ত্রৈমাসিক পত্রিকা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

ঘরোয়া আরাম

একে গরম, তার সারাদিন পায়ের উপর। অবশেষে ছুটি যখন মিললো, আরামের প্রথম সূচনায় নরম এক জোড়া বাটার চটি—পা গলিয়ে পরম শান্তি। হাওয়া নকশা, নিরিবিলি একমাত্র ঘরেই আমেজের।

Bata

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৭০

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

লংলাইফ অক্সফোর্ড ১৬.৫০
অনেক দিনের আরাম
শুধু আরাম নয়, গঠনেও আশ্চর্য মজবুত।
আচ্ছাদনে আগাগোড়া সরেস চামড়া, সরেস টেকসই
সোল আর হিল, তার উপর নিপুণ
বিজ্ঞানসম্মত নির্মাণকৌশল।
ফলে অনেক দিন অবিকল থাকে এর
আঁটসাঁট গঠন, অনেক দিনের চলনেও মনে হয়
সদ্যকেনা, আনকোরা। বাটার এই জুতোগুলি
হাঁটাপথে পরিপাটি আরামের আধার,
বিচক্ষণ রুচির পরিচায়ক।
আজই একজোড়া কিনে পরখ করুন।
Bata
লংলাইফ নিউকাট ১৪.৯৫
ইজি ২২.৯৫
অপ্সরী ১৩.৫০
সুচিত্রা ১৩.৫০

ত্রৈমাসিক পত্রিকা

কার্ত্তিক-পৌষ ১৩৭০

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

লংলাইফ ডারবি ১৬.৯৫

লংলাইফ ক্যাজুয়াল ১৫.৯৫
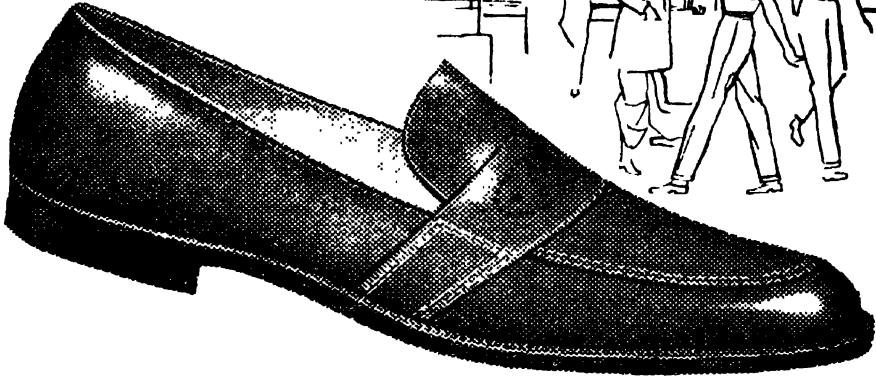
দীর্ঘ ব্যবহারের নির্ভরতা

সকল রকম ধকল সওয়া বাটা লংলাইফের বিশেষত্ব। মসৃণ অথচ মজবুত চামড়ার এমনই এর নির্মাণ-কৌশল যে দীর্ঘ ব্যবহারেও চেহারা অবিকল থাকে, সেই সঙ্গে অটুট থাকে এর নমনশীলতা। বাটা লংলাইফের আরেকটি বিশেষত্ব এর সোল, প্রায় অক্ষয় বলা চলে। অভিনব এর প্রস্তুতপ্রণালী, সুখে পদক্ষেপের প্রকৃত সহায়।

LONGLIFE

লংলাইফ অক্সফোর্ড ১৬.৫০
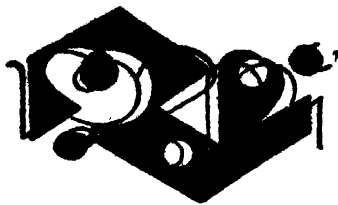
ত্রৈমাসিক পত্রিকা

মাঘ-চৈত্র ১৩৭০

॥ সূচীপত্র ॥

॥ সম্পাদক : হুমায়ুন কবির ॥

আতাউর রহমান কর্তৃক শ্রীসরস্বতী প্রেস লিমিটেড, ৩২ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড,
কলিকাতা ৯ হইতে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ হইতে প্রকাশিত।

পঞ্চবিংশতিতম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ-আষাঢ় ১৩৭০

কংগ্রেস মতবাদ

হুমায়ুন কবির

কংগ্রেসের যাঁরা সমালোচক তাঁরা প্রায়ই বলেন কংগ্রেসের কোন আদর্শ বা মতবাদ নেই। মতবাদ বলতে যদি বাঁধাধরা কতকগুলি বিশ্বাস বা সংস্কারের সমষ্টি বোঝায় এবং কেবলমাত্র যুক্তির উপর নির্ভর করে সেই মতবাদ থেকেই আমরা সকল রকম কর্মপদ্ধতি নির্ধারণ করবার চেষ্টা করি, তবে হয়ত এ অভিযোগ সত্য বলে মানতে হয়। নিঃসন্দেহে একথা সত্য যে কংগ্রেস ভারতের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য ও ইতিহাসের ভিত্তিতে নিজস্ব আদর্শ ও নীতি গ্রহণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সমান সত্য যে কোন নির্দিষ্ট অপরিবর্তনীয় মতবাদকে তার রাজনৈতিক ধর্ম বলে কংগ্রেস অন্ধভাবে গ্রহণ করেনি। সুদীর্ঘ প'চাত্তর বৎসরের ইতিহাসে তাই বারবার দেখি যে যখনই সমাজের সম্মুখে নূতন সমস্যা দেখা দিয়েছে, তার দাবী মেটাবার জন্য কংগ্রেস নূতন কর্মসূচীর উদ্ভাবন করেছে। এই জন্যই ১৯৬০ সালের কংগ্রেসের সঙ্গে ১৮৮৫ সালের কংগ্রেসের অনেক তফাৎ। ১৯৮৫ সালের কংগ্রেসের কর্মপন্থা ঠিক তেমনি ১৯৬০ সালের কংগ্রেস হতে বহু ব্যাপারে বিভিন্ন হতে বাধ্য।

চাকুরীর মাধ্যমে দেশের সরকারী কাজে ভারতবাসী অংশ গ্রহণ করুক এই উদ্দেশ্য সফল করবার জন্য প্রথম কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। অল্পদিনের মধ্যেই সে চেষ্টার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসাবে পৌর অধিকারের জন্য সংগ্রাম কংগ্রেসের প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় ২০ বৎসর নাগরিকের এইসব মৌলিক অধিকার লাভই কংগ্রেসের মূল উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী যুগে কংগ্রেস জনসাধারণের স্বায়ত্ত-শাসনের দাবী উত্থাপন করে এবং রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের জন্য জনগণের মুখপাত্রে পরিণত হয়। এই লক্ষ্য সফল করবার জন্য প্রথম প্রথম কংগ্রেস সম্পূর্ণ আইনানুগ এবং সাংবিধানিক পথ অবলম্বন করেছিল। কাজেই সে যুগে কংগ্রেসের দাবীগুলি ব্রিটিশ শাসনের প্রতিকূল মনে হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে মুক্তিলাভের দাবী সে কালেও উঠেছিল। কিন্তু যে সব বিপ্লবী সংস্থা সে দাবী তোলে, কংগ্রেসের সঙ্গে তাদের বিশেষ কোন সম্পর্ক বা যোগাযোগ ছিল না।

বর্তমান শতাব্দীর শুরুতে সমগ্র প্রাচ্যে এক নবজাগরণের সূচনা দেখা দেয়। বুয়র যুদ্ধের কালেই ইংরাজের প্রতি ভারতবাসীর বিশ্বাস অনেকখানি ভেঙ্গে গিয়েছিল।

আবিসিনিয়ার হাতে ইতালির পরাজয় ও রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের বিজয়ের ফলে এশিয়ার দেশগুলিতে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়। তার কিছুকাল পরে নবীন তুরস্ক আন্দোলন শুরু হয় এবং সমস্ত মধ্যপ্রাচ্য দেশগুলিকে আলোড়িত করে। এশিয়ার এ নবজাগরণের চাঞ্চল্য ভারতবর্ষেও দেখা দেয় এবং লর্ড কার্জনের শোষণমূলক নীতির ফলে সর্বশ্রেণীর ভারত-বাসীর মধ্যে এক নূতন সরকার বিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাবের ফলে সমগ্র দেশের ধূমায়িত আক্রোশ প্রজ্জ্বলিত হয়ে এক সংকটপূর্ণ অবস্থার সৃষ্টি করে।

কেবলমাত্র নাগরিক অধিকারের দাবীর বদলে সমগ্র ভারতবাসীর কণ্ঠে জন্মগত অধিকার হিসাবে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী মন্দ্রিত হয়ে ওঠে। বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথ অরবিন্দ ও সুরেন্দ্রনাথ এবং মহারাষ্ট্রে তিলক জাতীয় স্বাধীনতার জন্য নূতন দাবী উত্থাপন করেন। কংগ্রেসের কর্মসূচীতে বারবার আভ্যন্তরীণ স্বাধিকার (Home Rule) দাবীর মধ্যে এই নতুন জাগরণের প্রকাশ দেখা দেয়। এ প্রসঙ্গে শ্রীমতী অ্যানি বেসান্তের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। তিনি আভ্যন্তরীণ স্বাধিকারকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জনসাধারণের স্বায়ত্তশাসনরূপে বলে ঘোষণা করেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব এবং রাষ্ট্রপতি উইলসন কর্তৃক প্রত্যেক জাতির আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ঘোষণার ফলে ভারতবর্ষের এই জাতীয় দাবী আরো প্রবল হয়ে উঠে। মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেসের সামনে অহিংস ও অসহযোগ আন্দোলনের এক নূতন কর্মসূচী পরিবেশন করেন। ভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীর আবির্ভাব এক নবীন বিপ্লবের সূচনা এনে দেয়। কংগ্রেসের লক্ষ্য অবশ্য বদলায়নি, কিন্তু কর্মপদ্ধতিতে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। ১৯২৮ সাল পর্যন্ত সরকারীভাবে কংগ্রেস পূর্ণস্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করেনি। গান্ধীজীর নেতৃত্বে যে সংবিধানবিরোধী ও আইনবহির্ভূত আন্দোলন শুরু হল, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসন অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই তাদেরও লক্ষ্য ছিল। এমনকি ১৯২৮ সালেও মতিলাল নেহরু রিপোর্টে ভারতীয় রাজনৈতিক সংগ্রামের লক্ষ্য হিসাবে কমনওয়েলথের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসনের দাবীই উল্লিখিত হয়। ১৯২৯ সালেই প্রথম কংগ্রেস তার রাজনৈতিক লক্ষ্যরূপে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী ঘোষণা করে। এবার কেবল পদ্ধতি নয়, কংগ্রেসের লক্ষ্যেও ধারণাতীত পরিবর্তন এল। সরকারী কার্যে অধিক অংশ গ্রহণের অধিকার সংগ্রহের জন্যই কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। কালক্রমে তার রূপ বদলে আইনানুগ ও সংবিধানসম্মত পদ্ধতির মাধ্যমে রাজনৈতিক ও পৌর অধিকার লাভের জন্য আন্দোলনই কংগ্রেসের প্রধান কার্যক্রম হয়ে দাঁড়াল। সে কালের কংগ্রেসকে বিপ্লবী সংস্থা বলা চলে না। সমাজের নেতৃস্থানীয় বিদ্বজ্জনের প্রতিষ্ঠান হিসাবেই সেদিন কংগ্রেস মর্যাদা লাভ করেছিল। তারপরে পরিবর্তনের পালা আরো দ্রুত হয়ে উঠল। এই দশকের মধ্যেই আবেদন নিবেদনের পালা শেষ করে সংবিধানবহির্ভূত আইন অমান্য আন্দোলনের মাধ্যমে জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের আহ্বান কংগ্রেসের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল। স্বল্পসংখ্যক শিক্ষিত বুদ্ধিজীবীর সংস্থা সংগ্রামশীল বিরাট গণ-প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হল।

লক্ষ্য, আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে দলের বিভিন্ন কার্যক্রমের বিষয়বস্তুর পরিবর্তনও কংগ্রেসের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথই বোধ হয় প্রথম কংগ্রেসের সম্মুখে ভারতীয় গ্রামের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের এক সর্বাঙ্গীন কর্মসূচী উপস্থাপিত করেন। ফলে স্বদেশী যুগে বহু কর্মীর আবির্ভাব হয়। সরকারের

সাহায্য ভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ও শিল্পজীবন উন্নয়নের বিভিন্ন প্রয়াস দেখা যায়। অসহযোগ কর্মসূচী গ্রহণের সময় গান্ধীজীও গ্রামীণ শিল্প ও অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেন। নতুন ধরনের এই সমস্ত প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কংগ্রেসের রাজনৈতিক ধারা কিন্তু মূলতঃ অব্যাহত থাকে।

১৯৩১ সালে কংগ্রেসের ইতিহাসে আবার এক বিরাট পরিবর্তন আসে। করাচী অধিবেশনেই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের কাজকে কংগ্রেস তার অন্যতম লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বলে প্রথম স্বীকৃতি জানায়। এই পরিবর্তনের জন্য সর্বাধিক কৃতিত্ব শ্রীজওহরলাল নেহরুর। রবীন্দ্রনাথের গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গীকে রাজনৈতিকদের মধ্যে অনেকেই স্বীকার করতে পারেননি। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে গান্ধীজীর মতামত বুদ্ধিজীবীশ্রেণী নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেননি। বুদ্ধিজীবীসম্প্রদায়কে জওহরলালই কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করেন। আলোচ্য শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে কংগ্রেস কর্মসূচীর মধ্যে সমাজতন্ত্রের আদর্শ গ্রহণ করার জন্যও জওহরলালই প্রধানত দায়ী। বামপন্থী গোষ্ঠিগুলিতে এম. এন. রায় অনেক সমর্থক ও অনুরাগী পেয়েছিলেন কিন্তু জওহরলাল নেহরুর অটুট নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টা ভিন্ন করাচী অধিবেশনের কর্মসূচী গ্রহণ কখনই সম্ভব হত না। সেই কর্মসূচী গ্রহণের ফলে দেশের বিদ্বানসমাজ ও তরুণ সম্প্রদায় কংগ্রেসকে মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে শিখল।

১৯৩০-৩১ সালে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সঙ্কট ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক জীবনকেও প্রবলভাবে আলোড়িত করে। সেই সময় থেকেই আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের সম্ভাবনা জনসাধারণের সামনে বিভীষিকার মতন দেখা দেয়। এই সংকটের দিনে আন্তর্জাতিক ঘটনা সম্পর্কে ভারতবাসী অধিকতর সচেতন হয়ে উঠে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ হিংসাত্মক জাতীয়তাবাদের বিপদ সম্পর্কে পৃথিবীকে সাবধান করেছিলেন। বলেছিলেন যে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও সম্প্রীতি ভিন্ন বর্তমান যুগে মানুষের কল্যাণ নেই। অসহযোগ আন্দোলনের বহু পূর্বে, ১৯১২ সালে, মওলানা আজাদ বিশ্লেষণ করে দেখান যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্তর্জাতিক শান্তি ও প্রগতির জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়। দেশবন্ধু দাশও এ সম্বন্ধে অসাধারণ দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। তবু বলতে হবে যে এই ব্যাপারে কংগ্রেস নীতির নবপরিবর্তনের জন্য কৃতিত্ব জওহরলালকেই দিতে হবে। তিনি যেভাবে আন্তর্জাতিক ঘটনা ও শক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে ক্রমাগত দেশকে সচেতন করেন, তারই ফলে কংগ্রেস আন্তর্জাতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় সমস্যাগুলিরও বিচারে প্রবৃত্ত হয়।

১৯২৯ সালে কংগ্রেস স্বাধীনতার আদর্শ গ্রহণ করে। ১৯৩১ সালে করাচীতে সেই স্বাধীনতার অর্থনৈতিক রূপ সমাজতান্ত্রিক পরিকল্পনায় প্রকাশিত হয়। ১৯৩১ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের লক্ষ্যে ও কর্মসূচীতে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন হয়নি। এমনকি ১৯৪২ সালের যে আন্দোলন, তার মধ্যেও কোন নূতন রাজনৈতিক আদর্শের পরিচয় মেলে না। কংগ্রেসের অতীত রাজনৈতিক কর্মসূচীর ভিত্তিতেই সে আন্দোলন পরিচালিত হয়। এই ষোল বৎসরে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ঘটনার সংঘাত ও পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করার জন্যই কংগ্রেসের কর্মসূচীতে প্রয়োজনমত কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল।

১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের পরে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়। ১৯২৯

সালে কংগ্রেস ঘোষণা করেছিল যে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বাইরে স্বাধীন গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ১৯৪৭ সালে কিন্তু কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডমিনিয়ন হিসাবেই ভারতবর্ষ স্বাধীন হল। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে এ ব্যবস্থায় ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাহার করা হল। আসলে কিন্তু কংগ্রেসের নতুন সিদ্ধান্ত রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ও বাস্তববোধের পরিচায়ক। স্বাধীনতার পূর্বে নানা কারণে কংগ্রেস আন্দোলনকেই বড় করে দেখেছে। আন্দোলনের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল বলে ১৯২১, ১৯৩১ এবং ১৯৩৭ সালে আসল ক্ষমতা তাই সব সময়ে ঠিকভাবে ব্যবহার হয়নি। দেশবন্ধু দাশ এবং পরে সুভাষ-চন্দ্র বহুবার এ বিষয়ে কংগ্রেসের নীতির সমালোচনা করেছেন। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস ক্ষমতার ছায়া পরিত্যাগ করে কায়া অধিকারের দিকে দৃষ্টি দিল।

১৯২১ সালে ডমিনিয়ন ব্যবস্থাকে পূর্ণ স্বাধীনতা বলা সম্ভব ছিল না, কিন্তু ১৯২৬ সালের পরে ডমিনিয়ন ব্যবস্থা ও পূর্ণ স্বাধীনতার মধ্যে পার্থক্য ধীরে ধীরে লোপ পেয়ে গেল। বরং বলা চলে যে বর্তমান আণবিক যুগে যখন আমেরিকা বা সোভিয়েট রাষ্ট্রের মত শক্তিশালী রাষ্ট্রও কেবল একক শক্তিতে আত্মরক্ষা করতে দ্বিধা বোধ করে, তখন কমন-ওয়েলথের সম্বন্ধ বন্ধ বিভিন্ন ডমিনিয়নের পারস্পরিক নির্ভরশীলতা স্বাধীনতাকে ব্যাহত না করে বরং আত্মরক্ষার সুযোগ ও সুবিধা বাড়িয়ে দেয়। বস্তুত কমনওয়েলথ পরিকল্পনায় স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের স্বেচ্ছামূলক সংযোগে যে সংস্থার উদ্ভব হয়েছে, ভবিষ্যতে হয়তো তারই ভিত্তিতে পৃথিবীর সমস্ত স্বাধীন রাষ্ট্রের সংযোগে বিশ্বযুক্তরাষ্ট্র গড়ে উঠতে পারে। কমনওয়েলথের পরিকল্পনায় যে ভবিষ্যত রাষ্ট্ররূপ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল, প্রাক্তন ফরাসী সাম্রাজ্যের উপনিবেশগুলির স্বাধীনতার পরে ফরাসী সম্প্রদায়ের আবির্ভাবে তারই ক্রম-বিকাশ দেখা যায়। বোধ হয় ইয়োরোপীয় কমিউনিটি বা সম্প্রদায়ের পরিকল্পনা তারই তৃতীয় পদক্ষেপ। এই ধারাবাহিক পরিবর্তনের ফলে আন্তর্জাতিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের এক সুদৃঢ় সংস্থার আবির্ভাব হতে পারে। যেদিন এ পরিকল্পনা পূর্ণতা লাভ করবে, সেদিন স্বাধীনতা অপেক্ষা পারস্পরিক নির্ভরশীলতাই সভ্যসমাজের মূল আইনরূপে স্বীকৃত হবে।

কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে রাজনৈতিক চেতনা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামাজিক চেতনাও বৃদ্ধি পেয়েছিল। পৃথিবীতে আজ রাষ্ট্র বৃহত্তর সামাজিক দায়িত্বগ্রহণে ও সর্ব-সাধারণের সক্রিয় সহযোগিতায় সমাজ-কল্যাণসাধনে অগ্রণী। সমাজের সর্বশ্রেণীর এই সর্বাঙ্গীন কল্যাণসাধনার রূপ সমাজতন্ত্রের আদর্শে মূর্ত হয়ে উঠেছে। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকেই জওহরলাল নেহরু সমাজতন্ত্রের অনুরাগী ছিলেন, কিন্তু তাঁর প্রগাঢ় ইচ্ছা সত্ত্বেও কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনের পূর্বে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোকে কংগ্রেসের ঘোষিত নীতিরূপে গ্রহণ করা সম্ভব হয়নি। আবাদি অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর নীতি গৃহীত হল, এবং অল্পদিনের মধ্যেই সর্বোদয়ের আন্দোলনকে গ্রহণ করে কংগ্রেস সমাজতন্ত্রের পরিকল্পনাকে এক নতুন সমৃদ্ধ রূপ দিল। সঙ্গে সঙ্গে সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সমাজের অগ্রগতির সুযোগ দানের নীতিকে কংগ্রেস স্বীকার করে নিল। ভারত আজ কল্যাণ রাষ্ট্রের আদর্শকে গ্রহণ করেছে কিন্তু সেই সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে সমাজের প্রগতি ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চয় করা হবে কিন্তু সেজন্য ব্যক্তিস্বাধীনতা ও মানবতার প্রমূল্যের লেশমাত্র হানি কংগ্রেস স্বীকার করবে না। ব্যক্তিগত উদ্যম ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন শক্তির উন্মেষের ব্যবস্থা হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণের যে কর্মসূচী সম্প্রতি গ্রহণ করেছে তার ধরণ ও

বৈচিত্র্যের তুলনা পৃথিবীতে বিরল।

কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থার পরিবর্তন ও অগ্রগতির এই বিবরণ থেকেই প্রমাণ হয় যে কংগ্রেসী মতবাদ ও কর্মসূচী সর্বদাই পরিবর্তনীয় ও সহজ ছিল। ভারতবর্ষের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী চিরকাল গোঁড়ামি বর্জন করে পরিবর্তনশীলতাকে স্বীকার করেছে। বাস্তবে যে বহু ধারা আছে এবং সত্যের উপর কারো একচেটিয়া অধিকার নেই, এ সত্য বহু যুগ পূর্বে ভারতীয় দর্শন উপলব্ধি করেছিল। ভারতের ইতিহাসের শুরু থেকে আমরা দেখি যে নানা ধর্মীয় জীবনযাত্রা এদেশে সহঅবস্থান করছে। ভারতীয় চিন্তাধারা স্বীকার করে যে জীবনযাত্রার সকল ধরণধারণের মধ্যেই সত্যের বিভিন্ন প্রকাশের সম্ভাবনা আছে। সেইজন্য কোন মতকে সম্পূর্ণ স্বীকার করা অথবা কোন মতেরই আমূল বিলুপ্তি ঘটানো সম্ভব নয়। ভারতবাসী মনে করে কোন একটি পথ বা সত্যকে চরম বা সম্পূর্ণ সত্যরূপে গ্রহণ করা অযৌক্তিক। প্রত্যেক মতের আংশিক সত্যতা বা উপযোগিতাকে স্বীকৃতিদান এবং কোন একটি মতের সম্পূর্ণ সত্য উপলব্ধির পূর্ণ অধিকারকে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন—এই দুয়ের সমন্বয়ে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তনকে সহজে স্বীকার করতে পেরেছে। ফলে ভারতীয় দর্শনদৃষ্টিতে বৈচিত্র্যের যে উদার স্বীকৃতি, দর্শনের ইতিহাসে তার তুলনা বেশী মিলবে না।

দৃষ্টিভঙ্গীর এই উদারতার ফলে ভারতবর্ষ চিরকালই বিভিন্ন দেশ ও সমাজের বিভিন্ন চিন্তা আচার-ব্যবহারের বৈচিত্র্যকে শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। জীবনধারা ও সত্য বহুমুখী, তাই যেখানেই সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে, সে চেষ্টায় সার্থকতার দাবীকে ব্যাপকভাবে অস্বীকার করা সম্ভব নয়। ব্যক্তিমর্যাদাকে স্বীকৃতিদান এই নীতির স্বাভাবিক পরিণতি। প্রত্যেক ব্যক্তিরই অন্তত আংশিকভাবে সত্য উপলব্ধির শক্তি আছে, অন্যপক্ষে কোন ব্যক্তির পক্ষেই সম্পূর্ণ সত্য লাভ সম্ভব নয়, এই বিশ্বাস ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তি। তার ফলে এই সিদ্ধান্ত অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায় যে কোন ব্যক্তিকেই সম্পূর্ণ গ্রহণ বা সম্পূর্ণ বর্জন করা অযৌক্তিক। প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার প্রাপ্য মর্যাদা ও শ্রদ্ধা প্রদান করতে হবে। সকল মানুষকে ব্রহ্মের প্রকাশ বলে ঘোষণা করে ভারতীয় আদর্শ এই নীতি স্বীকার করেছে। সঙ্গে সঙ্গে দুঃখের সাথে স্বীকার করতে হয় আদর্শ ও নীতিগতভাবে ব্যক্তির মর্যাদা স্বীকার করলেও সামাজিক আচার-ব্যবহারে ভারতবর্ষে বহু ক্ষেত্রেই এই আদর্শকে অস্বীকার করা হয়েছে। ভারতভূমি থেকে বৌদ্ধ মতবাদ বিলুপ্ত হবার পর থেকে ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় জাতিবৈষম্য আরো দৃঢ়ভাবে কায়েম হল এবং ইসলাম ও খৃস্টান ধর্মের প্রভাবেও সে অন্যায় পুরোপুরি দূর হয়নি।

সত্যের প্রতি ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর এই বৈশিষ্ট্য সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সার্থক হয়নি। কিন্তু কালপ্রবাহে সমাজে ও চিন্তায় যে সব পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠে, তাকে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল। ব্যক্তি কেবলমাত্র আংশিকভাবে সত্য উপলব্ধি করতে পারে, তাই বাস্তবের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য সদাসর্বদা তাকে সচেষ্ট থাকতে হয়। বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন সময় সত্যের বিভিন্ন দিক উপলব্ধি করেন। মানুষের কাছে পৃথিবী তাই অনন্ত পরিবর্তনের লীলাক্ষেত্র বা সংসাররূপে প্রতিভাত। বাস্তবের ক্রিয়া এবং প্রকাশের উপর নির্ভর করে যাঁরা তার স্বরূপ বুঝতে চান, তাঁদের সামনে বিশ্বপ্রকৃতির অনন্ত চাঞ্চল্যই স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয়। বাস্তবপক্ষে এ রকম ধারাবাহিক অসংখ্য পরিবর্তনের মাধ্যমে সত্যের পূর্ণরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। অভিজ্ঞতা অনিত্য ও চিরচঞ্চল। তবু মানুষ তার অভিজ্ঞতার উপরই নির্ভর এবং ঐ অভিজ্ঞতা অতিক্রমণ করে চরম সত্যের

পরিচয় পাওয়ার সাধনা তাকে করতে হবে। ধর্ম এবং সম্প্রদায় নির্বিশেষে সমস্ত ভারত-বাসীই বস্তুর ক্ষণভঙ্গুরতা ও পরিবর্তনের অপরিহার্যতায় বিশ্বাসী।

কংগ্রেসের আদর্শ ও কর্মপন্থা ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে। তাই তার আদর্শ ও কর্মসূচীতেও পরিবর্তন ও পরিবর্তনশীলতার মৌলিক স্বীকৃতি মেলে। ভারতীয় অভিজ্ঞতার এই স্বীকৃতিও কংগ্রেসের বাস্তববোধের লক্ষণ। বাস্তবের সঙ্গে যোগের ফলে ভারতীয় মনে কংগ্রেস গভীর দাগ কেটেছে। গত ৭৫ বৎসরে প্রত্যেক স্তরে সমসাময়িক কালানুবর্তী সামাজিক অভিজ্ঞতা ও প্রগতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কংগ্রেসের আদর্শ সূচিত হয়েছে। অনেকে আপত্তি করেন যে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বহুক্ষেত্রে পরীক্ষা-মূলক, এবং অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে কংগ্রেসের কর্মপন্থা ও নীতিও বদলেছে। যাঁরা গুরুবাদী, তাঁরা এ ধরনের সমালোচনা করতে পারেন। কিন্তু বর্তমান যুগে যে দ্রুতগতিতে সামাজিক কাঠামো ও প্রতিষ্ঠানের, বস্তুতপক্ষে সমগ্র সমাজের মূল পরিবর্তন ঘটছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে এ রকম পরীক্ষামূলক মনোভাবকে সমালোচনার পরিবর্তে অভিনন্দিত করা উচিত। সত্যের বিভিন্ন প্রকাশকে স্বীকার করবার যে মনোবৃত্তি ভারতীয় দর্শনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য, সে কথা মনে রাখলে আদর্শ ও কর্মসূচীর ব্যাপক কাঠামোর মধ্যেও কংগ্রেস নানারূপ মত প্রকাশের স্বাধীনতা কেন দিয়েছে, তা সহজেই বোঝা যায়। একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে একই আদর্শ গ্রহণ করেও সেই আদর্শের উপলব্ধি বা প্রয়োগের ব্যাপারে মতবিরোধ থাকা শুধু স্বাভাবিক নয়, বোধ হয় অনিবার্য। কংগ্রেস সংগঠনের মধ্যে এই ধরনের মতভেদ রয়েছে বলে কংগ্রেসের কর্মপন্থায় পরিবর্তন আনা অনেক সহজ। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তনের সম্ভাবনা সংগঠনের দুর্বলতার লক্ষণ নয়, বরং শক্তির পরিচায়ক।

কালের পরিবর্তনের সঙ্গে কংগ্রেসের পরিবর্তনের প্রবণতা তরুণ মনে এক বিশেষ আবেদন সৃষ্টি করে। বর্তমান যুগে যুব সমাজের সম্মুখে যে সকল বাধা, বোধ হয় পূর্বের কোন যুগের যুবক সমাজ সে ধরনের বাধার সম্মুখীন হয়নি। বিজ্ঞান ও যান্ত্রিক প্রগতি পৃথিবীকে ঐক্যবদ্ধ করেছে, সম্পদ, ঐশ্বর্য ও আরামের নতুন সম্ভাবনার সৃষ্টি করেছে; কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মানুষের বাঁচার পথে নূতন বিপত্তির সৃষ্টি করেছে। প্রায় তিনশো বৎসর ধরে বিজ্ঞানের প্রগতির ফলে প্রথমে জাতীয় রাষ্ট্র এবং বর্তমানে বিশ্বরাষ্ট্র প্রায় অনিবার্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোবৃত্তির দিক দিয়ে বহু ক্ষেত্রে মানুষ উপজাতির স্তর অতিক্রম করে নি। উপজাতিসুলভ মনোবৃত্তি জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের সময়ে সমস্যা সৃষ্টি করেছে, বর্তমান আণবিক যুগে উপজাতিসুলভ মনোবৃত্তি মানুষের অস্তিত্বের পক্ষেও বিপদজনক। অতীতের তুলনায় বর্তমানে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর সহজ পরিবর্তনশীলতা আরো বেশী প্রয়োজন। আজ যারা তরুণ বা যুবক, যুগের সমস্যা সমাধানে কাল তাদেরই বিশেষভাবে উদ্যোগী হতে হবে। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস নিজের আদর্শ ও কর্মপন্থার মধ্যেই পরিবর্তনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করে নিয়েছে, তাই কংগ্রেস সংগঠনে বর্তমান যুগের বিচিত্র সমস্যার নূতন সমাধানের পথ তরুণ সম্প্রদায় যত সহজে করতে পারে পৃথিবীতে অন্য কোন রাজনৈতিক দলের সংগঠনে বোধ হয় তার নজীর মিলবে না। কম্যুনিস্ট পার্টি যেভাবে পুরাতন বিশ্বাস ও কর্মপন্থা আঁকড়ে থাকতে চায়, বিন্দুমাত্র পরিবর্তনের নামে ভয়ে আঁতকে উঠে, সে কথা স্মরণ করলেই কংগ্রেসের মুক্তবুদ্ধি ও নতুনকে গ্রহণ করবার আকাঙ্ক্ষা সম্বন্ধে কোন সন্দেহ থাকে না।

কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সহজ পরিবর্তনশীল মনোভাবের শ্রেষ্ঠত্বের যে দাবী উত্থাপন

করা হচ্ছে, অন্য রাজনৈতিক দলের সভ্যরা নিশ্চয়ই তার বিরোধিতা করবেন। রাজনৈতিক আলোচনা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তিনিরপেক্ষ হতে পারে না, কারণ মূল্যায়নের বিচার আমাদের অনুসন্ধানের ধারাকে প্রভাবিত করতে বাধ্য। ভারতীয় জনগণের স্বীকৃতি লাভের জন্য যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল আজ উদগ্রীব, কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যক্রমের সঙ্গে তাদের রাজনীতি ও কর্মপন্থার তুলনামূলক বিচার করলে এ সম্বন্ধে আমাদের ধারণা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

ঐতিহাসিক বিবেচনায় গুণগত বিচারে ও দলীয় নেতৃবৃন্দের ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের বাইরে যে দল প্রথম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তার নাম প্রজা সমাজতন্ত্রী দল। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দল ও কৃষক প্রজা মজদুর দলের সংযোগের ফলে এ দলের উৎপত্তি। ইচ্ছা করেই সংযোগ বা coalition কথাটির ব্যবহার করেছি। কারণ মনে হয় এই দুই দলের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হলেও দুই দলের আদর্শের সমন্বয় ঘটেনি। প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের দই শাখার নেতৃবৃন্দই প্রথমাবস্থায় কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেসের মধ্যেও প্রতিদ্বন্দ্বী দুই উপদলরূপেই তাঁরা কাজ করেছেন। কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবৃন্দ মূলতঃ মার্ক্সবাদী ছিলেন কিন্তু খানিকটা গান্ধিজীর প্রভাবে ও খানিকটা ভারতীয় রাজনৈতিক ঘটনার চাপে ধীরে ধীরে মার্ক্সবাদ পরিহারে তৎপর হন। অপরদিকে কৃষক প্রজা মজদুর দল গান্ধিজীর অনুগামীরূপেই আত্মপ্রকাশ করেন ও গান্ধিজীর প্রায় সমস্ত অর্থনৈতিক রাজনৈতিক ও সামাজিক মতবাদ ও দৃষ্টি-ভঙ্গীকে অকুণ্ঠভাবে স্বীকার করেন। বিরোধী পটভূমিকা ও দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে গঠিত এই দুই দলের মধ্যে যে মিলন ঘটেছে তা সত্যই বিস্ময়কর। মতের মিল অপেক্ষা কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ভিত্তিতেই দুই দলের নেতৃবৃন্দ এক সঙ্গে কাজ করতে স্বীকার করেছেন, একথা বললে অন্যায় হবে না। সংযোগের পরেও উভয় দলের পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয় সাধন কিন্তু সম্ভব হয়নি। বর্তমানে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের অভ্যন্তরে যে অনিশ্চয়তা ও দলাদলির পরিচয় মেলে, তার জন্য দলের রাজনৈতিক সংহতির অভাব ও দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর অসঙ্গতিই প্রধানত দায়ী।

প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের প্রতি যাঁরা সহানুভূতিশীল তাঁদেরও স্বীকার করতে হবে যে কংগ্রেসের আদর্শ থেকে স্বতন্ত্র বা পৃথক কোন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী প্রণয়নে এই দল সক্ষম হয় নি। কংগ্রেসের ন্যায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির মাধ্যমে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নীতি এই দল গ্রহণ করেছে। আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেসের সঙ্গে এই দলের মতৈক্য স্পষ্ট, কিন্তু তবু রাজনৈতিক প্রয়োজনে কর্মসূচীর মতানৈক্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কর্মসূচীর তথাকথিত পার্থক্যের উপর বেশী জোর দেওয়া হয়েছে এইজন্য যে তা নইলে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের পৃথক অস্তিত্বের কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। এটা দুঃখের কথা যে গণতন্ত্র প্রসারের পরিপ্রেক্ষিতে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল আজ পর্যন্ত নিজস্ব এক রাজনৈতিক দর্শন তৈরী করতে পারে নি। বিভিন্ন মতের স্বীকৃতি ও সমন্বয়ের মাধ্যমেই গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। গণতন্ত্রে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের মধ্যে মৌলিক প্রশ্নে মতের ঐক্য সত্ত্বেও মতের প্রকাশ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারে মতদ্বৈধের অবকাশ থাকে। মৌলিক

প্রশ্নে যদি বোঝাপড়ার অভাব হয়, তবে সমাজে ভাঙ্গন ধরে। অন্যপক্ষে মতের বৈচিত্র্যের অভাব হলে একনায়কতন্ত্রের পথ সুগম হয়ে উঠে। মৌলিকনীতির ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাথে মতৈক্য এবং রাজনৈতিক কর্মসূচীর পরিপ্রেক্ষিতে মতবিরোধ থাকার দরুন এক সময় মনে হয়েছিল যে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের এক বিকল্প গণতান্ত্রিক সংস্থারূপে আবির্ভূত হবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ দলীয় চিন্তাধারায় মার্ক্সীয় ও গান্ধীবাদী মতবাদের সমন্বয় ঘটল না। তার ফলে কংগ্রেসের বিকল্প কোন রাজনৈতিক মতবাদ গড়ে উঠল না, কেবলমাত্র বিরোধিতা করবার জন্য প্রজা সমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের বিরোধিতা করছে। এই সব কারণে দলটি সুস্পষ্ট রূপ পরিগ্রহণ করতে পারে নি; বরং চিন্তায় ও কর্মে অনিশ্চয়তা প্রদর্শন করছে। সুস্পষ্ট আদর্শ এবং বাস্তব কর্মপন্থার অভাবে ভারতীয় রাজনৈতিক জীবনে প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের কাছে যে সার্থকতা আশা করা গিয়েছিল তা পূরণ হয় নি। তার আর একটা দুঃখজনক ফল এই যে প্রজাসমাজতন্ত্রী দল কংগ্রেসের বিকল্প এক গণতান্ত্রিক সংস্থারূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নি বলে কম্যুনিস্ট দলের গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং ফলে ভারতে গণতন্ত্র বিপন্ন হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

কোন কোন সমালোচক এই প্রসঙ্গে আপত্তি তুলতে পারেন যে কংগ্রেসের বিকল্প সংস্থারূপে এককভাবে বা যুক্তভাবে রক্ষণশীল দলগুলির আবির্ভাব হতে পারে। এ ধরনের চিন্তার মূলে গলদ রয়েছে। বস্তুতপক্ষে রক্ষণশীল বা প্রতিক্রিয়াপন্থী দলগুলি রাজনৈতিক বিচারে কংগ্রেসের সঙ্গে একাসনে বসতে পারে না। হিন্দু মহাসভা হোক বা জনসংঘ হোক অথবা রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘই হোক, এই দলগুলি সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত হলেও একটিমাত্র সম্প্রদায়ের মতামতের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। তারা ভারতীয় সংস্কৃতির জটিলতা ও ব্যাপকতা হয় উপলব্ধি করতে পারে নি নয়ত অসম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছে। ভারতের সুপ্রাচীন অতীতের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে গিয়ে এসব দলের নেতারা ভুলে যান যে অতীতের গৌরবময় যুগে বিদেশী চিন্তাধারা ও প্রভাব অনুপ্রবেশের পথ ভারত রুদ্ধ করে নি। তাঁরা হয়ত জানেন না যে 'পুস্তক' 'কলম' 'কালি' ইত্যাদি মৌলিক শব্দগুলি গ্রীকভাষা থেকে সংস্কৃত ভাষায় গৃহীত হয়। অন্যান্য সমস্ত সম্প্রদায়ের দানকে অগ্রাহ্য করে কেবলমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সংস্কৃতি সম্বন্ধে অত্যধিক আগ্রহের ফলে এই সমস্ত দল রক্ষণশীল ও পরিবর্তন বিরোধী, তাই তারা বর্তমান যুগের বিরাট পরিবর্তনকে স্বীকার করতে অক্ষম। তারা যে কোনদিন সামগ্রিকভাবে ভারতীয় জনগণের আদর্শ ও আশার মুখপাত্ররূপে উপস্থিত হবে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক গঠন সে সম্ভাবনাকে লুপ্ত করেছে।

সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আদর্শ ও নীতির ভিত্তিতে গঠিত দলগুলি সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ভিত্তিতে গঠিত মুসলিম লীগের ন্যায় রক্ষণশীল দল সম্বন্ধে সে কথা আরো বেশী খাটে। বস্তুতপক্ষে সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের পক্ষে সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দেওয়া শুধু স্বার্থের পরিপন্থী নয়, মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এ ধরনের মনোভাব জাতীয় সংহতিকে দুর্বল করে। প্রত্যেক সম্প্রদায় বা অঞ্চলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য আছে, তা রক্ষা করাও জাতির স্বার্থে প্রয়োজন, কিন্তু সমগ্র জাতি বা দেশের ঐক্য রক্ষা প্রত্যেক অঞ্চল ও সম্প্রদায়ের জীবনের জন্য আরো বেশী প্রয়োজনীয়। ভারতবর্ষের দীর্ঘ ইতিহাসে আমরা বারবার দেখি যে একটি ব্যাপক ব্যবস্থা বা কাঠামোর মধ্যে যখনই জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ধারাগুলির সমন্বয় সম্ভব হয়েছে তখনই ভারতীয় জীবন

সমৃদ্ধ ও জাতীয় প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছে। রাজনীতির বা অন্য কোন ক্ষেত্রে অংশবিশেষের দানকে অস্বীকৃতি বা অবহেলার পথে ভারত সার্থকথার দিকে অগ্রসর হয় নি। সমস্ত বিভেদ লোপ করে যে বৈচিত্র্যহীন ঐক্য, সে পথে ভারতবর্ষ চলে নি। সমস্ত পার্থক্যকে স্বীকার করে ও সঞ্জীবিত রেখে তাদের মধ্যে ঐক্য সাধনই ভারতের বিস্ময়জনক জীবনীশক্তির গোপন সূত্র। এই প্রাচীন সত্যকে যখনই ভারত ভুলেছে, তখনই নানাভাবে ভারতবর্ষকে ক্ষতি স্বীকার করতে হয়েছে।

সাফল্যলাভে প্রয়াসী যে কোন রাজনৈতিক দলকেই ভারতবাসীর বৈচিত্র্য ও সংস্কৃতির বহুমুখিতাকে স্বীকার করতে হবে। রক্ষণশীল দলগুলি এই সহজ সত্য উপলব্ধি করেনি, কিন্তু বারবার পুনরাবৃত্তি করলেও মিথ্যা সত্যে পরিণত হয় না। একথা নিঃসন্দেহ যে ভারতীয় সংস্কৃতি মূলত বহুবিধ ধারার সংমিশ্রণে সমৃদ্ধ এবং প্রাচীন, মধ্যযুগীয় ও আধুনিক যুগের অবদানের সমন্বয়ে গঠিত। রক্ষণশীল দলগুলি ভারতীয় জীবনধারায় মধ্যযুগের ও আধুনিক যুগের অবদানগুলি অস্বীকার করে। ভারতীয় সমাজের আধুনিক প্রয়োজনগুলির সমাধানে তারা তাই ব্যর্থ হতে বাধ্য। বস্তুতঃ সুপ্রাচীন অতীতেও ভারতীয় সংস্কৃতি ছিল বহুমুখী, বহু সংস্কৃতির মিলনক্ষেত্র। রামায়ণ মহাভারতের যুগেও ভারতবর্ষ হরাপ্পা, আর্য ও দ্রাবিড় সভ্যতার এক সমন্বয় রচনা করেছিল। মধ্যযুগে আরব, পাঠান ও তুর্কীগণ নূতন ভাবধারার আমদানি করেছে। আধুনিক যুগের ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাধারা পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী ও ইংরাজের অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে।

সুদীর্ঘ কালের ইতিহাসে দেখা যায় ভারত চিরকালই তার সমৃদ্ধ ও বহুমুখী জীবনধারায় নব নব ভাবধারা গ্রহণে তৎপর হয়েছে। যুগের ভাবধারা ও প্রয়োজনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে যারা অগ্রসর হয়, প্রত্যেক স্তরে তারা সাফল্যলাভ করে। যারা অতীতের অচলায়তনকে আঁকড়ে থাকে, তারা ইতিহাসের বিস্মৃতির গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হয়। বর্তমান যুগে বিমান ও কারিগরি শিক্ষার প্রগতি দূরত্বের ব্যবধান ও ভৌগোলিক সীমানার বাধা দূর করে দিয়েছে। পুরাকালেও ভারতবর্ষ বহিরাগত প্রভাবকে আনন্দের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়েছে। বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে সেই গ্রহণশীল ও পরিবর্তনকামী মনোবৃত্তি আরো বেশী প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে। তাই ভারতের কল্যাণের জন্য আজ এমন রাজনৈতিক মতবাদের প্রয়োজন যে মতবাদ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আহরিত নব নব ভাবধারাকে গ্রহণ করে ভারতীয় জীবনকে সমৃদ্ধশালী করতে পারবে, সহজ পরিবর্তনীয় রাজনৈতিক দর্শনের মাধ্যমে পরিবর্তনশীল জগতের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারবে। যে সব রাজনৈতিক দল জাতি বা ধর্ম, সংস্কৃতি বা ভাষার ভিত্তিতে ভারতকে বিভক্ত করার চেষ্টা করবে, সে সব দল ভারতের জাতীয়তাকে দুর্বল করবে। যে দল বিজ্ঞান ও কারিগরি শিক্ষার শক্তি গ্রহণে বা আহরণে অক্ষম, বর্তমান পৃথিবীতে সে সব দলের স্থান নেই। উল্লিখিত রক্ষণশীল দলগুলি শুধু যুগের ভাবধারার বিরোধী নয়, ভারতের ঐতিহ্যেরও বিরোধী। ফলে আগামী দিনের ভারতবর্ষে তাদের স্থায়ী আসন নেই।

কংগ্রেসের আদর্শ ও কার্যক্রমের পরিপূর্ণ উপলব্ধি করতে হলে এবার শ্রীরাজাগোপালাচারীর নেতৃত্বে গঠিত স্বতন্ত্র দলের আদর্শের বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। রক্ষণশীল

দলরূপে স্বীকৃত হলেও সাম্প্রদায়িক আদর্শে গঠিত অন্যান্য দলগুলির সঙ্গে স্বতন্ত্র দলের পার্থক্য সুস্পষ্ট। শ্রীরাজাগোপালাচারীর যাঁরা কঠোর সমালোচক, তাঁরাও ভারতীয় রাজনীতিতে যে অর্থে সাম্প্রদায়িক শব্দ ব্যবহার হয় সেই অর্থে তাঁকে সাম্প্রদায়িক আখ্যা দিতে পারেন না। তিনি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের অন্যতম ছিলেন এবং সুস্পষ্ট দ্রষ্টা ও শক্তিমান বুদ্ধিজীবীরূপে বহুদিন হতে সম্মানিত। এতদ্ব্যতীত তাঁর নৈতিক সাহস অনন্যসাধারণ, অপ্রিয় সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি কোনদিন ভীত হন নি। তাঁর বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ অবশ্য করা চলে। বারবার দেখা গিয়েছে যে সাধারণ মানুষের ভাবগত ও মনোগত ইচ্ছা উপলব্ধি করতে তিনি অপরাগ। এইজন্যই ধীশক্তির প্রাচুর্য ও অসাধারণ নৈতিক সাহস থাকা সত্ত্বেও তিনি ভারতীয় জনগণের চিত্তে গান্ধী বা জওহরলালের মতন আসন গ্রহণ করতে পারেন নি। জনসাধারণের সহিত একাত্মতার মাধ্যমেই ব্যক্তি জাতীয় নেতৃত্ব লাভ করে। জাতীয় নেতা তাই জাতির অর্ধচেতন ও অবচেতন আশা ও চিন্তাকে উপলব্ধি করে স্বনির্বাচিত কর্মধারার মধ্যে জাতীয় শক্তিকে সঞ্চালিত করেন। জনসাধারণের সঙ্গে এই সহজ আত্মীয়তার অভাবে রাজাজী সঠিক সিদ্ধান্ত অবলম্বন করেও জাতিকে নিজের মতানুযায়ী পথে পরিচালিত করতে পারেন নি। সাধারণ লোকের প্রতি তাঁর সমবেদনার অভাব নেই, কিন্তু সাধারণ মানুষের আশা নিরাশার সাথে তিনি একাত্ম হতে পারেন নি।

জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর সহজ যোগ যে কত শিথিল, তাঁর দলের প্রাথমিক নামকরণেই তা প্রকাশ পেয়েছিল। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যাপারে পরিবর্তন ও প্রগতির প্রতি বর্তমানে ভারতবাসীর আকাঙ্ক্ষা উপলব্ধি করতে না পেরে রাজাগোপালাচারী প্রথমে তাঁর দলের নামকরণ করেন রক্ষণশীল দল। ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় স্থিতিশীলতার শক্তি সর্বদাই বিশেষ প্রকট ছিল। রাজাজী হয়তো ভেবেছিলেন যে জাতীয় চরিত্রের এই স্থিতিশীলতার সুযোগ নিয়ে তিনি কংগ্রেসের বিরুদ্ধে শক্তিশালী এমন দল সৃষ্টি করবেন যে ক্ষমতা ও প্রভাবে তা কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারবে। তিনি উপলব্ধি করতে পারেন নি যে ঐতিহ্যের শক্তি যতই প্রবল হোক, স্বাধীন ভারতবর্ষ আজ জাতীয় জীবনের বুনিয়াদ পর্যন্ত নতুন করে ঢেলে তৈরী করবার প্রয়াসী। চিরাচরিত পদ্ধতি বা প্রচলিত আদর্শ আঁকড়ে ধরে থাকলে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়, এই সহজাত উপলব্ধির ফলে অধিকাংশ চিন্তাশীল ভারতবাসী আজ সকল প্রকারের রক্ষণশীলতা সম্পর্কে তাই সন্দিহান।

দলের নামরণের অল্পদিনের মধ্যেই তীক্ষ্ম ও গভীর বুদ্ধি রাজাগোপালাচারী উপলব্ধি করলেন যে এ নাম চলবে না। তাই নাম বদলে দলের নতুন নামকরণ হল স্বতন্ত্র দল। ভারতীয় জীবনে ব্যক্তি স্বাধীনতা ও সম্পত্তিতে ব্যক্তির মালিকানা স্বত্ব চিরকালই স্বীকৃত। চিরদিনই ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রতি ঝোঁক দেখা গিয়েছে। ভারতবর্ষে ব্যক্তি স্বতন্ত্রভাবে মোক্ষ খোঁজে। এদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় হিন্দু, তাঁদের উপাসনাও মূলত ব্যক্তিগত, সমষ্টি বা গোষ্ঠিগত উপাসনার পরিচয় এদেশে বিরল। অর্থ-নৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এই দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিফলন স্পষ্ট। সমগ্র দেশের জন্য ভারত-বাসীর যতখানি টান, ব্যক্তি, পরিবার বা সম্প্রদায়ের প্রতি টান তার চেয়ে ঢের বেশী প্রবল। ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এদেশে অধিকাংশ লোক স্বনিয়োজিত, অথবা নিজের পরিবারের কোন ব্যবসায় বা কৃষিকর্মে ব্যাপ্ত। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক বা সামাজিক সমস্ত ক্ষেত্রেই সমাজের সামগ্রিক প্রচেষ্টার চেয়ে ব্যক্তি বা গোষ্ঠির সীমিত প্রচেষ্টাই বারবার দেখা দিয়েছে।

দেশের দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তিসত্তার উপর এত ঝোঁক রয়েছে বলে রাজাগোপালাচারী হয়তো ভেবেছিলেন যে ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতির ভিত্তিতে স্বতন্ত্র দল সহজেই ভারতবর্ষের জনসাধারণের হৃদয় জয় করে শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

একথা নিঃসন্দেহ যে রক্ষণশীল দল নামের চেয়ে স্বতন্ত্র দলের নামের আবেদন অনেক বেশী। ব্যক্তি স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির উপর গুরুত্ব দেওয়ার ফলে স্বতন্ত্র দলের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী অনেককে আকর্ষণ করেছে, একথাও মানতে হবে। পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে প্রথম মহাযুদ্ধের পূর্বে স্বতন্ত্র দলের রাজনীতি বোধ হয় এদেশে সকল শ্রেণীর লোকের স্বীকৃতি লাভ করত। দুটি বিশ্বযুদ্ধ ও বিশেষ করে স্বাধীনতার অভিজ্ঞতা ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীতে বিরাট পরিবর্তন এনেছে বলে বর্তমান যুগে স্বতন্ত্র দলের সে স্বীকৃতি লাভ অসম্ভব।

পঞ্চাশ বৎসরের ঘটনাপ্রবাহ ভারতীয় জনমানসের অন্য একটি শক্তিকে বিশেষভাবে জাগ্রত করেছে। প্রাচীন যুগে ভারতবাসী যখন ব্যক্তি সত্তার প্রতি বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছে, তখনও পরিবার ও গোষ্ঠীকে সে অবহেলা করে নি। অতীতে হয়তো দেশ বা জাতির প্রতি অনুরাগ তত প্রবল হয়ে দেখা দেয় নি, কিন্তু এ কথা কেবল ভারতবাসী বলে নয়, সমস্ত দেশের লোকের ক্ষেত্রে সমানভাবে প্রযোজ্য। বস্তুতপক্ষে বর্তমান যুগের পূর্বে কোন দেশেই জাতীয়তাবোধ প্রবল ছিল না। তাই ভারতবর্ষেও সাধারণ মানুষ দেশ বা জাতির চেয়ে গোষ্ঠী বা পরিবারের জন্য আনুগত্য জানিয়েছে। ইয়োরোপেও দেশাত্মবোধ মধ্যযুগের শেষেই প্রথম স্পষ্ট হয়ে উঠে।

ভারতবর্ষে কিন্তু পুরাকাল থেকেই ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বীকৃতির সঙ্গে সম্প্রদায়গত সম্পত্তির স্বীকৃতির পরিচয় মেলে। সাম্প্রদায়িক জীবনে ব্যক্তির কি পরিমাণ অবদান, তাই দিয়ে সমাজে ব্যক্তির প্রতিষ্ঠা নির্ধারিত হত। মধ্যযুগের শেষে এ মনোভাব বদলাতে শুরু করল এবং বর্তমান যুগে জাতিগত একাত্মবোধ অর্থনৈতিক কারণে আরো প্রবল হয়ে উঠল। কৃষিনির্ভর সমাজে সম্পদ পরিবার বা গোষ্ঠির মধ্যে সীমাবদ্ধ। শিল্প ও বাণিজ্যের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তির অর্থনৈতিক সম্বন্ধ সমস্ত দেশে ব্যাপ্ত হয়ে পড়ে, কালক্রমে বাণিজ্য ও শিল্প বিশ্বজনীন হয়ে দাঁড়ায়। অন্য দেশের মতন ভারতবর্ষেও শিল্পায়নের ফলে ব্যক্তি-কেন্দ্রিক জীবন অনিবার্যভাবে সমাজকেন্দ্রিক জীবনে পরিণত হচ্ছে। অসাধারণ ধীশক্তির অধিকারী হয়েও রাজাগোপালাচারী তাঁর দলের নীতি নির্ধারণের সময় শিল্পায়নের অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ এই পরিবর্তনের মর্ম সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি।

শিল্পায়নের ফলে সমাজমানসে যে পরিবর্তনের সূচনা, তা ভারতবর্ষে সীমাবদ্ধ নয়। ব্রিটেনের মতন রাজনীতিতে অভিজ্ঞ দেশেও তাই রক্ষণশীল দলকে কর্মসূচী ও নীতির পরিবর্তন করতে হয়েছে। বর্তমান ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একজন সদস্যের সঙ্গে আলোচনায় তিনি স্বীকার করেন যে ১৯৫০ সালে চার্চিল যে রক্ষণশীল মন্ত্রিসভা গঠন করেন, ১৯২৯ সালের র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ডের শ্রমিক মন্ত্রিসভার তুলনায় সে মন্ত্রীসভা অনেক বেশী প্রগতিশীল। গত পঞ্চাশ বৎসরে পৃথিবীর সর্বত্র এবং বিশেষ করে ভারতবর্ষে যে সব পরিবর্তন ঘটেছে, সে সম্বন্ধে স্বতন্ত্র দল সম্পূর্ণ উদাসীন। ভারতীয় শিল্পায়নের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে একদিকে গ্রাম থেকে সহরের দিকে জনসাধারণের আকর্ষণ বেড়েছে, অন্যদিকে যারা পূর্বে নিজের ব্যবসায়ে বা কৃষিকার্যে নিয়োজিত ছিল, তারা মাহিনার বিনিময়ে নানা ধরনের চাকুরি গ্রহণে তৎপর হয়েছে। এই পরিবর্তনের ফলে জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়,

এবং স্বাদেশিকতার শক্তি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শাসন বর্জন করে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হবার পরে আধুনিক যুগের শক্তিগুলি আরো প্রবল হয়ে উঠল। শিল্প ও বাণিজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ক্রমাগত অনুপ্রবেশ ও সর্বোপরি রাষ্ট্র কর্তৃক নব নব কার্যভারের দায়িত্ব গ্রহণের ফলে ব্যক্তিগত মূল্যায়ন অপেক্ষা জাতীয় মূল্যায়নের মনোবৃত্তি প্রবল হয়ে উঠল, নতুন শ্রেণীর আবির্ভাবের সম্ভাবনা দেখা দিল। অতীতে যারা সর্বপ্রকার সুবিধা ভোগ করেছে, রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে তাদের অধিকার সংকুচিত হওয়ায় তারা স্বভাবতই প্রতিবাদ জানাল। মূলত এই প্রতিবাদ থেকেই স্বতন্ত্র দলের সৃষ্টি। এই সমস্ত পরিবর্তন তাদের কাছে অপ্রিয় হলেও দেশের বিরাট জনসাধারণ তাকে সাদরে বরণ করেছে। ব্যবসায়ে শিল্প উদ্যোগে অথবা কৃষির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে কায়েমী স্বার্থের হয়তো ক্ষতি হয়েছে, কিন্তু সর্বসাধারণের কোনই ক্ষতি হয় নি। কৃষক ও শ্রমিক সম্প্রদায়ের এমন কোন বিত্ত বা অধিকার ছিল না যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপে তারা আপত্তি করবে, বরং সহজাত অনুভূতির দ্বারা তারা উপলব্ধি করেছে যে রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত জাতীয় প্রচেষ্টা ভিন্ন তাদের জীবনের বর্তমান নিম্নমান উন্নত করা অসম্ভব।

স্বাধীন ভারতবর্ষের নাগরিকদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্যবস্ত্র আবাস পথঘাট ও শিক্ষা স্বাস্থ্যের আজো অভাব। তাই স্বাধীনতা লাভের পরে সেই ব্যবস্থা করাই ভারত-বাসীর প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার করে ব্যক্তির স্বেচ্ছাপ্রণোদিত স্বার্থত্যাগের ভিত্তিতে আমরা যদি সেই বিপুল পরিবর্তন আনতে চাই তবে অদূর ভবিষ্যতে সফল হওয়ার বিশেষ আশা নেই। বিশেষত গ্রামীণ অঞ্চলে পরিবর্তন আনতে চাইলে রাষ্ট্রকে উদ্যোগী হতে হবে। তাই আজ পূর্বের রাষ্ট্রনিরপেক্ষ (laissez faire) অর্থনৈতিক জীবনযাত্রা চলবে না, রাষ্ট্রের নেতৃত্বে পরিকল্পনা অনুযায়ী জাতীয় জীবনকে নতুন করে সংগঠন করতে হবে। একথাও মানতে হবে যে গ্রামীণ অঞ্চলগুলিতে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে পরিবর্তন আনবার তীব্র ইচ্ছা জনসাধারণের মধ্যে আজ প্রকাশ পেয়েছে। পরিবার বা গোষ্ঠির কল্যাণের জন্য ব্যক্তিস্বার্থের বিসর্জন ভারতবর্ষের ইতিহাসে বারবার দেখা গিয়েছে, বর্তমানে সে প্রেরণা আরো ব্যাপক হয়ে সামগ্রিক সমাজের কল্যাণে ব্যক্তিস্বার্থ বিসর্জনের বৃহত্তর প্রস্তুতির পথ প্রশস্ত করেছে। ব্যক্তিগত স্বার্থের উপর প্রধান গুরুত্ব আরোপ করে স্বতন্ত্র দল ভারতীয় চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্যের প্রতি জোর দিয়েছে, আজ আংশিকভাবে ভারত-বাসীর মনোভাব পরিবর্তনের ফলে এবং আংশিকভাবে শুধু ভারতে নয় পৃথিবীময় পরিস্থিতির পরিবর্তনে সে বৈশিষ্ট্য দিন দিন দুর্বল হয়ে আসছে।

স্বতন্ত্র দলের নেতা ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ যে সকলেই বয়সে প্রবীণ তা বোধ হয় আকস্মিক নয়। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সমালোচনায় বলা হয় যে প্রধানত বয়োপ্রবীণদের নেতৃত্বেই এই সংগঠন পরিচালিত। কংগ্রেসের ন্যায় পুরাতন সুপ্রতিষ্ঠিত দলের পক্ষে এটা খানিকটা স্বাভাবিক, কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি কংগ্রেসের প্রগতির পথে তা অন্তরায় হয়, তবে স্বতন্ত্র দলের ন্যায় এক নূতন দলের পক্ষে প্রবীণ নেতৃত্বের বোঝা আরো দুর্বিসহ হয়ে উঠবে! নেতৃবৃন্দের বয়স ছাড়াও মৌলিক আদর্শে দুর্বলতার ফলে স্বতন্ত্র দল ভবিষ্যৎ-মুখী নয়, অতীতের দিকেই তার দৃষ্টি, তাই তাকে অতীত যুগের দল বললে অন্যায় হবে না। তাছাড়া আদর্শের সুস্পষ্ট সংজ্ঞার অভাব এই দলটিকে আরো দুর্বল করেছে। রাজা-গোপালাচারীর হয়ত সুস্পষ্ট সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গী আছে, কিন্তু দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের

দৃষ্টিভঙ্গী বিশ্লেষণে দেখা যায় যে তাঁদের মধ্যে অনেকেরই দৃষ্টি অতীত মুখী, প্রগতির বদলে তাঁরা পশ্চাৎগামী দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। রাজাজীর সহকর্মীদের অধিকাংশেরই কোন নির্দিষ্ট সামাজিক দর্শন নেই এবং প্রায় সকলেই তাঁর বুদ্ধিদীপ্তির সুস্পষ্টতা থেকে বঞ্চিত। তাঁদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার পটভূমিকা এত বিভিন্ন যে স্বতন্ত্র দলের সমালোচক ন্যায্যভাবেই বলতে পারেন যে দলটির কোন দার্শনিক সংহতি নেই, ফলে দলটি এতই স্বতন্ত্র যে জাতির সমস্যা সমাধানে প্রতিটি সদস্যের চিন্তাধারা ও কার্যক্রম স্বতন্ত্র। কংগ্রেসের সমালোচনায় রাজাগোপালাচারী প্রায়ই বলেন যে কংগ্রেসের সুবিন্যস্ত রাজনৈতিক আদর্শ নেই, কেবলমাত্র জওহরলাল নেহরুর প্রতি আনুগত্যের ফলেই কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে ঐক্য রয়েছে। তাঁর এই সমালোচনা সম্পূর্ণ ন্যায্য নয় কিন্তু এই সমালোচনার উত্তরে বলা চলে যে স্বতন্ত্র দলের সদস্যদের ঐক্যের একমাত্র ভিত্তি রাজাগোপালাচারীর ব্যক্তিত্ব।

আদর্শগত দুর্বলতা ও সাংগঠনিক অসংগতির ফলে স্বতন্ত্র দল এমনিতেই দুর্বল। ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে স্বতন্ত্র দলের বিলম্বিত আবির্ভাব দলের পক্ষে আরো অসুবিধার সৃষ্টি করেছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে অন্যান্য সকল দলের পরে এসেছে বলে এই দলকে অন্যান্য সকল দলের বিরুদ্ধে নিজ দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যদি তরুণ নেতৃবৃন্দ সুস্পষ্ট রাজনৈতিক দৃষ্টি এবং ইতিবাচক মূল্যায়ণের ভিত্তিতে সুসংবদ্ধ কার্যসূচী নির্ধারিত করে রঙ্গমঞ্চে নামতেন তবে বিলম্বিত আবির্ভাব সত্ত্বেও দলের সাফল্যের আশা ছিল। তা হয়নি তাই স্বতন্ত্র দলের জয়ের সম্ভাবনা এমনিতেই কম। কংগ্রেসের পরিবর্তনশীলতার ফলে স্বতন্ত্র দলের ভবিষ্যৎ আরো বেশী সমস্যাময় হয়ে উঠেছে।

৪

এ পর্যন্ত যে সমস্ত দলগুলির আলোচনা করেছি, তারা সবাই ভারতীয় ইতিহাস ও কৃষ্টিকে অংশত স্বীকার করেছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ যে ভারতীয় ঐতিহ্যের বৈচিত্র্য ও বহুমুখীনতাকে তারা উপযুক্ত মর্যাদা দেয়নি, অংশকে সমগ্র বলে ভুল করেছে। কিন্তু এ সমস্ত দলগুলিকে যদি একত্রিত করা সম্ভব হতো, তবে তাদের সমষ্টির মধ্যে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর জটিলতা ও বহুমুখীতার কিছুটা আভাস পাওয়া যেতো। অংশ কোন ক্ষেত্রেই সম্পূর্ণের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে না, তাই এই দলগুলিও কংগ্রেসের আদর্শ ও তার দূরদর্শী নীতির বিরুদ্ধে স্থায়ীভাবে টিকতে পারে না। এবার যে দলের আলোচনা করব তার ইতিহাস ও প্রকৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তরুণ সমাজের হৃদয় ও মন জয় করার জন্য বিশেষভাবে উদ্‌যোগী কম্যুনিস্ট দলের বিষয় প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে ভারতবর্ষের ইতিহাসে বা ঐতিহ্যে তার ভিত্তি নেই। তার জন্ম বাইরের প্রভাবের ফলে, তার বিকাশও প্রতিপদে বিদেশ নির্ভর। ভারতীয় কম্যুনিস্টরা যদি অস্তিত্ব এবং সম্প্রসারণের জন্য বাইরের দিকে না তাকিয়ে ভারতবর্ষের সমাজ ও অর্থনীতিক ভিত্তিতে দল সংগঠনের চেষ্টা করতো, তবে কম্যুনিস্ট দল কংগ্রেসের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ভাবনার বিষয় হয়ে উঠত। কম্যুনিস্টরা দাবী করে যে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বিশ্বদৃষ্টি বা জীবনদর্শন গঠনে তারা প্রয়াসী। আধুনিক যুগ একান্তভাবে বিজ্ঞানের যুগ। বিজ্ঞানসম্মত বলে যা পরিচিত, তাই সাধারণভাবে সকল লোককে, বিশেষ

করে যুব সমাজকে আকৃষ্ট করে। কম্যুনিস্ট দল তাই নিজেকে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রী দল বলে পরিচয় দিয়ে সকলের কাছে স্বীকৃতি পাওয়ার চেষ্টা করে।

দাবী করলেই যে তা মানতে হবে তার অবশ্য কোন যৌক্তিকতা নেই। রাজসিংহাসন দাবী অনেকেই করে, তারা সকলে রাজপুত্র বা রাজা নয়। কাজেই কম্যুনিজম যেভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর দাবী করে, তা সত্য কিনা তার বিচার করে দেখতে হবে। বিজ্ঞানের দুইটি মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল : (১) বাস্তব ঘটনার উপর নির্ভরশীলতা, (২) বাস্তবের ব্যাখ্যার জন্য রচিত সূত্রের প্রতি বিশ্লেষণাত্মক ও পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী। বিজ্ঞানের ইতিহাসে আমরা দেখি যে অভিজ্ঞতা যত বাড়ে, মানুষ নতুন নতুন ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের সূত্রগুলি বদলিয়ে ব্যাপকতর রূপ ধারণ করে। বিজ্ঞানে তাই গোঁড়ামী বা অনমনীয় মনোভাবের স্থান নেই। কোন সূত্রকেই বিজ্ঞান ধ্রুবসত্য বলে মানে না। বাস্তবের প্রতিটি ঘটনা ও বিষয়কে স্বীকার করে প্রচলিত মতবাদকে তাই বারবার নতুন পরীক্ষা ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচারের সম্মুখীন হতে হয়। এই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে যদি কম্যুনিজমের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিচারধারার তুলনা করা যায়, তবে একথা মানতেই হবে যে কম্যুনিজম আর যাই হোক না কেন বৈজ্ঞানিক নয়। কম্যুনিস্টদের মতে মার্ক্সবাদ অপরিবর্তনীয়, এবং সমস্ত অভিজ্ঞতাকেই কম্যুনিজমের ধাঁচে ফেলা চলে। এ ধরনের গোঁড়ামী ও অন্ধবিশ্বাস বিজ্ঞান বিরোধী। কম্যুনিজম বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী, এ দাবী তাই একেবারে ভিত্তিহীন।

কম্যুনিস্টরা যদি মার্ক্সের প্রতিটি কথাকে বেদবাক্য বলে মানত, তবে বহুদিন পূর্বেই কম্যুনিজমের বিলুপ্তি ঘটত। মুখে যাই বলুক, কার্যত কম্যুনিস্টরা তা করেনি। এবং করেনি বলেই আজো কম্যুনিজম পৃথিবীতে শক্তিশালী। কম্যুনিজমের যাঁরা নেতা, তাঁরা প্রত্যেকেই মার্ক্সের শিক্ষাকে বহুক্ষেত্রে লঙ্ঘন করেছেন। মার্ক্স বলেছিলেন যে শিল্পে উন্নত দেশে শ্রমিক আন্দোলনের মাধ্যমে কম্যুনিস্ট বিপ্লব সাধিত হবে। কার্যত দেখা গেল যে শিল্প উদ্যোগে অপেক্ষাকৃত অনগ্রসর রুশ দেশে যুদ্ধক্লান্ত সৈনিক ও করজর্জর চাষীর সহযোগেই সোভিয়েট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল। মার্ক্সের মৌলিক অনেক নীতির সংশোধন করেই লেনিন বিপ্লবের সার্থক উদ্যোক্তা রূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। কৃষিজীবীদের মার্ক্স প্রতিক্রিয়াশীল ও বিপ্লববিরোধী শক্তিরূপে নিন্দা করেছিলেন, সেই কৃষিজীবীদের নিকটও লেনিন আবেদন জানিয়েছিলেন। কম্যুনিস্টরা লেনিনকে মার্ক্সের বিশ্বস্ত শিষ্য বলে পরিচয় দেয়, কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতির বিচারে লেনিন বহু মার্ক্সীয় নীতি বর্জন বা সংশোধন করেছিলেন। তিনি যেভাবে দলকে প্রাধান্য দিয়েছেন, গোপন সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমকে স্বীকার করেছেন, তাতে কেউ কেউ তাঁকে মার্ক্সবাদী না বলে ব্লাঙ্কির শিষ্য মনে করেন। বর্তমানে কম্যুনিস্টরা তাদের রাজনৈতিক দর্শনকে মার্ক্স-লেনিনবাদ বলে। এই নামকরণ থেকেই প্রমাণ হয় যে লেনিন মার্ক্সের মতবাদে পরিবর্তন এনেছিলেন, তা নইলে মার্ক্সবাদের সঙ্গে লেনিনের নাম সংযোগের কোন অর্থ হয় না। পরে স্টালিন আরো পরিবর্তন আনেন বলে মতবাদের নাম হয় মার্ক্স-লেনিন-স্টালিনবাদ। স্টালিনের মৃত্যু ও নেতৃত্বচ্যুতির পরে আবার পরিবর্তন আসে এবং মতবাদ থেকে স্টালিনের নাম বাদ পড়ে যায়। স্টালিনের নামের যোগ ও বিয়োগ—দুই-ই প্রমাণ করে যে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি কখনোই অন্ধভাবে মার্ক্সের মত অনুসরণ করেনি।

পৃথিবীতে সোভিয়েট ইউনিয়নের কম্যুনিস্ট দল সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও সার্থক

কম্যুনিস্ট দল হিসাবে যে প্রমাণিত হয়েছে, তার প্রধান কারণ মতবাদে পরিবর্তন ও সংশোধন আনতে তারা দ্বিধা করেনি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা শক্তিমান ও সুসংগঠিত কম্যুনিস্ট দল ছিল জার্মানিতে। তারা কালপ্রবাহের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারেনি, মার্ক্সবাদের প্রতিটি ছত্র ও শব্দের প্রতি সুদৃঢ় আনুগত্য দেখিয়েছে। ফলে কালক্রমে সে শক্তিশালী দল ভেঙে পড়ল। স্টালিনকে অনেকে সঙ্কীর্ণ এবং গোঁড়া মনে করেন, কিন্তু তিনিও সোভিয়েট ইউনিয়নের স্বার্থ সাধনের জন্য মার্ক্সবাদের সংশোধন ও নিজের কর্মপন্থায় পরিবর্তন আনতে ইতস্ততঃ করেন নি। লেনিন অপেক্ষা তিনি আরও বেশী জাতীয়তাবাদী ছিলেন, তাই তাঁর আমলে সোভিয়েট রাজনীতি মার্ক্স-লেনিন-স্টালিনবাদ রূপে পরিচিত ছিল। বর্তমানে যে সোভিয়েট রাজনৈতিক দর্শন থেকে স্টালিনবাদ কথাটি বাদ দেওয়া হয়েছে, তাতে বোধ হয় এই ইঙ্গিতই মেলে যে স্টালিনের আমলের তীব্র জাতীয়তাবাদের বদলে আবার লেনিনের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গী সোভিয়েট রাষ্ট্রে বেশী শক্তিশালী হয়ে উঠেছে।

বিভিন্ন দেশের ও জাতির কম্যুনিস্ট দল অবশ্য তত্ত্বের দিক থেকে সবাই মার্ক্সবাদী বলে দাবী করে, কিন্তু তারা প্রত্যেকেই কার্যক্ষেত্রে মার্ক্সবাদ সংশোধনের ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছে। এ ধরনের পরিবর্তনশীলতা না থাকলে চীনের কম্যুনিস্ট দল কোন দিনই ক্ষমতা অর্জন করতে পারত না। বস্তুতপক্ষে গোঁড়া মার্ক্সপন্থীরা প্রথম প্রথম মাও-সে-তুংকে সাম্যবাদী বলে মানতেই চায়নি, বলেছেন যে মাও-সে-তুং শ্রমিক সংগঠনের চেয়ে কৃষক সমাজের উপর বেশী নির্ভর করেন বলে তিনি প্রতিক্রিয়াশীল। যেদিন শহরে শ্রমিক সংগঠনের বদলে গ্রাম অঞ্চলে কৃষকদের সংগঠনে তিনি মন দিলেন, তখনই চীন কম্যুনিস্ট পার্টির ভবিষ্যৎ সাফল্যের ভিত্তি স্থাপিত হল। মাও-সে-তুংয়ের এ 'অনাচার' বিজ্ঞানসম্মত মার্ক্সবাদীর মধ্যে অনেকেরই পছন্দ হয়নি। স্টালিন স্বয়ং তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনা করেন এবং প্রায় দুই দশক ধরে মাও-সে-তুংকে ক্ষমা করেননি।

যুগোশ্লাভিয়াতে মার্শাল টিটো এবং পোলাণ্ডে গোমুলকা আজ দেশের অবিসম্বাদী নেতা। তাঁরাও দেশকালের প্রয়োজন অনুসারে মার্ক্সবাদের সংশোধন করেছেন, নতুন নীতি ও কর্মসূচীর সৃষ্টি করেছেন। আরও সাম্প্রতিক কালে ক্রুশ্চফ আধুনিক পৃথিবীর নতুন প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প ও কৃষিজনিত সমস্যার ব্যাপারে এক পরীক্ষামূলক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছেন। কৃষকদের পণ্য বিক্রয়ে যে স্বাধীনতা তিনি দিয়েছেন, ভোগ্যদ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর যে গুরুত্ব আরোপ করেছেন, বহু স্টালিনপন্থীর তা পছন্দ হয়নি। কিন্তু স্টালিনপন্থীরা যাই বলুক, ক্রুশ্চফের বিজ্ঞজনোচিত দেশহিতকারী কার্যকলাপে সোভিয়েট রাষ্ট্রে জনসাধারণের সুখস্বাচ্ছন্দ্য সন্তোষ বেড়েছে, সর্বস্তরের নরনারীর সৃজনমূলক শক্তি বৃদ্ধি হয়ে ব্যক্তির বৃহত্তর বিকাশের পথ প্রশস্ত হয়েছে। কেন্দ্রীভূত একধারায় প্রবাহিত রাষ্ট্রের জীবনধারাকে বিভিন্ন কৃষিজ ও শিল্পজ কেন্দ্রের সমবায়ে গঠিত যুক্তরাষ্ট্রে রূপান্তরিত করেছেন বলে ক্রুশ্চফ ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। ইতিহাসের এটা অমোঘ বিদ্রূপ যে, যে মাও-সে-তুংয়ের উদ্যোগে প্রায় ৩৫ বৎসর পূর্বে কম্যুনিস্ট নীতি ও কার্যের ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল, আজ সেই মাও-সে-তুংই মার্ক্সীয় গোঁড়ামীর এক অন্ধ অনুরাগী। অপর দিকে যে ক্রুশ্চফ প্রথম জীবনে স্টালিনের গোঁড়া অনুগামীরূপে রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন, আজ তিনিই কম্যুনিস্ট রাজনৈতিক চিন্তার ক্ষেত্রে নতুন ও সৃষ্টিধর্মী শক্তি প্রকাশের সর্বাপেক্ষা প্রধান উদ্যোক্তা।

সোভিয়েট রুশ, চীন, যুগোশ্লাভিয়া বা পোলাণ্ডের ন্যায় স্বাধীন ও মৌলিক কম্যুনিস্ট দলগুলি মার্ক্সবাদের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেও নীতি ও কর্মসূচীতে বহু বিপ্লবকারী পরিবর্তন এনেছে। বস্তুতপক্ষে তত্ত্ব ও বাস্তবের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে বলেই এ সব কম্যুনিস্ট দল বারবার কর্মপন্থার পরিবর্তন করতে বাধ্য হয়েছে। কম্যুনিস্টরা যতদিন রাজশক্তি দখল করেনি, মানুষের চিন্তাজগতে আসন প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করেছে, ততদিন কম্যুনিস্ট নেতাদের বাক্য ও রচনায় স্বাধীনতার পরিচয় মেলে। ট্রট্স্কি ও লেনিনের নেতৃত্বে সোভিয়েট রাষ্ট্র স্থাপনার থেকেই কম্যুনিস্ট চিন্তাধারায় বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বদলে হয় একপক্ষে অন্ধ গোঁড়ামী, নয় অন্যপক্ষে বিচ্ছিন্ন ঘটনার অসমাপ্ত ও অসংলগ্ন গোঁজামিলের চেষ্টা বারবার দেখা দিয়েছে।

একথা নিঃসন্দেহ যে গত চল্লিশ বৎসরে বিজ্ঞান শিল্প উদ্যোগে ও শিক্ষার ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্র অসামান্য কৃতিত্ব দেখিয়েছে, কিন্তু মূলতঃ তা রুশ জাতির নরনারীর সাহস, শ্রমশীলতা এবং আনুগত্যের জন্যই সম্ভব হয়েছে। আমেরিকা, জার্মানী ও জাপানের সঙ্গে সোভিয়েট রাষ্ট্রের তুলনা করলে এই কথাই প্রমাণ হয় যে রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক কাঠামোর উপর আমরা যত জোরই দিই না কেন, জাতির ভবিষ্যত প্রধানত জাতির চরিত্রের উপরই নির্ভর করে। যেখানে কম্যুনিস্ট দল স্বাধীন, সেখানে জাতির স্বার্থরক্ষার জন্য তারা মার্ক্সবাদের পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করে বাস্তবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজ নিজ কর্ম-পন্থা নির্ধারণে সক্ষম হয়েছে।

ভারতবর্ষের কম্যুনিস্ট পার্টি গোড়া থেকেই পরমুখাপেক্ষী। এককালে ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির ইঙ্গিতে চলত, বর্তমানে বহুক্ষেত্রে চীন কম্যুনিস্ট পার্টির কথার পুনরাবৃত্তি করে। চীন ভারতবর্ষকে আক্রমণ করার পরে অবশ্য প্রকাশ্যভাবে চীনাপন্থী কম্যুনিস্ট বেশী মিলবে না, কিন্তু তাদের কথায়, চিন্তায় এবং কাজে এখনো মাও-সে-তুংয়ের মতবাদের আভাস স্পষ্ট। দেশের সঙ্গে তাদের যোগ নেই মতের স্বাধীনতাও নেই, ফলে যেভাবে তাদের নীতি ও কর্মপন্থা বদলায়, মার্ক্সবাদের বাঁধা বুলির যেভাবে তারা পুনরাবৃত্তি করে, তাতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে মার্ক্সবাদ আর যাই হোক, বৈজ্ঞানিক মতবাদ নয়, অভ্রান্ত তো নয়ই। গত ত্রিশ বৎসর ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির কার্যক্রমে বারবার স্ববিরোধী অস্থির মনোভাবের যে পরিচয় মেলে, মার্ক্সীয় চিন্তাধারার মৌলিক দুর্বলতা প্রমাণে তার চেয়ে আর কোন চরম সাক্ষ্য হতে পারে না।

বুর্জোয়া সংগঠনরূপে কংগ্রেসকে তীব্রভাবে নিন্দা করে ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু যখন তারা দেখল যে সকল বিরোধিতা সত্ত্বেও জনগণের মধ্যে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা ধীরে ধীরে বেড়েই চলেছে তখন কম্যুনিস্ট দল কংগ্রেসের কর্মসূচী আন্তরিক-ভাবে গ্রহণ না করেও তার মৌখিক অনুমোদন জানাল। ১৯৩০-৩১ সালে কংগ্রেসের চেয়েও অধিক জাতীয়তাবাদী হিসাবে কম্যুনিস্ট দল নিজেকে প্রতিপন্ন করতে চেষ্টা করে-ছিল, ঘোষণা করেছিল যে ভারতীয় জনগণের জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার পূর্ণরূপদানের পথে কংগ্রেসের বুর্জোয়া স্বার্থ প্রতিবন্ধক। কৃষক, শ্রমিক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা নষ্ট করাই ছিল কম্যুনিস্ট দলের লক্ষ্য কিন্তু তবু মুখে তারা সব সময় যুক্ত ফ্রন্টের কথা বলত, ভাবত যে জাতীয় সংহতির নামে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তার সুযোগ নিয়ে শহরে ও গ্রামাঞ্চলে কম্যুনিস্ট দল নিজেদের স্বতন্ত্র ভিত্তি স্থাপন করবে।

১৯২৩ সালে ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়, কিন্তু প্রায় দশ বৎসরের

চেষ্টার পরেও তারা বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। দেশের জাগ্রত জনমত তখন স্বাধীনতা লাভের জন্য উদগ্রীব। সাধারণ বুদ্ধির লোকেও সেদিন বুঝেছিল যে জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে সকল শ্রেণীর ভারতবাসীর সম্মিলিত চেষ্টা ভিন্ন স্বাধীনতা লাভ অসম্ভব। এ রকম পরিস্থিতিতে শ্রেণী সংঘর্ষের উপর জোর দিলে জাতীয় সংহতি নষ্ট হবে, তাতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদেরই লাভ, তাই কম্যুনিস্ট দলের শ্রেণী সংগ্রামের বুলি ভারতীয় মনকে স্পর্শ করেনি। ভারতীয় কম্যুনিষ্ট দল বিলিতী কম্যুনিস্টদের আদেশ অনুসারে চলত বলে ভারতীয় ঘটনা সমাবেশের চেয়ে ইয়োরোপীয় পরিস্থিতির দিকেই বেশী তাকিয়ে থাকত। ইয়োরোপে যখন নূতন সমস্যা দেখা দিল, হিটলারের শক্তি দ্রুতগতিতে বাড়তে লাগল, তখন ইয়োরোপে হিটলারের প্রভাব কমাবার উদ্দেশ্যে যুক্ত ফ্রন্টের জন্য কম্যুনিস্টদের উৎসাহও বাড়তে লাগল। ফলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের প্রতিও তাদের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটল। তারা ব্রিটিশ ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক উপাদানগুলির উপর জোর দিয়ে বলতে শুরু করল যে পৃথিবীর সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকে একজোট হয়ে ফ্যাসিস্ট এবং নাৎসী শক্তির প্রতিরোধ করতে হবে।

ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মুখে অবশ্য তখন যুক্ত ফ্রন্টের বুলি, কিন্তু তাদের কথা ও আচরণের অসংগতির প্রমাণ এ যুগেও পদে পদে মেলে। গণতান্ত্রিক দেশগুলির শিল্প বাণিজ্যের ক্ষতি এবং তাদের অর্থনৈতিক শক্তি হ্রাসের জন্য কম্যুনিস্ট দল চেষ্টার ত্রুটি করেনি। প্রায় ছয় বৎসর এ লীলা চলল। প্রকাশ্যে পাশ্চাত্ত্য গণতন্ত্রের নিন্দাবাদ খানিকটা কমে এল, কিন্তু গোপনে গণতন্ত্র ধ্বংস করে কম্যুনিস্ট একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার চেষ্টা সমানভাবে চলল। কম্যুনিস্টদের এ চালবাজীও কিন্তু বেশীদিন টিকল না। গণতন্ত্রের নিম-তারিফ এবং নাৎসিবাদ ফ্যাসিজমের অবিরাম নিন্দার ফলে কম্যুনিস্ট দলের সাধারণ কর্মীদের মধ্যে যে মনোভাব গড়ে উঠেছিল, ১৯৩৯ সালের আগস্ট মাসে তা এক প্রচন্ড ধাক্কা খেল। হঠাৎ একদিন পৃথিবীর বিভিন্ন কম্যুনিস্ট দল দেখল যে, নাৎসীবাদকে তারা এতদিন মানুষের চরম অপমান বলে ধিক্কার দিয়েছে, হিটলার-স্টালিন চুক্তির ফলে হঠাৎ সেই নাৎসীবাদই গণতন্ত্রের তুলনায় কম্যুনিস্টদের কাছে বেশী আদরণীয় বলে প্রতিভাত হল। স্টালিন অবশ্য সোভিয়েট রাষ্ট্রের স্বার্থেই জার্মানীর সঙ্গে চুক্তি করেছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর অন্যান্য দেশের কম্যুনিস্ট দলের মনে তার ফলে এক বিশ্বাসের সংকট দেখা দিল। কম্যুনিস্টদের কণ্ঠ আবার গণতন্ত্রের নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে নাৎসীবাদের মধ্যে নূতন গুণ ও উৎকর্ষ খোঁজার সাধনা শুরু হ'ল। ভারতীয় কম্যুনিস্টরাও বলতে শুরু করল যে হিটলারের জার্মানীর যত দোষই থাক না কেন, তার মধ্যে জাতীয় সমাজতন্ত্রের ইসারা মেলে, কাজেই কম্যুনিস্ট দৃষ্টিভঙ্গীতে পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক ব্রিটেনের তুলনায় নাৎসী জার্মানী শ্রেষ্ঠ।

হিটলার-স্টালিন চুক্তি প্রায় দুই বছর কার্যকরী ছিল। সে সময় রুশ-জার্মান সম্বন্ধকে মৈত্রী বললে হয়তো অত্যুক্তি হবে, কিন্তু তাদের মধ্যে যে সমঝোতা হয়েছিল সে কথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। এই দুই বছর ভারতীয় কম্যুনিস্ট দল পাশ্চাত্ত্য গণ-তান্ত্রিক রাষ্ট্র ও ফ্যাসিস্ট শক্তিবর্গের মধ্যে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের চেষ্টা করে। বিশ্বযুদ্ধ শুরু হবার সঙ্গেই কংগ্রেস ঘোষণা করে যে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির জন্যই ভারতবর্ষের সহানুভূতি, কিন্তু ভারতের এবং অপরাপর পরাধীন রাষ্ট্রের স্বাধীনতা স্বীকার করে তাদের প্রমাণ করতে হবে যে তারা সত্য সত্যই গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। যুদ্ধের প্রথম অবস্থায় ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলও কংগ্রেসের এ সিদ্ধান্তের সমর্থন করেছিল।

ভারতীয় কম্যুনিস্টদের আরও কঠিন পরীক্ষা তখনও বাকী ছিল। হিটলার রুশদেশকে আক্রমণ করার পরে ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের বুদ্ধিগত বিভ্রান্তি এবং বিদেশী উপদেশের উপর নির্ভরশীলতা আরো নির্মমভাবে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ল। প্রায় ছয় মাস কাল কম্যুনিস্টরা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে নিষ্ক্রিয় থাকে। সোভিয়েট রুশের সঙ্গে সহানুভূতি থাকা সত্ত্বেও তারা যতদিন বিলিতী কম্যুনিস্ট দলের নির্দেশ পায়নি, ততদিন চুপ করেছিল। ১৯৪১-৪২ সালের শীতকালের একটি ঘটনায় ভারতীয় কম্যুনিস্টদের অবস্থা যে কি পরিমাণ হাস্যকর হয়ে উঠেছিল তার পরিচয় মেলে। পাটনায় তারা এক সর্বভারতীয় ছাত্র সম্মেলনের আয়োজন করে কিন্তু সভাপতি যখন পৌঁছলেন তখন তিনি ভাষণহারা। কারণ বলতে গিয়ে তিনি বললেন যে, তিনি তাঁর ভাষণ লিখেছিলেন লাহোরে, তখনো কম্যুনিস্ট দলের পুরোনো নিষ্ক্রিয় কর্মপন্থার কথাই তিনি জানতেন, কিন্তু তাঁর ট্রেন যখন এলাহাবাদ পৌঁছল, তখন জানতে পারলেন যে কম্যুনিস্ট কর্মপন্থার পরিবর্তন হয়েছে, এবার নাৎসীবাদ ও নাৎসী জার্মানীর বিরুদ্ধে বিরামহীন সংগ্রাম চালাতে হবে। এলাহাবাদ থেকে পাটনায় পৌঁছতে যে সময় লাগে, তার মধ্যে তিনি আর নূতন ভাষণ রচনা করতে পারেননি, কাজেই ভাষণ-হীন সভাপতি হিসাবেই তিনি সম্মেলনে উপস্থিত।

এ ধরনের ডিগবাজী থেকেই বোঝা যায় যে ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের নিজস্ব কোন নীতি ছিল না। বাইরে থেকে যে হুকুম আসত তাই তারা তামিল করত। নূতন হুকুম না আসা পর্যন্ত হয় পুরোনো মতের পুনরুক্তি, অথবা ন যযৌ ন তস্থৌ ভিন্ন তাদের গতি ছিল না। বিলিতী কম্যুনিস্ট দলের হুকুম যখন মিলল, পুঁজিবাদী গণতন্ত্র তখন আবার সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠল এবং নাৎসীবাদ হয়ে উঠল আধুনিক পৃথিবীর মূর্তিমান গ্লানি। এতদিন পর্যন্ত যা ছিল সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, তাই তখন হঠাৎ হয়ে উঠল জনযুদ্ধ।

মতের এ-ধরণ আকস্মিক পরিবর্তন কেবল বিস্ময়কর নয়, হাস্যকর। ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের যুদ্ধকালীন আচরণে তার হাস্যকরতা আরো নির্লজ্জ রূপ নিয়ে প্রকাশ পেল। রাতারাতি ভারতের কম্যুনিস্ট দল ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠল। ভারতের স্বাধীনতার স্বীকৃতির জন্য কম্যুনিস্টদের আস্ফালন বন্ধ হয়ে গেল, বরং স্বাধীনতার দাবীতে অটল থাকায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তারা এক অদ্ভুত অভিযোগ আনল। কম্যুনিস্টরা বলল যে, জার্মানী ও জাপানের জন্য প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি রয়েছে বলেই কংগ্রেস ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় যোগ দেয়নি। এমনকি কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবীকেও কম্যুনিস্টরা উপহাস করতে শুরু করল। কম্যুনিস্টদের চোখে দেশাত্মবোধ আবার বুর্জোয়া অপরাধ বলে পরিগণিত হল। তাদের কেউ কেউ প্রকাশ্যে এমন কথাও বলেছে যে, আন্তর্জাতিক কম্যুনিজমের স্বার্থে ভারতবর্ষকে বলি দিতেও তারা প্রস্তুত। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে, এই একই যুদ্ধ সোভিয়েট রাষ্ট্রে মহান দেশাত্মক সংগ্রামরূপে পরিগণিত হয়েছিল।

কম্যুনিস্টদের গণতন্ত্রের প্রতি অনুরাগ যুদ্ধকাল পর্যন্ত স্থায়ী ছিল। ভারতে ব্রিটিশ যুদ্ধ প্রচেষ্টায় তারা তখন সর্বতোভাবে সহায়তা করেছে। এমনকি ইংরেজের কর্মসূচীর ফলে যখন ১৯৪৩ সালে বাংলাদেশে মন্বন্তর দেখা দিল, তখনও কম্যুনিস্ট কার্যক্রমে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। যুদ্ধের অবসানে যখন আবার সোভিয়েট রাষ্ট্র এবং পশ্চিমী গণতন্ত্রের মধ্যে মনান্তর শুরু হল, তখন ভারতীয় কম্যুনিস্টদেরও সুর বদলাল। তারা আবার আবিষ্কার করল যে হিটলারের বিরুদ্ধে যুদ্ধের দিনে যাদের তারা গণতন্ত্র বলে অভিনন্দিত করেছিল, বাস্তবিকপক্ষে তারা ধনতান্ত্রিক সাম্রাজ্যবাদী। ভারতবর্ষে এবং অন্যত্র

তাদের প্রভাবের বিরুদ্ধে তখন আবার কম্যুনিস্ট পার্টির সংগ্রাম শুরু হল।

কেবল যুদ্ধের ব্যাপারে নয়, পাকিস্তান গঠনের ব্যাপারেও ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টি বারবার আদর্শহীন সুবিধাবাদ ও ভারতীয় স্বার্থবিরোধী কার্যক্রমের পরিচয় দেয়। অধিকাংশ ভারতবাসীর মতন কম্যুনিস্টরাও প্রথমে ভারত বিভাগের বিরুদ্ধে ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই কিন্তু তাদের মত বদলে গেল এবং কখনও প্রকাশ্যে কখনও গোপনে তারা জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণের অজুহাতে পাকিস্তানের সমর্থন শুরু করল। যুদ্ধের আমলে কম্যুনিস্টরা যে রকম নির্লজ্জভাবে মুসলিম লীগের সমর্থন করেছে, সে কালের যে কোন সংবাদপত্রের পাতা উল্টালেই তা দেখা যাবে। যুদ্ধ যখন শেষ হল, ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত নির্ণয় করবার সময় এল, তখন কম্যুনিস্টরা মুসলিম লীগ প্রার্থীর পক্ষে প্রকাশ্যভাবে প্রচারকার্য চালায়। কম্যুনিস্টরা চিরকাল ধর্মপ্রবণতার নিন্দা করেছে, মার্ক্সের মতে ধর্ম আফিমের মতন জনসাধারণকে অচেতন করে রাখে. কিন্তু তা সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে ভারত-বিভাগের যে দাবী মুসলিম লীগ তুলেছিল, তাকে সমর্থন করতে গিয়ে কম্যুনিস্টরা মুসলমান ভোটারদের ধর্মপ্রাণতার সুযোগ গ্রহণ করে তাদের বিভ্রান্ত করে। ধর্মে অবিশ্বাসী কম্যুনিস্টরা সেদিন যেভাবে কোরাণের নামে মুসলিম লীগের জন্য ভোট ভিক্ষা করেছে, তা একদিকে যেমন বেদনাদায়ক তেমনি অন্যদিকে হাস্যাস্পদ। ১৯৩৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সালের মধ্যে মুসলিম লীগের যে শক্তিবৃদ্ধি, এবং ১৯৪৬ সালে মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সংরক্ষিত আসনে মুসলিম লীগের যে জয়, কম্যুনিস্ট পার্টির 'বিরামহীন ও সংগ্রামশীল' সমর্থন না পেলে তা সম্ভব হত কিনা সে বিষয়ে গুরুতর সন্দেহের অবকাশ আছে।

ভারত বিভাগ এবং পাকিস্তান সৃষ্টির জন্য তাই মুসলিম লীগের যতখানি দায়িত্ব, কম্যুনিস্ট পার্টির দায়িত্বও ঠিক ততখানি। লীগ তবু পাকিস্তানে বিশ্বাস করত এবং ভ্রান্ত বিশ্বাসের ফলে সমগ্র ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের এবং বিশেষ করে বাংলাদেশের এবং ভারতীয় মুসলমানের ক্ষতি করেছে। কম্যুনিস্টদের অপরাধ আরো বেশী, কারণ তারা এ বিষয়ে জ্ঞানপাপী। ভারত বিভাগের জন্য যারা দায়ী, বাংলাদেশকে দ্বিখণ্ডিত ও দুর্বল করবার অপরাধে যারা অপরাধী, তারা যখন বেরুবাড়ীর বিভাগ নিয়ে ছদ্মকান্না শুরু করে, তখন স্বভাবতই মনে হয় যে রাজনৈতিক সুবিধাবাদ ছাড়াও তাদের অন্য কোন গূঢ় উদ্দেশ্য আছে।

জনযুদ্ধের নামে কম্যুনিস্ট দল যেভাবে ইংরেজ সরকারের প্রকাশ্য সমর্থন করেছিল, তাতে ভারতবর্ষের জনসাধারণ তাদের প্রতি কেবল বিমুখ নয় বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়ে। ফলে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে তারা প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ভারতবর্ষ যেদিন স্বাধীন হল, ব্রিটিশ রাজশক্তি এদেশ থেকে বিলুপ্ত হল, তখন কম্যুনিস্টদের দুর্দশা আরো বেড়ে গেল। জনগণের সমর্থন তারা আগেই হারিয়েছিল, এবার শাসকশক্তির পৃষ্ঠপোষকতাও রইল না। কম্যুনিস্টদের মধ্যে যারা অদূরদর্শী ও চরমপন্থী, তারা তখন ভাবল যে, হিংসাত্মক উপায়ে সমগ্র ভারতবর্ষে না হোক অন্তত কোন কোন অংশে হয়তো তারা ক্ষমতা লাভ করতে পারে। তাদের এ ষড়যন্ত্রমূলক সন্ত্রাসবাদী প্রচেষ্টার জন্য স্বভাবতই তারা হায়দ্রাবাদকে বেছে নিল। নিজামের আমল থেকেই সেখানে শাসক ও কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বার্থ সংঘাত বর্তমান ছিল। ১৯৪৭-৪৮ সালে কয়েকটি আধা-সামরিক বেসরকারী সংস্থার কার্যকলাপ ও বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের মধ্যে প্রচুর অস্ত্র সরবরাহের ফলে এ সংঘর্ষ বিশেষভাবে ইন্ধনলাভ করে।

বস্তুতপক্ষে ভারতীয় কেন্দ্রীয় সরকার হস্তক্ষেপ করবার আগে হায়দ্রাবাদে ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিয়েছিল। দাঙ্গাহাঙ্গামা খুনখারাপীর ফলে হায়দ্রাবাদের গ্রাম অঞ্চলে যে অশান্তি ও অনিশ্চয়তা, কম্যুনিস্টরা তার সুযোগ পুরোপুরি নেয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তক্ষেপের ফলে আইন ও শৃঙ্খলার অবশ্য উন্নতি হল, কিন্তু অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে যে বিপর্যয় এসেছিল, তা দূর করতে সময় লাগল। তারই সুযোগ নিয়ে কম্যুনিস্টরা তেলেঙ্গানায় নিজেদের শাসন স্থাপন করবার চেষ্টা করে। তাদের এ দুরভিসন্ধী সার্থক হয়নি, কিন্তু তাদের কার্যকলাপে কম্যুনিস্টদের সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রমের পরিচয় দেশের সামনে পরিষ্কার হয়ে উঠল। দেশবাসী এ কথাও জানল যে, প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক উপায়ে যদি ক্ষমতালাভের আশা না থাকে, তবে কম্যুনিস্টরা গুপ্ত এবং ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের দ্বারা বিভীষিকা ও অরাজকতা সৃষ্টি করতে ইতস্তত করবে না।

তেলেঙ্গনার অভিজ্ঞতায় কম্যুনিস্ট দলের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ও বাস্তববাদী. তারা বুঝল যে ষড়যন্ত্রমূলক সন্ত্রাসবাদী কার্যক্রম দিয়ে ভারতবর্ষে সাফল্যের কোন আশা নেই। তাদের মধ্যে যাদের খানিকটা দেশাত্মবোধ ছিল, দেশের স্বাধীনতার পরে তারা এ কথাও উপলব্ধি করতে শুরু করে যে, সব ব্যাপারে সকল সময়ে বিদেশী কম্যুনিস্ট দলের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকা আত্মসম্মানের বিরোধী। সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টি যেভাবে দেশের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বের ঘটনা বিচার ও নিজের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী স্থির করেছে, তা দেখেও ভারতীয় কম্যুনিস্টদের এক অংশ শিক্ষালাভ করে। তারা বোঝে যে দেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিবেচনা করে সংস্থাকে কার্যক্রম নির্ধারণ করতে হবে, বিদেশের অন্ধ অনুকরণ করতে গেলে ফল বহুক্ষেত্রে হাস্যাস্পদ হয়ে দাঁড়াবে। তাই ভারতীয় সংবিধানে জনসাধারণকে সার্বজনীন ভোট দেবার পরে কম্যুনিস্ট দলও শ্রেণীসংগ্রাম এবং বল প্রয়োগের নীতিকে একেবারে বিসর্জন না দিলেও অধিকাংশ সদস্যদের ইচ্ছা অনুসারে অন্তত সাময়িকভাবে গণতান্ত্রিক কার্যক্রম অবলম্বনের সিদ্ধান্ত করে।

মার্ক্সের মতবাদকে অন্ধভাবে গ্রহণ করবার ফলে কম্যুনিস্ট পার্টির অবশ্য কোন কোন বিষয়ে লাভও হয়েছে। অন্ধবিশ্বাসের ফলে একদর্শিতা আসে এ কথা সত্য কিন্তু তার ফলে বিশ্বাসের শক্তি ও তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে এ রকম অন্ধবিশ্বাস না থাকলে ১৯৪২ সালে ভারতীয় জনমানসের বিক্ষোভে এ দেশে কম্যুনিস্ট পার্টির অস্তিত্ব লুপ্ত হয়ে যেতো। মার্ক্স বলেছিলেন যে ইতিহাসের অগ্রগতিতে কম্যুনিজমের বিজয় অবশ্যম্ভাবী। মার্ক্সের কথায় অন্ধবিশ্বাসের ফলে সঙ্কট মুহূর্তেও কম্যুনিস্টরা ভবিষ্যত সম্বন্ধে আশা হারায়নি। তাই ভারতীয় অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তুলনায় কম্যুনিস্ট দল অনেক বেশী সংহত, দলের সদস্যদের নিয়মানুবর্তিতা অধিক স্পষ্ট। কম্যুনিস্টদের স্বকীয় আদর্শে নিষ্ঠা এবং সে বিষয়ে উৎসাহের ফলে ১৯৪২ সালের নির্বুদ্ধিতা এবং ১৯৪৮ সালে তেলেঙ্গনার বিপর্যয় সত্ত্বেও ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট দল ভারতীয় পার্লামেন্টে তৃতীয় দল হিসাবে স্বীকৃতি পেল। কম্যুনিস্টদের এ সাফল্য একদিকে যেমন তাদের কর্মকুশলতার প্রমাণ, অন্যদিকে তেমনি জনসাধারণ যে কত সহজে অতীত ঘটনা ভুলে যায় তারও প্রত্যক্ষ উদাহরণ।

স্বাধীনতা লাভের পর কিছুকালের মধ্যেই ভারত যে আন্তর্জাতিক সম্ভ্রম অর্জন করে, ভারতীয় জনগণের মনে তা এক নূতন গর্বের সঞ্চার করল। এই জাতীয় গৌরববোধ কম্যুনিস্ট দলকেও প্রভাবান্বিত করেছিল, এবং সাধারণ কম্যুনিস্ট কর্মীদের মনে গণতান্ত্রিক

পন্থায় সাফল্যের সম্ভাবনায় বিশ্বাস সঞ্চারিত করে। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কম্যুনিস্ট দলের কেরালায় গণতান্ত্রিক পথে ক্ষমতালাভে আশাবাদ ও বিশ্বাসের এই মনোভাব দৃঢ়তর হল। কম্যুনিজমের ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম দৃষ্টান্ত যে ষড়যন্ত্র ও বল-প্রয়োগের আশ্রয় না নিয়েও কম্যুনিস্ট দল সরকার গঠন করল। অল্পদিন পরেই অমৃতসরে তাদের যে সম্মেলন হয়, সেখানে বিকাশমান উদারনৈতিক মনোভাব প্রকাশ করে সুপরিচিত অমৃতসর ঘোষণা গৃহীত হল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আস্থার প্রকাশ্য ঘোষণা কম্যুনিস্ট পার্টির ইতিহাসে এই বোধ হয় প্রথম ঘটল। স্টালিনের মৃত্যুর পর সোভিয়েট ইউনিয়নে যে সব পরিবর্তন, তার প্রভাবেও ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মতবাদে এবং কর্মপন্থায় উদারতা ও আইনানুবর্তিতার সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। ভারতীয় কম্যুনিস্টরা যদি সে সময়ে মত ও পথের বিচার করে ভারতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মপন্থা নির্ধারণের চেষ্টা করত, তবে আজ সোভিয়েট রাষ্ট্রে যেভাবে ইতিহাসের এক নতুন অধ্যায় রচিত হচ্ছে, ভারতীয় কম্যুনিস্ট পার্টির বেলায়ও বোধ হয় তা সম্ভব হত।

ভারতীয় কম্যুনিস্ট নেতাদের মধ্যে কেউ কেউ মার্ক্সবাদে অন্ধবিশ্বাস বর্জন করলেও অধিকাংশ কম্যুনিস্ট পূর্বের মত তাকে সমালোচনাহীন ও নিষ্প্রশ্ন স্বীকৃতি দিয়ে চলল। দলের স্বার্থে জনসাধারণের উপর যে নৃশংস অত্যাচার, তার ফলে কেরালায় কম্যুনিস্ট শাসনের ইতিহাস দীর্ঘকাল ভারতবাসীর কাছে এক বিভীষিকা হয়ে থাকবে। কম্যুনিস্ট চীন যেদিন ভারতবর্ষ আক্রমণ করল, সেদিন আবার নতুন করে প্রমাণ হল যে কম্যুনিস্টরা বাস্তবের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অস্বীকার করে কেবলমাত্র স্লোগান আওড়ায়। অবাস্তবের পূজা ভিন্ন ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যায় ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মনোভাবের ব্যাখ্যা বাস্তবিকই অসম্ভব। কম্যুনিস্ট পণ্ডিতদের বিধানে মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী রাষ্ট্র কখনই আক্রমণাত্মক হতে পারে না। চীন মার্ক্সবাদে বিশ্বাসী, কাজেই ভারতীয় কম্যুনিস্টরা সিদ্ধান্ত করল যে ভারত সীমান্তে চীনের কার্যকলাপ নিশ্চয়ই শান্তিপূর্ণ। এ হেন শান্তিপূর্ণ কার্যকলাপের ফলে ভারতের উপর হামলা, ভারতীয়দের বন্দী করা, তাদের প্রাণনাশ এবং অবশেষে ১৯৬২ সালে ব্যাপকভাবে ভারত আক্রমণ—এ সমস্তই কম্যুনিস্টদের মতে মার্ক্সীয় মায়াবাদের প্রকাশ।

বিচারবুদ্ধি একেবারে বিসর্জন না দিলে কোন ব্যক্তিই এভাবে অন্ধ সংস্কারের বন্দী হয়ে চিরকাল থাকতে পারে না। সোভিয়েট রাষ্ট্রে শিক্ষার প্রসার ও সমাজের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নাগরিকদের বাস্তববোধ বেড়েছে। তার একটি প্রমাণ যে ভারত-চীন সংঘর্ষে সোভিয়েট রাষ্ট্রনেতারা ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মতন বাঁধা বুলি না আওড়িয়ে বাস্তবদৃষ্টিতে ঘটনার বিচার করেছেন। সোভিয়েট নেতারা প্রথমে খানিকটা দ্বিধাবোধ করলেও কোন সময়েই চীনা কম্যুনিস্টদের অহেতুক এবং বিশ্বাসঘাতক আক্রমণের সমর্থন করেননি, বরং ধীরে ধীরে ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গীর যাথার্থ্য স্বীকার করে অবশেষে প্রকাশ্যভাবে চীনের নিন্দা করেন। তার ফলে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যেও নতুন বোধোদয়ের আভাস মেলে। সোভিয়েট ও চৈনিক মার্ক্সপন্থীদের সাম্প্রতিক বৈষম্যের ফলে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে বোধ হয় এই সর্বপ্রথম নিজস্ব চিন্তাধারার উদ্ভব হচ্ছে। ফলে ভারতীয় কম্যুনিস্টদের মধ্যে আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের অভ্রান্ত লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। ভারতীয় কম্যুনিস্ট দলের ত্রিশ বৎসরের ইতিহাসে বারবার বৈদেশিক নীতির যে অস্থিরতা, আভ্যন্তরীণ ঘটনার পর্যবেক্ষণ ও বিচারে যে বারবার গোঁজামিল ও ভুল, তার ফলে দলের মধ্যে যারা চিন্তাশীল, তাদের মনে নতুন সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। যারা বুদ্ধিমান, তারা কিভাবে দলের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ

নীতির এ রকম ঘন ঘন ও আকস্মিক পরিবর্তন দেখেও কম্যুনিস্ট মতবাদের অভ্রান্ততায় বিশ্বাস রাখবে?

কম্যুনিস্ট মতবাদের মধ্যে যে চাঞ্চল্য ও অস্থিরতা দেখা যায়, তা আকস্মিক নয়। মার্ক্সীয় দর্শনের মধ্যে যে স্ববিরোধ, তা থেকেই এই সব ভিন্নমুখী বিপরীত মতবাদগুলির জন্ম। মার্ক্স বহু বিষয়ে বহুদর্শী ব্যক্তি ছিলেন এ কথা নিঃসন্দেহ কিন্তু তাঁর দর্শনবিচার ও দর্শনদৃষ্টি আংশিক এবং বহুক্ষেত্রে ভ্রান্ত, এ কথাও সমান সত্য। তিনি হেগেলিয় মতবাদের বিরোধী বলে নিজের পরিচয় দিতেন, কিন্তু বাস্তবিকপক্ষে তিনি আজীবন হেগেলপন্থী ছিলেন। হেগেল বাস্তবকে দুটি বিভিন্ন বিপরীত ধর্মের মধ্যে প্রকাশ করতে চেয়েছেন; কিন্তু তিনি ভুলে গিয়েছিলেন যে বাস্তব কখনও প্রত্যক্ষভাবে দুটি বৈপরীত্য বা বিপরীত ধর্মের মধ্যে রূপ পায় না। ইংরেজীতে বলা চলে যে বাস্তবের মধ্যে contrary বা বিরোধী সত্তার পরিচয় মেলে, কিন্তু contradictory বা বিপরীত সত্তার সহঅবস্থান সম্ভব নয়। ভারতীয় দর্শনের দৃষ্টিতে সত্যের প্রকাশ বহুমুখী, তাই ভারতীয় দর্শন সহজেই আমাদের বাস্তববোধ এবং বাস্তবজগতকে স্বীকার করে নিয়েছে। হেগেল এবং হেগেলপন্থী মার্ক্স বাস্তবের এ বৈচিত্র্য স্বীকার করতে চাননি, বিপরীতধর্মী সত্তার দ্বন্দ্ব ও সমন্বয়ের মধ্যে বাস্তবকে প্রকাশ করতে চেয়েছেন বলে তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টাই অসার্থক বলে প্রমাণিত হয়েছে। কম্যুনিস্ট নীতি এবং কর্মের দৌর্বল্য মার্ক্সের এই বাস্তব ব্যাখ্যার মূলগত ত্রুটি থেকেই এসেছে।

বিগত একশত বৎসরের মধ্যে মার্ক্সের বহু ব্যাখ্যা এবং ভবিষ্যদ্বাণী ভ্রান্ত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে। তিনি সামাজিক অগ্রগতিকে হেগেলের বর্ণিত দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষের ফলরূপে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বাস্তব দ্বি-শক্তির প্রকাশ, তাই তাঁর ধারণা ছিল সামাজিক উন্নতির যে কোন পর্যায়ে, দুটি মাত্রই প্রধান শ্রেণী থাকবে, সামাজিক সব ব্যাপারই এই দুই শ্রেণীর সংঘাতের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। মার্ক্সের কাছে তাই শ্রেণী সংঘর্ষই সমাজ পরিবর্তনের একমাত্র শক্তি। এ সিদ্ধান্ত স্পষ্টতঃই ভুল। সমাজ দুটি শ্রেণীর যোগফল নয়, দুটি শ্রেণীর সংঘাত সামাজিক উন্নতির একমাত্র নিয়ামকও নয়। সমাজের মধ্যে কেবল দুটি শ্রেণী বিরাজমান,—এ কথা ভেবে যত আত্মপ্রসাদই লাভ করা যায় না কেন, আসলে অতটা সহজে সমাজের ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়। বস্তুতপক্ষে সমাজে বহুশ্রেণী, এবং যাকে আমরা এক শ্রেণী মনে করি, তার মধ্যেও বহু বিভাগ। উদাহরণস্বরূপ শ্রমিক শ্রেণীর কথা যদি ভাবা যায়, তাদের বিশেষ প্রকৃতি বোঝার জন্য যদি সাধারণ কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের খোঁজ করি, তবে দেখি যে শ্রমিক শ্রেণী শুধু একটিমাত্র নয়—একই শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বহু বিভাগ বর্তমান। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেই সম্পূর্ণ সমাজের শ্রেণীবিভাগের প্রতিচ্ছবি দেখা যায়। ঠিক সেই রকম কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে একজনের আছে হয়তো বা এক একর জমি অন্য একজনের ৫০ একর অথবা ১০০ একর বা আরও বেশী। তাদের দাবী এবং আশা তাই একমুখী নয়। কৃষক বা শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন বিভাগ তাই নিজ নিজ স্বার্থ সিদ্ধির জন্য পৃথকভাবে তীব্র সংগ্রাম করে। ট্রেড ইউনিয়ন বা শ্রমিক সংস্থা সম্পর্কে যাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণা আছে তাঁরা জানেন, যে সময় সময় শ্রমিক ও ধনিকের স্বার্থ সংঘাতের সমন্বয় করার চেয়েও শ্রমিক শ্রেণীর বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন দাবীগুলিকে সাধারণ ভাবে পেশ করা বেশী কঠিন মনে হয়।

যতক্ষণ আমরা তত্ত্বের রাজ্যে বিচরণ করি, ততক্ষণ সমাজকে শ্রমজীবী, মধ্যবিত্তশ্রেণী

আর অভিজাত সম্প্রদায় এই তিনটী শ্রেণীতে সুশৃঙ্খল ও সুষম ভাবে ভাগ করতে পারি, কিন্তু তত্ত্ব ছেড়ে বাস্তবের সংস্পর্শে আসা মাত্র দেখি যে তাদের মধ্যেই শ্রেণী বিভাগ আর বৈষম্যের অন্ত নেই। অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে উচ্চ সম্ভ্রান্ত এবং নিম্ন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্পর্কে যে অনাত্মীয়তার পরিচয় মেলে, অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সম্পর্কের চেয়ে তা কম নয়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই বৈষম্য ও বিভেদ আরো তীব্র। উচ্চ মধ্যবিত্ত অভিজাত শ্রেণীর সঙ্গে ক্রমাগতই আত্মীয়তা স্থাপনে প্রয়াসী, অন্যপক্ষে নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তফাৎ বজায় রাখবার জন্য সদাই সচেষ্ট। বোধ হয় এ ধরনের শ্রেণীর বদলের ফলেই হিন্দু সমাজে তথাকথিত নিম্নবর্ণ দেখা দিয়েছে এবং তারই সঙ্গে এসেছে অস্পৃশ্যতা। বর্তমান যুগধর্মের আহ্বানে এতকাল যারা কম সুযোগ সুবিধা পেয়েছে, তারাই আজ বিশেষ অধিকার এবং বিশেষ সুযোগ সুবিধা পাবার জন্য সংগ্রামশীল।

সামাজিক পরিবর্তন সাধনের বাহন হিসাবে শ্রেণী সংঘর্ষের উপর মার্ক্স যে গুরুত্ব দিয়েছিলেন, ইতিহাস তার সমর্থন করেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদে এবং ঊনবিংশ শতকের শুরুতে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ছিল পরিবেশের সঙ্গে খাপ না খেলে জীবন সংগ্রামে জয়ের আশা নেই। তাই struggle for existence বা বাঁচবার জন্য সংগ্রাম এবং adaptation to environment বা পরিবেশের সঙ্গে অভি-যোজন সে কালে প্রায় যুগধর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে তখন সবাই বলতেন যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমেই জীবন এগিয়ে চলে। প্রতিযোগিতার নিশ্চয়ই জীবনে স্থান আছে, কিন্তু তার ফলে সহযোগিতার মাহাত্ম্য অস্বীকার করা চলে না, মিলেমিশে কাজ করেছে বলেই মানুষ অন্যান্য প্রাণীর উপর আধিপত্য করে, সামাজিক জীব হিসাবে জীবনকে সুন্দর ও সুগম করে তোলে। কিন্তু সমাজ জীবন সহযোগিতারই নামান্তর। অধিকাংশ প্রাণীর যে দৈহিক শক্তি অথবা গতি দৃষ্টি এবং শ্রবণ শক্তির তীক্ষ্ণতা, মানুষের তার কিছুই নেই। কিন্তু এই সব অসামর্থ্য সত্ত্বেও আজ সে সমগ্র প্রাণীকুলের অধিকর্তা। সার্থক সহযোগি-তার ভিত্তিতেই জীব জগতে মানুষের প্রাধান্য। কাজেই বলা যেতে পারে যে প্রতিযোগিতা বা সংগ্রাম নয়, সহযোগিতা এবং ঐক্যবদ্ধতাই মানুষের বিরাট উন্নতির কারণ।

সমাজের অর্থনৈতিক সংগঠন যে জীবনের বিভিন্ন প্রকাশে কার্যকরী, মার্ক্সের বিশ্লেষণের ফলে তা পরিস্ফুট হয়ে উঠে। বস্তুতপক্ষে তাঁর বিভিন্ন সিদ্ধান্তের মধ্যে এটি একটি বড় দান। মানুষের শক্তি সীমিত, তার আকাঙ্ক্ষা অসীম। ফলে বিজ্ঞান ও শিল্প উদ্যোগের উন্নতি সত্ত্বেও মানুষের আশা ও আকাঙ্ক্ষার মধ্যে ব্যবধান বেড়ে চলেছে। তারই ফলে অর্থনৈতিক জগতে বৈষম্য এবং সংঘর্ষ ক্রমশই অহেতুক ভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ইতিহাসে বারবার দেখি যে অপরিহার্যভাবেই একজনকে বঞ্চিত করে অন্যজনের আকাঙ্ক্ষার পরিতৃপ্তি ঘটে। মার্ক্স এ থেকে এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হলেন যে বিপরীত দাবীর এই সংঘর্ষই ব্যক্তির এবং সমাজের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।

মার্ক্সের এ আবিষ্কার বিপ্লবকারী সন্দেহ নেই, কিন্তু নতুন আবিষ্কারের আনন্দ তাঁকে এত অভিভূত করেছিল যে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে চরমে টেনে নিলেন, এমন সব মত-বাদকে অভ্রান্ত সত্য বলে ঘোষণা করলেন যে ইতিহাসের বিচার বুদ্ধি সম্পন্ন কোন ছাত্রই তা গ্রহণ করতে পারে না। ঐতিহাসিক জড়বাদ এবং ইতিহাসের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে তিনি প্রকৃতির শাশ্বত সত্তা এবং অমোঘ বিধান বলে ভুল করলেন। ফলে তাঁর মূল বক্তব্য এমন

কতকগুলি অনড় সংস্কারে পরিণত হল যে মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিকগণ অনেক সময় তাঁদের তত্ত্বের সমর্থনের জন্য বাস্তব ঘটনার উপরও হস্তক্ষেপ করেছেন। তাঁরা কেবল মাত্র সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ক্রমবিকাশের ধারাকে ব্যাখ্যা করবার জন্যই যে এই নীতি প্রয়োগ করেছেন তা নয়, সর্বাঙ্গীন উন্নতির আদর্শকেও এই নীতিদ্বারা সমর্থনে প্রয়াসী হয়েছেন। গোঁড়া মার্ক্সবাদীর মতে চিত্র বা কবিতার মূল্যায়ণ অথবা শিল্পী বৈজ্ঞানিকের প্রতিভার বিচার করবার জন্যও তাদের শ্রেণী সম্বন্ধের কথা জানা প্রয়োজন। মার্ক্সবাদী সমালোচক তাই শেক্সপীয়রকে ব্রিটেনের বুর্জোয়া বিপ্লবের এবং রবীন্দ্রনাথকে ভারতের ধনতন্ত্রের প্রচারক সাহিত্যিক হিসাবে বর্ণনা করবার চেষ্টা করে নিজেকে ও নিজের মতবাদকে হাস্যাস্পদ করতে দ্বিধা করেনা।

এ বিষয়ে সন্দেহ নেই যে অর্থনীতির ভূমিকা ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ। এটা পরীক্ষিত সত্য যে, মানুষের বৃত্তি, তার সমগ্র অভ্যাস, এমন কি চিন্তাধারার উপরও সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে। কৃষিজীবী সম্প্রদায় সাধারণত ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বা শ্রমিক সম্প্রদায়ের তুলনায় অধিক রক্ষণশীল। অর্থনীতি মানুষের কথা, কাজ ও চিন্তাকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করে এ কথা সত্য, কিন্তু তাই বলে সমস্ত মানবিক ক্রিয়াপদ্ধতি অর্থনৈতিক নিয়ামক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—এ কথা বললে সত্যের অপলাপ ঘটে। অর্থনীতি আদর্শবাদকে যতখানি প্রভাবান্বিত করে, আদর্শবাদও অর্থনীতির উপর ততখানি প্রভাব বিস্তার করে। মার্ক্স নিজেই এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। চিরকাল দারিদ্র্য যাতনা সহ্য করেও তাঁর আদর্শ বিচ্যুতি ঘটেনি, তীব্র অর্থনৈতিক টানা পোড়েনের মধ্যেও তাঁর আদর্শবাদ সব কিছুর উপর জয়লাভ করেছিল। কম্যুনিস্ট দলের তরুণ কর্মীকেও আদর্শবাদই অনুপ্রাণিত করে—তাই মুখে কম্যুনিস্ট কর্মী যাই বলুক না কেন, তার আচরণ তার মার্ক্সীয় মতবাদকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে।

বহু মার্ক্সবাদীর পক্ষে ইতিহাসের জড়বাদী ব্যাখ্যা এবং শ্রেণী সংঘর্ষের বাস্তবতা প্রায় ধর্ম বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। এর ফলে সংঘর্ষকে যারা বাস্তবের প্রকৃতি মনে করে, তারা যে বিদ্বেষ ও হিংসাত্মক আচরণের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন আনতে চেষ্টা করবে, তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। মার্ক্সবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যক্তি এবং সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধার উপর এত অধিকমাত্রায় জোর দেওয়া হয়েছে যে সমাজে সংক্ষুব্ধ সংঘর্ষ অবধারিত ভাবেই দেখা দিয়েছে। কম্যুনিস্টরা স্পষ্টতঃই সমাজ পুনর্গঠনের জন্য হিংসা এবং বিদ্বেষকে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার বলে স্বীকার করে নিয়েছে। কোন ব্যক্তি যদি বিপ্লব-সংঘটনকারী যন্ত্র হিসাবে নিজেকে তাদের কাছে সমর্পণ করে, তাহলে ধর্ম বা নীতি বোধের বিরোধী হলেও তার কার্যাবলীকে কম্যুনিস্টরা নিন্দার বদলে প্রশংসার যোগ্য মনে করে।

সামাজিক পরিবর্তনের জন্য শক্তি এবং বিদ্বেষের ব্যবহারকে মার্ক্সবাদী দার্শনিক যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। মার্ক্সবাদীদের কাছে মানুষ পদার্থের উন্নততর প্রকাশমাত্র। মানুষ ও প্রস্তর খণ্ডের মধ্যে পার্থক্য তাদের চোখে শুধু উপাদানের সংখ্যা ও জটিলতার উপর নির্ভর করে। পদার্থ জগতের ক্ষেত্রে জড় পদার্থ ও সজীব পদার্থের আচরণ একই সূত্র দিয়ে বোঝা যায়। সজীব পদার্থ বলতে মানুষ এবং সমস্ত প্রাণী বোঝায় বলে জড় জগতের নিয়ম বা সূত্র উভয়ের উপর সমান প্রযোজ্য। জড় জগতের আইন কিন্তু চিন্তা বা ভাব জগতে খাটেনা, তাই বিভিন্ন ধর্ম মতে, বিভিন্ন সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শে

মানুষের বিবেক সম্পন্ন বিচার ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছা শক্তির যে বিভিন্ন প্রকাশ, জড় জগতের নিয়ম কানুন দিয়ে তা বোঝাতে চাইলে হাস্যাস্পদ হতে হয়। বস্তুতপক্ষে কিন্তু চিন্তা ও ভাবজগতে এই স্বকীয়তাই মানুষের বৈশিষ্ট্য এবং মার্ক্সবাদে সে স্বকীয়তার স্বীকৃতি নেই বললেই চলে।

মার্ক্সের মতে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি বস্তুগত প্রয়োজনের স্বীকৃতি মাত্র। মার্ক্সের মতামত সম্বন্ধে যাঁরা খবর রাখেন, তাঁরা এ কথাও মানবেন যে প্রকাশ্যে মার্ক্স যতই প্রতিবাদ করুন না কেন, আসলে কিন্তু তিনি প্রচ্ছন্নভাবে অদৃষ্টবাদী। পূর্বেই বলেছি যে এ ধরনের অন্ধ-বিশ্বাস মার্ক্সবাদীর জন্য শক্তির উৎস হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্ক্সবাদী মনে করে যে, সে এমন কাজের জন্য সংগ্রাম করছে যার সাফল্য অনিবার্য এবং প্রথম থেকেই সুনির্দিষ্ট। তাই মার্ক্সবাদীর বিশ্বাসের শক্তি বুদ্ধি এবং ইচ্ছা নিরপেক্ষ, অথচ ইচ্ছাশক্তি আর বুদ্ধিই মানুষের একান্ত গৌরবের সামগ্রী।

মার্ক্স সামাজিক পরিবর্তনের জন্য সংস্কারের পরিবর্তে বিপ্লবকে কেন বেছে নিলেন, তা সহজেই বোঝা যায়। তাঁর মতে মানুষ অনুভূতিহীন বিচার-বিবেক বর্জিত জড় পদার্থের জটিলতার প্রকাশ, কাজেই জড় জগতে বাহিরের শক্তি সংঘাতে যে ভাবে পরিবর্তন আসে, সমাজ জগতেও ঠিক সেইভাবে বিভিন্ন ব্যক্তির সংঘর্ষেই প্রগতি আসবে। বিবেক সম্পন্ন লোক কিন্তু বলবেন যে, ক্রমিকসংস্কারের মাধ্যমে পরিবর্তন আসাই বাঞ্ছনীয়। গোঁড়া মার্ক্সবাদীরা বলবে যারা সংস্কার পন্থী, তারা প্রকৃতপক্ষে প্রতিক্রিয়াশীল, তাই সংস্কার-ধর্মী মনোবৃত্তি শুধু অবাঞ্ছনীয় নয়, প্রগতি বিরোধী। সত্যি কথা বলতে কিন্তু মার্ক্সীয় পদ্ধতির বিচারে ভাল বা মন্দের কোন অর্থ নেই। মার্ক্সবাদীদের বিশ্বাস যে ঐতিহাসিক প্রয়োজনীয়তায় আপেক্ষিকভাবে সমস্ত কিছুরই পরিবর্তন হয়। যদি কোন জিনিসকে অনিবার্য মনে করি, তবে তাকে ভাল বা মন্দ বলার কোন অর্থ হয় না। প্রাকৃতিক নিয়মে যা ঘটবেই, তা নৈসর্গিক, কাজেই ভালোমন্দের প্রত্যয় সেখানে নিরর্থক। মানুষের ইচ্ছা শক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করি বলেই মানুষের কাজকে ভাল বা মন্দ বলা চলে। প্রকৃতপক্ষে একমাত্র মানুষই ভাল মন্দের বিচার করবার ক্ষমতা রাখে। মার্ক্স নিজে সাধারণ মানুষের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং আনন্দের কথা চিন্তা করে নিজে আজীবন কষ্ট স্বীকার করেছেন। তাঁর এই আচরণের দ্বারাই প্রমাণ হয় যে বস্তুবাদ অপেক্ষা মানসিক বৃত্তি তাঁর জীবনে অধিকতর শক্তিশালী ছিল।

আশ্চর্যের কথা এই যে নিজে আদর্শবাদী হয়েও ঐতিহাসিক জড়বাদের উপর বেশী জোর দেওয়ার ফলে মার্ক্স মানুষের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেছেন। কালের অমোঘ বিধানে সামান্যতম অনুপরমাণু থেকে মনুষ্যকুল পর্যন্ত সব কিছুই অনিবার্যভাবে নিয়ন্ত্রিত। দীর্ঘকালের পরিক্রমে ব্যক্তির পৃথক সত্ত্বার অস্তিত্ব থাকে না। ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনই সত্য এবং ব্যক্তির সত্ত্বার কোন মূল্য নেই—মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় এই সব ভাবনা হঠাৎ প্রবেশ করে নি। মার্ক্সবাদী উপায়কে অবহেলা করে লক্ষ্যের উপর এত বেশী জোর দেয় কেন তাও এ থেকে বোঝা যায়। ঐতিহাসিক বিবর্তনে যদি ফললাভ ঘটে, তবে মার্ক্সবাদী লক্ষ্য সিদ্ধির উপায় সম্বন্ধে মোটেই ভাবে না। বস্তুতান্ত্রিক দ্বৈতবাদের দৃষ্টিতে ব্যক্তির প্রতি অবহেলা এবং সমষ্টির পূজা মার্ক্সীয় চিন্তাধারায় তাই অনিবার্য ভাবে এসে পড়েছে।

দার্শনিক চিন্তাধারার দুর্বলতার ফলে মার্ক্সবাদীর বিভিন্ন বিশ্বাসের মধ্যে নানা অসঙ্গতি এসেছে। মার্ক্সবাদী ঐতিহাসিক বিবর্তনকেই একমাত্র সত্য বলে জেনেছে।

বিপ্লবকে মনে করেছে ফললাভের একমাত্র উপায়। শ্রেণী সংঘাতের মাধ্যমেই পরিবর্তন আসবে অথচ মার্ক্সীয় আদর্শানুযায়ী এক সময় শ্রেণী বিভাগের সমস্ত বৈষম্য দূরীভূত হয়ে যাবে। স্বভাবতই তখন সংঘর্ষেরও অবসান ঘটবে, কিন্তু তার সঙ্গেই পরিবর্তনের সম্ভাবনাও সুপ্ত হবে। পরিণামে তাই অনড় স্থানু সমাজের সৃষ্টি হবে। জীবনের অর্থ কিন্তু পরিবর্তন, তাই পরিবর্তনহীন সমাজের মধ্যে আর জীবনের স্পন্দন খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মার্ক্সীয় মতবাদের এ ধরনের স্ববিরোধের পরিচয় ব্যক্তির বিশ্লেষণেও মেলে। মানুষের দুঃখকষ্টের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়েই মার্ক্স অর্থনীতি এবং সমাজনীতি অধ্যয়ন শুরু করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর কার্যসূচীতে মানুষের ব্যক্তিগত সব সুখকেই বিসর্জন দেওয়া হয়েছে। সমষ্টিগত স্বার্থের প্রয়োজনে ব্যক্তির বিনাশ কম্যুনিজমের অবশ্যম্ভাবী ফল। লক্ষ্য সাধনকেই মার্ক্স চরম সত্য বলে ঘোষণা করেছিলেন, কিন্তু কার্যত মার্ক্সীয় কর্মপন্থায় লক্ষ্য এবং উপায় দুই অস্বীকৃত হয়েছে। মার্ক্সবাদের পরিণতিতে তাই মার্ক্সবাদের প্রত্যেকটি বিশ্বাস ও সিদ্ধান্তই বর্জন করতে হয়।

কংগ্রেস এবং তার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলগুলির আদর্শ ও কার্যক্রমের সংক্ষিপ্ত এ বিবরণ থেকে প্রমাণ হয় যে ভারতবর্ষ আজ ইতিহাসের যে পর্যায়ে পেঁৗছেছে, সেখানে কংগ্রেস ভিন্ন অন্য কোন দল দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করতে পারে না। বস্তুতপক্ষে কংগ্রেসের আদর্শ শুধু ভারতবর্ষ নয়, সমস্ত জগতের জন্য আজকের দিনে বিশেষ উপযোগী। গত তিনশো বৎসরের মধ্যে পৃথিবীতে ৫টি বড় রকমের বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে। ১৬৪০ খৃস্টাব্দে যে ব্রিটিশ বিপ্লব শুরু হয়, রাজা চার্লসের মৃত্যুদণ্ডে তার পরিসমাপ্তি ঘটে। কিঞ্চিদধিক একশত বৎসর পরে ১৭৭৬ সালে আমেরিকার বিপ্লব, এবং ১৭৮৯ সালে ফরাসী বিপ্লবের মধ্যে প্রথমে রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও পরে সামাজিক সাম্যের দাবী মুখরিত হয়ে উঠে। ১৯১৭ সালে রুশ দেশে যে বিপ্লব, তাতে অর্থনৈতিক সাম্যের দিকে লক্ষ্য দেওয়া হয়। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষের বিপ্লব পূর্বের সমস্ত বিপ্লবগুলিকে সম্পূর্ণ করে।

বস্তুতপক্ষে এই পাঁচটি বিপ্লবকে একটি অবিচ্ছিন্ন কর্মধারা মনে করা উচিত। ব্রিটিশ বিপ্লব দায়িত্বহীন রাজার বিরুদ্ধে প্রজা সাধারণের নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য বিদ্রোহ করার দাবীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে। আমেরিকার বিপ্লবের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং মানুষের সুখভোগের দাবী। ফরাসী বিপ্লব এ দুটি ধারণা ছাড়াও সাম্য এবং ভ্রাতৃত্ববোধকে জাগ্রত করেছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাধীনতাকে যুক্ত করে রুশিয়ার বিপ্লব এই ধারণাকে ব্যাপকতর রূপ দেবার চেষ্টা করে। ভারতবর্ষের বিপ্লবে এই সমস্ত আদর্শ স্বীকার করে তার সঙ্গে যুক্ত করেছে নতুন কর্মপদ্ধতি। উপায়কে বাদ দিয়ে লক্ষ্যের বিচার করা যায় না, ভারতীয় বিপ্লবের এই হল অন্যতম শিক্ষা। কম্যুনিস্ট দলের চীনে ক্ষমতাগ্রহণ এই পাঁচটি বিপ্লব থেকে পৃথক। সংঘর্ষের পথে মাও-সে-তুং কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র স্থাপন করেছেন, কিন্তু তবু তাকে প্রকৃতপক্ষে নতুন বিপ্লব বলা চলে না। লেনিন মার্ক্সবাদের যে সূত্র রুশদেশে প্রয়োগ করেছিলেন, চীনদেশের পরিপ্রেক্ষিতে তার

খানিকটা বদল করে মাও-সে-তুং যে ভাবে দেশ অধিকার করেন, তাতে মানুষের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কোন নতুন ধারণা সংযোজিত হয় নি।

এই পাঁচটি বিপ্লবের মধ্যে পূর্ববর্তী চারটিতে উপায়ের চাইতে লক্ষ্যের দিকেই দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে বেশী। বৃটিশ বিপ্লবে নাগরিক স্বাধীনতা ও সাম্যের প্রাথমিক সাফল্য সত্ত্বেও এই বিপ্লব কুড়ি বৎসর অপেক্ষাও কম সময়ের মধ্যে অকৃতকার্যতায় পরিণত হয়। রাজার প্রাণদণ্ডের ফলে বিপরীতধর্মী শক্তিগুলি উদ্দীপিত হয়ে উঠেছিল বলে বৃটিশ বিপ্লবের সামাজিক সাম্য ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবী বহুলাংশে ব্যর্থ হয়ে পড়ে। আমেরিকার বিপ্লবের মধ্যেও সহিংস কার্যক্রমের লক্ষণ মেলে, কিন্তু তাকে আমেরিকার বিপ্লবীরা বিপ্লবের অচ্ছেদ্য অঙ্গ মনে করেনি। তবু সহিংস পন্থা অবলম্বনের জন্য প্রায় একশত বৎসর আমেরিকা এবং বৃটেনের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ছিল। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরেই প্রায় বার হাজার রাজভক্ত প্রজা এই নতুন রাজনৈতিক প্রবর্তনা গ্রহণ করার চেয়ে দেশত্যাগ করা অধিক বাঞ্ছনীয় মনে করেছিল। এদের সংখ্যা কম হলেও তাদের যে মনোভাব, তারই ফলে বহুকাল ধরে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে এবং আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ এবং সংঘাতের পরিচয় মেলে।

ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতা সাম্য ও ভ্রাতৃত্বের বাণী সমস্ত মানুষের মনকে অভিভূত করে তুলেছিল। ফরাসী বিপ্লবের আদর্শ তাই সর্বজনগ্রাহ্য, কিন্তু আদর্শ লাভ করার জন্য যে সহিংস পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তার ফলে প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে সমস্ত দেশে বিদ্বেষ ও বিরোধ ছড়িয়ে পড়েছিল। আজ পর্যন্ত প্রাচীন রাজতন্ত্রের উত্তরজীবীদের অনেকে সাধারণ-তন্ত্রী ফরাসী বিপ্লবের সঙ্গে নিজেদের সামঞ্জস্য সাধন করতে পারেনি। ফরাসী বিপ্লবের সংঘর্ষ ও হিংসাত্মক কার্যক্রমের ফলে প্রায় সমস্ত উনিশ শতক ধরে ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ ফরাসী রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছে। ফরাসী দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও আজ পর্যন্ত যে সমস্ত সমস্যা অমীমাংসিত, ফরাসী বিপ্লবের আত্মঘাতী অন্তর্বিরোধ তার অন্যতম কারণ।

আমেরিকার ও ফরাসী বিপ্লবের মতবাদগুলিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রসারিত করাই ছিল রুশ বিপ্লবের আদর্শ। সামাজিক এবং অর্থনৈতিক সাম্য ও স্বাধীনতার আদর্শকে সুস্থমস্তিষ্ক কোন মানুষই অস্বীকার করতে পারে না, কিন্তু সহিংস এবং বিদ্বেষপূর্ণ পদ্ধতির ফলে এই মহৎ বিপ্লব মূলেই বিষাক্ত হয়ে উঠেছিল। হিংসা ও বিদ্বেষের প্রচারে পৃথিবীর অনেক দেশেই সোভিয়েট রাষ্ট্র সম্বন্ধে সন্দেহ ও সংঘাতের আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। শুধু তাই নয়। হিংসার পথ অবলম্বনের ফলে সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যেই বিদ্বেষ এবং অসন্তোষের সৃষ্টি হল। তার ফলে লক্ষ লক্ষ লোক নিহত অথবা বাস্তুহারা হয়েছে। ব্যক্তির দোষ গুণের বিচার না করে কেবলমাত্র জন্মগত পরিস্থিতির দ্বারা সমগ্র সম্প্রদায়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষের সঙ্গে বাইরের সংঘাত জড়িত হয়ে পড়ল। বৈদেশিক শত্রুতা সোভিয়েতবাসীদের দুঃখ দুর্দশা বাড়িয়ে হয়তো তুলেছিল, কিন্তু আভ্যন্তরীণ সংঘর্ষ এবং গৃহযুদ্ধ না থাকলে সোভিয়েট নাগরিকদের এত দুঃখকষ্ট সহ্য করতে হত না।

ভারতীয় বিপ্লবে এ ধরনের হিংসা, দ্বন্দ্ব বা সংঘর্ষের পরিচয় অনেক কম। সামাজিক পরিবর্তনের যুগে ব্যক্তির খানিকটা কষ্ট ভোগ বোধ হয় অনিবার্য কিন্তু ভারতবর্ষে সে দুঃখ ভোগ তীব্র হয়ে উঠে নি। তাই ইতিহাসের সার্থক বিপ্লবের মধ্যেও ভারতীয় বিপ্লবের

স্থান অনন্যসাধারণ। ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে সংগ্রামের যুগেও হিংসামূলক কার্যক্রম ব্যাপক হয় নি। যুক্তি আলোচনা এবং আপোষের মধ্য দিয়েই স্তরে স্তরে ভারতবর্ষ অধিকার অর্জন করে। শান্তিপূর্ণ এবং অহিংস উপায় অবলম্বন করলে ব্যক্তি ও জাতির যে কল্যাণ, তার অন্যতম উদাহরণ মেলে স্বাধীনতার পরে বৃটেন ও ভারতবর্ষের সম্বন্ধে। স্বাধীন ভারতবর্ষ গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে সহযোগিতা এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়ে তুলতে প্রয়াসী হল। সম্ভবতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে এ ধরনের ঘটনা আর পূর্বে কখনো ঘটেনি। শুধু অন্য দেশের সঙ্গে সম্বন্ধ বলে নয়, নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও ভারতবর্ষের অহিংস আদর্শ ও কার্যক্রম অপূর্ব সুফল দিয়েছে। সমস্ত রাজকীয় প্রথার অবসান ঘটল, কিন্তু একটি রাজাও প্রাণ হারাল না। তারা তাদের ক্ষমতা, মর্যাদা এবং ঐশ্বর্য হারাল, কিন্তু অহিংস পদ্ধতির দ্বারা বিপ্লব সাধিত হয়েছিল বলে পূর্ব যুগের রাজন্যবর্গ আজ ভারতের দেশভক্ত নাগরিক রূপে পরিচিত। ধনিক বণিক মহাজনদের উপর গুরু করভার চাপান হল, জমিদারী প্রথার অবসান ঘটল, এবং পুঁজিপতিদের জীবন যাপনের প্রতিটি ক্ষেত্র সংকুচিত হয়ে এল, কিন্তু অহিংস উপায়ে সাধিত হয়েছে বলে এই বিপ্লবের ফলে হিংসা ও দ্বেষের উত্তরাধিকার সৃষ্টি হয়নি। ফরাসী অথবা রুশ বিপ্লবের পরিণামে দেশের মধ্যেই যে ভাবে বিরোধী এবং যুযুধমান শক্তি গড়ে উঠেছিল, ভারতবর্ষে সে ধরনের বিরোধী এবং শত্রুভাবাপন্ন কোন অন্ত শক্তির পরিচয় মেলেনা। অহিংস উপায়ে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সমস্যার সমাধান করে এবং বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে ভারতবর্ষ যে আদর্শ স্থাপন করেছে, বর্তমান আণবিক যুগে সমগ্র পৃথিবীর জন্যও তাই একমাত্র কল্যাণের পথ।

সমালোচনায় স্বকীয়তা

অমলেন্দু বসু

বাংলা ভাষায় সাহিত্য-সমালোচনা এখনো প্রাচুর্য-লাঞ্ছিত অথবা প্রবীণতা-মন্থর হয়নি, মহৎ মণীষার বাহক হয়নি, যদিও বঙ্কিমচন্দ্র এই সাহিত্য-সরণির পথিকৃৎ এবং রবীন্দ্রনাথ মুষ্টিমেয় বাংলা সমালোচকগোষ্ঠীর মধ্যমণি। মাত্র শতবর্ষবয়স্ক অর্বাচীন বাংলা সমালোচনা আরো অগ্রসর হওয়ার পূর্বে সংশয় জাগে এ-সমালোচনার কোনো চারিত্রিক স্বকীয়তা, সহজেই চেনা যায় এমন কোনো অনন্যতা, প্রস্ফুট হয়েছে কিনা। এমন বলা কি সম্ভব যে অমুক অমুক লক্ষণে বাংলা সমালোচনার বৈশিষ্ট্য, অমুক দৃষ্টিভঙ্গী অথবা মূল্যমান অথবা মূল্যায়ন-প্রণালী বাঙালী সমালোচকের একান্তই নিজস্ব? ভারতীয় অন্য কোনো ভাষাতেই ঐশ্বর্যবান সমালোচনা আছে বলে' জানি না। (বস্তুত, নানা ঐতিহাসিক কারণে বাংলা ভাষাতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি সমালোচনার শুরু হওয়ার বেশ কিছুকাল পরেই অন্যান্য ভাষায় সমালোচনার আবির্ভাব হয়েছিল।) কিন্তু ইওরোপের প্রাগ্রসর সাহিত্যগুলির সমালোচনা-শাখায় (আমি বিশেষ করে' ফরাসী, জার্মান, রুশ, ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস স্মরণ করছি) যে স্বকীয়তা বিদ্যমান, কোনো কোনো বিষয়ে যে-অননুকৃত স্বাধীন মূল্যোজ্ঞান ও বিচারপ্রণালী কার্যকরী, বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায়ও তত্তুল্য, এমনকি ক্ষীণভাবেও তুলনীয়, কুললক্ষণ আমাদের দর্শনসাধ্য কি? স্থানে অস্থানে বাঙালী আপন ভাষা-কৌলীন্যের মাহাত্ম্য ঘোষণা করে' থাকেন, সে-মাহাত্ম্য কি কিছু মুষ্টিমেয় মেধাবী ও মৌলিক সমালোচনা ছাড়া সমগ্র বাংলা সমালোচনায়ও প্রযোজ্য? বাংলা সাহিত্যের সৃষ্টিশীল এলকাগুলিতে স্বকীয়তা নিঃসংশয়। লিরিক, কাহিনীকাব্য ও দৃশ্যকাব্য প্রভৃতি কাব্যবর্গে বাঙালীর কৃতিত্ব সুস্পষ্ট ও জাতিচরিত্রানুকারী। (শব্দটি বঙ্কিমচন্দ্র থেকে ধার-করা।) প্রায় এক শতাব্দী পূর্বে, ১২৮০ সালের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত এক গ্রন্থ-সমীক্ষায়, বঙ্কিমচন্দ্র আলোচনা করেছিলেন বাংলা গীতিকাব্যের ধারা কোথা থেকে কোথায় প্রবাহিত হয়েছে, সে-কাব্যের জাতীয় চরিত্র সন্ধানসাধ্য কিনা। এর মানে বাংলা গীতিকাব্যের ঐতিহ্য ও জাতিচরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রের লক্ষ্যগোচর হয়েছিল। গীতিকাব্যের তুলনায় অর্বাচীন অন্য কয়টি সাহিত্যগোত্রেও—যেমন গদ্যে-রচিত গল্পে ও উপন্যাসে—অল্পবিস্তর স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং শুধু সাহিত্যগোত্রেই নয়, প্রেম নিসর্গ সমাজবোধ প্রমুখ প্রধান সাহিত্যিক কল্পবস্তুগুলির (literary themes) ব্যবহারেও অথবা উচ্ছ্বাস বিষাদ কৌতুক প্রভৃতি চিত্তবৃত্তির শৈল্পিক রূপায়ণেও বাংলা সাহিত্যের স্বকীয়তা সংশয়াতীত। এসব (এবং আরো কয়েকটি) কল্পবস্তু ও চিত্তবৃত্তি অবশ্য যাবতীয় সাহিত্যেরই সম্পত্তি। এমন কোনো সাহিত্য অস্তিত্ববান বলে' জানা নেই যাতে কৌতুক বা প্রেম (বিরহ বা মিলন বা সম্পূর্ণ ব্যর্থতা যে-রীতিতেই সে-প্রেম আধৃত হোক না কেন) কাব্যের কল্পবস্তু হয়নি অথবা কাব্যে সুরসঞ্চার করেনি। (শুধু প্রেম বা কৌতুকেরই উল্লেখ করলাম, সর্বশৈল্পিক কল্পবস্তু বা চিত্তবৃত্তির তালিকা দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়।) বাংলায় প্রেমের কাব্য বা নিসর্গকাব্য এক বিচারে যে কোনো ভাষায় প্রেমকাব্যের অথবা নিসর্গকাব্যের সগোত্র কেননা প্রেম এবং নিসর্গ-প্রীতি সর্বমানবিক হৃদয়বৃত্তি, সর্বশিল্পসম্মত কল্পবস্তু, কিন্তু অপরপক্ষে বাংলা কাব্যের

প্রেমে ও নিসর্গপ্রীতিতে এমন কিছু সূক্ষ্মতা, এমন কোনো বর্ণচ্ছটা বিদ্যমান যা অপর ভাষায় পাওয়া যাবে না। এই একই বিচারে বাঙালীর কৌতুকবোধ সর্বমানবিক কৌতুক-বোধের শামিল বটে, তবুও সূক্ষ্মতার বিচারে সে-কৌতুকবোধে একান্ত বঙ্গীয়তাও ভাগীদার, অতএব বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কৌতুকে বঙ্গচিত্তসুলভ স্বকীয়তার স্বাক্ষর।

বাংলা সমালোচনায় স্বকীয়তা প্রতিষ্ঠার পথে কয়েকটি বিঘ্ন ঘটেছে। এ-সমালোচনা এখনো শতায়ু নয়। দ্বিতীয়ত এ-সমালোচনা নেহাৎই ইওরোপীয় সাহিত্যের (বিশেষত ইংরেজি সাহিত্যের) অভিঘাতের সাক্ষাৎ ফল। এ-প্রসঙ্গে জনৈক পূর্ণচন্দ্র বসুর কয়েকটি কথা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত "সমালোচনা-সাহিত্য-পরিচয়" নামক সংকলন-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত হতে পারে :

'আর্যসাহিত্যে আরও এক বিলাতী সামগ্রীর অভাব দৃষ্ট হয়। সে সামগ্রী সমালোচন-সাহিত্য। ইউরোপীয় সাহিত্যে সমালোচনা-সাহিত্য প্রচুর। * * * এরূপ সমালোচন-সাহিত্য সংস্কৃতে দেখা যায় না। ব্যাস, বাল্মীকির গুণকীর্তন লইয়া আর্যসাহিত্যে সমালোচন-গ্রন্থ কই? কালিদাসাদির সমালোচন-গ্রন্থ কোথায়? সে সাহিত্য-মধ্যে রীতিমত সমালোচনার স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই; আছে কেবল অলংকারশাস্ত্র-মধ্যে দোষগুণের পরিচ্ছেদে দৃষ্টান্তের উল্লেখ। আর আছে টীকাকার এবং ভাষ্যকারগণের পুস্তকারম্ভে সামান্য ভূমিকা। ভাষ্যকে ঠিক সমালোচনা বলা যায় না। * * * এই যৎসামান্য সমালোচনা ছাড়িয়া দিলে কি বলিতে পারা যায় না যে আর্যসাহিত্যে ইওরোপীয় সাহিত্যের মত সমালোচনা-সাহিত্যের সম্পূর্ণ অভাব?'

এই লেখক সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গেরও আলোচনা করেছেন—আর্যসাহিত্যে সমালোচনা নেই কেন?

'প্রাচীন ভারতে যখন অহিন্দু সংস্কার সকল আর্যগণের মনে প্রবিষ্ট হয় নাই; যখন সকলেই হিন্দু রীতিনীতি, হিন্দু আচার-ব্যবহার বিলক্ষণ বুঝিতেন, যখন তদ্বিষয়ে কোনো কুসংস্কার মনে উদয় হইবার সম্ভাবনা ছিল না, তখন আর্যসাহিত্যের সমালোচনার তত প্রয়োজন হয় নাই। সকলেই গ্রন্থের অধ্যয়ন ফল ও সামাজিক ফল ধরিয়া বিচার করিতে সক্ষম ছিলেন এবং সেই বিচারে সুকবিগণকে চিনিয়া লইতে পারিতেন। তাহা অবধারিত হইতে পারিত। কিন্তু এক্ষণে আর সে কাল নাই, এক্ষণে ইংরেজি বিদ্যা আমাদিগকে বিভিন্ন অবস্থায় নিপতিত করিয়াছে। সেই অবস্থায় আমাদের সাহিত্যের সমালোচনা আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণে সে কার্যে কোন্ কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে? সেই কর্ণধার আর্য-সমালোচক। * * * আর্যদিগের গ্রন্থরচনায় একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল:—সেই উদ্দেশ্য ফলশ্রুতি বা অধ্যয়নফল। * * * যদি গ্রন্থ-প্রতিপাদ্য ফল উৎপন্ন হয়, তবেই গ্রন্থরচনায় সাফল্যলাভ হইয়াছে, নতুবা নহে। * * * গ্রন্থ-অধ্যয়ন বা শ্রবণের সমষ্টি-ফল যাহা তাহাই গ্রন্থের সম্যক সমালোচনা। তদ্দ্বারা গ্রন্থের ভালমন্দের বিচার স্বতই সম্পন্ন হইয়া যায় এবং জানা যায়—'যাহার ফলশ্রুতি বা অধ্যয়নফল ভাল, তাহাই ভাল গ্রন্থ; যাহার অধ্যয়নফল মন্দ, তাহা মন্দ গ্রন্থ; এবং যাহার অধ্যয়নফল কিছুই নাই, তাহা গ্রন্থই নহে।' রস সর্ববিধ গ্রন্থেরই আছে। সেই রসের পরিপুষ্টি সাধন হইলেই ফলশ্রুতি ঘটে। সমালোচনার এই মূল নীতি ইউরোপীয় সাহিত্যসমাজে প্রচারিত না থাকাতে সে সমাজের সাহিত্য-সমালোচনাও সুনিয়মিত হইতে পারে নাই। তজ্জন্যই সে সমাজে সমালোচনার এত ধুমধাম ও বাড়াবাড়ি। কিন্তু এই সহজ নীতি আর্যসমাজে প্রচলিত ছিল বলিয়া

সংস্কৃত আর্যসাহিত্যে আর স্বতন্ত্রাকারে সমালোচন-সাহিত্যের আবশ্যকতা হয় নাই।'

গ্রন্থ-মূল্যায়নে ফলশ্রুতির প্রয়োজন সম্বন্ধে ধারণা এই লেখক পেয়েছেন শ্রীজীব গোস্বামীর একটি শ্লোকে :

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোঽপূর্ব্বতা ফলম্।
অর্থবাদোপপত্তীচ লিঙ্গং তাৎপর্য্যনির্ণয়ে॥

শ্রীজীব গোস্বামী 'ফলম্'-এর উল্লেখ করেছেন কিন্তু এমন কথা বলেন নি যে সেই ফলটি বিচারাতীত। গ্রন্থপাঠে বা পাঠশ্রবণে কোন্ ধরনের ফল জন্মালো, কোন্ প্রণালীতে, কোন্ গুণসমন্বিত ফল জন্মালো, সে কথার বিচারই সমালোচনা। উপরে উদ্ধৃত প্রবন্ধে পূর্ণচন্দ্র বসু ফলশ্রুতি = সমালোচনা, এই সমীকরণের আশ্রয় নিয়ে যতটা নিশ্চিন্ত আত্মপ্রসাদের পরিচয় দিয়েছেন ততটা সদ্বিচার করেন নি আলোচ্য বিষয়ের প্রতি অথবা গোস্বামী প্রভুর প্রতি। সে কথা ছেড়ে দিয়েও মানব যে ভারতীয় সাহিত্যে ইওরোপীয় অর্থে সমালোচনার অভাব বিষয়ে তাঁর ধারণা অভিনব বটে যদিও অহিন্দু সংস্কার ও হিন্দু রীতিনীতি সম্বন্ধীয় নির্দ্বিধ উক্তিটিতে ইতিহাস-সম্মতি কিছু দেখছি না। আমার বর্তমান আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখকের বড় কথা হচ্ছে যে বাংলায় সমালোচনার উদ্ভব ইংরেজি প্রভাবের পরিণামে। দ্বিতীয় কথা, বাংলা সমালোচনার মূলনীতি আর্যসাহিত্যের উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে গঠিত হওয়া উচিত।

বাংলা সমালোচনার উপক্রম-যুগে সমালোচনা সম্বন্ধে আরো কিছু চিন্তা উল্লেখযোগ্য। ১৩১৫ সালের "বঙ্গদর্শন" পত্রিকায় শরচ্চন্দ্র চৌধুরী রচিত 'সমালোচনা' শীর্ষক প্রবন্ধে কয়েকটি সুপ্রাসঙ্গিক কথা আছে :

'প্রাচীন কালে বোধ হয় কেবল সমালোচন উপলক্ষ করিয়া প্রবন্ধ লিখিবার প্রথা বড় একটা ছিল না, টীকা-টিপ্পনীতে প্রসঙ্গ উপলক্ষেই সচরাচর নানা গ্রন্থকারের মতামত সমালোচিত হইত। তখন সমালোচনার বড় বেশী প্রয়োজনও হইত না, কেননা গ্রন্থকারগণ জীবনব্যাপী অধ্যয়ন দ্বারা যে জ্ঞান উপার্জন করিতেন, সারা জীবনের অভিজ্ঞতায় যে সত্য আপন হৃদয়ে উপলব্ধি করিতেন, তাহা নিজেই ধীরভাবে সমালোচনা করিয়া, উপযুক্ত ভাষা, ভাব এবং অলঙ্কারে সজ্জিত করিয়া পাঠকের হৃদয়ে সঞ্চারিত করিবার চেষ্টা করিতেন, কাজেই তাঁহাদের গ্রন্থে অন্যের সমালোচনার জন্য তেমন অবকাশ থাকিত না। কিন্তু আজকালকার এই ব্যস্ততার দিনে, এই অভিনবতার যুগে সে ভাবের কি আশা করা যায়, না তাহা সম্ভব হয়? * * * সমালোচন যখন কাব্যের শত্রু নহে, বরং একটা প্রবল সহায়, তখন ইহাকে আর অধিক কাল উপেক্ষা করা কি উচিত? বিধি-ব্যবস্থা-শূন্য রাজ্য যেমন, সমালোচনা-শূন্য সাহিত্য-সমাজ কি সেইরূপ নহে? * * * কাব্যাদির প্রধান উদ্দেশ্যই শিক্ষা, আনন্দ-বোধ তাহার আনুষঙ্গিক অবস্থা মাত্র। সমালোচনই এই শিক্ষার সূত্র, কাব্যাদি ইহার দৃষ্টান্ত। অলঙ্কার-শাস্ত্র এই শিক্ষার শৃঙ্খলাবদ্ধ সূত্র সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। অলঙ্কার-শাস্ত্রের নাম লইয়া আমি সঙ্কুচিত হইতেছি। হয়ত কেহ মনে করিতে পারেন, আমাদের অলঙ্কার-গ্রন্থ অনেক আছে, তাহাই তো পর্যাপ্ত। আমি এই ভয়েই আদ্যোপান্ত সমালোচন শব্দের ব্যবহার করিতেছি। আজ আমরা যাহাকে সমালোচনা বলিতেছি, কালে তাহাই বঙ্গভাষায় অলঙ্কার-শাস্ত্র হইবে। যে অলঙ্কার আছে, তাহা আমাদের দিদিমার অলঙ্কার, মা'র গায়ে তাহা খাটিবে না।'

প্রাচীন সাহিত্যে কেন সমালোচনা ছিল না সে-বিষয়ে এই লেখকও একটি অনুমান

পেশ করেছেন, সে-অনুমান চতুর বটে, তবে তারও ইতিহাস-সম্মতি দেখছি না। কিন্তু এই লেখকও আধুনিক জীবনের সঙ্গে সাহিত্যরচনার ও সমালোচনার সম্পর্ক প্রস্তাব করেছেন, আরো প্রস্তাব করেছেন যে প্রাচীন সাহিত্যের অলঙ্কার-শাস্ত্র দ্বারা আধুনিক সাহিত্যের সম্যক বিচার সম্ভব নয়, সুতরাং আধুনিক সাহিত্যের আলোচনায় আধুনিক বিচার-পদ্ধতি প্রযুক্ত হবে।

সদ্যোজাত বাংলা সমালোচনায় বেশ একটি পরস্পর-বিরোধী মনোভাব লক্ষ্য করা যায়। ইওরোপীয় পদ্ধতির সমালোচনা বাংলা সাহিত্যেও প্রয়োজন একথা মানা হয়েছে, অথচ বাংলায় বিদেশীয়ানা বরদাস্ত হয় নি। বাংলা সাহিত্যে বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে কয়েকটি সমসাময়িক মত উদ্ধৃত করছি।

(পূর্ণচন্দ্র বসু) 'বিলাতী সাহিত্যের মান বিলাতী সমাজে থাকিতে পারে, কারণ সে সমাজের রীতিনীতি ও ধর্মাধর্মের বিচার স্বতন্ত্র। * * * কি সাহিত্য, কি ইতিহাস, কি কাব্য, কি দর্শন—বিদ্যার সমস্ত অঙ্গই ধর্মনীতি এবং সমাজনীতির অনুকূল হওয়া চাই, যাহা অনুকূল নহে, তাহা তদ্বিরোধী, এজন্য পরিত্যাজ্য। * * * সেক্সপীয়ার হউন, মিলটন হউন, যিনিই হউন না কেন, যাঁহার কাব্যের ফলশ্রুতি হিন্দু সমাজ-নীতি এবং ধর্মনীতির বিরোধিনী হইবে, তিনি প্রকৃত হিন্দুর নিকট তদুপযুক্ত সমাদর লাভ করিবেন। * * * তাই আজ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর আদর ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে। ইংরেজি ছাঁচে ঢালা বাঙ্গালার অপরাপর উপন্যাস ও কাব্যাদির দশাও যে তদ্রূপ হইবে, তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।'

(বঙ্কিমচন্দ্র : "মানস-বিকাশ" নামক কাব্যগ্রন্থ থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধার করার পরে বলছেন :) 'এ কবিতা উত্তম, কিন্তু ইহাতে বড় ইংরেজি গন্ধ কয়। * * * ইংরেজ শিষ্য এইরূপে প্রেম বর্ণন করিলেন, ইহার সঙ্গে কণ্ঠিধারী বৈরাগিগণকৃত প্রেম বর্ণন তুলনা করুন, কিন্তু তৎপূর্বে আর একজন হাফ-ইংরেজ হাফ-জয়দেব-চেলার কৃত কবিতা শুনুন।'

(অক্ষয়চন্দ্র সরকার : 'কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত' :) 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার শেষ কবি। মধুসূদন বাংলার মিলটন, হেমচন্দ্র পিন্ডার, নবীনচন্দ্র-বায়রণ, রবীন্দ্রনাথ-শেলি,—বেশ কথা, কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বাংলার কি? ঈশ্বর গুপ্ত—বাংলার ঈশ্বর গুপ্ত। ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের নিন্দা, ঐ কথায় ঈশ্বর গুপ্তের প্রশংসা। তাঁহার কবিত্ব বাঙালীর নিজস্ব। * * * বাঙালীর খাঁটি বাংলা পদ্য এখন আনাচে-কানাচে আশ্রয় লইয়াছে। ইংরাজী গন্ধী, ইংরাজী ছন্দী,—তাহার উল ইংরাজী, তাহার ফুল ইংরাজী—এরূপ পরস্ব পদ্য কেবল আসর জাঁকাইয়া পসার করিতেছে। * * * ১২৯২ সালের ভাদ্রের প্রথমেই আমরা এখনকার কালের কাব্য ইংরাজী গন্ধী ইংরাজী গন্ধী বলিয়া খটকা তুলিলাম, দুঃখ করিতে লাগিলাম। দুই মাসের মধ্যেই বঙ্কিমবাবুর লিখিত ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের জীবনী প্রকাশিত হইল। তাহাতে তিনি লিখিতেছেন—

'আজিকার দিনের অভিনব এবং উন্নতির পথে সমারূঢ় সৌন্দর্যবিশিষ্ট বাংলা সাহিত্য দেখিয়া অনেক সময়ে বোধ হয়—হউক সুন্দর, কিন্তু এ বুঝি পরের—আমাদের নহে। খাঁটি বাঙালী কথায়, খাঁটি বাঙালীর মনের ভাব তো খুঁজিয়া পাই না। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাংলা। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাংলার কবি। এখন আর খাঁটি বাঙালী কবি জন্মে না।'

(বীরেশ্বর পাঁড়ে : 'ঊনবিংশ শতাব্দীর মহাভারত', নবীনচন্দ্র সেনের কাব্য :) 'অভিমন্যু' Sir Philip Sidney-র অনুবাদ। * * * উত্তরা পাশ্চাত্য রমণীর ন্যায় রূপগুণসম্পন্না। * * * শৈলজার চরিত্র......পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা।......সুভদ্রাও পাশ্চাত্য ছাঁচে ঢালা।'

উদ্ধৃতির সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই, উপরের বাক্য-স্তবক কয়টির মধ্যে স্বয়ং বঙ্কিম-চন্দ্রের প্রত্যয়ঘন উক্তিও আছে। এসব মতামত থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত সম্ভব : (ক) 'বিলাতী সাহিত্যের মান বিলাতী সমাজে'। এই যুক্তির সূত্রে স্থির অনুমান করা যেতে পারে যে তাহ'লে দেশী সাহিত্যের মান দেশী সমাজে, অথবা অপরপক্ষে বলা যেতে পারে যে দেশী সমাজের মান দেশী সাহিত্যে। আসল কথা, দেশী বা বিলাতী, যে কোনও সাহিত্যের মান স্বকীয় সমাজে। (খ) দেশী ও বিলাতীর এই প্রভেদ সম্বন্ধে উনিশ শতকী সমা-লোচকদের ঘ্রাণেন্দ্রিয় বড় সহজেই বিচলিত হত। তাঁরা নবীন কবিদের রচনায় ইংরেজি গন্ধ পেতেন, ইংরেজি আদর্শের প্রতিরূপ দেখতে পেতেন। (গ) কবিগণকে দুই পংক্তিতে শ্রেণীবদ্ধ করা সম্ভব ছিল—খাঁটি বাংলা কবি, শিক্ষিত কবি। এই শিক্ষিত কবিগণ অবশ্যই ইংরেজি-শিক্ষিত, অতএব সম্ভবত ইংরেজি কাব্য-প্রভাবিত।

বিদেশী প্রভাব সম্বন্ধে অন্তত একজন লেখক সুচিন্তিত কথা বলেছেন। ১২৮৮ সালের "বঙ্গদর্শনে" জনৈক অজ্ঞাতনামা গ্রন্থ-সমীক্ষক 'রঙ্গমতী কাব্য' সম্বন্ধে একটি অনুবন্ধে বলেছেন :

'বঙ্গভূমিতে মহাকাব্য জন্মিল কিরূপে? ইহার উত্তর সহজ। যখনই এই চির-স্থিতিশীল সমাজের অটুট বন্ধনীগুলি কালপ্রভাবে এক একবার শিথিল হইয়াছে, অমনি বঙ্গে কাব্য জন্মিয়াছে। বৈদেশিক ভাবপ্রভাব যখন বহিয়াছে, তখনই কাব্য দেখা দিয়াছে—কেননা তখন সমাজ বৈচিত্র্যের মহিমা বুঝিয়াছে।'

এই লেখক কয়েকটি আপ্তবাক্যে সন্তুষ্ট থেকেছেন, বঙ্গসমাজে একদা বন্ধন ও অপরযুগে বন্ধনমুক্তি এই দ্বিবিধ গতির সঙ্গে কাব্যের উত্থান ও পতন কীভাবে সংশ্লিষ্ট হয়েছে (যদি সত্যিই হয়ে থাকে) আর সেই সংশ্লেষের সপক্ষে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত কোথায়, এসব প্রয়োজনীয় প্রশ্ন তিনি তোলেন নি। ঐতিহাসিক ঘটনার সমর্থনে বাংলা কাব্যের সঙ্গে বাংলা সমাজের সংযোগ সম্পর্কে বরঞ্চ হুমায়ুন কবির তাঁর 'বাংলার কাব্য' নামক বিস্তৃত প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যের প্রধান ধাপ কয়টি দ্রুত অথচ তীক্ষ্ন নজরে দেখে নিয়েছেন।

প্রায় একশো' বছর আগে বাংলা সমালোচনার পথিকৃৎগণ যে-সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন—স্বকীয়তার সমস্যা, চিন্তা ও চিত্তবৃত্তির স্বাধীন আদর্শের সমস্যা—সে-সমস্যা আজো তিরোহিত হয়েছে বলে মনে হয় না, বরং যেহেতু সেকালের তুলনায় অধুনা সমালোচনা চালু অনেক বেশি, সমালোচনার পদ্ধতিও অনেক বেড়েছে কেননা সমালোচ্য শিল্পের বৈচিত্র্য আজ অনেক বেশি বিস্তৃত ও জটিল, সেজন্য মনে হয় বাংলা সমালোচনায় স্বকীয়তার সমস্যা আজ সেকালের চেয়েও তীক্ষ্নতর। অন্তত এই প্রবন্ধ-লেখকের বিচারে তো বটেই।

কোনো সাহিত্যেই সমালোচনা স্বয়ম্ভূ কর্ম নয়, সমালোচনা নিয়তই সৃজনী সাহিত্যের অনুগামী। ইংরেজিতে যে কর্মৈষণাকে বলা হয়েছে, বলদের আগে গাড়ি জোতা, সে-অপচেষ্টা কেবল হাস্যকরই নয় তার ব্যর্থতাও অবধারিত। সমালোচিতব্য বস্তু হচ্ছে সৃজনী সাহিত্য, সে-বস্তুর অভাবে শেক্‌স্‌পীয়র-নায়ক ওথেলোর মতোই সমালোচকেরও পেশা অদৃশ্য হয়ে যায়। বাংলা সমালোচনায় স্বকীয়তার প্রশ্ন বস্তুত বাংলার সৃজনী সাহিত্যে

স্বকীয়তার প্রশ্নের সঙ্গে অনুলিপ্ত। আমাদের দৃষ্টি আরো প্রসারিত করলে বুঝতে পারব যে শুধু বাংলা সৃজনী সাহিত্যের সঙ্গেই নয়, সমগ্র আধুনিক বাংলা জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে, সমগ্র আধুনিক ভারতীয় জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গেও বাংলা সমালোচনা সমতানে অনুরণিত। ব্যাপক ক্ষেত্রে যে-প্রশ্ন উর্ধ্বশির, যে-চিন্তা কুণ্ডলীকৃত, সমালোচনার সীমিত ক্ষেত্রেও সে-প্রশ্নের সে-চিন্তার প্রভাব, পরন্তু সমালোচনায় মীমাংসিত সত্য বৃহত্তর জীবনেও ধ্রুব। প্রভেদ বর্গের নয়, ঘনতার। সমালোচনার সীমিত ক্ষেত্রে প্রশ্নটি ও চিন্তাটি সংহত, ঘনীভূত, তীব্র। বাংলা সমালোচনায় আমি দু'টি স্বতন্ত্র মনোবৃত্তির প্রকাশ দেখতে পাই, তা'রা আপাত-দৃষ্টিতে অ-সঙ্গত, পরস্পর-বিরোধী, এমনকি পরস্পর-বিনাশী। বাংলা সমালোচনা একদিকে বহির্বিশ্বের সাহিত্যের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার জন্য ব্যগ্র ও প্রসারিতবাহু, সে-সাহিত্যের সঙ্গেই যেন তার নাড়ির যোগ। অপরদিকে যেহেতু ইদানীংকার বাঙালী জাতি বঙ্কিমের সমকালীন বাঙালীর মতো আত্মবিস্মৃত নয়, সেজন্য আজকের বাঙালী স্বীয় ইতিহাস-চেতনার বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্য ও পুনরাবৃত্ত ভাবনাগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আপন সৃষ্টির সাযুজ্যসাধন করতে চায়। এই দ্বিশাখ উদ্দেশ্যের পথ সরল নয়, উভয় শাখায়ই বাহুল্যার্জনিত কদর্যতা ও নির্বুদ্ধিতা সম্ভব। ইওরোপের সাহিত্য, চিন্তা ও জীবনের সংস্পর্শে এসে একদা আমাদের চোখে এতই ধাঁধাঁ লেগেছিল (অনেক ব্যক্তিবিশেষের চোখে, কোনো কোনো সমাজস্তরস্থ নরনারীর চোখে, সে ধাঁধাঁ যেন আজ আরো বেশিরকমে লেগে আছে), আমরা এতই মনে করতাম যে ইওরোপীয়দের তুলনায় আমরা হীন সংস্কৃতির শস্য, যে তখন নির্বিচারে যা কিছু ইও-রোপীয় তা-ই গ্রহণ করার চেষ্টায় ছিলাম। নির্বিচারে মানে কেবল সদসৎ বিচারের অভাব নয়, ইওরোপীয় কোন্ চিন্তা ও প্রথা সর্বকালীন বিচারের, এমনকি ইওরোপীয় বিচারেরই নিকষে অগ্রাহ্য প্রতিপন্ন হতে পারে, তেমন স্বাধীন বিচার আমরা খুবই কম করেছি। উপরন্তু এমন বিচারও করিনি যে ইওরোপের অনেক প্রথা ও চিন্তা সৎ হওয়া সত্ত্বেও ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সমন্বিত হতে পারে কি না। চিকিৎসা-ক্ষেত্রে ব্লাড্ ট্রান্স্ফিউশন্ হ'য়ে থাকে, অপরের রক্ত রোগীর দেহে প্রবিষ্ট করানো যেতে পারে, কিন্তু যে কোনো ব্যক্তির রক্ত নয়, রক্তে রক্তেও সগোত্রতা বিদ্যমান। বাংলা সমালোচকের এই জ্ঞান থাকা একান্ত আবশ্যক: অ-বাঙালী, অ-ভারতীয় সাহিত্যের কোন্ শিল্প-ভাবনা, কোন্ ছাঁদ কোন্ প্রকরণ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-পরম্পরার সঙ্গে সগোত্র অতএব সঙ্গতি-সম্ভব? একদা পরানু-করণের উচ্ছ্বাসে আমরা ভেবেছি বাংলায় একটি স্কট, একটি বায়রন, একটি শেলি খুঁজে পেলেই আমাদের মান বেড়ে যাবে জগৎ-সভায়। পলাশীর যুদ্ধ পড়তে গিয়ে আমরা ভেবেছি চাইল্ড্ হ্যারল্ড্-এর কথা, বৃত্রসংহার পড়ার সময় স্কটের কাব্য স্মরণ করেছি, রঙ্গমতী কাব্য ও লেডি অব্ দি লেক্ পাশাপাশি রেখে পড়েছি, রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' কবিতাটি শেলির 'ওড্ টু দ্য ওয়েস্ট উইন্ড' থেকে নিকৃষ্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি। আমাদের চেতনা নেই যে ইংরেজি গীতিকবিতার সঙ্গে বাংলা গীতিকবিতার রূপগত তুলনা অতীব সাবধানে করা দরকার কেননা দুই ভাষার সঙ্গীতধর্ম প্রচণ্ড রকমে পৃথক, ইওরোপীয় সঙ্গীতে ও ভারতীয় সঙ্গীতে দুস্তর প্রভেদ, সুতরাং 'বর্ষশেষ' এবং শেলির 'ওয়েস্ট উইন্ড' কবিতা দুইটিতে ভাবগত স্থূলে সাদৃশ্য বর্তমান, তবুও ভাবগুলির অবয়বী গড়নে মৌল প্রভেদ। হ্যান্ডেল্এর সঙ্গীত এবং ধ্রুপদাঙ্গ কীর্তন মূলেই আলাদা বস্তু, শোপাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে ঠুংরির তুলনা হয় না যেমন হয়সালা স্থাপত্যের সঙ্গে রীম্স্ ক্যাথিড্রালের

তুলনায় তুলনাকারীর ঔচিত্যবোধের অভাব সূচিত হয়। মহাভারতের মহাকাব্যত্ব ইলিয়ডের আদর্শে মূল্যায়িত হতে পারে না কেননা যদিও দুই গ্রন্থই মহাকাব্য, মহাকাব্যের ধারণা ও রীতি দুই সংস্কৃতিতে পৃথক।

শিল্প-প্রকরণ যেখানে আলোচ্য সেখানে ইওরোপীয় সাহিত্যের নজির দেখাবার পূর্বে বাংলা সমালোচককে অতিশয় সতর্ক হতে হবে। ইংরেজি সাহিত্যে (অথবা অন্য কোনো ইওরোপীয় ভাষার সাহিত্যে) ও বাংলা সাহিত্যে শিল্প-মাধ্যম—অর্থাৎ ভাষা—মূলেই পৃথক। একদা প্রাগৈতিহাসিক বিস্মৃত যুগে ইংরেজি ভাষার ও বাংলা ভাষার আদি জননী ছিল একই ভাষা এমন কথা মেনে নিলেই মানা যাবে না যে আজও দুই ভাষার জ্ঞাতিত্ব নিকট ও সুস্পষ্ট। দুই ভাষার শব্দরূপতত্ত্ব, ধ্বনিতত্ত্ব, বাক্য বন্ধ, শব্দের ও বাক্যের ব্যঞ্জনা, শব্দের ও বাক্যের ঐতিহ্য-বাহিত ভাবানুষঙ্গ, এ-সমস্তে দুরতিক্রম্য ব্যবধান দাঁড়িয়ে গেছে। সত্য বটে গত দেড়শতাধিক বৎসরের নিয়ত সংস্পর্শে বাংলা ভাষার শব্দসম্ভারে, শব্দব্যঞ্জনায় ও এমনকি বাক্যবন্ধেও কিছু ইংরেজিয়ানা প্রবেশ করেছে কিন্তু এই যাবনিকতায় বাংলা ভাষার নবত্বশীল প্রাণশক্তিই সপ্রমাণ হয়, ভাষার মূল রূপের কিছুমাত্র হানি হয়নি। শিল্পের রূপ নির্ভর করে শিল্পের উপকরণের উপরে। বাংলা সাহিত্যের উপকরণ বাংলা ভাষা, সেই ভাষার কুশলতম প্রয়োগে এমন কোনো কোনো শিল্পসিদ্ধিতে পৌঁছনো সম্ভব যা ইংরেজি ভাষার কুশলতম প্রয়োগে সম্ভব নয়। বিপরীত প্রস্তাবও সত্য। তাহলে সদ্বিচারী বাংলা সমালোচক কোনো বাংলা শিল্পবস্তুতে ও ইওরোপীয় শিল্পবস্তুতে বহিরাঙ্গিক সাদৃশ্য দেখেই তুলনায় ও মূল্যায়নে প্রবৃত্ত হবেন না, উপকরণের ও প্রকরণের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তুলনায় প্রবৃত্ত হতে পারেন অথবা বিরতও থাকতে পারেন। এই পরিপ্রেক্ষিত-জ্ঞানে বা জ্ঞানের অভাবেই অধিকারী ও অনধিকারী সমালোচকের প্রভেদ। কোনো আধুনিক সমালোচক ইংরেজি (তথা ইওরোপীয়) প্রথায় বাংলা সাহিত্যের সমালোচনা করতে পারেন—করার প্রচুর সুযোগ ও প্রয়োজন রয়েছে কেননা একদিকে যেমন বাংলা দেশে আমরা গত দীর্ঘকালের মধ্যে শিল্পনির্মিতি সম্বন্ধে শিল্পপ্রকরণ সম্বন্ধে আদৌ কোনো নূতন চিন্তা করিনি, পক্ষান্তরে ইওরোপে গত এক শতকের মধ্যে চিন্তার নবত্ব আশ্চর্য দ্রুততায় এগিয়ে চলেছে—কিন্তু সব সময়েই তাঁকে একটি ধ্রুব মূলনীতি মানতে হবে যে বিদেশী প্রকরণটি বাংলা ভাষায় সাধ্য কিনা। কেবল সাধ্য হলেও চলবে না, tours de force হলে চলবে না, ইংরেজিতে হেক্সামিটারে, আল্‌কেইকে, কাটুল্লুসের হেন্‌ডেকাসিলাবিকে পদ্য রচিত হয়েছে, বাংলাতেও মন্দাক্রান্তা, মালিনী, শার্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের পরীক্ষা হয়েছে, এসবেই tours de force অর্থাৎ নির্মাণ-চাতুর্য লক্ষ্যণীয় বটে কিন্তু শিল্পের সুষম সুনির্মিতি নয়। শিল্পমাধ্যমের স্বধর্ম সম্বন্ধে নিয়ত-চেতনায় বাংলা সমালোচকের স্বকীয়তা প্রমাণিত হবে।

স্বধর্ম-চেতনা শুধু শিল্পমাধ্যমেই প্রযোজ্য নয়, শিল্পের বিষয়বস্তুতে ও শিল্পজ সংবেদনায়ও প্রযোজ্য। এমন মনে করার কোনোই কারণ নেই যে একটি বিষয়বস্তু সম্বন্ধে মাত্র একটি প্রকার অনুভূতিই সঞ্চারিত হতে পারে। বাস্তবিক দেখা গেছে যে আপনার কাছে যা করুণরসাত্মক, আমার কাছে তা' বিরস, আমার কাছে যা শোকাবহ আপনি তা'তে কৌতুক বোধ করেন। ভ্রাম্যমাণ এক ইংরেজ নট-সম্প্রদায় বারো তেরো বৎসর পূর্বে বোম্বাই দিল্লী লাহোর ঘুরে সব জায়গাতেই শেক্‌স্‌পীয়রের ওথেলো নাটক মঞ্চস্থ করে অবশেষে পেশোয়ারে উপস্থিত হয়ে সেই নাটকই মঞ্চস্থ করেন এবং লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হন যে ওথেলো যখন ডেস্‌ডেমোনার শ্বাসরোধ করছে, বলিষ্ঠ পাঠানেরা তখন মহা উল্লাসে করতালি

দিয়ে চলেছে কেননা অওরতের পাতিব্রাত্য সম্বন্ধে যদি স্বামীর সন্দেহ জাগে তাহলে কোনো মরদের পক্ষেই ব্যভিচারিণীর শ্বাসরোধ করা ছাড়া অন্য কোন্ আচরণ সম্ভব? আরেকটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা করুন। গীতার গোড়াতে আমরা জানছি যে কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধোন্মুখ দুই বাহিনী সমবেত হয়েছে, পাণ্ডবপক্ষের প্রধান যোদ্ধা বাহিনী পরিদর্শন করতে গিয়ে চিত্ত-বৈকল্য বোধ করলেন, তাঁর সারথি তখন জন্ম-মৃত্যু অবিনশ্বর আত্মা সম্বন্ধে দীর্ঘ উপদেশ দিলেন। আমার পরিচিত জনৈক ইংরেজ সাহিত্যিক-অধ্যাপকের কাছে শ্রীকৃষ্ণের এই বক্তৃতা অস্বাভাবিক ও অসম্ভব ঠেকেছে। তাঁর মতে সেনাপতির পক্ষে চিত্তবৈকল্য যদি বা সম্ভব, অষ্টাদশ অধ্যায়ব্যাপী বক্তৃতা উপলক্ষে উদ্যত সমরায়োজন বিলম্বিত হওয়া নিতান্তই অসম্ভব। বিদেশী পাঠকের এই যুক্তি অবশ্য রিয়ালিজমের যুক্তি। কিন্তু ভারতীয় পাঠক গীতার প্রাকরণিক মূল্যায়নে এই যুক্তি প্রয়োগ করবেন না। আঠারো অধ্যায় ব্যাপী দার্শনিক উক্তি তাঁর কাছে অস্বাভাবিক মনে হবে না কেননা তিনি জানেন যেখানে স্বয়ং ভগবান বক্তা ও শ্রোতা অসামান্য ব্যক্তি অর্জুন, সেখানে দার্শনিক জ্ঞান সঞ্চার ক্রিয়াটি কালিকলমে বর্ণনা করতে যদিও আঠারো অধ্যায় দরকার হয়েছে, বস্তুত সেই জ্ঞান এক মুহূর্তে, শ্রীকৃষ্ণের নির্বাক এক দৃষ্টিতেই, অর্জুনে সঞ্চারিত হতে পারে। বিদ্যুৎ-উদ্ভাসের মতোই এক পরম-সংহত সুতীব্র আধ্যাত্মিক প্রবাহনে আঠারো অধ্যায়ের দিব্যজ্ঞান শ্রীকৃষ্ণ থেকে অর্জুনে পৌঁছেছে। মহাভারতের দিব্যশক্তিসম্পন্ন নায়কসমূহে যদি প্রত্যয় রাখি তাহলে এই নিমেষ-সংহত জ্ঞানসঞ্চার আদৌ অস্বাভাবিক মনে হবে না। ইওরোপীয় রিয়ালিজমের যুক্তি এহেন ভারতীয় সাহিত্যবস্তুর মূল্যায়নে অসার্থক, একথা জানার মধ্যে ভারতীয় সমালোচকের স্বকীয়তা প্রকাশ পায়।

সমালোচনায় যে-স্বকীয়তার কথা আমি বলছি তার আভাস বাংলা সমালোচনার আদিযুগ থেকেই সহৃদয় লেখকদের মনোভঙ্গীতে প্রকট। বঙ্কিমচন্দ্রের মনস্বী রচনায় স্বকীয়তার সূত্রপাত, রবীন্দ্রনাথে তার ঐশ্বর্য-প্রাপ্তি। এই স্বকীয়তার এক বিঘ্ন ইও-রোপীয় আদর্শের বাহুল্যে, সে কথার আলোচনা করেছি। আরেক বিঘ্ন স্বাদেশিকতার বাহুল্যে। উনিশ শতকে আমাদের স্থবির সমাজপ্রথার উপরে ইওরোপীয় সংস্কৃতির অভিঘাতের সঙ্গে কোনো কোনো বুদ্ধিপন্থী যেমন নির্বিচারে বিদেশীয়ানায় প্রবৃত্ত হলেন, অপরপক্ষে অন্যেরা (সেই একই অভিঘাতের ফলে) আপন ঐতিহ্য-সম্বন্ধে সচেতন হলেন। বাংলা সাহিত্য-রসিক বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসের সঙ্গে আপন সাহিত্যসৃষ্টি ও সাহিত্যপাঠ সংগত করার চেষ্টায় নিযুক্ত হলেন। বাংলা সাহিত্যেরও পূর্বে যে সংস্কৃত সাহিত্যের নিয়ম ও আদর্শ প্রতিষ্ঠিত ছিল, সেসব নিয়ম ও আদর্শ বাংলা প্রমুখ নবীনতর ভাষাগুলির সাহিত্যে কমবেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। এখনকার সাহিত্য-রসিক স্বয়ং ধ্বন্যালোক না পড়ে থাকুন, এমনকি অতুল গুপ্তও না পড়ে থাকুন, হয়তো আনন্দবর্ধন ও অভিনব গুপ্তের নাম শুনে থাকবেন, অন্তত ব্যঞ্জনা-লক্ষণা, বাচ্যার্থ-বক্রোক্তি, ধীরোদাত্ত-ধীরোদ্ধত-ধীরললিত, বিভাব-অনুভাব-ব্যভিচারী ভাব প্রভৃতি অলঙ্কারশাস্ত্রীয় সংজ্ঞাগুলি তাঁর কাছে দূরশ্রুত অস্পষ্ট ধ্বনি হ'তেও পারে। বস্তুত আমি যে উপরে 'সাহিত্য-রসিক' শব্দটির প্রয়োগ করেছি, অসংখ্য আরো লোক করছেন, তা'র মানে এই নয় যে আনন্দবর্ধনের তত্ত্বগুলি আমাদের পক্ষে হস্তামলকবৎ, তা'র মানে শুধু এইটুকু যে 'রস' নামক আলঙ্কারিক সংজ্ঞাটি ঐতিহ্যপ্রভাবে আমাদের চেতনায় প্রবেশ করেছে যেমন কিনা বর্তমান জগতের অধিবাসী হওয়ার দরুন (বুঝি বা না বুঝি) এভলুশন্—রিলেটিভিটি—অ্যালার্জি

—ক্লাস কন্‌শাস্‌নেস্‌ প্রভৃতি কতকগুলি আধুনিক সংজ্ঞার সঙ্গেও আমরা পরিচিত। কাব্যপাঠের পরম্পরায় সাহিত্যাদর্শের যে-ঐতিহ্য আজকের বাঙালী সমালোচকের কাছে পেঁাছেছে, তাতে সংস্কৃত কাব্য ও নাটক যত প্রভাবশালী, ততখানিই সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র। এমন কথাও শুনেছি যে আজকের দিনে ভবভূতি-ভারবি-বাণভট্টের চেয়ে কুন্তক-ভামহ-আনন্দবর্ধনের সঙ্গে রচনাশীল ভারতীয় সাহিত্যিকের আত্মিক সংযোগ অধিকতর ঘনিষ্ঠ ও প্রাণবান। অপরাপর কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় যেমন, বাংলা ভাষায়ও তেমনি, ইদানীং সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের পুনরালোচনা হচ্ছে, কিছু শাস্ত্রিক গ্রন্থের অনুবাদ হচ্ছে. আর বোধহয় তার চেয়েও উল্লেখযোগ্য কথা, বাংলায় লেখা সমালোচনায় ও গ্রন্থসমীক্ষায় সংস্কৃত অলঙ্কারবিচারের কোনো কোনো প্রণালী প্রযুক্ত হচ্ছে। কোনো কোনো বিদ্বান চিন্তা করছেন সংস্কৃত অলঙ্কার, গ্রীকো-রোমান রেটরিক্‌, ইওরোপীয় রোমান্টিক সাহিত্যা-দর্শ, সমসাময়িক ইওরোপের নব্য সমালোচনারীতি, এ-সমস্তের সুমিত সমাহার সম্ভব কিনা। সমাহার যদি লাভ না-ও হয় (কেননা এই সমাহারের প্রশ্ন কেবল সাহিত্যিক সমস্যা নয়, আধুনিক ভারতীয় জীবনেরই সমস্যা, আধুনিক দর্শনের লক্ষ্য), অন্তত সমাহারের প্রয়োজনজ্ঞানে আধুনিক বাংলা সমালোচকের স্বকীয়তা সূচিত হবে। এই সমস্যাচেতনায় তাঁর প্রগতিশীল চিত্তের পরিচয়। পক্ষান্তরে যাঁরা মনে করেন যে বাংলা সাহিত্য সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে যেখানে ইওরোপীয় অভিঘাত কার্যকরী হয়নি, যাঁদের ধারণায় এই অভিঘাত বিস্মৃত হ'য়ে প্রাচীন আদর্শের পুনরুজ্জীবন আমাদের কাম্য, তাঁরা রিভাইভ্যালিস্‌ট্‌। ভারতবর্ষে আজ রিভাইভ্যালিস্‌টের অভাব নেই। যে সমালোচক বাংলা সাহিত্যের আদর্শ ও প্রথা সম্পূর্ণত মধ্যযুগীয় ভারতীয় সাহিত্যচিন্তার লাঙ্গুলে শৃঙ্খলিত রাখতে চান, তাঁর সাহিত্যচিন্তায় সাহিত্যপ্রীতির চেয়ে গতানুগতিক সমাজ-ব্যবস্থায় প্রীতি প্রবলতর হ'তে পারে। উদাহরণস্বরূপে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে তিনজন পুরাতন সমালোচকের উক্তি উদ্ধৃত করছি :

[পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় : 'বঙ্কিমচন্দ্রের ত্রয়ী' :] 'বিলাতের যে আদিরসের romanticism বায়রন হইতে ব্রাউনিং পর্যন্ত ফুটিয়া উঠিয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র তাহার মোহ এড়াইতে পারেন নাই। * * * নানাভাবে অনুশীলন-তত্ত্বটা বুঝাইবার উদ্দেশ্যেই বঙ্কিমচন্দ্র এই তিনখানি উপন্যাস লিখিয়াছিলেন। এ অনুশীলন-তত্ত্বটা কিন্তু খাঁটি ইউ-রোপের সামগ্রী। জর্মন পণ্ডিত ফিক্‌তের (Fichte) 'Individual and Communal Culture' ব্যক্তি এবং সংহতির অনুশীলনটাই তিনি বাঙ্গালার গঙ্গামাটির প্রলেপ দিয়া বাঙ্গালীকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। ভারতবর্ষের যত সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় আছে, আনন্দ-মঠের সন্ন্যাসী-সম্প্রদায় তাহার কোন আদর্শের অনুকূল নহে। ...... আমার অনুমান হয় যে আনন্দমঠের গড়নে নিউম্যানের ভাবের মসালা অনেকটা আছে। ...... আনন্দমঠের সন্ন্যাসীর আদর্শের তলায় বিলাতী পেট্রিয়টিজম্‌ আছে, ইউরোপের outlawry-র মোহন অংশটুকু অঙ্কিত আছে।'

[বীরেশ্বর পাঁড়ে : 'বঙ্কিমচন্দ্র ও হিন্দুর আদর্শ' :] 'বঙ্কিমচন্দ্র খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার প্রকৃতি সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যভাবে গঠিত হইয়াছিল। শেষকালে তাঁহার মত সমস্ত পরিবর্তিত হইলেও, প্রথমে তিনি গোঁড়া পাশ্চাত্যবিষয়ানুরাগী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার কোন কাব্য হিন্দু রীতিনীতি ও হিন্দুভাবের বিরোধী নহে।'

[পূর্ণচন্দ্র বসু : 'সাহিত্যে খুন' :] 'ইংরাজী ট্র্যাজেডির দোষ এক্ষণে বঙ্গ-সাহিত্যে

প্রচুর পরিমাণে গৃহীত হইতেছে। নিজে বঙ্কিমও এই দোষে দূষিত হইয়াছেন। তাঁহার কুন্দনন্দিনীর বিষপান এক্ষণে অনেক গৃহস্থসংসারে কার্যে পরিণত হইতেছে। আত্মহত্যায় যে ঘোর পাপ, এখন সে ঘোর পাপের ভয় আমাদের অনেক স্ত্রীলোকের মন ও কল্পনা হইতে অপসারিত হইয়াছে। তাহাদের ধর্মভীরুতা বিনষ্ট হইতেছে। তাহারা রঙ্গভূমে ম্যাকবেথ দেখিয়া আসিয়া সাহসিনী হইতেছে। ম্যাকবেথের বিষ ছিল কেবল ইংরাজী ভাষায়, এক্ষণকার কুরুচিসম্পন্ন লোকে তাহা বাঙ্গালা ভাষায় আনিয়াছে।'

স্পষ্টতই এসব উক্তিতে সত্যিকার সাহিত্যবোধ আদৌ নেই যদিও সাহিত্যগ্রন্থের উল্লেখ আছে, এবং এসব সাহিত্যালোচনা প্রকৃত পক্ষে সমাজ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্পর্শকাতরতা। ভারতীয় ঐতিহ্যের দোহাই আছে, সে-ঐতিহ্যের অপূর্ব উদারতা, পরিবর্তনশীলতা, বহুগ্রাহিতা সম্বন্ধে না আছে সুষ্ঠু ধারণা, না শ্রদ্ধা। এই দুর্বল ঐতিহ্যম্মন্যতা আজও বাংলা সমালোচনায় অপ্রচুর নয়, বরং ১৯৪৭ সনের পরে থেকে কখনো কখনো তারস্বরী।

বহির্বিশ্ব থেকে শৈল্পিক প্রত্যয় ও প্রথা গ্রহণ করায় কোনো কলঙ্ক নেই। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণযোগ্য :

'নীল নদীর তীর থেকে বর্ষার মেঘ উঠে আসে। কিন্তু যথাসময়ে সে হয় ভারতেই বর্ষা। তাতে ভারতের ময়ূর যদি নেচে ওঠে তবে কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ত স্বাদেশিক যেন তাকে ভর্ৎসনা না করেন; যদি সে না নাচত তবেই বুঝতুম, ময়ূরটা মরেছে বুঝি। এমন মরুভূমি আছে যে সেই মেঘকে তিরস্কার করে' আপন সীমানা থেকে বার করে' দিয়েছে। সে মরু থাক আপন বিশুদ্ধ শুচিতা নিয়ে একেবারে শুভ্র আকারে। তার উপরে রসের বিধাতা শাপ দিয়ে রেখেছেন, সে কোনোদিন প্রাণবান হয়ে উঠবে না। বাংলা দেশেই এমন মন্তব্য শুনতে হয়েছে যে দাশু রায়ের পাঁচালি শ্রেষ্ঠ যেহেতু তা বিশুদ্ধ স্বাদেশিক। এটা অন্ধ অভিমানের কথা।'

রবীন্দ্রনাথের উক্তিটি বাংলা সমালোচকের বীজমন্ত্র হওয়া উচিত। কোন্ বিষয় বা মনোভঙ্গী শিল্পীর অন্তরস্থ, কোন্‌টিই বা বহিরঙ্গ, তা'র নির্ণয় হবে সেই বিষয়ের বা মনোভঙ্গীর উৎপত্তিস্থল বিচারে নয়, তা'র শিল্পাবেগসঞ্চার ক্ষমতায়। 'দ্য প্রুফ্ অব্ দ্য পুডিং ইজ্ ইন্ দ্য ইটিং', স্বাদেই বিচার, রসসঞ্চার ক্ষমতায় রসবস্তুর সত্যতা সপ্রমাণ। বাংলার সাহিত্যিক ইতিহাসে এমন অনেক সাহিত্যিক ঘটনা ঘটেছে যার মূল আদিতে দেশজ ছিল না, ক্রমে পুরোদস্তুর বঙ্গীয় হয়েছে। এই আত্মীকরণের শক্তিতে, নিত্য নব-রূপায়ণের সার্বলীল ভঙ্গিমায়, যে কোনো ভাষার ও সাহিত্যের অগ্রগতি। যে-সাহিত্য ঐতিহ্যের নামে স্থিতবেগ, সে-সাহিত্য মৃত অথবা মরণোন্মুখ। এ-প্রসঙ্গে টি. এস্. এলিয়টের সুপরিচিত অভিমত স্মরণযোগ্য :

If the only form of tradition, of handing down, consisted in following the ways of the immediate generation before us in a blind or timid adherence to its successes, 'tradition' should positively be discourage. We have seen many such simple currents soon lost in the sand; and novelty is better than repetition. Tradition is a matter of much wider significance. It cannot be inherited, and if you want it you must obtain it by great lobour. It involves, in the first place, the historical sense, which we may call nearly indispensable to any one who would continue

to be a poet beyond his twenty-fifth year; and the historical sense involves a perception, not only of the pastness of the past, but of its presence. [যদি ঐতিহ্যের একমাত্র রূপের, অর্থাৎ এক পুরুষ থেকে অন্য পুরুষে হস্তান্তরের মানে হয় পূর্বপুরুষের রীতিনীতির অন্ধ অনুসরণ অথবা শঙ্কিত অনুগমন, তাহলে নিশ্চয় এহেন ঐতিহ্যের আস্কারা দেওয়া উচিত হবে না। অনেক সরল স্রোতস্বিনী বালুকায় পথ হারিয়েছে। পুনরাবৃত্তির চেয়ে নূতনত্ব ভালো। ঐতিহ্যের আসল মানে অতিশয় ব্যাপক। ঐতিহ্য উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ হয় না। যদি ঐতিহ্য লাভ করতে চাও তাহলে বহু পরিশ্রমে লাভ করতে হবে। এর সঙ্গে জড়িত সেই কালক্রমধারণা যে-ধারণা প্রায় সকল পঁচিশ বর্ষোত্তীর্ণ কবিযশঃপ্রার্থীর পক্ষে একান্ত প্রয়োজন। আর এই কালক্রমধারণায় অনুভূত হয় যে অতীত কেবল বিগত কালেই সমাপ্ত নয়, বর্তমান কালের সঙ্গেও অনুলিপ্ত।]

একদিকে ইতিহাস-চেতনা, ঐতিহ্যেষণা, অন্যদিকে বহির্বিশ্বের আহ্বান, এই দুইয়ের কেন্দ্রাতিগ আকর্ষণ, ঘর ও বাইরের দুমুখো টান, বাংলা সমালোচনায় প্রথম থেকেই আমাদের সাহিত্যচিন্তায় প্রবল। এরি মধ্যে, সংকীর্ণ অর্থে, বাংলা সমালোচনায় স্বকীয় সুর বেজেছে। বাংলা সমালোচনায় প্রথমাবধি সাহিত্যের অভিধায় সংস্কৃত ব্যঞ্জনা। সাহিত্যের মূল্য একক উপভোগে নয়, অপরের সহিত উপভোগে, অর্থাৎ সাহিত্যকর্মে ও সাহিত্যের মূল্যে মানব-সমষ্টিই কেন্দ্র। এই সাহিত্যে সত্যশিবসুন্দরের যোগ আছে, যদিও সত্য, শিব, সুন্দর এই তিনটি কথার প্রয়োগেই অনেক ঝাপসা চিন্তা, গতানুগতিক নির্মনা প্রত্যয় নিহিত এবং সে কারণেই সত্য শিব ও সুন্দরের পারস্পরিক সম্পর্কও অস্পষ্ট। তবু বোঝা যায় যে সাহিত্যের উপভোগে কল্যাণবোধ ও সত্যনিষ্ঠা বড়ো উপকরণ। বাংলা সমালোচনায়—সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রভাবেই—কবির চেয়ে কাব্যকে বড়ো মানা হয়েছে। আধুনিক ইওরোপীয় চিন্তায় কাব্যের পরম গুণ নৈর্ব্যক্তিকতা, সমালোচনার মহৎ লক্ষ্য কবির চেয়ে কাব্যে চিত্ত নিযুক্ত করা, আর এই চিন্তা ও এই লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথের কাব্যে ও সাহিত্যালোচনায় পুনঃপুনঃ কথিত হয়েছে, অলঙ্কার-শাস্ত্রেও এই মনোভঙ্গীই জয়যুক্ত। এই সঙ্গে আরো দেখতে পাই, বহু শতাব্দীর আলোচনার পরে আজ ইওরোপীয় নন্দনতত্ত্বে রসবোধকে বড়ো মানা হচ্ছে, কাব্যপাঠকের (অথবা কাব্যশ্রোতার) চিত্তে যে সংবেদনার উদ্ভব হয় তদ্বিষয়ে অনুসন্ধান (রিচার্ড্স্, এম্প্সন্ প্রমুখ তাত্ত্বিকের আলোচনা স্মর্তব্য) করা হচ্ছে, অর্থাৎ রসবোধকে মনোবিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। রসবেত্তার দিকে প্রধান লক্ষ্য ছিল অলঙ্কার-শাস্ত্রীরও, যদিও সেকালকার মনোবিজ্ঞান ছিল অনেক বিষয়েই অসম্পূর্ণ।

এ সকল মূল চিন্তাধারায় বাংলা সমালোচনার স্বকীয়তা নিঃসংশয়। এসব চিন্তাধারা ঐতিহ্যসম্মত, আবার বাংলা সমালোচকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-সঞ্জাত। এই চিন্তাধারা যে সংকীর্ণ অর্থে স্থানকাল শাসিত নয়, এদের মধ্যে শাশ্বত সত্য নিহিত, তার প্রমাণ এই চিন্তাধারার সঙ্গে সমকালীন ইওরোপীয় চিন্তাধারার নিষ্প্রয়াস তুল্যতায়। আসলে বাংলা সমালোচনার স্বকীয়তা আত্মসমর্পণের পথে নয়, অবরোধের পথেও নয়; ধর্মান্তরে নয়, শিলীভূত সংস্কার-বন্দনেও নয়; বাঁধন-ছেঁড়া অগ্রগমনে নয়, রোমন্থনরত স্থবিরতায় নয়। এই সংতুলিত মধ্যপন্থাই বাংলা স্বকীয় সমালোচনার পথ।

বাংলা রূপকনাট্যের উত্তরে আইরিশ প্রহসন

নরেশ গুহ

বিশশতকী ইউরোপের কবি উইলিয়ম বাট্‌লার ইয়েট্‌স্‌-এর সঙ্গে প্রাচীন এবং অর্বাচীন দুই ভারতীয় ঐতিহ্যের কোনো যোগাযোগ আছে কিনা, এবং থাকলে তাঁর কবিসত্তার আভ্যুদয়িকে উক্ত ঐতিহ্যের জিজ্ঞাসা কতদূর ফলপ্রসূ হয়েছিল তার উত্তরে কবির জীবনীকারেরা একবাক্যে প্রশ্নটিকেই ধূলিসাৎ করে দেবার পক্ষপাতী। অথচ তাঁর রচনা-শক্তির উদ্‌গমকালে মোহিনী চ্যাটার্জি, মধ্যবয়সে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, এবং আয়ুর অপরূপ শেষ দশকে পুরোহিত স্বামী নামক ভারতীয় সাধুর সঙ্গ উল্লেখ না-করেও উপায় নেই। এবং এই তিনের মধ্যে একমাত্র যাঁর প্রতি ঈষৎ মনোযোগ দেওয়া হয়ে থাকে তিনি ঐ প্রথমোক্ত বৈদান্তিক ব্রাহ্মণ যাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে আধশতকেরও বেশী পেরিয়ে এসে লেখা একটি আশ্চর্য কবিতায় তাঁর নামকে ইয়েট্‌স্‌ অমর করেছেন। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে ইংরেজি গীতাঞ্জলির বিখ্যাত ভূমিকা রচনার অনতিকাল পরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছিল, অর্থাৎ কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের প্রতি এরিন্‌ প্রেমের উষ্ণতা আচম্বিতে হ্রাস পেয়েছিল। প্রকাশিত চিঠিপত্রে উল্লেখের ধরণ দেখেও কিছুমাত্র উল্লসিত হওয়ার কারণ নেই। এবং রবীন্দ্রনাথের সপ্ততিতম জন্মদিন উপলক্ষে প্রকাশিত সোনালিগ্রন্থের পাতাতেও সোৎসাহে, স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে তিনি অভিনন্দন পাঠাননি। কবির তুলনায় কবিভক্তদের প্রতিই তাঁর রোষ কিঞ্চিৎ অধিক পরিমাণে নির্গত হয়ে থাকবে, যেমন হয়েছিল বর্নার্ড শ'র বেলায়। কিন্তু সবসত্ত্বেও বাঙালী মহাকবির তির্যক প্রভাব তাঁর শেষ বয়স পর্যন্ত রচনা-কর্মে নিবিড়ভাবে উপস্থিত।

অনুবাদে রবীন্দ্রনাথের যেটুকু রচনা তিনি পাঠ করেছিলেন তা থেকে তাঁর কবিতায় অনুমিত ঈশ্বরাধিক্য ইয়েট্‌স্‌কে প্রীত করেনি। রাণাডে রচিত উপনিষদের দর্শন বিষয়ক গ্রন্থটি উপহার নিয়ে অধ্যাপক অবিনাশচন্দ্র বসু যখন শেষ জীবনে আইরিশ কবিদর্শনে যান তখন ইয়েট্‌স্‌ তাঁকে বুঝিয়ে বলেছিলেন ভারতীয় কবির সঙ্গে তাঁর প্রভেদ ঠিক কোথায়। উপনিষদের প্রতি আনুগত্য উভয়েরই প্রবল। কিন্তু ইয়েট্‌স্‌-এর মনে হয়েছিল যে রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বিশ্বসৃষ্টির অন্তর্গত মৌলদ্বন্দ্বের চেতনা, দ্বন্দ্বাতীত সমাহিত শান্তিবোধের তলায় চাপা পড়েছে। নাটকীয় ভঙ্গীতে খাপ খুলে সাটো-র প্রাচীন তরবারি হাতে দাঁড়িয়ে আধুনিক ভারতবর্ষের প্রতি যে বাণী তিনি পাঠিয়েছিলেন—'দ্বন্দ্ব চাই, আরো দ্বন্দ্ব চাই',—তার থেকে কেউ যদি অনুমান ক'রে থাকেন যে দাঙ্গা বাঁধিয়ে লাঠালাঠি করানোই ছিল তাঁর কাম্য তাহ'লে হেন লোকের পক্ষে ইয়েট্‌স্‌-এর রচনাবলীর দরজায় নাক না গলানোই ভাল।

আসলে ভারতীয় ঐতিহ্যের বিশ্লেষণে রবীন্দ্রনাথের তুলনায় রাণাডের সঙ্গে ইয়েট্‌স্‌-এর মিল ছিল বেশি। এবং ভারতবর্ষে বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তার ক্রমপরিণতির সঙ্গে তার ইতিহাসের বিবর্তন বিষয়েও তাঁদের প্রত্যয় ছিল অভিন্ন। অন্বয়ী আত্মনির্ভর ব্যতীত বীর্যের সাধনা সার্থক হয় না বটে, কিন্তু বীর্যবানের পক্ষে ঐহিক জীবনভোগের প্রতি যতদূর মনোযোগ দেওয়া আবশ্যক শান্তম্‌-শিবম্‌-অদ্বৈতম্‌-এর প্রতি প্রাণমনকে অত্যাধিক

ধাবিত করলে তা আর সম্ভবপর থাকে না। কাজেই রাণাডের ন্যায় ইয়েট্‌স্‌-এরও ধারণা জন্মেছিল যে উপনিষদিক চিন্তার বিকাশ এবং পরে বৌদ্ধ মতের প্রসারের ফলেই প্রাচীন ভারতবর্ষ থেকে বীর্যসাধনার ধারা একদা লোপ পেয়েছিল। এবং ইয়েট্‌স্‌ যেহেতু আইরিশ ভগ্নপুরাণের পুনরুদ্ধার এবং স্বীয় রচনায় তার প্রতীকী প্রয়োগের সাহায্যে বীর্যাভিলাষী যুগের স্বপ্ন রচনায় সমধিক উৎসাহী ছিলেন কাজেই ইংরেজি ভাষায় "সাধনা" গ্রন্থের লেখককে প্রতিপক্ষ হিসেবে গণ্য করতে তাঁর বাধেনি, কেননা উক্ত লেখক নিজেকে বুদ্ধের আদর্শে অনুপ্রাণিত বলে প্রচার তো করেইছিলেন, উপরন্তু অতিরিক্ত স্বকর্মনির্ভরজ্ঞানে গ্রীক-যুগ থেকে সুরু করে আবহমানকালের প্রতীচ্য সভ্যতাকে তিনি একবাক্যে নামঞ্জুর ভেবেছিলেন। আমরা যারা বাংলা পড়তে পারি, আমাদের কাছে রবীন্দ্রনাথের এই চেহারা খুবই অচেনা ঠেকবে সন্দেহ নেই। কিন্তু ইয়েট্‌স্‌ বাংলাভাষা জানতেন না বলে প্রচলিত অনুবাদ গ্রন্থাদিই ছিল তাঁর সম্বল। ইংরেজি ভাষায় লভ্য রবীন্দ্রনাথ যে বাঙালী কবির ভগ্নাংশ মাত্র তা এখন আর কারো অবিদিত নেই, তথাপি ইংরেজি "সাধনা" গ্রন্থের লেখককে বিদেশী পাঠক ভুল বুঝলে তা নিয়ে খুব রাগ করাও সাজে না।

আমার বিশ্বাস রবীন্দ্রনাথে ইয়েট্‌স্‌-এর আগ্রহ নিস্তাপ হ'তে শুরু করে সেদিন থেকেই যেদিন অক্সফোর্ড প্রবাসী বাঙালী যুবক ক্ষিতীশ সেনের করা "রাজা" নাটকের অনুবাদ "দি কিং অব্‌ দি ডর্ক চেম্বার" ওদেশে প্রকাশিত হ'ল। লণ্ডনের লিট্‌ল্‌ থিয়েটরে ইয়েট্‌স্‌-এর প্রধান উৎসাহেই ভাষান্তরিত এই রূপক নাট্যের প্রথম অভিনয় হয়েছিল। কিন্তু যদিও প্রায় একই সময়ে তাঁর বোনের কুয়ালা-প্রেস থেকে "ডাকঘরের" অনুবাদ ছাপা হোলো, এবং ডাবলিনের অ্যাবি থিয়েটরে সেই নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে ইয়েট্‌স্‌ রবীন্দ্রনাথকে উৎসাহভরা চিঠিও লিখলেন, তবু "রাজা" নাটক বিষয়ে তিনি নীরব। সেই সঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে ১৯১৩ সাল থেকেই পাশ্চাত্যদেশে ভারতীয় তান্ত্রিক গ্রন্থাদির আর্থার আভালন্‌ কৃত অনুবাদ প্রথম ছাপা হ'তে শুরু করে। সেই সব গ্রন্থের আদি পাঠকদের মধ্যে ইয়েট্‌স্‌ অগ্রগণ্য, সেবিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। ইয়েট্‌স্‌-পত্নী ১৯৬২ সালে নিজে আমাকে বলেছিলেন যে ১৯১৭ সালে তাঁদের বিবাহেরও অনেক আগে থাকতেই ডব্লু. বি. সে শাস্ত্রের চর্চা করেছেন। উপনিষদের বিমূর্ত চিন্তার তুলনায় তন্ত্রোক্ত বীর্য-সাধনার প্রতি তখন থেকেই যে ইয়েট্‌স্‌-এর পক্ষপাত দেখা দিয়েছিল সে কথার সবচাইতে বড় প্রমাণ তাঁর তৎকালীন কবিতাবলী—যেখানে রূপক হিসেবে প্রত্যক্ষ যৌন প্রসঙ্গের তিনি প্রথম অবতারণা করলেন। উপনিষদেরও সেই সব অংশের প্রতি ইয়েট্‌স্‌ সবিশেষ উৎসাহ বোধ করতেন যেখানে তাঁর নিজের অনুমিত বীর্যবান ক্ষাত্র সভ্যতার আদর্শ স্বীকৃতি পেয়েছে। "এ ভিশান্‌" নামক বহু আলোচিত এবং অনেকাংশে দুর্ভেদ্য ব্যক্তিগত দর্শনের গ্রন্থে একাধিকবার তিনি এ প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদের ক্ষত্রিয় ঋষি জনক, কিংবা অজাতশত্রু তাই তাঁর কাছে প্রিয় চরিত্র। কেননা বাগ্মী ব্রাহ্মণ গার্গ্যের ন্যায় একমাত্র পরাব্রহ্মের প্রতি সমস্ত অভিপ্রায়কে ধাবিত করাতে এঁদের সায় নেই। ক্ষত্রিয় বীর তাঁরা, রাজ্য থেকে অনাহার, অশিক্ষা দূর করার, এবং বহিঃশত্রুকে পরাভূত করার সমূহ দায়িত্ব তাঁদেরই হাতে। যে-পুরুষ আদিত্যমণ্ডলে, চন্দ্রে, বিদ্যুতে, আকাশে, বায়ুতে, অগ্নিতে, জলে, দর্পণে, ধাবমান ব্যক্তির পশ্চাতে উৎপাদিত শব্দ মধ্যে, সকলদিকে ছায়াময় হ'য়ে বিরাজমান সেই ব্রহ্মের প্রসঙ্গে অজাতশত্রু অসহিষ্ণু না হ'য়ে পারেন না : এতস্মিন্‌ মা মা সংবদিষ্ঠাঃ। সেই পুরুষই ক্ষত্রিয় ঋষির উপাস্য যিনি জ্যোতিষ্মান্‌, তেজস্বী, অদম্য,

জিষ্ণু, অন্যতম্ত্যজায়ী, আত্মন্বী এবং সহিষ্ণু; যাঁর যজ্ঞে প্রতিদিন অবিরল সোমরস নিষ্কাষিত হয়; যিনি অবিজিত সৈন্যস্বরূপ; যাঁকে উপাসনা করলে তেজস্বী সন্তানের জন্ম হয়, ইহলোক থেকে প্রজাবংশ লোপ পায় না, শত্রুকে দমন করা যায়, উত্তম ভৃত্যাদির দ্বারা পরিবৃত থাকার সৌভাগ্য আসে, এবং আয়ুষ্কাল পূর্ণ না হ'লে মৃত্যু স্পর্শ করে না। বাগ্মী গার্গ্য অবশেষে ক্ষত্রিয় ঋষির সম্মুখে হার মেনেছিলেন।

ইয়েট্‌স্‌-এর কাছে রবীন্দ্রনাথ ক্রমশঃ তাই উপনিষদের বিমূর্ত চিন্তার প্রতীক হিসেবে প্রতিভাত হলেন। এবং ১৯১৩ সালে প্রকাশিত তন্ত্র, আর তার পরের বছর হার্ভার্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত পাতঞ্জল যোগশাস্ত্রের সঙ্গে পরিচয়ের ফলে ঔপনিষদ সংস্কৃতির সমান্তরালে প্রবহমান অন্য এক ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি দিনে দিনে তাঁর শ্রদ্ধা বেড়ে উঠল। রবীন্দ্রনাথের প্রতি উৎসাহে আপাতত ভাঁটা পড়লেও বাঙালী কবিকে তিনি যে ভুলতে পারেননি তা অবশ্য একাধিক কবিতায় রবীন্দ্রনাথের প্রচ্ছন্ন উল্লেখ থেকেই ধরা যায়। মড্‌ গন্‌-এর ন্যায় তাঁর কন্যা ইসোল্টকেও প্রেম নিবেদন করেছিলেন ইয়েট্‌স্‌, এবং একই ভাবে প্রত্যাখ্যান পেয়েছিলেন। ইসোল্ট যেহেতু এককালে রবীন্দ্রনাথে মজেছিলেন, বাংলা শিখতে উদ্যোগী হয়েছিলেন একমাত্র ঠাকুর কবিকে মূল ভাষায় পড়বেন বলে, এবং "দি গার্ডনার" গ্রন্থের জন্য এক আধটি অনুবাদেও হাত দিয়েছিলেন, কাজেই আশাভঙ্গের বেদনা জানিয়ে লেখা 'ওয়েন্‌ আহার্নে অ্যান্ড হিজ্‌ ডান্সার্স্‌' (১৯১৭) কবিতায় ইয়েট্‌স্‌ অতি কৌশলে ঠাকুরকবির প্রসঙ্গ না এনে পারেননি, এবং "দি গার্ডনার" গ্রন্থেরই একটি কবিতা থেকে দুটি পংক্তি ঈষৎ বদল করে নিজের কবিতায় জুড়ে দিয়েছেন :

> 'Let the cage bird and the cage bird mate and the wild bird
> mate in the wild.'

মূল কবিতায় সঙ্গমের কথা ছিল না, সাক্ষাতের কথা ছিল, ইংরেজিতে যে শব্দ দুটির একই উচ্চারণ! রবীন্দ্রনাথের 'দুই পাখি' কবিতার সঙ্গে উপনিষদের দুই পাখির যোগাযোগ বিষয়ে যাঁরা অবহিত আছেন তাঁরাই বুঝতে পারবেন যে ইয়েট্‌স্‌-এর কবিতায় রবীন্দ্রনাথ এবং উপনিষদ দুই প্রসঙ্গেরই উল্লেখ হয়েছে। এছাড়া ১৯২২ সালে লেখা এবং পরে আংশিকভাবে বর্জিত 'দি হেরো, দি গার্ল, অ্যান্ড দি ফুল্‌' কবিতাতেও ইয়েট্‌স্‌ আবার একবার রবীন্দ্রনাথে ফিরেছিলেন। পূর্ণাঙ্গ সংস্করণে ছাপা এই কবিতাটি পড়লে কারো সন্দেহ থাকবে না যে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি "চিত্রা" নাটকের বক্তব্যকে অস্বীকার করার ইচ্ছাই কবিতাটির প্রেরণা। "চিত্রা"র উত্তরে ইয়েট্‌স্‌ বলবেন : 'only God has loved us for ourselves', এবং আমরা যেহেতু ঈশ্বর নই, বিদেহী নই, কাজেই দেহকে আমরা সমাদর না-করে পারি না। যে চিত্রাঙ্গদা নাটককে একদা বাংলাদেশের কোনো কোনো মনীষী অশ্লীল জ্ঞান করেছিলেন, ইয়েট্‌স্‌ তাকে যদি বড় বেশি পবিত্র বলে ভেবে থাকেন তার কারণ তিনি বাংলা চিত্রাঙ্গদা পড়েননি, পড়েছিলেন রূপান্তরিত "চিত্রা" যেখানে যবনভাষিণী চিত্রাঙ্গদা অর্জুনকে বলেন :

> 'Whom do you seek in these dark eyes, in these milk-white arms ? . . . Not my true self, I know.' Surely this cannot be love, this is not man's highest homage to woman. Alas, that this frail disguise, the body, should make one blind to the light of the deathless spirit ! . . .'

'ফর্‌ অ্যান্‌ গ্রেগরি' নামের কবিতাতেও ইয়েট্‌স্‌ একথারই প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন বলে আমার বিশ্বাস :

> . . . only God, my dear,
> Could love you for yourself alone
> And not your yellow hair.

এ কবিতার রচনাকাল ১৯৩০।

ইয়েট্‌স্‌ তাঁকে বিসদৃশ আদর্শের প্রতীক হিসেবে আজীবন মনে রেখেছেন একথা রবীন্দ্রনাথ জানতেন বলে মনে হয় না, কেননা ১৯১২ সালের সেই তপ্ত অনুরাগের যুগেও তিনি আইরিশ কবির কবিতাবলী একবারের জন্য পড়ে দেখারও উৎসাহ পাননি। বরং ইয়েট্‌স্‌ যখন গীতাঞ্জলির স্মরণীয় ভূমিকা রচনার জন্য নর্মাণ্ডির নির্জনবাসী, ঠিক তখনই "প্রবাসী" পত্রিকার জন্য ইয়েট্‌স্‌-এর উপরে মোটামুটি ফরমায়েসী যে প্রবন্ধটি তিনি তৈরি করেছিলেন তা কবিতা প'ড়ে লেখা নয়, প্রধানতই কবিতা সম্পর্কিত লেখা প'ড়ে লেখা। এমন কি তাতে জর্জ মুরের গ্রন্থ উল্লেখ করতেও ভোলেননি, যে মুরের সঙ্গে ইয়েট্‌স্‌-এর ব্যক্তিগত বিসম্বাদ সর্ববিদিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ নিজে ইয়েট্‌স্‌-এর কবিতা পড়বার সময় না পেলেও, আমার ধারণা, ইয়েট্‌স্‌ই তাঁকে পাণ্ডুলিপি থেকে নিজের কিছু কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলেন। তার মধ্যে বিশেষ ক'রে একটি কবিতা রবীন্দ্রনাথের মনে ধরেছিল বলে মনে হয়। এবং হয়তো ১৯১২ সালে লেখা 'এ কোট' নামের এই উজ্জ্বল কবিতাটিই ইয়েট্‌স্‌ প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধে ঈষৎ ভিন্নভাবে ব্যবহার করেছেন : 'সংসারের রণক্ষেত্রে লড়াই করা যাহার ব্যবসায় তাহাকে কবজ পরিতে হয়; তাহাকে সংসারের সমস্ত আবরণ আচ্ছাদন গ্রহণ করিতে হয়; নহিলে, পদে পদে চারিদিক হইতে তাহাকে আঘাত লাগে। কিন্তু, আপনাকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা যাহার কাজ, আবরণের অভাবই তাহার যথার্থ সজ্জা। কবি ইয়েট্‌সের সঙ্গে আলাপ করিয়া আমার ঐ কথাই মনে হইতেছিল।' রবীন্দ্রনাথের এ অংশটি আমি যে কবিতার প্রতিধ্বনি বলে মনে করি ইয়েট্‌স্‌-এর সেই কবিতাটি হচ্ছে এই :

> I made my song a coat
> Covered with embroideries
> Out of old mythologies
> From heel to throat;
> But the fools caught it,
> Wore it in the world's eyes
> As though they'd wrought it,
> Song, let them take it,
> For there's more enterprise
> In walking naked.

এ কবিতা রবীন্দ্রনাথ পাণ্ডুলিপি অবস্থাতেই পড়েছিলেন বলে মনে হয়, কেননা ১৯১২ সালে লেখা হ'লেও কবিতাটি প্রথম ছাপা হয় ১৯১৪ সালের মে মাসে শিকাগোর "পোইট্রি" কাগজে, রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি অনুবাদ প্রথম যে-পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। গদ্যেকৃত সারমর্মটি এইজন্য উল্লেখযোগ্য যে ইয়েট্‌স্‌-এর আর কোনো কবিতার প্রসঙ্গ

রবীন্দ্রনাথে খুব সম্ভব নেই। এতৎসত্ত্বেও ইয়েট্স্‌কে রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি, কেননা যে-স্বাদেশিকতার বেদনা থেকে এরিন্‌ চিত্তের স্বাতন্ত্র্যের প্রথম প্রকাশ তার মধ্যে 'স্বভাবতই বিস্তর ফেনিলতা' দেখা দিয়েছিল, এবং এই বেদনার ফলে দেশের ঐতিহ্যের দিকে যখন দৃষ্টি পড়ে, যেমন ইয়েট্স্‌-এর পড়েছিল, তখন প্রবল অহংকার বশে 'সাঁচ্চার সঙ্গে ঝুটাকে' আমরা সমান মূল্যে দিয়ে বসি ব'লে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাস। ইয়েট্স্‌, তা তাঁর কাব্যসৃষ্টির কারণে হলেও, ভূতপ্রেত দিব্যযোনিতে উৎসাহী ছিলেন, একদা থিয়োসফির ভক্ত ছিলেন, এবং লন্ডনের বেপাড়ায় দাসদাসী সমাদৃত ভূতনামানো বৈঠকে যাতায়াত করতেন বলে, রবীন্দ্র-নাথের পক্ষে তাঁকে বেশি গ্রাহ্য করা সম্ভব ছিল না। ঐতিহ্যের মধ্যে কতটা সাঁচ্চা কতটা ঝুটা তা নিয়েই দুই কবির মূল বিরোধ।

এই বিরোধ হয়তো অনুচ্চারিতই থাকতো, যদি না কবির সপ্ততিতম জন্মদিনের অভিনন্দন উপলক্ষে একটি সোনালিগ্রন্থ প্রকাশের আয়োজন হোতো বাংলাদেশে যাতে রবীন্দ্রনাথ বিষয়ে নতুন ভাবনার প্রয়োজন হ'তো ইয়েট্স্‌-এর, এবং যদি না স্টার্জ মুরের সুপারিশে পুরোহিত স্বামী নামক কবিযশোপ্রার্থী এক ভারতীয় যোগীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটতো। উক্ত যোগিসান্নিধ্যের ফলে ইয়েট্স্‌ ভারতীয় যোগশাস্ত্রাদি বিষয়ে কতিপয় দীর্ঘ এবং উৎকৃষ্ট সাহিত্যিক প্রবন্ধই শুধু লেখেননি, স্বোপার্জিত কড়িতে দেনা শোধ দেবার ইচ্ছে নিয়ে উজ্জ্বল কবিতা রচনার ভাষাতে উপনিষদেরও অনুবাদ করেছেন, এবং অবশেষে এমন একটি অর্থগভীর ট্রাজিক প্রহসন লিখেছেন যার মধ্যে "রাজা" নাটক অর্থাৎ "দি কিং অফ্‌ দি ডর্ক চেম্বার"-এর রূপান্তরিত প্রতিবিম্ব দেখার জন্য বিশেষ পরিশ্রম করতে হয় না। মৃত্যুর এক বছর আগে পরিসমাপ্ত "দি হার্নস্‌ এগ্‌" নামের এই 'অদ্ভুত, উদ্দাম' রাব্‌লেশিয় প্রহসনটির বেপরোয়া উদ্দামতা পাছে আবার তাঁর বৃদ্ধবয়সে ডাবলিন শহরে একটা দাঙ্গাহাঙ্গামার সূত্রপাত করে সেই আশঙ্কা ক'রেই শেষ পর্যন্ত এমন কি নিজের প্রতিষ্ঠিত অ্যাবি থিয়েটরেও সে নাটকের অভিনয় তিনি আর করাননি।

প্রতীচীর মহাকবিকে যিনি এতদূর পর্যন্ত মাতিয়েছিলেন, শ্রীপুরোহিত স্বামী নামক সেই ভারতীয় যোগীটির নাম পর্যন্ত আমরা এদেশে শুনেছি ব'লে মনে পড়ে না। বলা-বাহুল্য তিনি রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, কৃষ্ণমূর্তি, শ্রীঅরবিন্দ, এমন কি দয়ানন্দ সরস্বতীর মতোও বিখ্যাত নন। ইয়েট্স্‌ অবশ্য নিজে তাঁকে খুঁজে বার করেননি। ঘটক ছিলেন স্টার্জ মুর। যৌগিক সাধনাতে সুষুপ্তিসিদ্ধি হয়েছিল বলে যোগীটি যে দাবী করতেন তার সত্যতা নির্ধারণে সাহিত্য পাঠকের কোনো দায় নেই। কিন্তু একথা স্বীকার করলেও দোষ হবে না যে ইয়েট্স্‌-পুরোহিতের সংসর্গ একমাত্র অ্যালেন্‌ পো-বোদলেয়ারের ঐতিহাসিক সংসর্গের সঙ্গেই তুলনীয়। পো-র অনুবাদ থেকেই প্রতীকী কবিতার নিগূঢ় মন্ত্রণা আবিষ্কার করেছিলেন বোদলেয়ার; শ্রীপুরোহিতের পরামর্শ থেকে ঐতিহ্য জিজ্ঞাসার আত্মকৃত মীমাংসা বিষয়ে সমর্থন খুঁজে নিয়েছিলেন ইয়েট্স্‌।

সংসারাশ্রমে শ্রীপুরোহিত ছিলেন মারাঠী ব্রাহ্মণের সন্তান। ১৮৮২ সালে বেরারে তাঁর জন্ম হয়, এবং ১৯০৩ সালে, তখনকার দিনের কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বি.এ. পাশ করেন। তাঁর শিক্ষকদের মধ্যে প্রায় সবাই ছিলেন বাঙালী। কম বয়স থেকেই যোগসাধনার দিকে এই ব্রাহ্মণ বালকের মন গিয়েছিল। তারপর তীর্থপরিক্রমা শেষ করে সংসারত্যাগে উদ্যত হলে তাঁর গুরু ভগবান শ্রীহংস তাঁকে কিছুকালের জন্য সংসারাশ্রমে ফিরে পাঠিয়েছিলেন যাতে তাঁর অন্তর থেকে বাসনার আগুন একেবারে নিভে যায়। গৃহস্থ

জীবনে তিনি বিবাহ করেন, একটি কন্যার পিতা হন, এবং শেষ পর্যন্ত স্ত্রীর সম্মতি নিয়েই পাকাপাকিভাবে সংসার ত্যাগ করেন। শুধু ধ্যানধারণা এবং অলৌকিক ঘটনাদি প্রত্যক্ষ করেই যে তিনি কাল কাটিয়েছেন তা নয়; মারাঠী, হিন্দী, উর্দু, এমন কি ইংরেজি ভাষাতেও তিনি মরমী কাব্যরচনার প্রয়াস করেছেন। রবীন্দ্রনাথ নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন এই চাঞ্চল্যকর সংবাদ যখন দিগ্বিদিকে ছড়িয়ে পড়লো তখন বম্বাই-র উইল্সন্ কলেজের অধ্যক্ষ কোনো রেভারেন্ড ডক্টর আর স্কট শ্রীপুরোহিতকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তাঁর লেখা মরমী কবিতাবলীর সমঝদার খুঁজতে হলে তাঁকে সমুদ্র পেরিয়ে লণ্ডনেই শেষ পর্যন্ত যেতে হবে। তখন নিশ্চয়ই সে অভিযান নানা কারণে সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৯৩০ সালে পৌঁছে কবি শ্রীপুরোহিত স্বামী ভারতধর্ম মহামণ্ডলের পরিচয়পত্র পকেটে করে হিন্দুধর্ম প্রচারের উদ্দেশে বিলেত যাত্রা করলেন। কিন্তু তাঁর কবিযশোপ্রার্থী মনটি ঠিক যথোচিত পরিমাণে উদাসীন ছিল বলে মনে হয় না, কেননা বিলেতে পৌঁছেই তিনি সর্বপ্রথম রটেন-স্টাইন, স্টার্জ মুর প্রভৃতি ঠিক তাঁদেরই সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করেছিলেন যাঁরা ছিলেন প্রতীচ্যে রবীন্দ্রযশ প্রতিষ্ঠার উদ্যোক্তা। স্টার্জ মুরকে এই স্বামীজির 'বাবু ইংলিশে' লেখা ছ-সাতশো কবিতা নিয়ে কিঞ্চিৎ বিব্রত হ'য়ে অগত্যা গীতাঞ্জলির ভূমিকা লেখককে স্মরণ করতে হয়েছিল তার প্রমাণ আছে। ১৯৩১-৩২ সালে ইয়েট্সকে লেখা স্টার্জ মুরের অপ্রকাশিত অথচ প্রাসঙ্গিক চিঠিপত্রের কপি রিচর্ড এলম্যানের সংগ্রহে আমি দেখে এসেছি। রটেনস্টাইনের আত্মচরিতের তৃতীয়খণ্ডে ইয়েট্স-এর সঙ্গে তাঁর পত্রালাপে যে ভারতীয় কবিটির উল্লেখ আছে তিনি এই মারাঠী স্বামীজি বলেই আমার বিশ্বাস। ক্ষিপ্ত হ'য়ে ইয়েট্স্ তাঁকে যা লিখেছিলেন সে সব কথা ইংরেজিভাষায় কাব্যরচনালিপ্সুদের প্রতি স্মরণীয় সতর্কবাণী ব'লে গণ্য হওয়া উচিত: 'I have no doubt that your Indian is, as you say, charming and sensitive, but he is writing in a language in which he does not think. Tell him to go back to India and start a boycott of the English language. When the English insisted on all the higher education of the Indian being carried on in English they did the greatest wrong to India, making a stately people clownish, putting indignity into their very souls. Probably your poet has talent, may even make a name for himself, if he will write in the language he has learned in childhood.' শ্রীপুরোহিতের আশা কাজেই পূর্ণ হোলো না, ইয়েট্স্ কিছুতেই ভূমিকা লিখলেন না তাঁর কবিতাবলীর জন্য। কিন্তু নিশ্চয়ই এই ভেবে তিনি সান্ত্বনা পেলেন যে তার পরিবর্তে ইয়েট্স্ ম্যাকমিলান্‌কে দিয়ে তাঁর যোগিজীবনের আত্মচরিত ছাপিয়ে দিলেন, নিজে তার ভূমিকা লিখলেন, এবং সেই ভূমিকার শেষদিকে স্বামিজীর কয়েকটি কবিতার অনুবাদকেও স্থান ক'রে দিলেন। ১৯৩৭ সালেও পুরোহিত স্বামী জীবিত ছিলেন কিনা আমার জানা নেই। থাকলে, ইয়েট্স্ সংকলিত 'দি অক্সফোর্ড বুক অব মডার্ন ভার্স'-এর পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পাশেই তাঁর নিজের কবিতাকেও আসন পেতে দেখে তিনি নিশ্চয়ই উল্লসিত হয়েছিলেন। ইয়েট্স-এর এই কীর্তিটিকে ভ্রূকুঞ্চিত পাঠক গুরুদক্ষিণা ব'লেই মেনে নেবেন।

স্বামীজির চরিত্রে বীতশ্রদ্ধ হয়ে স্টার্জ মুর আদি অনেকেই একে একে ত্যাগ করলেন তাঁকে; অবিচলিত থাকলেন শুধু ইয়েট্স্, কেননা ততদিনে শ্রীপুরোহিত ইয়েট্সীয়

স্বকীয়পুরাণে আর একটি অত্যাবশ্যক প্রতীকে পরিণত হ'য়েছিলেন। সকলের অনুরোধ, এমন কি তাঁর পত্নীর নির্বন্ধ পর্যন্ত অগ্রাহ্য ক'রে অসুস্থ শরীর নিয়ে ইয়েট্‌স্‌ ১৯৩৫ সালের শীতকালে চললেন ভূমধ্যসাগরীয় স্প্যানিশ দ্বীপ মেয়র্কাতে, ভারতীয় যোগীর সঙ্গে একত্রে উপনিষদের অনুবাদ করবেন বলে। পত্নী সঙ্গে যাননি ব'লে তাঁর সেবাকর্মে উদ্যোগী হ'য়েছিলেন শ্রীমতী ফোডেন নামে এক বিত্তশালী মহিলা। ইনি নিজের খরচায় স্বামীজিকে ভারতবর্ষে একটি আশ্রম গড়িয়ে দেবেন এই সংকল্প নিয়ে স্বামীজির স্বভাব চরিত্র বিষয়ে গোপনে খোঁজখবর করাচ্ছিলেন, কিন্তু কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে এমন সব সাপ বেরিয়ে পড়লো যে তাঁর সন্ন্যাসীগিরিতে শ্রীমতীর আস্থা একেবারেই চুকে গেল। কিন্তু তিনিও শেষ পর্যন্ত টলাতে পারলেন না ইয়েট্‌স্‌কে। শ্রীপুরোহিতের সঙ্গে একত্রে প্রস্তুত করা দশপ্রধান উপনিষদের ইংরেজি চেহারা উক্ত পবিত্রগ্রন্থের নির্ভরযোগ্য অনুবাদ হিসেবে কতদূর গ্রাহ্য তা একমাত্র পণ্ডিতেরাই বলতে পারবেন। কিন্তু বলবান এবং রূপবান রচনা হিসেবে তার তুলনা হয় না। ইতিমধ্যে কবির দেহে উদরী রোগ দেখা দেয়, এবং খবর পেয়ে ইয়েট্‌স্‌-পত্নী ছুটে এসে সন্ন্যাসীর টোটকা চিকিৎসা থেকে তাঁকে উদ্ধার করার আগেই যে আশ্চর্য প্রহসন রচনায় তিনি হাত দেন তারই নাম "দি হার্ন্‌স্‌ এগ্‌", যাকে আমি প্রবন্ধের শিরোনামে বাংলা রূপক নাট্যের উত্তরে আইরিশ প্রহসন বলে বর্ণনা করেছি।

উইলিয়ম ব্লেক-এর ভাবীকথন আখ্যেয় রচনাবলীর মতো দুষ্প্রবেশ্য না হলেও ইয়েট্‌স্‌-রচিত হ্রস্বাকার কাব্যনাটিকাগুলি যথেষ্ট পরিমাণে দুরূহ, এবং কদাচ প্রহেলিকা প্রতিম হওয়ার ফলে বহু পাঠকের কাছেই তাঁর অসাধারণ নাট্যপ্রতিভা আজ পর্যন্ত মোটামুটি অজানা থেকে গেছে। অথচ আধুনিক কালে কাব্যনাট্যের পুনরুত্থান কর্মে তাঁর তুল্য প্রতিভা একান্তই বিরল। তাঁর পরিণত বয়সের প্রতীকী কাব্যনাট্য বিষয়ে কেম্ব্রিজের উইলসন সাহেবই শুধু বিস্তারিত ভাবে আলোচনা লিখেছেন। কিন্তু "দি হার্ন্‌স্‌ এগ্‌" বিষয়ে এ'র বিশ্লেষণের সঙ্গে আমার কোনোখানেই মেলে না।

নাটকের নাম অনুবাদ করতে হলে সারসকে স্মরণ করা বৃথা। হয়তো 'ব্রহ্মের ডিম' বললে লেখকের অভিপ্রায়টিকে খানিকটা বোঝানো চলে। কেননা রাজহাঁস, সারস, ঈগল এবং বাজপাখিকে ইয়েট্‌স্‌ বহুকাল থেকেই মন্ময়তার প্রতীক হিসেবে ব্যবহার ক'রে আসছেন। দ্রষ্টব্য "প্লেইজ অ্যান্ড কনট্রোভার্সিজ্‌" গ্রন্থে 'ক্যালভরি' নাটকের ইয়েট্‌স্‌কৃত টীকা। ভারতীয় শাস্ত্রে আত্মন্‌-ব্রহ্মণের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত পাখির দৃষ্টান্ত থেকেই এই ধারণাকে তিনি পেয়ে থাকবেন, কেননা ১৯১৩ সালে লেখা 'আর্ট অ্যান্ড আইডিয়াজ্‌' প্রবন্ধেই রাজপুতচিত্রকলায় মুক্ত আত্মার প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত রাজহাঁসের বিষয়ে ইয়েট্‌স্‌ যে অবহিত ছিলেন তার উল্লেখ আছে। হরভিৎস্‌-এর লেখা "দি ইণ্ডিয়ান থিয়েটর" (১৯১২) বইটিও তাঁর সংগ্রহে ছিল, যাতে এই ভারতীয় প্রতীকের বিস্তৃত ব্যাখ্যা বর্তমান। ১৯২৩ সালের পরে লেখা বহু কবিতায় ইয়েট্‌স্‌ এই অর্থে পাখির ব্যবহার করেছেন। এমনকি ১৯১৫ সালে ব্যক্তিগত সংগ্রহের বইপত্রে ব্যবহার করার জন্য স্টার্জ মুরকে দিয়ে তিনি যে বুকপ্লেটটি আঁকিয়ে নিয়েছিলেন তাতেও একটি সারসের মূর্তি আছে যেটিকে তিনি কালের বন্ধনীগত মর্ত্যজীবনে স্বীয় আত্মার প্রতীক বলে লিলি ইয়েট্‌স্‌-এর কাছে

লেখা অপ্রকাশিত তাঁর এক চিঠিতে বর্ণনা করেছেন। আত্মন্‌-ব্রহ্মাণ্ডের অখ্যুস্টান সাযুজ্যে বিশ্বাসী ছিলেন বলে ইয়েট্‌স্‌ সেই সারসকেই আলোচ্য নাটকে ব্রহ্মের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেছেন। বস্তুময় বিশ্ব সেই আদি সারসেরই পবিত্র ডিম। সারসকে নিবেদন না করে মানুষের পক্ষে তাঁরই ডিম ভক্ষণের অধিকার আছে কিনা, এবং শাপগ্রস্ত হওয়ার ভয় দেখিয়ে সেই ডিম্বভোগ থেকে নিবৃত্ত করলে তার পরিণামে মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কী মহাপরিবর্তনের সূচনা হয়, আমার বিশ্বাস ইয়েট্‌স্‌-এর নাটকে তারই সঙ্কেত আছে।

আপাতদৃষ্টিতে "দি কিং অফ্‌ দি ডর্ক চেম্বার" এবং "দি হার্ন্‌স্‌ এগ্‌" নাটক দুটির আকারে প্রকারে কোনোই মিল নেই বলে মনে হতে পারে। রাজা, ঠাকুরদা, সুদর্শনা, সুরঙ্গমা, কাঞ্চী, কোশল, অবন্তী—এদের সঙ্গে আয়ে, কন্‌গাল্‌, কর্নি, এ্যাট্রাক্‌টা, ক্যেট্‌, আগনেস্‌, বা জনৈক অবোধ চরিত্রের কোথায় সাদৃশ্য? কিন্তু এতোটা বাহ্য সাদৃশ্যের নিষ্ফল সন্ধান এড়িয়ে, প্রতীকী ভাষার ভিতরমহলে তাকালেই দেখা যাবে, দুই নাটকেরই কেন্দ্রে দুটি নারী চরিত্র যারা জগতের অপ্রমেয় আদি পুরুষের সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন। আর দুটি নাটকেই ক্ষাত্রবীর্যসম্পন্ন দুটি পুরুষ চরিত্র বর্তমান যাঁদের পক্ষে এই নির্গুণ আদি পুরুষে আস্থা রাখা কঠিন। রবীন্দ্রনাথ সেই আদি পুরুষের নাম দিয়েছেন অন্ধকার প্রকোষ্ঠের অধীশ্বর, রাজা। মাটির আবরণ ভেদ করে পৃথিবীর বুকের মাঝখানে তাঁর ঘর। 'আলোর ঘরে সকলেরই আনাগোনা', তাই একলা রাণীর সঙ্গে তাঁর মিলন ঘটে অন্ধকারে। অধীর সুদর্শনা সেই অন্ধকারের অরূপ অধীশ্বরকে মুখোমুখি দেখার জন্য ব্যাকুল হ'য়েছেন। কিন্তু জানেন না যে দুঃখের আগুনে দগ্ধ না হ'লে, অন্তরের সেই অন্ধকারটি অপরূপের আবির্ভাবে কিছুতেই উদ্ভাসিত হ'য়ে ওঠে না। ততদিন পর্যন্ত তিনি থাকেন ভয়ানক, সহ্য করা যায় না তাঁর মুখের রেখাকে, ভয়ে বুক কাঁপে। অথচ তিনি আছেন, হাওয়ার গন্ধে, ফুলের সুবাসে, সঙ্গীতের মূর্ছনায়, এমনকি প্রলয়ের রোষাগ্নিতে। তাঁর রাজত্বে সবাইকে রাজা ক'রে রেখেছেন তিনি, আপনাকে চিনলেই শুধু চেনা যায় তাঁকে। সুদর্শনা অধীর হ'য়ে উঠেছিলেন, পথচেয়ে বসে না থেকে, নিজের মধ্যে নিজেকে প্রস্তুত করার আগেই তিনি রাজার মুখ দেখবেন বলে জেদ ধরেছিলেন। 'রূপের মোহে অন্ধ হ'য়ে', 'পাপের মধ্যে অগ্নিদাহ, বিষময়ুদ্ধ, অন্তরে বাইরে অশান্তি' ঘটিয়ে অবশেষে তিনি সত্য-মিলনের পথে পেঁছিতে পারলেন। আইরিশ নাটকে এই অরূপ অপরূপকে "রাজা" বলা হয়নি, যদিও "দি কিং অফ্‌ দি ডর্ক চেম্বার"-এরই প্রতিধ্বনি ক'রে ইয়েট্‌স্‌ অন্য এক নাটকে তাঁর অভিপ্রেত পরম প্রভুর নাম দিয়েছিলেন 'দি কিং অফ্‌ দি গ্রেট ক্লক্‌ টাওয়ার'। আলোচ্য নাটকে তাঁর নাম পরম সারস, যাঁর প্রেমে অধীর হ'য়ে যুগ যুগ ধরে অপেক্ষা করে আছেন পূজারিণী এ্যাট্রাক্‌টা। তাঁদেরও মিলন হয় মার্তণ্ডের প্রজ্বলন্ত কেন্দ্রটিতে, কিংবা তাঁর মধ্যরাতের নিবিড় অমায়, পরম সারস যখন চন্দ্রসূর্যগ্রহতারা সব কিছুকে নিবিয়ে দেন। তাঁর সেই অমারাত্রি কোনো মিলনপ্রদীপে আলোকিত হতে পায় না। দুটি নাটকেই সেই পরমের আবির্ভাব সূচিত হয় সঙ্গীতের সুরমূর্ছনায়। ইয়েট্‌স্‌ তাকে বীণার ঝঙ্কার বলেননি, বলেছেন অলৌকিক এক বাঁশির সুর, যে বাঁশিটি অন্য কোনো সারসের জানু থেকে খসানো অস্থি দিয়ে তৈরি! সেই অলীক বাঁশিটি একান্তমনে বাজাতে পারলেই সারসের বঁধু এ্যাট্রাক্‌কা ব্যাকুল হ'য়ে ছুটে এসে দেখা দেন। হয়তো কৃষ্ণের বাঁশির কথা মনে ছিল, হয়তো ভুলতে পারেননি যে ১৯২৪ সালে বৈষ্ণবগীতি কবিতার অনুবাদ প'ড়ে তিনি সাধ করেছিলেন নিজে সেই রকম কিছু প্রেমের কবিতা রচবেন। এ্যাট্রাক্‌টাকে টেনে আনার এই

বাঁশিটি নিজে বাজাতে না জানলেও হতাশার কারণ নেই। হাতে কিছু মূল্য ধ'রে দিলেই অভিজ্ঞ বংশীধরেরা আপনার হ'য়ে সেটি বাজিয়ে দেবে।

"রাজা" নাটকে অবিশ্বাসী ক্ষত্রিয় বীরের নাম কাঞ্চী, ইয়েট্‌স্-এ তার তুল্য চরিত্র রাজা কন্‌গাল্। এবং উভয় শুভবিদ্বেষীরই ক্রিয়াকর্মের সহায়ক সাতটি অপর চরিত্র, যে সাতের ব্যাখ্যা অন্ততঃ রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আপাতত অবিশ্বাস্য ব'লে মনে হ'তে পারে। রবীন্দ্রনাথ রাজা কাঞ্চীর সঙ্গীদের নাম দিয়েছেন অবন্তী, কোশল, কলিঙ্গ, বিদর্ভ, বিরাট, পাঞ্চাল এবং সুবর্ণ। উইলসন্ সাহেব গুণতে ভুল করেছিলেন, নয়তো দেখতেন যে কন্-গালের পার্শ্বচরদের সংখ্যাও ছয় নয়, সাত : মাথিয়াস্, মাইক, জেম্‌স্, পিটার, জন্, প্যাট্ আর মালাকি। চরিত্রলিপিতে এখন পর্যন্ত ছ'জনেরই নাম আছে বটে, কিন্তু নাটকের মধ্যে হঠাৎ আরো একটি চরিত্র এসে উপস্থিত হ'য়েছে যার নাম জেম্‌স্। এবং "রাজা" নাটকে সুবর্ণ যেমন শেষ পর্যন্ত ছত্রধরের কাজ নিয়ে স্বয়ম্বর সভার প্রতিযোগিতা থেকে নিবৃত্ত থাকে, ইয়েট্‌স্-এর নাটকেও কোনো অজ্ঞাত কারণে কন্‌গালের সাতসঙ্গীর মধ্যে পিটার নামে একজনের যথোচিত খোঁজ পাওয়া যায় না শেষ পর্যন্ত। কাঞ্চীর মতোই কন্‌গাল ক্ষত্রিয় বীর, সৃষ্টির কেন্দ্রস্থ চিরন্তন দ্বন্দ্বে বিশ্বাসী। নাটকের গোড়াতেই যে-যুদ্ধের অবতারণা করা হ'য়েছে তাকে চলতি অর্থে কোনোমতেই যুদ্ধ বলা চলে না, বলতে হয় যুদ্ধের নৃত্য। কারো কৃপাণ বিপক্ষের ঢালকে স্পর্শ করে না। শুধু অন্তরীক্ষে মৃদঙ্গ করতালের ধ্বনি থেকে যুদ্ধের মোহ জাগে। এবং যুদ্ধশেষে প্রতিপক্ষের আলিঙ্গন মেনে কন্‌গাল ভোজশালার দিকে পা বাড়ান।

এইরকম কোনো এক যুদ্ধের শেষে ঢাল-তলোয়ার সম্বরণ ক'রে কন্‌গাল এ্যাট্রাক্‌টার পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন, আকাঙ্ক্ষা ডিমভরা ঝুরি পিঠে একটি রাসভ আর সেই রাসভ চালনার জন্য একটি পাকা সহিস। কন্‌গালের পাচকেরা সেই ডিমের উত্তম ঝোল পাকাতে বিশেষ পটু। কিন্তু পুজারিণীর আজ্ঞা না নিয়ে তিনি পরম সারসের পবিত্র ডিমে হাত দেবেন কি করে? সর্বত্যাগী পূতচরিত্র সারসবধূরাই যে শুধু সেই ডিম ভোজনের প্রকৃত অধিকারী। প্রত্যাখ্যাত হ'য়ে কন্‌গাল অনুমান করলেন, অলৌকিক সারসউপাসনার রহস্য হচ্ছে এই যে এ্যাট্রাক্‌টা তার স্বাভাবিক কামনাবাসনাকে টুঁটি চেপে রেখেছেন ব'লে মন তার শোধ নিচ্ছে। কৌমার্যের তুষারে জমে গিয়ে বালকদের মতো নারীরাও বোধ করি একান্তে তুষারপুত্তলি গড়তে বসে যার তারা নাম দেয় প্রভু, পবিত্র পাখি বা জন্তু, এবং তাই দিয়েই তাদের অবরুদ্ধ কামজ-তৃষ্ণার সাধ মেটায় তারা। পার্সিয়ুস-মাতা বন্দিনী ডানী-র প্রকোষ্ঠে স্বর্ণবৃষ্টি হ'য়ে দেবতা জিউসের প্রবেশ কিংবা তৃণশায়ী লেডার রোমাঞ্চিত দেহে অলৌকিক রাজহাঁসের পাখসাট—সব উপাখ্যানের এই একই-রহস্য। আসলে এ্যাট্রাক্‌টার সবটাই ভ্রান্তি।

"রাজা" নাটকে অবিশ্বাসী কাঞ্চীও ভেবেছিলেন সুদর্শনার রাজ্যে রাজা নেই। তা রাজা না থাকলেও সুরূপা রাণীটি যখন জাজ্বল্যমান তখন তাকে অপহরণ করাটাই তিনি সুবুদ্ধি বিবেচনা করেছিলেন। তারপর করভোদ্যানে আগুন লাগার পরে কী কী ঘটলো তার সবটা বলার দায় ছিল না রবীন্দ্রনাথের। সুদর্শনা একদিন শুধু সুরঙ্গমার সামনে আত্মহত্যায় উদ্যত হ'য়ে অঙ্গীকার করেছিলেন : 'দেহে আমার কলুষ লেগেছে—এ দেহ আজ আমি সবার সমক্ষে ধুলোয় লুটিয়ে যাব—কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমার দাগ লাগেনি।... তোমার সেই মিলনের অন্ধকার ঘরটি আমার হৃদয়ের ভিতরে আজ শূন্য হ'য়ে রয়েছে—সেখানকার দরজা কেউ খোলেনি প্রভু।' কাঞ্চী বা সুবর্ণের হাতে দেহে কলুষ লেগেছে,

এই পর্যন্ত বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ইয়েট্‌স্‌-এর কন্‌গাল কিছুই গোপন রাখলেন না। তিনি আরো বিশদ ক'রে পূজারিণীকে উপদেশ দিলেন—তার সারসপ্রেম উপশমযোগ্য ব্যাধিমাত্র, সাত সাত যোদ্ধার তপ্ত আলিঙ্গনে ধরা দিলেই রোগমুক্তি হবে। হতে পারে মর্ত্যজীবন দুর্বিষহ, কিন্তু যৌবনেও যে-নারী উপভোগে বিরত তার মুখে ওসব পবিত্রতার কথা সাজে না। বরণ করো, নয় বৃত হও, বাকি কথা পরে হবে। কিন্তু এ্যাট্রাক্‌টা অনড়। তিনি সেই অনঘ, অক্ষর, নির্গুণে ভস্মসার অপ্রমেয় জরায়ু হ'য়ে পুনঃপ্রবেশ না ক'রে ছাড়বেন না। কাজেই সাত যোদ্ধাকে বলাৎকার করতেই হোলো। এ্যাট্রাক্‌টা অভিশাপ দিলেন, পাপ হবে, অপবিত্র হাতে সারসের ডিম ভক্ষণ করলে মূর্খ হ'য়ে জন্মাতে হবে, এবং মৃত্যু হবে মূর্খের হাতেই। কন্‌গাল সে অভিশাপে বিচলিত হলেন না। মৃত্যু তো মূর্খই, তার হাতে একদিন যে ধরা দিতেই হবে এ আর নতুন কি!

কিন্তু কন্‌গালের পারিষদ এই সাতটি চরিত্র কারা? উইলসনের মতে কন্‌গাল হচ্ছেন ভারতীয় রজোগুণের প্রতীক, আর যেহেতু তার সঙ্গীদের গুণতে তিনি ভুল করেছিলেন, কাজেই কন্‌গালের ছ'জন অনুচর ধরে নিয়ে তাদের বলেছেন জীবনের ছয় শত্রু—কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ আর মাৎসর্য। উইলসন্‌ অবশ্য 'রাজা' নাটকের কথা অনুমান করতে পারেননি। তাছাড়া ইয়েট্‌স্‌-পুরোহিত অনূদিত দশপ্রধান উপনিষদ গ্রন্থটিও এই প্রসঙ্গে উল্টে দেখার কথা তাঁর মনে হয়নি। যদি মনে পড়তো তাহলে মাণ্ডুক্যোপনিষদের ইয়েট্‌স্‌-কৃত পাদটীকা তাঁর চোখে পড়তো। মাণ্ডুক্যোপনিষদে বলা হ'য়েছে: সর্বং হ্যেতদ্‌ ব্রহ্ম; অয়মাত্মা ব্রহ্ম; সোঽয়মাত্মা চতুষ্পাৎ। এবং এই চতুষ্পাৎ আত্মার প্রথম পাদকে বলা হ'য়েছে বৈশ্বানর, জাগ্রতবস্থা যাঁর ভোগস্থান, যিনি বহির্বিষয়ে অনুভূতিসম্পন্ন, যাঁর সাতটি অঙ্গ, যাঁর উনিশটি মুখ, এবং যিনি স্থূল বিষয় ভোগ করেন। ইয়েট্‌স্‌ কন্‌গালকে বলেছেন 'the Great eater', ব্রহ্মাণ্ডকে ভোগ না করলে তাঁর কাণ্ডজ্ঞান থাকে না। বৈশ্বানরের সপ্তাঙ্গ বিষয়ে ইয়েট্‌স্‌ তাঁর উপনিষদ গ্রন্থে পাদটীকা দিতে ভোলেননি: দ্যুলোক তাঁর মস্তক, সূর্য—চক্ষু, বায়ু—প্রাণ, আকাশ—শরীর, জল—মূত্রাশয়, পৃথিবী—পাদদ্বয়, এবং অগ্নি—মুখ। কন্‌গালের সপ্ত অনুচর বৈশ্বানরের এই সপ্তাঙ্গ। হয়তো ইয়েট্‌স্‌ বলতে চান, এ্যাট্রাক্‌টার বিমূর্ত ব্রহ্মচিন্তার পরিণামেই ক্ষাত্রবীর কন্‌গাল্‌ অপরিণামদর্শী ভোক্তায় পরিণত হয়েছেন। ক্ষাত্রসংস্কৃতির মধ্যে ভাঙন ধ'রেছে, মানবইতিহাসে যুগান্ত দেখা দেবার আর দেরি নেই। কাঞ্চীর সাত অনুচর নির্দেশ করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথও কি মাণ্ডুক্যোপ-নিষদের এই সপ্তাঙ্গের কথা ভেবেছিলেন? 'যুদ্ধে যাবার পূর্বে বাবা এসে বললেন, তুই একজনের হাত থেকে ছেড়ে এসে আজ সাতজনকে টেনে আনলি—ইচ্ছে করছে তোকে সাত টুকরো ক'রে ওদের সাতজনের মধ্যে ভাগ ক'রে দিই।'—এই সাত কি, তিন-পাঁচ-দশের মতো নিছকই কথার কথা? হয়তো তাই। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে উপনিষদ-পুষ্ট ব'লে জানতেন ব'লে ইয়েট্‌স্‌ এই সাতের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা ক'রে থাকলে খুব অন্যায় করেননি।

সুদর্শনার মতো ইয়েট্‌সীয় প্রহসনের এ্যাট্রাক্‌টাও দেহের কলুষকে গ্রাহ্য করতে রাজী না। দুয়েরই মনে এ বিশ্বাস দৃঢ় যে দেহের কলুষ হৃদয়ের মধ্যে দাগ রেখে যায় না। সাত-যোদ্ধার আলিঙ্গনে বদ্ধ উপভোগের অবসানেও এ্যাট্রাকটা তাই বলতে পারেন:

The Herne is my husband.
I lay beside him, his pure bride.

তাছাড়া দুই নাটকের মধ্যে আরো একটি সাদৃশ্যও মনে রাখা ভালো। রবীন্দ্রনাথ, ইয়েট্‌স্‌,

দুজনেই নাটকের ঘটনাকালকে বসন্তপূর্ণিমা বলেছেন।

সাদৃশ্যের সীমারেখা এই পর্যন্ত। "রাজা" নাটকের সমাপ্তি হয় বিদ্রোহী কাঞ্চীর চূড়ান্ত পরাভবের মধ্যে। ঠাকুরদার মতো, রাণী সুদর্শনার মতো, শেষ পর্যন্ত কাঞ্চী-রাজকেও, রাজা পথে বার করেছেন। ঠাকুরদার কাছে তাঁর বিনীত প্রার্থনা : 'তোমাদের এই ধুলোর খেলায় আমাকেও ভুলো না। আমার এই রাজবেশটাকে এমনি মাটি ক'রে নিয়ে যেতে হবে যাতে একে আর চেনা না যায়।' রবীন্দ্রনাথের নাটকের অভিপ্রায় মনে রাখলে এই পরিণামকে অবশ্যই মানতে হবে। কিন্তু তবু বীররাজা কাঞ্চীর জন্য কোথায় একটু খেদ থেকেই যায়। ইয়েট্‌স্‌-এর অভিপ্রায় ভিন্ন। তিনি এ্যাট্রাক্‌টার সঙ্গে শেষ দৃশ্যে পরম সারসের মিলন দেখাতে উৎসাহী ছিলেন না। ইতিহাসে বিমূর্ত দার্শনিক চিন্তার ক্রমপরিণতির সঙ্গে মানবসভ্যতার রূপ কেমন পালটায় সেই ভাবনাই তাঁর মনকে অধিকার ক'রে ছিল। 'দি হার্ন্‌স্‌ এগ্‌' নাটকে অরূপের সাধিকা এ্যাট্রাক্‌টারই আপাততঃ জয় হোলো। পরাভব ঘটলো বীর কন্‌গালের। পরমসারসের পরাক্রমকে মেনে নিয়ে, একে একে তাঁর অনুচরেরা স্বীকার করলেন পূজারিণী এ্যাট্রাক্‌টার দেহ তারা স্পর্শও করেননি। নাটকের প্রারম্ভে যে যুদ্ধকর্মের রূপ ছিল নৃত্যেরই রূপ, শেষ পর্যন্ত তা ভাঙা টেবিল চেয়ারের পায়া নিয়ে নিছক দাঙ্গাহাঙ্গামায় পর্যবসিত হোলো। তবু অবিচলিত রইলেন কন্‌গাল্‌। মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলেন, যে মৃত্যু মূর্খের হাত থেকে আসবে বলে কথা ছিল। এবং সেই মূর্খ যখন সত্যি সত্যি কয়েকটা কড়ি এবং কিছু হাততালির আশায় তাকে হত্যা করার কসরৎ করতে উদ্যত হোলো, তখন শান্তচিত্তে বীর কন্‌গাল্‌ নিজের অসির আঘাতেই নিজের প্রাণ নিলেন।

তারপরে ইয়েট্‌স্‌ যা ঘটালেন তা জনপ্রিয় নাটমঞ্চে কখনো কেউ দেখাতে চাইবে কিনা সন্দেহ। বীরের মৃত্যু দেখে এতক্ষণে পরমসারসের পবিত্রবধূ এ্যাট্রাক্‌টার মনে দয়া হোলো। বীরের আলিঙ্গনে ধরা দিতে এতদিন যার সায় ছিল না, বীরের মৃত্যুশয্যার পাশে দাঁড়িয়ে নিজের মূর্খ ভৃত্যের সঙ্গে তিনি রমণে উদ্যত হলেন। উদ্যত হলেন এই আশা নিয়ে যে বীরের আত্মা তাঁর নিজের জরায়ুতে এসে পুনর্জন্ম নেবে, বীর্যবানের যুগ তাহলে হয়তো শেষ হবে না। কিন্তু তার আর সময় ছিল না, দেরি হ'য়ে গিয়েছিল। সেই যে গাধাটা, পবিত্র সারসডিম্ব ব'য়ে বেড়ানোই কাজ ছিল যার, হায়রে, সে ইতিমধ্যেই দড়ি ছিঁড়ে পালিয়ে গিয়ে আর একটি গাধার সঙ্গে সঙ্গম শেষ ক'রে ফেললো। তুষার গলেছিল এ্যাট্রাক্‌টার কুমারী বুকে, কিন্তু কন্‌গালের আত্মা পুনর্জন্ম নিল সেই হতভাগা গাধাটার পেটে। এই-ভাবে ইতিহাসের এক একটা যুগের শেষ হয়। ইয়েট্‌স্‌ বলতেন কালের সেই চাকাটা ঘুরতে কমবেশি দুহাজার বছর লাগে। কন্‌গালের মৃত্যুর সঙ্গে ক্ষাত্রযুগের অবসান হোলো। আর তার শেষে নাটকে যে-যুগের আভাষ দেখা যাচ্ছে সেখানে ইয়েট্‌স্‌ গর্দভের রাজত্ব অনুমান করছেন, চিন্তা আর কর্ম, দেহ আর মন, বস্তু আর সত্তা যেখানে দ্বিধাবিভক্ত।

যদিও দুই কবির মধ্যে কিছুই প্রায় মেলে না, তবু জীবনীকারদের মনে রাখতে হবে যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে ইয়েট্‌স্‌ আজীবন ভুলতে পারেননি, নয়তো মৃত্যুর মাত্র একবছর পূর্বে তিনি "রাজা" নাটকের প্রত্যুত্তর লিখতে বসতেন না। এই প্রত্যুত্তরকে ইয়েট্‌স্‌ একই-কালে আখ্যায়িকার আকারে রচিত শ্রীপুরোহিতের দার্শনিক মত কিংবা শ্রীপুরোহিত সমর্থিত তাঁরই স্বকীয় দর্শনজাত নাটিকা বলে বর্ণনা করেছিলেন।

বাংলা ছোট গল্পের নবরূপ

অচ্যুত গোস্বামী

সাম্প্রতিক কালে বাংলাদেশে কিছু কিছু নতুন ধরনের পরীক্ষামূলক গল্প-রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সংখ্যার বিচারে এখন পর্যন্ত এই ধরনের প্রয়াস খুব নগণ্য, এবং যে যুগে সাহিত্য-কর্ম লাভজনক পণ্যে পরিণত হতে চলেছে সে যুগে তা-ই স্বাভাবিক। কয়েকজন মাত্র তরুণ লেখক অসীম দুঃসাহসের সঙ্গে অনেক আপাত প্রলোভনের হাতছানিকে উপেক্ষা করে কয়েকখানি বুদ্ধিপ্রধান পত্রিকায় এই ধরনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন। যতদূর জানি দু'-তিনটির বেশী ক্ষেত্রে এ ধরনের গল্প এখনও পুস্তকাকারে সন্নিবিষ্ট হয়নি। গতানুগতিকতার মধ্যে পরিবর্তনসৃষ্টির ভগীরথ-ব্রত যাঁরা গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রণী হিসাবে বিমল কর, দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবেশ দাশ, মতি নন্দী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে বাংলাদেশে আরও বেশ কিছু সংখ্যক শক্তিশালী গল্প-লেখক আছেন। কিন্তু গণমনোরঞ্জনের সহজ রাস্তা ছেড়ে শক্ত মাটি ভাঙার ব্রত তাঁরা গ্রহণ করতে চাইছেন না।

পরীক্ষামূলকতার যে ফসল আপাতত আমার সামনে রয়েছে সে সবের সার্থকতা বিচার করা বা সাহিত্য-মূল্য নির্ধারণ করা আপাতত আমার উদ্দেশ্য নয়। সত্যি বলতে কি এখন পর্যন্ত তরুণ লেখকরা কোন খুব উচ্চ মূল্যের সাহিত্য-কর্ম উপস্থিত করতে পেরেছেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। সেটা বড় কথা নয়। তাঁরা যে নতুন সম্ভাবনার দিগন্ত উন্মোচন করছেন সেইটেই বড় কথা। নতুন প্রয়াসের পিছনে যে সব সাহিত্য তত্ত্ব বা রীতি লেখকদের অলক্ষ্যে নিয়ন্ত্রিত করছে, বর্তমান প্রবন্ধে আমি সেই সম্পর্কে কিছু আলোচনা করতে চাইছি। যে কোন সৃজনধর্মী সাহিত্য আন্দোলনের পাশাপাশি সে জিনিসের বুদ্ধিগ্রাহ্য তত্ত্বমূলক আলোচনা হওয়া বাঞ্ছনীয়। তা লেখক ও পাঠক উভয়কেই সাহায্য করে।

প্রথমেই অকপটে এ কথা স্বীকার করা ভাল যে আমাদের সমস্ত নয়া প্রয়াসই য়ুরোপের বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলনের অনুকরণ মাত্র। এ প্রসঙ্গে একজন ইতালীয় গল্প সংকলক তাঁর দেশের সাহিত্য সম্পর্কে যে কথা বলেছেন আমি তারই পুনরাবৃত্তি করতে পারি মাত্র। তিনি বলেছেন যে ইতালীর লেখকগণ অন্যান্য অধিক অগ্রসর দেশগুলির বিভিন্ন রীতিকে অনুকরণ করছেন মাত্র; তার সহজ কারণ এই যে এই শেষোক্ত দেশগুলির তুলনায় ইতালী অনেক বেশী পুরানো। আপাতবিরোধী মনে হলেও কথাটা সত্য এবং এ কথা আমাদের দেশ সম্পর্কে আরও বেশী প্রযোজ্য। পুরোনো দেশ বলে আমাদের কিছু পুরোনো পুঁজি আছে; তাই নিয়ে আমরা মশগুল হয়ে আছি। নতুন দেশগুলোর সঞ্চিত পুঁজি নেই বলে তারা নতুন উদ্যমে পুঁজি সঞ্চয়ে ব্যস্ত এবং অনেক অভিনব জিনিস তারা উদ্ভাবন করে ফেলেছে। পুরাতন নিয়ে মগ্ন থাকতে থাকতে আমরা হঠাৎ এক সময় আবিষ্কার করি যে পুরোনো দিনের সঞ্চয়ে নতুন দিনের প্রয়োজন মেটে না। তখন চারদিকে দৃষ্টিপাত করে দেখি অন্য অন্য দেশগুলি যুগোপযোগী সাহিত্য বা শিল্পের সাধনায় অনেক বেশী অগ্রসর হয়ে গিয়েছে। ত্রস্ত ক্লান্ত পদে তাদের অনুকরণ করা ছাড়া আমাদের অন্য উপায় নেই।

কাজেই অনুকরণে আমার আপত্তি নেই; অবশ্য অনুকরণকে নিজের করে নিতে পারা

চাই। কোন লেখক যদি অনুভব করেন যে তাঁর বিশিষ্ট শিল্প-অভিজ্ঞতা কোন বৈদেশিক সাহিত্য-রীতির মাধ্যমে সুষ্ঠুভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, তবেই সেখানে অনুকরণকে সদর্থক বলে গণ্য করা যায়। কিন্তু নিছক বৈচিত্র্যবিলাস হিসাবে বিদেশের অনুকরণের বিশেষ কোন সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি না। জাতীয় মানসে যে অনুকরণের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়নি, সে অনুকরণের উদ্দেশ্য শুধু চমক সৃষ্টি করা। মানুষের জীবনে একটা বয়স থাকে যখন কোন নতুন জিনিস নতুন বলেই আগ্রহ সৃষ্টি করে। সে বয়সটা আমি পার হয়ে এসেছি বলে আমার কাছে নিছক নতুনত্বের 'গরবে গরবিনী' অনুকৃতির কোন মূল্য বা উপযোগিতা নেই।

একটা উদাহরণ দেই : ওদের দেশে মনোবিকার নিয়ে কিছু কিছু কাহিনী রচিত হয়ে থাকে। কাহিনীর ভিতর দিয়ে ফ্রয়েড্ বা অনুরূপ কোন মনোবিজ্ঞানীর তত্ত্ব এবং চিকিৎসা পদ্ধতির যৌক্তিকতা প্রমাণ করা হয়। টাইফয়েড রোগের কার্যকারণ এবং চিকিৎসা-পদ্ধতি যদি সাহিত্যের বিষয়বস্তু না হয় তবে মানসিক রোগের ক্ষেত্রেই বা তা কী করে সাহিত্যের বিষয়বস্তু হয় তা আমার মাথায় আসে না। তবু ওদেশে এ সব কাহিনীর কিছু যৌক্তিকতা এ জন্য স্বীকার্য যে ওখানে মানসিক চিসিৎসা অত্যন্ত ব্যাপকতা লাভ করেছে। মন নামক যন্ত্র, তার রোগ ও চিকিৎসা সম্পর্কে ও দেশের লোকের একটা ব্যাপক সচেতনতা আছে। আমাদের দেশে এই মানসিক প্রস্তুতিটা নেই বলে মনোবিকারের কাহিনীর অনুকরণকে কৃত্রিম অনুকরণ বলে গণ্য করা সঙ্গত। অবশ্য যদি মনোবিকার উপলক্ষ্য মাত্র হয় তা হলে তা স্বতন্ত্র কথা।

অবশ্য এখানে আর একটা প্রশ্ন দেখা দিতে পারে। জাতীয় মানসের প্রস্তুতি আর লেখকের প্রস্তুতি যে এক হতে হবে এমন কি কথা আছে। সাধারণ মানুষের তুলনায় লেখকের মন একটু বেশী অগ্রসর এ কথা যদি ধরে নেই, তবে কি এ-ও ধরে নেওয়া যায় না যে লেখক তাঁর সাহিত্যের ভিতর দিয়ে অপ্রস্তুত জাতীয় মানসকে প্রস্তুত করে নিতে পারেন?

এ প্রশ্নের জবাবে প্রথমেই এ কথা বলা দরকার যে দু'-একজন ক্ষণদীপ্ত জিনিয়সের কথা বাদ দিলে পনের আনি লেখকের ক্ষেত্রেই বলা চলে যে শিক্ষিত জনসাধারণের মানস থেকে তাঁদের মানস শ্রেষ্ঠ বা উন্নত এ কথা সরল বিশ্বাসে স্বীকার না করাই ভাল। লেখক-মানসের কিছু বৃত্তিগত বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন শ্রমিক ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ারের আছে। কিন্তু বৈশিষ্ট্য আর শ্রেষ্ঠত্ব এক কথা নয়। দ্বিতীয়ত, প্রশ্নটার মধ্যে একটা সুপ্ত ইঙ্গিত আছে যে জাতিকে (কোন না কোন ভাবে) শিক্ষিত করে তোলার একটা অলিখিত দায় আছে লেখকদের। এই 'গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল' গোছের মনোবৃত্তি আমরা যত তাড়াতাড়ি ত্যাগ করতে পারব ততই মঙ্গল।

কাজেই জাতীয় মানসে কোন অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে তবেই অনুকরণের যৌক্তিকতা স্বীকার্য। আমি অবশ্য এতদূর অবধি মানতে রাজী আছি যে যেহেতু লেখকের পক্ষে জাতীয় মানসকে পুরোপুরি জানা সম্ভব নয়, সেহেতু তিনি নিজের অভিজ্ঞতায় যে অনুকরণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করবেন তা তিনি অনুকরণ করবেন। কারণ তিনি জাতীয় মানসেরই অংশ। কিন্তু প্রয়োজনের অনুভূতিটা প্রকৃত হওয়া দরকার। হীনম্মন্যতা থেকে যে অনুকরণ প্রবৃত্তি জন্মে তা থেকে সাবধান থাকা দরকার।

জাতীয় মানস বা লেখক মানসের প্রয়োজন জিনিসটা কি সেটা বোধ করি একটু ব্যাখ্যা করলে ভাল হয়। মানুষ কখনও এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকে না। পরিবর্তন জীবনের ধর্ম।

এ যুগে দশ বিশ বা পঁচিশ বছর অন্তর অন্তর মানুষের মানসক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা দার্শনিক বিশ্বাসকে অবলম্বন করে কিছুদিন চলার পর তার সীমাবদ্ধতাগুলি নজরে পড়তে থাকে। সেই অনুযায়ী নূতনতর বিশ্বাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সময়ের মধ্যে সমাজে রাষ্ট্রে বা পৃথিবীতে যে সব ঘটনা ঘটে তার আলোতে নতুন করে চিন্তা করার প্রয়োজন দেখা দেয়। এক কথায় জীবনের নিত্য নতুন অভিজ্ঞতাই চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের জন্য দায়ী এবং তা অপরিহার্য নিয়মে সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তনকেও আবশ্যক করে তোলে।

এইভাবে জীবন যেমন সাহিত্যকে পরিবর্তনের পথে ঠেলতে থাকে, তেমনি সাহিত্যের মধ্যেও একটা আভ্যন্তরীণ গতি আছে। কোন একটি সাহিত্য ধারা বা রীতি অনুযায়ী কিছুদিন সাহিত্য-রচনা হওয়ার পর সেই রীতিতে আর নতুন কিছু সৃষ্টি করার সম্ভাবনা লোপ পায়। তখন শুরু হয় পুনরাবৃত্তি অনুকরণ এবং নানাবিধ ক্ষয়িষ্ণু প্রবণতার প্রতি আকর্ষণ। কিন্তু সাহিত্যের কাছে পাঠক নিত্য নতুনের দাবী নিয়ে উপস্থিত হয়। কাজেই পাঠকের চাহিদা মেটানোর জন্য নূতনতর রীতির অনুসন্ধান পর্ব শুরু হয়। এ কথা অবশ্য ঠিক নয় যে সাহিত্যে একটা সময় একটি মাত্র রীতিই অনুসৃত হতে থাকে। সব সময়ই একটা প্রবল রীতির পাশাপাশি গোন বা সুপ্তভাবে অন্য রীতি কার্যকরী থাকে। কালক্রমে এই শেষোক্ত রীতি কোন এক বা একাধিক শক্তিশালী লেখকের উপজীব্য হলে দেশের সাহিত্যে পরিবর্তন অত্যাবশ্যক হয়ে উঠে। সাধারণ কথায় আমরা অনেক সময় বলি যে ইংরাজী সাহিত্যে ক্লাসিক্যাল যুগের পরে রোমান্টিক যুগের আবির্ভাব ঘটেছিল। যেন একটি বিশুদ্ধ সাহিত্য আন্দোলনের অবসানে আর একটি বিশুদ্ধ সাহিত্য আন্দোলনের জন্ম হল। প্রকৃত ঘটনা এই যে ক্লাসিক্যাল যুগেও যথেষ্ট পরিমাণে রোমান্টিক প্রবণতা ছিল এবং রোমান্টিক যুগেও ক্লাসিক্যাল প্রবণতা ও প্রভাবের দৃষ্টান্তের অভাব নেই।

কাজেই সাহিত্যের ক্ষেত্রে পরিবর্তন দেখা দেয় দ্বিবিধ কারণে—আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। এই কারণগুলো যখন প্রবল হয়ে ওঠে তখনই আমরা বলি জাতীয় মানসে (বা লেখক মানসে বা যুগ মানসে) পরিবর্তনের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এখন এমনি একটা সময় উপস্থিত।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে যুগে যুগে যে রীতি বদলের পালা চলে তার মধ্যে কি কোন প্যাটার্ন আবিষ্কার করা যায়? ইংরাজী সাহিত্যের ঐতিহাসিকগণ বলেন যে উক্ত সাহিত্যে ক্লাসিকবাদ ও রোমান্টিকবাদ পর্যায়ক্রমে বার বার করে দেখা দেয়। এই পুনরাবর্তন মানে অবশ্য পুনরাবৃত্তি নয়; কিন্তু বেশবাস এবং উপাদানে আমূল পরিবর্তন দেখা দিলেও এবং নানারূপ জটিল মিশ্রণ ঘটলেও মৌল প্রবণতাতে মিল থাকে।

আলোচনার সুবিধার জন্য জটিলতা এড়িয়ে গিয়ে আমরা ক্লাসিকবাদকে রীতিপ্রাধান্য এবং রোমান্টিকবাদকে মন- বা ভাব-প্রাধান্য বলে উল্লেখ করব। বাস্তববাদ এই দুই বিপরীত আদর্শের জারজ সন্তান, ক্লাসিকবাদ বস্তুর প্রতি আনুগত্যকে স্বীকার করে, কিন্তু বস্তু সব সময় রীতির অধীন। রোমান্টিকবাদ রীতির বিরোধী। বাস্তববাদে বস্তুর প্রতি আনুগত্যই প্রধান; রোমান্টিকদের মতো রীতিকে সে অস্বীকার করে। তবু বলা চলে ক্লাসিকবাদের সঙ্গেই বাস্তববাদের সাযুজ্য বেশী।

ইংরাজী সাহিত্যের মত বাংলা সাহিত্যেও কি কোন প্যাটার্ন আবিষ্কার করা যায়? যায় কিনা তা চেষ্টা করে দেখায় নিশ্চয় আপত্তির কোন কারণ নেই। আমরা প্রাচ্যদেশবাসীরা

ধর্ম, নীতি, আদর্শ, শুভাশুভ প্রভৃতি নিয়ে একটু বেশী মাথা ঘামাই। সত্য এবং শিব সঙ্গে না থাকলে আমরা সুন্দরকে স্বীকার করতে রাজী হই না। এমনকি শিবের খাতিরে আমরা সত্যকে জলাঞ্জলি দিতেও কুণ্ঠিত হই না। মহাভারতের আশ্চর্য অকপটতার পরে রামায়ণে এসেই আমরা একটা দারুণ ঋজুতার আবহাওয়া অনুভব করি। সংস্কৃত নাট্য-সাহিত্যে দেখতে পাই অপ্রিয় সত্যকে অকপটে প্রকাশ করতে লেখকদের কতই না অনিচ্ছা। দুষ্মন্তের অপরাধ লাঘব করার জন্য কালিদাস আংটি হারানোর প্রক্ষিপ্ত গল্পটির অবতারণা করেছেন। কাজেই আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সূত্রপাতেই যে ঔচিত্যবাদের প্রবল চাপ অনুভব করা গিয়েছিল তা খুব স্বাভাবিক। এক হিসাবে বলা চলে উনিশ শতকীয় বাংলা সাহিত্যে মাইকেল এক নিঃসঙ্গ পথিক; তিনি ছিলেন অনৌচিত্যবাদী। কিন্তু তাঁকে বাদ দিলে তৎকালের বঙ্কিম-শাসিত সাহিত্য-প্রয়াসে ঔচিত্যবাদের জয়জয়কার। ঔচিত্যবাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র প্রভৃতি এবং সেই অনৌচিত্যবাদ অবশেষে শিল্পকৈবল্যবাদের অবক্ষয়ের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল। অতঃপর তারাশঙ্কর মাণিক প্রমুখ লেখকগণ, এবং তাঁদের পরে সুবোধ ঘোষ, মার্কসপন্থী লেখকগণ নূতন করে ঔচিত্যবাদের নানা রঙের পতাকা ধারণ করে এগিয়ে এলেন। আপাতত এই প্রবণতাটিতে অবক্ষয়ের চিহ্ন খুব সুস্পষ্ট এবং দেশ এক ভিন্নধর্মী সাহিত্য আন্দোলনের জন্য রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করছে।

অনৌচিত্যবাদ যে অশিবের সাধনা এ কথা মনে করা অবশ্য ভুল। অনেক সময় ঔচিত্যবাদ যখন কোন পুরাতন নীতি বা আদর্শকে অবলম্বন করে, তখন পরবর্তী যুগের অনৌচিত্যবাদ তাকে শিল্পের নামে আঘাত করে; কিন্তু আসলে তখন আড়ালে লুকিয়ে থাকে আর কোন যুগোপযোগী নৈতিক ভাবনা। আবার অনেক সময় অনৌচিত্যবাদী নীতি-নিরপেক্ষভাবে নিজের মানস অভিজ্ঞতাকে সাহিত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করতে চান। তখন তাঁর উদ্দেশ্য হয়তো নিরাবরণ সত্যকে উপস্থিত করা, নয়তো নির্ভেজাল সৌন্দর্য সৃষ্টি করা। তিনি যে নীতি-বর্জিত মানুষ তা নয়; কোন মানুষই তা হতে পারে না। কিন্তু তিনি অন্তত সাহিত্য সাধনার সময় ক্ষণকালের জন্য নৈতিকতার নিগর থেকে মুক্তিলাভ করতে চান।

সাধারণত ঔচিত্যবাদীর সত্যনিষ্ঠা থাক বা না থাক বাস্তবের প্রতি আনুগত্য বেশী; সেই হিসাবে ক্লাসিক বা বাস্তববাদী রীতির সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা বেশী। পক্ষান্তরে অনৌচিত্যবাদীরা মনোধর্মে অধিকতর অনুরক্ত; কাজেই তাঁদেরকে রোমান্টিকবাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা বেশী। কিন্তু মোটামুটিভাবে এই সাযুজ্য দেখতে পাওয়া গেলেও সর্বত্রই যে তা বর্তমান এ কথা বলা যায় না। মোটামুটিভাবে ঔচিত্যবাদী objective অনৌচিত্যবাদী subjective.

এই যে বস্তুমুখিনতা এবং ভাবমুখিনতা অথবা বহির্মুখিনতা এবং অন্তর্মুখিনতা,—এদের মধ্যে যতখানি মৌলিক পার্থক্য আছে বলে সাধারণত অনুমান করা হয় আসলে হয়তো তা নেই। সমালোচক আই. এ. রিচার্ড্‌সের মতে এ দুয়ের মধ্যে যে তফাৎটা আপাতত প্রতীয়মান হয় তা প্রকৃতপক্ষে ভাষার কারসাজি মাত্র। ভাষা-রহস্যের উপর আমার অতখানি দখল নেই বলে এ কথায় আমি পুরোপুরি সায় দিতে পারি না। এ দুয়ের মধ্যে আর কোন তফাৎ না থাক গুরুত্ব আরোপের তফাৎ নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তফাৎটাকে আমরা যতখানি বাড়িয়ে দেখি ততখানি বাড়িয়ে না দেখা সাহিত্য রস-উপলব্ধির পক্ষে কল্যাণজনক।

বস্তুবাদী মনে করেন যে জ্ঞানের উৎস হচ্ছে বস্তু বা বহির্জগৎ; আর ভাববাদী মনে করেন, জ্ঞানের উৎস তাঁর নিজের মনের মধ্যেই নিহিত আছে,—যুক্তি বা উপলব্ধির সাহায্যে নিজের মনের মধ্যেই জ্ঞানকে আবিষ্কার করা যায়। সাধারণ বুদ্ধিতে বস্তুবাদীর যুক্তিটাই স্বাভাবিক বলে মনে হয়; কিন্তু একটু ভাবতে গেলেই বোঝা যায় মনের বাইরে গিয়ে বস্তুকে জানার কোন উপায় আমাদের জানা নেই। আমাদের পাঁচটি ইন্দ্রিয় বাইরের জগতের কতকগুলি ছাপ বা impression মনের কাছে পেঁাছে দেয়; এবং সেই ছাপ-গুলিই আমাদের বস্তুকে জানার একমাত্র অবলম্বন। সেইগুলির সাহায্যে আমরা বস্তুজগতের একটি চিত্র মনে মনে রচনা করে নিই। এই জ্ঞান বস্তুজগতের অবিকল (Thing in itself-এর) জ্ঞান নয়। প্রত্যেকটি ইন্দ্রিয়ের এক একটি বিশেষ চরিত্র আছে; সেই চরিত্র অনুযায়ী তারা বস্তুজগতের কতকগুলি গুণের পরিচয় কমবেশী বিকৃতভাবে মনের কাছে এনে দেয়। আমরা যে কোন বস্তুকে লাল বা কালো বা সাদা দেখি, সেটা এক-ধরনের বিকৃতি; কারণ এ-সব রঙ বস্তুর নিজস্ব ধর্ম নয়, আরোপিত ধর্ম। বস্তু যে আলোক রশ্মি প্রতিফলিত করে, আমাদের চোখে বস্তু সেই রঙের বলে প্রতিভাত হয়। মন আবার ইন্দ্রিয়লব্ধ ছাপকেই যথাযথভাবে গ্রহণ করে না, সে আবার কল্পনার সাহায্যে সেগুলোকে পুনর্গঠিত করে। রেটিনার উপর কোন জিনিসের যে ছবি পড়ে তা অতি ক্ষুদ্র এবং উল্টানো। আমরা কিন্তু মনে করি যে আমরা জিনিসকে সোজাভাবেই দেখছি এবং পুরো মাপেরই দেখছি। কাজেই মন যে বস্তুজগতের চিত্র নির্মাণ করে তা বস্তুর প্রত্যক্ষজ্ঞান থেকে দু' ধাপ দূরবর্তী।

ইন্দ্রিয়গুলির সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করার জন্য বিজ্ঞান অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করেছে। কিন্তু ইন্দ্রিয়গুলি বস্তুজগতের যে গুণগুলির পরিচয় দান করে তার বাইরে যাওয়ার ক্ষমতা বিজ্ঞানের নেই। পাঁচটির চেয়ে কম ইন্দ্রিয়সম্পন্ন যে জীব আছে: তারা যদি খুব উন্নত বিজ্ঞানের অধিকারীও হত তা হলেও তারা আমাদের চেয়ে কম জানত। তেমনি যদি কোন কালে ষড়্-ইন্দ্রিয়সম্পন্ন কোন জীবের আবির্ভাব হয় তারা আমাদের চেয়ে অধিকতর বস্তুজ্ঞানের অধিকারী হবে।

কাজেই আমাদের বস্তুজ্ঞান আমাদের মন কর্তৃক সংগঠিত জ্ঞান। এবং তা আমাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পরিকল্পিত। আইনস্টাইন তাঁর subject-object-relativity তত্ত্বে স্পষ্টই স্বীকার করেছেন যে মানুষ যখনই বস্তুর সমীপবর্তী হয় তখনই সে তাকে রূপান্তরিত করে নেয়। প্রকৃতপক্ষেই আমরা একটা মন-গড়া জগতে বাস করছি; আমরা যে বাইরের জগৎটা দেখতে পাচ্ছি সেটা আমাদের মনের তৈরী জগৎ।

আমাদের জ্ঞান-লাভের প্রক্রিয়ার এই সীমাবদ্ধতার কথা মনে রাখলে এ কথা মনে হয় না কি যে বস্তুবাদী ও ভাববাদীর মধ্যে যতখানি পার্থক্য আমরা কল্পনা করি আসলে ততখানি পার্থক্য নেই। বিজ্ঞানীর মনে বস্তুর প্রকৃত জ্ঞানলাভের একটা সুদূরবর্তী আকাঙ্ক্ষা যে নেই তা নয়। কিন্তু কার্যত তিনি যা করেন তা হল আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে প্রতিভাত ঘটনাসমূহের পারম্পর্য অনুসন্ধান করা। যখন তিনি বার বার একই ধরনের পারম্পর্য দেখতে পান তখন তিনি তাদের মধ্যে একটা কার্যকারণের সূত্র আছে বলে অনুমান করেন। তারপর একটি তত্ত্বের সাহায্যে এই কার্যকারণকে তিনি ব্যাখ্যা করেন। আসলে এই তত্ত্বটি পুরোপুরিভাবে বৈজ্ঞানিকের মন-গড়া কল্পনা। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলো মিথ্ বা রূপকথা, যেমন আমাদের ইন্দ্র চন্দ্র বরুণাদি দেবতারা রূপকথা। বিজ্ঞানীর মিথ্

(myth)-কে ততক্ষণই আমরা বিশ্বাস করি যতক্ষণ তা ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারে; যখন তা পারে না তখন আবার ভিন্নতর মিথের দরকার হয়। বৈজ্ঞানিক মিথের সঙ্গে পৌরাণিক মিথের তফাৎ এই যে প্রথমোক্তের নির্দেশ লঙ্ঘন করলে বিপদ ঘটার সম্ভাবনা, এবং দ্বিতীয়োক্তের নির্দেশ অমান্য করলে খুব সম্ভব কিছু হবে না। শনিঠাকুরকে অবজ্ঞা করেও প্রাণে বেঁচে থাকা যায়. কিন্তু আগুনে পোড়ায় এ নির্দেশ অমান্য করলে হাত বা পায়ের মায়া ছাড়তে হতে পারে।

কাজেই আমার মনে একটা বেড়ালের চিন্তা জেগেছে—এটা যেমন একটা মানসিক ঘটনা, তেমনি আমি একটা বেড়াল দেখতে পাচ্ছি—এটাও তেমনি একটা মানসিক ঘটনা। শেষোক্ত ঘটনাটিতে ইন্দ্রিয়-বাহিত যে ছাপটিকে মন বেড়াল বলে ব্যাখ্যা করছে, সে ছাপটির উৎস বাইরের জগতের কোন একটা কিছু বড়জোর এই পর্যন্ত স্বীকার করতে পারি। কিন্তু বাইরে যে জিনিসটা আছে এবং যাকে আমরা বেড়াল বলি এ দুই হুবহু এক কিনা তা জানার আমাদের কোন উপায় নেই। আমাদের মন এক নিশ্ছিদ্র সাম্রাজ্য যার বাইরে পা দিয়ে বাস্তবের প্রত্যক্ষ জ্ঞানলাভের কোন উপায় আমাদের জানা নেই।

আমি উপরে যে কথাগুলি বললাম এগুলো বৈজ্ঞানিক সত্য. কূট যুক্তি নয়। এইভাবে দেখলে জড়বাদী ও ভাববাদীর মধ্যে পার্থক্য অনেকখানি হ্রাস পাবে। আসলে উভয়েই নিজের মনের মধ্যেই যাবতীয় জ্ঞানলাভ করেন বা বিভিন্ন হলেও, মানসিক পদ্ধতিতে জ্ঞানকে সংগঠিত করেন। উভয়ের মধ্যে তফাৎ হচ্ছে গুরুত্ব আরোপের। বিজ্ঞানী সর্বদাই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য জগতের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন: তাঁর আবিষ্কৃত সত্যকে অবশ্যই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অপরিহার্য পারম্পর্য দ্বারা সমর্থিত হওয়া চাই। যে সব মানসিক (বা জাগতিক) ঘটনাসমূহকে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয়ীভূত করা যায় না তাকে তিনি উপেক্ষা করেন। পক্ষান্তরে ভাববাদী প্রমাণযোগ্য নয় এমন উপলব্ধি-বা যুক্তিলব্ধ তত্ত্বে বা সিদ্ধান্তে বিশ্বাসী। বিজ্ঞানীর জগৎ খুব সীমাবদ্ধ জগৎ। আমাদের মনে এমন অনেক আবেগ অনুভূতি কল্পনা সিদ্ধান্ত বিশ্বাসের জন্ম হয় যা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার আওতায় আসে না। বিজ্ঞানীর কাছে সে সব উপেক্ষনীয়।

এবং প্রকৃতবাদী (Naturalist) এবং বাস্তববাদী লেখকের কাছেও। প্রকৃত-বাদীর সাহিত্য রচনার পেছনে এই বৈজ্ঞানিক চিন্তা কাজ করছে যে মানুষের চরিত্র পুরোপুরিভাবে তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারা সংগঠিত। কিন্তু মজা এই যে এমন কোন প্রথম শ্রেণীর লেখককে খুঁজে পাওয়া যায় না যিনি পুরোপুরি এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে অনুকরণ করে চলেছেন। ব্যালজাক্‌কে ন্যাচার্যালিজমের অগ্রদূত বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট ফাদার গোরিও-র অপরূপ চরিত্রকে কি তার পারিপার্শ্বিকের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায়?

উপরে আমি যে জড়বাদ আর ভাববাদ নিয়ে এতখানি আলোচনা করলাম তার একটু সঙ্গত কারণ আছে। মনের মধ্যে জড়বাদী বা ভাববাদী কুসংস্কার অনেক সময়েই সাহিত্য রস-উপলব্ধিতে বাধা জন্মায়। লেখকরা অনেক সময়েই এমন সব সিদ্ধান্ত বা বক্তব্য বা চরিত্র বা ঘটনা আমদানী করেন যা বৈজ্ঞানিকভাবে সমর্থনযোগ্য নয়। বিজ্ঞানের বাতিকগ্রস্ত পাঠকদের পক্ষে এ সবের রস উপলব্ধি করা কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয় অনেক সময় বিজ্ঞানের অনুশাসন লেখকদের কল্পনার মুক্তির পথে বিরাট বাধা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক সময় তাঁরা রচনায় আইন লঙ্ঘন করার লোভ সামলাতে পারেন না এবং সে জন্য তাঁরা অপরাধ

বোধে পীড়িত হন। এই অনাবশ্যক মানসিক সঙ্কীর্ণতা এবং আত্মপীড়ন থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য এ কথা জেনে রাখা ভাল যে আমরা সবাই myth তৈরী করছি,—জড়বাদী ভাববাদী বৈজ্ঞানিক দার্শনিক সাহিত্যিক সবাই। বিজ্ঞানীর myth আর সাহিত্যিকের myth-এর মধ্যে তফাৎ আছে। প্রথমটা আমাদের ব্যবহারিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য; এবং তা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপায়ে প্রমাণযোগ্য। দ্বিতীয়টি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণযোগ্য নয়, কিন্তু তারও প্রয়োজন আছে। আমাদের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে, মনের বিস্তারের পক্ষে এ জিনিস অপরিহার্য।

মনের এই উদারতা এখন আরও বাঞ্ছনীয় এই জন্য যে খুব সম্ভব বাংলা সাহিত্যের গতি এখন রোমান্টিকবাদ এবং ভাববাদের দিকে। সাহিত্যের স্বাভাবিক গতিকে বাধা দিলে তার ফল ভাল না-ও হতে পারে।

আগেই বলেছি বৈজ্ঞানিক অনুশাসন মেনে লিখতে গেলে লেখককে কতকগুলো বাধার সম্মুখীন হতে হয়। যখনই কোন কল্পনা মাথায় আসে তখনই তাঁকে ভাবতে হয় সে কল্পনা বিজ্ঞানানুমোদিত কিনা। বিজ্ঞানচর্চা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর ভিত্তিমূলে রয়েছে কতকগুলি বিশ্বাস। তাদের মধ্যে প্রধান এইটে যে বিজ্ঞানের সাহায্যে সমাজের উন্নতি বা অগ্রগতি সাধিত হবে। প্রকৃতবাদীর মত বাস্তববাদী কোন নির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব অনুসরণ করেন না বটে, কিন্তু তাঁর দৃষ্টিও প্রধানত বস্তুমুখী, সমাজমুখী। মানুষকে সমাজ ও চরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান দেওয়া, বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজের উপযোগী মূল্যবোধ, নীতিবাদ প্রভৃতি গঠন করা, প্রয়োজনবোধে সমাজ সংস্কার করা,—এইসব কার্যক্রম প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বাস্তববাদী লেখককে নিয়ন্ত্রিত করে। সমাজতাত্ত্বিক বাস্তববাদ মার্কস্‌বাদকে বিজ্ঞান বলে ধরে নিয়ে সমাজের সমস্ত অভিজ্ঞতাকে একটি নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে ফেলতে চেষ্টা করেন। যে-সব অভিজ্ঞতা এই ছকের আওতায় পড়ে না সে-সবকে তিনি উপেক্ষা করেন। এই ঔচিত্যমুখী চিন্তা মানুষের সাহিত্য প্রচেষ্টাকে বস্তুমুখী করে রাখে। অবশেষে একটা সময় আসে যখন মানুষের অন্তরাত্মা এইসব আরোপিত সীমাবদ্ধতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।

এই বিদ্রোহ ঘোষণা আরও শক্তিশালী হয়ে ওঠে সেই সব সময়ে যখন বিশ্বাস আর জীবনের অভিজ্ঞতার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। বাংলাদেশে আজকে সেই ধরনের একটি সংকটকাল দেখা দিয়েছে। দশ বা পনের বছর আগে যাদের মধ্যে ঐকমত ছিল এমন পাঁচজন লোক আজকে এক আসরে মিলিত হলে দেখা যাবে পাঁচজন পাঁচভাবে চিন্তা করছেন। আজকের দিনের অনেক মার্কস্‌বাদীই স্টালিনপন্থী রাশিয়া এবং চীনের কার্যকলাপ দেখে মার্কস্‌বাদ সংশোধনের কথা চিন্তা করছেন। অনেক গান্ধীবাদী আছেন যাঁরা ভারত সরকারের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি দেখে গান্ধীবাদের বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করছেন। আজকে এমন একটা সময় এসেছে যখন প্রত্যেকের থেকে প্রত্যেকের চিন্তা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। একজন মানুষ আজ যা চিন্তা করছেন, কাল তা পুনর্বিবেচনার দরকার বোধ করছেন। এইভাবে যদিও মানুষের বিশ্বাসের ভিত্তিভূমি শিথিল হয়ে গিয়েছে, তথাপি ব্যবহারিক জীবনের প্রয়োজনে তারা বিভিন্ন দল উপদল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেদের জড়িয়ে নিচ্ছে। দল বা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত থাকার তাগিদে তারা নিজেদের স্বাধীন চিন্তা বা মতকে অল্পাধিক বিসর্জন দিতে বাধ্য হচ্ছে।

এইরকম সময়ে এটা খুব স্বাভাবিক যে মানুষ বাইরের হট্টগোল থেকে দৃষ্টি সরিয়ে

এনে নিজের অন্তরের দিকে মনোযোগ নিবন্ধ করবে। বাইরের কোলাহলে আমরা অনেক কাল মত্ত হয়ে থেকেছি, আমাদের চারপাশে অনেক জড়বস্তু জড়ো করেছি। আজকে প্রয়োজন ধীর স্থিরভাবে নিজের অন্তরকে পরীক্ষা করা। দলীয় উদ্দেশ্য প্রচার বা শিক্ষা-দানের মোহ ত্যাগ করে আজকে খোলাখুলিভাবে জানা ও প্রকাশ করা দরকার কী আমার প্রকৃত অভিজ্ঞতা। এই যুগ এই দেশ এই পৃথিবী আমার মনে কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করছে, কোন্ ঘটনাগুলি আমার মনকে বিষিয়ে দিচ্ছে, কোন্ ঘটনাগুলি আমার মনে আশা সঞ্চার করছে—এগুলি আজ অকপটে বলার সময় এসেছে। সত্যি সত্যি আমি কী চাই, আমার লক্ষ্য কী, মানুষ সম্পর্কে আমি কোন্ উপলব্ধিতে পৌঁছেছি,—কারও মুখের দিকে না তাকিয়ে এ সব কথা আজকে বলতে হবে লেখককে।

এক কথায় এই প্রক্রিয়ার নাম অন্তর্মুখিনতা, এবং তার জন্য লেখকের পক্ষে প্রয়োজন চরিত্রের একটি গুণ অর্জন করা—আন্তরিকতা বা অকপটতা। সাম্প্রতিক বাংলা ছোটগল্পে যে পরীক্ষামূলকতা দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে এই অন্তর্মুখিনতার লক্ষণ সুস্পষ্ট। এই লক্ষণ রয়েছে বাংলা গীতিকাব্যের ক্ষেত্রে। কিন্তু আমাদের বাণিজ্যবুদ্ধিসম্পন্ন রম্যরচনা-ধর্মী উপন্যাসে এখনও এই লক্ষণ প্রায় অনুপস্থিত।

সাম্প্রতিক 'বাংলা ছোটগল্পে' যে সব সাহিত্য-রীতি আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য চেতনাপ্রবাহের রীতি (Streams of Consciousness), প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার এবং নয়া বাস্তববাদ (New Realism)।

এই প্রসঙ্গগুলি নিয়ে আলোচনায় অগ্রসর হওয়ার আগে একটা কথা বলা দরকার। ঘরোয়া আলোচনায় অনেক সময় লক্ষ্য করেছি এগুলিকে নতুন আঙ্গিক বলে উল্লেখ করা হয়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তু থেকে বিচ্ছিন্ন করে আঙ্গিকের চিন্তা করাটায় বিপদের সম্ভাবনা আছে। অনেক সময় আমরা ভাবি যে আঙ্গিক এ যেন একটা বাক্স এবং যে কোন আঙ্গিকরূপ বাক্সে যে কোন বিষয়বস্তুকে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়। (উপমাটি আমেরিকান New criticism-গোষ্ঠীর অন্যতম সমালোচক ক্লন্থ ব্রুকসের)। এই ধরনের চিন্তা খুব বিভ্রান্তিকর। আসলে সাহিত্যে পৃথক আঙ্গিক বা পৃথক বিষয়বস্তু বলে কোন উপাদান নেই; সাহিত্য একটি অখণ্ড বস্তু; ভারতীয় বলে আমরা তাকে 'রস' বলে উল্লেখ করতে পারি। আলোচনার সুবিধার জন্য কখনো কখনো আঙ্গিক বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে পৃথকভাবে বলার দরকার হয় বটে, কিন্তু এরা যে আসলে পৃথক নয় এ কথা মনে রাখা দরকার। একটি কাহিনীকে একাধিকভাবে প্রকাশ করা হয়তো সম্ভব, বর্ণনা ও সংলাপ ব্যবহারের মধ্যে কিছু তারতম্য হয়তো করা যায় (যদিও তাতেও রসের বিভিন্নতা ঘটে)। কিন্তু ফীল্ডিং-এর কাহিনীকে কিছুতেই জেমস্ জয়সের মত করে প্রকাশ করা যায় না বা সেকস্পীয়রীয় নাট্যবস্তুকে কোন উপায়েই ইবসেনীয় নাট্য ছাঁচের মধ্যে ঢালা সম্ভব নয়। কোন বিষয়বস্তুর যখন জন্ম হয়, তখন সেই সঙ্গে তার জন্য প্রয়োজনীয় প্যাটার্নেরও জন্ম হয়। বরং বলা চলে যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্দিষ্ট প্যাটার্নটি দৃষ্টিগোচর হচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত বিষয়বস্তুও শুধু দূরে থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে, হাতে ধরা দিচ্ছে না। মাইকেলকে তাঁর আঙ্গিকের জন্য মিলটন থেকে হোমর পর্যন্ত ধাওয়া করতে হয়েছিল; কারণ রামায়ণ মহাভারত কিংবা মঙ্গলকাব্যের আঙ্গিকে তাঁর প্রয়োজন সিদ্ধ হত না।

কোন তরুণ লেখক যদি ভাবেন যে তিনি তাঁর পুরোনো বিষয়বস্তুকে নতুন আঙ্গিকে নতুন বেশে সজ্জিত করে উপস্থিত করবেন, তবে সে চেষ্টা হবে হাস্যকর। নতুনত্ব-পিয়াসী

কিছু কিছু লেখকের মধ্যে আমি এ ধরনের প্রয়াস লক্ষ্য করেছি বলেই কথাটা উল্লেখ করলাম। লেখকের মনে একটা পুরোনো ধরনের কাহিনী এবং পুরোনো ধরনের বক্তব্য রয়েছে; তিনি কাহিনীটিকে তার স্বাভাবিক পারম্পর্য অনুযায়ী বাস্তববাদী ঢঙে প্রকাশ করতে চাইছেন না। একজনের স্মৃতিতে কাহিনীটা এলোমেলোভাবে অসংলগ্নভাবে ভেসে উঠছে এইভাবে লেখক কাহিনীটি প্রকাশ করছেন। এর ফলে কাহিনীটি উদ্ধার করতে পাঠককে কিছু অনাবশ্যক বাড়তি পরিশ্রম করতে হচ্ছে; তার চেয়ে বেশী কিছু লাভ হচ্ছে বলে মনে হয় না। এই লেখকরা হয়তো Arbitrary Dial নামক একটি রীতির অনুসরণ করতে চান। আমাদের মনে অনেক সময় সময়-বোধের বিপর্যয় ঘটে, অতীত ভবিষ্যৎ বর্তমান একই সঙ্গে পারম্পর্যহীনভাবে এসে জড়ো হয়,—এই রীতি তাই সাহিত্যে উপস্থাপিত করতে চায়। আসলে এটা চেতনা প্রবাহ রীতিরই অনুষঙ্গমাত্র, এবং এর পিছনে আছে জীবন সম্পর্কে এক নতুন ধরনের উপলব্ধি।

বিষয়টি সম্পর্কে তরুণ লেখকদের বিশেষভাবে অবহিত হওয়া দরকার। নিজের মনে বিশেষভাবে অনুসন্ধান করে দেখা দরকার তাঁর মনে যে বিষয়বস্তু (বা অনুভূতি বা উপলব্ধি) প্রকাশ লাভের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে, তা প্রকৃতই নতুন কিছু কিনা, সত্যিই তা নতুন কোন প্যাটার্ণের সাহায্য ছাড়া গতানুগতিকভাবে প্রকাশ করা অসম্ভব কিনা। মদ যদি পুরোনো হয় তবে তাকে নতুন বোতলে সরবরাহের চেষ্টা বিড়ম্বনা মাত্র।

Stream of Consciousness-এর কথাই ধরা যাক। Stream of Consciousness কেবলমাত্র একটি নতুন আঙ্গিক নয়, একটি নতুন বিষয়বস্তুও বটে,—মানুষের মন ও চরিত্র সম্পর্কে একটি নতুন উপলব্ধি। অবশ্য এক ধরনের Stream of Consciousness অনেক আগে থেকেই উপন্যাসে প্রচলিত আছে। মানুষের চিন্তা বা অনুভূতি বা ভাবাবেগ-প্রবাহের আনুপূর্বিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ দেওয়ায় অষ্টাদশ শতকের রিচার্ডসন যে নৈপুণ্য দেখিয়েছিলেন আধুনিক লেখকরাও তাকে সহজে ছাড়িয়ে যেতে পারবেন না।

রিচার্ডসন জর্জ এলিয়ট মেরেডিথ্ প্রভৃতির উপন্যাসকে মনোবিশ্লেষণমূলক উপন্যাস বলা হয়। আসলে এই মনোবিশ্লেষণ বাস্তববাদেরই রকমফের: লেখক objectively চরিত্রের মনের গতিকে পর্যবেক্ষণ করছেন। এ-সবের সঙ্গে তুলনায় প্রুস্ত্ বা জেমস্ জয়েসের প্রয়াস সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ফ্রয়েড তাঁর মানসিক চিকিৎসার অবাধ ভাবানুষঙ্গ প্রক্রিয়া নামে একটি প্রক্রিয়া ব্যবহার করতেন। তার উদ্দেশ্য ছিল, মনটাকে ভাবনামুক্ত করে লক্ষ্য-মুক্ত করে যদি অবাধে বিচরণ করতে দেওয়া হয় তবে একটা কথার খেই ধরে by association অনেক আপাত অসংলগ্ন কথা এসে পড়ে, এবং তার মধ্যে অনেক সময় গভীর মনের গুপ্ত কথা জানতে পারা যায়। জয়েস প্রমুখ লেখকরা ফ্রয়েডের থেকে এই ইঙ্গিতটুকু মাত্র গ্রহণ করেছেন, কিন্তু চিকিৎসকের মত objectively তাঁরা এই পদ্ধতির প্রয়োগ লক্ষ্য করেন নি। তাঁরা চেয়েছেন অবাধ ভাবানুষঙ্গের উপায়ে নিজের মনের গভীরে অবতরণ করে মন বলে কথিত বস্তুটির স্বরূপ উদ্ঘাটন করা। তাঁদের প্রক্রিয়া আত্মানু-সন্ধানের প্রক্রিয়া, subjective। তাঁরা দেখেছেন যে আমরা যে মনে করি মানুষের একটি বিশিষ্ট চরিত্র আছে, কতকগুলি বিশিষ্ট ধ্যান-ধারণা মূল্য-বোধ নীতিবোধ প্রভৃতি আছে, এ-সবই সমাজ কর্তৃক আরোপিত মনের উপরিভাগের একটি খোলসমাত্র। আসলে মন বলতে কোন অখণ্ড সত্তাকে বোঝায় না, মন কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অসংলগ্ন পরস্পরবিরোধী ইমেজের প্রবাহ-মাত্র। জড়বাদী যেমন বস্তুকে ভাঙতে ভাঙতে শেষ পর্যন্ত এমন এক

জায়গায় পেঁৗছেছেন যেখানে বস্তুকে খ‍ুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, রয়েছে কতকগ‍ুলো শক্তি-কণা মাত্র; ঠিক তেমনি জয়েস প্রম‍ুখ লেখকরাও মনকে ভাঙতে ভাঙতে এমন জায়গায় গিয়ে পেঁৗছেছেন যেখানে মন বলে কোন কিছ‍ুকে খ‍ুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। মনের গভীরে আছে কতকগ‍ুলো ইন্‌স্‌টিংক্ট বা সহজাত প্রবণতা; সমাজ কর্তৃক প্রতিহত হয়ে এই Instinct-গ‍ুলি নানারকম প্রতীকের ছদ্মবেশে আত্মপ্রকাশ করে। জয়েসের রচনায় তাই প্রতীকের ছড়াছড়ি। একটা শব্দের মাথার সঙ্গে আর একটা শব্দের লেজ জ‍ুড়ে দিয়ে নতুন শব্দ তৈরী করতে জয়েস খ‍ুব ভালবাসেন; কারণ আমাদের মন নাকি সম্প‍ূর্ণগ‍ুলোকে ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নতুন সম্প‍ূর্ণ গড়তে খ‍ুব ওস্তাদ। আমরা এক দেড় প‍ৃষ্ঠার একটি আধ‍ুনিক কবিতার রসোপলব্ধি করতে হিমসিম খেয়ে যাই; জয়েসের গোটা উপন্যাসখানাই একটি বা কয়েকটি আধ‍ুনিক কবিতামাত্র। এই অত্যন্ত দ‍ুষ্পাচ্য সাহিত্যকর্মের পাঠক-সংখ্যা যে-কোন সমাজেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ হতে বাধ্য।

আমরা যদি আমাদের মনের আত্ম কণ্ড‍ূয়নকে নিপ‍ুণভাবে দ্রষ্টা হিসাবে লক্ষ্য করি তা হলে সহজেই দেখতে পাব যে ষোল বছরের মন আর প‍ঁয়তাল্লিশ বছরের মনের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। এইভাবে দেখলে মনের ধারাবাহিকতা বা মনের ক্রম-পরিণতি বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব খ‍ুঁজে পাওয়া যায় না। কোন মান‍ুষের জীবনকে আদ্যোপান্ত দেখলে যে বহ‍ু পরস্পরবিরোধিতা বহ‍ু অসামঞ্জস্যের মধ্যেও finished art-এর মতো একটা সমগ্রত দেখতে পাব তা নয়। Stream of Consciousness-এর লেখকরা তাই ক্ষণিকের প‍ূজারী। মনের যদি কোন সত্য থেকে থাকে তবে তা ম‍ুহ‍ূর্তেই ধরা পড়ে। এই-সব লেখকদের উপন্যাসে তাই কোন ধারাবাহিক কাহিনীর বদলে কতকগ‍ুলো বিচ্ছিন্ন ম‍ুহ‍ূর্তের প‍ুঙ্খান‍ু-প‍ুঙ্খ বিবরণ মাত্র থাকে।

Stream of Consciousness-এর লেখকদের এ-কথা মনে রাখা দরকার যে এটা দ‍ুটো ভিন্ন ধরনের সত্যের প্রশ্ন। মনকে স‍ূক্ষ্মভাবে দেখলে তার এক ধরনের সত্যের পরিচয় পাই, আবার স্থ‍ূলভাবে দেখলে তার আর এক ধরনের সত্য জানতে পারি। যেমন বস্তুর ক্ষেত্রে : স্থ‍ূলভাবে প্রতিটি পদার্থের এক একটি নিজস্ব চরিত্র আছে, কিন্তু স‍ূক্ষ্ম-ভাবে দেখলে সব পদার্থের মধ্যেই গ‍ুটিকয়েকমাত্র শক্তি-কণার লীলা দেখতে পাওয়া যায়। স্থ‍ূল সত্য আর স‍ূক্ষ্ম সত্যের মধ্যে যে কোথায় সঙ্গতি আছে তা আমরা জানি না। কাজেই লেখককে আগেই মনস্থির করে নিতে হবে। তিনি যদি গভীর মনের সত্য সম্পর্কে কোন উপলব্ধিকে সাহিত্য-ভাত করতে চান তবে তাঁকে মনে রাখতে হবে যে সেখানে কোন সামাজিক বক্তব্য, ম‍ূল্য-বোধ নীতিবোধের কোন স্থান নেই। এ-সব জিনিসের প্রতি যাঁর পক্ষপাত আছে, Stream of Consciousness-এর রীতি তাঁর পক্ষে উপযোগী নয়। আবার বলি মনের চিন্তা-প্রবাহ বা অন‍ুভূতি-প্রবাহের বর্ণনা বাস্তববাদী সাহিত্যেও প্রচুর দেখা যায়। তার সঙ্গে ভাবান‍ুষঙ্গ রীতির আকাশ পাতাল পার্থক্য বিদ্যমান।

Stream of Consciousness-এর রীতিতে সাহিত্য রচনার প্রয়াস বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। তার একটি কারণ এই যে এইভাবে মান‍ুষের মনকে দেখলে মান‍ুষে মান‍ুষে তফাৎ থাকে না; যে-কোন মান‍ুষের মনের ভাবান‍ুষঙ্গের বিবরণ একরকম হতে বাধ্য। তার ফলে জিনিসটা একঘেঁয়ে এবং নিত্য নতুন রসের সাহিত্য স‍ৃষ্টির উপাদান হিসাবে অন‍ুপযোগী হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে Stream of Consciousness-এর রীতি য়‍ুরোপে অনেক কাল আগেই পরিত্যক্ত হয়েছে এই সব কারণে। আজকাল অবশ্য কিছ‍ু ফরাসী ও জার্মান ছোট

উপন্যাসে ও ছোট গল্পে Stream of Consciousness-এর কিছু কিছু অনুবর্তন যে একেবারে না দেখা যায় এমন নয়। কিন্তু এ-সবই নকল-মাত্র, আসল জিনিস নয়। হতাশা-গ্রস্ত নৈরাশ্যপীড়িত মানুষের মানসিক অবস্থার চিত্রায়নে খানিকটা প্রতীক-সমৃদ্ধ ভাবানুষঙ্গের অনুরূপ কৌশল গ্রহণ করলে তাতে বেশ ভাল effect সৃষ্টি হয়। তাতে কাহিনীর একটা ক্ষীণ কাঠামো বজায় রেখে কাব্যোচিত আবহাওয়া রচনা করা যায়। আসলে এগুলো একটি ঘন নিবিড় আবেগ সৃষ্টির পক্ষে একটি কার্যকরী কৌশল-মাত্র; Stream of Consciousness-এর রীতি যে-তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত তার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই।

উপরে যে আসল আর নকলের বিবরণ দিলাম এদের উভয়েরই নিজের নিজের ক্ষেত্রে শিল্পোপযোগিতা আছে। কিন্তু বাংলাদেশে আমি Stream of Consciousness রীতিতে রচিত যে ক'টি ছোট গল্প পড়েছি সেগুলো এর কোনটার মধ্যেই পড়ে না। আমার আশঙ্কা এই যে এমন একটা বুদ্ধিপ্রধান রীতিকে অবলম্বন করার আগে যে পরিমাণ মানসিক প্রস্তুতি দরকার তা আয়ত্ত না করেই উৎসাহী তরুণ লেখকরা নতুনত্বের ঝোঁকে এই ধরনের প্রয়াসে অগ্রসর হয়েছেন।

আমার মনে হয় মনের গভীর অনুভূতি বা উপলব্ধিকে প্রকাশ করার জন্য রূপকধর্মী রচনার উপযোগিতা অনেক বেশী। অনেক সময় বাস্তবতার সঙ্গে ফ্যান্টাসী বা আজগুবি কল্পনার সংমিশ্রণ ঘটিয়ে গভীর তাৎপর্যপূর্ণ চিন্তাধারাকে হাজির করা যায়। এ-বিষয়ে কাফ্‌কা এবং কামুর উদাহরণ বাঙ্গালী লেখকদের কাছে খুবই পরিচিত। এ'দের রচনার মধ্যে এমন এক অনন্যতা আছে যে এ'দের অনুসরণ বা অনুকরণ করতে যাওয়া খুবই বিপজ্জনক। তথাপি এ'দের লেখা থেকে আমরা অন্ততপক্ষে এটুকু বুঝতে পারি যে কাহিনী বজায় রেখেও, কাহিনীর পারম্পর্য অক্ষুণ্ণ রেখেও গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়বস্তু পরিবেশন করা যায়। কাহিনীর মধ্যে কাহিনী অতিরিক্ত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারার মধ্যেই রসের সার্থকতা। অনেক সময়ে নিছক বাস্তবরসের কাহিনীর মধ্যে প্রতীকী তাৎপর্য আরোপ করে অদ্ভুত ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করা সম্ভবপর। বাস্তবতার কাঠামো বজায় রেখে রূপক-ধর্মী রচনাও বিদেশী বইতে কিছু কিছু দেখা যায়। বাস্তবতাবর্জিত রূপকগল্প ঈশপের কাহিনীগুলির মত উপদেশাত্মক গল্প বা জ্ঞানাত্মক গল্প হয়ে দাঁড়ায়। তার রসাবেদন স্বভাবতঃই কম। রবীন্দ্রনাথের মত লেখককেও রূপকধর্মী চরিত্রগুলোকে যাতে পুতুল বলে মনে না হয় সেজন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করতে হয়েছে।

প্রতিভাবান লেখকের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু মাঝারী লেখকদের পক্ষে কাহিনী এবং চরিত্রের স্বাভাবিক আবেদনকে উপেক্ষা করে কোন দুষ্পাচ্য রচনারীতিকে অবলম্বন করতে যাওয়া একটি বিপজ্জনক পরীক্ষা। তাতে অনেকখানি সময় এবং শ্রমের বিনিময়ে ব্যর্থতা-লাভের আশঙ্কা থাকবে। আবার বলি, মোটামুটি বাস্তবতার আবরণ বজায় রেখেও রূপক এবং প্রতীকের ব্যবহার সম্ভবপর এবং এইভাবে মনের গভীরতর অনুভূতিকে প্রকাশ করা যায়।

বাস্তববাদ এবং নয়া বাস্তববাদে অনেক তফাৎ। নয়া বাস্তববাদের যে কয়েকটি নজীর আমার চোখে পড়েছে তাতে আমার মনে হয়েছে যে এটা লেখকের subjective অনুভূতি প্রকাশের একটি পরোক্ষ উপায়মাত্র। আপাতত মনে হয় বটে জীবনের যে কুৎসিত অপ্রিয় সত্যকে প্রকাশ করতে বাস্তববাদ সঙ্কুচিত হয়, নয়া বাস্তববাদ সেখানে অকুণ্ঠভাবে বাস্তবের মুখোমুখী হতে পারে। কিন্তু আসলে তফাৎটা আরও গভীর। বাস্তববাদী

বিজ্ঞান-নিষ্ঠ, তিনি সমাজের কোন এক অংশের মোটামুটি সম্পূর্ণ চিত্র দিতে চান। তিনি একপেশেমী পরিহার করে চলেন এবং তিনি সাংগঠনিক মনোভাব-সম্পন্ন। পক্ষান্তরে নয়া বাস্তববাদী লেখকের দৃষ্টি একপেশে। তিনি জীবনের মধ্যে evil-কে পাপকে, বা মানুষের দুরদৃষ্টকে তার ন্যায়সঙ্গত শেষ সীমা পর্যন্ত উদ্‌ঘাটন করতে ইতস্ততঃ করেন না। এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তির বদলে সংবেদনশীল মানবাত্মার তীব্র জ্বালা-বোধ অনেক বেশী প্রকাশমান। নয়া বাস্তববাদ জীবনের হতাশা-বোধ ব্যর্থতা-বোধের তীব্রতম প্রকাশ। অথচ বাহ্যত একটি সম্পূর্ণ objective কাহিনীই তার অবলম্বন। এই রচনারীতির বিপদ এইখানটায় যে তা অনায়াসেই সিনেমা-সুলভ sensationalism বা স্নায়ু উত্তেজক কাহিনীতে পর্যবসিত হতে পারে।

বাংলাদেশে নয়া বাস্তববাদের কিছু কিছু অনুকরণ শুরু হয়েছে। এই রচনারীতির সুষ্ঠু প্রয়োগ হলে কিছু সম্ভাবনা আছে বলে মনে হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত এ-জাতের দু'একটি ছোট গল্প মনে আশার সঞ্চার করেছে। আবার অনেক সময়, যে কথা একটু আগে বলেছি, সস্তা sensation সৃষ্টির প্রয়াস দেখতে পাচ্ছি।

পরিশেষে, যে সব পরীক্ষামূলক প্রয়াস আপাতত আমাদের সামনে রয়েছে সেগুলোর শিল্পোৎকর্ষ এখনই খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন নয়। সেগুলির মধ্যে যে অন্তর্মুখিনতার ইঙ্গিত দেখতে পাচ্ছি সেটা এ-যুগের পক্ষে একটা সঙ্গত দাবী বলেই অভিনন্দন-যোগ্য। কিন্তু এই প্রসঙ্গে আবার বলি, অন্তর্মুখিনতা আর বহির্মুখিনতা আসলে একই বাস্তবের দুই ভিন্ন ধরনের উপলব্ধি; উভয়েই মানস-ক্রিয়ার ফল। বাস্তব সম্পর্কে যার উপলব্ধি যে-রকম তার সেই অনুযায়ী প্রকাশ-রীতি নির্বাচন করাই সঙ্গত। নিছক বৈচিত্র্যবিলাস প্রকৃত শিল্পসৃষ্টির পক্ষে খুব অনুকূল মনোভাব নয়। প্রকৃতবাদ বা বাস্তববাদের চেয়ে চেতনাপ্রবাহ বা প্রতীকবাদ শ্রেষ্ঠতর এ-রকমের কোন সংস্কারকে মনে প্রশ্রয় না দেওয়াই ভাল। ফীল্ডিং অপেক্ষা স্টার্ণ, হার্ডি অপেক্ষা জয়েস বা স্টেইনবেক অপেক্ষা ফক্‌নার শ্রেষ্ঠতর শিল্পী এ-কথা কোন স্থির-বুদ্ধি সমালোচক স্বীকার করবেন না।

ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

ঘটনা হিসাবে বিস্ময়কর হলেও একথা সত্য প্রতীচী লেখকদের কলমেই ভারতবর্ষের ইতিহাস জন্মলাভ করে। অন্তত সমকালীন গবেষণালব্ধ তথ্যের ভিত্তিতে ভারতবর্ষের ইতিহাস আনুপূর্বিকভাবে রচনার চেষ্টার জন্য প্রতীচ্যের লেখকদের কাছে আমাদের ঋণ অনস্বীকার্য। ১৭৮৩ সালে স্যার উইলিঅম জোন্স-এর ভারত-আগমন এবং ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা ভারত-ইতিহাস চর্চার ইতিহাসে দুটি স্মরণীয় ঘটনা, কারণ ভারতবাসীর মধ্যে স্বদেশ-সন্ধিৎসার সূত্রপাতের সঙ্গে ঘটনা দুটির যোগ ঘনিষ্ঠ। ১৭৮৮ সালে 'এশিয়ার ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, শিল্প, বিজ্ঞান ও সাহিত্যে' গবেষণার ফসলবাহী "এশিয়াটিক রিসার্চেস" পত্রের আত্মপ্রকাশে এই কথাই প্রমাণিত হল : এশিয়া তথা ভারতবর্ষেরও ইতিহাস এবং সংস্কৃতি আছে এবং তা পুরাতন ব'লে পর্যাপ্ত গবেষণার বিষয়ীভূত। আরও পরে বেরোল 'কোয়ার্টার্লি জার্নাল' (১৮২১) 'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স' (১৮২৯) এবং 'জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটি' (১৮৩২)। নতুন আবিষ্কার মূল্যবান ও ধারণা-সিদ্ধান্তে দেদীপ্যমান এই পত্রিকা দুটি ইতিহাস-গবেষণার ক্ষেত্রকে বিস্তৃততর করল। স্যার উইলিঅম জোন্স, যিনি ভারতবর্ষের উন্নত সভ্যতায় বিশ্বাসী, শুধু বিশ্বাসী নয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে প্রাচীতত্ত্ব তথা ভারতবিদ্যা-গবেষণার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করলেন। এবং সেই বনিয়াদের উপর হর্ম্যনির্মাণের দায়িত্ব নিলেন যাঁরা তাঁরাও বিদেশী : উইলকিন্স, উইলসন, কোলব্রুক, জেমস প্রিন্সেপ, কানিংহাম, ম্যাক্স মূলার, মনিয়ার উইলিঅমস—অনেক নামের মধ্যে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য নাম। এই বিদেশী মনীষিবৃন্দের কাছ থেকেই ভারতবাসী শুনল তার গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। শুনে উপলব্ধি করল অন্য সভ্য দেশের মতো তারও অতীত আছে। এবং হয়তো উৎসাহিত ভবিষ্যতও।

জোন্স-প্রিন্সেপ-কানিংহামের বিপরীত মেরুতে ছিলেন একশ্রেণীর প্রতীচী লেখক : জেমস মিল, ওঅর্ড, মার্শম্যান। এ'রা ছিলেন আত্মতুষ্ট, অহংদৃপ্ত। ভারতবর্ষের মতো একটা অসভ্য দেশকে তাঁরা সভ্য করেছেন নানাভাবে এই কথাটার প্রচারণাতেই তাঁদের সমস্ত প্রয়াস সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁদের এই উচ্চমন্য দৃষ্টিভঙ্গী ভারতীয়দের মধ্যে বিরক্তির সঞ্চার করল এবং সেই বিরক্তির সঙ্গে অনিবার্যভাবেই স্বদেশপ্রেম উন্মীলিত হল। ইতিমধ্যে জোন্স-উইলসন-কোলব্রুক-প্রিন্সেপ প্রমুখের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্য উপকরণ সংগৃহীত হয়েছে। সেই তথ্য উপকরণ দিয়েই মিল-মার্শম্যানদের উচ্চমন্যতাকে কঠোরভাবে আঘাত দেওয়া যায়। সুতরাং মার্শম্যানের "হিস্‌ট্‌রী অফ ইন্ডিয়া" বা "হিস্‌ট্‌রী অফ বেঙ্গল" জাতীয় গ্রন্থের আদর্শে স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়োজন কি? নতুনভাবে স্বাধীনভাবে স্বদেশের ইতিহাস রচনা করতে হবে। প্রমাণ, ১৮৫৭ সালে নীলমণি বসাক বাংলায় লেখা এ দেশের পুরাবৃত্তের অভাব দূর করার জন্য "ভারতবর্ষের ইতিহাস" লিখলেন। দু'বছর বাদে ১৮৬০ সালে একজন কেদারনাথ দত্ত 'স্বাধীন ও সংস্কারমুক্ত কলম'-এ স্বদেশের ইতিহাস রচনার প্রয়াস পেলেন; নাম

"ভারতবর্ষের ইতিহাস।"

সংক্ষেপে এইভাবে উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই বাংলাদেশে একটি স্বদেশচেতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছিল।[১] এই সম্প্রদায়ের অনেকেই সুগৃহীতনামা, দু'চারজন যেমন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং মধুসূদন দত্ত। এই অবিস্মরণীয়দের কর্মে কৃতিত্বে মনীষায় ভাস্বর উনিশ শতকী বাংলার ইতিহাসের পাতায় আর-একটি শ্রদ্ধার্হ নাম : রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

পূর্ব কলকাতার শুঁড়ার এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত বংশে ১৮২২ খ্রীস্টাব্দে ১৬ ফেব্রুয়ারী রাজেন্দ্রলাল জন্মগ্রহণ করেন। পাথুরিয়াঘাটার ক্ষেমচন্দ্র বসুর ইংরেজি স্কুলে এবং গোবিন্দচন্দ্র বসাকের হিন্দু ফ্রি স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষাপর্ব সমাপন করে তিনি পনেরো বছর বয়সে মেডিকেল কলেজে ভর্তি হন। চার বছর পড়াশোনা করার পর তিনি কলেজের বিদেশী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বিবাদহেতু কলেজ ছেড়ে দেন। সমসাময়িক শিক্ষাবিষয়ক সরকারী প্রতিবেদনে রাজেন্দ্রলালকে মেডিকেল কলেজের কৃতী ছাত্রদের অন্যতম বলে স্বীকৃতি পেতে দেখা যায়। কৃতিত্বের নিদর্শনস্বরূপ তিনি একটি রৌপ্যপদক ও পঞ্চাশ টাকা পেয়েছিলেন। মেডিকেল কলেজ ছাড়ার পর রাজেন্দ্রলাল কিছুদিন আইনশাস্ত্র পড়েছিলেন। তারপর তিনি ভাষাশিক্ষায় মনঃসংযোগ করেন। ফার্সী, সংস্কৃত, হিন্দী ও উর্দুতে তিনি প্রশংসনীয় পারঙ্গমতা অর্জন করেছিলেন। এ ছাড়া ইংরেজি ভাষাতেও তাঁর বিশেষ অধিকার ছিল, তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধাবলিই তার প্রমাণ।

তাঁর একান্ত জীবন সম্পর্কে উল্লেখনীয় এই, ১৮৩৯ সালের অগস্ট মাসে তিনি নিমতলার ধর্মদাস দত্তের কন্যা শ্রীমতী সৌদামিনীর পাণিগ্রহণ করেন। পাঁচ বছর পরে সৌদামিনী দেবী পরলোকগমন করেন। আনুমানিক আটত্রিশ বছর বয়সে রাজেন্দ্রলাল ভবানীপুরের কালীধন সরকারের কন্যা শ্রীমতী ভুবনমোহিনীকে বিবাহ করেন। ভুবনমোহিনীর গর্ভে রমেন্দ্রলাল ও মহেন্দ্রলাল নামে রাজেন্দ্রলালের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করেন।

৩

অসংখ্য ঘটনার মধ্যে দু'একটি ঘটনাই মানুষের জীবনে সুদূরপ্রসারী ফল নিয়ে

[১] এই স্বদেশচেতনা ও ইতিহাসবোধের সুস্পষ্ট স্বাক্ষর ১২৮১ বঙ্গাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের স্মরণীয় উক্তি : 'বাঙ্গালার ইতিহাস নাই।...যে দেশে গৌড়, তাম্রলিপ্তি, সপ্তগ্রামাদি ছিল, যেখানে নৈষধচরিত-গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য, রঘুনাথশিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।'

১৮৫৭ সালে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের বইর বিজ্ঞাপনেও এই ধরনের কথা শোনা যায় :

'এই দেশের যে পুরাবৃত্ত আছে, তাহা ইংরাজী ভাষাতে লিখিত, বাঙ্গালা ভাষাতে এই পুরাবৃত্ত প্রায় নাই। এই ভাষাতে যে দুই একখানা পুস্তক দেখা যায়, তাহা ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত।......এই সকল পুস্তক বালকদিগের পাঠের উপযোগী নহে, এইজন্য তাহা কোন পাঠশালাতে পঠিত হয় না, সুতরাং বালকেরা ভারতবর্ষের ভালমন্দ কিছুই জানিতে পারে না, ইংরাজী পুস্তক পাঠ করিয়া অনেক বালকের এমত সংস্কার জন্মে যে এদেশের ধর্ম্মকর্ম্ম সকলি মিথ্যা এবং হিন্দুরা পূর্ব্বকালে অতি মূঢ় ছিলেন, অপর বালকেরা অন্য দেশের ইতিহাস কণ্ঠস্থ করিয়া রাখে, কিন্তু জন্মভূমির কোন বিবরণ বলিতে পারে না।'

হাজির হয়। রাজেন্দ্রলালের জীবনে এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সংযোগ। ১৮৪৬ খ্রীস্টাব্দের ৫ই নভেম্বর রাজেন্দ্রলাল মাসিক ১০০ টাকা বেতনে সোসাইটির সহকারী কর্মসচিব ও গ্রন্থাধ্যক্ষ হন। এশিয়াটিক সোসাইটিতে দশ বছর তিনি কাজ করেছিলেন, কিন্তু এই দশ বছরের কর্মকালই তাঁর চিন্তাজীবনের ভিত্তিভূমি রচনা করেছিল। সোসাইটিতে তিনি বহু প্রাচীতত্ত্বজ্ঞের সান্নিধ্যে যেমন আসার সুযোগ পেয়েছিলেন, তেমনি ঐ প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহও তাঁর জ্ঞানার্জনের পক্ষে পরম সহায়ক হয়েছিল। ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে রাজেন্দ্রলাল ওঅর্ডস ইন্স্টিটিউশন-এর পরিচালকপদে যোগদান করলেও এশিয়াটিক সোসাইটির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেননি। ঐ বৎসরে ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁকে সোসাইটির সাধারণ সদস্য বলে ঘোষণা করা হয় এবং জুন মাসে তাঁকে সোসাইটির কাউন্সিলের অন্যতম সদস্য মনোনীত করা হয়। সেকালে কোন ভারতীয়ের পক্ষে কাউন্সিলের সদস্য নির্বাচিত হওয়া বিশেষ সম্মানের বিষয় ছিল। রাজেন্দ্রলাল অনুরূপ সম্মানিত ভারতীয়দের অন্যতম ছিলেন।

এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগদানের দু'বছর পরে, ১৮৪৮ খ্রীস্টাব্দে, রাজেন্দ্রলাল গবেষকরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ঐ বছরের এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালের জানুআরি সংখ্যায় তাঁর প্রবন্ধ Inscription from the Vijaya Mandir, Udaypur প্রকাশিত হয়। এটিই রাজেন্দ্রলালের প্রথম রচনা। ১৮৪৮-এর নভেম্বর মাসে তিনি কামন্দক-কৃত নীতিসার নামে প্রাচীন ভারতের রাজনীতি সংক্রান্ত সুপ্রাচীন গ্রন্থের একটি পুঁথির প্রতি সোসাইটির কর্মসচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। মেজর কিটো নামে একজন বিদ্যোৎসাহী ঐ মূল্যবান পুঁথিটি সোসাইটিকে উপহার দিয়েছিলেন। রাজেন্দ্রলালের বিদ্যাবত্তায় আস্থাশীল সোসাইটির কর্মসচিব ও কাউন্সিল-সদস্যরা সোসাইটি-প্রবর্তিত Bibliotheca Indica নামে গ্রন্থমালায় পুঁথিটি প্রকাশের সিদ্ধান্তই শুধু গ্রহণ করেননি, তাঁর উপর সমগ্র পুঁথিটি সম্পাদনের ভারও অর্পণ করেন। ১৮৮৪ সালে উপরি-উক্ত গ্রন্থমালায় কামন্দকীয় "নীতিসার" প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থমালায় রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় "তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ" ১-৩ খণ্ড (১৮৫৯, ৬০, ৯০), "তৈত্তিরীয় আরণ্যক" (১৮৭২), "ঐতরেয় আরণ্যক" (১৮৭৬), "ললিতবিস্তর" (১৮৭৭), "বায়ুপুরাণ", ১-২ খণ্ড (১৮৮০, ৮৬) "অষ্ট-সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা" (১৮৮৮) প্রভৃতি আরও কয়েকটি সুপ্রাচীন গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

রাজেন্দ্রলাল পরিচিত ও জ্ঞাত পুঁথি নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন না, নতুন পুঁথির সন্ধানেও তাঁর উৎসাহ ও প্রয়াস ছিল অপরিসীম। তাঁর এই সন্ধানকার্যের ফলে অনেক নতুন ও মূল্যবান পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। ১৮৭০ থেকে ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে আবিষ্কৃত সংস্কৃত পুঁথিগুলি সম্পর্কে তিনি *Notices of Sanskrit Manuscripts* নামে একটি পরিচিতি-গ্রন্থ প্রকাশ করেন। ন'টি খণ্ডে প্রকাশিত এই গ্রন্থখানি রাজেন্দ্রলালের বিদ্যোৎ-সাহিতা ও পরিশ্রমের প্রদীপ্ত প্রমাণ। ঐ সময়ের মধ্যে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহভুক্ত পুঁথি, বিকানীরের মহারাজার গ্রন্থাগারভুক্ত পুঁথি, অযোধ্যায় প্রাপ্ত পুঁথি প্রভৃতি সম্পর্কেও কয়েকটি পরিচিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় পুঁথিসংগ্রহ সংক্রান্ত প্রতিবেদন-গ্রন্থগুলিরও উল্লেখ করা যায়।

ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলালের চারখানি স্মরণীয় বই: দুখণ্ডে প্রকাশিত *The Antiquities of Orissa* (প্রথম খণ্ডের প্রকাশ ১৮৭৫, দ্বিতীয় খণ্ডের ১৮৮০), *Buddha Gaya, the hermitage of Sakya Muni* (১৮৭৮), দুখণ্ডে প্রকাশিত *Indo-Aryans* (১৮৮১) এবং *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* (১৮৮২)। সময়ের ক্ষয়কারী প্রভাবে তাঁর অন্যান্য বইগুলির মূল্য হ্রাস পেলেও প্রথম ও চতুর্থ বই দু'টি উপকরণের ঐশ্বর্যে এখনো পণ্ডিতমহলের সশ্রদ্ধ বিস্ময়।

১৮৬৮-৬৯ সালের শীতকালে বাংলাদেশের তদানীন্তন লেফটেনাণ্ট গভর্নর গ্রে সাহেব রাজেন্দ্রলালের উপর উড়িষ্যার মন্দিরগুলি সম্পর্কে সরজমিনে বিস্তৃত তথ্য ও উপকরণ আহরণের ভার অর্পণ করেন। কয়েকজন কারিগর ও শিল্পীকে নিয়ে তিনি ভুবনেশ্বর, পুরী, কোনারক প্রভৃতি মন্দির-নন্দিত স্থানগুলিতে যান। উদ্দেশ্য: মন্দিরগুলি পর্যবেক্ষণ এবং সেই কারিগর ও সঙ্গে শিল্পীদের দিয়ে মন্দিরগুলির শিল্পানুকৃতি ও মন্দিরগত অলঙ্করণের নিদর্শন প্রস্তুত করা। উড়িষ্যার মন্দিরগুলি সম্পর্কে যতখানি বিস্তৃত ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তথ্যসংগ্রহ-ও- বিশ্লেষণ সেকালে সম্ভব ছিল, রাজেন্দ্রলাল তার নিঃসন্দিগ্ধ স্বাক্ষর রেখে গেছেন তাঁর এই গ্রন্থে। গ্রন্থটির প্রথম খণ্ডে উড়িষ্যার প্রত্নবস্তুসমূহের প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্য সাধারণভাবে বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডটি বিভিন্ন মন্দির ও প্রত্নবস্তুর স্বতন্ত্র ও বিশদ আলোচনার গ্রন্থনায় প্রকাশিত। প্রথম খণ্ডের 'ভূমিকা'য় প্রাচীন সাহিত্যে উড়িষ্যা সংক্রান্ত তথ্যগুলি সমাহৃত হয়েছে। এবং ভারতীয় স্থাপত্যের ইতিহাস, উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য, ভাস্কর্য ও স্থাপত্যগত অলংকরণ, ভাস্কর্য-নিদর্শন থেকে উড়িষ্যার মন্দিরনির্মাতাদের সামাজিক অবস্থা, উড়িষ্যার শিল্পকলার বিবর্ধন-বিবর্তনে হিন্দুধর্মের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার দান খণ্ডটির অবশিষ্ট পাঁচটি পরিচ্ছেদে স্থানলাভ করেছে। দ্বিতীয় খণ্ডে খণ্ডগিরির প্রত্ননিদর্শন, এবং ভুবনেশ্বর পুরী, কোনারক ও সত্যবাড়ি এবং দর্পণ, জাজপুর, অলাতি প্রভৃতি স্থানের মন্দিরনিচয় সম্পর্কে তথ্যবহুল আলোচনা আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থিত হয়েছে।

The Antiquities of Orissa পরিশ্রম ও মনীষার হার্দ্য সমন্বয়ে, ভারতীয় কলমে ইতিহাসরচনার ক্ষেত্রে, স্মরণীয় কীর্তি।

রাজেন্দ্রলালের আর-একটি গ্রন্থ *Buddha Gaya, the hermitage of Sakyamuni.* এই গ্রন্থ অবশ্য *The Antiquities of Orissa*-র মতো সুপ্রসিদ্ধ নয়। মৌলিকতার দিক থেকেও এটি খুব উল্লেখনীয় নয়। গ্রন্থের ভূমিকায় লেখক নিজেও সে কথা স্বীকার করে বলেছেন, গ্রন্থটির অধিকাংশ উপাদান তিনি তাঁর পূর্বসূরী কিটো, কানিংহাম ও অন্যান্যদের বুদ্ধগয়া-সংক্রান্ত রচনাবলি থেকে সংগ্রহ করেছেন এবং গ্রন্থপ্রণয়নে মৌলিক তথ্যানুসন্ধানীর চাইতে পরিচিত তথ্যসংগ্রাহকের ভূমিকাকেই প্রধানত বেছে নিয়েছেন। তবে মূলত পূর্ব-সূরীদের আবিষ্কৃত তথ্যকে ভিত্তি করলেও সব সময় তিনি তাদের ব্যবহারে নির্বিচার নন; প্রয়োজনমতো কোন কোন তথ্যকে যাচাই করে পূর্বসূরীদের অভিমত সিদ্ধান্তের উপর নতুন আলোকপাত করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রত্নতত্ত্ববিৎ হিসাবে কিটো কানিংহাম অবশ্যই শ্রদ্ধেয় কিন্তু ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁদের সমস্ত মতই যে অভ্রান্ত নয়, ১৮৭৮ সালে—ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের শৈশবাবস্থায়—এ কথা একজন ভারতীয়ের পক্ষে প্রশংসনীয় নয় কি?

দু'খণ্ডে প্রকাশিত *The Indo-Aryans* ভারতের ইতিহাস, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত বিভিন্ন প্রবন্ধের নির্বাচিত সংকলন। *The Antiquities of Orissa* গ্রন্থেরও কিছু কিছু অংশ এতে স্থান লাভ করেছে। গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলির বিষয়-বৈচিত্র্য বিস্ময়কর। একদিকে জটিল নন্দনতত্ত্ব বা প্রাচীন ভারতের মন্দিরস্থাপত্য, অন্যদিকে প্রাচীন ভারতে খাদ্য হিসাবে গোমাংসের ব্যবহার বা প্রাচীন ভারতে সুরাপান—নানা ধরনের বিষয় অবলম্বনে লেখা প্রবন্ধগুলি রাজেন্দ্রলালের অধ্যয়নের বিস্তৃতিই শুধু প্রমাণ করে না, সেই সঙ্গে তাঁর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও কিছুটা ঐতিহাসিকসুলভ নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীরও পরিচয় প্রবন্ধগুলিতে বিদ্যমান।

গৃহীতনামা হজসন সাহেব নেপাল থেকে ৩৮১ বাণ্ডিল সংস্কৃতে লেখা প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথি আবিষ্কার ক'রে বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যের উপর যুগান্তকারী আলোকসম্পাত করেন। আবিষ্কৃত পুঁথিগুলির মধ্যে ৮৫ বাণ্ডিল হজসন কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিকে দেন। সোসাইটির তদানীন্তন সভাপতি আর্থার গ্রোট পুঁথিগুলির প্রামাণিকতা ও ঐতিহাসিক মূল্য সম্পর্কে স্থিরনিশ্চয় হয়ে সেগুলিকে অবিলম্বে বিদ্বজ্জনসমক্ষে প্রকাশ করতে ব্যগ্র হলেন। তিনি পুঁথিগুলিকে পরীক্ষা এবং তাদের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ ও লিপিবদ্ধ করার ভার রাজেন্দ্রলালের উপর অর্পণ করলেন। হরিনাথ বিদ্যারত্ন, রামনাথ তর্করত্ন এবং কামাখ্যানাথ তর্কবাগীশ নামে তিনজন পণ্ডিতের সহায়তায় রাজেন্দ্রলাল সমস্ত পুঁথি পরীক্ষণ ও বিষয়বস্তু-সংকলনকার্য শেষ ক'রে ফেললেন। তাঁর এই অসাধারণ পরিশ্রমের ফল চতুর্থ গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal.* এখানে মনে রাখা দরকার, সমস্ত পুঁথিই যে উক্ত তিনজন পণ্ডিত পড়েছিলেন বা তাদের বিষয়বস্তু সংকলন করেছিলেন তা নয়, রাজেন্দ্রলাল নিজেও অনেক পুঁথি পড়ে তাদের সারসংগ্রহ করেছিলেন। তা ছাড়া পণ্ডিতদের প্রত্যেকটি পাঠ ও বিষয়বস্তু সংকলন তিনি মূল পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছিলেন। এই সময় রাজেন্দ্রলাল অসুস্থ হয়ে পড়লে (সম্ভবত অত্যধিক পরিশ্রমে) হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁকে সাহায্য করতে চাইলেন। এবং মোট ১৬টি বড় পুঁথির বিষয়বস্তুর ইংরেজী অনবাদ ক'রে দেন।[১] পরবর্তীকালে পুঁথিসংগ্রহ, পুঁথির বর্ণনাত্মক সূচিসংকলন ইত্যাদি কাজে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী যে-অসাধারণ দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য দেখিয়েছিলেন, রাজেন্দ্র-লালের সঙ্গে সংযোগে তার উৎসভূমি নিহিত, এ কথা মনে করাটা খুব একটা অন্যায় হবে না। সংক্ষেপে, *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* ভারতবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি অবিস্মরণীয় কীর্তি। আয়তনেই শুধু নয়, উপাদানের প্রাচুর্যে ও ঐতিহাসিক ঐশ্বর্যে এটি মহাগ্রন্থের মর্যাদা দাবি করতে পারে এবং আজও এ গ্রন্থ পণ্ডিতমহলে শ্রদ্ধার সঙ্গে পঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজেন্দ্রলালের এই গ্রন্থভুক্ত 'মহাবস্তু-অবদান'-এর কুশের কাহিনী (পৃ. ১৪২-৫) এবং 'শার্দুলকর্ণাবদান' (পৃ. ২২৩-৪) থেকে রবীন্দ্রনাথ যথাক্রমে তাঁর "রাজা" (১৯১০) ও "শাপমোচন" (১৯৩১) এবং "চণ্ডালিকা"র (১৯৩৩) কাঠামো নিয়েছিলেন।[২] এ ছাড়া আরও কিছু কিছু কবিতার জন্যও—যেমন, 'পরিশোধ' (বজ্রসেন ও শ্যামার কাহিনী)—রবীন্দ্রনাথ আলোচ্য গ্রন্থের কাছে ঋণী।

[১] গ্রন্থের সূচীপত্রে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর অনূদিত অংশগুলির পুঁথিসংখ্যার পাশে H.P.S. আদ্যক্ষর আছে।

[২] মূল গল্পে নায়ক এবং নায়িকা কুশ এবং তদীয় পত্নী সুদর্শনা। 'রাজা'য় সুদর্শনা নাম অবিকৃত কিন্তু নায়ক শুধুমাত্র 'রাজা' বলে অভিহিত। 'শাপমোচন'-এ কুশ এবং সুদর্শনা অরুণেশ্বর এবং কমলিকায় নামান্তরিত হয়েছেন। 'অরূপরতন' (১৯২০) 'রাজা'র-ই ভিন্নতর সংস্করণ।

শুধু ইংরেজী নয়, মাতৃভাষাকেও রাজেন্দ্রলাল তাঁর ইতিহাস-সাধনার অন্যতম মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। এ দিক থেকে রাজেন্দ্রলাল উনিশ শতকের স্বদেশচেতন বাঙালী সমাজের একজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে "বিবিধার্থ সংগ্রহ" নামে যে-সাময়িকপত্রের প্রকাশ ঘটল, তার পরিচয়-ই হল 'পুরাবৃত্তেতিহাস প্রাণিবিদ্যা শিল্পসাহিত্যাদিদ্যোতক মাসিকপত্র'। ইংরেজিতে যাকে বলে পেনি ম্যাগাজিন, "বিবিধার্থ সংগ্রহ" ছিল তা-ই এবং বাংলা ভাষায় এটিই প্রথম সচিত্র ও সর্বস্বর পত্রিকা। 'যাহাতে সাধারণ জনগণে অনায়াসে বিদ্যালাভ করিতে পারে' সেই মহান উদ্দেশ্য নিয়েই রাজেন্দ্রলাল পত্রিকাটি বার করেছিলেন। এবং পত্রিকাটি যে এ বিষয়ে কী আশ্চর্য সার্থকতার সামীপ্য লাভ করেছিল, "জীবনস্মৃতি"র পাঠকমাত্রই তা জানেন। এবং "জীবনস্মৃতি" রচনাকালে যখন কবি আক্ষেপ ক'রে বলেন,—

'এই ধরনের কাগজ একখানিও নাই কেন।...সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পড়িবার একটি মাঝারি শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না' ('জীবনস্মৃতি', বিশেষ সংস্করণ, ৬৩)।

তখন বোঝা যায় সার্থক সম্পাদক হিসাবেও রাজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের কতখানি শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

বস্তুত, "বিবিধার্থ সংগ্রহ" বাঙালীর ইতিহাসচেতনার উদ্বোধন-বিবর্ধনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। পত্রিকাটি শুধুমাত্র এদেশের ইতিহাস-ভূগোল-বা- পুরাবৃত্ত সংক্রান্ত আলোচনা প্রকাশেই ক্ষান্ত ছিল না, পরন্তু সমগ্র বিশ্বই ছিল "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর বলয়-ধৃত। "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-র পাঠক তাই কাশ্মীরদেশের, হুলকরাজ্যের, বা রোহিলাদিগের ইতিহাসের সঙ্গে আরব লোক দ্বারা পারশ্যদেশের পরাজয়ের বা রুষিয়া রাজ্যের ইতিহাস জানবার দুর্লভ সুযোগ অর্জন করেছিল। তা ছাড়া "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এ দেশের কীর্তিমান পুরুষদের জীবন-চরিত আলোচনার মাধ্যমে দেশবাসীর সামনে সমুচ্চ আদর্শ স্থাপনের প্রয়াস পেয়েছিল, সে কথাও এ সূত্রে স্মরণীয়। উদাহরণস্বরূপ "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এ 'ক্রমশঃ প্রকটিত' শিবাজীর জীবনালেখ্য—নবেম্বর ১৮৬০ সালে "শিবজীর চরিত্র" নামে পুস্তিকাকারে মুদ্রিত—রচনার উল্লেখ করা যায়। রাজা চন্দ্রগুপ্তের বিবরণ বা অশোক সম্পর্কিত প্রবন্ধ (ঐ প্রবন্ধে অশোকের অনুশাসনের ব্যাখ্যা ও ব্রাহ্মী অক্ষরের প্রতিলিপি প্রদত্ত হয়েছিল) প্রকাশ ক'রে রাজেন্দ্রলাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য সেকালের জ্ঞানলিপ্সু বঙ্গভাষীদের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছিলেন। "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর ঐতিহাসিক রচনার পাশাপাশি দেশবিদেশের পশুপাখির সচিত্র বর্ণনা, ভৌগোলিক ও বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ, নানাবিধ শিল্পদ্রব্যসংক্রান্ত আলোচনা, সদ্যপ্রকাশিত গ্রন্থাদির বিশ্লেষণমূলক পরিচিতি প্রভৃতি স্থান পেত। এবং এখানে অবশ্যই উল্লেখ্য, সাময়িকপত্রে গ্রন্থ-সমালোচনার রীতি প্রবর্তনের সম্মান রাজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। বিশ্লেষণাত্মক ও বৈদগ্ধ্যগর্ভ গ্রন্থ-সমালোচনার যে-কয়েকটি নমুনা আলোচ্য পত্রিকা থেকে পাওয়া গেছে, এ কালের মননশীল গ্রন্থসমালোচকরাও তাদের সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি দেবেন ব'লে আমার বিশ্বাস।

১৮৬১ সালে "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-র প্রচার বন্ধ হ'য়ে যায়। রাজেন্দ্রলালের সম্পাদনায় ১৮৬৩ সালের ফেব্রুআরি মাসে "রহস্য-সন্দর্ভ" নামে অনুরূপ একটি সচিত্র মাসিক পত্রিকা

প্রকাশিত হয় কিন্তু প্রায় ন বছর চলার পরে পত্রিকাটি উঠে যায়।

স্বদেশী কলমে দেশের ইতিহাস রচনা প্রয়োজন, প্রয়োজন শুধু নয়, জাতীয় কর্তব্য—উনিশ শতকের প্রথমার্ধেই এই বোধ বাঙালীচিত্তে উন্মীলিত হ'তে শুরু করেছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"য় (প্রতিষ্ঠাকাল ১৬ অগস্ট ১৮৪৩) 'প্রাচীন হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা' (১৭৭১ শকাব্দ, ৭১ সংখ্যা) বা 'ভারতবর্ষের সহিত অন্যান্য দেশের পূর্ব্বকালীন বাণিজ্যবিবরণ' (ঐ, ৭৮ সংখ্যা) জাতীয় প্রবন্ধ বাঙালীর স্বদেশচেতনা ও ঐতিহাসিক জিজ্ঞাসার পরিচয়বাহী। "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-এর প্রকাশের মূলে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র আদর্শ অনুপ্রেরণার কাজ করেছিল। "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ও "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-র তৈরি জমির উপর "বঙ্গদর্শন" (১২৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত) আবির্ভাব তাই স্বভাবী ঘটনা হিসাবেই পরিগণ্য। ইতিহাস-চেতনা জাতীয় জাগরণের ভিত্তিভূমি, উনিশ শতকের বাঙালী সমাজে সেই চেতনা সঞ্চারে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" "বিবিধার্থ সংগ্রহ" এবং "বঙ্গদর্শন" পত্রিকা তিনটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যভাবে, "বিবিধার্থ সংগ্রহ"-র ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল নবজাগ্রত দেশবন্ধ বঙ্গমনীষার প্রতিনিধিদের অন্যতম।

শুধু ইতিহাসেই নয়, ভাষাতত্ত্ব, ভূগোল, জীবতত্ত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে রাজেন্দ্রলালের আগ্রহ ও জিজ্ঞাসা লক্ষণীয়। "জীবনস্মৃতি"তে রবীন্দ্রনাথ আমাদের জানিয়েছেন, তাঁর অগ্রজ জ্যোতিরিন্দ্রনাথের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'সারস্বত সমাজ'-এর (প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৮২ খ্রীস্টাব্দ) প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজেন্দ্রলাল। ১২৮৯ সালে ২রা শ্রাবণ সমাজের প্রথম অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে রাজেন্দ্রলাল বাংলা বানানের উন্নতি সাধন, ঐতিহাসিক অথবা ভৌগোলিক নামগুলির বানানে নির্দিষ্ট নীতি অনুসরণ, ইংরেজী পারিভাষিক শব্দের যথার্থ অনুবাদ প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ ক'রে সমাজের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থার প্রতি ইংগিত দিয়েছিলেন। 'সারস্বত সমাজ' স্বল্পায়ু নিয়ে এসেছিল, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'যে কয়দিন সভা বাঁচিয়া ছিল, সমস্ত কাজ একা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই করিতেন। ভৌগোলিক পরিভাষা নির্ণয়েই আমরা প্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। পরিভাষার প্রথম খসড়া সমস্তটা রাজেন্দ্রলালই ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন।'[১] রাজেন্দ্রলালের মাতৃভাষাপ্রীতি, বৈদগ্ধ্য এবং কর্মৈষণা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধাগর্ভ উক্তি : "তখন যে বাংলা সাহিত্যসভার প্রতিষ্ঠাচেষ্টা হইয়াছিল সেই সভায় আর কোনো সভ্যের কিছুমাত্র মুখাপেক্ষা না করিয়া যদি একমাত্র মিত্র মহাশয়কে দিয়া কাজ করাইয়া লওয়া যাইত তবে বর্তমান সাহিত্য পরিষদের অনেক কাজ কেবল সেই একজন ব্যক্তি দ্বারা অনেক দূর অগ্রসর হইত সন্দেহ নাই।'[২]

রাজেন্দ্রলাল কিছু কিছু ভৌগোলিক পরিভাষিক শব্দের অনুবাদ করেছিলেন যেমন Isthmus = সংকটস্থান, peninsula = প্রায়দ্বীপ ইত্যাদি।[৩] 'প্রাকৃত ভূগোল' নামে তিনি

[১] জীবনস্মৃতি, পৃ. ১২৭
[২] জীবনস্মৃতি, পৃ. ১২৮
[৩] মন্মথনাথ ঘোষ-রচিত "জ্যোতিরিন্দ্রনাথ", পৃ. ১১২

যে ভূবিদ্যাগ্রন্থ রচনা করেছিলেন (প্রকাশকাল ১৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ) তার শেষের দিকে একটি 'পারিভাষিক শব্দের নির্ঘণ্ট' আছে। তা ছাড়া ১৮৫০-৫৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কয়েকটি ছোট-বড় মানচিত্র বাংলায় প্রকাশ করেছিলেন এবং 'বঙ্গাক্ষরে সর্বপ্রথমে এ দেশের মানচিত্র প্রকাশের গৌরব তাঁহারই প্রাপ্য।' ব্যাকরণে ও ভাষাতত্ত্বে তাঁর আগ্রহের পরিচয়স্বরূপ 'ব্যাকরণ-প্রবেশ' (প্রকাশকাল ১৮৬২) পুস্তিকাটির উল্লেখ করা যায়। "পত্রকৌমুদী" (প্রকাশকাল ১৮৬৩) নামে আর-একটি বইতে তিনি বিভিন্ন সম্পর্কীয় লোককে ও প্রতিষ্ঠানকে কিভাবে চিঠি লেখা উচিত তা শেখাবার জন্য কয়েকটি আদর্শ চিঠির সংকলন করেছেন। এই সব বই ছাড়া "বিবিধার্থ সঙ্গ্রহ" ও "রহস্য-সন্দর্ভ"-র বিভিন্ন খণ্ডে প্রকাশিত অসংখ্য রচনায় তাঁর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তাঁর জিজ্ঞাসা ও পারঙ্গমতার স্বাক্ষর ছড়িয়ে রয়েছে। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে কৌতূহল ও জিজ্ঞাসা এবং যুক্তির কষ্টি-পাথরে জানা জিনিসকে যাচাই ক'রে নেওয়ার বাসনা মননবিত্ত লেখকের পরিচয়পত্র এবং এ দিক রাজেন্দ্রলাল বাঙালী তথা ভারতীয় মনীষীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য একজন।

রাজেন্দ্রলাল যে সেকালের ভারতীয় মনীষীদের অন্যতম ছিলেন, দেশবিদেশের নানা পণ্ডিত ও বিভিন্ন বিদ্বৎপ্রতিষ্ঠান সে কথা নিঃসংশয়িতভাবে স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন। যে-'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সভাপতি-পদ আজও বিদ্বজ্জনমাত্রেরই কাঙ্ক্ষণীয়, রাজেন্দ্রলাল ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে সেই পদ অলংকৃত করেছিলেন। এবং এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য এই, রাজেন্দ্রলালই 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র প্রথম ভারতীয় সভাপতি। ইতিপূর্বে ১৮৫৭ এবং ১৮৬৫ সালে তিনি 'সোসাইটি'র কর্মসচিব নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীস্টাব্দে গ্রেট ব্রিটেন ও আয়র্ল্যাণ্ডের 'রয়েল এশিয়াটিক সোসাইটি' তাঁকে তাদের সম্মানিত সদস্য মনোনীত করেছিলেন। এ ছাড়া 'জার্মান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি,' 'অ্যামেরিকান ওরিয়েণ্টাল সোসাইটি', 'এথ্নোলজিক্যাল সোসাইটি অফ বার্লিন' প্রভৃতি বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গেও তিনি সম্মানিত অথবা সংযোগ-সদস্যরূপে যুক্ত ছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সম্মানসূচক 'ডক্টরেট' ডিগ্রীতে ভূষিত করেন। ১৮৭৭ এবং ১৮৭৮ সালে সরকার তাঁকে যথাক্রমে 'রায় বাহাদুর' ও 'সি.আই.ই' খেতাব দেন। ১৮৮৮ খ্রীস্টাব্দে সরকার তাঁকে 'রাজা' উপাধিতে ভূষিত করেন।

এই সব খেতাব উপাধির সাংসারিক মূল্য আপাতদর্শন ব'লে উল্লেখ করা যাক সেই তথ্যটি যে-তথ্যে রাজেন্দ্রলাল একজন বিদেশী বুধপ্রবর কর্তৃক সশ্রদ্ধ স্বীকৃত। ম্যাক্সমুলার নামে প্রাতঃস্মর্তব্য সেই মনীষী রাজেন্দ্রলাল সম্পর্কে বলেছেন :

He is a Pandit by profession, but he is, at the same time, a scholar and critic in our sense of the. word. . . Our Sanskrit scholars in Europe will have to pull hard, if, with such man as Babu Rajendralal in the field, they are not to be distanced in the race of scolarship.

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল কমিটি, ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্মানিত ও সক্রিয়ভাবে যুক্ত থেকে রাজেন্দ্রলাল এ কথাও প্রমাণ করেছিলেন, ইতিহাসের ধূসর পাণ্ডুলিপির বাইরেও তাঁর সজীব দৃষ্টি ছিল।

দেশের প্রবহমান জীবনধারায় তিনিও যে একজন অংশীদার, নানাভাবে তার নির্ভুল প্রমাণ দিয়ে খ্যাতি ও গৌরবের কোলে ১৮৯১ খ্রীস্টাব্দের ২৬শে জুলাই তিনি শেষ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ করেন।

স্বদেশবৃত্ত-চর্চার সূচনাপর্বে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের আবির্ভাব। একদিকে জোন্স-কোলব্রুক-প্রিন্সেপ প্রমুখ বিদেশী ভারতবন্ধুদের রচনা-ধৃত গৌরবময় অতীত ব্যাখ্যান, অন্যদিকে মিল-মার্শম্যানদের ভারতনিন্দা ও স্বাজাত্যদর্প—দুয়ের মাঝখানে ধীরে ধীরে ভারত-ইতিহাস চর্চার ডাঙা জাগতে শুরু করেছে। সে-ডাঙায় স্বদেশী ঐতিহাসিকদের পদক্ষেপ তখনও ভীরু, দ্বিধাগ্রস্ত। বাংলা ভাষায় ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছে, কিন্তু যে দু চারখানা বই বেরিয়েছে তার অধিকাংশই, নীলমণি বসাকের কথায়, 'ইংরাজী হইতে ভাষান্তরিত, তাহাতে হিন্দুদিগের প্রাচীন বৃত্তান্ত কিছুই নাই, এবং তাহা এমত নীরস যে, কোন ব্যক্তি তাহা পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন না, এবং পাঠ করিলেও তৃপ্তিবোধ হয় না।' নীলমণি বসাকের এই উক্তির উচ্চারণ-কাল ১৮৫৭, সিপাহী বিদ্রোহের বছর। রাজেন্দ্রলাল তখন গবেষকরূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র পত্রিকায় তাঁর কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। *Bibliotheca Indica*-য় তিনি 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক (১৮৫৪) সম্পাদনা করেছেন এবং 'সোসাইটি'র প্রত্নসংগ্রহের তালিকা (১৮৪৯), বই ও মানচিত্রের তালিকা (১৮৫৬) এবং 'জার্নাল'-এর প্রথম চব্বিশ খণ্ডে প্রকাশিত প্রবন্ধাবলির সূচী (১৮৫৬) প্রস্তুত করেছেন। রাজেন্দ্রলালের বেশির ভাগ কাজ ১৮৬০ সালের পরে এবং তাঁর প্রধান রচনাবলির কালসীমা ১৮৭৫ থেকে ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দ-বিধৃত। এই সময়-সীমার মধ্যেই তাঁর বিখ্যাত *The Antiquities of Orissa* এবং *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* প্রকাশিত হয়।

ভারতবর্ষের প্রণালীবদ্ধ আনুপূর্বিক ইতিহাস রচনা তখন সাধ এবং সাধ্যের মধ্যে দোলায়িত, কারণ তথ্যের অপ্রতুলতা এবং ফলত যুক্তিসহ কাঠামোর অভাব, তদুপরি প্রাপ্ত তথ্যের যথাযথ বিশ্লেষণের উপর নির্ভরশীল বিজ্ঞানসম্মত রচনাপদ্ধতির অনুপস্থিতি। এমতাবস্থায় ঐতিহাসিকের প্রাথমিক কর্তব্য তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ। প্রিন্সেপ, কিটো, কানিংহাম প্রমুখ বিদেশী প্রত্নশাস্ত্রীদের চেষ্টায় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে অনেক মূল্যবান আবিষ্কার সম্ভব এবং সেগুলির মূল্য নির্ধারিত হয়েছে। এঁদের কাছ থেকেই প্রেরণা সংগ্রহ করলেন রাজেন্দ্রলাল। উপাদান, আরও উপাদান চাই, এবং নিজের চোখে সে সব উপাদান পরীক্ষার প্রয়োজন, এই সিদ্ধান্ত নিয়ে রাজেন্দ্রলাল কাজে নামবার ব্রত গ্রহণ করলেন।

রাজেন্দ্রলালের মৃত্যুর বহু পরে ইতিহাস-রচনার রীতি-পদ্ধতির উন্নয়ন-সংক্রান্ত অজস্র আলোচনার মধ্যে একটি কণ্ঠস্বর[১] শ্রুত হলো : ইতিহাস-সৌধ নির্মাণ করতে হবে

[১] The American History Association প্রকাশিত ও Caroline F. Ware সম্পাদিত *The Cultural Approach to History* (Columbia University 1940) পৃ. ২৭৫ দ্রষ্টব্য। গ্রন্থভুক্ত The Value of Local History প্রবন্ধ-লেখকের মতে : In writing cultural history, local historical research must take rank as a basic discipline পৃ. ২৮৬

গোড়া থেকে উপরের দিকে ('from the bottom up')। এবং প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিস্তৃত তথ্য ও উপাদান সংগ্রহ ক'রে ও ঐ সব জায়গার আঞ্চলিক গুরুত্বের কথা মনে রেখে এই কাজ করতে হবে। অর্থাৎ সমগ্র দেশের ইতিহাস রচনা করার আগে সে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের ইতিহাস রচনার, অন্তত সে ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের, দিকে মনঃসংযোগ করতে হবে। সমাপতন কি না বলতে পারব না, ১৮৬৮-৯ সালে আঞ্চলিক ইতিহাসের বিস্তারিত উপাদান সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে রাজেন্দ্রলাল সদলবলে উড়িষ্যায় গিয়েছিলেন। উড়িষ্যার প্রত্নকীর্তিগুলি সরজমিনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রত্যবেক্ষণ করে তা থেকে ভারতের ইতিহাসের, বিশেষত ভারতের সামাজিক ইতিহাসের, উপাদান সংগ্রহ ছিল তাঁর অন্বিষ্ট। তাঁর নিজের কথাতেই :

In prosecuting my researches I had a two-fold object in view; in the first place to carry out the directions of the Lord Canning, as laid in his memorable resolution on the antiquities of India, that is to say, to secure 'an accurate description,—illustrated by plans, measurements, drawings, or photographs, and by copies of inscriptions—of such remains as most deserve notice, with the history of them so far as it may be traceable, and a record of the traditions that are retained regarding them'; and in the second place to notice prominently such points in them as were calculated to throw any special light on the *social history of the ages* to which they referred. For this purpose, Sir Gardner Wilkinson's learned work on the 'Ancient Egyptians' has served me for a guide. (ইটালিকস আমার) *Antiquities of Orissa*, Vol. I, preface, p. 1.

রাজেন্দ্রলালের ইতিহাস-দৃষ্টি যে ভারতের ভৌগোলিক সীমাকে অতিক্রম করতে পেরেছিল, স্যার গার্ডনারের *Ancient Egyptians*-এর আদর্শে উড়িষ্যার প্রাচীন সামাজিক ইতিহাস রচনা-প্রচেষ্টাতে তার পরিচয় নিহিত।

রাজেন্দ্রলালের ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং ইতিহাসরচনার পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ধারণা সুস্পষ্টভাবে তাঁর উপরি-উদ্ধৃত উক্তিতে ব্যক্ত হয়েছে। সে উক্তি বিশ্লেষণে দেখা যায়, ঐতিহাসিকরূপে দ্রষ্টব্য বস্তুর নিখুঁত ও বিশদ বিবরণ সংগ্রহ তাঁর প্রাথমিক কর্তব্য এবং এ কর্তব্যের সুষ্ঠু সমাধা সম্পর্কে ঐতিহাসিকরা ক্রমশ মনোযোগী ও যত্নশীল হ'য়ে উঠছেন। দ্বিতীয়ত, আধুনিক ঐতিহাসিকসুলভ দ্রষ্টব্য বস্তু প্রত্নকীর্তি-সংক্রান্ত কিংবদন্তী স্থানীয় জনশ্রুতি ইত্যাদির উপরও গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন; যেমন 'মাদলা পঞ্জী' নামে উড়িষ্যার মন্দির-সংক্রান্ত পুরাবিবরণগুলিকে তিনি সম্পূর্ণ অপ্রামাণিক বলে কখনো নস্যাৎ করেননি এবং 'মাদলা পঞ্জী' যে একেবারে মূল্যহীন নয় পরবর্তী গবেষণায় একথা প্রমাণিত হয়েছে। শেষত, প্রত্নকীর্তিকে নিছক বস্তুমূল্যে গ্রহণ করা অর্থহীন কারণ প্রত্নকীর্তিগুলি, যেমন উড়িষ্যার মন্দির ও ভাস্কর্য, সমসাময়িক কালের দর্পণ। আজ থেকে প্রায় শতবর্ষ আগে, একজন ভারতীয়ের মধ্যে এই আধুনিক ঐতিহাসিকসুলভ ইতিহাস-বোধের উপস্থিতি নিঃসন্দেহেই বিস্মিত শ্রদ্ধা আকর্ষণের যোগ্য। আরও অবাক হ'তে হয় যখন দেখি, সেই ভারতীয় ঐতিহাসিকের দৃষ্টি-বলয়ে শুধু স্বদেশ নয়, সমগ্র বিশ্ব এসে ধরা দিয়েছে এবং বিশ্ব-ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি তাঁর স্বদেশবৃত্তকে স্থাপনের প্রয়াস পাচ্ছেন। প্রাচীন

উড়িষ্যার সামাজিক ইতিহাস রচনায় যেমন তিনি স্যার গার্ডনারের বইকে আদর্শ করছেন তেমনি উড়িষ্যার শিল্পকলা অধ্যয়নের সময় ওয়েস্টম্যাকটের *Handbook of Sculpture* বা লিবকি-র *The History of Art* ও *The History of Sculpture*-এর কথা মনে রেখেছেন।

পুনরুক্তির সুরে বলি, যে-সময় রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিকের কলম হাতে নিয়েছিলেন, দেশীয় ইতিহাসচর্চার তখন শৈশবাবস্থা, তথ্য অপ্রচুর, রচনাপদ্ধতি অজ্ঞাত। উড়িষ্যা-সংক্রান্ত মহাগ্রন্থের গোড়ায় তিনি তথ্যের অপ্রতুলতার কথা মেনে নিয়ে বলছেন, মানুষের অন্বেষণের সীমা নেই, আপাতদৃষ্টিতে নিরাশ হবার মতো ক্ষেত্রেও মানুষ শুধু অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের দ্বারা অনেক কাজ করতে পারে। বলাই বাহুল্য, এই প্রত্যয় দৃঢ়মূল না হ'লে রাজেন্দ্রলাল ঐতিহাসিক হিসাবে কীর্তিমান ও স্মরণীয় হতেন না।

স্বভাবতঃই প্রশ্ন ওঠে, ভারতের ইতিহাসচর্চায় অন্যতম পথিকৃতের সম্মান কি রাজেন্দ্র-লালের প্রাপ্য? এ প্রশ্নের উত্তর নিঃসন্দেহেই সম্মতিসূচক। উড়িষ্যায় তাঁর আগে কোন প্রত্নসন্ধীর পদার্পণ ঘটেনি বা উড়িষ্যার প্রাচীন নিদর্শনাদি নিয়ে কেউ কিছু লেখেননি এমন নয়, কিন্তু সমগ্র প্রাচীন উড়িষ্যাকে তার বর্ণবৈভবে আমাদের দৃষ্টির সামনে নিয়ে আসার কৃতিত্ব রাজেন্দ্রলালের প্রাপ্য। উড়িষ্যা-সংক্রান্ত গ্রন্থে ১৮৮০ অবধি প্রাপ্ত তাবৎ প্রত্ন-নিদর্শনের বিশদ বিবরণই শুধু লিপিবদ্ধ হয়নি, নানা শিল্পবস্তুর রেখাচিত্র ও আলোক-চিত্রেও এই গ্রন্থ অত্যন্ত মূল্যবান। রাজেন্দ্রলালের পর উড়িষ্যা সম্পর্কে আরও বহু তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু এখনো উড়িষ্যার ইতিহাস প্রণয়নেচ্ছুকে রাজেন্দ্রলালের বইর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। রাজেন্দ্রলালের অপর গ্রন্থ *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal* সম্পর্কেও অনুরূপ মন্তব্য ক'রে বলা যায়, ভারতের সাহিত্য-ও-সংস্কৃতির ইতিহাস-রচয়িতা মাত্রেরই এটি অবশ্যপাঠ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের প্রাথমিক ভিত্তি যদিচ হজসন রচিত এবং যদিচ হজসন-এর পুঁথিগুলির পাঠোদ্ধারে তিনজন পণ্ডিত রাজেন্দ্রলালকে সাহায্য করেছিলেন,[১] তবু বুদ্ধিমান ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করবেন এই গ্রন্থ রাজেন্দ্রলালের, একান্ত-ভাবে রাজেন্দ্রলালেরই, কীর্তি। রসিক ভোক্তা সুস্বাদু ব্যঞ্জনের কৃতিত্ব রন্ধনশিল্পীকেই দিয়ে থাকেন তেল-নুন সরবরাহকারীকে নয়। ইতিহাসরচনার পথ-প্রস্তুতির কাজে রাজেন্দ্র-লালকে অসামান্য পরিশ্রমী অংশ নিতে হয়েছিল। এবং সেই কাজে রাজেন্দ্রলাল যদি কিছু ভুল-ত্রুটি ক'রে থাকেন তবে তা নিশ্চয়ই ক্ষমার যোগ্য। কিন্তু আমার হাতের কাছেই এমন তথ্য আছে যা প্রমাণ করে, সে সব ভুলত্রুটি উপাদানের স্বল্পতা বা অসম্পূর্ণতাজনিত, রাজেন্দ্রলালের বিচারবোধ থেকে তারা জন্মায়নি। পরন্তু, ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টি ও কল্পনাশক্তির বলে রাজেন্দ্রলাল সেদিন এমন কতকগুলি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, যেগুলি পরবর্তীকালে অধিকতর তথ্য উপাদানের দ্বারা সপ্রমাণ হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি সম্পর্কে তাঁর সিদ্ধান্তের উল্লেখ করা যায়। ফার্গুসন-এর মতো

[১] এখানে রবীন্দ্রনাথের উক্তি উদ্ধৃত করা যেতে পারে। রবীন্দ্রনাথের কথায়: 'তখনকার কালের মহত্ত্বাবিদ্বেষী ঈর্ষাপরায়ণ অনেকেই বলিত যে, পণ্ডিতেরাই কাজ করে ও তাহার যশের ফল মিত্র মহাশয় ফাঁকি দিয়া ভোগ করিয়া থাকেন। আজিও এরূপ দৃষ্টান্ত কখনো কখনো দেখা যায় যে, যে-ব্যক্তি যন্ত্রমাত্র ক্রমশ তাহার মনে হইতে থাকে, 'আমিই বুঝি কৃতী আর যন্ত্রীটি বুঝি অনাবশ্যক শোভামাত্র।' কলম বেচারার যদি চেতনা থাকিত তবে লিখিতে লিখিতে নিশ্চয় কোন একদিন সে মনে করিয়া বসিত, 'লেখার সমস্ত কাজটাই করি আমি, অথচ আমার মুখেই কেবল কালী পড়ে আর লেখকের খ্যাতিই উজ্জ্বল হইয়া উঠে।' "জীবনস্মৃতি," পৃ. ১২৯।

ভারতীয় স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একজন প্রমাণপুরুষের যুক্তি-তর্ক খণ্ডন ক'রে রাজেন্দ্রলাল তাঁর মত প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস পেয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় স্থাপত্যের উৎপত্তি এই ভারতবর্ষেই; আলেকজান্ডারের আক্রমণের পরে ভারতীয়রা গ্রীক স্থপতির কাছে পাথরের সাহায্যে বাড়ি তৈরি করার বিদ্যা শিখেছিল ফার্গুসনের এ মন্তব্য ঐতিহাসিকসুলভ নয়।[১] বলাই বাহুল্য, আদি-ঐতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার আবিষ্কার ভারতীয় স্থাপত্যের দেশীয় ভিত্তিভূমি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত করেছে। ফার্গুসনের মতো খ্যাতিমান পণ্ডিতের সঙ্গে বিতর্ক রাজেন্দ্রলালের বিদ্যাবত্তা শুধু নয়, স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও অন্তর্দৃষ্টিতে তাঁর গভীর আত্ম-বিশ্বাসেরও পরিচয় দেয়। এই আত্মবিশ্বাস ছিল ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলালের অন্যতম চরিত্রবৈশিষ্ট্য। আর তা যুক্তিবুদ্ধির উপর সহজভাবে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তথ্যের বিশদ সংগ্রহ, তথ্যের নিরাসক্ত বিশ্লেষণ, অতঃপর বিশ্লেষণ-নির্ভর তথ্যের বিন্যাস ও সামান্যী-করণ—ঐতিহাসিকসুলভ এই কাজগুলি করতে গিয়ে যদি তাঁকে বিখ্যাত কীর্তিমান পণ্ডিত-দের (প্রায়শ বিদেশী) বিরোধিতা করতে হত, তা হ'লে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা বা সঙ্কোচ না ক'রে নিজের যুক্তি ও আত্মবিশ্বাসের হাতিয়ার নিয়ে সেই সব প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের বিরুদ্ধে দাঁড়াতেন, তাঁদের মতকে খণ্ডন করার চেষ্টা করতেন। এ বিরোধিতার সময় তিনি তাঁদের প্রতি কোনরকম অশ্রদ্ধা দেখাতেন, এ কথা যেন আমরা ভুলেও মনে না করি। তাঁর বিতর্ক জ্ঞানের সীমা অতিক্রম ক'রে কখনও ব্যক্তিকে স্পর্শ করেনি।

প্রসঙ্গক্রমে আমি 'তথ্যের নিরাসক্ত বিশ্লেষণ অংশে নিরাসক্ত' এবং 'যুক্তি-বুদ্ধি' শব্দ-বন্ধের প্রতি পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করতে চাই। প্রাচীন ঐতিহ্য, কিংবদন্তী, গল্প-গাথা প্রভৃতিকে রাজেন্দ্রলাল আদৌ অবজ্ঞা করতেন না, কারণ তাঁর মতে ঐ সমস্ত জিনিসের মধ্যে ইতিহাসের উপাদানের সন্ধান পাওয়া সম্ভব, বিশেষত যে-সমাজের মধ্যে তাদের জন্ম ও বিবর্ধন, সেই সমাজের চেহারা পেতে তাদের সাহায্য অনস্বীকার্য। সম্ভবত সেই কারণেই তিনি উড়িষ্যার মাদলাপঞ্জীর প্রতি অনেকখানি আস্থাবান ছিলেন এবং পুরীর মন্দির সম্পর্কে পুরী স্কুলের হেডমাস্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়কে লেখা চিঠির এক জায়গায় বলছেন, 'আমার মতে লাঙ্গুলীয় নরসিংহই বর্তমান মন্দিরের নির্মাতা। এবং তাঁহার সময় হন্টার সাহেব নির্দিষ্ট করিয়াছেন। ঐ নির্দেশের মূল মাদলা পাঁজী এবং তৎকালের মাদলা পাঁজী অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য।[২] প্রাচীন ঐতিহ্য, কিংবদন্তী ইত্যাদি যে একেবারে মূল্যহীন নয়, তা পরে সপ্রমাণ হয়েছে যদিচ তারা প্রধানত সমর্থক উপাদানের মূল্যেই বিশিষ্ট। আশ্চর্য এই, সেকালের অনেক দেশপ্রেমী লেখকের মতো তিনি কখনও ঐসব কিংবদন্তী গল্পগাথাকে অভ্রান্ত তথ্য বা ইতিহাস রচনার প্রাথমিক উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেননি। নিরাসক্ত-দৃষ্টিতে তিনি তাদের বিশ্লেষণ ক'রে তা থেকে বুদ্ধিগ্রাহ্য উপাদান সংগ্রহ করে অন্যবিধ আকরলব্ধ তথ্যের সঙ্গে মিলিয়ে কাজে লাগাবার প্রয়াস পেয়েছেন। এ ব্যাপারে তিনি দেশপ্রেমের উপরে ইতিহাস ও ইতিহাস-সত্যকে স্থান দিয়েছেন। সেই কারণেই জেমস প্রিন্সেপ-এর মতো প্রাজ্ঞ জন যখন সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে পালি গল্পগাথাকে বিশ্বাস্য ও

[১] রাজেন্দ্রলালের সঙ্গে ফার্গুসনের বিতর্ক তাঁর *The Antiquities of Orissa*-র প্রথম খণ্ডে এবং *Indo-Aryans*-এর প্রথম খণ্ডে পাওয়া যাবে। ফার্গুসন পরে রাজেন্দ্রলালের মত মেনে নিয়ে বলেছিলেন Indians knew the use of stone and did use it in the construction of walls and plinths and bridges before the time of Alexander.

[২] ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "রাজেন্দ্রলাল মিত্র" (সাহিত্যসাধক চরিতমালা, তৃতীয় খণ্ড) পুস্তিকার ৩৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

ইতিহাসের অপরিহার্য উপাদানরূপে স্বীকার ক'রে মন্তব্য করেন[১] :

...*if* the rationality of a story be a fair test of its genuineness, which few will deny, the Pali record will here bear away the palm.

তখন রাজেন্দ্রলাল তাদের 'legendary and full of romantic fables' রূপে বর্ণনা ক'রে বলেন :

Plausibility is no proof in law, nor can it be its history. If we admit the reverse of the position, we have to accept all the Society novels and stories of the day as history.

সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে রাজেন্দ্রলাল একালের ইতিহাসব্রতীদের কাছে হয়তো নামমাত্র। রাজেন্দ্রলালের রচনায় ত্রুটি নির্ণয়, তাঁর কোন কোন সিদ্ধান্তের অসারতা প্রতিপাদন আজ হয়তো দুঃসাধ্য নয়। তাঁর সময় থেকে ভারতবিদ্যা তথ্যে তত্ত্বে প্রয়োগপদ্ধতিতে অনেকদূর এগিয়ে এসেছে। ভারতবিদ্যার এই প্রগতি দর্শনের জন্য রাজেন্দ্রলাল যদি পুনর্বার জন্ম নেন, তা হ'লে তিনি নিজেই উনিশ শতকের রাজেন্দ্রলালের সমালোচনায় তৎপর হ'য়ে নতুন ক'রে উড়িষ্যার বা বুদ্ধগয়ার ইতিহাস লিখবেন। সেই সঙ্গে তিনি নতুন তথ্যের আলোকে ঐতিহাসিক অন্তর্দৃষ্টিতে রচিত সিদ্ধান্তের নির্ভুল প্রতিষ্ঠায় পরিতৃপ্ত হবেন। জানি রাজেন্দ্রলালের সেই সব নির্ভুল সিদ্ধান্তকে কেউ কেউ সমাপতন ব'লে পাশ কাটাতে চাইবেন, কিন্তু একহিসাবে পৃথিবীর প্রায় সব উল্লেখযোগ্য আবিষ্কারও কোন-না-কোনভাবে সমাপতন নয় কি? সময় পরিবেশ এবং কর্মোপাদান থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে কর্মীসাধকের বিরূপ সমালোচনা একধরনের অক্ষমতা। ইতিহাসচর্চার শৈশবাবস্থায় রাজেন্দ্রলালের আবির্ভাব, তথ্য-উপাদানের অপ্রতুলতার মধ্যে তাঁকে ইতিহাসরচনার রাস্তা তৈরি ক'রে পথিকৃতের ভূমিকা গ্রহণ করতে হয়েছিল। ফলত, তাঁর দোষ-ত্রুটি-স্খলন পথিকৃতের। এবং পথিকৃতের দুরূহ ভূমিকা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন ব'লেই বোধ করি তিনি "বুদ্ধগয়া" গ্রন্থের মুখবন্ধে বলেছেন :

I feel myself under great obligation to my predecessors for the assistance I have derived from their researches. If in the discharge of my self-imposed tasks it has become necessary for me occasionally to question the correctness of their opinions, my object has been to serve the cause of truth, and not to find fault with them. As pioneers traversing a new and untrodden path, they had grave difficulties to overcome and mistakes and misconceptions were under the circumstances unavoidable.

মাঝে-মধ্যে সন্দেহ জাগে, হয়তো রাজেন্দ্রলালের মনে কোন ত্রুটিসন্ধী উত্তরপুরুষের ছায়াপাত ঘটেছিল।

[১] *The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal*, পৃ. XXXVIII.

আধুনিক সাহিত্য

অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র ঘোষ তাঁর "বাঙালী"* বইখানিতে সমসাময়িক বাঙালী জীবনের অনেকগুলো সমস্যা আমাদের সামনে এনে হাজির করেছেন সেজন্য বইখানি তথ্যসমৃদ্ধ—বিশেষ করে এর পরিসরের তুলনায়। মহাভারতের কাল থেকে আরম্ভ করে একাল পর্যন্ত বাংলাদেশের ইতিহাস সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় আছে তার প্রায় সবই এই একশ' পঁয়ষট্টি পৃষ্ঠার বইখানির ভিতরে লেখক কোনো না কোনো আকারে উল্লেখ করেছেন। এ কম কৃতিত্বের কথা নয়। পণ্ডিতদের কাছ থেকে এজন্য তাঁর উচ্চ প্রশংসা লাভ হয়েছে।

কিন্তু সে দিকটা আমাদের আলোচনার বিষয় নয়। বইখানি দুইটি বড় ভাগে বিভক্ত: 'রাষ্ট্র ও সম্পদ' আর 'সমাজ ও সংস্কৃতি'। আমরা আলোচনা করতে চাচ্ছি মুখ্যত দ্বিতীয় বিভাগটি সম্বন্ধে। তারও সবটা সম্বন্ধে নয়—শেষের তিনটি পরিচ্ছেদের বিষয় সম্বন্ধে,—সেগুলোর নাম দেওয়া হয়েছে আধুনিক সংস্কৃতি, সংস্কৃতির বৈচিত্র্য ও ভবিষ্যৎ। ক্রোচের যে কথা: All history is contemporary history—ইতিহাস-কথা হচ্ছে সমসাময়িক ইতিহাসের কথা, এটিকে আমরা বহুমূল্য জ্ঞান করি। তাই ইতিহাসের বিচিত্র তথ্যের খুঁটিনাটি নিয়ে মেতে উঠতে খুব একটা উৎসাহ বোধ করি না, কেন না, সেই সব তথ্যের খুঁটিনাটির সত্যতা বাস্তবিকই দুর্জ্ঞেয়—আমাদের বর্তমান প্রয়োজন, চিন্তা, রুচি, প্রধানত এই সবের আলোকে সেসব অর্থ গ্রহণ করে চলেছে।

তবে এই সিদ্ধান্তও হয়ত শেষ পর্যন্ত রুচির কথা। তথ্যের খুঁটিনাটি নিয়ে মেতে উঠবার মতো লোকের অভাব ঘটেনি কোনো কালেই। যাই হোক আমাদের সমস্যা বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বাংলাকে নিয়ে—অতীতের বাংলাকে নিয়ে নয়। কিন্তু অধ্যাপক ঘোষ বাংলার অতীতকে নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করেছেন, আর সেটি বাংলার ভবিষ্যতের ভাবনা ভেবেই। তাঁর মুখ্য চিন্তা এই: 'যুগে যুগে বিপর্যয়, প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও ঐতিহাসিক বিপ্লব বাঙালীকে ধ্বংস করতে পারে নি'—অতএব এবারকার বিপর্যয়েও সে রক্ষা পাবে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এটি যুক্তি নয়। এটি আশার কথা; আশার স্থান জীবনে অনেকখানি; তবু আশা যুক্তি নয়। অনেকবার ব্যাধি থেকে কেউ রক্ষা পেয়েছে বলে ব্যাধি থেকে সে রক্ষা পেতেই থাকবে একথা যেমন বলা যায় না, তেমনি অতীতের দিকে তাকিয়ে কোনো জাতির সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ-বাণী করা যায় না। অবশ্য অতীত অর্থহীন নয়। কিন্তু বর্তমান যদি অর্থপূর্ণ না হয় তবে শুধু অতীতের মহত্ত্বের গুণে কোনো দেশ বা জাতি সত্যকারভাবে গণনীয় হতে পারে না। রুশিয়ার কথা ভাবা যাক। রুশিয়ার অতীত ইতিহাসেও অনেক অর্থপূর্ণ ঘটনার পরিচয় রয়েছে। রুশিয়া একালে জগতে গণনীয় হলো কারণ সেখানে একটি বড় বিপ্লব ঘটলো সেই জন্য। আর শুধু সেই বিপ্লবের জন্যই নয়, সেই বিপ্লবের পরে আরো যে বহু অর্থপূর্ণ ঘটনা সেখানে ঘটলো সেসবেরও ফলে। তেমনি বাংলার অতীত মহত্ত্ব তাকে একালে গৌরব দান করতে পারতো না যদি একালে স্বদেশী আন্দোলনের

---

*বাঙালী—প্রবোধচন্দ্র ঘোষ। রূপা অ্যান্ড কোম্পানী। কলিকাতা-১২। মূল্য ছয় টাকা।

মতো একটি বড় ব্যাপার সেখানে দেখা না দিত। আরো লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে স্বদেশী আন্দোলনের মতো ব্যাপার বাংলাকে ভারতে ও জগতে যত গণনীয় করে তুলতে পারতো সেসব থেকে বাংলা বঞ্চিত হয়েছে তার পরবর্তী অনেক ব্যর্থতার জন্য।

অবশ্য আশার কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু যুক্তির অবতারণাও অধ্যাপক ঘোষ করেছেন, যেমন তাঁর এই উক্তিটি: 'আজও চিন্তাশক্তি ও মনীষার অভাব নেই বাঙালীর'। অবশ্য চিন্তাশক্তি ও মনীষার অভাব না হলেই যে কোনো জাতি সংকট থেকে উত্তীর্ণ হতে পারে তা সত্য নয়—সেই চিন্তাশক্তি ও মনীষার সঙ্গে যোগ ঘটা চাই জাতির বহুক্ষেত্রের কর্মির বিচিত্র চেষ্টা। তবু চিন্তাশক্তি ও মনীষার অভাব যদি জাতির ভিতরে না ঘটে থাকে তবে তার সম্বন্ধে অনেকটা আশা পোষণ করা যেতে পারে। কিন্তু একালের বাংলা কি সত্যই তেমন ভাগ্যবন্ত দেশ?

বিচার করে দেখতে গেলে দেখা যায় তেমন সৌভাগ্য থেকে একালের বাংলা এ-পর্যন্ত বঞ্চিত রয়েছে। দুই-একটি দৃষ্টান্তই দেব। স্বদেশী আন্দোলনের দিনে দেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য বাঙালী প্রাণপণে লড়েছিল। কিন্তু এবার দেশ বিভাগের সময়ে দেখা গেল দল-মত-নির্বিশেষে সবাই সেই বিভাগের জন্য আগ্রহান্বিত হল। আগ্রহান্বিত হয়নি এমন লোকও কিছু-সংখ্যক ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু তাদের গণনা করা হয়নি, নিজেদেরও তারা গণনীয় করে তুলতে চেষ্টা করে নি। বলা যেতে পারে দেশ-বিভাগ এমন একটা হঠাৎ এসে পড়া বিপর্যয় যে তার সামনে সবাই হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বুদ্ধি বিচার এসবের পরিচয় তো বিপদের দিনেই পাওয়া যায়—বোবা জলে সবাই তো মাঝি। তাছাড়া দেশ-বিভাগের ফলে যে বিষম উদ্বাস্তু সমস্যা দেখা দিল তার সাহায্য নিয়ে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির চেষ্টাও বাংলায় কম হয় নি। দৃষ্টিহীনতার এর চাইতে বড় দৃষ্টান্ত ভেবে পাওয়া কঠিন। দেশের একালের সাহিত্যের দিকে তাকালে দেখা যায় দেশ-বিভাগের পূর্বেই এক ধরনের বিপ্লব সেই ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আজ বোধ হয় কারোর সন্দেহ নেই যে সেই বিপ্লব ছিল অতি কাঁচা ধরনের, তাই তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সুফল তা থেকে লাভ হয় নি। চীনের আক্রমণের পরে দেখা গেল, দেশাত্মবোধ নতুন করে উদ্দীপ্ত করবার জন্য বহুদিন পূর্বে রচিত স্বদেশী সঙ্গীত কাজে লাগানো হচ্ছে। যাঁরা আমাদের একালের কবি সাহিত্যিক দেখা যায় তাঁদের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়েছে কিছু বেশি পরিমাণে আত্ম-কেন্দ্রিক যেসব বিষয় সেসবের দ্বারা। একালে প্রায় বিশ-পঁচিশ বৎসর ধরে দেশে নানা অরাজকতা চলে, তার সঙ্গে ফ্রয়েডের জগৎব্যাপী প্রভাব। সেইসবের প্রতিক্রিয়ায় আমাদের সাহিত্যের এমন রূপ লাভ হয়ে থাকবে। কিন্তু কারণ যাই হোক সমস্যা-সংকুল জীবনের সম্মুখীন হবার চেষ্টা না করে তার পাশ কাটাবার চেষ্টা যে আমাদের একালের সাহিত্যে লক্ষ্যণীয়ভাবে হয়েছে একে জাতির স্বাস্থ্য ও সৌভাগ্যের পরিচায়ক বলবার উপায় নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রেও অবাঞ্ছিত অবস্থা দেশে পূর্বেই দেখা দিয়েছিল। স্বাধীনতা লাভের পরে শিক্ষার 'কায়িক' সম্প্রসারণ মন্দ হয় নি, এমনকি অনেকটা ভালোই হয়েছে বলা যায়; কিন্তু তার 'আত্মিক' উৎকর্ষের দিকটা সম্বন্ধে কি বলা যাবে? সেই দিকটার শোচনীয় দুর্বলতা সম্বন্ধে দেশ আজও, অর্থাৎ স্বাধীনতালাভের পনেরো-ষোলো বৎসর পরেও, তেমনভাবে সচেতন হয়ে উঠলো না। এই বিষয়ে কারো কারো মত এই ধরনের স্বাধীনতা লাভের পরে দেশ ব্যাপৃত রয়েছে বড় বড় অর্থনৈতিক পরিকল্পনা নিয়ে। সেইসব দিকেই দেশের, বিশেষ করে দেশের নেতৃস্থানীয়দের, মনোযোগ আকৃষ্ট রয়েছে। কিন্তু সেসবের ফলাফলের

খতিয়ানের জন্য আমাদের আরো কিছুকাল অপেক্ষা না করে উপায় নেই। এইসব কারণে শিক্ষার দিকে দেশ পুরো মনোযোগ দিতে পারে নি। এটি একটি ভাববার দিক বটে। দেশ যে কিছুই করছে না সেই অভিযোগ না করাই সঙ্গত। কিন্তু তা হলেও দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দেশের সর্বসাধারণের মধ্যে কেমন যে একটা ঔদাসীন্য দেখা যাচ্ছে, অন্ততঃ উদ্দীপনা দেখা যাচ্ছে না, এদিকটা অবহেলা করবার মতো নয়। নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষায় দেশ যদি উদ্দীপ্ত না হয় তবে দেশের সৃষ্টিশক্তি নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকবে—স্বাধীনতা অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে কেবলই বাধা পাবে। তার চেয়ে বড় মন্দ আর দেশের জন্য কী আশঙ্কা করা যেতে পারে।

বলা বাহুল্য একটা বড় রকমের দুর্ভাবনার অবতারণা করে পাঠকের মনে একটা অস্বস্তি সৃষ্টির অভিপ্রায় আমাদের নয়। নতুন আশার নতুন আকাঙ্ক্ষার উদ্দীপনা যে দেশে, বিশেষ করে বাংলা দেশে অনুভূত হচ্ছে না তা অস্বীকার করার উপায় আছে মনে হয় না। এই দশা থেকে আংশিকভাবেও পরিত্রাণ লাভ না করে কেমন করে বলা যায় দেশে সৃষ্টি-ধর্মী মনীষা সক্রিয় রয়েছে? অদূর ভবিষ্যতে নতুন জনজাগরণের সম্ভাবনা অধ্যাপক ঘোষ দেখেছেন। জানি না কিছুকাল পূর্বে আমাদের দেশে কমিউনিস্ট চিন্তা ও কর্মতৎপরতার ফলে যে এক ধরনের জনজাগরণ দেখা দিয়েছিল তার ইঙ্গিত তিনি করেছেন কি না। কমিউনিস্টরা যদি সফলকাম হত তাহলে একটা নতুন কিছু হয়ত দেশে ঘটতো। অবশ্য সেটি যে সত্যকার ভালো কিছু হত কমিউনিজমের যে ইতিহাস আমাদের সামনে উন্মুক্ত রয়েছে তা থেকে সে বিষয়ে খুব আশান্বিত হওয়া যায় না। তবে নতুন কিছু ঘটতো নিঃসন্দেহ। কিন্তু কমিউনিস্টরা যে বেশ কিছু কালের জন্য দেশের সমর্থন থেকে বঞ্চিত হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই; আর সেই সঙ্গে তাদের ভঙ্গির জন-আন্দোলনও দেশের সন্দেহের বস্তু হয়েছে। সার্থকভাবে নতুন জন-আন্দোলন কত দিনে যে গড়ে উঠবে সেটি আজ একটি সমস্যা।

একালের খণ্ডিত বাংলায় আর একটি ব্যাপারও দিন দিনই খুব চোখে পড়বার মতো হচ্ছে, সেটি হচ্ছে বাংলায় অবাঙালী প্রভাবের আধিক্য। এর খুব বড় একটি কারণ দৈহিক শ্রমে আর ব্যবসায়ে-বাণিজ্যে বাঙালীর বহুদিনের অনিচ্ছা বা অপটুতা। এর প্রতিকারের ভাবনা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র দীর্ঘদিন ভেবেছিলেন। কিন্তু সেই ভাবনার ফলে এই সমস্যার কোনো সুরাহা হয় নি। বলা বাহুল্য বাঙালীজীবনের এটি একটি বড় রকমের সংকটের দিক, কেন না, শ্রমশক্তিই একালে সব চাইতে বড় শক্তি—শ্রমিকরাই একালে দেশের প্রধান অধিবাসী। কিন্তু এর প্রতিকারের শক্তি আজ শুধু বাঙালীর হাতে আর নেই। এটি একটি সর্বভারতীয় সমস্যা—সর্বভারতীয় দৃষ্টিকোণ ও সর্বভারতীয় প্রচেষ্টার দ্বারাই এর সুমীমাংসা সম্ভবপর। তবে বাংলায় যে এটি বিশেষভাবে দেখা দিয়েছে সেজন্য এ-সম্বন্ধে যোগ্য চেতনা বাঙালীদের মধ্যেই চাই। কিন্তু বাঙালীর বুদ্ধি ও অনুভূতির প্রখ্যাত তীক্ষ্ণতা এই সমূহ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে গরহাজির।

একালের বাংলা ও বাঙালীর সামনে যেসব সংকট আমরা দেখছি সে সব সম্বন্ধে অধ্যাপক ঘোষও যথেষ্ট সচেতন। তাঁর বইখানিতে নানা জায়গায় নানাভাবে তার উল্লেখ, অন্তত ইঙ্গিত, তিনি করেছেন। তবে তাঁর বইয়ের উপসংহার করেছেন তিনি একটি অ-সাধারণ উক্তি করে। তাঁর সেই উক্তিটি এই :

'খণ্ড-ছিন্ন বিক্ষিপ্ত বাঙালীকে হতে হবে নতুন সভ্যতার অগ্রদূত : ছিন্ন সতীদেহ

যেখানে যেখানে ছড়িয়ে পড়েছে সেখানেই জেগে উঠেছে পীঠস্থান। আদর্শবাদের দৃঢ়তা নিয়ে বাঙালী যদি নিঃশেষও হয়ে যায় তাহলে তার প্রতিটি রক্তবিন্দু নতুন মানুষ, নতুন জাতির মধ্যে আবার জীবন পাবে।'

ব্যক্তির পুনর্জন্ম তত্ত্বই যথেষ্ট দুরূহ; সেই তুলনায় জাতির পুনর্জন্ম-তত্ত্ব তো বহুগুণ দুরূহতর। সেই জটিল তত্ত্বের ভিতরে প্রবেশ করবার আগ্রহ আমাদের নেই। আমরা বরং এই সোজা কথাটা সত্য বলে মানি যে কেউই মরতে চায় না—জাতি তো নয়ই। তাই বাঙালী জাতি আজো যখন বেঁচে আছে তখন বেঁচে থাকতেই সে চায়—আর সেই জাতির কর্মীদের কাজ হচ্ছে যত রকমের বিপদ তাকে ঘিরে ধরেছে সবের হাত থেকে তাকে বাঁচিয়ে তোলা। যে আদর্শ নিষ্ঠার কথা অধ্যাপক ঘোষ বলেছেন সেটি তো তাদের জন্য চাই-ই, সেই সঙ্গে চাই বাস্তব ক্ষেত্রে সমস্যাগুলো যত জটিল রূপ নিয়েছে সে সব সম্বন্ধে সম্যক অবধান। আদর্শে ও বাস্তবে আমাদের দেশে যে বিষম জট পাকিয়ে গেছে সে সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অবিস্মরণীয় উক্তি এই :

'ভারতে ক্রমে ঋষিদের যুগ, অর্থাৎ গৃহস্থ তাপসদের যুগ গেল; ক্রমে বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর যুগ আসিল। ভারতবর্ষ যে মহাসত্য পাইয়াছিল তাহাকে জীবনের ব্যবহারের পথ হইতে তফাত করিয়া দিল। বলিল, সন্ন্যাসী হইলে তবেই মুক্তির সাধনা সম্ভবপর হয়। তার ফলে এদেশে বিদ্যার সঙ্গে অবিদ্যার একটা আপস হইয়া গেছে, বিষয়-বিভাগের মতো উভয়ের মহল-বিভাগ হইয়া মাঝখানে একটা দেয়াল উঠিল। সংসারে তাই ধর্মে কর্মে আচারে বিচারে যত সংকীর্ণতা যত স্থূলতা যত মূঢ়তাই থাক উচ্চতম সত্যের দিক হইতে তার প্রতিবাদ নাই, এমন কি, সমর্থন আছে। গাছতলায় বসিয়া জ্ঞানী বলিতেছে, 'যে-মানুষ আপনাকে সর্বভূতের মধ্যে ও সর্বভূতকে আপনার মধ্যে এক করিয়া দেখিয়াছে সেই সত্যকে দেখিয়াছে' অমনি সংসারী ভক্তিতে গলিয়া তার ভিক্ষার ঝুলি ভরিয়া দিল। ওদিকে সংসারী তার দরদালানে বসিয়া বলিতেছে, 'যে-বেটা সর্বভূতকে যতদূর সম্ভব তফাতে রাখিয়া না চলিয়াছে তার ধোবানাপিত বন্ধ', আর জ্ঞানী আসিয়া তার মাথায় পায়ের ধুলো দিয়া আশীর্বাদ করিয়া গেল, 'বাবা বাঁচিয়া থাকো'। এইজন্যই এদেশে কর্মসংসারে বিচ্ছিন্নতা জড়তা পদে পদে বাড়িয়া চলিল, কোথাও তাকে বাধা দিবার কিছু নাই। এইজন্যই শত শত বছর ধরিয়া কর্মসংসারে আমাদের এত অপমান, এত হার।

য়ুরোপে ঠিক ইহার উলটা। য়ুরোপের সত্যসাধনার ক্ষেত্র কেবল জ্ঞানে নহে ব্যবহারে। সেখানে রাজ্যে সমাজে যে কোনো খুঁত দেখা যায় এই সত্যের আলোতে সকলে মিলিয়া তার বিচার, এই সত্যের সাহায্যে সকলে মিলিয়া তার সংশোধন। এইজন্য সেই সত্য যে শক্তি যে মুক্তি দিতেছে সমস্ত মানুষের তাহাতে অধিকার, তাহা সকল মানুষকে আশা দেয়, সাহস দেয়—তাহার বিকাশ তন্ত্রমন্ত্রের কুয়াশায় ঢাকা নয়, মুক্ত আলোকে সকলের সামনে তাহা গড়িয়া উঠিতেছে, এবং সকলকেই বাড়াইয়া তুলিতেছে।'

এটি অবশ্য শুধু বাংলার সমস্যা নয়, সর্বভারতের সমস্যা, অথবা সমগ্র প্রাচ্যের সমস্যা। তবে বাংলায় প্রাচীন আদর্শের গৌরব কিছু উঁচু গলায় ঘোষণা করা হয়েছিল, সেজন্য সেই আদর্শের লাঞ্ছনার দিকটা সম্বন্ধে বাঙালীর মধ্যেই পুরো চেতনা চাই। বলা বাহুল্য এমন চেতনা বাঙালীর জন্য হবে নতুন মহাসম্পদ। এর ফলে তার আকাশচারিতা যাবে ঘুচে আর মাটির পৃথিবীর উপরে চলার ব্রত সে নিতে পারবে। আদর্শের প্রেম চিরদিনই মহামূল্য, কিন্তু বাস্তবের বোধের সঙ্গে যুক্ত হতে না পারলে তা হয় মহা অনর্থ।

মনোভাবের এমন বড় রকমের পরিবর্তনের সঙ্গে চাই বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন-ধারারও পরিবর্তন—তার দীর্ঘদিনের 'ভদ্রলোকি'র অর্থাৎ অকর্মণ্যতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হয়ে তাকে বুঝতে হবে দৈহিক শ্রমের মর্যাদা। সেজন্য হয়ত বাঙালী তরুণদের জন্য সামরিক শিক্ষা, কৃষিক্ষেত্রে কাজ, খনিতে ও কারখানায় কাজ, এসব বেশ কিছু দিনের জন্য আবশ্যিক করবার প্রয়োজন হবে। অবশ্য এর উদ্দেশ্য হবে বাঙালীর স্বভাব বদলানো নয়, তার দেহের পটুতা বাড়ানো। দেহ যদি কোনো জাতির জন্য সত্যই অপটু হয়ে পড়ে তবে বুঝতে হবে প্রকৃতির বিধানে তার বেঁচে থাকার দাবি না-মঞ্জুর হয়েছে তা অন্য গুণপনা তার যতই থাকুক।

মন ও দেহ দুয়েরই ব্যাপক উজ্জীবন বাঙালীর নতুন সার্থক জীবনের জন্য চাই। এই কর্মসূচী অন্তত আংশিকভাবে বাঙালীর সামনে পূর্বেও রাখা হয়েছে। তবে একালে, অর্থাৎ স্বাধীনতা লাভের পরে; এই কর্মসূচী কার্যকর করার বাধা দূর হয়েছে। সেটি একটি বড় সুযোগ।

কিন্তু সুযোগের চাইতে বড়—সংকল্প। বাঙালী সংকল্পবান্ হবে কি?

কাজী আবদুল ওদুদ

সমালোচনা

The Politics of Scarcity. *By* Myron Weiner. Asia Publishing House. Bombay. Rs 18·00.

মাইরন উইনার কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক দলগুলির কাঠামো বিশ্লেষণ করে একটি বই লিখেছিলেন। মহৎ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বইখানা একদেশদর্শিতার দোষ থেকে মুক্ত হতে পারেনি : প্রধানত বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে গবেষণা করার জন্যই হয়তো, বামপন্থী টুকরো-টুকরো দলগুলি অনাবশ্যক বেশী প্রাধান্য পেয়েছিল, অথচ তদসত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তেমন কোনো অনুসন্ধানী মন্তব্য ছিল না।

উইনার নতুন বই লিখেছেন এবার : প্রসঙ্গ গরিবদেশের রাজনীতি, মানে ভারতবর্ষের। এবার ঠিক রাজনৈতিক দলগুলির খতিয়ান লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য নয়, একটু তির্যক করে আলোচনা রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের প্রকরণের উপর প্রলম্বিত হয়েছে। বিষয়ী ছেড়ে এবার লক্ষ্য বিষয়, বিষয়ের বিন্যাস-বিভূষণ-বিমোচন। অভাবের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি কতরকম হতে পারে, অভিব্যক্তির প্রকাশ কত ভিন্ন রূপ নিতে পারে, সে সব নিয়ে স-উদাহরণ জল্পনা। দেশ স্বাধীনতা পেয়েছে সংবিধানে ব্যক্তি-স্বাধীনতার উজ্জ্বল স্বীকৃতি, সুতরাং, অন্য যতই অভাব থাক, অভাবের বিরুদ্ধে উচ্চ গ্রামে প্রতিবাদ জানাবার সুবিধে-সুযোগের অভাব নেই। এই প্রতিবাদের পরিভাষা এবং পরিষঙ্গ নিয়ে আলোচনা করাই *The Politics of Scarcity*-র উদ্দেশ্য।

১৯৪৭ সালের পর থেকে সমুদ্রশান্তি আজ পর্যন্ত ভারতবাসীদের ছুঁয়ে যায়নি। অনেক রকম কলরোল, অভাব-অভিযোগ, মূল্যবৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, শরণার্থী সমস্যা, জনসংখ্যা-বৃদ্ধিহেতু নানাবিধ নাগরিক উৎকণ্ঠা-অসুবিধা। অন্যপক্ষে, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ছিটেফোঁটা প্রসাদ নিয়ে কাড়াকাড়ির সমস্যা : সেচের জল চাই, স্কুল-হাসপাতাল আমার গ্রামে বসবে, সিমেণ্ট চাই—লোহা চাই—কয়লা চাই। এবং : করবৃদ্ধি চাই না, ট্রাম-বাসের ভাড়া কেন বাড়বে, স্কুলের মাইনেই বা কেন। গ্রামাঞ্চলে জমিদার-ভাগচাষী-মজুরচাষীদের অন্তর্দ্বন্দ্ব-বহির্দ্বন্দ্ব; কলকারখানা শ্রমজীবীদের দাবিদাওয়ার সততনির্ঘোষ। তাছাড়া, স্বাধীনতার যেহেতু কোনো আপাতগণ্ডিরেখা নেই, কিছু চুপিসারে, কিছু প্রকাশ্যে ব্যবসায়ী-মালিকপক্ষও স্বার্থ সংরক্ষণ ও বৃদ্ধির তাগিদে সরকারের উপর চাপ দেওয়ার চেষ্টা থেকে আদৌ বিরত নন।

সব-মিলিয়ে তাই, অন্তত গত বছর পর্যন্ত, দেশের সর্বত্র রাজনৈতিক অশান্তি অব্যাহতই থেকেছে : কোনো প্রদেশে পরিমাত্রা কম, কোথাও হয়তো বেশি। ভাষাভিত্তিক প্রদেশ গঠনের সমস্যা এই অশান্তির অনলে নতুন আহুতি জুগিয়েছে : মধ্যপঞ্চাশের বছরগুলিতে রাষ্ট্রশক্তির অনেকটাই অপব্যয়িত হয়েছে প্রদেশ পুনর্গঠনের যুক্তি-তর্ক-আবেগের গোলকধাঁধার অন্ধকারে।

শ্রীযুক্ত উইনারের মূলতত্ত্ব হলো যে ভারতবর্ষে যা হচ্ছে তার চরিত্রলক্ষণ যে কোনো

সদ্যস্বাধীনতা-পাওয়া দরিদ্র দেশে খুঁজে পাওয়া সম্ভব : যেহেতু সম্পূর্ণ ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বাধীনতার আশ্রয়ে আমরা আছি, আমাদের সকলেরই চীৎকারের অধিকারে, স্বার্থপ্রকাশের অখণ্ডতা। রাষ্ট্রশক্তিকে কান পেতে আমাদের দাবি শুনতেই হবে, কারণ একুশের ঊর্ধ্বে আমাদের সকলেরই ভোট আছে, এবং প্রতি পাঁচবছরে আমরা সে-ভোট বজ্রস্বরূপ ব্যবহার করতে তৈরি। অভাব যেহেতু অজস্র, স্বার্থ যেহেতু বহুধা, সরকারকে তাই অহরহ টানা-পোড়েনের মধ্যে থাকতে হয়। দেশ দরিদ্র, সর্বপ্রকারের দাবি একসঙ্গে মেটানো সম্ভব নয়, এঁর স্বার্থকে একটু বেশি জায়গা ছেড়ে দিলে ওঁর স্বার্থে টান পড়ে। এই অবস্থার পরিণাম গিয়ে দাঁড়ায় যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই হোক, বা অন্য কোনো সামান্যতর রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তই হোক, কোনো কিছুর প্রয়োগেই প্রারম্ভিক অবৈকল্য অটুট থাকে না, সত্য-শিব-সুন্দর থেকে অবতরণ করে অন্বিষ্ট হয়ে দাঁড়ায় কোন্ দলকে তোয়াজ আপাতত কোন্ রাজনৈতিক কারণে করা প্রয়োজন, কোন্ প্রদেশের গলা কত ভারি, কাদের কতটা প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ সাহায্য করলে আশু বাড়তি ভোটের সম্ভাবনা ইত্যাকার অনিত্যপ্রশ্নের উত্তর। এই অবৈকল্যনাশ থেকে সর্বনাশের সূচনা, কারণ দেশের আর্থিক প্রগতির ক্ষিপ্র বেগ এ অবস্থায় ব্যাহত হতে বাধ্য, এবং জাতির নৈতিক মানেরও অপকৃষ্টতায় নেমে আসার আশঙ্কা।

সমস্যার এই ভাষণের সঙ্গে আমি নিজে মোটামুটি একমত। পুরোনো আদর্শ ধূসর হয়ে মিলিয়ে গেছে, নতুন কোনো কুলকুণ্ডলিনী অন্তত সমগ্র জাতিকে নাড়া দিয়ে মাথা চাড়া দেয়নি, এখন আপাতত ক্ষুদ্র স্বার্থের সরীসৃপসঞ্চরণ, সেই সঙ্গে শ্রেণীবৈষম্যহেতু সংঘাতের বিস্তার। গেলো অক্টোবর থেকে যে সামান্য নব আলোড়ন এসেছিল, তা-ও এতদিনে প্রায় থিতিয়ে এসেছে : আমাদের সমস্যা মামুলি স্বার্থের বিন্যাস অতিক্রম করে কোনো নীলিমা অনুরাগঘন আকাশে ব্যাপ্তি পায়নি।

সমস্যার সমাধানের ইশারা শ্রীযুক্ত উইনারের গ্রন্থে নেই, থাকতেও পারে না। ভারতবর্ষের সাম্প্রতিক দিনলিপি ইদানীং এতই অস্থির যে পূর্বপ্রত্যয় মূল্যহীন। *The Politics of Scarcity*-তে বিশেষ করে যা বিবৃত হয়েছে তা জোট এবং ঘোঁট পাকানোর সাংগঠনিক ও প্রাকরণিক কলকৌশলের উপর। উইনার ভারতবর্ষের ছাত্র আন্দোলন, কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক সংস্থা, ব্যবসায়ী সংস্থা, নাগরিক সভা, শ্রেণী ও ধর্ম সংস্থা ইত্যাদির কিছুটা ঐতিহাসিক, প্রধানত সাম্প্রতিক, কর্মধারার আলোচনা করেছেন। মুস্কিল হলো, লেখকের প্রথম বইতে যা প্রধান স্খলন ছিল, এই গ্রন্থেও তার পুনরাবৃত্তি : উইনার বাঙালীভক্ত মানুষ, ভূমিকাতে খুব সুন্দর করে সেই ভক্তি নিবেদন করা হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের রাজনীতি সারা ভারতের আবেগধারার নিখুঁত প্রতিবিম্ব নয়, লেখকের অনেক মন্তব্য সিদ্ধান্তই তাই একটু একপেশে। বিশেষত যে তিনটি অধ্যায়ে ছাত্র, শ্রমিক এবং কৃষক আন্দোলনের প্রকরণ বর্ণনা করা হয়েছে, সেগুলিতে বাংলাদেশের বাইরের ভারতবর্ষ প্রায় অনুপস্থিত। এমনকি শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের লীলাকলা বিশ্লেষণ পর্যন্ত কলকাতার সংস্থাগুলিকে কেন্দ্র করে, অথচ কে না জানে গত দশ-পনেরো বছরে ব্যবসায়ীমহলে যে সব উৎকীর্ণ সমস্যা দেখা দিয়েছে, তাদের উৎস এবং অন্ত দুই-ই কলকাতাকে পাশে ফেলে রেখে।

তাছাড়া, যতরকম জোটই আমাদের দেশে পাকানো হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত এক জায়গায় এসে তাদের চারিত্র্যসমন্বয় ঘটে : প্রধান কয়েকটি রাজনৈতিক দল সর্বপ্রকার সংস্থা-গঠনের সহায়তা করে আসছে, এখনো করছে এবং ভবিষ্যতেও করবে। সাময়িক স্বার্থ, শ্রেণীগত স্বার্থ, ভাষাগত স্বার্থ সব কিছুর দুই তীর জড়িয়ে উদ্বেলিত গোষ্ঠীমাত্রেই

আসলে রাজনৈতিক দলগুলির উপর জীবননির্ভর। সুতরাং দ্বন্দ্ব-সংঘাত-শত্রুতা-কলহ বিশ্লেষণ করে উপান্তে পৌঁছবো কংগ্রেস-কমিউনিস্ট পার্টি-জনসংঘ-দ্রাবিড় মুন্নেত্রা কাজগম প্রভৃতির টানাপোড়েনে।

এবং এখানেই শ্রীযুক্ত উইনারের ব্যাখ্যার মস্ত দুর্বলতা। যে কোনো দ্বন্দ্বেরই দুই পক্ষ : লোকেরা জোট বাঁধে কারণ প্রতিপক্ষকে হটাতে চায়, নিজেরা প্রতিহত না-হয়ে বিরোধী পক্ষকে পর্যুদস্ত করতে চায়। এটা বলা ভুল হবে এই মুখোমুখি বোঝাপড়ায় আমাদের দেশে, গত পনেরো বছরের ইতিহাসে, সরকার মধ্যবর্তী নিরপেক্ষভূমিতে স্থিত থেকেছেন। রাষ্ট্রশক্তি সর্বদাই কংগ্রেসের কোনো-না-কোনো উপদলের হাতে অর্পিত থেকেছে, এবং ইত্যাকার উপদলগুলি নিজেদের শ্রেণীস্বার্থ আদৌ ভুলে থাকেনি। কিছু-কিছু লোক তাই ষড়যন্ত্র করেছে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিজেদের স্বার্থে নিয়োগ করার উদ্দেশ্য নিয়ে, অন্য-কিছু লোক চেয়েছে রাষ্ট্রশক্তির এবংবিধ ব্যবহার বন্ধ করতে।

শেষ পর্যন্ত তাই শ্রেণীস্বার্থের রাজনীতিতেই ফিরতে হয়, অবশ্য যদি এটা মানা হয় যে আমাদের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি মোটামুটি শ্রেণীবিভাজনে প্রত্যয়শীল। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তো যা মনে হয় আসলে তা নয়। শ্রীযুক্ত উইনারের গ্রন্থে, বলতেই হয়, শেষ পর্যন্ত সে রকম কোনো বিশিষ্ট অভিজ্ঞতার দ্যোতনা নেই।

অশোক মিত্র

The Struggle of the Moderns. *By* Stephen Spender. Hamish Hamilton. London. 25*s*

অক্ষর বিজ্ঞানের প্রথম প্রভাত থেকে আজ অবধি কোনো সাহিত্য-বিচার নিষ্কাম, নৈর্ব্যক্তিক ও নিখুঁত ন্যায়ানুগত হয়নি এবং হতেও পারে না। হতে পারে না এইজন্যে যে সমালোচক নিজে যদি সত্যপরায়ণ হন, তাহলে তাঁর প্রকৃত মতামত প্রকাশ করবেন এবং সেই মতামতের যদি কোনো যাথার্থ্য থাকে সেগুলি হবে তাঁর আজন্ম লালিত ভালোমন্দ বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। অর্থাৎ একান্তভাবে তাঁরই ব্যক্তিত্বের ছাপ দেওয়া, একান্ত নিজস্ব মতামত। আর সমালোচক যদি মিথ্যাচারী হন তাহলে তাঁর কচকচির এক কাণাকড়িও দাম নেই। অতএব গোড়াতেই মেনে নিতে হবে যে সাহিত্য ও শিল্প সমালোচনা মানেই হল একজন মানুষের ব্যক্তিগত মতামত এবং সে যতই সুচিন্তিত ও অনুশীলিত হক না কেন, তাতে ভ্রান্তির প্রচুর সুযোগ আছে। এই প্রাথমিক সত্যটিকে গ্রহণ করে বর্তমান গ্রন্থের বিষয় চিন্তা করা যাক। বলা বাহুল্য এই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিচার করতে গেলে ভালোমন্দ বলা চলবে না; তবে বিশ্লেষণ করা চলবে।

বইয়ের উপাধিকে বাংলা করে 'আধুনিক দ্বন্দ্ব' বলা যেতে পারে, তবে বুঝে নিতে হবে যে দ্বন্দ্ব হল মতামতের ও আদর্শের মধ্যে, মানুষের মধ্যে নয়। এমন কি বহু ক্ষেত্রে, একই মানুষের হৃদয়ের মধ্যে নিষ্ঠুর প্রচন্ড সংগ্রাম চলতেও দেখা গেছে। এ বই একজন প্রথম শ্রেণীর কবির ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী থেকে লেখা, অর্থাৎ তাঁর মন্তব্যগুলিকে আরেক-জনের চোখ দিয়ে দেখা জিনিস বলে ধরে নিতে হবে।

লেখক নিজেই বলছেন যে এই অসংলগ্ন অধ্যায়গুলি লিখবার সময়, তাঁর মনের মধ্যে আরেকখানি বই কেবলি আনাগোনা করেছে, নির্ভরযোগ্য ও ব্যাপক একটি সাহিত্য পরিক্রমা, যা একদিন কেউ লিখে ফেলতেও পারে। সেই রকম একটি পরিক্রমা পড়লে পাঠকের মনে যে সব চিন্তার উদ্রেক হবার সম্ভাবনা আছে তারি খানিকটা হল এ বইয়ের বিষয়বস্তু। অর্থাৎ একখানি না-লেখা বইয়ের নেই-পাঠকদের না-ভাবা চিন্তা নিয়েই এমন বই। জাতকবি ছাড়া কে এমন বইয়ের কথা ভাবতে পারত? কিন্তু এ বই চকিত অনুপ্রেরণার রচনা নয়। সব সমালোচনার পিছনে গভীর অনুশীলন থাকা প্রয়োজন; সমালোচনার বই, তা সে যে ধরনের সমালোচনাই হক না কেন, লিখতে গেলে অনেকখানি তথ্য-বিশ্লেষণ ও আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন থাকে। এ ক্ষেত্রে রচয়িতা কোনো দিক দিয়েই কার্পণ্য করেননি। ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকে আরম্ভ করে ইংল্যাণ্ডের যাবতীয় কবি, গল্পকার, প্রবন্ধলেখক ও সমালোচকদের কথা তাঁর মনে এসেছে। অনেক জায়গায় লেখা সমালোচনার সমালোচনা হয়ে দাঁড়িয়েছে; কত গভীর অভিনিবেশের সঙ্গে এবং কত ব্যাপকভাবে তাঁকে যে পড়াশুনা করতে হয়েছে সেটি প্রত্যক্ষ করা যায়।

শুধু সাহিত্যসৃষ্টির কথা নিয়ে লেখক সন্তুষ্ট থাকেননি, শিল্পসৃষ্টির কথাও প্রসঙ্গক্রমে বিচার করেছেন, দুটি ক্ষেত্রকে আলাদা করে দেখেছেন। এর জন্যে বহু চিত্র ও শিল্পীকেও অনুশীলন করতে হয়েছে, ফলে বইখানি তথ্যের দিক থেকে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। সত্যি কথা বলতে কি রচনাকালে অনুপ্রেরণার প্রশ্নই ওঠে নি, অত্যন্ত সচেতন ও সতর্কভাবেই প্রবন্ধগুলি লেখা হয়েছে।

বইখানিকে চারখণ্ডে ভাগ করা হয়েছে, প্রথম খণ্ড ১৯৬১ সালে ওয়াশিংটনের লাইব্রেরি অফ কংগ্রেসে প্রদত্ত বক্তৃতাবলীর কাঠামো অবলম্বনে লেখা। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ খণ্ডকে ক্যালিফর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ঋণশোধ বলা যেতে পারে; কারণ ১৯৫৯ সালে বার্কলেতে স্পেণ্ডার যে বেক্‌ম্যান বক্তৃতা দিয়েছিলেন, সেগুলি তাঁর ছাপাবার কথা ছিল; বইয়ের এই অংশটি হল সেই শর্তপূরণ, যদিও ছাপতে গিয়ে লেখক খোল-নলচে সবই বদলিয়ে ফেলেছেন।

ভূমিকাতে লেখক বলছেন যে বর্তমান শতকে শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে সব গুণাগুণকে আধুনিক বলা চলে এই বইখানিতে সেই সব বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মতামত পাওয়া যাবে। ফলে ক্ষেত্র হয়েছে বিস্তৃত, কিন্তু যে সব শিল্পী ও লেখকের মধ্যে আধুনিকতার গুণ সেরকম প্রত্যক্ষ হয় না তাঁরা সবাই বাদ পড়ে গেছেন।

প্রথম খণ্ডের নাম The Modern Imagination অর্থাৎ আধুনিকের কল্পনাগুণে। এই সূত্রে কাব্যের মূল্য ও মূল নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। শেলী থেকে রবার্ট গ্রেভ্‌স্ কেউ বাদ যাননি। শেলী বলেছিলেন কবিরা হলেন মানবজাতির অস্বীকৃত আইনপ্রণেতা। গ্রেভ্‌স্ বলেছেন, কবিরা কবিদের জন্যেই লেখেন, তাঁরা সাধারণ লোকের বোঝার বাইরে। পাউণ্ড বলেছেন ত্রিশজন সহানুভূতিশীল পাঠক পেলে কবির অনেক ভাগ্য। জাতকবি স্পেণ্ডার বলতে চাইছেন অত শতয় কাজ কি, কাব্যই হল চরম, তার আবার অন্য একটি উদ্দেশ্য থাকার দরকার কি? আধুনিকের সংগ্রাম কিসের সঙ্গে? বিজ্ঞানজগতের সঙ্গে কি? বিজ্ঞানের এত উন্নতি হচ্ছে বলেই কি কবিদের মনে এত ক্ষোভ, এত জ্বালা? নাকি এলিয়ট যেমন ভেবেছিলেন মূল্যবোধ গেল চলে, বিশ্বাস পড়ল ভেঙ্গে। তাই সংঘর্ষ? লেখক মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি ও মানবজীবনের মান

উন্নয়নের দরুণ কাব্যের কিসে ক্ষতি? শেলী তাঁর 'অ্যাডোনেইস'এ দেখিয়েছিলেন বস্তু-পুঞ্জের বাধার রাশিতে অন্তরের আলো লেগে সেও স্বর্গীয় জ্যোতিতে উদ্ভাবিত হয়ে উঠছে। তবে দ্বন্দ্বটি কার সঙ্গে? কবির নিজের বাস্তবচেতনার সঙ্গে নয় কি?

দ্বিতীয় খণ্ডে স্পেণ্ডার আধুনিক ও সমকালীনের মধ্যে একটি সীমারেখা টেনে দিচ্ছেন। আধুনিকরা বর্তমানকে খণ্ডিত করে দেখে কষ্ট পাচ্ছেন; সমকালীনরা এতে জড়িয়ে থাকলেও তাঁরা জানেন এসব দুদিনের সমস্যা, কালের পরিপ্রেক্ষিতে এর অন্য মূল্য। লেখক আবার মনে করিয়ে দিচ্ছেন যে বহু সাহিত্যিকই এই সত্য উপলব্ধি করে গেছেন যে চার শো বছরেও যখন মানবচরিত্রের কোনো পরিবর্তন চোখে পড়ে না, তখন বদলেছে কোনটা? হয়তো অভ্যাস, হয়তো সাজপোশাক, হয়তো দুনিয়া দেখবার ঢঙ, সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে একজন মনীষী যাকে বলেছেন lighting effect অর্থাৎ আলোকপাতের কায়দা। অর্থাৎ দেখার রকমটি বদলিয়েছে, দৃশ্যবস্তু যেমনকে সেই।

তারপর উঠছে সমালোচনার কথা, সাহিত্য বিচারের সমস্যা, কাব্যরচনার সঙ্গে সাহিত্যবিচারের সম্বন্ধ। আজকালকার কবিরা কি এ বিষয়ে বড় বেশি সচেতন হয়ে পড়ছেন? নিয়মভাঙ্গার নিয়মটি কি খুব কড়া হয়ে উঠছে? কীট্স্ বলেছিলেন গাছে যেমন করে পাতার কুঁড়ি ধরে, কাব্যও তেমনি স্বাভাবিকভাবে কবির হৃদয়ে উন্মেষিত হবে। সৃজনের ক্ষেত্রের নিয়মগুলি বড় উদার। কবিরা কি তা ভুলে যাচ্ছেন?

স্বাভাবিক হও, স্বাভাবিক হও, এও যেন একটা অস্বাভাবিক বুলির মতো হয়ে দাঁড়াচ্ছে। স্পেণ্ডার বলছেন যন্ত্রশিল্পের যুগের আগে 'প্রকৃতির কবিতা' কথাটি শোনাই যেত না। কবিতা লিখে সেটা কাব্য হল কি না, এ বিচার কেউ করত না, বড় জোর বলত, কি বলতে চাইছে কবি?

বইখানিতে মাঝে মাঝে এক নির্ভীক ভাবুকের দেখা পাওয়া যায়, যিনি কাব্য সম্পর্কে শেলী-কীট্সের গীতাভাষ্যগুলির প্রসঙ্গে এতদূর বলতে সাহস পেয়েছেন যে অসাধারণ প্রতিভা থাকলেও, এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে দুজনার মধ্যে কেউই পরিণত হবার সময় পাননি। বিজ্ঞানী স্যার চার্লস স্নো যে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক সংস্কৃতিকে আলাদা করে দেখতে চেয়েছিলেন, সেই সূত্রে স্পেণ্ডার বলছেন যে বৈজ্ঞানিক উন্নতি সম্বন্ধে অজ্ঞ থাকাটাও কিছু গুণের কথা নয়। স্পেণ্ডার নিজে কবি, কাব্যকেই যে তিনি শীর্ষ আসন দেবেন তাতে আর আশ্চর্য কি? শিল্পীর সত্য আর বৈজ্ঞানিকের সত্যের প্রভেদ করে তিনি বলছেন, বৈজ্ঞানিক বলেন 'এইরকম হয়।' আর শিল্পী বলেন 'আমি এইরকম দেখি'। আরো বলছেন যে হাজার কবি এলে একই দৃশ্যবস্তুর হাজার রূপ দেখতে পাবেন, এই হল সাহিত্য-সৃষ্টির সুন্দরতম সত্য।

শেষ অধ্যায়ে স্পেণ্ডার তাঁর উদার বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে আদর্শবাদের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এই অধ্যায়ের নাম The Modern and the Now আধুনিক ও আজকাল। তিনি বলছেন আধুনিকতার আস্ফালন আজকাল পুরোনো হয়ে গেছে; তবে আর তার কথা উত্থাপন করা কেন? তার কারণ আধুনিকের আসল যে সমস্যা তার যে এখনো সমাধান হয়নি। কি সে সমস্যা? তাকে সমস্যা না বলে স্পেণ্ডার বলছেন, 'চ্যালেঞ্জ'; আজকালকার এই অভূতপূর্ব জগতের সঙ্গে যে শিল্প এই জগতকে অতীতের ধারা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে দেখে, তার সমন্বয় ঘটাবার অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারবে কি? এই হল 'চ্যালেঞ্জ'। সাহিত্য ও শিল্পের আধুনিকরা অনেকে অতীতের বুকে ফিরে যেতে চাননি, বরং তাঁরা অতীতের

ঐতিহ্য দিয়ে বর্তমান দ্বন্দ্বময় জীবনকে আলোকিত করবার চেষ্টা করেছেন। লরেন্স যখন প্রকৃতির বুকে ফিরে গেলেন, তিনি ওয়ার্ডস্বর্থের মতো শান্তির ও সমন্বয়ের আশ্রয় খোঁজেননি, তিনি খুঁজলেন প্রচণ্ড ও প্রাথমিক একটা প্রাণশক্তি, যার সাহায্যে যেমন গড়াও যায়, তেমনি ধ্বংসও করা যায়।

এখন মুস্কিল হচ্ছে বহু আধুনিক প্রতিভা ভিৎ ছাড়াই প্রাসাদ গড়তে চেয়েছেন, কারণ তাঁদের মতে ভিৎ মানেই পিছন হাতড়ে অতীতের সামগ্রী ধার করা; তাছাড়া তাঁরা বলছেন আধুনিকের আবার ভিত্তির কি দরকার, সে নিজেই দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে। স্পেণ্ডার বলছেন সম্ভবতঃ আধুনিকরা বিংশ শতাব্দীর সমগ্র অভিজ্ঞতাকে তার কুশ্রীতা, গ্লানি, হতাশা সুদ্ধ শিল্পের পর্যায়ে তুলে দিতে চেয়েছেন। এই 'চ্যালেঞ্জ' চিরন্তন; সেক্ষপীয়রের কিং লিয়রের শেষে এডমণ্ড এই চ্যালেঞ্জ করেছিলেন।

তাহলে সৃষ্টিকারদের এই দুই পন্থার মধ্যে বেছে নিতে হয়, বর্তমানকে সর্বৈবভাবে শিল্প প্রেরণা দিয়ে উদ্ভাসিত করবেন, নাকি এই সভ্যতাকে অস্বীকার অর্থাৎ তার ধ্বংস কামনা করবেন। এই দুইয়ের একটিকেও যদি গ্রহণ করা সম্ভব না হয়, তা হলে শিল্পীর সমস্যার কি কোনো উত্তর আছে? কবি ইয়েটস্ নাকি বলেছিলেন ১৯২৯ সাল থেকে এই সভ্যতার অন্তিম অধ্যায়ের সূচনা হবে। তার পর বহু বছর কেটে গেছে। স্পেণ্ডার বলছেন সেই প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে আজ নতুন প্রতিক্রিয়া দেখা যাচ্ছে। এইতো আধুনিকের অভিযানের আশাপ্রদ সমাপ্তি।

লীলা মজুমদার

বাংলা গদ্যসাহিত্যের ইতিহাস—সজনীকান্ত দাস। মিত্রালয়। কলিকাতা ১২। মূল্য চৌদ্দ টাকা।

বাংলা গদ্যের জন্ম ও ক্রমবিকাশের আলোচনায় বাংলাদেশের খ্যাতনামা পণ্ডিতরা আত্মনিয়োগ করেছেন। তাঁদের মধ্যে দীনেশচন্দ্র সেন, সুশীলকুমার দে এবং সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়। এইসব পণ্ডিতদের বই সামনে উপস্থিত থাকা সত্ত্বেও সজনীকান্ত যে বাংলা গদ্যের উপর আর একখানি বিপুল আকারের বই রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তার কারণ তিনি বহু নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়েছিলেন। কিন্তু শুধু নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে পারাটাই সব সময় খুব বড় কথা নয়।

পৃথিবীতে এক জাতের লোক থাকেন যাঁরা সংগ্রহ করতে ভালবাসেন। নানা দেশ থেকে তাঁরা নানা রকম বিচিত্র এবং সঙ্গতিবিহীন দ্রব্যসম্ভার আমদানী করে ঘর ভরে ফেলেন। আর এক জাতের লোক আছেন যাঁরা সাজানোর গুণে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করেন, অসঙ্গতির মধ্যে সঙ্গতিবিধান করেন। আলোচ্য বইয়ে মনে হয় সজনীবাবু এই দুই জাতের প্রকৃতির মধ্যে মিলন ঘটিয়েছেন। তিনি শুধু নতুন তথ্য সংগ্রহ করেননি, সেই তথ্যের সাহায্যে বাংলা গদ্যের আদি যুগের ইতিহাসকে নতুন অবয়ব দান করেছেন। তিনি একই সঙ্গে সংগ্রাহক এবং সংগঠক।

সুশীলকুমার দে তাঁর ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে প্রাচীন গদ্যের নিদর্শন যে সব

পুঁথি-পত্র দলিল-দস্তাবেজের মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে তা ঘাঁটাঘাঁটি করে ইতিহাস রচনা করা শুধু কষ্টসাধ্য নয়, খুব নীরস কাজও বটে। সে যুগের গদ্যের নিদর্শন বলতে যা বোঝায় তার সঙ্গে সুললিত সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নেই; অভিধান, ব্যাকরণ, অনুবাদ ও পাঠ্য-পুস্তকের মধ্যেই তা সীমাবন্ধ। এই ফুলফলবিহীন শ্রীবর্জিত দুস্তর অরণ্যের মধ্যে দিনের পর দিন বিচরণ করা সহজ কাজ নয়। কতখানি নিষ্ঠা থাকলে এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন ইতিহাসকে জানার এবং জানানোর আগ্রহ থাকলে এ কাজ মানুষ করে তা সহজেই অনুমেয়। এই কঠিন কাজে সজনীকান্ত যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা সুশীলবাবুর একটি কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে: সজনীকান্ত 'রসিকের ধর্মের সহিত পণ্ডিতের কর্মের মণিকাঞ্চন সংযোগ ঘটাইয়াছেন।' এবং তা সত্ত্বেও 'তাঁহার রস-পিপাসা কোথাও তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাকে ক্ষুণ্ণ করে নাই।' কথাটির মধ্যে কোন অতিরঞ্জন নেই।

যে উপায়ে সজনীকান্ত নীরস বিষয়বস্তুকে সুখপাঠ্য করে তুলেছেন তা হল সহজ সাবলীল ভাষা, অনাবশ্যক বাগ্‌বিস্তারকে পরিহার করা, এবং উপমার ব্যবহার। আলোচনা-মূলক রচনায় অলঙ্করণ অনেক সময় পীড়াদায়ক। কিন্তু অনেক অলঙ্কার বিষয়বস্তুর গভীরতর উপলব্ধিকে সাহায্য করে। এ জাতের অলঙ্কার প্রয়োগ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং মূল্যবান। উপভোগ্য তো বটেই। প্রাচীন গদ্যের উপকরণ প্রসঙ্গে সজনীকান্ত বলছেন: 'অধুনা অজ্ঞাত উপাদান ও পদ্ধতিতে নির্মিত কোনও প্রাচীন মন্দির ভাঙিয়া গেলে আমরা যেমন বিচ্ছিন্ন উপাদানগুলিই দেখাইতে পারি, তদ্দ্বারা কিছু গড়িয়া তুলিতে পারি না, আজিকার দিনে বাংলা গদ্যের আদিম অবস্থা বুঝাইতে হইলে আমাদিগকে সেইরূপ বিচ্ছিন্ন উপাদানই দেখাইতে হইবে।' পৃ. (৬)।

কিন্তু সেই বিচ্ছিন্ন উপাদানের মধ্যেই সজনীকান্ত ধারাবাহিকতা অনুসন্ধান করেছেন। দশম শতাব্দীতে বাংলা ভাষার উৎপত্তির সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলায় উল্লেখযোগ্য সাহিত্য রচিত হয়েছে। কিন্তু সাহিত্যের সেই পংক্তি-ভোজনে দৈনন্দিন ব্যবহারের অন্ত্যজ গদ্যের কোন স্থান ছিল না। তথাপি এই সময়েও বাংলা গদ্যে কিছু অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। ধর্মীয় প্রয়োজনে রচিত ভাঙা ভাঙা প্রতীক লক্ষণাক্রান্ত সন্ধ্যা ভাষার বদলে ধীরে ধীরে অপেক্ষাকৃত সুসংগঠিত ভাষা রূপ নিয়েছে। তার পরিচয় পাওয়া যায় প্রধানতঃ কিছু কিছু চিঠিপত্রের মধ্যে। সজনীকান্ত পরিবর্তনটুকু চিহ্নিত করার জন্য এই কালকে দুই যুগে ভাগ করেছেন—অন্ধকার যুগ এবং চিঠিপত্র ও দলিলের যুগ।

সজনীকান্ত বলছেন: 'চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত 'চণ্ডীদাস রূপপ্রাপ্তি'র বা 'অক্ষরে রাগ লাড়ি' অথবা শূন্যপুরাণের 'হস্ত পাতি লহ সেবকের অর্ঘ পুষ্প পাণি' হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্বোক্ত ১৭৭৮ খৃস্টাব্দের 'তোরফেনকে তলব দিয়া' পর্যন্ত ভাষার একটা প্রগতি ও ধারাবাহিকতা প্রায় অব্যাহত আছে। বাংলা গদ্যের উহাই মূল ধারা। এই ধারাই পরবর্তী কালে শ্রীরামপুর মিশন ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ, ভবানীচরণ ও রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্র ও অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণমোহন ও রাজেন্দ্রলাল, ভূদেব ও বঙ্কিম কর্তৃক পরিপুষ্ট হইয়া বর্তমান গদ্য বাংলা সাহিত্যরূপ সুবিশাল নদীতে পরিণত হইয়াছে।' (পৃ. ১৭) কিন্তু ১৭৪৩ খৃস্টাব্দে যে লিসবন নগর থেকে রোমান হরফে "কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ" নামে প্রথম মুদ্রিত বাংলা বই প্রচারিত হয় তা একটি প্রাদেশিক কথিত ভাষায় রচিত এবং মূল ধারার সঙ্গে নিঃসম্পর্কিত। 'সুতরাং ১৭৭৮ খৃস্টাব্দকেই আমরা বাংলা গদ্যের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ বৎসর বলিব। এই বৎসরই হুগলি সহরে প্রতিষ্ঠিত মুদ্রাযন্ত্রে নাথানিয়েল

ব্রাসি হালহেড প্রণীত *A Grammar of the Bengali Language* প্রকাশিত হয়।' (পৃ. ২৭) সজনীকান্তের এই মন্তব্যের মধ্যে তাঁর মৌলিকত্ব এবং ভাষার রূপ সম্পর্কে গভীর অভিনিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়।

সজনীকান্ত বলছেন : 'এক হিসাবে ১৭৭৮ খ্রীস্টাব্দে যে ভাষার প্রামাণিক আত্মপ্রকাশ দেখিতেছি তাহা বাংলাদেশে মুসলমান প্রভাবের ফল।...পরবর্তীকালে হেনরী পিটস্ ফরস্টার ও উইলিয়ম কেরী বাংলা ভাষাকে সংস্কৃত জননীর সন্তান ধরিয়া আরবী পারসীর অনধিকার প্রবেশের বিরুদ্ধে রীতিমত ওকালতী করিয়াছেন।' (পৃ. ৬২) কাজেই ইংরেজের আগমন না ঘটলে 'আজিও আমাদিগকে 'গরিব নেওয়াজ শেলামত' বলিয়া শুরু করিয়া 'ফিদবি' বলিয়া শেষ করিতে হইত। তাহা মঙ্গলের হইত কি অমঙ্গলের হইত, আজ সে বিচার করিয়া লাভ নাই।' (পৃ. ৩২) সজনীকান্তের মত গোঁড়া হিন্দুর কলম থেকে এ রকমের উদার অসাম্প্রদায়িক উক্তি বিস্ময়কর। বস্তুতঃ বইখানি পড়তে পড়তে আমার কতবার মনে হয়েছে যে সাহিত্যের অনেক ব্যাপারে সজনীকান্ত মাঝে মাঝে অসহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়েছেন: কিন্তু তিনি যখন ঐতিহাসিক তখন তিনি উদার নিরাসক্ত এবং বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিসম্পন্ন।

বিজয়ী ইংরেজদের বিরুদ্ধে আমাদের বৈরীভাব থাকা অস্বাভাবিক নয়। তথাপি সজনীকান্ত তাঁদের প্রাপ্য প্রশংসা দান করতে ইতস্তত করেন নি। তিনি বলেছেন : 'উইলকিন্স-জোনস্ সম্প্রদায় ভারতবর্ষের সহিত ইউরোপের সংস্কৃতিগত ঘনিষ্ঠতার সূত্রপাত করিলেও নিজেরা শুধু দিতে ও শিখাইতে আসেন নাই; শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিতে ও শিখিতে আসিয়াছিলেন। একটা বর্বর অসভ্য জাতিকে অন্ধকার হইতে আলোকে লইয়া যাইবার দম্ভ তাঁহাদের ছিল না; তাঁহারা সশ্রদ্ধ অন্তঃকরণে বিনীতভাবে আত্মীয়-হস্ত প্রসারণ করিয়াছিলেন।' (পৃ. ৫৪-৫৫)

সত্য ভাষণ হিসাবে প্রশংসা করতে যেমন সজনীকান্ত পরাঙ্মুখ হন নি, তেমনি সেই সত্যের খাতিরে প্রয়োজনবোধে তিনি অপ্রশংসাও করেছেন। হেস্টিংস উইলকিন্সদের পরবর্তী মিশনারীদের মধ্যে ভারতবর্ষের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবের অভাব ছিল। 'বিলাতে বন্ধুদের নিকট লিখিত শ্রীরামপুর মিশনারীদের পত্রে এবং তাঁহাদের দিনলিপিতে হিন্দু ও মুসলমান ধর্মশাস্ত্র ও ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনীগুলি সম্পর্কে যে কুৎসিৎ বিরুদ্ধ মতবাদ লিপিবদ্ধ আছে, তাহা পাঠ করিলে আমরা আজিকার দিনেও চঞ্চল হইয়া উঠিব।' (পৃ. ১১২)

সজনীকান্তের নির্ভীক ও নিরাসক্ত স্পষ্টবাদিতার আর একটি প্রমাণ পাওয়া যায় উইলিয়াম কেরী সম্পর্কে তাঁহার মন্তব্যে। তিনি বলেছেন : 'কেরীর জীবন-কথা যিনি ঔৎসুক্য ও কৌতূহলের সঙ্গে অনুধাবন করিবেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তিনি আর তাঁহাকে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন না।' (পৃ. ১৬৪) অথচ যে কেরী সম্পর্কে সজনীকান্তের এতখানি শ্রদ্ধা সেই কেরীর গদ্য রচনা সম্পর্কে তিনি বলেছেন : 'স্পষ্ট দেখা যাইতেছে কেরী ভাষার কিছুমাত্র শ্রীবৃদ্ধি করিতে পারেন নাই।' (পৃ. ৯৬) একটু পরেই বলেছেন : 'মুনসী ও পন্ডিতদের উদ্বুদ্ধ ও উৎসাহিত করিয়া তিনি (কেরী) যাহা করিয়াছেন, তাঁহার নিজের কৃতিত্ব তাহার তুলনায় সামান্য।' (পৃ. ৯৭)

সজনীকান্তের বইখানা থেকে বিচ্ছিন্ন কতকগুলো বিষয় উল্লেখ করে আমি এইটেই প্রতিপন্ন করতে চাইছি যে ইতিহাস লেখার জন্য যে তথ্যনিষ্ঠা, বৈজ্ঞানিক নিরাসক্তি এবং

স্পষ্টবাদিতা দরকার তাঁহার মধ্যে তা পূর্ণমাত্রায় আছে।

ইতিহাস রচনার পরিকল্পনার মধ্যেও তাঁর নিজস্ব বিশেষত্ব প্রকাশ পেয়েছে। তিনি শুধু গদ্যের নমুনা উল্লেখ করে ভাষার অগ্রগতির ধারাবাহিকতা নির্ধারণ করেই ক্ষান্ত থাকেননি। তিনি বিভিন্ন গদ্য-রচয়িতার জীবনী ও চরিত্র এবং গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। গদ্য-সাহিত্যের আলোচনায় এই আনুসঙ্গিক ব্যাপারের উপর এতখানি গুরুত্ব দেওয়া সকলের কাছে ভাল না লাগতে পারে। কিন্তু আমার মনে হয় এই পদ্ধতিতে নীরস বিষয়বস্তু অধিকতর চিত্তাকর্ষক হয়েছে। গদ্য-সাহিত্যের ইতিহাস যে একটি নিষ্প্রাণ ব্যাপার নয়, মানুষের হাতে হাতেই তা যে গড়ে উঠেছে, বইখানি এমন একটি অনুভূতি সৃষ্টি করে। অবশ্য এ-কথা ঠিক আনুষঙ্গিক ইতিহাসের উপর অনেকখানি জোর দেওয়ায় গদ্য-ভাষার আবয়বিক অগ্রগতির খুঁটিনাটি আলোচনায় সজনী-কান্ত বেশী কালক্ষেপ করতে পারেননি। তাতে খুব অসুবিধা হয় না এই জন্য যে তিনি যে প্রচুর পরিমাণ উদ্ধৃতি দিয়েছেন তা থেকে পাঠক অনায়াসে ভাষার অবয়বগত অগ্রগতির বিস্তারিত চিত্র তৈরী করতে পারবেন। মোটের উপর ইতিহাস রচনার পদ্ধতি হিসাবে সজনীকান্ত মোটামুটিভাবে দীনেশচন্দ্র সেনকে অনুসরণ করেছেন বলে মনে হয়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁর মতামতের মৌলিকত্ব ও সূক্ষ্ম অভিনিবেশের পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি তথ্য সংগ্রহ ও সুশৃঙ্খল পরিবেশনাতেই সজনীকান্ত সর্বাধিক মনোযোগ দিতে বাধ্য হয়েছেন বলে বিস্তারিত সমালোচনামূলক পর্যালোচনার অবকাশ রয়ে গিয়েছে। সে কাজের দায়িত্ব পরবর্তীদের।

সজনীকান্ত চার খণ্ডে বাংলা গদ্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু সে আশা পূর্ণ হলো না। সুখের বিষয় প্রকাশক লেখকের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রচনাগুলি সংগ্রহ করে পরিকল্পিত দ্বিতীয় খণ্ডকে (ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পর্যন্ত) মোটামুটি সম্পূর্ণতা দান করেছেন। তার ফলে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলা গদ্যের একটি বিস্তারিত এবং পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আমরা হাতের কাছে পাচ্ছি।

অচ্যুত গোস্বামী

ভ্রমণকারি বন্ধুর পত্র—কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। মোহনলাল মিত্র সম্পাদিত। নবভারতী। কলিকাতা ১২। মূল্য চার টাকা।

বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়াছেন যে ঈশ্বর গুপ্ত শেষ খাঁটি বাঙ্গালী কবি। আমরা বলি স্বল্প-ইংরাজি-শিক্ষিত, ধুতি-পিরাণ-পরিহিত গঙ্গাকূলবাসী ঈশ্বর গুপ্তই চিন্তা ও কীর্তির দিক দিয়া আমাদের দেশের একজন প্রথম খাঁটি 'সাহেব'। কথাটা যে রহস্য নহে তাহার জন্য কিঞ্চিত টীকা প্রয়োজন। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে কাব্য, অলঙ্কার ও রস শাস্ত্রের বইয়ের ইয়ত্তা নাই। কিন্তু কে কবে আমাদের দেশে কবিদের জীবনবৃত্তান্ত বা তাঁহাদের কাব্য লইয়া লিখিয়াছেন? ঈশ্বর গুপ্তের ভারতচন্দ্র ও অন্যান্য প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের 'কবিজীবনী' পাশ্চাত্ত্য রীতিতে লিখিত বাঙ্গলাভাষায় সর্বপ্রথম জীবনীগ্রন্থ। স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্র গুরু ঈশ্বর গুপ্তকে দেশবাৎসল্যে আমাদের একজন পূর্বগামী বলিয়া প্রণাম জানাইয়াছেন। ইহা

ছাড়া শ্রীরামপুরের পাদ্রীদের এবং রাজা রামমোহন রায়কে বাদ দিলে ঈশ্বর গুপ্ত একজন সর্বপ্রথম ও সর্বপ্রধান বাঙ্গালী সাংবাদিক। বাঙ্গালীদের মধ্যে তিনিই প্রথম কেবলমাত্র লেখনীর সাহায্যে জীবিকা অর্জন করিয়াছেন।

বলা বাহুল্য গুপ্তকবির সংবাদ প্রভাকর এখন আমাদের চোখে দেখিবার জো নাই। গত বৎসর শ্রীবিনয় ঘোষ প্রভাকরের সংরক্ষিত ফাইলগুলি হইতে সম্পাদকীয় মন্তব্য, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, সংবাদ ও বিজ্ঞাপন ইত্যাদির সুবৃহৎ সংকলন গ্রন্থ ("সংবাদপত্রে বাংলার সমাজচিত্র" —১ম খণ্ড) প্রকাশ করিয়া একটি বড় কাজ করিয়াছেন। আলোচ্য গ্রন্থটিতে সাংবাদিক ঈশ্বর গুপ্তর একটি বিশেষ দিক দেখা যাইবে। সম্পাদক শ্রীমোহনলাল মিত্র প্রভাকর হইতে গুপ্তকবির ভ্রমণ-বিষয়ক রচনাগুলি উদ্ধার করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ১২৬১ সালের ৭ই অঘ্রাণ ঈশ্বর গুপ্ত সংবাদ প্রভাকরের সম্পাদনা ভার তাঁহার সহকারী বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের হস্তে ন্যস্ত করিয়া শারীরিক রোগের প্রতিকার প্রার্থনায় ও দেশ-দর্শনের অভিপ্রায়ে বাহির হইয়া পড়েন। কিঞ্চিদধিক চারিমাস কাল উত্তর-পূর্ব বঙ্গের কিয়দংশ ও পূর্ববঙ্গের বিভিন্নাঞ্চল ভ্রমণান্তে তিনি চৈত্রমাসে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। ভ্রমণকালীন নানাস্থান হইতে তিনি যে লেখাগুলি পাঠান 'ভ্রমণকারী বন্ধুর লিখিত বিষয়' নামে সংবাদ প্রভাকরে মুদ্রিত হয়। এই প্রসঙ্গে গুপ্তকবি লিখিয়াছেন :

'...ভ্রামক হইয়া ভ্রমণকালে স্থানে স্থানে সমূহ সুখ অনুভব করিয়াছি...নূতন নূতন যত দেখিয়াছি ততই নূতন নূতন সুখের সঞ্চার হইয়াছে। নদী-নদের সরল তরল লহরী-লীলা, তরঙ্গ-রঙ্গ, অতি সহজ ও অতি কুটীল বঙ্কিম গতি। -পর্বতপুঞ্জের প্রকৃষ্ট ভাতি। -কাননের কমনীয় কান্তি। -সুন্দরবনের সুন্দর শোভা। -কত নগর, কত গ্রাম, কত হট্ট, কত গঞ্জ, কত দেবালয়, কত তীর্থ, কত ক্ষেত্র, কত উপবন, কত সরোবর, এইরূপ কত কত বিষয় অবলোকন করত কেবল পুলকে পরিপূরিত হইয়াছি, চক্ষের সার্থকতা হইয়াছে।'

এই কথাগুলির মেজাজ আমাদের খাঁটি সনাতনী ভেষজ মেজাজ নহে, একেবারে যেন বেকনপড়া মেজাজ। জাতি হিসাবে আমরা চিরকালই ভ্রমণপ্রিয়। আমরা রূপকথার রাজপুত্রের কথা কহিতেছি না যে রাজপুত্র কুঁচবরণ কন্যার জন্য আকাশ-পাতাল ঢুঁড়িয়া বেড়াইতেন। আমরা দিগ্বিজয়ী রাজাদের কথাও বলিতেছি না। কিন্তু আমাদের চাঁদবেণেরা চৌদ্দডিঙা সাজাইয়া সাগরপাড়ি দিতেন ইহা অলীক কল্পনা নহে। আমাদের সাধু-সন্ন্যাসীগণ যুগ যুগ ধরিয়া আসমুদ্র-হিমাচল প্রবজ্যা হইতেন। যুগ যুগ ধরিয়া কোটি কোটি নরনারী সংসার-পাকচক্র হইতে মুক্তি কামনায় এই বিশাল ভারতের চারিধামে তীর্থ করিয়া বেড়াইতেন। কিন্তু পূর্বে 'পর্বতপুঞ্জের প্রকৃষ্ট ভাতি', 'সুন্দরবনের সুন্দর শোভা', 'নদী-নদের তরল তরঙ্গ রঙ্গ', হট্ট-গঞ্জের কোলাহল উপভোগ সকাশে লোকে ভ্রমণে বাহির হইতেন তাহার কোন লিখিত নজীর নাই। আজিও আমাদের দেশের নরনারী প্রধানতঃ দেবদর্শনের জন্য ভ্রমণ করেন, দেশ-দর্শনের আনন্দের জন্য নহে। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। প্রায় তেত্রিশ বৎসর পূর্বে বিখ্যাত পর্বতারোহী ফ্র্যাঙ্ক স্মাইথ যখন ভুইন্দর উপত্যকায় ফুলের গারদে বন্দী তখন তিনি দেখেন অদূরবর্তী 'যাত্রীপথ' বাহিয়া অগণিত নর-নারী বহতা নদীর ন্যায় বদ্রীনাথ অভিমুখে ধাবমান। তিনি অবাক হইয়া দেখেন যে পুষ্পিতা প্রকৃতির মোহিনী শোভা তাহাদের আকর্ষণ করিতে অক্ষম, নীলকণ্ঠ গিরিশৃঙ্গের 'প্রকৃষ্ট ভাতি' তাহাদের নিকট অর্থহীন। পরিবেশ সম্পর্কে এই উদাসীনতা স্মাইথ সাহেব ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। ইহা সত্য যে একদা আমরা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ

সচেতন ছিলাম, তাহা না হইলে 'দ্রব্যগুণ' লেখা হইল কি করিয়া। কিন্তু অক্ষয় দত্ত মহাশয়ের কথায় আমাদের চিন্তার ইতিহাসে একটি বেকনের আবির্ভাব হইল না। ফলতঃ আমরা কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পাত্রাধার-তৈল ও ঘটাকাশ-পটাকাশের অনর্থক তর্কে কয়েদ হইয়া রহিলাম। কোন বায়স বৃহস্পতিবার সার্ধ-তিন ঘটিকায় গৃহের নৈঋৎ কোনে তিনবার কা কা রব করিলে তাহার শুভাশুভ ফল লইয়া আমরা পুঁথি লিখিলাম কিন্তু কাকের আকৃতি প্রকৃতি, ইত্যাদি সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ভাবে জানিবার কোন চেষ্টা করিলাম না। অবশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহেবগণের সহিত ঘর করিয়া পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার প্রভাবে আমরা পুনরায় পরিবেশ সচেতন হইলাম, চোখ খুলিয়া সকল জিনিস পুনরায় পরীক্ষা করিবার প্রয়াস পাইলাম। আরও নানা বিষয়ের ন্যায় নিছক আহ্লাদের জন্য অথবা আনন্দ ও শিক্ষার জন্য ভ্রমণ ও ভ্রমণের অভিজ্ঞতা লিপিবন্ধ করার সার্থকতা আমরা শিক্ষা করিলাম। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে অনেকে ও তৎপূর্বে মীর্জা আবু তালেব খান বা দীন মহম্মদের ন্যায় লোকেরা স্বদেশে ও বিদেশে নতন দৃষ্টি লইয়া ভ্রমণ করিতে সুরু করিলেন এবং ভ্রমণ কাহিনী লিখিতে লাগিলেন। ঈশ্বর গুপ্ত এই অগ্রণীদের অন্যতম। শ্রীমোহনলাল মিত্র ঠিক বলিয়াছেন যে 'ঊনবিংশ শতাব্দীর নবযুগ-ধর্মী ভ্রমণ সাহিত্য রচনায় পূর্বসূরিতার মর্যাদা যে কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রাপ্য তা মেনে নেওয়া যেতে পারে।'

'ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র'-গুলি সংবাদপত্রের জন্য লেখা হয়। আশ্চর্য এই আপাত ক্ষণ-ভঙ্গুর রচনাগুলি আজ আমাদের সম্মুখে শতাধিক বর্ষ পূর্বের বাঙ্গলাকে জীবন্ত করিয়া তুলিয়া ধরে। শ্রীমিত্রের ভাষায় 'এই গ্রন্থখানি একাধারে ইতিহাস, ভূগোল, সমাজতত্ত্ব, সমাজ-চিত্র, নিসর্গ পরিচয়...।' শ্রীমিত্রের বক্তব্যের পাদপূরণ করিলে বলিতে হয় ইহার পাতায় যে জগৎ কলরবমুখর হইয়া দেখা যায় তাহা ইংরাজ 'শাসনের' আদিপর্বের জগৎ। এই জগতে যাহারা ভীড় করিয়া আছে তাহারা হইল ইংরাজ হাকিম, দেশীয় হাকিম ও শিক্ষক, খাজাঞ্চী ও সেরেস্তাদার, জমিদার ও ডাক্তার, কেরাণী ও পুলিশের আমলা, পেস্কার ও নিমকীর কর্মচারী, ব্যবসায়ী-ব্যাপারী ও মাঝি-মাল্লা ও আরও নানা বিচিত্র নরনারী।

শ্রীমিত্র তাঁহার ভূমিকায় বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান পুস্তক ও ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন। আমরা 'রিপোর্টার' ঈশ্বর গুপ্তর বিষয়ে কয়েকটি কথা বলিতে চাহি। সাংবাদিকের মূল কাজ হইল খবর ও তথ্য সংগ্রহ করা, কারণ এগুলির অভাবে তাহার অবস্থা ঠুঁটো হইয়া পড়ে। ঈশ্বর গুপ্ত এই বিষয়ে কিরূপে উদ্যমী ছিলেন তাহা একটি উদাহরণ দিলে বুঝা যাইবে। তিনি চট্টগ্রাম জিলায় ১২৬১ সালের ২৪শে মাঘ হইতে ৩০শে মাঘ অর্থাৎ একুনে এক সপ্তাহ অবস্থান করেন এবং জিলাটির নিম্নলিখিত ভাবে বিবরণী দেন :

জিলা চট্টগ্রামের পুরাতন ও নূতন বিবরণ; জিলার সীমা; আবাদি, পতিত ও সর্বশুদ্ধ জমি; রাজস্ব আয়ব্যয়; চিহ্নিত ও অচিহ্নিত রাজকর্মচারীগণের বিবরণ; থানা, ফাঁড়ি, নিমকচৌকি; দেশীয় কর্মচারীগণের বিবরণ; পূর্বাবস্থার সহিত বর্তমানের ঘটনা; কারাগার; পরগনা; জমিদার; মালগুজারী; পলটন; রাস্তা; নীলকুটি; কর্মচারী; জিলায় ভদ্রলোক ও ভদ্রজাতি; বিবাহাদি ক্রিয়া; ব্রাহ্মণ; কায়স্থ; মুসলমান; সাধারণ বিষয়; নানা জাতীয় প্রজার সংখ্যা; ভিক্ষা; ব্যভিচার; হাট-বাজার; হিন্দু পুরুষ; দস্যুতা; মোকদ্দমা; নদী-নদ; সদরঘাট; তীর্থ; ফিরিঙ্গি; মেলা ও ব্রত; বেহারা; ব্যবসায়; আহারীয় দ্রব্য; ফলমূলাদি; কৃষিকার্য; নানাদ্রব্য; সাম্প্রতিক সংবাদ; ভূমিজ দ্রব্যাদি; পর্বতীয় কাষ্ঠ;

চর্চ; বন্যবৃক্ষ; পক্ষী; হিংস্র সর্প ও জন্তু; শিল্পকর্ম; পর্বতীয় জাতিসমূহ; আহার-বিহার; বিবাহ-পদ্ধতি; ধর্ম ইত্যাদি।

উপরোক্ত তালিকাটি দেখিলে যে প্রশ্নটি স্বতঃই মনে আসে তাহা হইল এই যে একজন ভগ্নস্বাস্থ্য 'ভ্রামকের' পক্ষে মাত্র সাতদিনে কিরূপে এবম্বিধ খবরাখবর সংগ্রহ সম্ভব। মনে রাখিতে হইবে যে তখন ভ্রমণ অতীব সময়-সাপেক্ষ ও কষ্টকর ছিল। মনে রাখিতে হইবে যে তখন আজিকার ন্যায় তথ্যপুস্তিকা প্রায় ছিল না বলিলে চলে—ইহা হান্টার সাহেবের গেজেটিয়ারের প্রায় দুই তিন যুগ আগেকার কথা। সেইজন্য গুপ্তকবিকে খবরাখবর সংগ্রহের জন্য রাজকর্মচারী, শিক্ষিত ভদ্রলোক, সাধারণ লোকজন সকলের সহিত সাক্ষাৎ ও আলোচনা করিতে হইয়াছে এবং তাঁহার নিজের কথায় 'প্রতি জেলায় প্রায় সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া ...ছদ্মবেশে ও প্রকাশ্যভাবে নানাপ্রকার পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করিতে হইয়াছে।'

প্রতিটি অঞ্চলের বিশিষ্ট চেহারাটি সম্যকভাবে চিত্রিত করিতে লেখক ছোট-বড়, লঘু-গুরু সকল বিষয়কে তুল্য মূল্য দিয়া, মনের তরাজুতে পাষাণ ভাঙিয়া মিলাইয়া মিশাইয়া ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার দৃষ্টির বেঁওতি জালে যেমন রুই-কাতলা সেইরূপ চুনো-পুঁটিও ধরা পড়িয়াছে। তিনি যেরূপ একদিকে জেলার প্রাকৃতিক বিবরণী, রাজস্বের বিভিন্ন খাতে আয়-ব্যয়, থানা, ফাঁড়ি চৌকি ইত্যাদির বিস্তারিত ফিরিস্তি দিয়াছেন সেইরূপে অপর দিকে টেঁপাখোলার ঘাট হইতে ফরিদপুরের কাছারীর সঠিক দূরত্ব, (অর্ধ ক্রোশের কিঞ্চিৎ উপর), নোয়াখালীর পুস্তকালয়ের গ্রন্থসংখ্যা (১৯৫৩), বরিশালের প্রকাশ্য ইষ্টকালয়ের সংখ্যা (৯), চট্টগ্রামের স্কুলের ছাত্রসংখ্যা (২৪৭—ব্রাহ্মণ ৭, বৈদ্য ৬৮, কায়স্থ ৮৮, ইতরজাতি ২, খৃস্টান ১৪, মুসলমান ৬৭, মগ ১), নোয়াখালীর কালেজ বাটি নির্মাণের খরচ (৩৬৬৩৯॥৶৩ পাই) ইত্যাদির কড়াক্রান্তি হিসাব দিয়াছেন। ঠিক এইরূপে নিখুঁতভাবে তিনি প্রত্যেকটি স্থানের রাজকর্মচারী, শিক্ষক ও অন্যান্য ব্যক্তিবর্গের নামধাম, বংশপরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা, স্বভাবচরিত্র বিবৃত করিয়াছেন। কোন সাহেব প্রজাপীড়ক (সকল কুঠিয়াল), কোন সাহেব নীলকরদিগের অনুরোধের বশ্য নহেন ('ফরিদপুরের জাইণ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর মেং এই সি রেক্স...যদিও বয়স অল্প, বিলক্ষণ প্রবীণতা আছে'), কোন সাহেব ৭ হাত নরখাদক বাঘ মারিয়াছেন (নোয়াখালির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও জাইন্ট কালেক্টর মেং সিম্‌সন), কোথাকার (রাজসাহীর বোয়ালীয়ার) দুই হুজুর 'সরকুটে বাহির হইয়া নীল ও রেশম কুঠিয়ালদের অন্ন ধ্বংসিয়া উদরপূর্ণ করিতেছেন...অথচ ভাতার টাকা গবর্নমেন্টের নিকট হইতে কড়ায়গণ্ডায় বুঝিয়া লইয়া পাকেট পূর্ণ করিতেছেন', আবার কোন হুজুরকে (বোয়ালিয়ার কালেক্টর) ভ্রমণকালীন 'ভাতা রহিত করিবার জন্য শীঘ্রই আপনার হাতার মধ্যে মাথা ঢুকাইতে হইবে', কোন দেশীয় কর্মচারীর সুকর্মের জন্য বেতনবৃদ্ধি হইল ('বোয়ালিয়ার খাজাঞ্চীবাবু শ্রীরাধাকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের বেতন ১১৩ টাকা নির্ধারিত হইয়াছে ...খাজাঞ্চীবাবু সর্বতোভাবে সুযোগ্য, সম্ভ্রান্ত, সদ্বংশ'), কোথাকার (পাবনার) ডাক্তারবাবুকে আপনার কার্য ছাড়া ডাকের ও রেজেষ্ট্রারির কর্মও করিতে হয়...কিছুই গুপ্তকবির দৃষ্টি এড়ায় নাই। ব্যক্তিপরিচিতির মধ্যে গুপ্তকবি যে কোন মুসলমানের নাম করেন নাই তাহার একটি কারণ যে তখনও শিক্ষা ও সামাজিক ক্ষেত্রে তাঁহারা খুব প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। তবে তিনি যে তাঁহাদের গুণগ্রাহী ছিলেন তাহা তাঁহার চট্টগ্রামের মুসলমানদিগের সম্বন্ধে মন্তব্য দেখিলে বুঝা যায়। ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন যে তাঁহাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত, ধনী ও বিদ্বান ব্যক্তি দেখিয়াছিলেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন যে বরিশালের হিন্দু

জমিদারেরা 'মদগর্বে গর্বিত, মোকদ্দমা পাইলে কিছুই চাহেন না...যবন জমিদারেরা হিন্দু জমিদার অপেক্ষা অনেক প্রকৃষ্ট, তাঁহারা যদিও প্রজাপীড়ক বটেন, কিন্তু বিবেচনাপূর্বক মোকদ্দমায় প্রবৃত্ত হয়েন।'

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের আচার-ব্যবহার ইত্যাদির বড় সুন্দর চিত্র আমরা গুপ্তকবির লেখায় পাই। নোয়াখালিতে গরীব লোকেরা সীমের বিচির ডাল খাইত, বরিশালে মুশুরী ও খেঁশারী ছাড়া অন্য ডালের চল ছিল না। নোয়াখালিতে তিনি দেখিয়াছিলেন যে স্ত্রীলোকেরা তামাকু ব্যবহার করেন এবং শুনিয়াছিলেন যে জুতাও নাকি পায়ে দিয়া থাকেন এবং এমত জনরব কানে পঁহুছায় যে ব্রাহ্মণ, বৈদ্য ও কায়স্থের বিধবারা দুই সন্ধ্যা অন্ন আহার করেন। বরিশালের বিধবারা কিন্তু 'একাদশী দিবসে ফলমূল ও ঘরে কোটা চিঁড়া ও খই খাইয়া থাকেন এবং যাঁহারা এরূপ করেন তাঁহারা অতিমান্যা ও পুণ্যশীলা খোঁয়াড়ী বলিয়া সুখ্যাতি ঘোষণা হয়।' বিভিন্ন স্থানের বিবাহ, স্ত্রীআচারের বর্ণনা হইতে আরো নানা জিনিসের মধ্যে আমরা জানিতে পারি বরিশালে বরকে বিবাহ করিতে কন্যার বাড়ীতে যাইতে হইত না, এবং পূর্ববঙ্গের স্থানে স্থানে উচ্চ ও নীচ হিন্দুজাতির মধ্যে বিবাহের চল ছিল। পাবনায় শুঁড়ি জাতির প্রাধান্যহেতু এমনকি ব্রাহ্মণ ও বৈদ্যদের নামের সহিত শুঁড়িদিগের পদবি মানাসূচকভাবে উল্লেখ করা হইত যেমন মুখুজ্জে সা জি মোশয়, গুপ্ত সা জি মোশয় ইত্যাদি। বরিশালের মুসলমানেরা নবান্ন করিত, চট্টগ্রামের পার্বত্য-জাতিরা বন্দুকের বারুদে শবদাহ করিত এবং ফিরিঙ্গিরা গির্জায় উপাসনা, পীরের দর্গায় সিন্নি এবং কালী মন্দিরে বলি প্রদান করিত। বরিশালের লোকজনের সম্বন্ধে গুপ্তকবি লিখিয়াছেন 'ইহাদের স্বভাব অতি উগ্র, অত্যন্ত ক্রোধান্বিত...বিনয় করিলে আরো বিপরীত ঘটিয়া উঠে, কিন্তু বলপ্রকাশ করিলে সহজেই আজ্ঞাধীন হয়...কিঞ্চিন্মাত্র তালুক করিতে পারিলেই সকলে চৌধুরী হইয়া বসেন...বৃষ্টি হউক না হউক, রৌদ্র হউক না হউক, সকলেই ছাতাধারি সঙ্গে লইয়া যাইবেন...মান তাঁহাদের ভালুক জ্বরের ন্যায়, এক কথায় হয়, এক কথায় যায়।' নোয়াখালির লোকেরা কিন্তু 'ভদ্রাভদ্র তাবতে বিনয়ী ও নম্র এবং সে স্থানে প্রতারক ও প্রবঞ্চকের সংখ্যা কম এবং মামলা অল্প।' চট্টগ্রামের ন্যায় মামলাপ্রিয় জাতি লেখক কোথাও দেখেন নাই। তিনি লিখিয়াছেন : 'একজনের কুক্কুট আর একজনের ধান্য খাইলে অথবা একজনের গাভী আর একজনের বেড়া ভঙ্গ করিলে সেই হানিগ্রস্ত ব্যক্তি ম্যাজিস্ট্রেটিতে না গিয়া ৵০ আনা ।০ আনার দাবীতে মুন্সেফের নিকট আর্দাস করে। রহস্যের কথা কত লিখিব, এদেশের কুমারজাতির মধ্যে যদি কেহ সভামধ্যে আপনার নমস্য ব্যক্তিকে নমস্কার না করে তবে ঐ নমস্য ব্যক্তি নমস্কার অপ্রাপণের জন্য স্বচ্ছন্দে নালিশ করে।'

বিভিন্ন জেলার প্রাকৃতিক ও অন্যান্য বিবরণীর মধ্যেও ঈশ্বর গুপ্তের অনুসন্ধিৎসু সাংবাদিক মনের পরিচয় ছত্রে ছত্রে পাওয়া যায়। যেমন চট্টগ্রামের নদ-নদীর জল মিষ্ট, নোয়াখালির পুষ্করিণীর জল উত্তম এবং তথাকার মৃত্তিকা দেখিলে উর্বর বলিয়া প্রতীতি জন্মে। পাবনার কবিবর দেখিয়াছিলেন হাট-বাজারের ভারী জাঁক এবং সেখানে কলিকাতার 'বিবি সাহেবেরা যে পালকের পোশাক পরেন, যে পক্ষির পক্ষ মস্তকে ধারণ করেন, সেই পক্ষির পক্ষের ব্যবসায় এখানে বিস্তর হয়।' ফরিদপুরে যত খর্জুর বৃক্ষ তাঁহার নজরে পড়িয়াছিল সেরূপ তিনি কুত্রাপি দেখেন নাই এবং সেখানকার 'এক আনার মাছ কলিকাতার এক টাকার হইবে।' সৈয়দপুরে দেখিয়াছিলেন কলিকাতার হৌসওয়ালার কর্মচারীরা গুড়

সংগ্রহ করিতেছে কিন্তু নোয়াখালির লোকেরা তিনি লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে গুড় তৈরি করিতে জানে না এবং তথায় 'নারিকেলবৃক্ষ স্বল্পায়ু হইলেও বিস্তর অথচ লোকেরা নারিকেল হইতে তৈল ও ছোবড়া হইতে রজ্জু প্রস্তুত করিতে জানে না ইহা কম ক্ষেদের কথা নহে।' বরিশালে আরও দেখিয়াছিলেন গোলআলুর চাষ নাই, ফরিদপুরে পটোল হয় না এবং 'আম্র ভাল জন্মে না ও পোকায় পরিপূরিত।' চট্টগ্রামে লেখক অন্ততঃ আঠারো রকমের পক্ষী, ও তাহা ছাড়া নানা জাতীয় হাঁস দেখিতে পান কিন্তু লক্ষ্য করেন 'কাক বিস্তর কিন্তু দাঁড়কাক অত্যল্প।' বরিশালের পশ্বাদি বর্ণনাকালে তিনি মজার কথা বলিয়াছেন। সেখানে তাঁহার মতে শাদা ষাঁড় বা গরু দেখা যাইত না এবং ছাগ অধিকাংশই 'এক মুষ্ক বিশিষ্ট'। পরিশেষে বলা দরকার যে গুপ্তকবি কুমিল্লার একটি ছাত্রের কবিতা পাঠে মুগ্ধ হন, রাজসাহীর দুই কেরাণী বাবুর অনূদিত চাহার-দরবেশ শুনিয়া আহ্লাদিত হন কিন্তু তাঁহার কবিমন বরিশালের কর্তাব্যক্তিদের কবিগানের মধ্যে 'য়্যাকটা মালসী মালসী গাওহে' বেতালা ফরমাইশ শুনিয়া পীড়িত হয়। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের শিল্পকার্য, ভাষা ও উচ্চারণ সম্বন্ধে তিনি কয়েকটি মূল্যবান মন্তব্য করিয়াছেন।

অন্যায়ের প্রতিকার ও জনসাধারণের মঙ্গল প্রচেষ্টা—সাংবাদিকের এই দুইটি দায়িত্ব সম্বন্ধে ঈশ্বর গুপ্ত কিরূপ অবহিত ছিলেন তাহা গ্রন্থটি পড়িলে বুঝা যায়। তিনি কুটিয়ালদের অত্যাচারের কথা বারম্বার উল্লেখ করিয়া প্রতিকার চাহিয়াছেন, দায়িত্বশীল দেশীয় কর্মচারীদের উপযুক্ত বেতনের প্রয়োজনীয়তার কথা যুক্তিসহকারে বুঝাইয়াছেন। বোয়ালীয়ার দাতব্য চিকিৎসালয়ের গোদাগাকে সরাইয়া উপযুক্ত চিকিৎসক নিয়োগ ও কুমিল্লার স্কুলের লাইব্রেরীর শ্রীবৃদ্ধির জন্য কর্তৃপক্ষকে আর্জি করিয়াছেন। গৌড়ের রাজধানীর পুরাকীর্তি রক্ষার জন্য পাহারাদার নিয়োগ করায় সরকারকে সাধুবাদ দিয়াছেন এবং বলিয়াছেন 'আর কিছুদিন পূর্বে এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিলে আরো কত সুখের বিষয় হইত'। পূর্ববঙ্গের তৎকালীন খালবিল, নদ-নদীর চেহারা দেখিয়া তিনি শুধু ভীত হন নাই, সমস্যাগুলির প্রতিকারের পন্থাও নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন ত্রিপুরা জেলায় খাল কাটাইয়া বর্ষার রুদ্র নদ-নদীর প্লাবন হইতে রক্ষার জন্য সরকারকে পরামর্শ দিয়াছেন। সেইরূপ নোয়াখালী জেলা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন 'রামপুরে ডাকাতে নদীর যে খাল আছে তাহা প্রবল করিয়া দিলে, ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, বরিশাল ও শ্রীহট্ট প্রভৃতির বণিকেরা মেঘনা দিয়া হাতিয়া স্পর্শপূর্বক ডাকাতের ভিতর পড়িয়া ঐ খাল দিয়া এবং কুমিল্লার লোকেরা ডাকাতে দিয়া উক্ত খালে স্বচ্ছন্দেই এখানে আসিতে পারে। এতদ্ভিন্ন আরো উপায় আছে, গবর্নমেন্ট তাহার নক্সা চাহিলেই অনায়াসে অর্পণ করিতে পারি। পরন্তু ফেণী নদীরযোগে চট্টগ্রামাভি-মুখে খাল কাটিলে কত যে কল্যাণ হয় বলিতে পারি না, দেশ জাত সকল প্রকার দ্রব্য সুলভ হইয়া উঠে।' ঈশ্বর গুপ্ত আরো বলেন যে এই সকল খালে কুৎ বসাইলে সরকার অবিলম্বে খরচা উঠাইয়া লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করিতে পারিবেন।

কথায় কথায় আমাদের বক্তব্য অত্যন্ত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহার বিষয় বৈচিত্র্য ও সরস লিখনভঙ্গীর একটা অস্পষ্ট আভাষ মাত্র দেওয়া সম্ভব হইল।

ভ্রমণকাহিনী ও সমাজচিত্র হিসাবে "ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র" সকল পাঠক উপভোগ করিবেন। আমরা এই পুস্তকটির প্রতি বিশেষ করিয়া সাংবাদিকগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। বর্তমানে সত্যাসত্য বিচার করিবার সময় নাই, বক্তব্যের ভাবের ঘরে চুরি, সেই-জন্য বাক্যের ছটা ও বলিবার প্যাঁচের উপর বেশি ঝোঁক ও দলীয় মতবাদের গাজুয়ারী

ওকালতির বড় ধুম। যে সততা ও বস্তুনিষ্ঠা, যে স্বদেশ প্রেম, মানবপ্রীতি ও যে অকুত উদ্যম ও সর্বোপরি যে অনুসন্ধিৎসা ও গাণিতিক মন লইয়া ঈশ্বর গুপ্ত সাংবাদিকের কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন তাহা অনুধাবন করিলে আজিকালিকার সাংবাদিকগণ হয়ত উপকৃত হইতে পারেন। পুস্তকটিতে সম্পাদক একটি সূচীপত্র ও উপযুক্ত মানচিত্র দিলে পাঠকদের পড়িতে ও বুঝিতে সুবিধা হইত।

পরিশেষে আমরা আবার বঙ্কিমচন্দ্রকে স্মরণ করিয়া আমাদের বক্তব্য শেষ করিতে চাই। বহুদিন আগে তিনি বড় দুঃখে বলেন 'মহাজন মরিয়া গেলে খাতক আর তা'র বড় নাম করে না। ঈশ্বর গুপ্ত গিয়াছেন, আমরা আর সে ঋণের কথা বড় একটা মুখে আনি না'। সুখের বিষয় গত কয়েক বৎসর 'মহাজন' ঈশ্বর গুপ্তের নিকট আমাদের ঋণের কথা কতিপয় সজ্জন আমাদের স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন। কিছুদিন পূর্বে শ্রীভবতোষ দত্ত ঈশ্বর গুপ্তের কবি-জীবনী সম্পাদনা করিয়া পুনর্মুদ্রণ করিয়াছেন এবং শ্রীকমলকুমার মজুমদার তাঁহার করা কাঠ-খোদাই সম্বলিত কবিবরের কয়েকটি কবিতার ভারী সুন্দর বই ছোটদের জন্য ছাপাইয়াছেন। গত বৎসর শ্রীবিনয় ঘোষ এবং বর্তমানে শ্রীমোহনলাল মিত্র সংবাদ প্রভাকরের সহিত নব্যবঙ্গের পরিচয় করাইয়া 'বাঙ্গালীর অন্তরঙ্গ স্বজন' ঈশ্বর গুপ্তর প্রতি ভক্তি ও কর্তব্য এবং দেশের বড়ই মঙ্গল করিলেন।

রাধাপ্রসাদ গুপ্ত

বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপা অ্যান্ড কোঃ। কলিকাতা ১২। মূল্য বারো টাকা।

রূপতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনার স্বল্পতা বাংলাভাষার একটি বিশিষ্ট সম্পদের দৈন্যতারই সূচনা করে। ১৩৫৯ সালে যামিনীকান্ত সেনের "আর্ট ও আহিতাগ্নি" সম্পাদনা প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করেছিলাম যে 'শিল্পকলা সম্বন্ধে আমরা যতটা সচেতন শিল্পতত্ত্বের আলোচনা সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা ততটা অগ্রসর নয়।' একথা তখন যতটা সত্য ছিল আজও ঠিক ততটাই রয়েছে—শিল্পতত্ত্বের নৈষ্ঠিক আলোচনা প্রায় কিছুই অগ্রসর হয় নাই। এই পরিবেশে শিল্পগুরুর রূপতত্ত্ব সম্পর্কিত প্রবন্ধ সংকলনের পুনঃপ্রকাশ তার যথাযোগ্য অভিনন্দনের দাবী করতে পারে। অবনীন্দ্রনাথের শিল্পপ্রতিভাকে বংশানুক্রমিক সাধনার উন্মেষিত ফল বলে অভিহিত করা যেতে পারে। অবনীন্দ্রনাথের পিতামহ গিরীন্দ্রনাথের চিত্রশিল্পী বলে খ্যাতি ছিল এবং পিতা গুণেন্দ্রনাথ ছিলেন কলিকাতা শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রথম দিকের কৃতিছাত্রদের অন্যতম। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে ১৮৭১ খৃস্টাব্দের ৭ই আগস্ট অবনীন্দ্রনাথের জন্ম হয় এবং বাল্যকাল থেকেই তাঁর মধ্যে চিত্রাঙ্কণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। প্রথাগতভাবে আর্ট স্কুলে তিনি ছবি আঁকা শেখেন নাই; গোড়ার দিকে কয়েকজন ইংরাজ চিত্রকরের নিকট তাঁর ছবি আঁকার অনুশীলন হয়। একসময়ে অবনীন্দ্রনাথ দক্ষ পোট্রেট শিল্পীরূপে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। ই. বি. হ্যাভেলের সান্নিধ্যে আসায় অবনীন্দ্রনাথের শিল্পদৃষ্টির পরিবর্তন ঘটে; এতদিন গৃহস্থিত রত্নরাজি ছেড়ে পরধন লোভে মত্ত ছিলেন এই উপলব্ধি থেকে তিনি দেশজাত শিল্পসম্পদের সন্ধানে ব্রতী হন।

এই নব উপলব্ধি তাঁকে কেবলমাত্র শিল্পরচনায় নূতন কৌশল এবং নূতন আঙ্গিকের অন্বেষণেই উদ্বুদ্ধ করে নাই রূপতত্ত্বের নিগূঢ় পর্যায়েও সন্ধানী করে তোলে। ভাষার শিল্পেও অবনীন্দ্রনাথ কম কুশলী ছিলেন না; বস্তুত ভাষার রূপরাজ্যে তাঁর প্রবেশ ছিল সম্মোহন শক্তিসম্পন্ন যাদুকরের মত। ফলে তাঁর রূপতত্ত্বের মনন অপূর্বভাষার বিন্যাসে পরম হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছিল।

সৌন্দর্যতত্ত্ব সম্বন্ধে মানুষের চিন্তার বিকাশ বহু পুরোনো কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্ত্যে প্লেটো, অ্যারিস্টটল থেকে বার্গসঁ ক্রোচে ইত্যাদি বহু মনীষীই সৌন্দর্যের স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস করেছেন। ভারতে ঋগ্বেদের কোন কোন মন্ত্রে সৌন্দর্যানুভূতির সচেতন অভিব্যক্তি রয়েছে। বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ, বরাহমিহিরের বৃহৎসংহিতা এবং প্রতিমা-লক্ষণ ইত্যাদি নানা শাস্ত্রগ্রন্থে দৃষ্টিগ্রাহ্য জগতের রূপানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যের রসের তত্ত্ব নিয়ে উচ্চপর্যায়ের আলোচনা করে গিয়েছেন অনুমানিক নবম শতাব্দীর পণ্ডিত আনন্দবর্ধন। এই রূপ ও রসের অভিনব ব্যাখ্যান নিয়ে যেদিন অবনীন্দ্রনাথ আচার্যের আসনে বসে পাঠ দিতে শুরু করেছিলেন বাংলাভাষাভাষীদের পক্ষে সে দিনটি ছিল স্মরণীয়। কারণ রূপতত্ত্বের অমন অপরূপ লালিত্যপূর্ণ ও প্রাঞ্জল ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে কেউ শোনায়নি। রূপদৃষ্টি বাঙ্গালীর সহজাতসম্পদ—বাংলার সমভূমি, যেখানে নদীজলধারা ও বৃক্ষলতাদির প্রাচুর্য, সেখানকার মানুষ স্বভাবতই রসে দ্রব ও সৌন্দর্যে অভিভূত না হয়ে পারে না। বিগত কয়েকশত বৎসর মঙ্গল কাব্যের প্রবাহে আর বৈষ্ণবগীতাবলীর লয়ে বাঙ্গালী রসিকোত্তম হয়ে তার বহু সত্ত্বাকেই বিসর্জন দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে তাই সে প্রবহমান রূপরসকে বিশ্লেষণ করবার প্রেরণাও বহুকাল উপলব্ধি করে নাই। অবনীন্দ্রনাথ আলোচনার পথে এই সৌন্দর্য রূপকে জিজ্ঞাসুর সামনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেছেন। বিচারহীন সৌন্দর্যাভিলাষ রূপরসের মানকে প্রতিষ্ঠা বিচ্যুত করে; উপযুক্ত অনুশীলনের অভাব নিয়ে আসে অজ্ঞানতা। তত্ত্ববিচারহীন পৃষ্ঠ-পোষকের প্রেরণায় শিল্প ক্রমে বিচ্যুতির পথে অবনমিত হয়। বাংলার সংস্কৃতির এক সংকট মুহূর্তে অবনীন্দ্রনাথ শিল্পানুশীলনে এই যুক্তিমার্গের অবতারণা করে শিল্পকে পথভ্রষ্টতা থেকে রক্ষা করবার ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছেন। নিতান্ত অবচেতন প্রেরণা থেকে দেশে ধারা-বাহিক যে শিল্পানুসরণ চলছিল পাশ্চাত্ত্যের প্রবল সংঘাতে তার সমূহ বিলুপ্তির সম্ভাবনাই নিশ্চিন্ত হয়ে উঠেছিল। শিল্পগুরুর প্রজ্ঞা শুধু শিল্পকর্মের মাধ্যমেই নয় শিল্পধর্মের ব্যাখ্যানেও সেই সম্ভাবনাকে অবরোধ করেছিল। "বাগেশ্বরী শিল্প প্রবন্ধাবলী" তাই একাধারে যাঁরা শিল্পানুশীলনে ব্রতী হবেন তাঁদের এবং যাঁরা শিল্প থেকে সৌন্দর্য আহরণে পুষ্ট হওয়ার প্রয়াস করবেন তাঁদের সমান অধীতব্য শাস্ত্রীয় গ্রন্থরূপে পরিগণিত হওয়া উচিত।

আটাশটি সুনির্বাচিত অধ্যায়ে শিল্প সম্পর্কে আচার্য অবনীন্দ্রনাথ যে সকল প্রসঙ্গের অবতারণা করেছেন রূপতত্ত্বের অনুসন্ধানীর নিকট তার প্রত্যেকটাই সারবান বলে বিবেচিত হবে। দুর্ভাগ্যক্রমে বক্তৃতাবলীর পাঠক্রম গ্রন্থে নির্দেশ করে না দেওয়ায় বিষয়বস্তুর বিকাশের যথাযথ পর্যায় অনুধাবন করা যায় না। অধুনা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্প বিষয়ে যে পাঠক্রম অনুসৃত হয়ে থাকে আচার্য অবনীন্দ্রনাথকে সে পাঠক্রম অনুসরণ করতে হয় নাই। তাঁর বক্তৃতাবলীর শ্রোতা বা কারা ছিল সে সম্পর্কেও আমি সঠিক সন্ধান পাই নাই। মনে হয় সাধারণ শ্রোতাদের উদ্দেশ করেই এই পাঠগুলি দেওয়া হয়েছিল। তাই শিল্পে অধিকার

(পৃঃ ১৩) ও অনধিকারের (পৃঃ ১) প্রশ্ন তুলেই হয়ত তিনি বক্তৃতাবলী শুরু করেছিলেন। 'দৃষ্টি ও সৃষ্টি' (পৃঃ ২৩) নামক অধ্যায়ে শিল্পীর হাতে সৃষ্টির অনুপ্রেরণার মূলে তার অভিদর্শন সম্পর্কে যে আলোচনা তাতে খুবই প্রগতিশীলতার পরিচয় পাওয়া যায়। দৃশ্যমান রূপের হুবহু অনুশীলনেই যে শিল্পীর সার্থকতা একথা সত্যিকারের কোন শিল্পীই স্বীকার না করে থাকলেও শিল্পীর স্বাধীনতা কতটুকু তা নিয়ে কখনও বিতর্কের শেষ হয় নাই। আচার্যের মতে 'ভাবুকের কবির শিল্পীর সেই দৃষ্টি দিব্যদৃষ্টি যা অন্ধকারে আলো দেখলে, দুঃখের পরশেও আনন্দ পেলো, অসীম স্তব্ধতার ভিতরে সন্ধান পেয়ে গেলো সুরের"। (পৃঃ ৪২)। একবার এই দৃষ্টি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে সকল ইজম্ থেকে বিমুক্ত শিল্প আপনার মাহাত্ম্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই। এর পর 'শিল্প ও ভাষা' (পৃঃ ৪৫) সম্পর্কিত আলোচনায় ভাষা ও শিল্পের ক্রমবিবর্তনের রূপকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

শেষের দিকের চারটি প্রবন্ধে সুচিন্তিত ভাবে তিনি বাৎসায়নের কামসূত্রের জয়মঙ্গলা টিকার

রূপভেদ প্রমাণানি ভাবলাবণ্য যোজনম
সাদৃশ্য বর্ণিকাভঙ্গম্ ইতিচিত্র ষড়ঙ্গকম্

এই বিখ্যাত প্রকরণটির বিষদ ব্যাখ্যা করেছেন। এই ব্যাখ্যা অবনীন্দ্রনাথের ইংরাজী *Six Limbs of Indian Painting* গ্রন্থেরও প্রতিপাদ্য বিষয়। কুমারস্বামী ঐ শ্লোকটির অবনীন্দ্রনাথ কৃত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিতে না পেরে থাকলেও অবনীন্দ্রনাথের ব্যাখ্যায় যে যথেষ্ট পরিমাণে যুক্তি এবং তত্ত্বের বিন্যাস রয়েছে একথা অস্বীকার করা যায় না। তাঁর যুক্তি বিস্তারের পদ্ধতিটিও খুবই আগ্রহ সঞ্চারক এবং ভাব এবং লাবণ্য সম্পর্কেও তাঁর মত ভারতীয় মননের সঙ্গে যথেষ্ট সাদৃশ্যযুক্ত বলে বিবেচিত হবে এবিষয়ে সন্দেহ নাই। বস্তুত ভারতীয় চিত্রশিল্পের এই গভীর অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত অবনীন্দ্রনাথের পূর্বে আর কোন মনীষী শিল্পরসিকদের মহলে অনুরূপ আগ্রহ ও ভাবগাম্ভীর্য নিয়ে করেন নাই। সুন্দর (১৭০) অসুন্দর (১৭৮) সৌন্দর্যের সন্ধান (৭০) শিল্প ও দেহতত্ত্ব (৮৬) অরূপ না রূপ (২০২) ইত্যাদি প্রবন্ধ নিছক æthetics বা রূপতত্ত্বের আলোচনায় সমৃদ্ধ। রূপতত্ত্বের এই ধরনের অবতারণা বাংলাসাহিত্যে একরকম হয় নাই বলেই ধরে নেওয়া যেতে পারে। আশ্চর্যের বিষয় ১৯২১ খৃস্টাব্দে যখন অবনীন্দ্রনাথ এই বক্তৃতাগুলি দিতে আরম্ভ করেন ঐ বৎসরই (১৩২৮ সালে) যামিনীকান্ত সেনের "আর্ট ও আহিতাগ্নি" প্রথম প্রকাশিত হয়। নির্ভেজাল রূপতত্ত্বের আলোচনায় যামিনীকান্ত সেন যে বিশাল পটভূমির উপর আপনার মনকে সঞ্চালিত করেছিলেন তার গন্ডী দেশকে অতিক্রম করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেছিল। যামিনীকান্ত সেন নিজে শিল্পী ছিলেন না তাই তাঁর অনুভূতি স্বভাবতই ছিল কেতাবী। জাতশিল্পী অবনীন্দ্রনাথ রূপতত্ত্বকে আপন অনুভূতির রঙে ও রসে নিসিক্ত করে যেভাবে উপস্থিত করেছিলেন অতি সহজেই তা কেবলমাত্র হৃদয়গ্রাহীই হয় নাই চিত্তের সঙ্গে তার যোগ হয়েছে অতি নিবিড়। যারা শিল্পের রসগ্রহণ করতে চায় তাদের পক্ষে রূপবিদ্যা (পৃঃ ২১৮) ও রূপদেখা (পৃঃ ২৩২) এই দুটি প্রবন্ধ সবিশেষ মূল্যবান বলে প্রতীয়মান হয়। রূপবিদ্যায় তিনি রূপের মান নির্ণয়ে উপযুক্ত তৌলের সন্ধান করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, রূপবিদ্যার দ্বারাই রূপের যথার্থ পরিমাপ হওয়া সম্ভব আর কোন বিদ্যা রূপের তল পর্যন্ত পৌঁছে দিতে

পারে না।' (পৃঃ ২২৮)। এই রূপবিদ্যা রূপের মাপ ও পরিমাণ নিয়ে তত্ত্বমূলক আলোচনায় আচার্য অবনীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধাবলী প্রকৃত পথপ্রদর্শকের কাজ করবে।

রূপতত্ত্ব এই প্রবন্ধাবলীর অন্তরঙ্গ পরিচয় হলেও বহিরঙ্গেও এদের বৈশিষ্ট্যের অভাব নাই। সাধারণত অবনীন্দ্রনাথের রচনা রূপকথাধর্মী; এই প্রবন্ধাবলীতেও তিনি কথক; কিন্তু এই কথক এবং রূপকথার গল্পবলিয়ের ভঙ্গীতে যথেষ্ট বিভিন্নতা দেখা যায়। রূপকথার গল্প তার কল্পনার ভাবরসে আপনি সমুজ্জ্বল; অবনীন্দ্রনাথের ভাষা সেই কল্পনাকে দু'একটি তুলির টানের মত রহস্যময়তার আভাস দিয়ে আরও সমুজ্জ্বল করে তোলে। রূপতত্ত্বের ব্যাখ্যা রূপকথার বিপরীত ধর্মী। এখানে তত্ত্বের রহস্যকে সহজ ও সুবোধ্য করে শ্রোতার কাছে উপস্থিত করতে হয়। এমনিতেই রূপতত্ত্ব সমস্যাসমাকুল। আপাতদৃষ্টিতে দেখাবস্তুর মধ্যে না-দেখা যে বৈশিষ্ট্য আছে রূপতত্ত্বের ব্যাখ্যাতাকে সেই না-দেখা বস্তুটি স্পষ্ট করে ধরতে হয়। এখানে কল্পনাভিত্তিক ভাবাবেশের স্থান নাই। যাঁর সাহিত্যচর্চায় কল্পনার ভাবরসই ছিল প্রধান আঙ্গিক, যিনি চিত্রাঙ্কনেও প্রধানত রোমাণ্টিক ধর্মী তাঁর পক্ষে শিল্পতত্ত্বের ব্যাখ্যায় আচার্যের পদে ব্রতী হওয়ায় অনেক বিপদ ছিল। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের মনীষা এই বিপদে বাধাগ্রস্ত হয় নাই; অতি সহজ অকৃত্রিমতার সঙ্গে তিনি রূপবস্তুর গভীরতাকে শ্রোতার নিকট উপস্থিত করেছিলেন। তাঁর বাচনভঙ্গী ও শাস্ত্রব্যাখ্যার আবেগময় সুরটি প্রবন্ধাবলীর ছত্রে ছত্রে বিধৃত হয়ে আছে। এই বৈশিষ্ট্য তার রচনার বহিরঙ্গকে ধ্বনিমধুর করে রেখেছে। রূপতত্ত্বের ব্যাখ্যা অবনীন্দ্রনাথের হাতে নিরস শাস্ত্রব্যাখ্যায় পরিণত হয় নাই। রূপের বৈশিষ্ট্য প্রতিপাদনে শিল্পী অবনীন্দ্রনাথ বর্ণোজ্জ্বল চিত্রকল্পের মতই সহজ কথার বিন্যাস করেছেন।

কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

Tales from the Masnavi. *Translated By* A. J. Arberry. George Allen & Uuwin Ltd., London. 21*s*

মওলানা জামী জলালুদ্দীন্ রূমীর (১২০৭—১২৭৩) মসনবীকে কুরাণের পারসিক কাব্যবন্ধ বলে বর্ণনা করেছেন।

মসনবী মওলবী ম'অনবী।
হস্‌ৎ কুরাণ দর্ জবান-ই-পহ্‌লবী॥

পৃথিবীর অধ্যাত্ম সাহিত্যের দিক থেকে বিচার করে এই উক্তিকে যথার্থ বলে স্বীকার করতে হয়। প্রায় পঁচিশ হাজার পদ সমন্বিত এই গ্রন্থটি একটি বিশাল কীর্তি। বলা বাহুল্য গ্রন্থটির সর্বত্র সহজে অধিগম্য নয়। পারসিক সাহিত্যে বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণও এই মহৎ গ্রন্থটিকে একটি কঠিন গ্রন্থ বলেই মনে করেন। অতএব গ্রন্থটি সুপণ্ডিত ব্যক্তিগণ অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে গভীর অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করে এসেছেন।

মওলানা রূমী গ্রন্থে যে সব কাহিনীর অবতারণা করেছেন সেগুলি তাঁর সূফী ভাব-ধারাকে সুপরিস্ফুট করবার উদ্দেশ্যে করেছেন। আসলে মওলানার মরমী দার্শনিকতা এবং জীবনসম্বন্ধে নিজস্ব আদর্শবোধ এই গ্রন্থের কাহিনীগুলির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে

রয়েছে। শুধু তাই নয়, ইসলামীয় দর্শন, জীবনবোধ, প্রেম প্রভৃতি বহু বিষয় এই গ্রন্থে সার্থকতার সঙ্গে প্রতিফলিত হয়েছে। অতএব প্রথমেই প্রশ্ন ওঠে মূল দার্শনিক পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে কেবলমাত্র আখ্যায়িকাগুলি নির্বাচিত করে নিলে গ্রন্থের মূল উদ্দেশ্যটি ব্যক্ত হয় কিনা এবং সাধারণ পাঠক সেই পরিচয় পেতে সমর্থ হন কিনা। এই দিক থেকে বিচার করলে অধ্যাপক আরবেরীর গ্রন্থকে সার্থক বলা চলে না কিন্তু তিনি ঠিক এই উদ্দেশ্য নিয়ে অনুবাদে হাত দেন নি। তাঁর গ্রন্থের উদ্দেশ্য মসনবীতে যে কাহিনীগুলি আছে কেবলমাত্র সেগুলি সরসভাবে বলা। মসনবীর আখ্যায়িকাগুলিকে তিনি কাহিনী বলেছেন সেগুলিকে রূপক হিসাবে বোঝাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেন নি। অধ্যাপক নিকলসন এই গুরুদায়িত্বকে স্বীকার করেছিলেন এবং আট খণ্ডে সে দায়িত্ব পালনও করে গেছেন। একথা অধ্যাপক আরবেরী ভূমিকাতেই বলে নিয়েছেন। তিনি কেবলমাত্র আখ্যায়িকাগুলিকে বেছে নিয়েছেন যাতে সাধারণ পাঠক এই অনুবাদের সাহায্যে মওলানা রূমীকে কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝতে সক্ষম হন। এইদিক থেকে দেখলে অধ্যাপক আরবেরীর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলা চলে।

অধ্যাপক আরবেরী ভূমিকায় নিকলসনের উক্তি উদ্ধৃত করে আমাদের বুঝিয়েছেন যে মূল গ্রন্থটি সুসম্বদ্ধ নয়, রচনার পারম্পর্যও তাতে নেই, খোসার বাহুল্য থেকে সার বেছে নেওয়া অনেকক্ষেত্রে দুঃসাধ্য ব্যাপার। কিন্তু তিনি মওলানার বৃহৎ চিন্তাকে কেবলমাত্র নাতিবৃহৎ গল্পে পরিণত করেছেন তাতে অনুবাদের খোসা যতটা থেকে গেছে সার সেই পরিমাণে বর্তমান আছে কি? অধ্যাপক আরবেরী গল্পের সন্ধান করেছেন, গল্প বলতে চেয়েছেন এবং এই কার্যেই সাফল্যলাভ করেছেন। তথাপি এই গল্পগুলি থেকে মওলানা রূমীর বিবিধ অধ্যাত্মচিন্তা এবং সুফীভাবধারার সামান্য পরিচয় পাওয়া সম্ভব হবে। এটি কম লাভ নয় এবং সাধারণ পাঠকের কাছে এই গ্রন্থ যথেষ্ট আদরণীয় হবে এই কারণেই।

সত্যি কথা বলতে কি প্রাচ্য ভাবধারার মূলতত্ত্ব অনেক সময় পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের অন্তরে সুপরিস্ফুট হয় না। যা তাঁদের কাছে বাহুল্য প্রাচ্যবাসীর কাছে তা অপ্রয়োজনীয় নয়। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণ বিপুল পরিশ্রম করেন, বহু তথ্য অনুসন্ধানপূর্বক সমবেত করেন কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিতে সেই গ্রাহ্যগুণ থাকা সম্ভব নয় যা আমাদের প্রাচ্যবাসীর দৃষ্টিতে স্বাভাবিকভাবে রয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে বলতে পারি পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের স্থূল গদ্যবন্ধ থেকে যা পাইনি টোলের পণ্ডিত বা মাদ্রাসার মৌলবীর কাছ থেকে মাত্র স্বল্পকালের ব্যাখ্যায় তা পেয়েছি। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতগণের চিন্তা পাশ্চাত্ত্য জীবনধারায় প্রাচ্যভাব সম্বন্ধে যতখানি বোধ জাগ্রত করতে পারে তার মধ্যেই সীমিত। তাঁরা কেন আমাদের মত ভাবতে পারেন না সে সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। এই কারণেই যাঁরা ফার্সী ভাষায় এবং ইসলামীয় দর্শনে সুপণ্ডিত তাঁদের কাছে মওলানা রূমীর মূলগ্রন্থ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে এই রকম বাছাই করা গল্পের সমাবেশকে অযৌক্তিক বলে মনে হবে কেননা এই রকম অনুবাদ থেকে রূমীর মূল চিন্তার পরিচয় সামান্যই পাওয়া যায়।

অধ্যাপক আরবেরী যে ক্ষুদ্র ভূমিকাটি যুক্ত করেছেন সেটি সারবান। মওলানা রূমীর ওপর কাদের প্রভাব বিশেষভাবে পড়েছিল সে বিষয়ে তিনি সুন্দর আলোকপাত করেছেন। বিশেষ করে ফরীদুদ্দীন 'অত্তার এবং রূমী সম্বন্ধীয় আলোচনাটি প্রয়োজনীয়। রূমীকে জানতে গেলে 'অত্তারকেও জানতে হয়। বাংলায় সাদী, হাফিজ যতটা পরিচিত 'অত্তার ততটা নন কিন্তু 'অত্তারের রচনামাধুর্যের তুলনা হয় না। ইনি কেবলমাত্র পারস্যের কবি নন বিশ্বের কবি। অথচ আমরা তাঁর সম্বন্ধে কতটুকুই বা জানি।

মওলানা রূমীর মসনবী সম্বন্ধে মোটামুটি হলেও জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সবই ভূমিকায় বলা হয়েছে। অনুবাদের সবচেয়ে প্রশংসনীয় বস্তু হচ্ছে অধ্যাপক আরবেরীর সুললিত ভাষা। অনুবাদের ব্যাপকতা বা যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন উঠতে পারে কিন্তু যে অনুবাদ তিনি আমাদের কাছে পেশ করেছেন তা বিশেষভাবেই তৃপ্তিদায়ক। এ বিষয়ে অধ্যাপক আরবেরী অতুলনীয়। তাঁর রচনার গুণে ভারি বস্তুও সরসভাবে প্রতিভাত হয়। তাঁর অপরাপর গ্রন্থের ভাষাও রম্যরচনার মত মধুর। এই গ্রন্থেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। অনুবাদ অবশ্য ত্রুটিহীন নয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণ শব্দের ভিন্ন অর্থ করা হয়েছে।

রাজ্যেশ্বর মিত্র

সঙ্গ: নিঃসঙ্গতা রবীন্দ্রনাথ—বুদ্ধদেব বসু। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা ১২। মূল্য পাঁচ টাকা।

অনেক বইয়ের ভিড়ের মধ্যে কোনো কোনো লেখা, মিছিলের একটি উজ্জ্বল মুখের মতো নিজের অনন্যতায় আপনাকে আকৃষ্ট করবেই। তেমনি সকল রুচিমান বাঙালী পাঠককেই স্বীকার করতে হবে যে বুদ্ধদেব বসুর লেখায় এমন একটি নিজস্বতা, এমন একটি গড়ন আছে, যা একবার পড়লেই আপনি সে-সম্পর্কে অবহিত হবেন যে, এ লেখা আর কারো হতে পারে না। স্টাইলের এই বিশিষ্টতায় বুদ্ধদেব আজো অম্লান।

স্টাইলের অনন্যতার সঙ্গে তাঁর প্রবন্ধ রচনার আর একটি গুণ আমাদের মুগ্ধ করে, তাঁর পাদটীকা-বর্জিত, অপরের উদ্‌ধৃতি-রিক্ত, তথ্যের গুরুভারমুক্ত বক্তব্যস্থাপনার রীতি। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধরচনায় আমরা এই রীতির ঐতিহ্য খুঁজে পাই। সেদিক থেকে বুদ্ধদেব রবীন্দ্রনাথেরই অনুগামী। বইখানিতে নানা ধরনের প্রসঙ্গ আছে। ব্যক্তিগত প্রবন্ধ আছে 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা', 'হেমন্ত'। আবার বরিস পাস্টেরনাক ও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের জীবন ও কাব্য সম্পর্কে আলোচনা আছে। তার পাশে রয়েছে 'রাজশেখর বসু' ও 'শিশিরকুমার ভাদুড়ী'। একটি পৃথক অংশে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আটটি ছোট-বড়ো প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে। সব রচনাই গত দশ বছরে লেখা।

ব্যক্তিগত প্রবন্ধ হিসাবে 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা' ও 'হেমন্ত' পাঠককে মুগ্ধ করে। বুদ্ধদেবের কবি-মনের সেই অতিপ্রিয়-স্পর্শ এই রচনায় চমৎকারভাবে সংক্রামিত হয়েছে। ব্যক্তিমনের এই নিভৃত চিন্তা, নিজের মনে-মনে ভাবা বা ঈষৎ অনুচ্চ কণ্ঠে স্বগত কথনের মতো 'সঙ্গ : নিঃসঙ্গতা' লেখাটি পড়তে পড়তে আমি মুগ্ধ হয়েছি। 'হেমন্ত' পড়তে গিয়ে স্বভাবতই রবীন্দ্রনাথের 'শরৎ' প্রবন্ধের কথা মনে হয়েছে। কিন্তু হেমন্তের যেরূপ বুদ্ধদেব তাঁর ইন্দ্রিয় মন দিয়ে অনুভব করেছেন, তার মূর্তি আমাদের চোখের সামনের যবনিকা সরিয়ে সরিয়ে স্পষ্ট করে তুলেছেন :

'এমনি সময় কাছে এলো সে। সামনে এসে দাঁড়ালো—শান্ত, নিঃশব্দ অনুগ্র ; উজ্জ্বল নয়, কিন্তু ম্লানতার আভা ছড়িয়ে দিচ্ছে চারদিকে ; বিষণ্ণ, কিন্তু সেই বিষাদে যেন সুক্ষ্মতম সুখের মতো শিহরণ। ক্ষীণাঙ্গী, নিরাভরণ, একরঙা ধূসর কাপড়ে সংবৃত, মাথাটি নিচু করা, তার চুল তার পিঠের কাপড়ে মিশে গেছে রাত্রির বুকে সূর্যাস্তের মেঘের মতো। আমি

চেয়ে দেখলুম তার মুখের দিকে, স্বপ্নের মতো অস্পষ্ট মুখ তার; চেয়ে দেখলুম তার চোখের দিকে, যে চোখ কাঁদবে না কখনো, শুধু একফোঁটা ছলছলানি নিয়ে স্বচ্ছ, স্থির, গভীর হয়ে তাকিয়ে থাকবে।...'

রবীন্দ্রনাথ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য রচনা দুটি : 'রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প' এবং 'বাংলা কবিতার স্বপ্নভঙ্গ : মানসী'। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ ও গদ্যশিল্প সম্পর্কে এই ধরনের একটি প্রবন্ধের প্রয়োজন ছিল। 'মানসী'সম্পর্কে তিনি ঐ কাব্যের প্রযুক্তিগত যে সূক্ষ্ম ও মনোজ্ঞ আলোচনা করেছেন তার জন্যও ধন্যবাদার্হ হবেন। যে রচনাটি নিয়ে কিছুদিন পূর্বে বাঙালী পাঠক সমাজে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল 'রবীন্দ্রনাথ ও প্রতীচী', আসলে ঐ লেখাটি তাৎপর্যহীন, বেশি গুরুত্ব দেবার মত প্রবন্ধ নয়। আর বুদ্ধদেব 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র সঙ্গে বোদলেয়ার, র‍্যাঁবোর কবিতার মিল না খুঁজলেই ভালো করতেন তবে এইসূত্রে একমাত্র স্বীকার্য যে 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'র পিছনে রয়েছে ফরাসী লেখক গোতিয়ের একটি কবিতার ছায়া। কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় করিয়েছিলেন আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়। তিনি ১২৯৩ সালের "ভারতী" পত্রিকায় 'কাব্যজগৎ' নামে প্রকাশিত প্রবন্ধে গোতিয়ে থেকে একটি কবিতা অনুবাদ করে দেন :

বলরে যুবতী বালা কোথা যাবি তুই?
পাল উড়িতেছে, বায়ু বহিতেছে, চল কোথা যাবি তুই।
সোনার ডিঙ্গায় সোনার হাল, পরীর পাখায় উড়িছে পাল—
হাতির দাঁতের দাঁড়িটি লয়ে,
দেবতার ছেলে যাইবে বেয়ে,
বালা কোথা যাবি তুই।

আর মনে রাখা ভালো 'নিরুদ্দেশ যাত্রা' লেখা হয় ২৭শে অগ্রহায়ণ, ১৩০০ সাল।

বরিস পাস্টেরনাক সম্পর্কে একটি প্রবন্ধ ও ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত একখানি পত্র এই বইয়ে স্থান পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসু একথা অস্বীকার করতে পারেননি যে "ডাঃ জিভাগো" বইখানি 'ঠাণ্ডা লড়াইয়ে'র শিকার হয়েছে। তাঁর মতে অনেক ভালো হত 'যদি বইটির যাত্রা হত মৃদু ও অলক্ষিত, রাজনৈতিকদের দৃষ্টির অন্তরালে'। কিন্তু দুঃখের বিষয় তা হয়নি। বুদ্ধদেব বসু ডঃ অমিয় চক্রবর্তীকে যে চিঠি লিখেছেন তার মধ্যেই দুজনের দৃষ্টিভঙ্গির মৌলিক পার্থক্য দেখা গিয়েছে। বুদ্ধদেব বসু, রুষ বিপ্লবকে যেভাবে দেখেন, ডঃ চক্রবর্তীর কাছে তার সমর্থন মেলেনি। লেনিনের নেতৃত্বে পরিচালিত রুষ বিপ্লবকে (১৯১৭—২১) এবং তার পরবর্তী কালের বলশেভিক রাষ্ট্রচালনা তথা সমাজতান্ত্রিক গঠনকে পাস্টেরনাক "ডাঃ জিভাগো" উপন্যাসে তীব্রভাবে বিরোধিতা করেছেন। এবং সেজন্যই উপন্যাসখানি পৃথিবীব্যাপী সোভিয়েট-বিরোধী প্রচারের হাতিয়াররূপে গৃহীত হয়েছে। এর শিল্পমূল্য কারো চোখে পড়বেনা আজ, কেননা পাস্টেরনাক শিল্প-সৃষ্টির জন্য এ বই লেখেননি। যে-বিপ্লবের উপর ভিত্তি করে সোভিয়েট রাষ্ট্রের উদ্ভব, সেই মূল ভিত্তিকেই আক্রমণ করেছেন পাস্টেরনাক। আর রুষ বিপ্লব ও সোভিয়েটতন্ত্রের নিন্দাবাদের জন্যই যে "ডাঃ জিভাগো" পশ্চিম ইউরোপ তথা আমেরিকায় এত বহুল প্রচারিত হয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। সোভিয়েটের দিক থেকে এই বইকে 'প্রতিবিপ্লবী' আখ্যা দান অস্বাভাবিক নয়।

বুদ্ধদেব বসু এই সূত্রে ফ্লোবেয়র ও রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা উল্লেখ করেছেন। ফ্লোবেয়র

১৮৪৮এর প্যারিস বিদ্রোহকে সমর্থন করেননি। কিন্তু ঐ বিদ্রোহের সঙ্গে রুষ বিপ্লবকে (১৯১৭-২১) তুলনা করা ঐতিহাসিক দৃষ্টির পরিচয়বাহী নয়। আর মনে পড়ল বিস্‌মার্ক পরিচালিত ১৮৭০এর ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজয়কালে ফ্লোবেয়রের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা। মনে পড়ল প্যারী কম্যুনের পতনের পর ফ্লোবেয়র ও গকুঁরের নির্বিকার রূপ নির্মম অত্যাচারের পটভূমিকায়, যার জন্য সার্ত্র তাঁদের ভর্ৎসনা করেছেন। আর মনে পড়ল কলাকৈবল্যবাদের জন্মদাতা বিশুদ্ধ সৌন্দর্যতাত্ত্বিক গোতিয়েকে যিনি ফ্রান্সের জাতীয় দুঃখের দিনে ১৮৭০এ লিখেছিলেন—'to leave Paris in this hour of trouble, uncertainty and fervour when the fate of the nation depends on a throw of dice, is impossible'। কাজেই শ্রীযুক্ত বসু ফ্লোবেয়রের দোহাই দিয়ে ভালো করেননি।

শ্রীযুক্ত বসু লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ "ঘরে বাইরে" উপন্যাসে 'স্বদেশী' আন্দোলনকে এবং "চার অধ্যায়" উপন্যাসে 'সন্ত্রাসবাদী' আন্দোলনকে 'বেদনাময় ভর্ৎসনা' করেছেন সেজন্য কেউ তাঁকে 'দেশদ্রোহী' বলেনি একথা সত্য। আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ একদা যুক্ত ছিলেন। তার অনেক পরে তিনি লেখেন "ঘরে বাইরে"। এই প্রসঙ্গে বলা অন্যায় হবে না যে রবীন্দ্রনাথ সংগত কাজ করেননি। বক্‌সা ক্যাম্প থেকে রাজবন্দীরা রবীন্দ্রনাথকে অভিনন্দন জানিয়েছিল তাঁর জয়ন্তী উপলক্ষে। "চার অধ্যায়" তাঁরাই পড়েছিলেন গভীর ক্ষোভ ও বেদনার সঙ্গে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও জানি হিজলির গুলিবর্ষণের পর রবীন্দ্রনাথ এসে দাঁড়িয়েছিলেন মনুমেণ্টের সভায়, বারংবার ধিক্কার দিয়েছেন ইংরেজ সরকারকে বিনাবিচারে আটক রাখার জন্য, 'অমৃতের পুত্র' বলে তাঁদের অভিনন্দনের জবাব দিয়েছেন, আন্দামানবন্দীদের ফিরিয়ে আনার সমর্থনে তার করেছেন : 'Bengal stands by her brave sons.' সেখানেই রবীন্দ্রনাথ যথার্থ বড়ো।

পাস্তেরনাকের সঙ্গে মিল চেকভ তুর্গেনেভের নয় ডস্টয়েভস্‌কির। ডস্টয়েভস্‌কি জার-সমর্থক ও নিহিলিজম্‌ তথা রুশ বিপ্লবের বিরোধী হয়েছিলেন আর বড়ো করে দেখিয়েছিলেন পাপ তত্ত্বকে আর খ্রীষ্টধর্মকে। পাস্তেরনাকের সঙ্গে এখানেই তাঁর মিল। এজন্যই পাস্তেরনাক তুর্গেনেভ বা টলস্টয়ের সগোত্র নন কোনোদিক থেকেই। হালে শ্রীযুক্ত বসু ডস্টয়েভস্‌কি ও বোদলেয়র উভয়েরই পরম ভক্ত, উভয়ের জন্ম সাল এক জেনে তিনি উল্লাসবোধ করেন। র‍্যাঁবোর "নরকে এক ঋতু" বোদলেয়রের "বিষাক্ত কুসুম" কিংবা ডস্টয়েভস্‌কির "ভূতলবাসীর আত্মকথা" গ্রন্থগুলিকেই আধুনিকতার মুখ্য লক্ষণাক্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। সব গ্রন্থগুলিই আত্মযন্ত্রণার, অসুস্থ মনোবিকারের, বৈবর্ণ্যের অবক্ষয়ের চিহ্নবহ। মার্ক্স ও প্রাজের এই ফতোয়া বেদবাক্য নয়। ফরাসী সাহিত্যে বিশেষজ্ঞ কবি-সমালোচক শ্রীঅরুণ মিত্র বোদলেয়র সম্পর্কে যা লিখেছেন তার প্রতিটি হরফের সঙ্গে আমি ঐকমত্য বোধ করি :

'বাঁচবার জন্য তাঁর প্রয়াসের সেই চিহ্নও ইতস্তত কিছু আছে। আর আছে কয়েকটি কবিতার বিধুর গাম্ভীর্যে এক ক্ষণিক প্রশান্তির স্বর। ঐটুকুই আলো। নইলে তাঁর কাব্যের আবহাওয়ায় হাঁপ ধরে আসে। গহ্বর ও কারাগারের অস্তিত্ব সেখানে সর্বব্যাপী। পাপবোধে, শয়তানের লীলায়, যৌনতাজড়িত বিক্ষেপে, অবসাদে, বিতৃষ্ণায় এবং এক যুক্তিহীন বিকারগ্রস্ততায় জীবনের রূপ সেখানে অভিভূত।...আমরা এক যন্ত্রণা-জর্জর মানুষকে প্রত্যক্ষ করে যন্ত্রণা পাই। নিজের প্রতিরূপে যে মানুষকে তিনি এঁকেছেন, সে সম্ভোগ ও বিতৃষ্ণায় সদাবিক্ষিপ্ত, ঈশ্বরে উন্মুখ হয়েও শয়তানের দ্বারা কবলিত। এরূপ একটা

অবস্থায় সত্য হলেও হতে পারে, কিন্তু বোদল্যার তাকে অনারোগ্য এবং ভবিষ্যৎহীন করে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।...'

বলা বাহুল্য র‍্যাঁবো, বোদলেয়র, ডস্টয়েভস্‌কি সকলেই মানসিক রোগাক্রান্ত হয়ে জীবন শেষ করেছেন।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

রবীন্দ্র-সাগর সংগমে—বিশ্ব মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত। এম. সি. সরকার এ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা ১২। মূল্য দশ টাকা।

গত বৎসর অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মশতবার্ষিকী জয়ন্তীর পটভূমিকায় "রবীন্দ্র-সাগর সংগমে"র সময়োপযোগিতা তো আছেই; তদতিরিক্ত, কিশোর বয়সে, এখন থেকে ৭৫ বৎসর পূর্বে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম যে কবিপরিচিতি বাঙ্গালা দেশের সমালোচকসমাজে প্রাপ্ত হন, তাহা হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহার দেহরক্ষার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত, রবীন্দ্র-কৃতির যে আলোচনা ও বিশ্লেষণ ধারাবাহিকরূপে বঙ্গ-সাহিত্যে প্রকাশিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার এক সম্পূর্ণ সংগ্রহ এই বইয়ে রক্ষিত হইয়াছে, এবং সেই দিক হইতে রবীন্দ্র-প্রসঙ্গে ও বঙ্গ-সাহিত্যে সমালোচনার ইতিহাসে এই বই নিজ স্থায়ী আসন করিয়া লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব ও ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া, তাঁহার জীবৎকালে অর্ধ-শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বাংলা পত্র-পত্রিকায় যেভাবে প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাহার পূর্ণ পরিচয় এই পুস্তকে মিলিবে। সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিশ্ব মুখোপাধ্যায় বহু যত্নে ও পরিশ্রমে, রবীন্দ্রনাথের বিভিন্ন পুস্তক সম্পর্কে এবং সাধারণভাবে তাঁহার সাহিত্যিক অবদান সম্বন্ধে, ষাটজনের অধিক লেখকের স্বাক্ষরযুক্ত রচনার এবং উপরন্তু বঙ্গভাষার কতকগুলি বিশিষ্ট সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্যের সংকলন করিয়া, একটি রত্নপেটিকার মত বইখানি বাঙ্গালা দেশের পাঠকসমাজকে উপহার দিয়াছেন। যে সকল সমালোচনা ও রচনা রবীন্দ্রনাথের গোচরে অবশ্যই আসিয়াছিল, সেগুলি এই বইয়ে সংগৃহীত হইয়া রহিল, এবং রবীন্দ্রনাথের সমকালীন সাহিত্যিকদের রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে বিচার-বিশ্লেষণের প্রমাণপঞ্জী হইয়া এই বইয়ের প্রতিষ্ঠা বহু বৎসর ধরিয়া বিদ্যমান থাকিবে। ইহাতে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার সহিতই সর্বশ্রেণীর আলোচনা রক্ষিত হইয়াছে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরূপ ও বিরোধী অভিমতও বাদ দেওয়া হয় নাই। বহু তথ্যপূর্ণ ও মূল্যবান টীকা-টিপ্পনীর সাহায্যে আলোচ্য নিবন্ধগুলি সম্পাদক সকলের বোধ-গম্য করিবার প্রয়াস করিয়াছেন, এবং এখানে তাঁহার সার্থক গবেষণার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে সরকারী রিপোর্ট ও অন্য পত্র-পত্রিকায় ইংরেজীতে তাঁহার রচনা সম্বন্ধে যে সকল আলোচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সেগুলি পুস্তকাকারে সংগৃহীত করিয়া দিয়াছেন, এবং এই বইকে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের বইয়ের পরিপূরক বলা যাইতে পারে। এই পুস্তকের উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে ইহার চিত্রসম্ভার হেতু।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

দ্বারকানাথ ঠাকুর—কিশোরীচাঁদ মিত্র। দ্বিজেন্দ্রলাল নাথ অনূদিত ও কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত সম্পাদিত। সম্বোধি পাবলিকেশানস প্রাঃ লিঃ। কলিকাতা ১। মূল্য দশ টাকা।

কিশোরীচাঁদ মিত্রের *Memoir of Dwarkanath Tagore* ১৮৭০ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থটি এখন দুষ্প্রাপ্য এবং কিশোরীচাঁদ মিত্র বিস্মৃতপ্রায় লেখকদের দলে। এতদিন পরে এই গ্রন্থের সটীক ও সুসম্পাদিত বাংলা অনুবাদের প্রকাশ আনন্দের বিষয়। ভূমিকায় সম্পাদক লিখেছেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি দ্বারকানাথের একটি জীবনচরিত লিখবেন। তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হয়নি। কিশোরীচাঁদ মিত্র রচিত জীবনচরিত ছাড়া দ্বারকানাথের আর কোন জীবনী প্রকাশিত হয়নি।

দ্বারকানাথ ঠাকুরের জন্ম ১৭৯৪ সালে এবং মৃত্যু ১৮৪৬ সালের ১ আগস্ট, তাঁর বাল্যকালে দেশে ইংরেজী শিক্ষার সূত্রপাত হয়েছিল এবং যখন তাঁর মৃত্যু হয় তখন বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা আরম্ভ হয়েছে। দ্বারকানাথ কিছুকাল পেরবোর্ন সাহেবের স্কুলে পড়েছিলেন। কিশোরীচাঁদ তাঁকে অনতিখ্যাত শিক্ষক বলে বর্ণনা করেছেন। জীবিতকালে তাঁর নাম যথেষ্ট পরিচিত ছিল না। কিন্তু আজ তাঁকে অনতিখ্যাত বলা হয়ত উচিত হবে না। গ্রন্থটিতে দ্বারকানাথের পারিবারিক জীবনের কথা বিশেষ নেই। গ্রন্থকারের সে অভিপ্রায়ও ছিল না। পিতা ও পিতামহের সামান্য পরিচয়ের পর কিশোরীচাঁদ দ্বারকানাথের কর্মজীবনের পরিচয় এই বইটিতে দিতে চেষ্টা করেছেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে, ইয়োরোপ যাত্রার প্রাক্কালে, কলকাতার ইয়োরোপীয় ও ভারতীয়রা দ্বারকানাথের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য টাউনহলে একটি সভার আয়োজন করেন। সেই সভায় একটি প্রস্তাবে দ্বারকানাথ সম্বন্ধে বলা হয়েছিল: 'ইংলণ্ডের ব্রিটিশ প্রজারা ভারতীয় ভদ্রলোক সম্পর্কে এতদিন যে-ধারণা পোষণ করত, তোমাকে দেখে তাদের সে ধারণা পরিবর্তিত হবে ভেবে আমরা আনন্দিত।' (পৃঃ ৮৭) প্রস্তাবের এই অংশ এখনকার পাঠকরা কিভাবে নেবেন বলা কঠিন, কিন্তু এ কথা ঠিক যে দ্বারকানাথের মত চিত্তের বলিষ্ঠতা, এবং দৃষ্টিকে ভাবীকালে প্রসারিত করার ক্ষমতা সব দেশেই দুর্লভ। রামমোহন রায় ও দ্বারকানাথ ঠাকুর প্রথম ভারতীয় যাঁরা ইয়োরোপের কাছে ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয় বহন করে এনেছিলেন।

কিশোরীচাঁদ মিত্র বেলগাছিয়া ভিলার একটি কৌতূহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন, 'এখানেই তাঁর আতিথেয়তা রাজকীয় আড়ম্বরে প্রকাশিত হয়েছিল।' এখনকার পাঠকদের সেই মার্বেল পাথরে বাঁধান ফোয়ারা মতিঝিলের মাঝখানে দ্বীপ ও গ্রীষ্মবাস, শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনে অলঙ্কৃত বৈঠকখানা, মোগলাই পোলাও কাবাব এবং 'রূপে ও গুণে...নৃত্যে মদ্যে আলোকে' ইন্দ্রপুরীর মতো বাগানের কথা স্মরণ করে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ছাড়া উপায় নেই।

গ্রন্থের শেষে পরিশিষ্ট ও প্রসঙ্গকথায় সম্পাদক বহু তথ্যের সমাবেশ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য এই সংগ্রহ মূল্যবান উপাদান বলে স্বীকৃত হবে। অনুবাদ মোটের উপর সুখপাঠ্য। কিন্তু আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা না করাই উচিত ছিল। বাংলায় অনূদিত গ্রন্থগুলির মধ্যে এই বইটি একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত
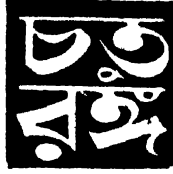
সার্কাসের খেলোয়াড়

শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

সে এক অদ্ভুত মানুষ ওই রাঘবাইয়া।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের ট্রেনার—মণিমঙ্গলম্ রঘু-রাঘবসুন্দরম্ আইয়ার।

এত বড় নাম—উচ্চারণ করা শক্ত। তাই তাকে ছোট করে বলা হয়—রাঘবাইয়া।

বয়স তিরিশ কি বত্রিশ। ইয়া চওড়া বুকের ছাতি। মাথায় বাবরি চুল। টানা-টানা চোখ, আর বোকা-বোকা হাসি।

গায়ের রং কালো। কিন্তু মানুষটি বড় ভাল।

ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজী, হিন্দী, বাংলা, তামিল, তেলেগু—অনেকরকমের ভাষায় কথা বলতে পারে।

সার্কাসে ছিল চারটে বড় বড় বাঘ। রাঘবাইয়া তাদের ট্রেনার।

হিংস্র মাংসাষী বাঘের ট্রেনার রাঘবাইয়া নিজে কিন্তু মাছ-মাংস খায় না। বলে, আমি মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ।

গলায় পৈতে নেই তবু বলে আমি ব্রাহ্মণ।

ভাত খায়, রুটি খায়, নিরামিষ তরি-তরকারি খায় আর খায় ভিজে ছোলা।

পনেরো কুড়িটা ঘোড়া আছে সার্কাসে। তাদের জন্য বালতি বালতি ছোলা ভেজানো থাকে। একটুখানি নুন হাতে নিয়ে সেই ছোলা সে মুঠো মুঠো খেয়ে ফেলে।

কিচেনে ভাত রান্না হয়। প্রকাণ্ড একটা বাটি হাতে নিয়ে রাঘবাইয়া সেইখানে বসে থাকে। গরম ভাতের ফেন নুন দিয়ে সে খুব আরাম করে খায় আর বলে, ভেরি গুড্ ড্রিঙ্ক।

সার্কাসের লোকজন তাকে ক্ষেপায়। বলে,—মাংস খাও রাঘবাইয়া, নয়তো ওই বুড়ো বাঘটা কোন্‌দিন তোমার গায়ের মাংস ছিঁড়ে খাবে।

রাঘবাইয়া হাসে। বলে,—পারবে না।

বলে,—হাতীগুলো তো মাংস খায় না। ওদের গায়ে কি কম জোর?

তা হাতীর মত গায়ের জোর আছে রাঘবাইয়ার। বড় বড় বাঘের খাঁচাগুলো নিজেই

টেনে টেনে তাঁবুর মুখে লাগিয়ে দেয়। শরীরটা যেন তার লোহা দিয়ে তৈরি।

ত্রিপুরা, মণিপুর হয়ে চট্টগ্রাম সেরে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাস তখন বর্মায় গিয়ে ঢুকেছে। আকিয়ারে প্রোগ্রাম শেষ করে তারা তখন রেঙ্গুনে তাঁবু ফেলেছে।

কথা ছিল রেঙ্গুনে খেলা দেখিয়ে তারা থাইল্যাণ্ড হয়ে চলে যাবে সুমাত্রা, জাভা, বোর্ণিও।

যাওয়া কিন্তু হলো না। ব্যাঙ্কক্ যাবার অনুমতি পেলে না তারা।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের বাঙ্গালী মালিক গোরা সরকার চেষ্টার ত্রুটি করলেন না, কিন্তু কিছু করতে পারলেন না।

ফার্ ঈষ্টের ট্রিপ সেবারের মত সেইখানেই খতম্ হয়ে গেল। গোরা সরকার কলকাতায় তাঁর লোক পাঠিয়ে দিলেন। বললেন,—ডিসেম্বরে এবার কলকাতায় গিয়ে বড়দিন করা যাবে। আরও কিছুদিন রেঙ্গুনেই থাকা যাক।

রেঙ্গুনে তখন আর-একটা ছোট সার্কাস পার্টি এসেছে। তাদেরও খেলা দেখানো হচ্ছে সেখানে।

রাঘবাইয়া একদিন গেল তাদের খেলা দেখতে।

ফিরে এসে আর কারও সঙ্গে কথা বলে না! একেবারে চুপ!

কথায় কথায় গুজব রটে গেল, ওদের পার্টিতে একটা মেয়ের খেলা দেখে এসে নাকি রাঘবাইয়ার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

কথাটা কানে গেল গোরা সরকারের।

—কেমন মেয়ে দেখতে হবে। গোরাবাবু বললেন,—আমার জন্যে একখানা টিকিট কিনে আনো।

গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের ম্যানেজার তরণীবাবু নিজে গিয়েছিলেন টিকিট কাটতে। কথায় কথায় জানাজানি হয়ে গেছে। টিকিটের তারা দাম নেয়নি। গোরা সরকারের নামে কম্‌প্লিমেণ্টারী পাশ পাঠিয়ে দিয়েছে একখানা।

ফিলিপাইন থেকে এসেছে তারা। নাম—"ফিলিপিনো সার্কাস"।

গোরাবাবু দেখতে গেলেন।

দেখলেন মেয়েটিকে। হ্যাঁ, মাথা খারাপ করে দেবার মত মেয়ে সত্যিই। সাদা ধপ্ ধপ্ করছে গায়ের রং। বেঁটে খাটো ছোট্ট চেহারা। মাথায় বব্-করে-ছাঁটা একমাথা ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া চুল। মুখে হাসি যেন লেগেই আছে। হাসলে আবার দু'গালে দুটি টোল্ পড়ে।

যেমন স্বাস্থ্য তার তেমনি যৌবন।

খেলাও তার এক আশ্চর্য খেলা।

জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে খেলা নয়। শুধু কয়েকটা ছোট ছোট কাঠের বল আর গোলাকার আগুনের একটা রিং।

খুব উঁচুতে উঠে গিয়ে বড় বড় দুটো কাঠের বলের ওপর পিঁড়ি পেতে সেই পিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে প্রতি মুহূর্তে হেলেদুলে নিজের ব্যালেন্স্ ঠিক রেখে হেসে হেসে কত-রকমের কত খেলা দেখালে মেয়েটা।

একটুখানি অন্যমনস্ক হয়েছে কি—পা হড়্‌কে সেই উঁচু থেকে একেবারে নীচে! তার ওপর মুখের সাম্‌নে সেই গোলাকার আগুনের চক্র। আর সেই চক্রের ভেতর দিয়ে আড়া-আড়ি ভাবে ছাড়া-ছাড়া ছ'টি ছোট ছোট বলের আর-একটি চক্র তৈরি করছে সে—হাত দিয়ে

বলগুলি ছুঁড়ে ছুঁড়ে। বলগুলি হাত দিয়ে ছুঁড়ছে, মুখ দিয়ে ধরছে, মুহূর্তের বিরাম নেই। সে যে কী অপরূপ দৃশ্য মুখে বলে ঠিক বুঝানো যায় না।

খেলা ভাঙলে "ফিলিপিনো সার্কাসে"র মালিক নিজে এসে দেখা করলে গোরা সরকারের সঙ্গে। ভাঙা-ভাঙা ইংরেজিতে বললে,—আমার একটু প্রাইভেট কথা আছে আপনার সঙ্গে। যদি অনুমতি করেন তো বলি।

এই বলে গোরাবাবুকে নিজের তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে তিন চার পেগ্ ভাল বিলিতি মদ খাইয়ে নিজের দুঃখের ইতিহাস বললে সে। বললে,—আজকেই তার "ফিলিপিনো সার্কাসে"র শেষ খেলা। সার্কাস আমি আর রাখতে পারছি না।

—কেন?

লোকটি তখন মদ খেয়ে নেশায় একেবারে বুঁদ হয়ে আছে। বললে,—আমার ওয়াইফ্ টেলিগ্রামের পর টেলিগ্রাম করছে। বলছে সার্কাস চালানো তোমার কম্ম নয়। সব কিছু বেচে দিয়ে তুমি চলে এসো।

গোরাবাবু গিয়েছিলেন সার্কাসের ওই মেয়েটিকে দেখতে। সার্কাস কিনতে নয়।

মেয়েটির খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ভাবছিলেন, বেশি মাইনের লোভ দেখিয়ে কোনোরকমে যদি তাকে নিজের দলে টেনে আনতে পারেন তো খুব ভাল হয়।

গোরাবাবু ওস্তাদ লোক। তবু জিজ্ঞাসা করলেন,—কত টাকা চান আপনি?

—আপনি যদি নেন্ তো আমি তিরিশ হাজার টাকা পেলেই ছেড়ে দিতে পারি।

গোরাবাবু বললেন,—ভেবে দেখি। কাল আমি আপনাকে বলবো।

লোকটি বললে,—কাল তো হবে না। কাল আমার লোকজন সব চলে যাবে। সবাইকে আমি নোটিশ দিয়ে দিয়েছি।

—সরি। বলে কেটে পড়লেন গোরাবাবু।

ভাবছিলেন, মেয়েটাও তো নোটিশ পেয়ে গেছে, তার সঙ্গে একবার দেখা করে গেলে কেমন হয়? কিন্তু উপযাচক হয়ে গেলে মাইনে হয়ত বেশি চেয়ে বসবে—এই ভেবে তিনি চলেই আসছিলেন, হঠাৎ দেখেন—তাঁবুর বাইরে সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে। হাতে তার একটি বড় সুটকেস।

চাকরটা কিছুতেই তাকে মালিকের সঙ্গে দেখা করতে দেবে না! দেখা কিন্তু সে করবেই! এমনি জেদি মেয়ে!

দুজনের খুব চেঁচামেচি চলছে, মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালেন গোরা সরকার। চট্ করে দেখলে গোরা সরকার কোন্ দেশীয় মানুষ সহজে বোঝা শক্ত। লম্বা চওড়া গৌরবর্ণ প্রিয়-দর্শন যুবক। কোনো-কিছুতেই হঠ্বার পাত্র নন।

—Excuse my interruption. What's the matter?

পরিষ্কার ইংরাজিতে মেয়েটি জবাব দিলে,—That's none of your bussiness.

গোরা সরকার একটুখানি হাসলেন শুধু।

বেশি দেরি হলো না কাজ হাঁসিল করতে। কয়েক মিনিটের মধ্যেই দেখা গেল—মেয়েটি আসছে গোরাবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে। দুজনেই এসে ঢুকলো ইণ্ডিয়ান সার্কাসের মালিক গোরা সরকারের তাঁবুর ভেতর।

তারপর রাত্রি এগারোটার ভেতর দুজনের কথাবার্তা, কাগজপত্রে সহিসবুদ, পাকা-

পাকি ব্যবস্থা, সব শেষ। ফিলিপাইনের মেয়ে মার্গারেট লুসি পেনাং চাকরি নিলে বাঙ্গালী বাবু গোরা সরকারের ইণ্ডিয়ান সার্কাসে।

লুসি পেনাং বললে,—তাহ'লে কাল থেকেই কাজ আরম্ভ করি?

গোরাবাবু বললেন,—না। আগে দু'একদিন তুমি আমার সার্কাসের খেলাগুলো দ্যাখো। তারপর আমি তোমার প্রোগ্রাম ঠিক করে দেবো।

মরুক এবার ফিলিপিনো সার্কাসের মালিক সেই পাঁড় মাতালটা তার ভাঙ্গা সার্কাসের আসবাবপত্র আর জন্তু-জানোয়ার নিয়ে! গোরাবাবু পরমানন্দে ঘুমিয়ে পড়লেন কম্বল চাপা দিয়ে।

পরের দিন সকালে আবার আর-এক হাঙ্গামা।

ভোর পাঁচটা। তখনও চারিদিক ফর্সা হয়নি। কেমন যেন কুয়াশা-ঢাকা ঝাপ্সা-ঝাপ্সা অন্ধকার এখানে-ওখানে জমাট বেঁধে রয়েছে। গোরাবাবু ছড়ি হাতে নিয়ে তাঁবুর চারিদিকে দেখে বেড়াচ্ছেন। এইটি তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। ঝাড়ুদারদের কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। চারিদিকে ব্লিচিং পাউডার আর ফিনাইলের গন্ধ।

গেটের কাছে কে যেন একটা লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে মনে হলো। গোরাবাবু এগিয়ে গেলেন। বেঁটে খাটো ফর্সা একটি মানুষ—তার দুই বগলে বাঘের বাচ্চার মত দুটি কাবুলী বিড়াল, সঙ্গে একটি বছর-চারেকের ফুটফুটে ছেলে ছোট্ট একটা কুকুর নিয়ে খেলা করছে।

লোকটার পরনে ফুল প্যাণ্ট, গায়ে হাতকাটা গেঞ্জি, মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। মানুষটিকে চিনতে দেরি হলো না। "ফিলিপিনো সার্কাসে"র আর-একজন খেলোয়াড়।

—গুড্ মর্নিং স্যার!

গোরাবাবু বললেন,—মর্নিং।

লোকটি কি জন্যে এসেছে বুঝতে দেরি হলো না গোরাবাবুর। কাল রাত্রে তারও খেলা তিনি দেখেছেন "ফিলিপিনো সার্কাসে"।

প্রথমেই সে তার মনিবের গুণ বর্ণনা করতে আরম্ভ করলে,—মাতাল ব্যাটা 'সান্ অফ্ এ বীচ্' মদে আর মেয়েমানুষেই টাকা ওড়াবে তো সার্কাস চালাবে কেমন করে?

সকাল বেলা সে-সব কথা শুনতে চাইলেন না গোরাবাবু। জিজ্ঞাসা করলেন,—তুমি কি চাও তাই বল।

লোকটি তবু থামে না!

—ব্যাটাকে আমি খুন করে দিতে পারতাম, কিন্তু করিনি শুধু আমার এই বাচ্চা 'সানি'র মুখ চেয়ে।

তারপর সুরু হলো তার ছেলের কথা।

—ওর মা নেই। ব্যাড্ লাক্। আন্‌ফরচুনেট্ চ্যাপ্। কিন্তু ও একজন খুব বড় খেলোয়াড় হবে তুমি দেখে নিও। এখন আমি ওকে খেতে দেবো কেমন করে, মানুষ করবো কি দিয়ে এই ভাবনায় সারারাত আমি ঘুমোইনি স্যার, ভোরবেলায় আপনার কাছে ছুটে এসেছি। আমার তিন মাসের মাইনে বাকি পড়েছে। চাইতে গেলাম তো বললে, ম্যানিলায় গিয়ে নিয়ো। ব্যাটা—সান্ অফ্ এ বীচ্! ব্যাটা মাতাল—ব্যাটা—

থামিয়ে দিলেন গোরাবাবু। বললেন,—তুমি কত মাইনে নেবে তাই বল। তোমার নাম কি?

লোকটি বললে,—আমার নাম গোমেশ। আমার ছেলের নাম সানি, এই কুকুরটার নাম বেটি।

বলেই সে তার বগল থেকে কাবলী বেড়ালদুটোকে নামিয়ে দিয়ে বললে,—এর নাম টুং, এর নাম লুং। দে আর টুইন্ সিস্টারস্।

গোরাবাবু বললেন,—ঠিক আছে। ওখানে তুমি কত মাইনে পেতে তাই বল।

গোমেশ আবার বলতে লাগলো,—দ্যাট্ ব্লাডি চ্যাপ্—দ্যাট্ ড্রাঙ্কার্ড সোয়াইন্—দি প্রোপ্রাইটার অফ্ ফিলিপিনো সার্কাস হ্যাপেন্স্ টু বি মাই ডিসট্যাণ্ট্ রিলেটিভ and he took advantage of it. রোজ দু'টাকা দিতো আমার এই সানির জন্যে, দু'টাকা আমার জন্যে, আর এক টাকা ফর্ দিজ্ এ্যানিম্যাল্স্। ফাইভ্ রুপিস্ পার্ ডে স্যার।

গোরাবাবু বললেন,—আচ্ছা তাই দেবো। চলে এসো।

গোমেশ বললে,—থ্যাক্ ইউ স্যার, গড্ ব্লেস্ ইউ!

এই বলে সে কুকুর-বেড়াল নিয়ে সপরিবারে ঢুকে পড়লো ইণ্ডিয়ান সার্কাসের গেটের ভেতর। ঢুকেই বললে,—এইবার আমাদের চা-রুটির ব্যবস্থা করে দিন স্যার। তারপর চা-রুটি খেয়ে আমি আমার জিনিসপত্র আনতে যাব, আর ওই মাতালটার মুখে একটি লাথি মেরে দিয়ে আসবো।

কিন্তু এতেও শেষ হলো না। কাগজপত্র সই করবার সময় গোমেশ বললে,—পাঁচটা টাকা রোজ—মানে আমাদের খোরাকি। সানির জন্যে মিল্ক্, বাটার, লোফ্ এণ্ড চিকেন্, আমার জন্যে—

বড্ড বেশি কথা বলে গোমেশ। গোরাবাবু বললেন,—কি বলতে চাও খুলে বল। আমার অনেক কাজ।

গোমেশ এতক্ষণ পরে বললে,—আমার মান্থ্লী মাইনে একটা ঠিক করে দিন। ডেলি ফাইভ্ রুপিস্ হলো গিয়ে আমাদের খাবার খরচ।

গোরাবাবু বললেন,—লিখুন মাসে পঞ্চাশ টাকা। রোজ পাঁচটাকা করে পাবেন খোরাকি। আর মাইনে পঞ্চাশ টাকা। সবসুদ্ধ দু'শো টাকা মান্থ্লী। লিখতে হয় লিখুন, নইলে চলে যান।

গোমেশ বোধহয় বুঝতে পারলে গোরাবাবু রাগ করেছেন। বললে,—নো স্যার নো। ইউ আর এ গ্রেট্ ম্যান। তবে আমি মান্থ্লী হিসেব ঠিক বুঝতে পারি না স্যার, আই এ্যাম্ এ ডাল্-হেডেড্ ম্যান্। রোজ পাঁচ টাকা খোরাকি ফর্ মাই হোল্ ফ্যামিলি আর দু'টাকা সেলারি হলে রোজ কত হয় বলুন, আমি এক্ষুনি সই করে দিচ্ছি। কোন্খানে সই করতে হবে বলুন।

বলেই সে কলমটা তুলে ধরলে।

বিরক্ত হলেন গোরাবাবু। বললেন,—লিখুন দু'শ দশ টাকা পার্ মান্থ্।

—নো স্যার, পার্ ডে বলুন। আমার যা পাওনা আমি রোজ-রোজ নিয়ে নেবো। পার্ মান্থ্ লিখে আমি খুব ঠকে গেছি ওই লোকটার কাছে। তিন মাস আমি মাইনে পাইনি। মাই সানি হ্যাড্ টু স্টার্ভ।

গোরাবাবু বুঝলেন তার দুঃখটা কোথায়। বললেন,—অল্ রাইট্। রোজ সাত টাকা করে পাবেন আপনি। নিন্ সই করুন।

গোমেশ সই করলে টিকিটের ওপর।

গোরাবাবু হুকুম দিয়ে দিলেন,—"ফিলিপিনো সার্কাসে"র আর কাউকে ঢুকতে দেবে না আমার তাঁবুতে।

কিন্তু হাঙ্গামা এতেই চুকলো না।

দুপুরে মার্গারেট হুসি পেনাং এসে দেখা করলে গোরাবাবুর সঙ্গে। বললে,—ওই গোমেশ লোকটাকে আপনি কেন নিলেন?

গোরাবাবু জবাব দিলেন,—That's none of your bussiness.

লুসি পেনাং ঠিক এই কথাই একদিন বলেছিল তাঁকে।

এর ওপর আর কথা চলে না।

লুসি পেনাং তবু বললে,—লোকটা একনম্বরের শয়তান।

গোরাবাবু বললেন,—অনেক শয়তান নিয়ে আমাকে ঘর করতে হয়। নাহয় আর-একটা শয়তান বাড়লো।

লুসি পেনাং এইবার তার শেষ কথাটা বলে দিয়ে চলে গেল,—এর পর আমি যদি আপনার চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে যাই তখন আর আমাকে দোষ দেবেন না যেন।

চিন্তায় পড়লেন গোরাবাবু। গোমেশ লোকটা একটু গোলমেলে লোক, তা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন। তবু তাকে চাকরি দিয়েছেন তার ওই ছেলেটার মুখ চেয়ে। ভারি মিষ্টি মুখ ছেলেটার! বাপের চাকরি না থাকলে হয়ত সে খেতে পাবে না।

গোরাবাবুর এরকম দুর্বলতা আছে বলে তো মনে হয় না। নিজে বিয়ে-থা করেননি। আজন্ম ব্রহ্মচারী স্বাস্থ্যসুন্দর এই মানুষটিকে আপাতদৃষ্টিতে দেখলে মনে হয়—বড় শক্ত ধাতুতে গড়া তাঁর হৃদয়। মনে হয় মানুষের বাচ্চার চেয়ে জন্তু-জানোয়ারের বাচ্চাগুলোই তাঁর বেশি প্রিয়।

ওদিকে কোথাকার কোন্ এক ফিলিপাইন দ্বীপের মেয়ে মার্গারেট লুসি পেনাং তাঁকে ঘায়েল করলে কিনা তাই-বা কে বলতে পারে!

আমি যদি আপনার চাকরি ছেড়ে চলে যাই তখন আর আমাকে দোষ দেবেন না যেন! কথাটা কিছুতেই ভুলতে পারলেন না তিনি। রাত্রে শোবার সময় মাত্র এক পেগ্ হুইস্কি খাওয়া তাঁর প্রতিদিনের অভ্যাস। সেদিন কিন্তু দিনের বেলা কতবার যে তিনি তাঁর তাঁবুতে ঢুকলেন আর বোতল খুলে হুইস্কি খেলেন তার হিসেব-নিকেশ রইলো না।

কাকে তাড়াবেন তিনি? গোমেশকে না লুসি পেনাংকে? ভাবলেন দু'জনের দিকেই নজর রাখতে হবে।

এই নজর রাখতে গিয়েই গোরাবাবু পড়লেন বিপদে।

লুসি পেনাংকে ছোট্ট একটি আলাদা তাঁবু দেওয়া হয়েছিল। তাঁর তাঁবুর কাছেই।

সূর্য তখন উঠি-উঠি করছে। পূব-আকাশটা সবে রাঙা হয়ে এসেছে। ছড়ি হাতে নিয়ে বেড়িয়ে ফিরছেন গোরাবাবু।

ভেবেছিলেন লুসি পেনাং তখনও ঘুমোচ্ছে, তাই সেদিকে না তাকিয়েই তিনি চলে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পেছন থেকে শুনলেন,—গুড্ মর্নিং!

তাকিয়ে দেখেন, লুসি পেনাং তাঁবুর দরজার কাছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাসছে।

গোরাবাবু এগিয়ে গেলেন তার কাছে।

—কোনো কষ্ট হয়নি তো?

পেনাং বললে,—না। কবে থেকে কাজ করব আমি?

গোরাবাবু বললেন,—তোমার নামে হ্যান্ড্‌বিল ছাপতে দিয়েছি, পোস্টার ছাপতে দিয়েছি, সেগুলো আসুক্, তারপর—

পেনাং হঠাৎ হাত বাড়িয়ে গোরাবাবুর হাতখানা ধরে ফেললে। বললে,—এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলে না। ভেতরে আসুন।

গোরাবাবু গেলেন ভেতরে, কিন্তু সার্কাসের একটা মেয়ে তাঁর হাতে ধরে তাঁবুর ভেতরে টেনে নিয়ে এলো—ব্যাপারটা কেমন যেন ভাল লাগলো না তাঁর। আত্মসম্মানে কোথায় যেন আঘাত লাগলো।

পেনাং বললে,—কেন আপনাকে টেনে আনলাম বলুন তো?

—কেন?

—গোমেশ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল।

গোরাবাবু বললেন,—দেখুক্ না। ও তোমার কী ক্ষতি করতে পারে?

—আপনি ওকে চেনেন না তাই এ-কথা বলছেন। ও আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছিল—ওর এত বড় সাহস!

গোরাবাবু বললেন,—হয়ত তোমাকে ওর ভাল লেগেছে।

—ও আমাকে পুষতে পারবে?

গোরাবাবু হাসলেন একটুখানি। বললেন,—তুমি তো ভাল রোজগার কর। তুমিই ওকে পুষবে।

পেনাং বললে,—আমি জানোয়ার পুষি না।

গোরাবাবু উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—চলি।

চলি—বললেন, কিন্তু চলে এলেন না। একখানা ক্যাম্প্ খাট, বিছানা, একটি ড্রেসিং টেবিল আর খানকতক টিনের চেয়ার দিয়ে সাজিয়ে দিয়েছিলেন পেনাংএর থাকবার জায়গাটা। সেইগুলো দেখছিলেন গোরাবাবু। দেখতে দেখতে হঠাৎ বলে বসলেন,—বিয়ে তো তুমি করবে একদিন?

পেনাং তাকালে একবার গোরাবাবুর মুখের দিকে। তাকিয়েই চোখটা নামিয়ে নিয়ে হেসে বললে,—মনের মত মানুষ যদি পাই।

তার হাসিটা আজ যেন আরও সুন্দর বলে মনে হলো। প্রভাতসূর্যের আলো এসে পড়েছে পেনাংএর সোনালী চুলের ওপর। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে ফিলিপাইনের এই মেয়েটিকে। গোরাবাবুর মত শক্ত মানুষও একটুখানি দুর্বল হয়ে পড়লেন। তাঁবু থেকে বেরিয়ে এলেন তাড়াতাড়ি। নিজের তাঁবুতে এসে হাত থেকে ছড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন তাঁর খাটের ওপর। খানসামা ছুটে এলো পা থেকে জুতো খুলে দেবার জন্যে। ভাবলো বুঝি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সাহেব।

গোরাবাবু বললেন,—না জুতো খুলতে হবে না। তুই এক পেগ্ হুইস্কি দে আমাকে।

ডেক্ চেয়ারের ওপর শুয়েছিলেন গোরাবাবু।

সন্ধ্যায় যখন খেলা চলে, গোরাবাবু তখন তাঁর তাঁবুর সামনে এই চেয়ারটির ওপর চুপ করে শুয়ে থাকেন। শুয়ে শুয়ে দর্শকদের হাততালির আওয়াজ শোনেন।

গোমেশ এসে দাঁড়ালো তাঁর কাছে। বললে,—আমার একটা নালিশ আছে স্যার।

—কিসের নালিশ?

গোমেশ বললে,—লুসি আমাকে চাবুক মেরেছে।

—তা আমার কাছে কেন? ম্যানেজারের কাছে যাও।

—ম্যানেজার বললেন আপনার কাছে আসতে।

—তা আমার কাছে কেন?

—লুসি পেনাংকে তার কিছু বলবার উপায় নেই স্যার। বললে আপনি নাকি চটে যাবেন।

কথাটা শুনলেন গোরাবাবু। শুনে বললেন,—আচ্ছা তুমি এখন যাও। আমি এর ব্যবস্থা করবো।

এই বলে গোমেশকে তিনি সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। গোমেশ কিন্তু সরলো না। বললে,—এই নিয়ে তিনবার ও আমাকে মারলে স্যার।

গোরাবাবুর রাগ হয়ে গেল। লোকটা নাছোড়বান্দা। ঘুরে ফিরে কথা সে বলবেই। গোরাবাবু চীৎকার করে উঠলেন,—শুধু শুধুই মারলে? তোমার কোনও দোষ নেই?

গোমেশ বললে,—বিয়ের কথা বললে মেরে বসবে, ফট্ করে চাবুক হাঁক্ড়ে দেবে—এ আবার কোন্ দেশী বিচার বলুন তো?

এতক্ষণে তিনি বুঝলেন ভেতরের রহস্য।

—তুমি ওকে বিয়ে করতে চাও?

গোমেশের মুখখানা যেন আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললে,—হ্যাঁ স্যার। আমার 'সানি' মাদারলেস। ওর একটা মা দরকার। ইট্ ইস্ ওন্লি ফর মাই সানি, নট্ ফর্ মি স্যার।

গোরাবাবু বললেন,—সে যদি তোমার সানির মা হতে না চায়? তারও তো ইচ্ছে-অনিচ্ছের একটা দাম আছে!

কথাটাকে যেন গ্রাহ্যই করলে না গোমেশ। বললে,—কী যে বলেন স্যার! ওদের আবার ইচ্ছে অনিচ্ছে? আই হ্যাভ্ হ্যাণ্ডেল্ড্ সো-মেনি উইমেন স্যার। দে ওয়াণ্ট্ এ স্ট্রং ম্যান্ এণ্ড্ নাথিং এল্স্।

গোরাবাবু তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে উঠে দাঁড়ালেন। বললেন,—তুমি এখন যাও। আমি দেখবো।

গোরাবাবু দেখেছিলেন শেষ পর্যন্ত। জিজ্ঞাসা করেছিলেন লুসি পেনাংকে।

—তুমি চাবুক মেরেছিলে গোমেশকে?

পেনাং হেসেছিল। সলজ্জ সুন্দর তার সেই মিষ্টি হাসি! গালে টোল্ পড়েছিল। হেসে বলেছিল,—মেরেছি। বলেছে বুঝি সে আপনাকে?

—হ্যাঁ বলেছে।

আকাশে সূর্য তখনও ওঠেনি। ঘন কুয়াশায় দূরের জিনিস ভাল দেখা যাচ্ছে না। বাতাসে কেমন যেন মিষ্টি মিষ্টি ফুলের গন্ধ। ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল পেনাংকে।

গোরাবাবু তাঁর ঠাণ্ডা হাতখানা বাড়িয়ে পেনাংএর একখানা হাত চেপে ধরলেন। বললেন,—কই, তুমি তো বলনি আমাকে?

পেনাং বলেছিল,—সবাইকে সব কথা বলতে নেই।

তাঁবু ছাড়িয়ে অনেক দূর চলে এসেছে তারা দু'জনে। আজকাল পেনাংএর যেন অভ্যাস হয়ে গেছে ভোর রাত্রে বিছানা থেকে উঠে হাতমুখ ধুয়ে গোরাবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে যাওয়া।

সার্কাসের লোকজন সবাই দেখছে।

শুধু দেখছে নয়, নানান্ কথা বলছে হয়ত'।

তা বলুক। ইণ্ডিয়ান সার্কাসের মালিক গোরা সরকার কারও কথার ধার ধারে না।

গোরাবাবু বললেন,—আরও একটু যাবে নাকি?

—আপনার যদি ইচ্ছে হয় তো চলুন।

গোরাবাবু তার মুখের দিকে তাকালেন। কুয়াশাচ্ছন্ন প্রভাতবেলায় এই রহস্যময়ী যুবতীকে মন্দ লাগছিল না তাঁর। বললেন,—তোমার কোনও ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই?

পেনাং বললে,—না।

গোরাবাবু পেনাংএর নরম হাতখানা চেপে ধরলেন একটুখানি। বললেন,—তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

—বলুন।

কি যে মনে হলো গোরাবাবুর কে জানে। বললেন,- আজ থাক্। আর-একদিন বলব।

সেই দিনটির বোধকরি অপেক্ষা করছিলেন গোরাবাবু।

মার্গারেট লুসি পেনাংএর খেলা ইণ্ডিয়ান সার্কাসে দেখানো হবে বলে গাদা গাদা হ্যাণ্ডবিল, পোস্টার ছাপানো হয়েছে, কিন্তু বিলি করা হয়নি একটিও।

মালিকের হুকুম ছাড়া বিলি করা চলে না।

গোরাবাবু নির্বিকার। বসিয়ে বসিয়ে মাইনে দিচ্ছেন মেয়েটাকে।

ম্যানেজার তরণীবাবু এলেন জিজ্ঞাসা করতে।

—লুসি পেনাংএর খেলার প্রোগ্রাম কি করব না?

গোরাবাবু বললেন,—না। "ফিলিপিনো সার্কাসে" এখানে অনেকে তার খেলা দেখেছে।

—কাগজগুলো মিছিমিছি ছাপানো হলো।

—তা হোক্। গোরাবাবু বললেন,—ইণ্ডিয়ায় ফিরে গিয়ে তার খেলা দেখাব। কলকাতায় আপনি চিঠি লিখে দিন।

পরের সপ্তাহেই এখানকার খেলা শেষ। রেঙ্গুন থেকে সোজা কলকাতা। জাহাজ বুক করা হয়েছে। কলকাতায় লোক চলে গেছে।

ম্যানেজার চলে গেলেন কলকাতার রিপ্রেজেনটেটিভকে চিঠি লিখবার জন্যে। বড়দিনের আসরটা সেখানে জমবে ভাল। মার্গারেট লুসি পেনাংএর অত্যাশ্চর্য খেলা দেখানো হবে। এড্ভান্স পাবলিসিটি চলুক।

রেঙ্গুনে আর মাত্র তিনদিন খেলা চলবে।

তাঁবুর ভেতর খেলা চলছে। গোরাবাবু বসে আছেন তাঁর সেই চেয়ারটিতে। হাতের ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে দেখলেন—আটটা কুড়ি। রাঘবাইয়া বাঘের খেলা দেখাচ্ছে। হাততালির চোটে কান পাতা দায়। রোজই এইরকম হয়। রাঘবাইয়ার মত এত হাততালি কেউ পায় না।

২

অথচ আশ্চর্য, একটি দিনের জন্যও রাঘবাইয়া তার কাছে আসে না। মাইনে বাড়াবার কথা বলে না। কারও নামে নালিশ করে না। মুখে হাসি তার যেন লেগেই আছে। মানুষটা ভাল।

এইবার কলকাতা গিয়েই তার দশটাকা মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে।

এই কথা ভাবছেন গোরাবাবু, এমন সময় গোমেশ এসে দাঁড়ালো।

গোরাবাবু গোমেশের মুখের দিকে তাকাতে পর্যন্ত পারলেন না। লোকটাকে ভাল লাগছে না তাঁর। এক্ষুনি হয়ত' পেনাংএর নামে নালিশ জানাবে। কথা যেন তার শেষ হতে চাইবে না।

—গুড্ মর্ণিং স্যার।

ভদ্রতার খাতিরে মুখ তুলে তাকালেন গোরাবাবু।

—পেনাংএর কথা কিছু বলবে?

গোমেশ বললে,—না স্যার, I have washed my hands off. ওর আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। সি ইজ্ এ ন্যাস্‌টি গার্ল।

লোকটা বলে কি? তিন-তিনবার চাবুক খেয়েও যে-লোকটা পেনাংএর পিছু ছাড়েনি, তার মুখে এ-কথা শুনবেন—গোরাবাবু আশা করেননি। জিজ্ঞাসা করলেন,—কোথায় সে?

—কার কথা জিজ্ঞাসা করছেন? পেনাংএর?

গোরাবাবু বললেন,—হ্যাঁ।

গোমেশ বললে,—সে এখন রাঘবাইয়ার খেলা দেখছে। পাগলের মতন হাসছে আর দু'হাতে তালি বাজাচ্ছে।

গোরাবাবু বললেন,—ডাকো তাকে। তোমাদের ভাব করিয়ে দিই।

গোমেশ বললে,—এখন সে কিছুতেই আসবে না। আই ক্যান্ বেট্।

—আমি ডাকছি বললেও আসবে না?

গোমেশ বললে,—নো স্যার। আমি পালাই।

সত্যিই পালিয়ে গেল গোমেশ।

তাঁবুর দরজার দিকে তাকিয়ে বসে রইলেন গোরাবাবু।

এদিকের যে-দরজা দিয়ে বাঘের গাড়ী বের করা হয়, সেই দিক দিয়ে বেরিয়ে এলো রাঘবাইয়া। পরনে ফুল প্যাণ্ট, গায়ে লাল ভেল্‌ভেটের হাতকাটা গেঞ্জি।

পিছু পিছু ছুটতে ছুটতে আসছে পেনাং।

—রাঘু! রাঘু!

গোরাবাবুর কাছাকাছি এসে থম্‌কে দাঁড়ালো রাঘবাইয়া।

পেনাং বললে,—না তুমি এই শীতে ঠাণ্ডা জলে চান করবে না। আমি তোমাকে রিকোয়েস্ট্ করছি রাঘু, তোমার জন্যে গরম জল আমি রেডি করতে বলেছি কিচেনে। দেখবে এসো।

এই বলে পেনাং তাকে একরকম টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল গোরাবাবুর সুমুখ দিয়ে।

আধো-আলো আধো-অন্ধকারে গোরাবাবুকে বোধকরি সে দেখতে পেলে না।

তবে কি গোমেশ যা বলে গেল তাই সত্যি?

অনেক রাত্রি পর্যন্ত ভাল ঘুম হলো না গোরাবাবুর।

হবেও-বা হয়ত পেনাংএর ভাল লেগেছে দুঃসাহসী রাঘবাইয়ার বাঘের খেলা! তার জন্যে গ্রেট ইন্ডিয়ান সার্কাসের মালিক গোরা সরকারের এত দুশ্চিন্তা কিসের?

আবার এমনও হতে পারে—গুন্ডা গোমেশটা তার পিছু লেগেছে, তার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে সে ওই লৌহদানব রাঘবাইয়ার আশ্রয় গ্রহণ করলে!

যাই করুক, এমন কত মেয়েই তো তাঁর হাত দিয়ে এসেছে গেছে, আবার কত আসবে কত যাবে।

গোরা সরকার দু'পেগ্ হুইস্কি খেয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

পরের দিন ভোর রাত্রে সেজেগুজে ছড়ি হাতে নিয়ে গোরাবাবু যেই তাঁর ক্যাম্প থেকে বেরিয়েছেন, পেছনে তাঁর নারীকণ্ঠ ধ্বনিত হয়ে উঠলো,—গুড্ মর্ণিং!

অত্যন্ত পরিচিত গলার আওয়াজ। অথচ ঘন কুয়াশায় কিছুই ভাল দেখতে পাচ্ছেন না।

রাত্রি জাগরণের অবসাদ যেন মুহূর্তে কেটে গেল। কুয়াশার সেই ঘন আবরণ ভেদ করে' হাসতে হাসতে ছুটে এসে দাঁড়ালো সেই রহস্যময়ী যুবতী—মার্গারেট লুসি পেনাং!

—উঃ কী ভাবনায় ফেলেছিলে তুমি আমাকে!

—কেন?

গোরাবাবু বললেন,—ভেবেছিলাম তুমি আসবে না।

পেনাং জিজ্ঞাসা করলে,—কেন ভেবেছিলেন? আমি কি কোনও অপরাধ করেছি?

গোরাবাবু বুঝি বলতে চেয়েছিলেন অন্য কথা, কিন্তু তাঁর মনের সব কথা ছাপিয়ে মুখ দিয়ে শুধুমাত্র বেরিয়ে এলো,—না।

ঝাড়ুদারেরা বেরিয়েছে কাজ করতে। মনিবকে দেখে সসম্ভ্রমে নমস্কার করে সরে দাঁড়ালো তারা।

বেড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে হীরামণি। সার্কাসের সব চেয়ে বড় হাতীটার নাম হীরামণি।

গোরাবাবুকে দেখে রোজ যেমন সে শুঁড় তুলে অভ্যর্থনা জানায়, সেদিনও তেমনি শুঁড় তুলে কেমন যেন একটা শব্দ করলে।

হীরামণি আর-একবার শুঁড় তুললে পেনাংকে দেখে।

গোরাবাবু বললেন,—হীরামণি তোমাকে চিনতে পেরেছে।

—কেমন করে বুঝলেন

—দেখলে না দুবার স্যালুট্ করলে। একবার আমাকে, একবার তোমাকে।

পেনাং বললে,—ওরা শুধু কথা বলতে পারে না, কিন্তু বুদ্ধি খুব।

গোরাবাবু বললে,—মাছ মাংস খায় না—নিরামিষাশী, অথচ শরীরে জোর দেখেছ কিরকম?

—হ্যাঁ। বলে চুপ করে রইলো পেনাং।

গোরাবাবুর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল রাঘবাইয়ার নামটা। কিন্তু কি জানি কেন, চেপে গেলেন। বলতে পারলেন না। সেও তো মাছ-মাংস খায় না, কিন্তু বাঘের সঙ্গে লড়াই করে!

পেনাং অন্য কথা পেড়ে বসলো। বললে,—আমাকে এরকম করে বসিয়ে রেখেছেন

কেন? সবকিছু ভুলে যাব যে!

গোরাবাবু বললেন,—এখানে অনেক লোক তোমার খেলা দেখেছে।

—দেখুক না! রোজ তো একই লোক খেলা দেখতে আসে না।

গোরাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—কলকাতার নাম শুনেছ?

—নাম শুনেছি। দেখিনি কখনও।

গোরাবাবু বললেন,—খুব—খুব বড় শহর। সেইখানে হাজার হাজার লোকের সামনে খুব চমৎকার পোষাক পরিয়ে তোমাকে আমি প্রথম বের করব। তোমার মুখের সামনে মশালের মত আগুনের যে রিংটা থাকে, ওর ধোঁয়ায় তোমার কষ্ট হয় আমি দেখেছি। নীচে থেকে তার দিয়ে ওখানে একটা লাল রংএর 'নিওন' জ্বালিয়ে দেবো। স্পট্ লাইট্ ফেলবো তোমার মুখে। তুমি হেসে হেসে খেলা দেখাবে। হাজার হাজার লোক অবাক্ হয়ে তাকিয়ে দেখবে তোমাকে। ক্রমাগত হাততালি দিয়ে তোমাকে—।

বলতে বলতে হঠাৎ থেমে গেলেন গোরাবাবু। উচ্ছ্বাসের মুখে এ কী করছেন তিনি? তাঁরই মাইনে-করা একটা মেয়ের সুমুখে এত প্রশংসা বোধকরি ভাল নয়। তাঁর সার্কাসে আরও তো অনেক মেয়ে চাকরি করে! অনিমা দাস সাইকেলের খেলা দেখায়, বিভা বোস ট্রাপিজের খেলা দেখিয়ে তিনটে মেডেল পেয়েছে। তাদের কৃতিত্ব কি কম?

গোরাবাবুকে হঠাৎ থেমে যেতে দেখে মিস্ পেনাং বললে,—বেশ তো বলছিলেন। বলুন না, শুনতে মন্দ লাগছে না।

গোরাবাবু বললেন,—খেলাটা রোজ প্র্যাক্টিস করছ তো?

—করছি। কিন্তু দেখবার লোক কোথায়? রোজ রোজ কি রাঘবাইয়াকে দেখাতে ভাল লাগে?

ধক্ করে কথাটা গিয়ে লাগলো গোরা সরকারের বুকে।—রাঘবাইয়াকে দেখাও বুঝি?

মিস্ পেনাং বললে,—দেখাই। আমি যা করবো ওর কাছে তাই ভালো। হাঁ করে তাকিয়ে থাকে আর খালি খালি বলে আমাকে শিখিয়ে দাও।

—শেখাও বুঝি?

—শিখতে পারবে কেন? ঠক্ ঠক্ করে বলগুলো কপালে ঠোকে আর হাসে।

এই বলে সে নিজেও হাসতে লাগলো।

যে-কথা বলবার জন্যে গোরাবাবু উদগ্রীব হয়েছিলেন সে-কথা তাকে আর বলা হলো না।

সেদিন বলা হলো না। তার পরেও না। বলবার সময়ই পেলেন না। অত বড় একটা সার্কাস-পার্টি নিয়ে তাঁকে কলকাতায় আসতে হবে, দেখাশোনার লোকজন অবশ্য অনেক, তবু তিনি মালিক বলে' চুপ করে বসে থাকতে পারেন না। বসে থাকা তাঁর স্বভাববিরুদ্ধ।

দুটো জাহাজে জন্তু-জানোয়ার মালপত্র আগেই চলে গেছে। শেষের জাহাজে যাচ্ছেন বাছা বাছা খেলোয়াড়দের নিয়ে গোরা সরকার নিজে।

নীচের পোর্টহোলের বাঙ্কে সকলের থাকবার ব্যবস্থা করে দিয়ে ওপরের দুখানা কেবিন নিয়েছেন। একখানায় যাচ্ছেন নিজে, আর একখানায় যাচ্ছে—মিস্ মার্গারেট লুসি পেনাং।

পেনাং এর এই সৌভাগ্যে অনেকের ঈর্ষা হবারই কথা।

তবে সবাই আজকাল জেনে ফেলেছে—গোরা সরকার কলকাতায় গিয়ে পেনাংকে বিয়ে করবেন।

ম্যানেজার তরণীবাবু কথাটা সেদিন বলেই ফেললেন গোরাবাবুকে। যা শুনছি সেটা কি সত্যিই?

আর বেশিকিছু বলতে হলো না। গোরাবাবু একটুখানি হেসে বললেন,—সত্যিই যদি হয়, আপনাদের আপত্তি আছে?

—না না, আপত্তি থাকবে কেন? এ তো সুখের কথা, আনন্দের কথা।

গোরাবাবু বললেন,—বেশ তবে আনন্দই করুন।

তা জাহাজের দিন এবং রাত্রি মন্দ কাটছে না। সমুদ্রের ওপর দিয়ে জাহাজ চলেছে। চারিদিকে শুধু জল আর জল। প্রতিদিনের অভ্যাস মত গোরাবাবুর ঘুম ভাঙ্গে শেষ রাত্রে। পেনাং কিন্তু আজকাল আর অত সকালে উঠতে পারে না। গোরাবাবু একাই পায়চারি করে বেড়ান ডেকের ওপর। বেলা হলে নীচে নেমে যান লোকজনের খবর নিতে। কারও কোন অসুবিধা হচ্ছে কি না দেখে আসেন।

আর মাত্র একটা দিন।

গোরাবাবু সেদিন সন্ধ্যায় নীচে নেমে গিয়ে দেখেন, রাঘবাইয়া ডেকের এককোণে খালাসীদের কাছে বসে বসে গল্প করছে।

গোরাবাবু এগিয়ে গেলেন।

—এখানে কি করছো রাঘব?

রাঘবাইয়া উঠে দাঁড়ালো। তার হাতে ঢাকা-দেওয়া একটা এলুমোনিয়ামের ডেক্‌চি।

গোরাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—ওতে কি আছে?

রাঘবাইয়া বললে,—মুরগীর মাংস। খালাসীরা রান্না করে দিলে।

অবাক হয়ে গেলেন গোরাবাবু। নিরামিষাশী রাঘবাইয়া কি শেষে মাংস খেতে আরম্ভ করেছে নাকি?

গোরাবাবু বললেন,—আমি তো তোমাকে আগেই বলেছি—মাংস খাওয়া তোমার উচিত।

রাঘবাইয়া বললে,—না না আমি খাব না স্যার। চুপিচুপি ওদের দিয়ে রান্না করালাম আপনাদের জন্যে। আপনি খাবেন আর পেনাং খাবে। শুনলাম নাকি আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার অসুবিধে হচ্ছে।

এই বলে ডেক্‌চিটা নিয়ে রাঘবাইয়া চলে গেল। গোরাবাবু অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন লোকটার দিকে।

বিকেলে জাহাজ ভিড়বে খিদিরপুরের ডকে।

সকালেই দেখা হলো রাঘবাইয়ার সঙ্গে। পেনাংএর কেবিন থেকে বেরিয়ে বোধকরি সে নীচে নেমে যাচ্ছিল। হাতে তার সেই এলুমোনিয়ামের ডেক্‌চি।

গোরাবাবু ডাকলেন তাকে।—শোনো রাঘব!

রাঘবাইয়া থমকে দাঁড়ালো।

গোরাবাবু বললেন,—আজ আবার মাংস আনতে যাচ্ছ?

—আজ্ঞে না। আজ তো আমরা নামবো জাহাজ থেকে।

—হাতে তা'হলে ওটা কেন? ডেক্‌চি নিয়ে কোথায় চললে?

রাঘবাইয়া ডেক্‌চির ঢাকাটা তুলে দেখালে। ডেক্‌চি-ভর্তি ভিজে ছোলা। হেসে বললে,—এটা আমার খাবার।

—কোথায় পেলে?

রাঘবাইয়া বললে,—পেনাং দিলে। রোজ ও আমার জন্যে ভিজিয়ে রাখে।

এই বলে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে গেল সে।

গোরাবাবু পেছন ফিরতেই দেখেন পেনাং বেরিয়ে আসছে তার কেবিন থেকে।

—দেখুন তো কিরকম বেয়াড়া মানুষ! দশটা টাকা দিতে গেলাম, নিলে না কিছুতেই।

গোরাবাবু ঠিক বুঝতে পারলেন না কথাটা। বললেন,—কেন টাকা কি হবে?

পেনাং বললে,—আপনার ডিনারে যে চিকেন্ কারি দেওয়া হয় সে কি ভাবছেন কিচেন থেকে দিয়েছে? যেদিন থেকে শুনেছে জাহাজের সারেংরা মুরগী রান্না করে খায় সেইদিন থেকে ওদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে দিয়ে কারি কিনে এনেছে আমার জন্যে। আমি কি একা অতটা খেতে পারি? তাই রোজই আপনার ডিনার টেবিলে—'

গোরাবাবু হাসতে হাসতে বললেন,—জানি।

পেনাং হাত দিয়ে লুফে লুফে কি যেন খাচ্ছিল। গোরাবাবু জিজ্ঞাসা করলেন,—কি খাচ্ছ?

পেনাং তার হাতের মুঠো খুলে দেখালে—একমুঠো ভিজে ছোলা। বললে,—এগুলো তো জানতাম ঘোড়াতেই খায়। রাঘু এগুলো কেমন করে খায় বলুন তো?

বলেই সে হাসতে লাগলো খিল্ খিল্ করে।

কলকাতায় বড়দিন। ভারতবর্ষ তখন ইংরাজের। চৌরঙ্গীপাড়ায় ফুর্তির ফোয়ারা ছুটেছে। ময়দানে বিরাট তাঁবু পড়েছে গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের। তিন দিন পরে খেলা সুরু হবে। পোস্টারে হ্যাণ্ডবিলে শহর সরগরম।

কলকাতায় পৌঁছেই গোরাবাবু খুব ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। ট্যাক্সি নিয়ে দিনরাত ছুটে বেড়াচ্ছেন।

হোটেলের দু'খানা ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছে।

বিয়ের পর সার্কাসের তাঁবুতেই বা থাকবেন কেন?

ম্যানেজার তরণীবাবু বিরাট খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন করেছেন।

রেজেস্ট্রি আপিসে বিয়ে হবে। কতক্ষণেরই-বা মামলা।

পেনাংকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন গোরাবাবু। সঙ্গে একজন লোক তো চাই! তরণীবাবু যেতে চাইলেন। কিন্তু গোরাবাবু তাঁকে নিলেন না। রাঘবাইয়াকে বললেন, —তুমি এসো।

হাসতে হাসতে রাঘবাইয়া গিয়ে ট্যাক্সিতে উঠলো।

সার্কাসের তাঁবুতেই তাঁরা ফিরে আসবেন। মনিবের বিয়ে। ম্যানেজার তরণীবাবু খেলোয়াড়দের সাজিয়ে দিলেন আপন আপন পোষাকে।

ভেতরে সারি সারি খাবার জায়গা হয়েছে। নববিবাহিত বরবধূ এলেই তাঁদের অভ্যর্থনা করে নিয়ে এসে বসানো হবে তাঁবুর ভেতরে। তারপর চলবে—খাওয়াদাওয়ার

ব্যাপার।

মাহুত দুটো প্রকাণ্ড হাতীকে মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে গেটের দু'পাশে। একদিকে হীরামণি, একদিকে সোনামণি।

গাড়ী আসতে অনেক দেরি হচ্ছে। বেরিয়ে গেছেন বেলা এগারোটায়, সন্ধ্যে হতে চললো এখনও তাদের দেখা নেই। সবাই উদ্‌গ্রীব চঞ্চল হয়ে উঠলো।

তরণীবাবু গেটের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালেন।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে। তাঁবুর ভেতরে বাইরে নানা ধরনের আলো জ্বলে উঠলো।

হঠাৎ দেখা গেল একখানা গাড়ী এসে দাঁড়ালো গেটের সামনে। তরণীবাবু বললেন, এসে গেছে।

মেয়েরা শাঁক বাজালে। সার্কাসের ব্যাণ্ড পার্টি সুরু করলে তাদের কনসার্ট। হীরামণি আর সোনামণি শুঁড় তুলে মালিকের নববিবাহিতা পত্নীকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য প্রস্তুত হলো।

গাড়ী থেকে প্রথমেই নামলেন গোরাবাবু। তারপর তিনিই হাতে ধরে নামালেন নব-বিবাহিত দম্পতিকে।

সবাই অবাক হয়ে তাকিয়ে দেখলো—গোরাবাবু বিয়ে করেননি। মার্গারেট লুসি পেনাংএর সঙ্গে বিয়ে হয়েছে মণিমঙ্গলম্ রঘুরাঘবসুন্দরম্ আইয়ারের।

রাঘবাইয়ার পরণে নতুন সুট, পেনাংএর অপরূপ সজ্জা। একজনের গায়ের রং কালো, অন্যজন অত্যধিক ফরসা।

তরণীবাবু বললেন,—এ কী হলো স্যার? এ-কাজ কে করলে? আপনি?

গ্রেট ইণ্ডিয়ান সার্কাসের মালিক গোরা সরকার সেদিন বোধকরি প্রাণ ভরে মদ্যপান করেছিলেন। প্রসন্ন হাসি হেসে বললেন,—আমি কেন করবো? করলে ওদের প্রেম—ওদের ভালবাসা। আমি শুধু সুর আর অসুরের মিলন করে দিলাম।

হাতে হাত মিলিয়ে এগিয়ে আসছিল রাঘবাইয়া আর পেনাং। লোকজনের একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল গোমেশ।

গোমেশ বোধকরি গোরাবাবুকে লক্ষ্য করেই বললে, আমি তো আপনাকে বলেছিলাম স্যার, they want a strong man; and nothing else.

কথাটা শুনতে পেলে পেনাং। সেও বোধকরি একটুখানি মদ্যপান করেছিল। গোমেশের দিকে তাকিয়ে বললে,—yes, a strong man and not a strong animal like you.

বলেই সে খিল্ খিল্ করে হেসে উঠলো।

কথাটা আর-কেউ না বুঝুক্, গোরাবাবু বুঝলেন।

নিত্য-নিঠুর দ্বন্দ্ব

মনীশ ঘটক

প্রাচীন কাহিনী আর উপকথার দেশ তিব্বত। পৌরাণিক গল্প বিস্তর, হাল আমলের কাহিনীও কম নয়। এই ধরো বুড়ো তেকন আর বুড়ো দেবদারু গাছের উপাখ্যান। সংশয়ীরা জেরা করবে, নাক সিঁট্‌কোবে। কিন্তু হে সত্যসন্ধী, বুদ্ধের বাণী স্মরণ করো। বিশ্বাসে মিলায় স্বর্গ। ঈশ্বরের আশীর্বাদ শুধু বিশ্বাসীর শিরেই বর্ষিত হয়।

তেকন সোরবুর বয়সের গাছপাথর নেই, কত যে বুড়ো কেউ জানে না। সাধুসন্ত লোক। বাড়ী তার হিমালয়শীর্ষে, ছককাটা বাঁধা রাস্তায় জীবনযাপন। প্রত্যূষে প্রার্থনার পর দু'খানা যবের রুটি খেয়ে সে পাহাড় থেকে নামে, এসে বসে তাতা-হো নদীর অতলস্পর্শ ঘূর্ণীর ধারে তার উপাসনা বেদীতে। গগনচুম্বী এক প্রাচীন দেবদারু গাছতলায় সেই আস্তানা। গাছ বেশী বুড়ো, না মানুষ, এ নিয়ে লোকের জল্পনা কল্পনার অন্ত নেই। খুনখুনে বুড়োর নোয়ানো ঘাড় আর শুকনো কুলের খোসার মতো বলীজর্জর চামড়ার ভেতরে অফুরন্ত জীবনরস। জাব্বাজোব্বার ঘেরাটোপ থেকে স্বপ্নালু চোখে তাকায়, যেন সব দেখেও কিছু দেখছে না, গভীর অন্তর্মুখী দৃষ্টি, শান্তসমাহিত মুখ।

এম্‌নি চলে আস্‌ছিল চীনে লড়াইবাজেরা দেশ আক্রমণ করার আগভাগ পর্যন্ত।

চিন্তাশীর্ণ, চঞ্চল দেখাচ্ছে ওকে আজ সকালে। সূর্যের তাপে পাহাড়ের চূড়ায় বরফ গলছে। ঘন কুয়াশার মতো ধোঁয়াটে হয়ে আছে চারিদিক গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতে। দেবদারুর ঘন পাতার আচ্ছাদন বাঁচাচ্ছে তাকে, যেমন বাঁচিয়ে এসেছে এম্‌নি আরো কত দিন, কত যুগ। ওই গাছের বিশাল গুঁড়ি মত্ত ঝড়ের আক্রোশ থেকে কতোবার আড়াল করে রেখেছে ওকে। ও ত গাছ নয়, প্রাণের বন্ধু যেন। সোরবু আদর করে, খস্‌খসে বাকলে সস্নেহে হাত বুলোয়।

কোলের ওপর ভিক্ষাপাত্র, তার ভেতর হাত ঢুকিয়ে মালা জপ করে সোরবু। গুণে গুণে একশো আটবার করে নাম জপ করে। প্রার্থনা পতাকা সোজা করে দেয়, ধর্মচক্র বাঁয়ে থেকে ডাইনে ঘুরিয়ে দেয়। নির্দন্ত মাড়ি ঢাকা শিথিল ঠোঁটদুটো থর থর করে কাঁপে। আবেগকম্পিত সুরে উচ্চারণ করে, ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব। করুণাঘন ধরণীতল করো মধুনিস্যন্দ।

ঘূর্ণ্যাবর্তের নীচে পাহাড়ে রাস্তা থেকে দূরাগত গরুর গলার ঘণ্টার রুণ্‌ঠুণ্‌ শোনা যায়। বেদীর রাস্তায় আজকাল লোকের গতিবিধি কমে গেছে। বিশেষ করে কয়েক মাস হোলো দেশে অশান্তি সুরু হবার পর থেকে। কিন্তু এ আওয়াজটি রোজকার। প্রতি দিন ভোরবেলা একজন আসে গাঁয়ের পথ বেয়ে, আবার সন্ধেবেলা ওপরকার পাহাড়ের গোচারণ-এর মাঠ থেকে নেমে সমতলে ফিরে যায়। খাড়াইয়ের সঙ্কীর্ণ পথে দেখা দেয় তিনটে ইয়াক, পেছনে ভারী মেঠোবুট পায়ে বর্ষাতিমোড়া এক মূর্তি। তেকনের আশ্রমের সামনে এসে টুং টাং শব্দ থামে, পাথরের ঢিবির ওপর একটি নুড়ি রাখে আগন্তুক।

পুরুষ নয়, তরুণী মেয়ে। পথের শ্রমে তাজা রক্তের গোলাপী আভায় গালদুটো টুক্‌টুক্‌ করছে। কালোচুলের গুচ্ছের আড়ালে ঘাম টস্‌টস্‌ করছে। ইয়াক পালিকার

নাম কায়া। গতযৌবন তেকনের চোখেও কায়া এলে দিনের আলোকপ্রভা যেন উজ্জ্বলতর হয়ে ওঠে।

তেকন বলে,—ভগবান বুদ্ধ তোর ভালো করুন। তাঁর আশীর্বাদ তোর চিরসাথী হোক।

আঙ্‌রাখার ভেতরে হাত ঢুকিয়ে একতাল জমাট মাখন বার করে ভিক্ষাপাত্রে রাখে কায়া। পায়ের নখের দিকে মাথা নীচু করে তাকিয়ে অস্পষ্ট সুরে বলে,—আশীর্বাদ মাথা পেতে নিলাম, প্রভু।

তাকে কেউ সাধু, কি সন্ন্যাসী বললে লজ্জিত হয় তেকন। সে ভেকধারী লামা নয়। তবুও গাঁয়ের লোক তাকে দেবাংশ বলে শ্রদ্ধা করে। তেকন বলে,—মেয়ের দেবার হাত কি! কালকেই ত এতো চা নিয়ে এলি, আবার আজ—

—শরীর থাক্‌লেই তার যত্ন আছে। ধ্যান ধারণা ভগবানের চিন্তা সবই শরীর ভালো থাকার ওপর।

—ঠিক্ কথা। ভগবান সহায় থাকুন তোর।

এবারে কি বলবে কায়া, অপেক্ষা করে তেকন। মেয়েটা আর কথা কয়না। চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। ওকে দেখে বিষাদের দীর্ঘনিশ্বাস ঠেলে ওঠে তেকনের বুকে। যেন রাত্তিরের অনর্গল কান্নায় চোখমুখ ফুলো ফুলো হয়ে আছে। কি হোলো ওর?

এ জীবনে যৌবনের দিনকটা কতো তপস্যার ফল। দেশের দুর্দিনে সে যৌবন অসহায় ভাবে শুধু অন্ধকারে মাথা কুটে মরে। তেকন বলে,—কিন্তু সুস্থ দেহের আর এক প্রকাশ মন খুলে হাসতে পারাতে। তোর মুখে হাসি নেই কেন মা?

ঠোঁট কাঁপে কায়ার। বুঝি উদ্গত কান্না থামায়।

—গাঁয়ের খবর ভালো নয়। নতুন সাঁকোর ধারে আরো অনেক ফৌজ এসে পৌঁছেচে।

—তারা কি তোকে—

—না বাবা, তা নয়। তবুও তোমার সাহায্য চাই আমি।

—এই অশক্ত বুড়ো মানুষ যতদূর যা করতে পারে, ধরে নে সে সব করা হয়েছে।

—তুমি জ্ঞানবান, তোমার দয়ার অন্ত নেই।

—বয়েসের সাথেই কি জ্ঞান বাড়ে? সে সব যাক্। তোর প্রেমিকটির কথা বল।

—তুমি দোরজির কথা শুনেছ? অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে কায়া।

ঘাড় নেড়ে তেকন বলে, যে সে জানে। দোরজি গোজে হল গাঁয়ের কামার। চীনে শয়তানরা এই দোস্‌রাবার ডবল ফৌজ নিয়ে গাঁয়ে আসবার আগে পর্যন্ত কামারের কাজ করত। এইবার লাগলো তুমুল মারামারি কাটাকাটি। পুরোনো সেতুটা ধ্বসে চুরমার হয়ে গেল লড়াইয়ে। সেই লড়াইয়ে মাতব্বর হোলো দোরজি, গেরিলা সেনাবাহিনীর নায়ক। এখন পাহাড়ের চূড়ায় চূড়ায় পালিয়ে বেড়াচ্ছে। দোরজির কথা শুনেছে তেকন, অল্পবয়স, রক্তগরম, কিন্তু এ দুনিয়াতে সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ। কায়র দিকে তাকিয়ে স্নেহের হাসি মুখে আনে তেকন।

কথা বলতে গলা কাঁপে কায়ার।—কাল রাত্তিরে এসেছিল। কোনো মতে চীনে পাহারাদারদের নজর এড়িয়ে রাতদুপুরে এসে হাজির।

রুদ্ধশ্বাসে শোনে তেকন। যা টহলদারি ফৌজের বহর, তাদের নজর এড়িয়ে চলা-ফেরা করা ত প্রায় অসম্ভবের কোঠায়। ধরা পড়লে নির্ঘাৎ প্রাণ যাবে। এত বিপদ মুখে

করে দৌরাত্মি এসেছে কায়ার বাড়ীতে!

—তোকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালোবাসে, না রে? সাধ্য কি না বেসে! এখন কোথায় আছে সে?

—ছাদে লুকিয়ে আছে। আমি বললুম, চলো আমরা পালাই। দুজনায় পাহাড়ের ওপরদিকে উঠতে পারলে, ব্যস্, নিশ্চিন্তি। কিন্তু ষাঁড়ের মতো গোঁয়ার। একটা মতলব ওর মাথায় ঘুরছে বুঝলাম, তাতে ঝুঁকিও খুব—

—মতলব?

—কিছু ভেঙে বলে না যে। কিন্তু এ গোঁয়ার্তুমি ছাড়তে হবে ওকে। ধরা পড়বেই আর নির্ঘাৎ প্রাণটাও যাবে। তুমি কথা কয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ওকে থামাও প্রভু, তোমার কথা ঠেলতে পারবে না। খুব মান্যি করে তোমাকে।

—তুই কি চাস্ যে আমি ওর ওখানে যাই?

দুহাতে মুখ ঢেকে ঘাড় নাড়ায় কায়া।

চোখ বুজে ভাবে তেকন। চোখের পাতা ত নয়, প্রাচীন পুঁথির মড়মড়ে কাগজ যেন। এই সব যুদ্ধ, আর হিংসা আর জয়োল্লাস, তার মনকে আর দোলা দেয় না। শিরায় রক্ত বরফ গলা জল হয়ে গেছে। আজ কতোদিন হলো সে পৃথিবীর সব ভাবনা ছেড়ে দিয়েছে —যা কিছু চিন্তা, পরলোক নিয়ে। তবুও, নিজেরই অতীতের ক্ষীণ এক স্মৃতি মনের মধ্যে উঁকি দেয়।

—আচ্ছা, তুইও ত ওকে খুব ভালোবাসিস্?

কায়ার রুদ্ধচিত্ত যেন মুক্তবায়ুতে এসে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচে। বলে,—হ্যাঁ বাবা, ওই আমার জীবনমরণ।

—আচ্ছা। চোখের জল মুছে গোঠে যা, ধর্মের জীবগুলোকে চরাবরা করগে যা। আবার কথা হবে'খন রাত্তিরে।

কায়া চলে গেলে গাছের গুঁড়িতে মাথা ঠেস্ দিয়ে বসে তেকন। দেবদারু পাতার ছুঁচোলো ডগা বেয়ে জল ঝরছে, নীচে বেগবতী তাতা-হো-র স্রোত গিরিসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে সগর্জনে বয়ে চলেছে। নদীর মনমেজাজ ওর জানা, কখন শান্ত মেয়েটি আর কখন দজ্জাল কুঁদুলী। জীবন ভোর শুনে আস্ছে। আজকে নদী আসন্নপ্রসবা মেয়ের মতো যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করছে, প্রসবান্তে পরমশান্তিতে সমুদ্রগভীরে গিয়ে মিশবার জন্যে। বাঁধন ভাঙতে দেরী নেই আর।

—আমারো সময় হয়ে এলো, বন্ধু! গাছের গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে তেকন বলে।

শিঁজিল করে আলখাল্লা গায়ে জড়িয়ে অষ্টাবক্র লাঠিতে ভর দিয়ে গাঁয়ের পথ ধরে তেকন। রাস্তার পাথরকুচিগুলো ভিজে আর পেছল, হাজার হাজার বছরের পথচল্‌তি পায়ের দাবে পালিশ হয়ে গেছে। গাঁ কুয়াশায় ঢাকা। এর আগে কবে যে গাঁয়ে এসেছে, মনেই পড়ে না তেকনের। পুজাবেদীর তদারক ছেড়ে বহুদিন নড়ে নি সে।

বোমা ফাটিয়ে রাস্তা চওড়া করে নিয়েছে চীনেরা, যাতে চারচাকার গাড়ী আর ভারী ট্রাকগুলো সহজে যাওয়া আসা করতে পারে। নিজেদের নীচু দেশ থেকে অনেক নতুনত্ব এই পাহাড়ে দেশে নিয়ে এসেছে তারা। এক জীপ ভর্তি টহলদার ফৌজ আস্তে আস্তে যাচ্ছে, গাড়ীর তেলের দুর্গন্ধে ওর দম বন্ধ হয়ে আসে, কাশি পায়। পাশের পাহাড়ে

দেয়ালে গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ও দেখতে পায় সৈন্যদের হাসিমুখ, তাদের হাতের মারণাস্ত্র। সৈন্যরা ওকে চেনে—হেঁকে শস্তা রসিকতার বুলি ঝাড়ে, কিন্তু তাদের শত্রু বলে মনে হয় না তেকনের। তারই মতো মাটির মানুষ ওরাও, তবে স্বতন্ত্র মত, ভিন্ন পথ। কিম্বা, নিজস্ব মত ও পথ কিছুই নেই ওদের।

অনেকবার থেমে, জিরিয়ে, তেকন শেষপর্যন্ত নদীর নাবালে গাঁয়ের ধারে গিয়ে পৌঁছল। এখানটায়, খাড়া গিরিসঙ্কটের মধ্যে দিয়ে যেখানে নদী ক্ষুরধারে বয়ে চলেছে, নতুন সেতু বানাচ্ছে চীনেরা। পুরোনো ঝোলা সাঁকো ত কবে সাবাড় হয়ে গেছে।

লোহার খিলেন আর ইস্পাতের পাত দিয়ে এই যে ময়দানবের কাণ্ডকারখানা করছে চীনেরা, দেখে তাজ্জব বনে যায় তেকন। ওরা শুধু করিৎকর্মা নয়, সত্যিই কুশলী। আর অনলস। আধা তৈয়ারী সেতুর ওপর পিঁপড়ের পালের মতো অগুণ্তি মজুর কাজ করে চলেছে অক্লান্ত ভাবে।

গ্রামের একেবারে ওধারে কায়ার ছোট্ট বাড়ীখানি। সেইখানেই ছাদের ওপর গা ঢাকা দিয়ে আছে দোরজি গোজে, দেখা করতে হবে তার সাথে। সোজা সেখানে যাবার চেষ্টা করলে সন্দেহ করতে পারে শত্রুরা। বাব্বা :, এদিকে ওদিকে গিজ্‌গিজ করছে সৈন্য আর সিপাই, কাঁধে চক্‌চকে কিরীচ আঁটা বন্দুক। একটিই রাস্তা, তাতে তিব্বতি পথিক নেই বললেই চলে, কেবল দু'একটি স্ত্রীলোক, আর বাচ্চা। জোয়ান মরদ, যারা লড়তে পারত, হয় গেছে নির্ব্বাসনে, না হয়ত পালিয়ে বেড়াচ্ছে গিরি গহ্বরে। ভিক্ষেপাত্র সাম্‌নে ধরে এগোতে থাকে তেকন।

কয়েক পা যেতে না যেতেই দু'জন সেপাই ধরে ফেলে তাকে। গা-তাল্লাসিতে বাধা দেওয়া নিষ্ফল। ধাক্কা মারতে মারতে ওকে নিয়ে যায় এক বাড়ীতে, সেখানে লালতারা মার্কা নিশেন উড়ছে। মাথা নীচু করে নির্বাক থাকে তেকন। ওকে ঘিরে জটলা পাকায় একপাল হলদে ফৌজ। শেষ পর্যন্ত নিয়ে যায় ওকে ছোট্ট একটা কুঠুরিতে, সেখানে একটি টেবিল আর একখানিই চেয়ার। চেয়ারে বসে মিলিটারি উর্দ্দি আঁটা চাঁদবদন এক ছোক্‌রা অফিসার, মাথা গুঁজে কাগজপত্র নাড়াচাড়া করে, ওর দিকে ফিরেও তাকায় না। হাতের কাজ শেষ হলে ধীরে সুস্থিরে মুখ তুলে তাকায়।

—কি ফকির বাবাজি, মৎলব কি? কি চাও এখানে?

অবিচলিত সুরে তেকন জবাব দেয়,—কিচ্ছু না।

—কিচ্ছু না? তবে বুঝি আমাদের নতুন সাঁকো দেখতে এসেছো?

—আশ্চর্য সুন্দর সাঁকো।

—ভালো লেগেছে তাহলে। তুমিই সেই উঁচু পাহাড়ের ফকির ত? আমার পরিচয় দিই। আমি ইঞ্জিনিয়ার কোরের কর্ণেল চেন। আমার নিজের নক্‌সা মাফিক আমিই বানাচ্ছি এই সাঁকো, যা দেখে তারিফ করলে তুমি।

—আপনার সামনে কথা বলা আমার বেআদপি হুজুর।

জানালা দিয়ে দূরে কায়ার বাড়ীর ছাদ বোধ হয় দেখা যায়। ওইখানে লুকিয়ে আছে দোরজি, কায়ার প্রণয়ী। এই হাসিমুখ, মিষ্টভাষী কর্ণেলকে দেখে তাদের জন্য দুর্ভাবনা হয় তেকনের। ভাবে, না এলেও হোতো।

কর্ণেল বলে,—তোমার কথা অনেক শুনেছি, আজ দেখা হয়ে গেল। শুনেছি তুমি নাকি অনেক তুকতাক জানো?

—তুকতাক? না হুজুর, প্রার্থনা ছাড়া আর কিছু করবার শক্তি নেই আমার।

—নিরাশ করলে তবে। কিন্তু সবাই যে বলে তুমি অনেক কিছু জানো—এই মন্ত্র তন্ত্র, ঝাড়ফুক, এই সব? ভূতে পেলে ছাড়াতে পারো! আবার কেউ বলে যে আমার সাঁকোর ওপর তুমি শনির দৃষ্টি দিয়েছো!

—ওরা সব গাধার পাল, হুজুর, এই আমি যেমন। বোকা, হদ্দ বোকা।

—ওসব কথার মার প্যাঁচ রাখো ফকির বাবাজী, খেল্ একটা কিছু দেখাও। কথা দিচ্চি গুমোর ফাঁস করব না আমি।

ঢোক গিলে চুপ করে থাকে তেকন। অনেকদিন পর আজ আবার নতুন করে মনে জ্বালা ধরে। কবেকার নিভে যাওয়া রাগের আগুন চিড়বিড় করতে থাকে দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠ্বার জন্যে। লজ্জার কথা—লজ্জার কথা।

কর্ণেল হঠাৎ দাঁড়িয়ে ওঠে, ধরণ ধারণ পালটে যায় কর্কশ কণ্ঠে বলে,—তবে তোকেই কিছু দেখাই, দ্যাখ্, ভিক্ষুক কোথাকার। ওই জানালা দিয়ে কি দেখতে পাচ্ছিস্?

রাগ, না ভয়, না অবসাদ—বুঝতে পারে না তেকন, কিন্তু থরথর করে পা কাঁপে। বাইরে গিরিমাটির রং নদীর জল টগ্‌বগ করে ফুটছে, কেশর ফোলানো সিংহের মতো ভীম-বেগে লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে, ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে নির্মূল গাছপালা ইট পাথর, কিন্তু বাগ মানছে গিয়ে নতুন সেতুর তলায়। তামাম তিব্বতে তাহা-হো-কে রুখতে পারে এমন সাঁকো কেউ বানায় নি।

—দেখছি পুলটা।

—আম্বানের রাস্তাও দেখতে পাচ্ছিস্, পিকিন থেকে লাসা পর্যন্ত। তোর আমার জন্মাবার আগে তৈরী ও রাস্তা। এই ক'দিনেই সাঁকোর কাজ শেষ হবে, আবার ও রাস্তার পরমায়ু হবে হাজার বছর—

—ভগবানের দয়া থাকলে। আমার বয়সে তিনটে সাঁকো ভাঙ্‌তে দেখেছি আমি।

উন্মাদের চোখের মতো ধ্বক্ করে জ্বলে ওঠে কর্ণেলের চোখ।

—এ সাঁকো সে জাতের নয়। এ ভাঙ্‌তে পারে না, কেউ পারবে না একে ভাঙ্‌তে।

—মানুষ কোন ছার, ভাঙ্‌বে নদী নিজেই।

মন দিয়ে শোন। নয়া চীনের পাশ করা ইঞ্জিনীয়র আমি। এমন সাঁকো আমি বানাই না যা নদীতে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। থুতু ফেলি তোমাদের শাপমন্যির মুখে। তোকে এখনো জ্যান্ত রেখেছি কেন জানিস্?

তেকন কথা কয় না। এই দাম্ভিক ছোকরা হয়ত জানে ঢের, বোঝে না কিছু।

—তুই তোর পাথরের ঢিবিতে বসে কুঁড়োজালি জপ্‌গে যা। সেখানে বসে দেখিস আমার কারিগরদের কাজ, আর বলিস তোদের গেরিলা শয়তানদের—

বাধা দিতে তেকন হাত ওঠায়, কিন্তু কর্ণেল থামিয়ে দেয়।

—বলিস্ যে আমি চাই ওরা আমার সাঁকোয় হাম্‌লা করুক। আসুক ওরা, নেমন্তন্ন রইল। গুষ্টিসুদ্ধ মরুক এসে। যা, এখন পালা—নিজের দাঁড়ে গিয়ে বস্‌গে যা। ফের যদি এদিকে পা বাড়াবি তো কুকুরের মতো গুলি করে মারব।

আশাহত তেকন জরাজর্জর দেহ নিয়ে ফিরতি পথ ধরে। পেছন ফিরে কায়ার বাড়ীর দিকে তাকাতে সাহস হয় না। কোনো উপকারে এলো না সে, হয়ত এতক্ষণ দোর্‌জিকে পাকড়াও করেছে ওরা। তা হলে কী সান্ত্বনা দেবে কায়াকে?

গোধূলি বেলায় বেদীতে ফিরে পাথরের আসনে বসে পড়লো। বৃষ্টি থেমে গেছে, কুয়াশা কেটে গিরিশৃঙ্গের ওপর অস্তগামী সূর্যের আলোর ঝলকানি চোখে পড়ছে। ঊষর প্রকৃতির বুকে তার দেবদারুই একমাত্র গাছ—সেই দিকে তাকিয়ে নতুন করে বল বাঁধে বুকে, প্রেরণা খোঁজে। সন্ধ্যার আবির্ভাব সচকিত করে জাগে দাঁড়কাকের কর্কশ ডাক, পাহাড়ি খরগোসের কিচ্‌কিচ্‌ আর তাতা-হো-র বুকে অবিরাম স্রোতের কলধ্বনি।

গোচারণ ফিরতি ঘণ্টার আওয়াজ কানে যেতে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেপড়ে তেকন। কাঠ্-
গোচারণ ফিরতি ঘণ্টার আওয়াজ কানে যেতে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠেপড়ে তেকন। কাঠ-
কাঠালি জুটিয়ে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালে। কায়া পোঁছতে না পোঁছতে মাখন নুন দিয়ে চা তৈরী করে ফেলে। কায়ার হাতে এক বাটি ধরে দিয়ে ওর দুশ্চিন্তাজীর্ণ মুখের দিকে তাকায়।

কায়া প্রায় কেঁদে ওঠে,—আমার মন বলছে ওর কোনো বিপদ হয়েছে। আমি ওর কাছে যাই।

কায়ার হাতধরে তেকন বলে,—স্থির হ', এখনো নয়। তোর বাড়ীতে যদি চীনেরা ওকে খুঁজে পেয়ে থাকে, তবে তোর ঘোর বিপদ! বোস্‌ এখন দ্যাখ্‌ কি হয়।

চুপচাপ বসে থাকে দুজনাতে। কখন গোধূলির নরম আলো গভীর রাত্রের ঘন অন্ধকারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। ঘরে ঘীয়ের প্রদীপ জ্বাললো তেকন। খটাখট বুটের আওয়াজ তুলে পাথুরে রাস্তা দিয়ে টহলদারী ফৌজ খালি হাতে ফিরে গেল।

পশ্চিমে মেঘ করেছে। চীড় খেয়ে খেয়ে বিদ্যুৎ চম্‌কাচ্ছে। হাড় কাঁপানো শীত, গরম চায়েও হাড় ঠক্‌ঠকানি থামে না।

বেশ অনেক পরে ঠক করে কুঁড়ের দেওয়ালে ঢিল পড়ার শব্দ হয়। লম্বা চওড়া দশাসৈ এক জোয়ান লাফিয়ে পড়ে। কায়ার উল্লাস ধরে না। পিঠের ভারী থলি সন্তর্পণে নামিয়ে দোরজি কায়াকে কোমর ধরে শূন্যে তোলে শিশুটির মতো, বলে, লক্ষ্মী মাণিক আমার। এত রাত পর্যন্ত এখানে—

তেকন দেখে আর ভাবে, হাঁ, যে কোনো মেয়ের হৃদয় জয় করতে পারে বটে। দৈত্য বিশেষ, কিন্তু কি হাসিখুশী! কায়ার মুখভাব কিন্তু পাকা গিন্নীর মতো ভারিক্কি, সেই চালে বলে,—ছাড়ো, গাধা কোথাকার! এদিকে আমি হাজার মরণে মরছি, বলি ছিলে কোথায় সমস্তটা দিন?

ঘাড় পেছনে ছুঁড়ে হো হো করে হেসে ওঠে দোরজি।

—বাব্বাঃ, এর মধ্যেই সাতপাকের বউ! গাঁয়ের মধ্যেই ছিলাম, কাজ ছিলো। রাতের অন্ধকারে যেমন সুরুৎ করে এখানে এসে গেলাম, তেম্‌নি গাঁ থেকেও সরে পড়েছি। ভাগ্যিস লালবাঁদরগুলো 'শোনে না মন্দ, দেখে না মন্দ'—তথাগতের তিন বাঁদরের দুটোর মতো।

তেকনকে উদ্দেশ্য করে কায়া বলে,—শোনো এবার, কি কি জেনে এসেছেন উনি।

দোরজি তেকনকে বলে,—আমায় বকাবকি করবে না ত ঠাকুরদা!

হেসে তেকন বলে,—আরে না না। উলটে তোর সাহসকে বলিহারি যাই নাতি। আচ্ছা, কাজে আট্‌কে পড়ার সাথে কি তাতা-হো-র নতুন সাঁকোর কোনো সম্পর্ক আছে?

—আছে।

বলে গম্ভীর হয়ে যায় দোরজি। কাঁধের সেই থলেটাতে পায়ের ঠোকর দিয়ে বলে, এখন যাচ্ছি আমি দলের আর সবাইকে খুঁজতে। কাল রাত্তিরে শ'খানেক গেরিলা আমরা

গিয়ে গুঁড়ো করে উড়িয়ে দেব ওদের পুল।

নাভিশ্বাস ওঠে কায়ার। কষ্টে বলে,—খুন করে ফেলবে তোমাদের সব কটাকে।

—সে আশঙ্কা ত আছেই। লড়াইয়ে নাম্‌লে থাক্‌বেও।

তেকন একটু ভেবে চিন্তে বলে,—কায়ার কথা ফেল্‌না নয়। আর এটা চীনেদের প্যাঁচও হতে পারে—তোমাদের মারলো, আবার নতুন করে পুল বাঁধ্‌তে লেগে গেল।

—লাগুক না। আমরা না থাকি, অন্য ছেলেরা আবার উড়িয়ে দেবে। এমনি বার বার। যতদিন না শয়তানেরা ঝাড়েবংশে ভাগে এখান থেকে।

—তাই বলে তুমি কেন? তুমি না আমায় ভালোবাসো, আমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না?

—ও কথা বলতে নেই লক্ষ্মীটি। আমার মন ত তুমি জানো। তাই বলে যুদ্ধের সময় শত্রুর মুখোমুখি না হয়ে তোমার পেছনে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাব, এই কি তুমি চাও?

দোরজির গলার স্বর বিষণ্ণ, ধীর, মৃদু। কিন্তু প্রেমে ভরা। চোয়াল দুটো দৃঢ় প্রতিজ্ঞায় কঠিন যদিও।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কায়ার মুখের দিকে তাকায় তেকন। সে মুখ থেকে প্রাণের শেষ রক্তবিন্দুও যেন মুছে গেছে, এমনি ফ্যাকাসে। তেকন ভাবে, বুড়োকে ভুলে আছে ওরা, দেখা যাক এই বুড়োই কোনো কাজে লাগে কিনা। দেখা যাক্‌ দোরজির বরফজমা বুকে প্রাণপ্রবাহ বওয়ানো যায় কি না।

কায়া বলে,—এখুনি যাবে তুমি?

দোরজি দোরের দিকে এগোয়।—আমার জন্যে অপেক্ষা করে আছে দলের আর সবাই।

তেকন বলে,—দাঁড়াও। তার মাথায় মৎলবটা দানা বেঁধেছে, সে জানে আবেদন নিবেদন বৃথা। দোরজির সাথে চীনে কর্ণেলের যেন মিল আছে কোথাও। দুজনারই বয়স অল্প, দুজনাই নিজের নিজের কাজে প্রাণমন ঢেলে দিয়েছে। আহা, এরা করুণার পাত্র। কিন্তু ঐ যে কায়া, এক কোণে বসে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলছে, ওর জন্য সমবেদনায় বুক ভরে ওঠে তেকনের।

—ঝড় বাদলে বাইরে যাচ্ছ, একটু গরম কিছু খেয়ে যাও।

খুঁজেপেতে ঘরের কোনা থেকে আর একটা বাটী যোগাড় করে নিয়ে এসে তাতে চা ঢালে তেকন,—গরম চা। দোরজি আঙুল ডুবিয়ে একটু নেড়ে নিয়ে এক চুমুকে শেষ করে চায়ের পাত্র।

—ওহে দোরজি, শোন, শোন। একটা গল্প শুনে যাও।

—চট্‌ করে বলে ফেল ঠাকুরদা, ভোরের আগেই লম্বা পাড়ি দিতে হবে।

ক্লান্ত মনে হয় নিজেকে তেকনের। বুকে হাত ঘসে ঠাণ্ডা নিবারণ করে। তারপর বেশ স্পষ্ট গলায় সুরু করে—

—ঢের দিন আগেকার কথা। এক যে ছিল, এই তোমার মতো, যুবক। যেমন পণ্ডিত, তেমনি অহঙ্কারী। ভারী মাতব্বর মনে করত সে নিজেকে। কিন্তু সেও প্রেমে পড়ল, ভারী সুন্দরী এক মেয়ের সাথে, যে আবার ছেলেটাকে সমান ভালোবাসত। দেখে শুনে অন্তত তাই মনে হোতো।

বাধা দিয়ে কায়া বলে,—চিনতেন সে মেয়েকে, ঠাকুরদা?

—আরে হ্যাঁ—সে যেন তুই! অন্তত তোর মতোই সুন্দরী। তোকে দেখলেই আমার

তার কথা মনে হয়। ওরা দুটিতে ফিস্‌ফাস্‌ গুজ্‌গাজ করে জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে। কবে বিয়ে হবে, কেমন মোটাসোটা বাচ্চা হবে, এইসব। তারপর একদিন হোলো কি, কোথাকার কে এক বণিকপুত্র, তারই সাথে পালালো মেয়েটা। তার প্রণয়ী হতাশায় আর রাগে মাথা কুট্‌তে লাগল। ক্রমে মন বাঁধল সে প্রতিহিংসার আগুনে। কোথায় গেল ভালোবাসা, আর কোথায় গেল স্বপ্ন! শোধ নেবার জেদ তুষানলের মতো ধিকিধিকি জ্বলতে লাগলো তার বুকে।

দোরজি বলে,—ভারী ত গল্প—ঝট্‌পট্‌ শেষ করো ঠাকুরদা—

—প্রণয়ীটি বেরুলো পলাতকদের খোঁজে। ধরে ফেলল এক মাঠের মধ্যে তাঁবুর ভেতর। তারপর আর কি—মেয়েটার চোখের সামনেই কচুকাটা করলো সে ছোঁড়াকে, রাগে আর হিংসায় সে তখন জ্ঞানশূন্য—।

কায়া শিউরে উঠে সুধোয়,—আর মেয়েটা? আগের প্রণয়ীর সাথে ফিরে গেল সে?

কড় কড় করে বাজ পড়লো একটা। ঝিলিক দিয়ে উঠ্‌লো চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ। শুক্‌নো চোখের পাতা ঘসে তেকন বললে,—না, মেয়েটা আবার পালালো। ভূত দেখলে মানুষ যেমন ভয়ে পালায়, তেমনি করে। আগের প্রণয়ী তাকে আর জ্যান্ত দেখতেই পায় নি—পালিয়ে গিয়ে মেয়েটা শোকে দুঃখে মরে গেল।

—যুবকটাও মরল?

—না সে কেমন উদাস পারা হয়ে লোকসমাজের বার হয়ে গেল। কেউ দেখতে পারত না তাকে। কিন্তু সে যে মরে বেঁচে যাবে, তাও তার কপালে ঘট্‌ল না। বেঁচে থেকেই নরকযন্ত্রণা ভোগ করতে হোলো তাকে। জীবনের বিনিময়ে জীবন জিইয়ে রাখতে হবে, তিয়েন শানের তপোবনে গিয়ে সাধনায় মেতে গেল সে। সে তপস্যা সংশয়ের অন্ধকারের পারে আলোকরেখা দেখতে পাবার তপস্যা। কৃচ্ছ্রসাধন একদিন শেষ হোলো তার। তপোবন থেকে ফেরবার সময় সাথে নিয়ে এলো একটি চারাগাছ, যে গাঁয়ে মেয়েটির বাড়ী ছিলো, শেষ পর্যন্ত সেইখানে ফিরে এসে চারাগাছটি পুঁতে দিলো। তারপর থেকে চোখের জলে ভিজিয়ে সর্বশরীরের উত্তাপ দিয়ে ঘিরে, মা যেমন শিশুটিকে পরিচর্যা করেন তেমনি করে বড়ো করে তুলল গাছটি। একদিন সেই শিশুগাছ বিরাট মহীরুহ হয়ে দাঁড়ালো। সেই সুবিশাল দেবদারু হোলো তার তপস্যার ফল।

বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কায়া বললো,—এই দেবদারু, মানে আপনি—মানে আপনার সেই গাছ এইটে?

ঘোঁৎ করে নিশ্বাস ফেলে দোরজি বললো,—যত্তো সব গাঁজাখুরি গল্প! বলি আমাকে এসব কথা কওয়ার মানে কি?

তেকন বলে চলল,—সেই যে যুবক—প্রেমের প্রকৃতি সে আদপেই জানতে পারে নি। তার মন বিষিয়ে ছিলো বিবাগে আর বিদ্বেষে। নিজেরে মনকে নিজেই মেরে ফেলেছিলো সে। দোরজি গোজে—সেই এক ভুল তুমি করতে যাচ্ছো। বুকের কপাট বন্ধ করে রেখে ভালোবাসাকে বাইরে থেকে ফিরিয়ে দিয়ো না।

দোরজি উদ্ধত ভাবে বলে,—উল্‌টে যুবকটিকেই তারিফ করি আমি। সে ঠিক করে-ছিলো। আমি হলে আমিও তাই করতুম।

কায়া ঘেঁসে এসে দোরজির দেহসংলগ্ন হয়। বলে,—আমাকে ফেলে যেতে পাবে না তুমি। সাথে নাও আমাকে।

দৃঢ় হাতে কায়াকে সরিয়ে দেয় দোরজি। ডিনামাইটের থলেটা কাঁধে ফেলে। চলতে চলতে বলে,—আমি যাই। ঠাকুরদা, কায়াকে দেখো, আমার হয়ে।

—তোর হয়ে কেন রে, আমার বলেই না হয় দেখ্‌লুম।

কুতুহলী চোখে দোরজির নিষ্ক্রমণ দেখে তেকন। দোরজির মুখভরা বিন্দু বিন্দু ঘাম, চোখের মণি নিষ্প্রভ, বিড় বিড় করে বক্‌তে বক্‌তে দরজা পর্যন্ত গিয়েই ঠাস্‌ করে চিৎ হয়ে পড়ে গেল, কাঁধের থলে ছট্‌কে গিয়ে পড়ল দূরে। এক গড়ান দিয়ে উপুড় হয়েই অজ্ঞান হয়ে গেল সে।

এক ছুটে কায়া তার পাশে গিয়ে হাঁটু পেতে বস্‌ল। চোখ বন্ধ, গভীর ঘুমে অচেতন। দোরজির গালে চিম্‌টি কেটে পাগলিনীর মতো তাঁকে ঝাঁকাতে লাগলো কায়া।

—ওর অসুখ করেছে, মরে যাবে ও—

—মরবে নারে, অসুখও করে নি। ঘুমিয়ে পড়েছে। লম্বা ঘুম ঘুমোবে এখন ঘণ্টা কতক ধরে। তোর ভয় নেই, কোনো ক্ষতি হবে না।

আয়ত বিস্ময়ে কায়ার চোখ ড্যাবডেবে হয়ে ওঠে,—আপনি? আপনিই করেছেন এইরকম?

—হ্যাঁরে পাগ্‌লি। চায়ে একটুখানি ঘুমের গুঁড়ো গুলে দিয়েছি।

—কিন্তু কেন?

—ভরসা রাখ্‌ আমার ওপর। ভুল বুঝিস্‌ নি। দেখ্‌লি ত, সদুপদেশ ওর কানেই গেল না। এখন তোরই জিম্মায় ওকে সরাতে হবে এখান থেকে। গোপন করে রাখতে হবে একটা রাত। পাহাড়ে ওর বন্ধুরা আছে, সেইখানে যাবি, তদারক তারাই করবে। পারবি নিয়ে যেতে।

—কিন্তু জ্ঞান ফিরলে মারমুখী হয়ে উঠ্‌বে যে!

—তা উঠুক, কিন্তু চৈতন্য, মানে সুবুদ্ধি ফিরতেও ত পারে। নে এখন, দেরী করিস্‌ নে, হাত লাগা।

বিহ্বলের মতো কায়া ওঠে। দু'জনা ধরাধরি করে সংজ্ঞাহীন দেহটা রাস্তায় টেনে বার করে। ওই বিরাট লাস ষণ্ডামার্কা বড়ো ইয়াকটার পিঠে চাপাতে সে কি কম খিদ্‌মৎ। দাঁড় দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে শক্ত বাঁধনে বাঁধে।

ঝোড়ো হাওয়া আচমকা দেবদারুর মাথায় নাড়া দিয়ে যায়, দূরে কড়্‌ কড়্‌ করে বাজ পড়ে। কায়া শিউরে ওঠে।

রওনা হবার আগে কায়া শান্ত গলায় সুধোয়,—গল্পটা আপনি ওকে দেরী করিয়ে দেবার জন্যেই বলছিলেন, না? সব গল্পটাই কি বানানো?

তেকন কাঁধ ঝাড়া দিয়ে বলে,—অতশত জানিনে কিছু—সত্যি হলেও হতে পারে। এখন রওনা দে ত। তথাগতের কৃপায় যেন নিরাপদে পেঁাছে যাস্‌ তোরা। তোর ভালো-বাসা ওকে ভালোবাসতে শেখাক, ভগবান যেন এই আশীর্বাদ করেন।

—আপনি যাবেন না আমাদের সাথে?

—আমাকে যে থাক্‌তে হবে। অসুর দলনের তপস্যায় বসতে হবে আমাকে।

ইয়াকের পিঠে হাত বুলিয়ে রওনা করে দেয় তাদের। উঁচুনীচু পাহাড়ের চূড়ার আড়ালে অদৃশ্য হয়ে যায় আস্তে আস্তে দোরজি কায়া ইয়াকের দল। ওঁৎ পেতে বসে থাকা পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার সহসা আত্মপ্রকাশ করে, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় দিগন্ত।

তেকন ঠায় দাঁড়িয়ে সার্থবাহের ঘণ্টাধ্বনির শেষ টুংটাংটি শোনে, তারপর ফিরে আসে বেদীমূলে। গাছের চূড়ায় ডালেদের সে কি দাপাদাপি, অশান্ত হয়ে উঠেছে ওরা। বাজ পড়ছে অনবরত, গিরিসঙ্কট মুহুর্মুহু কেঁপে কেঁপে উঠছে। সজোরে বৃষ্টির চড়বড়ে ফোঁটা এসে আঘাত করে তেকনের কপালে।

ডিনামাইটের থলে খুলে ফেলে কাজে লেগে যায় তেকন। সে অনেকবার দেখেছে চীনেদের এ কাজ করতে। তবে বয়স হয়েছে ঢের, হাত কাঁপে, আঙুল স্বচ্ছন্দে চলে না।

কাজ শেষ হয়ে গেল যখন, তখন ভোর হতে আর দেরী নেই। এইবার দিয়ে দু'বার চকমকি ঠুকে ধ্বনি জ্বালালো তেকন। হাঁটু ভাঁজ করে প্রশান্ত মনে প্রার্থনায় বসল।

প্রার্থনা শেষে, মহাদ্রুম দেবদারুর কাছে নতশিরে নিবেদন করলো,—ক্ষমা কোরো বন্ধু, আমাদের দু'জনকেই ক্ষমা কোরো।

ভোর হয়ে গেছে। একখানা যবের রুটি চিবিয়ে নিলো তেকন। খিদে পায়নি, তবুও। কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে বেদীতে জেড়াসন হয়ে বসল। সম্মুখে আরো একটি দীর্ঘ দিন। কাটবে কেমন করে যেন তাই ভাবতে লাগল।

বৃষ্টির জলে ভিজে উঠলো দেহ, ভ্রূক্ষেপ নেই। মুদিত চোখ, অবনত মাথা। কানে আসতে লাগলো তাতা-হো-র অশ্রান্ত জলকল্লোল। আজকে কি বলছে নদী, ভাবতে চেষ্টা করে তেকন। নদীপথ, গিরিকন্দর, কুয়াশার আস্তরণে নিশ্ছিদ্র হয়ে ঢাকা, কিন্তু জলরাশির ক্ষুব্ধ গর্জন দিক্ প্রকম্পিত করে জাগছে। নদী যেন ক্ষিপ্তা, ক্রুদ্ধা, বেদনা অধীরা। প্রকৃতির আদরের দুলালী যেন দুঃসহ প্রসবব্যথায় রোরুদ্যমানা।

মুদিত চোখে অপেক্ষা করে থাকে তেকন। ঘুম নেই, বুড়োমানুষের আবার ঘুম!

খানিক বাদে চীনেদের একখানা টহলদার জীপ এসে থামে কাছাকাছি। লাফ দিয়ে নেমে আসে পলটনের একজনা।

সেই বিরাট দেবদারুর চিহ্নমাত্র নেই আর। যেখানে গাছ ছিলো, সেখানে অতল গহ্বর। কঠিন পাথরে শেকড়ের ছেঁড়া টুকরো তখনো লেগে। পোড়া কাঠের গন্ধ নাকে আসে।

—এই বুড়ো—গাছ কি হল?

আকাশের দিকে আঙুল তুলে তেকন বলে,—অভিশাপ। আগুনবাজ পড়েছিল রাত্রে। আওয়াজ পাওনি?

ভীতু চোখে মুখে কপালে হাত বুলোয় চীনেটা। উপুড় হয়ে দেখে গিরিসঙ্কটের নীচ পর্যন্ত, যতদূর চোখ চলে। সঙ্গীদের ডেকে বলে,—দ্যাখ্ দ্যাখ্, দেখে যা। সেই রাক্ষুসে গাছটা বাজে পুড়ে নদীর মধ্যে পড়ে গেছে রাতে। জলের টানে ভেসে গিয়ে দিয়েছে সাঁকোটাকে গুঁড়িয়ে।

তেকন নিঃশব্দে মালা জপ করে। সৈন্যটা আবিষ্কারের উল্লাসে মুখর। বলে,—আরে ও বুড়ো শুনছো? তোমার গাছটা শুধু নিজেই ভেঙে পড়েনি, নদী বেয়ে গিয়ে নতুন পুলটার খিলেন পাটাতন সব গুঁড়িয়ে দিয়েছে। যেখানে কাল দেখেছিলে সাঁকো, আজ দেখ গে সব খাঁ খাঁ করছে। লোপাট। বেমালুম।

পরম প্রশান্তিতে ভরে ওঠে তেকনের দু'চোখ। কোন অপার্থিব স্বর্গের আলোর অঞ্জন লেগেছে দৃষ্টিতে, চীনে ফৌজি সইতে পারে না, ভয়ে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তেকন বলে,—শুনছি—শুনলুম। কর্নেলকে আমার আদাব দিয়ো, দৈবদুর্ঘটনায় মানুষের হাত

কোথা, বোলো তাকে।

ওরা চলে গেলে পোড়াগাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে তেকন। বৃষ্টি পড়ার অবধি নেই, তাতা-হো-র প্রমত্তভাষ মিষ্টিগানের সুরের মতো কানে লাগে, বুড়োহাড়ে যৌবন সঞ্চার হয় সে গানের মাদকতায়।

কান্নার সাথে সুদূর অতীতের পট থেকে আরো একজনার প্রণয়ভীরু অথচ আকুল চোখ দুটি মনে পড়ে। *

* Hal. G. Everts এর Thundergorge গল্পের ছায়া আছে।

ঘাম

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

অধীর হয়ে হাত ঘড়ির দিকে তাকাল বিজন। পাঁচটা পঁয়ত্রিশ। এই আসছি বলে, আধ ঘণ্টারও বেশি হয়ে গেল সুনন্দা ওপাশের অমূল্যবাবুদের ফ্ল্যাটে গেছে। কিন্তু এখন পর্যন্ত ওর দেখা নেই। এরপরে কি আর কারো বাড়িতে চা খেতে যাওয়া যায়? তাছাড়া যেতেও তো সময় লাগবে? এই দীনেন্দ্র স্ট্রীট থেকে টালিগঞ্জের চারু এভেন্যু কি সোজা রাস্তা? তারপর মাথা খুঁড়লেও এখন এই রবিবারের বিকালে একখানা ট্যাক্সি মিলবে না। বাসের ভিড় ঠেলে উঠে দুহাতে মাথার ওপরের রড ধরে এঁকেবেঁকে সার্কাসের নানারকম কসরৎ করতে করতে তবে গিয়ে পেঁছিতে হবে।

কিন্তু যত কষ্টই হোক না গেলে চলবে না। অত করে বলে দিয়েছে যখন অনিমেষ— বিশেষ করে ওর স্ত্রী শুভ্রা যখন অমন অনুরোধ করেছে বিজনরা যদি না যায় খুবই খারাপ দেখাবে। কিন্তু সন্ধ্যাবেলার নিমন্ত্রণে রাত দুপুরে গিয়ে হাজির হলেই কি খুব ভালো দেখায়? সুনন্দার যদি কিছুমাত্র কাণ্ডজ্ঞান থাকে।

বিজন আরো পাঁচ মিনিট দেখল। পাঁচ মিনিট পাঁচটি ঘণ্টার মত মনে হতে লাগল। আর একবার সেকেন্ডের কাঁটা ঘুরে আসতে না আসতে বিজন চেঁচিয়ে উঠল,—রাজার মা!

বুড়ী ঝি উপুড় হয়ে বসে ভিজে ন্যাতা দিয়ে ঘরের মেজ পুঁছে নিচ্ছিল চোখ তুলে তাকাল,—কী বলছ দাদাবাবু?

বিজন ধমকের সুরে বলল,—তোমাকে এই অবেলায় ঘর পুছতে কে বলেছে?

—বউদি বলে গেছে দাদাবাবু। রোজই এই সময় ঘর পুছি।

বিজন বললে,—না, পুছতে হবে না। যাও ওই তিন নম্বর ফ্ল্যাট থেকে তোমার বউদিকে ডেকে নিয়ে এসো তো। যাও এক্ষুণি ডেকে নিয়ে এসো।

ন্যাতা আর জলের বালতি রেখে রাজার মা দোর খুলে বেরোল। নির্বিকারভাবে পান চিবুচ্ছে তো চিবুচ্ছেই। বয়স ষাটের কছাকাছি রাজার মার। বছর তিনেক ধরে বিজনদের কাছে আছে। বকুনি দুজনের কাছেই খায়। কিন্তু তেমন কোন ভ্রূক্ষেপ নেই। ধৈর্য আছে। বোধহয় অভিজ্ঞতাও আছে। রাজার মা বোধহয় ভাবে সংসারে যারা বকবার তারা বকবে আর যারা কাজ করবার তারা কাজ করে যাবে। রাগের সময় এই কুরূপা ন্যুব্জা নারীদেহের ভগ্নাবশেষ বিজনের মনে অস্বস্তির মাত্রা আরো বাড়িয়ে দেয়। সুনন্দাও ওর সঙ্গে কম বকাবকি করে না। ওর অপরিচ্ছন্নতা নিয়ে অবাধ্যতা নিয়ে মাঝে মাঝে চেঁচামেচি করে হুলস্থূল বাঁধিয়ে দেয়। কাজ ছেড়ে চলে যেতেও বলে। কিন্তু রাজার মা কাজও ছাড়ে না চলেও যায় না। জানে যে তাকে ছাড়া বিজনদের চলবে না। রাগ পড়ে গেলে দুজনেই ওরা রাজার মাকে ফের সাধাসাধি সুরু করবে।

একটুবাদে সুনন্দা ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল। একা নয়, কোলে একটি বাচ্চা। বছর খানেকের একটি ছেলে। যেমন কালো তেমনি রোগা। পাশের ফ্ল্যাটের অমূল্য নিয়োগীর কনিষ্ঠ সন্তান।

—অত চেঁচামেচি শুরু করেছ যে! বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে? সুনন্দা পাশের

ঘর থেকে খোলা দরজা দিয়ে স্বামীর সামনে এসে দাঁড়াল।

বিজন লক্ষ্য করল স্ত্রীর মুখে ডাকাত পড়বার মত কোন উদ্বেগ কি আশঙ্কা নেই। ওর মুখে হাসি। হাসলে সবাইকেই ভালো দেখায়। সুনন্দার দাঁতের গড়ন সুন্দর বলে আরো যেন বেশি সুন্দর দেখায় ওকে। বয়স বছর চাল্লিশেক হতে চলল সুনন্দার। কিন্তু দেখে মনে হয় যেন তিরিশও পার হয়নি। দীর্ঘ দোহারা চেহারা। মাথায় প্রায় বিজনের সমান সমান। বিজন সাড়ে পাঁচ। সুনন্দা পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি। পাশাপাশি হাঁটলে সুনন্দাকে এক ইঞ্চি ছোট দেখায় না বরং বড়ই দেখায়। কিন্তু এত দৈর্ঘ্য সত্ত্বেও ওর দেহের গড়ন ভালো বলে স্ত্রীকে বিজনের বেমানান লাগে না। গায়ের রঙে, নাক চোখের গড়নে সুনন্দা দেখতে বেশ সুশ্রী। প্রথম প্রথম বন্ধুরা বিজনকে বলত,—তুমি তো রীতিমত সুন্দরীভার্য।

তাদের গলায় ঈর্ষার আমেজ থাকত।

বন্ধুদের চোখ থেকে সেই মোহ আর লুব্ধতা এখনো একেবারে মিলিয়ে যায় নি।

কিন্তু সুনন্দা যাকে কোলে নিয়ে এই মুহূর্তে গণেশজননী সেজেছে তাকে কিন্তু ওর কোলে একেবারেই মানায় নি। বাচ্চাটি বেশ কদাকার। অমূল্যবাবুর সবগুলি ছেলেমেয়েই তাই। সবচেয়ে শেষেরটি কুরূপতায় যেন সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। কিন্তু এইটির ওপরই সুনন্দার যেন সবচেয়ে বেশি পক্ষপাত। আসলে একটি মাংসপিণ্ডকে বুকে চেপে ধরে সুনন্দা আদর করতে চায়। তার আকার-প্রকার যেমনই হোক না কেন।

বিজনের মনে হল সুনন্দার এখনকার হাসি দেখলে তার কোন বন্ধু অপলক হয়ে থাকত না। কারণ এই মুহূর্তে বিজনের স্ত্রীর হাসি কোন স্ত্রীর হাসি নয়, মায়ের হাসি। বাৎসল্যরসে বিগলিত।

সুনন্দা বলল,—হল কী তোমার? একেবারে শিবনেত্র হয়ে রইলে যে।

বিজন বলল,—শিব হয়ে গণেশজননীকে দেখছি।

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে বলল,—আহা! তারপর সেই শাবকটির মুখের কাছে মুখ নিয়ে সুনন্দা বলতে লাগল,—শুনছ বিণ্টু লোকে কী বলে শুনছ? তুমি নাকি গণেশ? কেন তুমি গণেশ হবে শুনি? তোমার কি হাতির মত মাথা? তোমার কি শুঁড় আছে? দেখ কিরকম হাসছে দেখ। থাক থাক আর হাসতে হবে না তোমাকে। একেবারে দেখন হাসি হয়ে উঠেছ, না?

বিজন দেখল সুনন্দার সুডৌল সুগৌর মুখখানা ওই কদাকার মাংস পিণ্ডটির ওপর নেমে এল। নাক ঘষতে লাগল কপালে। ঠোঁটে ঠোঁট ঘষল। মনে হল দাঁত ঘষার শব্দও যেন শুনতে পেল বিজন। তীব্র যৌন আবেগে, ক্রোধে আর গভীর বাৎসল্যে প্রায় একই রকম দাঁত ঘষে সুনন্দা। বিজন লক্ষ্য করেছে।

আরো একজন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব লক্ষ্য করছিল। মাত্র গুটি কত দাঁতে পান চিবুতে চিবুতে উপভোগ করছিল এই অপরূপ বাৎসল্যের দৃশ্য।

রাজার মা সুনন্দার আরো কাছে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। হেসে বলল,—এত সখ তোমার ছেলের। আহা একটি বাচ্চা যদি তোমার কোলে আসত! তোমাকে অত করে বললাম চল যাই আমার সঙ্গে কাঁকুড়গাছির বুড়ো শিবের চরণে বাবার কাছে যে যা মানৎ করে তাই ফলে। একটি ফল দিয়ে এসে মনের মত ফল পাবে বউদি।

সুনন্দা লজ্জিত হয়ে বলল,—থাক থাক হয়েছে। তোমার আর ফল ফল করতে

হবে না।

রাজার মা বলল,—তাতো হবে না বুঝলুম। কিন্তু এ তোমার হল কী বউদি। ঘামে যে একেবারে নেয়ে উঠেছ। এই কার্ত্তিক মাসের দিনে এত ঘাম।

স্ত্রীর স্বেদাক্ত শরীর বিজনও লক্ষ্য করল। লক্ষ্য করে একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

সুনন্দা লজ্জিতভাবে হাসল। স্বামীর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ঝিকে বলল, —আচ্ছা এক আপদ হয়েছে। বাচ্চাটাচ্চা কাউকে কোলে নিলেই আমার এমনি করে ঘাম ছোটে।

নিজের দেহের দিকে তাকাল একবার সুনন্দা, কোলের বাচ্চাটির দিকে তাকাল তারপর ফের একটু অপ্রতিভ ভঙ্গিতে হেসে বলল,—এ এক রোগ। যাই ওকে ওর মার কাছে রেখে আসি।

কিন্তু এই অস্বাভাবিক ঘামকে যে সত্যিই আপদ কি রোগ ব্যাধি বলে মনে করে সুনন্দা তা ওর কথার ভঙ্গিতে মনে হল না। কী অপার্থিব হাসিতেই না ওর ঠোঁট দুটি ফের রঞ্জিত হয়ে উঠল।

সুনন্দা স্বামীর দিকে চেয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে বলল,—তুমি আর একটু বোসো লক্ষ্মীটি। আমি ওকে রেখে এক্ষুনি আসছি।

বিজন হঠাৎ তিক্ত, তীব্র, কঠিন, স্বরে বলে উঠল,—আর আসতে হবে না।

সুনন্দা হঠাৎ থমকে থেমে দাঁড়াল। ভ্রূ কুঁচকে বলল,—তার মানে?

বিজন বলল,—মানে আবার কি। অমূল্যবাবুদের ঘরে যাও। গিয়ে ফের বিন্টু পিন্টু মিন্টু রিন্টুদের আদর সোহাগ করতে বসে যাও। ছটা বাজে। কারো বাড়িতে চায়ের নিমন্ত্রণ রাখতে যাওয়ার সময় আর নেই। এখনো কাপড় ছাড়বার সময় পেলে না তুমি। আদর সোহাগ নিয়েই আছ। এরপর কখন বা তৈরি হবে। কখন বা যাবে। যেতেও তো ঘণ্টাখানেক লেগে যাবে।

সুনন্দা বলল,—সে আমি বুঝব। তৈরি হতে আমার পাঁচ মিনিটের বেশি লাগবে না। আমি কি তোমার মত? দাড়ি কামাতেই দেড় ঘণ্টা?

বিন্টুকে রেখে আসতে গেল সুনন্দা। গিয়ে আর দেরি করল না। দুতিন মিনিটের মধ্যেই ফিরে এল।

বাইরে বেরোবার জন্যে তৈরি হয়ে বিজন এতক্ষণ খাড়া চেয়ারটায় বসে কথা বলছিল, কিন্তু স্ত্রী ঘর থেকে বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে সে গরদের পাঞ্জাবিটা খুলে চেয়ারের পিঠে রেখে দিল তারপর নেমে এসে নিচু ইজিচেয়ারটায় গা এলিয়ে দিয়ে চুরুট ধরাল।

সুনন্দা ফিরে এসে বলল,—একি তুমি জামাটামা সব ছেড়ে ফেললে যে।

বিজন বলল,—কী হবে আর গিয়ে? রাত দুপুরে চায়ের নিমন্ত্রণে গিয়ে লাভ কী।

সুনন্দা বলল,—সবে তো সন্ধ্যা। এখনই তোমার রাত দুপুর হয়ে গেল? তোমার রাগের কারণ আমি জানি।

—জানো! কী বলতো দেখি।

—বলে আর লাভ কী।

সুনন্দা পাশের ঘরে শাড়ি বদলাতে যাচ্ছিল, বিজন বাধা দিয়ে বলল,—নন্দা শুনে যাও। আমার কথার জবাব দিয়ে যাও।

সুনন্দা বলল,—আসছি। আমি তো পালিয়ে কোথাও যাচ্ছিনে। আচ্ছা, মাঝে মাঝে তোমার কী হয় বলতো দেখি। কারো ছেলে মেয়েকে কোলে করতে দেখলে তুমি যেন

একেবারে উন্মাদ হয়ে যাও। তোমার দুটো চোখ হিংসেয় জ্বল জ্বল করতে থাকে! আমাদের ঘরে কেউ আসেনি, আসেনি। তাই বলে পৃথিবীতে আর কারো ছেলেমেয়ে কি থাকবে না? কি তাদের কাউকে আমি একটু আদর আহ্লাদ করতে পারব না? এ কি হিংসুটে স্বভাব তোমার?

ভিজে ন্যাতা বুলিয়ে বুলিয়ে রাজার মা তখনো মেঝে পরিষ্কার করছিল হঠাৎ সে ফোঁড়ন কাটল, ঠিক বলেছ বউদি, ভগবান মন বুঝেই ধন দেন তো।

বিজন সোজা হয়ে উঠে বসল, তারপর তারস্বরে চীৎকার করে উঠল,—চুপ! তোমার আর ঘর পুছতে হবে না। যাও এ ঘর থেকে। বেরিয়ে যাও।

জলের বালতি হাতে রাজার মা উঠে দাঁড়ালো। বিড় বিড় করে বলতে লাগল, এ কী কাণ্ড রে বাবা। এমন তো কোথাও দেখিনি। কথায় কথায় মারতে ওঠে, এ কোন ধারার ভদ্দরনোক।

রাজার মা সামনে থেকে সরে গেলে সুনন্দা তার জায়গায় এসে দাঁড়াল। একমুহূর্ত চুপ করে স্বামীর দিকে তাকিয়ে থেকে বলল,—তোমার কী হয়েছে বলতো!

বিজন বলল,—আমার কিছু হয় নি। হঠাৎ তোমার মনেই একটু বেশিমাত্রায় বাৎসল্যের উদয় হয়েছে।

সুনন্দা সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না। একটু বাদে আস্তে আস্তে বলল,—যদি হয়ে থাকে সেটা কি খুব দোষের? আমাদের যা বয়েস—

বিজন বলল,—থাক থাক আর বয়েস বয়েস কোরো না। বয়েসের কথা কি তোমার সব সময় মনে থাকে? আড্ডা দেওয়ার সময় সাজসজ্জার সময় থাকে মনে?

—তার মানে?

নিজের কথার টীকা করবার ঝুঁকি নিল না বিজন। বরং আগের প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া নিরাপদ মনে করে বলল,—আমাদের যা বয়েস তাতে বাৎসল্য আসাটা দোষের নয় কিন্তু তারও তো একটা স্থানকাল আছে। অমূল্যবাবুর ছেলেমেয়েরা তো আর কোথাও পালিয়ে যাচ্ছে না। ঘুরে এসে তাদের আদর সোহাগ করলেও পারতে।

এবার সুনন্দা ধৈর্য হারিয়ে চেঁচিয়ে উঠল,—কেবল অমূল্যবাবুর ছেলে আর অমূল্য-বাবুর ছেলে। ওরা হয়েছে তোমার দুচোখের বিষ। তোমার ভয়ে কোন একটি ছেলেমেয়ে এ ঘরে ঢুকতে পারে না। তুমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকো আমি কাউকে ডাকিও না, আনিও না। কিন্তু পাড়াশুদ্ধ লোক তোমাকে চেনে। তোমার এই কুচুটে স্বভাব নিয়ে বলাবলি করে। আমি লজ্জায় মরে যাই। আমাদের হয়নি, হয়নি। তাই বলে বিশ্বশুদ্ধু লোক তোমার মত বাঁজা হবে তুমি কি তাই চাও!

বিজন এবার চেয়ার ছেড়ে তীরবেগে উঠে দাঁড়াল। ঘরের দুদিকের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এসে স্ত্রীর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বলল,—না তা চাইনে। কিন্তু তুমি বাঁজা না আমি বাঁজা তা কি ডিসাইডেড হয়ে গেছে?

সুনন্দা একটুকাল স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর অস্ফুটস্বরে বলল,—এ-সব কী বলছ তুমি? ডাক্তার তো বলেনি আমারই দোষ।

বিজন বলল,—ডাক্তার আমাকেও দোষী করেনি। তোমার ধারণা তুমি বুঝি নিখুঁৎ। বেশতো যাচাই করে দেখ না। করেছ কিনা তাই বা কে জানে। এত বন্ধুবান্ধব তোমার?

সুনন্দা তীব্র ক্রোধে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে বলল,—যাও আমার সামনে থেকে সরে যাও।

তোমার মুখ দেখতেও আমার ঘেন্না হয়। তুমি এত ছোট, এত মীন মাইনডেড তুমি! এত পারভারসন তোমার মধ্যে, কোন সুস্থ মেয়ের পক্ষে একঘরে তোমার সঙ্গে বাস করা অসম্ভব।

বিজন বলল,—তুমি তো তাই চাও। এক ঘরে আর বাস করতে চাওনা। বেশ তো, ঘর বদলে, মানুষ বদলে এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখতে পারো এখনো। সে বয়েস তোমার আছে। এখনো অন্তত একটি ডিকেড হাতে আছে তোমার।

সুনন্দা বলল,—এক্সপেরিমেণ্ট যদি করতেই হয় তোমার পরামর্শ নিয়ে করব না। আমি আমার সুবিধে মত পথ বেছে নিতে পারব। তোমাকে সে জন্যে ভাবতে হবে না।

বিজন বলল,—তা জানি। তোমাকে পরামর্শ দেওয়ার লোকের এখন আর অভাব নেই।

সুনন্দা বলল,—এই তোমার স্ত্রী স্বাধীনতার ধারণা। ছিঃ আমার ওপর এই তোমার অগাধ বিশ্বাস! এই তোমার ভালোবাসা। সুনন্দার দুটি চোখ এবার জলে ভরে উঠল। মুখ ফিরিয়ে পাশের ঘরে ঢুকে দোরে খিল দিল সুনন্দা।

আর স্ত্রীর চোখে জল দেখে বিজনের সম্বিৎ ফিরে এল। ছি ছি ছি, কথাটা ওকে বলা ঠিক হয়নি। যদি নিজের দোষেই বন্ধ্যা হয়ে থাকে সুনন্দা সে কথাও কোন দুর্ভাগিনী নারীর মুখের ওপর বলা পরম নির্মমতা।

একজন নয় চার পাঁচজন স্পেশালিষ্টকে দেখিয়েছে বিজন। স্ত্রীকেও পরীক্ষা করিয়েছে, নিজেও পরীক্ষিত হয়েছে। কিন্তু সবাই বলেছেন স্বামী স্ত্রী কারোরই কোন খুঁৎ নেই। তবু সন্তান আসছে না কেন কে জানে। বিজ্ঞান তো আর সব কথাই বলতে পারে না। তাকেও প্রকৃতির খেয়াল মানতে হয়। না কি ডাক্তাররাই বিজনকে স্তোকবাক্যে ভুলিয়েছেন তাই বা কে বলবে। হতে পারে বিজন—হ্যাঁ বিজন নিজেও দায়ী হতে পারে। যদিও তার কোন হেতু নেই। কোনদিন যৌনব্যাধিতে ভোগেনি, কোন অমিতাচার করে নি, নিজের স্ত্রী ছাড়া আর কোন নারীসংসর্গ করেনি, সমানে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলেছে, তবু তার প্রজনন ক্ষমতা না থাকা অসম্ভব নয়। জামাটা ফের গায়ে দিল বিজন। স্ত্রীকে নিয়ে এবার নিমন্ত্রণ রাখতে বেরোবে। ট্যাক্সি পেলে ট্যাক্সিই নেবে। পাওয়াটা হয়তো একেবারে কঠিন হবে না। শ্যামবাজারের মোড় থেকে একটা ট্যাক্সি এখন মিলে যেতেও পারে।

বিজন এগিয়ে গিয়ে রুদ্ধদ্বারে—ঠিক করাঘাত নয়, সস্নেহে টোকা দিতে লাগল। —নন্দা, তৈরি হয়ে নাও। চল এবার অনিমেষদের ওখান থেকে ঘুরে আসি।

প্রথমে খানিকক্ষণ কোন সাড়াই মিলল না। তারপর সুনন্দার বিরক্তিভরা গলা শোনা গেল,—তুমি যাও। আমি যাব না।

বিজন মধুর স্বরে বলল,—সেকি হয় নন্দা? অনিমেষ কী মনে করবে বলতো? ওরা যে দুজনকেই বলেছে? আর একেবারে বিনা উপলক্ষেতো বলেনি। তুমি তো জানো ওদের আজ ম্যারেজ অ্যানিভারসারি। ওরা সে কথা না বললেও তারিখটা তো আমাদের মনে আছে। ওরা রেজিস্ট্রেসনের তারিখটা ধরে। তিনজন সাক্ষীর মধ্যে দুজন তো আমরাই ছিলাম মনে নেই তোমার?

কিন্তু সুনন্দা এসব অবান্তর কোন কথা কানেই তুলল না। একই কথা সে বারবার বলতে লাগল,—তোমার যেতে ইচ্ছে হয় যাও, আমি যাব না। কারো কোন শুভকাজে যাওয়ার অধিকার আমার নেই। কাউকে মুখ দেখাবার মত মুখ আমার নেই। তুমি যাও।

আরো মিনিট পনের স্ত্রীকে সাধাসাধি করে বিজন ক্ষান্ত হল। এই এক দোষ

সুনন্দার। একবার যা 'না' করবে মাথা খুঁড়ে মরলেও বিজন তাকে 'হাঁ' করাতে পারবে না। বড় জেদ সুনন্দার। আর এই জেদ ক্রমে বেড়েই চলেছে। কেউ কেউ ভয় দেখিয়ে বলে আরো বাড়বে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ্যা নারীর আরো কত বিকৃতি আসবে তার ঠিক কি। এই যে ঘরে দোর দিয়েছে সুনন্দা ঝাড়া দুঘণ্টার মধ্যে সে দোর ও আর খুলবে না। পৃথিবীতে যদি ইতিমধ্যে প্রলয়কাণ্ডও ঘটে যায় তবু দরজায় খিল এঁটে ও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মরবে। সুতরাং বিজন এবার দুঘণ্টার মত নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে পড়তে পারে। চলে যেতে পারে যেদিকে দুচোখ যায়। যে পথে মন তাকে টেনে নিয়ে যায় সে পথে পা বাড়াতে বিজনের এখন আর কোন বাধা নেই। তারপর দুঘণ্টা আড়াই ঘণ্টা বাদে তার ভাগ্য যদি ভালো হয় বিজন এসে দেখবে সুনন্দার ঘরের দরজা আপনিই খুলে গেছে। তার গৃহিণী ঘরসংসারের কাজে হাত লাগিয়েছে। আর নসিব মন্দ হলে সারারাত এমনকি পরদিন সকালেও এর জের চলবে।

রাজার মাকে ডেকে সদর বন্ধ করতে বলে বিজন রাস্তায় নেমে পড়ল।

অনিমেষ চৌধুরীদের ওখানে যাবে কি? কিন্তু একা একা যেতে এখন আর ইচ্ছে করছে না। ঝগড়াঝাঁটির ছাপ মনের ওপর তো রয়েইছে মুখেও কি খানিকটা লেগে নেই বিজনের? এই মন নিয়ে এই মুখ নিয়ে লোক-সমাজে তারও যাওয়া এখন অনুচিত। বিশেষ করে কোন উৎসব অনুষ্ঠানের বাড়িতে।

—এই যে স্যার, কোথায় যাচ্ছেন এদিকে?

ছেলেটি পথের মধ্যে একেবারে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল। বিজন একেবারে আত্মমগ্ন ছিল। বহির্জগৎ ছায়াবাজি। অন্তত কয়েকটি মুহূর্তে তা যেন থেকেও নেই। বিজন একটু চমকিত, একটু বা অপ্রস্তুত। এত বিনয়, এত ভক্তি আজকাল বড় একটা দেখা যায় না। ছেলেটি বোধহয় সদ্য গ্রাম থেকে এসেছে। কি কোন মফঃস্বল শহর থেকে।

—স্যার আমাকে চিনতে পারছেন তো?

বিজন বলল,—বাঃ চিনতে পারব না কেন? তুমি তো আমাদের কলেজেরই—। মুখ তো খুবই চেনা চেনা মনে হচ্ছে।

—হ্যাঁ স্যার। আমার নাম প্রদীপ। প্রদীপ মজুমদার। আমাকে অনার্স ক্লাসে দেখেছেন। আমরা এপাড়াতেই উঠে এসেছি। সেদিন আর একটি ছেলে বলছিল প্রফেসর দাসগুপ্ত এই পাড়ায় থাকেন। আচ্ছা স্যার আপনি কি ওই হলদে রঙের ফ্ল্যাট বাড়িটায়—

—হ্যাঁ। তিনতলায়। চার নম্বর ফ্ল্যাট। যেয়ো একদিন।

প্রদীপ খুসি হয়ে বলল,—নিশ্চয়ই যাব স্যার। কোন অসুবিধে হবে না তো বাড়িতে গেলে?

বিজন ছাত্রের পিঠে হাত রেখে হেসে বলল,—বাঃ, অসুবিধা কিসের। যেয়ো, অবশ্যই যেয়ো।

প্রদীপ হেসে বলল,—আপনাকেও একদিন আমাদের বাড়িতে যেতে হবে স্যার। বাবা খুব খুসি হবেন। আমরা কাছেই—ওই মোহনলাল মিত্র স্ট্রীটে—।

—বেশতো, বেশতো। বিজন ফের ওর পিঠে হাত বুলাল। আর পিঠে হাত রেখেই দুপা এক পা করে উত্তরমুখে এগোতে লাগল।

একটু বাদে বিদায় নিল ছেলেটি। বেশ লাগল ওকে। ওকে আর ওর পৃষ্ঠপোষক শুভানুধ্যায়ী ছাত্রবৎসল হিসেবে নিজেকে। সুনন্দা মাঝে মাঝে রাগ করে যাই বলুক

বিজন সন্তানহীন বলে হীনমনা নয়, ক্ষুদ্রচেতা নয়, ছাত্রদের মধ্যে সে পুত্রকে দেখতে জানে। আগে আগে প্রথম বয়সে ছাত্রদের মনে হত ছোটভাইয়ের মত, এখন আস্তে আস্তে তারা ছেলের স্থান নিচ্ছে। মুখে অবশ্য বাবা বাছা বলে ডাকে না বিজন, ডাকতে পারে না। কেমন বাধোবাধো লাগে। কিন্তু যে স্নেহটুকু সে অনুভব করে তা নিখাদ বাৎসল্য। বাৎসল্য ছাড়া কিছু নয়। ক্লাসেও সে জনপ্রিয়। মানে যুবজনপ্রিয়। কলেজে ছাত্রদের কোন অনুষ্ঠান হলে প্রিন্সিপ্যাল বিজনের ওপর ভার দেন। ছোটোখাটো ছাত্র-বিক্ষোভ মিটাবার দায়ও বিজন দাসগুপ্তের। রোলকল করার সময় মাঝে মাঝে এক মিনিটের জন্য থেমে সে ক্লাস ভরতি ছাত্রদের দিকে তাকায়। অধ্যাপনা তার অতীতকাল নিয়ে। কিন্তু যারা অধ্যয়ন করে তারা তো উত্তরকালের। এক পলকের জন্যে থেমে সেই ভাবীকালের দিকে বিজন অপলক হয়ে থাকে। কাল সমুদ্রে তরঙ্গের পরে তরঙ্গ। সব সময় এদের সে বুঝতে পারে না। কখনো কখনো মনে হয় এরা যেন বেশি উদ্ধত, অহংকৃত আর সেই সঙ্গে অবোধ। কিন্তু পরমুহূর্তে মনে হয় যৌবনের এই হয় তো ধর্ম। প্রৌঢ়ের প্ল্যাটফর্ম থেকে যৌবনকে হয়তো এইরকমই দেখায়। তাদের প্রতিটি কথার মধ্যে অহংকারের ঝংকার লাগে। এই উত্তরকালের পক্ষ নিয়ে সমবয়সী কি নিজের চেয়েও বেশি বয়সী সহকর্মীদের সঙ্গে তর্ক করে বিজন। তাঁরা হয়তো ভাবেন যেহেতু বয়সে প্রৌঢ় হলেও তাকে প্রৌঢ় বলে মনে হয় না তাই সে যুবকদের পক্ষ নিয়ে যৌবরাজ্যে স্থায়ী আসন নিতে চায়। যেহেতু সে জৈবিক দিক থেকে আর একটি জেনারেশনের সৃষ্টি করেনি তাই সে যেন এক জেনারেশন পিছনে সরে যেতে চায় না। আসলে তা নয়। পুরাকালের সঙ্গে একালকে আর উত্তরকালকে সে মিলিয়ে দেখতে চায়। এই তিনকালের রাজনীতি, রীতিনীতি সভ্যতা সংস্কৃতি একই সম্পর্কসূত্রে যুক্ত এই তার বলবার কথা।

সহকর্মী বন্ধু অনিমেষ চৌধুরীর সঙ্গেও কি এই নিয়ে কম তর্ক হয় তার। অনিমেষ বিজনের চেয়ে অন্তত পাঁচবছরের ছোট। আধুনিক জীববিজ্ঞানের অধ্যাপক। কিন্তু ভাবনায় ধারণায় ওকে অনেকখানি অনাধুনিক বলে মনে হয় বিজনের। আর বিজ্ঞান? বিজ্ঞান শুধু ওর ক্লাসরুম আর লেবরেটরীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। বিজ্ঞান ওর দৃষ্টিতে নেই, যুক্তিতে নেই, দৈনন্দিন আচার-আচরণে জীবনযাত্রায় নেই। অনিমেষ আর শুভ্রা দুজনেই বিজনদের বন্ধু। বিয়ের পাঁচ বছরের মধ্যে দুটি ছেলেমেয়ের বাপমা হয়ে ওরা বিজনদের ওপর কিঞ্চিৎ সহানুভূতিশীল। সহানুভূতি কি অনুকম্পা অবশ্য বিজন চায় না। কিন্তু বন্ধুত্ব চায়। আর এটুকু জানে এই প্রগাঢ় প্রৌঢ় বয়সেও সেই বন্ধুত্ব ছোটখাটো মতবিরোধ, রুচিবিরোধ এমনকি আদর্শের বিরোধকেও ছাপিয়ে চলে যায়। বন্ধুত্ব নিজেই এক শিল্প, এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। যদিও তার মত উত্তরচল্লিশ অধিকাংশ পুরুষের কাছেই আপদ-বিশেষ, অনাসৃষ্টির তুল্য।

অনিমেষের ওখানে যেতে পারলে বড় ভালো হত। বিজনদের না দেখে ওরা ক্ষুন্ন হবে, দুঃখ পাবে। ওরা তো জানে না অকারণ দাম্পত্যকলহ তাদের যাওয়াটাকে এমন করে ঠেকিয়ে রাখল।

কিন্তু কয়েকবার মহড়া দিয়েও নিজেকে দক্ষিণগামী কোন একটা জনবহুল বাসে ঠেলে তুলতে পারল না বিজন। বড্ড ভিড়। আর একা একা যাওয়ার পক্ষে বড় দীর্ঘ পথ। পনের বছর আগে একাকিত্ব আর এককত্ব গেছে বিজনের। এখন যেন ভাবাই যায় না জীবনের সাতাশ আটাশ বছর বয়স পর্যন্ত সে একা ছিল। মনে হয় যেন জন্মাবধি দাম্পত্যজীবন চলেছে।

স্ত্রী এক অভ্যাস। সন্তান দ্বিতীয় অভ্যাস। অভ্যাস, অভ্যাস ছাড়া আর কি।

কিন্তু না গেলেও একটা ফোন করে দেওয়া দরকার। অন্তত সেইটুকু সৌজন্য অনিমেষ দাবি করতে পারে। ফোন অনিমেষের আছে। বিজনের নেই। কিন্তু সারা পাড়াতেও কোথাও একটি টেলিফোন খুঁজে পাবে না এমন কৈফিয়ৎ বিজন বন্ধুকে কী করে দেবে।

শেষপর্যন্ত বসাক ফার্মেসিরই শরণ নিল বিজন। ডাক্তার এখনো আসেন নি। কাউন্টারের পিছনে উঁচু টুলের ওপর রোগাটে কম্পাউন্ডার বসে আছেন।

বিজনকে দেখে ভদ্রলোক হাসি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন,—এই যে স্যার, আসুন স্যার। বাড়ির সব ভালো তো?

বয়স বেশি নয় রাখালবাবুর। কিন্তু এরই মধ্যে সামনের দুটি দাঁত গেছে। হয়তো সেই জন্যেই হাসিটি একেবারে দেঁতো হাসি নয়।

—হ্যাঁ ভালো। একটা ফোন করব।

রাখালবাবু বললেন,—নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।

ফোনে সরাসরি অনিমেষকেই পাওয়া গেল।

—হ্যালো। অনিমেষ, যেতে পারছিনে ভাই!

অন্যপারে এক নিমেষের স্তব্ধতা।

—কেন কী হল তোমার?

কিছু একটা ঘটেছে নিশ্চয়ই। ধরো না ছোটোখাটো গোছের একটা অঘটন।

—যাক্‌। তোমার গলা শুনে মনে হচ্ছে তেমন কিছু নয়। হয়তো বউদির পান থেকে চুণ খসেছে।

—যা বলেছ। বয়েস হোক তোমাদেরও মাঝে মাঝে খসবে।

—আজকের দিনে ও অভিশাপ আর দিয়োনা বিজন। এমনিতেই ঝড়-ঝঞ্ঝা-বজ্রপাত নিয়ে আছি।

বিজন হেসে বলল,—তাই নাকি? দাম্পত্যজীবনের রীতিই তাই। প্রভাতে মেঘ-ডম্বুর!

—শুধু প্রভাতে কেন ভাই। প্রভাতে মধ্যাহ্নে অপরাহ্নে নিশীথে কখনই বা না? শিগগিরই কিন্তু এসো আর একদিন। আজ ফাঁকি দিলে, আর একদিন কিন্তু আসা চাই। নইলে দারুণ ঝগড়া হয়ে যাবে। তোমার বন্ধুপত্নী এখন হেঁসেলে আছেন। আসতে পারছেন না। ছেড়ে দিচ্ছি। আরে, ধরো ধরো। আমার ছেলে তোমার সঙ্গে কথা বলবে।

—তোমার ছেলে?

—তাইতো শুনি। ছেলের মাতো সেই কথাই বলে।

—তোমার কাকাবাবুর সঙ্গে কথা বলো।

—বিজন বলল,—কাকা না জ্যেঠা?

—আরে দূর। জ্যেঠা আজকাল ছেলেরা হয়। ছেলের বাপজ্যেঠারা ওসব শুনলে কানে আঙুল দেয়। জ্যেঠার চেয়ে কাকাই ভালো। আঙ্কল টম।

বন্ধুর শিশুপুত্রের কলকাকলি শুনল বিজন। বাপের প্রম্পটিংও অবশ্য ফাঁকে ফাঁকে শোনা যাচ্ছিল।

—কাকাবাবু এসো। কাকিমাকে নিয়ে এসো

—নিশ্চয়ই যাব। তুমি যখন বলছ।

প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিজন ফোন ছেড়ে দিল। অনিমেষ আত্মজের মধ্যে একেবারে আত্মহারা হয়ে গেছে। দেখা হলেই ছেলের কথা বলে।

কম্পাউন্ডারকে ফোনের চার্জটা দিয়ে আর একটু কুশল প্রশ্ন,—বাড়ির সব ভালোতো রাখালবাবু?

রাখালবাবুর মুখে ফের সেই বৈদান্তিক হাসি,--ভালো আর কই স্যার। ভালো থাকবার কি জো আছে! এক পাল বাচ্চাকাচ্চা। বাড়ি থেকে অসুখবিসুখ আর যেতে চায় না। আপনার ওসব ঝামেলা নেই স্যার। বেশ আছেন আপনি।

নিঃশব্দে বিনামন্তব্যে বিদায় নিল বিজন। তা ঠিক, কোন ঝামেলা নেই বিজনের। ছেলেমেয়ের সুখও নেই ছেলেমেয়ের অসুখও নেই।

খানিকটা এগিয়ে পার্কের একটি বেঞ্চে এসে বসল বিজন। না, আসনের কোন ভাগীদার নেই। আপাতত এইটুকুই সুখ। ধোঁয়ায় আর কুয়াশায় এত বড় পার্কটা যেন এক বিষণ্ণতার চাদর মুড়ি দিয়ে রয়েছে। নাকি নিজের মনের কালিই বিজন সারা পার্কে ছিটিয়ে দিয়ে বসে আছে। কারণে অকারণে বিজনের মন যেন আজকাল কেন হঠাৎ বড় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। ছোটোখাটো ত্রুটির জন্য গ্লানির পাহাড় বুকের ওপর থেকে কিছুতেই যেন আর নামতে চায় না। সুনন্দাকে ওকথাটা না বলাই ভালো ছিল। স্ত্রী ছাড়া বিজনের আর কে আছে? স্বামী ছাড়া সুনন্দারও কেউ নেই। বোধহয় কেউ আর আসবেও না। মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তারা দুজনে অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকবে। এ সর্তের কোন নড়চড় হবে না। কিন্তু এক এক মুহূর্তে মনে হয় গিঁট ছেঁড়ার জন্যে দুজনেরই পণ যেন প্রাণ পর্যন্ত।

যুগ পালটেছে। বংশরক্ষার জন্য আগেকার মত মানুষ আর পাগল হয় না। রক্ষা না হলে মঠে মন্দিরে গিয়ে মাথা কোটাকুটি করে না। পুত্রেষ্টি যজ্ঞের ধারা বদল হয়েছে। শিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞানের সাহায্য নেয়। যদি না পায় মেনে নেয়। বিজনও মেনে নিয়েছে। মেয়ে বলে সুনন্দার পক্ষে অত সহজে এই সন্তানহীনতাকে মেনে নেওয়া সম্ভব নয় বিজন তা জানে। গোড়ার দিকে এই নিয়ে স্ত্রীর সঙ্গে লঘু হাসি পরিহাসও করেছে বিজন। কৃত্রিম উপায়ে প্রজননের কথা তুলেছে। এ দেশে যদি সে ব্যবস্থা থাকত পরীক্ষা করে দেখা যেত। বলা যায় না এই অপত্যহীনতা কার দোষে। সুনন্দা যদি রাজী থাকে সেই প্রাচীন নিয়োগপ্রথাও প্রয়োগ করে দেখা যায়। বিজনের তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

সুনন্দা বলেছে,—তোমার আপত্তি না থাকাটাই সব কিনা? আমার বুঝি আর রুচি প্রবৃত্তি বলে কিছু নেই? দরকার হয় ওসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা তুমি বাইরে থেকে চালিয়ে এসো। আমার ওসব নিয়ে মাথাব্যথা নেই।

তারপর স্বামীকে জড়িয়ে ধরে তার বুকে মাথা রেখে সুনন্দা বলেছে, যে হবে সে আমাদের দুজনের হবে। একজনের হলে তাতে কি দুজনের মন ভরবে? তুমি বরং আর একজনকে বিয়ে করো। আমি কিছু মনে করব না। যদি ছেলেপুলে হয়—

বিজন হেসে বলেছে,—তিনজনে তা নিয়ে কাড়াকাড়ি করব কী বলো?

তারপর সকৌতুকে পোষ্যপুত্র নেওয়ার প্রস্তাব, অনাথ আশ্রম থেকে কোন পরিত্যক্ত মানবশিশুকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় দান—কৌতুকরসের ভিয়েনে সম্ভব অসম্ভব নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করেছে দুজনে। একজন আর একজনের কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছে ব্যাপারটা মোটেই গুরুতর কিছু নয়। এ নিয়ে কারোরই কোন মাথাব্যথা নেই।

কিন্তু ব্যথাটা তো মাথায় নয়, ব্যথাটা বুকে। তা মাঝে মাঝে নানা ভাবেই জানান দিয়ে যায়। বি.এ. পাশ স্ত্রীকে বিজন বসিয়ে রাখেনি। নিজে গরজ করে সরকারী অফিসে কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। কিছু একটা নিয়ে থাকুক। অফিসে সুনন্দার সুখ্যাতি হয়েছে। সহকর্মীদের মধ্যে সুহৃদও নিতান্ত কম হয়নি। বিজন সব খবর রাখে। মাঝে মাঝে ঈর্ষার খোঁচা যে না খায় তা নয়, কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়া তার চালচলনে আভাসে ভাষণে ধরা না পড়ে তা নয়। তবু স্ত্রীকে সে মোটামুটি স্বাধীনতাই দিয়েছে। বন্ধুবান্ধব অনেকের তুলনায় বিজন সহনশীল উদারস্বভাব। এটুকু বললে অহংকার করা হয়না, সত্যি কথাই বলা হয়।

ঘরেও আমোদ-প্রমোদের সাধ্যমত ব্যবস্থা করে দিয়েছে বিজন। রেডিও আছে, গ্রামোফোন আছে, বাংলা গল্প উপন্যাসের লাইব্রেরী আছে। স্যাঁকরার দোকানে যাতায়াতও সুনন্দার নিতান্ত কম নেই। ছুটি ছাটায় বছরে দুবার, অন্তত একবার তো নিশ্চয়ই দেশ ভ্রমণে বেরোয়। তবু ভরিল না চিত্ত। তবু অমূল্যবাবুর ফ্ল্যাটের দিকেই টান যেন বেশি সুনন্দার। সময় পেলেই সেখানে তার ছুটে যাওয়া চাই। যতক্ষণ পারে একটি না একটি মানবশিশুর দেহের উত্তাপ তার ভোগ করা চাই। এ সুখ সুনন্দার একার। এর অংশ বিজনের পাবার জো নেই। সেই জন্যই কি তার মনে এত ঈর্ষা? নিজেকে ক্ষমা করে না বিজন। রেহাই দেয় না। মনকে খুঁটে খুঁটে চিরে চিরে দেখে। শেষপর্যন্ত নিজেকেই দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয়।

উচিত হয়নি বিজনের, শত হলেও সুনন্দা যে মেয়ে, মাতৃত্বের সংস্কার যে ওর রক্তের মধ্যে সে কথা ভুলে যাওয়া উচিত হয়নি।

খানিকবাদে পার্ক থেকে উঠে ঘরে ফিরে গেল বিজন। দেখে খুসি হল আজ দুঘণ্টার আগেই দোর খুলেছে সুনন্দা। রান্নাবান্নায় হাত দিয়েছে।

মান ভাঙাবার আগেই সুনন্দা আজ কথা বলল। যদিও দুটি চোখ ফোলা ফোলা। গলার স্বর ভারি।

—গেলে না অনিমেষবাবুদের ওখানে?

—না। একা একা যাই কী করে। একটা ফোন করে দিয়ে এলাম।

—বেশ করেছ।

ছোট টেবিলের দুধারে বসে নৈশ ভোজন প্রায় নিঃশব্দে শেষ হল।

তারপর শোয়ার ঘরে এসে দুজনে দুখানা বই হাতে নিয়ে বসল। পড়াটা অছিলা। মুখ বন্ধ করে রাখার উপায়।

হাতে বই। কিন্তু মন বইতে নেই বিজনের। সন্তান কেন চাই মানুষ? সন্তানের মধ্যে সে কতদিন বাঁচে? বংশরক্ষাটা আসলে একটা অহমিকা। পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্যা, পুত্র পিণ্ড প্রয়োজন। যার পিণ্ডে প্রয়োজন নেই তার পুত্রে কী প্রয়োজন? আসলে মানুষ তার কীর্তির মধ্যে বাঁচে। আলাদা বংশধারা একটা মিথ। স্পেসিস হিসেবে মানুষ যতদিন বাঁচবে, বিজনও ততদিন বাঁচবে।

আরো কিছুক্ষণ গেল। হঠাৎ একটু শব্দে চমকে উঠল বিজন। সুনন্দার হাত থেকে বইটা পড়ে গেছে। ওর চোখে রাজ্যের ঘুম। স্ত্রীকে হঠাৎ অপরূপ সুন্দরী মনে হল বিজনের। একটু তাকিয়ে রইল। তারপর উঠে গিয়ে স্ত্রীকে আড়কোলে তুলে নিয়ে বিছানায় শুইয়ে দিল। প্রথম যৌবনের সেই গাঢ় অনুরাগ আবার যেন ফিরে এসেছে।

সুনন্দা আপত্তি করতে লাগল,—না না না। ছেড়ে দাও আমাকে ছেড়ে দাও।

বিজন একটু হাঁপাচ্ছিল। তবু এ সময় স্ত্রীর অনুনয় কানে তুলবার পাত্র সে নয়। শক্তি সামর্থ্যে বিজন যে এখনো পূর্ণ যুবক সুনন্দা তার পরিচয় পাক।

শেষপর্যন্ত আগেও যেমন হয়েছে আজও তেমনি হল। স্বামীর বুকে মুখ গুঁজে অবুঝ বালিকার মতই খানিকক্ষণ ফুঁপিয়ে কাঁদল সুনন্দা।

বিজন বাধা দিল না, সান্ত্বনা দিল। নিজের ত্রুটী স্বীকার করে স্ত্রীর কাছে ক্ষমা চাইল। তার গালে মুখে হাত বুলাতে বুলাতে বলল, যে দুঃখ আমাদের আছে আমরা তা একসঙ্গে সইব। কেউ আমরা কাউকে ব্যথা দেব না, আঘাত দেব না।

সুনন্দা বলল,—আমি আর যাব না অমূল্যবাবুদের ওখানে। তুমি যখন কষ্ট পাও—

বিজন বলল,—কষ্ট, ছি ছি ছি। তুমি নিশ্চয়ই যাবে। যত খুসি ওদের তুমি ডাকবে আদর করবে, কোলে নেবে। আমার ঘর ওদের জন্যে খোলা রইল।

ঘুম এল অনেক রাত্রে। সেই ঘুম যে আরো কত রাত্রে ভাঙল তা অবশ্য টের পেল না বিজন। শুধু অনুভব করল স্ত্রীর নিবিড় আলিঙ্গনে সে আবদ্ধ হয়ে আছে। কিন্তু সুনন্দার সর্বাঙ্গ ঘামে ভিজে উঠেছে। এত ঘাম কেন সুনন্দার? আজ তো এমন কিছু গরম নেই। তাছাড়া মাথার ওপর কম পয়েন্টে পাখাও চলছে। বিজনের বরং একটু একটু শীত শীতই লাগছে। কিন্তু সুনন্দা এত ঘামছে কেন?

হঠাৎ আজকের বিকালের কথা বিজনের মনে পড়ল। তখনো সুনন্দা ঘামছিল। অস্বাভাবিক ভাবে ঘামছিল। সে ঘাম সুনন্দার গায়ে বিজন আরো কয়েকবার দেখেছে। বুক থেকে স্তন্য তো বোরোতে পারে না তার বদলে অতি বাৎসল্যে সর্বাঙ্গ থেকে ঘামের ধারা ছোটে। ঘুমের মধ্যে কী স্বপ্ন দেখছে সুনন্দা। সে কি এখনো একটি শিশুকেই আঁকড়ে রয়েছে? হঠাৎ কিসের যেন একটা যন্ত্রণা বোধ করল বিজন। এক অদ্ভুত অস্বস্তিতে তার মন ভরে উঠল। এর পর থেকে রোজই কি এমনি হবে? যেহেতু স্ত্রীর কোলে সে একটি শিশু এনে দিতে পারেনি, স্ত্রীর কোলে অন্যের শিশু দেখলে শিশুর মতই ঈর্ষায় জর্জর হয়েছে তাই কোনদিনই কি সে আর স্ত্রীর কাছে পুরুষের সম্মান, পুরুষের মর্যাদা পাবে না? বিজন কল্পনা করতে লাগল সুনন্দার আলিঙ্গনের মধ্যে সে যেন আকারে অবয়বে আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যাচ্ছে। তার কোন দায় নেই, দায়িত্ব নেই, আশঙ্কা নেই, লজ্জা নেই, অনুতাপ নেই গ্লানি নেই। রাত্রির অন্ধকারে গোপন সুড়ঙ্গ-পথে বিজন আবার যেন সেই মধুর শৈশবে ফিরে গেছে।

বিজন সুনন্দার কানের কাছে মুখ এগিয়ে আনল। তারপর অর্ধকৌতুকে, অর্ধবিদ্রূপে, অর্ধযন্ত্রণায়, অর্ধবেদনায় একটি অস্পষ্ট ধ্বনিকে ঈষৎ স্ফুটতর করে তুলল,—মা মা মা।

ঘুমের মধ্যে মৃদু হেসে সুনন্দা গাঢ় আলিঙ্গনে তাকে আরো বুকের কাছে টেনে নিল। নিজের কান্ড দেখে বিজন নিজেই এবার ঘামতে শুরু করেছে।

লেখক

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

একটা পাব্লিশারের কাছে আজ সে কিছু টাকা পাবে। টাকা পেলে সে মদ খাবে। মদ খাবে এবং একটা মেয়েছেলের কাছে যাবে। যে কোন মেয়ে। রোগ না থাকলেই হ'ল বুড়ি না হলেই হ'ল। একটা যুবতী। কালো ফর্সায় কিছু এসে যায় না। মদ আর মেয়ে। এই সে চাইছে। একটু আনন্দ।

হ্যাঁ, স্থূল আনন্দ সাধারণ আনন্দ। এর মধ্যে সে পরিতৃপ্তি খুঁজবে। সাধারণ হয়ে থাকার তৃপ্তি।

কেননা অসাধারণ হয়ে আনন্দিত হবার বাসনা সে ত্যাগ করেছে। অসাধারণ সে হতে পারবে না।

এটা তার একদিনের সিদ্ধান্ত নয়।

কুড়ি বছরের চেষ্টা শ্রম উদ্যম উৎসাহ নিষ্ঠা পুড়িয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেবার পর সে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেচে।

সে যা অসাধারণ মনে করে তা অসাধারণ নয়,—যা অপূর্ব মনে করে অনবদ্য মনে করে, তা অপূর্ব অনবদ্য নয়। দশ জন তা মনে করে না।

দশ জনের দৃষ্টির সঙ্গে তার দৃষ্টি মেলে না,—দশ জনের ভাবনার সঙ্গে তার ভাবনার মিল নেই। তাই এত আগ্রহ করে লেখা, এত উৎসাহ উদ্যম যত্ন নিয়ে লেখা "মৌন অপরাহ্ন" পাঠকের রাজ্য থেকে আজ নির্বাসিত। কেউ এ বই পড়ে না, কেউ কেনে না। যদি পড়ত—যদি মানুষ কদাচিৎ কখনো এ বই কিনত তা হলেও এই ন বছরে বইটার অন্তত আর একটা সংস্করণ হত। কিন্তু তা হয়নি। বাঁধানো বইগুলি দোকানে থেকে থেকে আলমারীতে পচেছে—তারপর বুঝি কখানা ফুটপাথে গেছে। বাকি ফর্মাগুলি দপ্তরী বাড়ি পড়ে থেকে নষ্ট হয়েছে—উইয়ে খেয়েছে ইঁদুরে কেটেছে—তারপর সে বই চিরকালের মতন হারিয়ে গেছে।

অথচ এই উপন্যাস যখন বেরোয় তখন বন্ধুরা—তার গুটি কয়েক বন্ধু অসামান্য উৎসাহ প্রকাশ করেছিল। তারা মুগ্ধ হয়েছিল বিস্মিত হয়েছিল বই পড়ে। অপূর্ব সৃষ্টি—তারা বলেছিল—এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের এক অক্ষয় সম্পদ হয়ে রইল।

অক্ষয় সম্পদ। বন্ধুদের কথাগুলি মনে পড়ে এখন তার হাসি পায়। আবার মনে হয়, বন্ধুরা হয়তো ঠাট্টা করেছিল, না কি তাকে খুশি করবার জন্য মিথ্যা স্তোকবাক্য শুনিয়েছিল সেদিন!

তা-ই বা হবে কেন। তার যে-কোন লেখা পড়ে তারা খুশি হয়, উচ্ছ্বসিত হয়। এখনো হয়। অসাধারণ তোমার কলম!

না, রাশি রাশি বই সে লেখে নি। খুব একটা তাড়াতাড়ি লিখতেও সে অভ্যস্ত নয়। ভয়ংকর যত্ন নিয়ে সে একটা গল্প লেখে, অবিশ্বাস্যরকম সময় খরচ করে একটা উপন্যাস শেষ করে। কিন্তু সবচেয়ে পরিতাপের বিষয় একটা বই লিখে সেটা যখন সে প্রকাশকের হাতে দিল তখন দেখা গেল—প্রকাশক তাড়াতাড়ি খাতা খুলে দেখিয়ে দিল—গত দু বছরে

তার আগের বইখানা মাত্র আশী কপি বিক্রী হয়েছে।

কাজেই—

লেখক হয়ে সে নিজেও তখন বুঝতে পারে, যেখানে তার একটি রচনা অবিক্রীত অবস্থায় রাশি রাশি জমা হয়ে আছে সেখানে আর একটা নূতন রচনা প্রকাশনের দায়িত্ব মানুষটার ওপর চাপিয়ে দেওয়া যায় না। তখন সে অন্য প্রকাশক খোঁজে।

হ্যাঁ, প্রকাশক তাকে খুঁজে বার করতে হয়।

একটা বই লিখে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশকরা তার বাড়ির দরজায় লাইন দিয়ে দাঁড়ায় না।

কিন্তু বন্ধুরা, তার গুটি কয়েক বন্ধু তাকে অন্য কথা শোনায়। দু বছরে আশী কপি? অসম্ভব। তার মানে লোকটা চুরি করছে। পুকুর চুরি। তোমার বই ঠিক বেচে যাচ্ছে—কাগজেপত্রে হিসাব দেখাচ্ছে অন্যরকম। হুঁ, খাতা—বন্ধুরা হেসে বলে, খোঁজ নিলে দেখা যাবে, আসল খাতা লুকিয়ে রেখে তোমায় নকল খাতা দেখাচ্ছে প্রকাশক মহাশয়।

বন্ধুদের কথার প্রতিবাদ করেছিল সে। তা হলে অমুক লেখকের ঐ বইটার আঠারোটা সংস্করণ হয় কি করে।

সংস্করণ? বন্ধুরা তাতেও হেসেছিল। সংস্করণ দিয়ে বইয়ের মূল্য বিচার! কোন কোন ভাল বইয়ের অনেক সংস্করণ অনেক মুদ্রন হয় সত্য, কিন্তু সংস্করণটাই সব নয় বহু-মুদ্রণটাই রচনার উৎকর্ষের মাপকাঠি নয়। অনেক বাজে বইও বার বার ছাপা হয়, হাজারে হাজারে বিক্রী হয়।

না, বাজে না, জনসাধারণের ভাল লেগেছে সে বই, পাঠক ভালবেসেছে সেই লেখককে, প্রতিবাদ করেছিল সে, বই লেখার সার্থকতা তো সেখানেই।

শুনে তার বন্ধুরা মাথা নেড়েছিল। বুঝলাম, তারা বুঝিয়েছিল,—জনপ্রিয় হবার রোগে ধরেছে তোমাকে। পপুলার হতে চাইছ। এবং তা হতে না পেরে দারুণ হতাশায় তুমি ভেঙ্গে পড়ছ। কিন্তু শিল্পীর এসব ঝোঁক থাকা তো ভাল না। এটা তো ব্যবসায়ের দিক। তুমি তোমার কাজ করে যাবে। জনসাধারণ যদি তোমার জিনিস নিল—ভাল, না নেয় তো বয়ে গেল। তা বলে তুমি তোমার বলার ভঙ্গি লেখার ধরণ দেখার বৈশিষ্ট্য ত্যাগ করবে নাকি? যথার্থ শিল্পী তা করে না।

অ, পপুলার হতে চাও,—তারা তৎক্ষণাৎ আবার বলেছে,—বেশ তো এবার পুজোর কাগজগুলি ধরে ধরে ,সাতখানা উপন্যাস লিখে ফেল—হুঁ, খেয়াল রাখবে সিনেমার প্রযোজকরা যাতে কাজে লাগাতে পারে সেভাবে সাজিয়ে সাজিয়ে কাহিনী দাঁড় করিয়ে প্রত্যেকটা বই যেন লেখা হয়। দেখবে রাতারাতি তুমি পপুলার রাইটার হয়েছ। পয়সা হবে। বাড়ি হবে গাড়ি হবে। তার পর থেকে তোমার দরজায়ও প্রকাশকরা লাইন দিয়ে দাঁড়াবে।

বুঝলে বন্ধু, অপরে যা করতে পারে শিল্পী তা পারে না। পারা উচিৎ নয়। নগদ মূল্য পাবার লোভ যখন শিল্পীকে পেয়ে বসে তখন তার অপমৃত্যু ঘটে।

এসব কথা বন্ধুরা তাকে বলেছে, এখনো বলে। তার গুটি কয়েক বন্ধুর স্তোক-বাক্য।

আজ সে উপেক্ষিত অনাদৃত। কিন্তু তাতে কি। তার জন্যে মন খারাপ করবে না সে। কালের বিচারে তার লেখা একদিন সার্থক হয়ে উঠবে। এবং দেশ সেদিন তার গলায় জয়-মাল্য পরাবে ইত্যাদি—

শুনে শুনে সে ক্লান্ত। কিছু বলে না। কিন্তু মনে মনে সে অনুকম্পা করে ঐ গুটি কয়েক বন্ধুকে। আজ তার লেখা নিয়ে অবোধ আনন্দে তারা মাতামাতি করছে। তাদের বোধ তাদের বিচার যে কালের বিচারে অক্ষম অর্বাচীন অপদার্থ প্রতিপন্ন হবে না একথা তাদের কে বোঝায়।

ক্লান্ত—তার লেখা সম্পর্কে নির্লজ্জ নির্বোধ কটি বন্ধুর নিরন্তর প্রশংসা গুণগান ও আপ্তবচনই তাকে আরো বেশি ক্লান্ত বিমর্ষ করে তুলেছে। যেন সে এখন তাদের এড়াতে চাইছে—তাদের হাত থেকে পালিয়ে বাঁচতে চাইছে। আমায় ক্ষমা করো—আমি পলাতক—অসাধারণ হবার কালজয়ী হবার মূঢ় আকাঙ্ক্ষা আমার নেই। আমি সাধারণ—চিৎকার করে সে বন্ধুদের বলতে চায়—আমায় সাধারণ হয়ে থাকতে দাও। বরং সাধারণ হয়ে বাঁচবার আনন্দ থেকে আমায় তোমরা বঞ্চিত করো না।

তাই সে আজ অন্যরকম পরিবেশ চাইছে। একটা মেয়ে একটু মদ। রোজ সন্ধ্যার চায়ের দোকানের সেই চক্রের কথা মনে হলে তার মাথা ঝিমঝিম করে। চারটি পরিচিত মুখ। আর তাদের মধ্যমণি হয়ে এই মহৎ লেখক।

যদি মানুষ আমার লেখা না পড়ে তো আমি লিখব কার জন্য? তুমি তোমার নিজের জন্য লিখবে—আর আমাদের জন্য। তোমার এই গুটি কয়েক বন্ধুর জন্য। যারা তোমার সত্যিকার গুণগ্রাহী। যারা তোমার লেখা বোঝে, যারা তোমায় জানে, যারা তোমায় রোজ দেখে আসছে।

অর্থাৎ আজ তুমি এই পরিচিত সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে বেঁচে থাক, তার পর দেখা যাক, মহাকালের দরবারে—

পাব্লিশারের ঘরে বসেও যেন কথাগুলি সে শুনতে পাচ্ছিল আর তার গা বমি বমি করছিল। টাকা পেতে একটু দেরিই হল। বেশ একটু রাত হল।

তা হলেও সে পেল শেষ পর্যন্ত।

আর বসে থাকল না, আর চা খেতে গল্প করতে সেখানে অপেক্ষা করল না। বই বই, বই আর সাহিত্যের মধ্যে থেকে তার দম বন্ধ হয়ে আসছিল।

বাইরে পেভমেণ্টে এসে দাঁড়াল।

রাস্তার ভিড় কমে গেছে। গাড়িও যেন পাতলা হয়ে আসছে। দাঁড়িয়ে সে চিন্তা করতে লাগল পূব দিকে যাবে কি দক্ষিণ দিকে। দু দিকেরই গাড়ি যাচ্ছে আসছে। ট্রাম বাস রিক্সা।

না কি একটা ট্যাক্সি ডাকবে।

তা হলে কিছুক্ষণ দাঁড়াতে হবে। তা হলে একটু এগিয়ে গিয়ে ঐ মোড়েই দাঁড়াতে হয়। তা ছাড়া সিগারেটও কিনতে হবে।

যখন চিন্তা করছে কথাটা, হঠাৎ ওপারের পেভমেণ্টের দিকে চোখ পড়তে আবার সে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

একটি মেয়ে। লম্বা মতন। রং কালো, এখান থেকে বোঝা যায়। সরু পাড়ের সাদা শাড়ি। হয়তো শাড়ির সাদা রংটাই চট করে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ওপারের আলোর জোর কম, এপারের আলো তেজী। যেন ইচ্ছা করে আর একটু অন্ধকারে একটা থামের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি। কিন্তু এদিকের পেভমেণ্টে

দাঁড়িয়ে সে বুঝতে পারল মেয়েটার দৃষ্টি এখানে। যেন তাকে দেখছে—চিবুকটা একটু উঁচু করে ধরে তার দিকে তাকিয়ে আছে।

আশ্চর্য তো! ভিতরে ভিতরে একটু পুলক অনুভব করল সে। এদিক ওদিক তাকাল। তারপর আবার রাস্তার ওপারে চোখ রাখল। আর তার কোন সন্দেহ রইল না।

ট্রামটার জন্য একটু অপেক্ষা করল। ওটা সরে যেতে রাস্তা ক্রশ করে সে ওপারে উঠে গেল।

একটু দূরে দাঁড়াল সে। মেয়েটি তার দিকে ঘাড় ফেরাল।

এখন তার হৃৎপিণ্ড রীতিমত দুব্দুব্ শব্দ করতে আরম্ভ করল।

এসব ক্ষেত্রে কে আগে কথা বলবে কে আগে অগ্রসর হবে বুঝতে না পেরে সে একটু বিব্রত বোধ করছিল বৈকি। আবার ঠিক একটা জায়গায় এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতেও সংকোচ-বোধ করছিল। হাঁটতে আরম্ভ করল সে। আস্তে আস্তে পা ফেলতে লাগল। সাদা শাড়ি পরা যুবতীও আর চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল না। হাঁটছে। বেশ বোঝা গেল তার পায়ের দিকে চোখ রেখে যুবতী পা ফেলছে।

সিগারেটের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সে সিগারেট কিনল। এখন সে লক্ষ্য করল মেয়িটিও দাঁড়িয়েছে সিগারেটের দোকানের পাশেই একটা ফলের দোকানের সামনে। দাঁড়িয়ে ফল দাম করছে। ফল অবশ্য কিনল না। ফলওয়ালার সঙ্গে কথা বলতে বলতে ঘাড় ফিরিয়ে তাকেই লক্ষ্য করল বেশি। সিগারেট কিনে সে পেভমেণ্ট ছেড়ে রাস্তায় নামল। মেয়েটি নামল।

তারপর এক মিনিট হাঁটাহাঁটির পর দুজন একটা লাইটপোস্টের আড়ালে এসে পাশা-পাশি হয়ে দাঁড়াল।

—ট্যাক্সি ডাকবেন? মেয়েটি আগে কথা বলল।

—হ্যাঁ, ডাকা যেতে পারে। আর কোনরকম দ্বিধা করল না সে। বেশ সহজভাবে ওর দিকে তাকাল। রং কালো হলেও চোখ দুটো বড় বড়। টানা ভুরু। ভুরু ও চোখের তুলনায় নাকটা ছোট। তা হলেও মুখখানা মিষ্টি। তার ভাল লাগল। পঁচিশ ছাব্বিশ বয়স হবে, সে অনুমান করল।

—কোথায় থাক তুমি?

—শ্যামবাজার। ছোট করে একটা ঢোক গিললো যুবতী।

আর কথা না বলে রাস্তা দেখতে লাগল সে। ফাঁকা ট্যাক্সি চোখে পড়ে কিনা।

প্রায় দুমিনিট কাটল।

—তার চেয়ে বরং একটা রিক্সা ডাকুন। যুবতী বলল। সে ঘাড় কাত করল। প্রস্তাবটা তার ভাল লাগল। কখন ট্যাক্সি মিলবে ঠিক নেই। এভাবে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে তার খারাপ লাগছিল। হয়তো মেয়েটিও তা চাইছে না।

—এই রিক্সা।

রিক্সা দাঁড়াল। দুজন উঠে বসল।

—পর্দা ফেলে দাও। তারপর হাত দিয়ে রিক্সাওয়ালাকে উত্তর দিক দেখিয়ে দিল যুবতী। ওদিকে চালাও।

রিক্সার মুখ ঘুরে গেল।

পর্দার মধ্যে সে আরো বেশি সহজ স্বাভাবিক হতে পারল। মেয়েটির উরুর ওপর

হাত রাখল সে।

—নাম কি তোমার?

—সুপ্রভা।

চমকে উঠল সে। যেন এমন একটা সুন্দর নাম অনেকদিন ধরে সে খুঁজছিল। কিন্তু মনে আসে নি। যদি মনে আসত তবে যে উপন্যাসটা কদিন আগে শেষ করল নায়িকার ওই নাম দিতে পারত। চমৎকার নাম হত।

—আর কে আছে তোমার?

ঘরে চলুন, বলব। আস্তে বলল ও। স্বরটা একটু গম্ভীর। তাই সে আর কিছু প্রশ্ন করতে সাহস পেল না। কিন্তু উরু থেকে হাতটা তুলল না। এক জায়গায় এতটা নরম মসৃণ মাংস ধরে রাখতে পেরে রোমাঞ্চ অনুভব করছিল সে। তাছাড়া লাগালাগি হয়ে বসার দরুন যুবতীর দেহের তাপও সে উপভোগ করতে পারছিল। স্বাভাবিক। বেশ একটু বয়স হয়েছে তার। বিয়াল্লিশ। তুলনায় তার রক্ত তো ঠান্ডা হবেই।

দুজন চুপ করে রইল।

ঠুনঠুন শব্দ করে রিক্সা চলতে লাগল।

—কটা বাজে? ওর হাতে ঘড়ি রয়েছে দেখতে পেয়ে সে একসময় প্রশ্ন করল।

চোখের কাছে কব্জিটা নিয়ে গেল যুবতী।

—দশটা বাজে।

শুনে সে চুপ করে রইল। হঠাৎ অন্তরে একটা পীড়া অনুভব করল সে এসময়। লেখক। তার হাতে ঘড়ি নেই। আজ পর্যন্ত সে একটা রিস্ট্‌ওয়াচ্ কিনতে পারল না। একটা রাস্তার মেয়ের হাতেও যা থাকে। অবশ্য মেয়েটি জানছে না সে একজন লেখক। তাকে জানাবার দরকারও পড়ে না। এখানে অন্য জগত অন্য পরিবেশ। এই যা সান্ত্বনা। বরং আর একটু সান্ত্বনা পেতে সে ওর পায়ের ওপর থেকেও সায়াটা একটু একটু করে সরাতে চেষ্টা করল।

—এসে গেছি। যুবতী একটু পরে পর্দার বাইরে মুখটা নিয়ে গেল। বাঁয়ে।

রিক্সা বাঁয়ে ঘুরে গেল।

যেন পথটা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল, চিন্তা করল সে।

—হ্যাঁ, রোখো এখানে। যুবতী এবার সোজা হয়ে বসে তার দিকে ঘাড় ফেরাল। —নামুন।

রিক্সা দাঁড়াল। পর্দা সরিয়ে দুজন দুদিক দিয়ে নেমে পড়ল। পকেট থেকে একটা টাকা তুলে সে ওর হাতে দিতে গেলে মেয়েটি ঘাড় নেড়ে রিক্সাওয়ালাকে দেখিয়ে দিল। —ওর হাতে দিন—আট আনা রাখবে। এই রিক্সাওয়ালা বাবুকে আট আনা ঘুরিয়ে দাও।

—থাক, ঘুরিয়ে দেবার দরকার নেই—সবটাই নিয়ে নিক। একটু মহানুভবতার পরিচয় দিতে ইচ্ছা হল তার। যুবতী আর কিছু বলল না। রিক্সাওয়ালা খুশি হয়ে দুবার টাকাটা কপালে ঠেকিয়ে পরে ট্যাঁকে গুঁজতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—আসুন। যুবতী ঘুরে দাঁড়াল।

তার মনে হল দোতলা বাড়ি। যেন ওপরে থাকে ও। ওর পিছনে চুপ করে সে সিঁড়ি ভাঙতে লাগল।

সুন্দর সাজানো ঘর। এসব মেয়ের ঘরদুয়ার সম্পর্কে তার অন্যরকম ধারণা ছিল। কিন্তু এখানে দেখল ভারি ছিমছাম রুচি। টেবিলে সমুদ্রশঙ্খ দেওয়ালে ভগবান বুদ্ধের ছবি বইয়ের শেলফ্-এ রবিঠাকুর।

যেন একটু অবাকই হল সে।

—বসুন। একটা সোফা দেখিয়ে দিয়ে যুবতী পাখাটা চালিয়ে দিল। হাওয়ায় ওর চুল নড়ে উঠল। আঁচল দুলতে লাগল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সে ওর শরীর দেখতে আরম্ভ করল। বুক কোমর বাহু পা। রিক্সার অন্ধকারে সে ওর শরীর স্পর্শ করেছে কিন্তু ভাল করে দেখতে পারে নি। দেখাটাও অনেকখানি। একটি মেয়েকে দেখতে দেখতে তার অঙ্গ-স্পর্শ করার অন্য স্বাদ।

কাছে সরে আসতে সে ওর হাত ধরল।

—আমার পাশে বোসো।

—বসছি। আগে আপনাকে একটু চা করে দিই—চা খাবেন তো?

—মদ নেই তোমার কাছে? যেন একটু মদ খেলে ভাল লাগত। ওর চিবুক ধরে নাড়া দিল সে। আমি টাকা দিচ্ছি।

—মদ খাবেন! যুবতী হাসল না বা অবাকও হল না। একটু চুপ থেকে ভেবে নিয়ে বলল,- আমার কাছে মদ নেই। আমি ওটা অভ্যাস করতে পারিনি—তবে আপনি যদি খান আনিয়ে দিতে পারি।

—আনিয়ে দেবে! একটু হতাশ হল সে।—কোথা থেকে? বাইরে থেকে?

—হ্যাঁ, যদি আপনার খুব ইচ্ছা হয়ে থাকে—

—না, খুব আর ইচ্ছা কি—কাকে পাঠাবে? অল্প হাসল সে।—তোমার লোক আছে?

—দেখছি চেষ্টা করে—কাউকে দিয়ে যদি—

মুহূর্তকাল কি চিন্তা করল সে।

—থাকগে দরকার নেই। সে ওর কোমর ধরল। আগে তো এখানে বোসো তুমি। আমার পাশে বোসো।

আঁচলটা ঠিক করে নিল ও।—হ্যাঁ বসছি, বসলুম। তার পাশে বসে পড়ে যুবতী একটা ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলল। কিন্তু সে তা গ্রাহ্য করল না। ওর গলা জড়িয়ে ধরল। ভয়ংকর   অনুভব করছিল সে।

—চা খাবেন না? এবার ঠোঁট টিপে হাসল ও।

—কিচ্ছু না। তার গলার স্বর গদগদ হয়ে উঠল। ওর মুখটা বুকের কাছে টেনে নিয়ে সে গভীরভাবে চুমু খেল। তারপর মুখটা ছেড়ে দিয়ে সে হাসল।—এই আমার মদ এই আমার চা।

সোজা হয়ে বসে যুবতী চুল ঠিক করল। তার হাতের ধাক্কায় ওর খোঁপা খুলে গেছে। এখন সে লক্ষ্য করল ওর সিঁথিতে সিঁদুরের দাগ।

—তোমার বিয়ে হয়েছিল?

কথা না বলে ও ঘাড় কাত করল।

—আপনি? যুবতী এবার স্থির হয়ে বসে তার চোখের দিকে তাকাল। আপনিও বিবাহিত নিশ্চয়ই?

—হ্যাঁ।

—আপনি লেখক! যুবতী এমনভাবে তার দিকে তাকিয়ে আছে, চোখের পলক পড়ছে না।

একটু বিব্রতবোধ করল সে। অস্বস্তিবোধ করল। এখানে আবার লেখক কেন। এর মুখে এই প্রশ্ন কেন।

—তুমি কি করে বুঝলে? ছোট করে একটা ঢোক গিলল সে। একটু হাসলও।

—আপনি তখন ঐ বইয়ের দোকান থেকে বেরোলেন দেখলাম। তাই না?

সে মাথা নাড়ল।

—ও হ্যাঁ, তা বেরিয়েছিলাম সত্য। হঠাৎ আবার কি একটু ভাবল সে, তারপর শব্দ করে হাসল। বইয়ের দোকান থেকে কতরকম লোক তো বেরোয়। আমি লেখক বুঝলে কি করে।

—তা বুঝেছি—বোঝা যায়। লেখক দেখলে চেনা যায়। আস্তে বলল ও। ঠোঁটের হাসিটা মিলিয়ে গেল ওর। ঘাড় ফিরিয়ে টেবিলের দিকে তাকাল যুবতী।

সে ওর কোলের ওপর হাত তুলে দিল।

—হ্যাঁ, আমি লেখক। ধরো একদিন তাই ছিলাম—এখন আর নেই, আজ আমি অন্য মানুষ।

একটা গাঢ় নিশ্বাস ফেলে যুবতী তার দিকে মুখ ফেরাল।

—আমি একজন লেখককে খুঁজছিলাম। লেখক কেউ আমার ঘরে আসুক একদিন চাইছিলাম। তাই ওখানে দাঁড়িয়ে ছিলাম।

এখন আবার ওর চোখের পলক পড়ছিল না। মণি দুটো বড় বেশি চকচক করছে। তার সন্দেহ হল, ওটা কি ক্রোধের আগুন, না এখনি কেঁদে ফেলবে, জল এসে এমন দেখাচ্ছে?

কিন্তু তবু সে স্বাভাবিক গলায় হাসল।

—হঠাৎ লেখক খুঁজছিলে কেন?

লেখকের কোলের ওপর থেকে যুবতী হাতটা তুলে নিল। কথা বলল না। চোখ নামিয়ে হাতের নখ খুঁটতে আরম্ভ করল।

কে জানে, হয়তো ট্র্যাজেডী আছে এর জীবনে। বড় রকমের ট্র্যাজেডী আছে। আমায় সব শোনাতে চায়। আমায় দিয়ে একটা বই লেখাতে চায়।

চিন্তা করে সে মনে মনে হাসল। এবং গর্ববোধও করল ভিতরে ভিতরে। এসব মেয়ের অনেক রকম খেয়াল থাকে সে শুনেছে।

আর পতিতালয়ে চিত্রকর সঙ্গীতজ্ঞ সাহিত্যিক—এই নিয়েও তো চমৎকার সব কাহিনী গড়ে উঠেছে, ভাল ভাল বইও লেখা হয়েছে।

—চুপ করে আছ? সে ওর চিবুক ধরে নাড়া দিল।

যুবতী চোখ তুলল। চোখ ছলছল করছে। আর তার সন্দেহ রইল না।

আবার সে একটু দমে গেল। চিবুক থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে ওর ব্লাউজের বোতাম খুলতে আরম্ভ করল। কিন্তু হাত স্থির হয়ে গেল।

—একটা সত্য কথা বলবেন? যুবতী তার প্রসারিত হাতটা মুঠ করে ধরল।

—বলব, কেন বলব না বলো? একটুও অবাক হয়নি ভাণ করে তেমনি সহজভাবে লেখক হাসল। হাতটা ওর মুঠোর ভিতর ধরে রাখতে দিয়ে শরীরে একটা শিথিল ভঙ্গী

আনতে পিঠটা বেঁকিয়ে বেশ একটু কুঁজো হয়ে বসল।

কিন্তু তখনি আবার ও কথা বলল না। হাতের মুঠও আলগা করল না। তার হাত ধরে রেখে যুবতী টেবিল দেখল বইয়ের শেল্‌ফ দেখল দেওয়ালের বুদ্ধের ছবি দেখল। তারপর এদিকে চোখ ফিরিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

—আমার স্বামীও লেখক ছিলেন।

অতিমাত্রায় চমকে উঠল সে। তার মেরুদন্ড ঋজু ও শক্ত হয়ে উঠল। চোখ বড় হয়ে গেল।

—সত্যি! কোথায় তিনি—সেই লেখক স্বামী এখন কোথায়?

—জানি না। তবে আমায় ছেড়ে চলে গেছে।

হতবাক হয়ে সে ওর মুখ দেখতে লাগল। মুখের পেশীর কুঞ্চন লক্ষ্য করতে লাগল। একটা দুরন্ত কান্না চেপে রাখতে মেয়েটি এমন করছে বুঝতে তার কষ্ট হল না।

অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে। তার হাতটা আরো শক্ত করে চেপে ধরে কোলের কাছে টেনে নিল যুবতী।

—চুপ করে আছেন কেন, বলুন সত্যি করে বলুন, আর একজন লেখকের মুখে আমি শুনতে চাই—

—কি? মৃদু নিশ্বাস ফেলার মতন শব্দ করে সে প্রশ্ন করল,—কি শুনবেন?

—এতে কি আপনি আনন্দ পান? সত্যিকারের আনন্দ!

ঘামছিল সে। পাখার হাওয়া সত্ত্বেও তার কপালে স্বেদ জমছিল।

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। কিসের আনন্দ?

—এই যেমন আমার কাছে এসে, আমার শরীর ধরতে পেরে—

আবার স্তব্ধ হয়ে গেল সে। যেন ভয়ংকর লজ্জা পেল। মাথা হেঁট করে রইল।

—বলুন—, অনুনয়ের সুরে তার হাত ধরে নাড়া দিল যুবতী।

অপরাধীর মতন চোখ তুলল সে। তবু একটা নিস্তেজ হাসি ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে আস্তে আস্তে বলল,—এই মাঝে মাঝে—একটু সময়ের জন্য—সাময়িক একটু আনন্দ পেতে—

—না না—, হঠাৎ ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছিল ওর, যেন উত্তেজিত হয়ে উঠেছে।—চরম আনন্দ আত্মার তৃপ্তি? একটা উপন্যাস লিখতে লিখতে যে আনন্দ পান একটা গল্প শেষ করে যে তৃপ্তি পান সেই তৃপ্তি সেই আনন্দ একটা মেয়ে আপনাকে দিতে পারে?

এই প্রশ্নের কি উত্তর আছে!

তার স্বামী কি তবে—

যেন উত্তর খুঁজতে ঘাড় ফিরিয়ে সে পাশের সাদা শূন্য দেওয়ালটা দেখতে লাগল। যেন অন্ধকার হাতড়াতে লাগল। তারপর যখন চোখ ফেরাল দেখল কান্না রুখতে যুবতী দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা কামড়ে ধরেছে। কিন্তু তাতে ফল হল না। চোখ ফেটে জল বেরোচ্ছে। ঠোঁট কেটে গিয়ে রক্ত বেরোচ্ছে। গাল বেয়ে চোখের জল ঠোঁটের কাছে গড়িয়ে এসে রক্তের সঙ্গে মিশে একটা বড় লাল নোলকের মতন হয়ে চিবুকের নিচে দুলতে লাগল।

তারপর কথা বলতে আরম্ভ করতে রক্ত মেশানো জলের ফোঁটাটা টুপ করে ওর কোলের ওপর ঝরে পড়ল।

—তাকে লেখক হয়ে থাকতে দিতে আমি কত কষ্ট সহ্য করেছি কত অনাহারে থেকেছি। সত্যিকারের শিল্পী হয়ে সে বেঁচে থাকবে জেনে কত তৃপ্তি পেয়েছি—

—তিনি কি লেখা ছেড়ে দিয়েছেন, তিনি কি এখন—

কিন্তু সেই প্রশ্ন ওর কানে যাচ্ছিল না, নিজের প্রশ্নের উত্তর জানতে যুবতী আবার অস্থির হয়ে উঠল।

—বলুন, আমার কথার জবাব দিন, কতটা আনন্দ—

এখন ওর চোখে জল আগুন দুটোই সে দেখতে পেল। আশ্চর্য সুন্দর লাগল চোখ দুটো। তার ভয়ানক ইচ্ছা হল আবার ওর গায়ে হাত রাখে। কিন্তু হাত উঠল না। কাঠের মতন স্থির শক্ত হয়ে রইল।

যেন অক্রোশে উত্তেজনায় যুবতী থরথর কাঁপছিল। তার হাত ছেড়ে দিয়ে দুটো কাঁধ ধরে জোরে ঝাঁকুনি দিল।

—আপনি চুপ কেন, আমায় বলুন—আপনিও লেখক—হাতের কলম ফেলে রেখে একটা মেয়েকে কতক্ষণ আপনার ভাল লাগবে, কতদিন সে আপনাকে আনন্দ দেবে—

কাঁধ ছেড়ে দিয়ে মেয়েটি তার মাথার চুল ধরে টানতে আরম্ভ করল।

যন্ত্রনায় সে উঃ করে উঠল।

কিন্তু ওর যন্ত্রণা যে অনেক বেশি।

—কত সুন্দর হতে পারে ওই রাক্ষসী যার জন্য জীবনের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস সে নষ্ট করে দিয়ে চলে গেল- আমায় বলুন, বলে দিন কেন এমন হল। এবার যুবতী নিজের মাথার চুল ছিঁড়তে আরম্ভ করল। গায়ের ব্লাউজটা টেনে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে নগ্ন স্ফীত স্তন দুটোর ওপর মুষ্ঠ্যাঘাত করতে লাগল। তার বুক ফাটা কান্নার শব্দ দেওয়াল থেকে দেওয়ালে প্রতিহত হয়ে ফিরতে লাগল।

চার্জ

অমিয়ভূষণ মজুমদার

কি শীত! কি শীত! হা ভগোয়ান্!

রামচরিতত্তর আহিরের পিতার নাম দশরথ ছিলো না, কিন্তু রাজা দশরথের মতোই সে পুত্র রামচরিতত্তর এবং লছমনপ্রসাদকে এক সত্যের বিপাকে ফেলে দিয়েছিলো, এবং তার এই দুর্মতির মূলেও ছিলো এক পরমাসুন্দরী স্বপ্ন। সে স্বপ্ন আলোকোজ্জ্বল কলিকাতা নগরী। ইতিহাসটা এই : গোরখপুর জেলার ভেলবারা গ্রামের এক আহির পরিবারের ছেলে কলকাতায় গিয়ে ভাগ্য ফিরানোর স্বপ্ন দেখে গ্রামের মহাজন অযোধ্যা তেওয়ারীর কাছে পৈতৃক জমিজমা বাঁধা রেখে কয়েক শ' টাকা ধার করেছিলো। ঋণ এবং আরও ঋণ করে ঋণের অংকটাকে সে যথেষ্ট বাড়িয়ে ফেললো, এদিকে তা সুদের পথেও বাড়ছিলো। তারপর একদা সে কঠিন অসুখ নিয়ে দেশে ফিরলো। জ্যেষ্ঠ রামচরিতত্তরের বয়স তখন সতরো আঠারো হবে, লছমনপ্রসাদ দশে পড়েছে। হাড্ডিসার ক্ষতযুক্ত দেহ, তবু তার উপরেই প্রাণের কি মায়া। অবশেষে গ্রামের পুরোহিত, মহাজন এবং কবিরাজ অযোধ্যা তেওয়ারী নিদান দিলো : বল, বল, ছেলেদের ডেকে বলে দে—তোর টাকা নেয়ার সব হিসাব কাগজে লেখা হয় নাই, কিন্তু তোর বাস্তুভিটা বাঁধা দিলে বকেয়া ঋণের জামিন দেয়া হবে। এই কথা শুনে রামচরিতত্তর এবং লছমনপ্রসাদের সম্মুখে মৃত্যুপথযাত্রী তাদের পিতা নাকি অস্থির হয়ে উঠেছিলো, বলেছিলো, হাঁ ঠিক, হাঁ ঠিক্ ঠিক্ ঠিক্। যেন একদিন ধ'রে সে এ কথাটাকেই খুঁজছিলো। এরপর বালিশে মাথা চেলে নখ দিয়ে বিছানা খামচে খামচে ধরে আরও দুটো দিনের সবটুকু সময় এই শব্দ দুটিকে উচ্চারণ করেছিলো সে যতক্ষণ না তার ঋণমুক্ত প্রাণ অসীমের দিকে উড়ে গেলো।

কেউ কেউ বললো বিকার। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটিতে দাঁড়িয়ে রামচরিতত্তর পিতার সত্যে আবদ্ধ হয়ে পড়লো। ছোটভাই লছমনপ্রসাদ ভাবলো—দাদা কি কম বোঝে? লোকে বলতো বটে—যদি অযোধ্যার কাছে তার বাবার ঋণ থাকে তবে কাগজ দেখাক। এসব শুনেও রামচরিতত্তর তাব সম্মুখের মন্থরগতি বলদ দুটোর মতোই যে নির্বিকার ভঙ্গিতে লাঙ্গল ঠেলে চলতো। কিন্তু বুকের মধ্যে সময় সময় সে বর্ণহীন একটা জ্বালা অনুভব করতো।

পুরো তিনটি বছর ধরে সে চেষ্টা করলো। সে কি অমানুষিক পরিশ্রম! কিন্তু না হলো রুকমিনিয়ার জন্য একটা ঘর তোলা, না হলো ঋণের শেষ। ঋণের আসল এবং সুদ কি করে পরস্পরকে বাড়তে সাহায্য করে তা সে জানতো না। জানে অযোধ্যা তেওয়ারি।

মনে মনে মরিয়া হয়ে উঠেছিলো সে। এ অবস্থাতেই যুদ্ধ লেগেছিলো ইউরোপে। অনেক দূরের দেশ। কিন্তু সেটা অবান্তর। আসল কথা, আশ্বাস ছিলো, সে সিপাহী হলে সরকার থেকে এমন ব্যবস্থা করে দেবে যে মাসে মাসে দুকুড়ি পঞ্চাশ টাকা আসবে তার বাড়িতে। সেই টাকায় তিনটি প্রাণীর চলে যাবে—লছমন, রুকমিনিয়া আর তাদের মা। যদি লছমন বুঝমান হয় তবে ধারও শুধতে পারবে দুপাঁচটাকা করে।

তখন অনেক দূরে গিয়েছিলো সে। তাকে ফরাসী দেশ বলে। সোমস্ বোধ হয়

জায়গাটার নাম। অনেক দিনের মধ্যে একদিন সকালের কথাই তার মনে পড়ে। তখন সকাল হচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারের বদলে বারুদের আর রক্তের আঁসটে গন্ধভরা কুয়াশা দেখা দিয়েছে। খাদের মাথার ঠিক এক হাত উপরে যেন সেই পর্দা। খাদের গা ভিজে ভিজে, পায়ের নিচে কাদা। আর শীত। হ্যাঁ, জাড়ও বটে। সারা রাত কামানের গোলা চলার পর তখন এমন সুমসাম হয়েছে যে ফড়িং-এর পাখার শব্দ শোনা যাচ্ছে। হঠাৎ তাদের ডানদিকে কামান চলতে শুরু করলো। তারা আশা করেছিলো ওদিকের কামানের উত্তরে এদিকের কামানও চলবে। কিন্তু রাত্রির গোলায় এদিকের সব ব্যবস্থা কল্পনার অতীত রকমে ভেঙে পড়েছে। তারপর সেই আক্রমণ শুরু হলো। হাতাহাতি যুদ্ধ—হাতবোমা আর বেয়োনেট। আশ্চর্য! পিছনের লোকেরা কি ধরে নিয়েছে ভারতীয় এই কম্পানিটার শেষ কজন রাত্রিতেই নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। জার্মানরা একশ' গজের মধ্যে আসতেই কম্পানি কমান্ডার রাইফেল চালাতে হুকুম দিলো। কিন্তু পঞ্চাশটা রাইফেলে পাঁচশ' জার্মান সৈন্যের গতিবন্ধ করা যায় না। অবশেষে তারা পঞ্চাশ গজের মধ্যে এসে গেলো। তাদের হাতবোমা খাদের মধ্যে পঞ্চাশজনের—সাত-আটজনকে শেষ করে দিলো। কম্পানি কমান্ডার ঝুজের সিংজী তখন হঠাৎ খাদ থেকে লাফিয়ে উঠেছিলো : চা-র-জ। অমন চীৎকার, অমন ভয়াবহ চিৎকার, মানুষের গলায় ধ্বনিত হতে পারে এখনও, এতদিন সিপাহী থেকেও, রামচলিত্তরের বিশ্বাস করতে অসুবিধা হয়। প্রায় চল্লিশজন ভারতীয় সৈনিক বেয়োনেট সম্মুখে রেখে জার্মানদের উপরে লাফিয়ে পড়েছিলো। স্পষ্ট মনে আছে রাম-চলিত্তরের এই ঘটনাটা। ঠিক তার সম্মুখে পড়েছিলো মাঝবয়েসী একজন অফিসার। স্পষ্ট মনে আছে তার—সেই অফিসার পিস্তল সমেত হাত তুলেছিলো। চার পাঁচ হাত লাফিয়ে গিয়ে পড়েছিলো রামচলিত্তর। বেয়োনেটের ফলাটা বিঁধেছিলো সেই অফিসারের বুকে বুটসমেত পায়ের লাথি ছাড়া হাড়ের ফাঁক থেকে বেয়োনেট বার করা যায় না। বেয়োনেট লক্ষ্যে বিঁধতেই লাথি মারলো রামচলিত্তর। আর ঠিক তখন, ঠিক তখনই, যেই আর্তনাদটা শুনেছিলো রামচলিত্তর : যেন তার গোরখপুরী হিন্দীতেই মা বলে কেউ কেঁদে উঠলো।

কি শীত! কি শীত! শীত, জাড়, বরফ কোন শব্দ দিয়েই এই শৈত্যকে বোঝানো যাবে না। সোমসেও এমন শীত ছিলো না। এক নম্বর প্লেটুনের পাথরের অগভীর এই খাদে যেন শীত থৈথৈ করছে। রাইফেলটাকে ধরে রাখা যাচ্ছে না। সিগ্রেট টানারও উপায় নেই। কম্পানি কমান্ডার বলবন্তজি কাল হুকুম দিয়েছেন দিনের আলো ফুটবার আগে সিগ্রেট খেয়ো না কেউ। ওপারের পাহাড়টায় দুষমন। হাজার পনরো শ' গজও হবে না।

রামচলিত্তর সোমসের ঘটনাটাকে পাশ কাটাতে গেলো, পারলো না। ওই আর্তনাদ-টার ফল সুদূরপ্রসারী হয়েছিলো। জার্মান অফিসার গোরখপুরী হিন্দিতে মা বলতে পারে না এটা সুযুক্তি হলেও তার মন তা স্বীকার করতে পারলো না। এরপরে আর একবার সে জার্মানদের মুখোমুখি হয়েছিলো। ডানকার্কের পাহারাদারদের একজন ছিলো সে। কিন্তু রাইফেলের হুকুম শুনে সে বারবার ঘোড়াটানতে গেলো—একবারও ঘোড়াতে তার আঙুল পড়লো না। উদ্যত আঙুলটা অভ্যাস মতো ছন্দে ছন্দে চললো বটে কিন্তু কখনও কাঠে কখনও ঘোড়ার বেড়টার উপরে পড়তে লাগলো। এ অবস্থায় যা হওয়া উচিত তাই হয়েছিলো—যুদ্ধবন্দী হতে হয়েছিলো তাকে।

তারপর থেকেই চিন্তাটাও চলতে চলতে হঠাৎ জাম হয়ে যায়। দু-বার তা প্রমাণ

হয়েছে, যদিও সম্পূর্ণ দুটো ভিন্ন অবস্থায় এবং চিন্তা আবার চালু হলে মনে মনে সে ভিন্ন দুটো আস্বাদ পেয়েছিলো।

বন্দী অবস্থাতেই সে মুখে মুখে শুনেছিলো; একদিন চোখের সম্মুখেও দেখেছিলো সুবাসবাবুকে (সুভাষ বোস নামটা)। কিন্তু তিনি যখন বললেন—তোমরা আমার সঙ্গে এসো আমরা ভারতকে স্বাধীনতা দেবো, যখন তার মতো যুদ্ধবন্দীদের অনেকে সেই ডাকে পাগলের মতো এগিয়ে গেলো, তখন হঠাৎ তার মন জাম খেয়ে গেলো অকেজো রাইফেলের মতো। আর কাজের সময়ে রাইফেল জাম খেলে যা হয়। জার্মানদের বন্দী—তারপরে ইংরেজের বন্দী—গোটা যুদ্ধটা বন্দী অবস্থায় কেটে গেলো।

তার এই ব্যাপারটা এতদিনে বোধ হয় উপরওয়ালা বুঝতে পারে। নতুবা এমন হয়? গণপতের সঙ্গে তার প্রথম পরিচয় রংরুট অফিসে। পাশের গ্রামের লোক গণপত, একই দিনে নাম লিখিয়েছিলো তারা। সে এখন এই দলেই আছে—সুবাদার গণপত আহির। আর এই বিশ বছর পরেও রামচলিত্তর এখনও নায়েক। অবশ্য ইদানীং রামচলিত্তরের গুণ আবিষ্কাব হয়েছে। রাইফেলে যদি বেয়োনেট পরানো না থাকে আর প্রতিপক্ষ যদি সামনে না থাকে অর্থাৎ তার চোখমুখ যদি স্পষ্ট না দেখা যায় তবে সাত-আটশ' গজ দূরে থেকেও রামচলিত্তর তাকে অব্যর্থ নিশানায় বিঁধে দিতে পারে। কম্পানি কমান্ডার কখনও কখনও তাকে স্যুটার বলে নায়েক না বলে। স্নাইপাব সে। তার প্রমাণ তার বিশেষ ধরনের রাইফেলটা।

আরে ছি ছি! ঘুমাচ্ছে না কি সে? তার এইমাত্র মনে হচ্ছিলো বটে সাদা লেপ গায়ে সে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের ঠিক আগে যেমন ধীরে ধীরে ইন্দ্রিয়গুলো শিথিল হয়ে আসে তেমনি হচ্ছে তার। জোর করে, বেশ চেষ্টা করেই, চোখ মেললো সে। দেখতে পেলো ময়দার বস্তা ঝাড়লে যেমন ময়দা ওড়ে তেমন সাদা গুঁড়োয় যেন চারিদিক ঢেকে যাচ্ছে। তুষার? কিন্তু চোখে পড়ছে কেন? সকাল হয়েছে তা হলে? এক ঝটকায় নিজেকে খাড়া করে নিলো সে। কি অসম্ভব ভারি লাগছে হাত-পা। হাতে থুথু ফেলে দু-হাতে ঘষলো সে। না, সোমসেও এমন শীত ছিলো না। ঘুম নয় তা হলে, শীতেই সে অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলো। কথাটা মনে হতেই গায়ে শীত কাঁটা উঠলো আবার। না—ঘুমনোর কথা, বিশ্রামের কোন কথাই, এখন ভাবা যায় না। কাল সারাদিন সারা রাতে এই খাদগুলো তৈরি হয়েছে। সূর্য ডোবার সঙ্গে সঙ্গেই পৃথিবীকে কেউ বরফের খাদে চুবিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু আগুন জ্বালানো যায় নি। কম্পানি কমান্ডার বলবন্ত শর্মাজি বলেছে খাদগুলোর কথা জানতে দেয়া যায় না দুষমনকে। কাল দুষমনের মোর্টারের গোলায় ঘাঁটিটা চুরমার হয়ে গিয়েছে। তার মন অসাড় হয়ে যাচ্ছিলো ঘুমের আগে যেমন হয়। এক ভাবতে আরেক ধরছে তার মন।

কাজটা সে ভালো করে নি। ওটাও হয়তো তার মন জাম খেয়ে যাওয়ার প্রমাণ। সেই সেদিন থেকেই তো গ্রামের লোকরা বলেছে—ওটা তোমার বাবার বিকার ছিলো। সেটাকে মওকা মনে করেছিলো তেওয়ারি। পাঁচ বছরের চেষ্টায় শোধ হয়েছে কিছু? তোমার মৃত্যুর সময়েও তোমার বিকারেও তেওয়ারি অমন কিছু তোমার ছেলেকে দিয়ে কবুল করবে। শুনতে শুনতে গলা আগুনের মতো কিছু সে অনুভব করেছে নিজের বুকে। তা সত্ত্বেও কি করলো সে?

স্বাধীন হয়েছে দেশ। লছমন এসে মনে করিয়ে দিলো। সে নিজে বলেছিলো—ঠিক। এখন বেআইনী কায়দা চলবে না। সেই প্রথমবার যখন চুনাই হয় ভদ্রলোকরা গ্রামে এসেছিলো। তাদের ধরে সে তেওয়ারিকে বাধ্য করেছিলো ঋণের কথা কাগজ-কলমে লিখতে। সুদে আসলে তিনহাজার। তিনহাজার! হোক, হোক।

তারপর থেকে ঋণের বোঝা কাঁধে আর মাথায় দাদার সংসার নিয়ে চলেছিলো লছমনপ্রসাদ। দাদা দূরে সৈন্যদলের সঙ্গে। ছাড়বে না লছমনপ্রসাদ। হঠবার মতো লোক নয় সে। তেওয়ারির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বরং চলবে। তেওয়ারির ছেলে গোরখপুরের কলেজে পড়ে। একবেলা খেয়ে থেকে লছমন দাদার ছেলে রামসুভগকে গোরখপুরের স্কুলে ভর্তি ক'রে দিয়েছে।

তা হলেও লছমন ভালো করে নাই সেনাবিভাগে এসে। .

হঠাৎ যেন কৌতুকের দিকটা চোখে পড়লো রামচলিত্তরের। তেওয়ারীই সেবার তাকে যুদ্ধে পাঠিয়েছিলো আর এবার পাঠিয়েছে লছমনপ্রসাদকে।

কিন্তু কৌতুক নয়, বরং অনুতাপ। তার মনের এই জাম-খেয়ে যাওয়ার ব্যাপারই। সকলেই বলেছে বিকার, কিন্তু হঠাৎ তা মনে করতে গিয়ে থমকে দাঁড়ায়। বাবার রোগজীর্ণ মুখটাকেই মনে পড়ে। তারই ফলে সে এবং লছমনপ্রসাদ সেনাবিভাগে এসেছে। কিন্তু আর সকলে কোথায়? রাত্রিতে যে ধোঁয়াটে ছিলো এই সাদা অন্ধকার তার চাইতেও গভীর। তার এ পাশে তার সেক্‌সেনের দুয়ারকা সিং ও পাশে ল্যান্সনায়েক সুরযপ্রসাদের থাকার কথা। হাতড়ে হাতড়ে সে একটা ভাঁজ হয়ে যাওয়া দেহ পেলো। দুয়ারকা, হেই দুয়ারকা। জামার কলার ধরে সে টেনে তুললো দুয়ারকার মুখ। তার হাতের উপরে, কাঁধের উপরে, কোমরে চাপড়াতে শুরু করলো রামচলিত্তর। দুয়ারকার মুখের কাছে মুখ নিয়ে সে চিৎকার করলো। ডুবন্ত মানুষের জলের উপরে ভেসে ওঠার ভঙ্গিতে খাবি খেতে খেতে চোখ মেললো দুয়ারকা। রামচলিত্তর বললো—উঠ্, জওয়ান। রামচলিত্তরের ভয় হলো খাদের আর সব মানুষও হয়তো দুয়ারকার মতো জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছে। আর এই শীতে জ্ঞান হারানোর অর্থ—। লছমন, লছমনপ্রসাদ? তার বুকের ভিতরটাই হিম হয়ে গেলো। বাঁয়ের দিকে নিচের খাদটায় তার থাকার কথা। সে কি ঘুমিয়ে পড়েছে? ছেলেমানুষ তো! উৎকণ্ঠায় রামচলিত্তর খাদ থেকে বেরনোর জন্য প্রস্তুত হলো। কাল নিজের গলার মাফলারটা সে লছমনপ্রসাদের গলায় জড়িয়ে দিয়েছে বটে, কিন্তু—

ভয়টা তার অমূলক। তার এদিকে সুরযপ্রসাদ দু-হাত দিয়ে আগুন আড়াল করে সিগ্রেট টানছে। তাও ভালো। কিছু একটা করাই ভালো। সুরোপ্রসাদই তাকে খাদ থেকে বেরুতে বাধা দিয়েছে তা হলে। আর তা হলে শুধু চিন্তা নয় সে লছমনের নামও উচ্চারণ করছিলো।

সুরযপ্রসাদ বললো,--ওদের খাদে লেপ্‌টেন্যান্ট চন্দ্রভানজি নিজে আছেন। ডিসিপ্লিন কড়া আছে। ঘুমাবে কেন?

তা হলেও লছমন খুবই ভুল করেছে এই যুদ্ধে এসে। কারণ এটা সাধারণ ব্যাপার নয়। অনেক শয়তানী আছে এখানে। সুরযপ্রসাদ বললো,—চন্দ্রভানজি কাবিল অফ্‌সর হ্যায়। দাদাজি।

সম্বোধনটাই যথেষ্ট। রামচলিত্তরের মনে পড়লো। এ কয়েকদিনই কম্পানির অনেকে তাকে দাদাজি বলতে শুরু করেছে। ছোটভাই লছমনপ্রসাদের জন্য তার দুশ্চিন্তা মাঝে

মাঝে প্রকাশ হয়ে পড়াই তার কারণ। খানিকটা সম্ভ্রম খানিকটা রসিকতায় মিশানো এ সম্বোধন।

সিগ্রেট ধরালো রামচলিত্তর দু-হাতে বাটির মতো আড়াল তৈরি করে। দুষমন আলো দেখবে তা উচিত নয়। ডিসিপ্লিন? মনে মনে হাসলো রামচলিত্তর। ভগবান, এমন যুদ্ধ কখনও দেখেছো? একি শীতের সঙ্গে মানুষের দেহতাপের যুদ্ধ? কুড়ি হাজার ফিট উপরে? কিসের উপরে? কুড়ি হাজার বছরের বরফের নাকি?

আর হাজার গজ দূরে দুষমন। চীনা হুনদের ঘাঁটিতে যেখানে মোর্টারের আড্ডা তার কিছু পিছনে অন্তত দুটো ওয়েপন ক্যারিয়ার দেখা দিয়েছিলো কাল। একি দুষমনের অসতর্কতা যে তার যুদ্ধের প্রস্তুতি দূরবীনে ধরা পড়ে। বন্ধুর বেশে নিশ্চিন্ত করে ঠগী যখন হঠাৎ ঘুমন্ত পথিকের গলায় ফাঁস টানে তখন সে অকুতোভয় হতে পারে বটে। কিম্বা কাল দুপুরে তার মোর্টারের উত্তরে যখন এদিক থেকে একটা গোলাও ছোঁড়া হয় নি তখন সেই কাঁটাওয়ালা সাপটা মনে করেছে ভারতের এই জওয়ান কয়টি তার থাবায় ধরা বাচ্চা হরিণ। দুষমনের ওই ওয়েপন ক্যারিয়ারই প্রমাণ করে কত দীর্ঘদিনের পরিকল্পনায় কত দীর্ঘস্থায়ী বিশ্বাসঘাতকতায় প্রস্তুত হয়েছে চীনা।

কিন্তু কম্পানি কমান্ডার বলবন্ত শর্মাজি জানেন এই ঘাঁটির গুরুত্ব কতখানি। এই ঘাঁটি আর দুষমন যেখানে আছে তার মধ্যে পর্বতে যেন ভাঁজ পড়েছে। পাঞ্চশ গজ চওড়া একটা উপত্যকা দুষমনের আড্ডার নিচে শুরু হয়ে এই ঘাঁটির ভিতর দিয়ে পিছনে বড় উপত্যকাটায় মিশেছে। এটাই 'লা', এটাই গিরিপথ। ভারতের প্রতিরক্ষা দুর্গের আর একটি দরওয়াজা।

তার প্রমাণ দেখো এই অদ্ভুত বিন্যাসে। পেলেটুন প্রতি এক লেপ্‌টেন্যাণ্ট এক সুবাদার। অস্ত্রের বদলে বুদ্ধিমান মানুষ, হিংস্রতাকে রুখতে মনোবল। বর্বরতাকে রুখতে নীতি।

কাল অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় বলবন্ত শর্মাজি ধসে যাওয়া ঘাঁটির পিছনে তার লেপ্‌-টেন্যাণ্টদের ডেকে নিয়েছিলো। বলেছিলো,—দুষমনদের মোর্টার আছে, ভারী পার্বত্য বন্দুক আছে, আমাদের নাই। ওদের বেস থেকে ঘাঁটিতে অস্ত্রবাহী যানবাহনের পথ আছে, অস্ত্র এবং সৈন্য আসবে। আমাদের কনভয় যেখানে থামে সেখান থেকে উঠে আসতে হয় একদিন পায়ে হেঁটে।

দুসরা পেলেটুনের লেপ্‌টেন্যাণ্ট ফাড়কর বললো,—আমাদের মোর্টার চাই, মোর্টার। খবর যাক বেসে এয়ার কভার চাই।

হেডকোয়ার্টার পেলেটুনের লেপ্‌টেন্যাণ্ট চন্দ্রভানজি বললো,—হাঁ, হেভি মোর্টার এবং জওয়ান।

সুবাদার গণপত বললো,—জি সাব।

কিন্তু হো হো করে হেসে উঠলো তিসরা পেলেটুনের লেপ্‌টেন্যাণ্ট করমবাহাদুর রাণা। বললো সে,—আমাদের ছ ছটা ব্রেন আছে।

চমকে উঠে সুবাদার আনোখেলাল বললো,—জি সাব, জি।

পাহাড়ের গায়ে পাথর জড়ো করে ছটা মেসিনগানের পিছনে বসেছে ভারতের ত্রিশ জওয়ান আর তাদের তিন হাবিলদার তিন সুবাদার। ছয় ব্রেনে ছয় দুর্গ। উত্তর দেবে তারা মোর্টারের। বুঝিয়ে দেবে তারা চীনা দুষমনকে যদি আর এক পাও এগোতে সাহস

হয় তাদের।

আর কম্পানি কমান্ডার বলবন্ত শর্মাজি? মেসিনগানের পোস্ট আর ঘাঁটির খাদে আলেয়ার মতো চোরা টর্চ জেবলে ঘুরে বেড়িয়েছে সে। সারা রাত এক একটা মোর্টারের গোলা ফাটতেই সেই আলোটাও নিবে গিয়েছে, আর জওয়ানরা হায় হায় করে উঠেছে। কিন্তু এমন যুদ্ধও দেখে নি রামচলিত্তর, এমন কম্পানি কমান্ডারও নয়। পরপর দুটো গোলা এসে ঘাঁটিটার দেয়াল ধসিয়ে দিলো। কাল সন্ধ্যায় ঘাঁটির ভিতরে কারা শেষ আর্তনাদ করে উঠলো। তারপর রামচলিত্তরের খাদেই আর একজন। বিস্মিত আকুল শেষ ভয়ের আর্তনাদ শুনে মনে হয় নতুন জওয়ান, ব্যথার কারণটা বুঝতে পারে নাই চোট লাগার সঙ্গে সঙ্গে। ঠিক সেই সময়েই তীব্র চাপা গলায় অর্ডার দিয়েছিলো কেউ মাথা নিচু করতে। কোন অসতর্ক জওয়ান হয়তো আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে মাথা তুলে থাকবে। অর্ডারের সঙ্গে সঙ্গেই ঝুপ করে খাদে নেমেছিলো বলবন্তজি। বললো,—পি লেও। কাঁধে স্ট্র্যাপে ঝোলানো চার চার ওয়াটার বট্‌ল। ফুটন্ত রাম মিশানো চা। খাদের পঁচিশ জনের গলায় সেই গরমটুকুর স্পর্শ দিয়ে বলবন্তজি আবার বেরিয়ে গেলো। সারা রাত মোর্টার চললো, আর সারা রাত সে কখনও বরফে হামা টেনে কখনও দাঁড়িয়ে খাদে খাদে জওয়ানদের চা খাইয়েছে। পয়লা পেলেটুন, দুসরা পেলেটুন, তিসরা পেলেটুন। না, এমন কমান্ডার দেখে নি রামচলিত্তর যদিও সে ফরাসী মাটিতে লড়াই করেছে।

প্রথম চোটেই মোর্টারকে আর ওয়েপন ক্যারিয়ারকে ওয়াটার বট্‌লে হারিয়েছে বলবন্তজি। সাবাস্‌।

কিন্তু এমন অন্ধকারও কি এর আগে কেউ দেখেছে? শাদা অন্ধকার। সব যেন লোপ পেয়ে গিয়েছে সেই সাদায় এক ঠান্ডা ছাড়া। ঠান্ডা, জাড়, শীত। দাঁতে দাঁত লেগে যাচ্ছে। কাতর একটা শব্দ বার হলো রামচলিত্তরের মুখ থেকে। দুবার সে মার্কটাইম করলো। তারপর সে স্থির করলো আবার সে ঘুমিয়ে পড়বে যদি কিছু না ভাবতে থাকে।

অদ্ভুত এই পাহাড়া। না, এর কিছু তুলনা নেই। কিন্তু সাদা দেখাচ্ছে কেন? তা হলে দিন হয়েছে। দিন, অথচ কিছু দেখতে পাচ্ছে না। না, ঘুমই আসছে তার। ঘুম না হোক তার মতোই কিছু। ক্লান্তি তো বলা যাবে না একে।

লছমনপ্রসাদ ভেবেছিলো, হয়তো অযোধ্যা তেওয়ারী ভয় পাবে। কালো বেরেট পরা, শক্ত চওড়া লোহার তৈরি চোয়াল। লছমন, যার নাকি সব চাইতে বড় সাইজের মিলিটারি প্যান্ট আর কামিজ লাগে, সে রুখে দাঁড়ালে সব লোকই ভয় পায়, কিন্তু কি আশ্চর্য, এক অযোধ্যা ছাড়া। অযোধ্যা ভয় পায় না। তারও শক্তি আছে। উকীল লাগাতে জানে সে। মাস চারেক হলো লছমন এই কম্পানিতে এসেছে। দাদার সঙ্গে দেখা হতেই সে রামসুভগের চিঠি দেখিয়েছিলো। ঋণ আদায়ের মামলা দায়ের করেছে তেওয়ারী। নিলাম করিয়ে নেবে।

কিন্তু কি লাভ হলো? বল, লছমন?

কি বোঝে লছমন লড়াই-এর? কি জানে সে দুষমনদের শয়তানীর। এই সাদা-অন্ধকারের পর্দার পিছনে এখনই দুষমন কি শয়তানী ভাঁজছে কে জানে?

কথাটা মনে হতেই রামচলিত্তর রাইফেলটাকে চেপে ধরলো। সেই হিমের স্পর্শে হাতের তেলো যেন থেতলে গেলো। কিন্তু হাতের দিকে মন দেয়ার সময় হলো না তার। অনেক বেশী একটা তীব্র শৈত্য সে বুকের মধ্যে অনুভব করলো। এই শাদা পর্দার পিছন থেকে যদি চীনারা লাফিয়ে পড়ে খাদগুলোতে। লছমনপ্রসাদ হয়তো ভরসা করেছে এ

চাকরিতে দাদা আছে। হায়, হায়। তার রাইফেলে যদি গুলি না ছোটে যদি গুলি না ছোটে? গোটা কম্পানিটাই হারবে তার অযোগ্যতায়। হায়, হায়।

দু-দুবার হয়েছে। সেই ডানকার্কে সে জার্মানদের উপরে গুলি ছুঁড়তে পারলো না। আর এই সেদিন ঘরের কাছেই, ঘরের কাছেই।

কে কোন ভাষায় কথা বলবে তাই নিয়ে কাজিয়া। আর তার মূলে নাকি তাদের গোরখপুরী হিন্দীতে আর সকলকে কথা বলানোর হুকুম। মারহাব্বা। হয়তো তার দরকার আছে যারা কাগজপত্র লিখবে তাদের জন্য। যাদের আগে থেকেই জানা আছে ভাষাটা এ আইনে তাদের সুবিধা হবে। যাক সে কথা। ওটা কোন কাজের কানুন নয়। তার জেলার অনেক লোক দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই বঙ্গাল মুলুকে চাকরি করছে, ব্যবসা কবছে—ভাষার জন্য তাদের অসুবিধা হয় নাই। আর গোরখপুরের যে বাঙালি ডাক্তর ভারি ভারি অসুখ সারায় তার হিন্দী শুনলে এদেশের কুকুর বিড়ালও হেসে উঠবে কিন্তু যম ভড়কে যায়। রোগীর বাপ-মা বুক ভরে দম নেয়। তার চাইতেও বড় কথা : সেই ফরাসী মাটিতে যখন জার্মানদের কামানের উত্তরে এদিকের একটা কামানও গর্জালো না, তখন সেই ভারতের জওয়ানদের মধ্যে জাঠ ছিলো, শিখ ছিলো, ডোগরা ছিলো—কে কার ভাষা বোঝে? কিন্তু সেই খাদ যেন ভারতের মাটি হয়ে গিয়েছিলো—তার সম্মান রাখার ভার ছিলো কম্পানি কমাণ্ডার ঝুজর সিংজীর হাতে। কোন ভাষায় এসব কথা জওয়ানদের বোঝানো হয়েছিলো। সাহেব কমাণ্ডারদের মতো পিস্তল ফেলে দিয়ে হাত তোলে নাই সে। ঝুজর সিংজী চিৎকার করেছিলো, চা-র-জ। কোন দেশী ভাষা? আর সেই জার্মান অফিসার যার আর্তনাদ গোরখপুরী ভাষায় মাকে ডেকে কেঁদে ওঠার মতো? সেই ভাষা নিয়ে দাঙ্গা। আমস-অ্যা-রেডি-ফায়ার। কাকে? তাকিয়ে দেখেছিলো রামচলিত্তর ভদ্রলোকের ছেলেরা হাত তুলে তুলে কি বলে চেঁচাচ্ছে। কিন্তু হুকুম হুকুমই। এক্, দো, তিন্, ট্রা ট্রা ট্রারা রা। রামচলিত্তরও পজিশনে রাইফেল নিয়ে ঘোড়া টানতে গেলো। বার-বার সে চেষ্টা করলো কিন্তু একটা গুলিও বার হলো না। রাইফেলের ঘোড়াটাই খুঁজে পেলো না সে। কি লজ্জা, কি লজ্জা।

কিন্তু ভাষাটাষা নাকি রাজনীতি! আর রাজনীতির সে কিই-বা বোঝে? সেই প্রথম বারের চুনাই-এর সময়ে সে রাজনীতির মুখোমুখী হয়েছিলো বটে। সাদা টুপি, লাল টুপি, লাল ঝণ্ডা। লছমনপ্রসাদ লাল ঝণ্ডাদের একদলকে চেপে ধরলো। সকলেই বলছে ঘিউ আর আটার লেখাজোখা থাকবে না। বিনা পয়সাতেও পাওয়া যাবে।

লছমনপ্রসাদ বললো,—মাথা পিছু কত ঘি পাওয়া যাবে? সেটাই বলো খুলে খুলে।

—তা, অনেক।

—কত তাই বলো। নাছোড়বান্দা লছমনপ্রসাদ।

—একসের পাঁচপও। বললো লালঝণ্ডা।

মাটিতে থাপ্পর দিয়ে লছমনপ্রসাদ সোৎসাহে দাদাকে বললো,—উঠা লো ভাইয়া, পও-ভর জ্যায়দা মিলা।

ঝণ্ডাওয়ালারা ভাবলো আচ্ছা মুরখের পাল্লার পড়েছে। কিন্তু ভোটটা দেবে।

তারা চলে যেতেই লছমন দাদাকে বলেছিলো,—গরমেই এরকম হয়েছে। বিলকুল পাগলা হো চুকা। সাদা টুপি, লাল টুপি, লালঝণ্ডা।

রামচলিত্তর জানে রাজনীতির সে কিছু বোঝে না। কিন্তু সে জানতো, বিশ্বাস

করতো নেহেরু আছে রাজনীতির হুইল ধরে। সেই নেহেরু বলতেন—শান্তি, শান্তি ছাড়া আর কিছু নয়। সিপাহী রোগীর সেবা করবে বন্যায় বিপন্নদের বাঁচাবে। দেশে দেশে যাবে জওয়ানরা শান্তিকে স্থায়ী করতে। এই আশ্বাসের জোর না-পেলে সে কি সৈন্যদলেই থাকতে পারতো? এমন জওয়ানের জওয়ান সে, যার হাতের রাইফেল বারবার দুবার প্রয়োজনের সময়েই জাম হয়ে গিয়েছিলো। হ্যাঁ। নিশ্চিন্তই ছিলো সে। নিশ্চিন্ত হয়ে ঠান্ডা মাথায় না দাগলে অমন নিশান দাগা রপ্ত হয় না, তার যেমন হয়েছে। আর সেই নেহেরু নাকি—কি সুন্দর হাসিমাখা মুখ—একটা ফটো আছে তার রেজিমেন্ট হেডকোয়ার্টাসে—সেই নেহেরু নাকি বলেছে হটাও হুনদের। তা হলেই বোঝ কত বড় দুষমন এই চীনা হুন।

আর ঠিক এখনই, যখন শয়তানরা হয়তো নিঃশব্দে এগিয়ে আসছে যদি তার রাইফেল জাম হয়ে যায়! কি অযোগ্যতা ! হো ভগোয়ান। আত্মগ্লানিতে যেন তার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

হঠাৎ একি? কড় কড় করে উঠলো সেই সফেদ অন্ধকারের দিগন্ত। চমকে উঠে খাদের নিচে মাথা নামালো জওয়ানরা।

আরে ও কি? লাউডস্পিকারে কেউ কিছু বলছে? তাইতো। রামচলিত্তর হেসে দুয়ারকাসিংকে ধাক্কা দিয়ে বললো, কা ভইল্ বারে? শুনৎ নহি? দুয়ারকাও শুনতে পেয়েছে। লাউডস্পিকারে বিদেশী উচ্চারণে হিন্দীতে বলছে : যুদ্ধ কোথায়? যুদ্ধ নাই, হিন্দিচিনি ভাই ভাই। তোমাদের সীমায় তোমরা থাকো, আমাদের সীমায় আমরা থাকবো।

রামচলিত্তর সুরযপ্রসাদকে বললো,—কা ভইল্, ভাইয়া।

ল্যান্সনায়েক সুরযপ্রসাদের গোঁফ দেখার মতো বড়ো। কুচি বরফে তা শাদা হয়ে উঠেছে। গোঁফ ঝাড়তে ঝাড়তে সে বললো, উ লোগকো ডর লাগল্‌বা।

তাই হবে। কিন্তু কিছুই বোঝার উপায় নাই। এ পাশে দুয়ারকা, ও পাশে সুরযপ্রসাদ। সুরযপ্রসাদের পরে একজনের কামিজের খানিকটা চোখে পড়ছে। তার বাইরে সমস্ত পৃথিবীটা শাদা।

লাউডস্পিকারে আবার শোনা গেলো—হিন্দিচিনি ভাই ভাই।

তাজ্জব!

দুয়ারকা বললো,—চায় চাপাটি মিলি জি?

একেবারেই ছেলেমানুষ। লছমনপ্রসাদের মতো অনভিজ্ঞ।

রামচলিত্তর হাতের আড়ালে মুখ নিয়ে হাই তুললো। এই দ্বিতীয় রাত কাটলো না ঘুমিয়ে পাহারা দিয়ে।

ঠিক এমন সময়েই পাঁচ সাতটা রাইফেল একসঙ্গে ট্রা ট্রা ক'রে উঠলো।

—আরে—আরে

আরও রাইফেল, অনেক রাইফেল হুরমুর ক'রে উঠলো। পাহাড়ে পাহাড়ে প্রতিধ্বনি জাগলো।

চমকে উঠে জওয়ানদের পেশীগুলো সব আবার ইস্পাতের মতো কঠিন হ'লো।

দাঁতে দাঁত চেপে সুবাদার আনোখেলাল হাঁকলো—টেনস্যান।

কারণ বলবন্ত শর্মাজি চিন্তা করছিলো। রাত্রিতে তবু ধোঁয়াটে আলো ছিলো। শেষরাত থেকে কুয়াশা আর তুষারে যখন তিন হাতের বেশী নজর চলছে না তখন হাতড়ে

দেখা ভালো কারণ শুধু কানের উপরে নির্ভর ক'রে থাকা যায় না। কি ক'রে সে বুঝবে কখন মেসিনগুলো চালাতে হবে, কি ক'রে সে নির্দেশ দেবে জওয়ানদের, কি ক'রে জওয়ানরা বুঝবে কে বন্ধু, কে দুষমন। সুরয, তুমি প্রকাশ হও।

—ফাড়কর, সে বললো দুসরা পেলেটুনের ঘাঁটিতে,—কালো অন্ধকারে রিকোনয়টার করা নিয়ম।

—সার।

—এখন মার্চ করা ছাড়া কি উপায়, এই সফেদ অন্ধকারে?

—সার?

কিন্তু বললো জওয়ানরা,—আলো হ'ক, আলো হ'ক।

বললো ফাড়কর,—এমন শয়তান দুষমন দেখিনি, এমন শয়তান।

জওয়ানরা বললো,—কুত্তীকে বাচ্চোঁ।

দুসরা পেলেটুনের খাদ থেকে ত্রিশ জওয়ান বার হ'লো লেপ্‌টেন্যান্ট ফাড়করের পিছনে সেই শাদা অন্ধকারে বুকে হে'টে হাতড়ে হাতড়ে। একবার শুধু বলবন্তজির হাতের তেলোয় একটু দীর্ঘক্ষণের জন্য তার হাত রেখেছিলো ফাড়কর। তার হাসিটা একটু বা বিবর্ণ দেখালো। কারণ সে জানে, সে জানে—

জওয়ানদের খাদে খাদে খবর দিলো বলবন্ত শর্মা : অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো। ঠিক এমন সময়েই লাউডস্পিকারে দুষমনের গলা শোনা গেলো। প্রথমে বিস্ময় পরে আতঙ্ক দেখা দিলো বলবন্তের মনে। দু-এক মুহূর্তেই এই ধারণাটা তার মনে নিঃসংশয় হ'লো—এই বন্ধুত্ব ঘোষণার আবরণেই তারা এগিয়ে আসবে। বলবন্তের চোয়াল কঠিন হ'লো। ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে দাঁতে। শীতে ফাটা ঠোঁটে রক্ত বেরিয়ে এলো। খবর দিলো সে : অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো। আর—হে সুরয, তুমি প্রকাশ হও। এই প্রার্থনা করলো বলবন্ত শর্মা। আশ্চর্য এই অন্ধকার! এল আলামিনের বালিতে দাঁড়িয়ে কামানের গোলা আর বোমায় তৈরী মধ্যরাত্রির মৃত্যুর অন্ধকার সে দেখেছে। কিন্তু এই সফেদ শয়তানী অন্ধকার? চীনাদের শান্তি-প্রস্তাবের মতোই। হে সুরয তুমি প্রকাশ হও, প্রকাশ হও। ওই সামনে ওখানে এখনই কি হবে কে জানে। সে দাঁতে দাঁত চেপে বললো : তোমার সামনে যে চড়াও করবে সে ছাই হ'য়ে যাক্।

এরকম সময়েই লাউডস্পিকারের ঘোষণাকে বিদীর্ণ ক'রে একশ'টা রাইফেল গর্জে গর্জে উঠলো। মাইন? মাইন? বলবন্তজি হায় হায় ক'রে উঠলো। ফাড়কর তো মানুষ। তা হ'লে, তা হ'লে? হাতড়ে হাতড়ে চ'লে ফাড়কর আবিষ্কার করেছে শয়তানকে। বলবন্তজি ঠিকই ধরতে পেরেছিলো দুষমনের কৌশল। কিন্তু হে সুরয, তুমি প্রকাশ হও, নতুবা একটা গুলি এসে লাগুক আমার বুকে—এই প্রার্থনা করলো বলবন্ত শর্মা, এক অন্ধ কমান্ডারের কোন দরকার নাই ভারতের।

খাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে রাইফেলের শব্দে রামচলিত্তর চমকে উঠলো। আনোখেলালের হাঁক শুনে রাইফেলকে শক্ত ক'রে চেপে ধরলো সে। যুদ্ধ সুরু হয়েছে, যুদ্ধ। কিন্তু দেখা যায় না। অদৃশ্য শত্রু। বাইরের অদৃশ্য শত্রু আর তার মনে নিজের উপরে অনাস্থা। এই দুই চাপে যেন তার মনটাই উল্টেপাল্টে যাবে। তার মনে প্রবল একটা আলোড়ন হচ্ছে। রাইফেল জাম হ'য়ে যায় ঠিক কাজের সময়ে। আর এখন এই যুদ্ধক্ষেত্রে যদি তা হয়? ধাক্কা হচ্ছে তার মনের মধ্যে। কিছু একটা উল্টেপাল্টে গেলো সেখানে। আর তারই ফলে

যেন পরিচ্ছন্নভাবে দেখতে পেলো। আসলে ব্যাপারটা জাম খাওয়া। তার ইচ্ছা অনিচ্ছা। তাই নাকি? তা যদি হয় তবে তো ইচ্ছা অনিচ্ছাকে সে নিজেই চালাতে পারে। আনন্দে চোখে যেন জল এসে গেলো রামচলিত্তরের। একবার সে ভুল করেছে—সেই সেবার সুবাস-বাবুর ডাকে সাড়া না দিয়ে। এবার? এ সুযোগ সে হারাবে না। এবার নেহরুজির ডাকে সে সমস্ত মন দিয়ে সাড়া দেবে। এমন ডাক রোজ আসে না। ভাবো তার সেই হাসি হাসি মুখের কথা—শিশুদের যে সকলের চাচা। সেই বলেছে—হটাও হূন, হটাও চীন। দুষমন তার কতবড় দুষমনি করলে তবে এমন লোকও রাগে ফেটে পড়ে। জর্মান দুষমন ছিলো, কিন্তু এমন হীন ছিলো না তারা। চীনা, চীনা, চীনা। সুতীব্র তিরস্কারের মতো উচ্চারণ করলো নায়েক রামচলিত্তর। রুমাল বার ক'রে সে রাইফেলের চোঙটা ঘষে ঘষে গরম করলো।

সুরয, তুমি উঠে পড়ো। ওঠো, ওঠো। তোমাকে ষঠের দিন আমার মা ও স্ত্রী পুজো করে। তুমি ওঠো। শত্রুকে মুখোমুখী দেখতে দাও। ওখানে একটা যুদ্ধ হ'য়ে যাচ্ছে:

মরিয়া ফ্রিগেট শতগুণে বেশী শক্তিশালী ব্যাট্‌লশিপের সঙ্গে যুদ্ধ করছে এমন বর্ণনা আছে। কিন্তু উত্তর অতলান্তিকের কুয়াশা-ঢাকা কালো রাত্রিতে সেই ম্যান অব ওয়ারের গায়ে ছোট একটা ফ্রিগেটের যদি ধাক্কা লাগে? লোহার চাদরে মোড়া ব্যাট্‌লশিপের ভৃকও আতঙ্কে কেঁপে ওঠে না?

হঠাৎ উঠে পড়লো সূর্য। সে যেন ভারতের জওয়ানদের তেজ। আর সেই আলোয় দৃশ্যটা দেখা গেলো। সে দৃশ্য একবার দেখলে কারো মৃত্যু হয় না।

বলবন্তর মুখে হাসি, কিন্তু এল আলামিনে পোড়খাওয়া এই যোদ্ধার চোখে জল এসে গেলো। দুষমনদের দল ফিরে যাচ্ছে। যারা এসেছিলো তারাই ফিরছে না। অনেক দুষমন পড়েছে হাল্কা তুষারে ঢাকা সেই পাহাড়ে। ফিরছে তারা। পালাচ্ছে, পালাচ্ছে। একজন চৌকিদারের ভয়ে যেমন দশ দশজন চোর পালায়। দুসরা পেলেটুন, সাবাস। দুসরা পেলেটুন লড়াই শেখাচ্ছে চীনাদের। কিন্তু। ফাড়কর ফেরো, ফেরো। স্থান কাল ভুলে বলবন্ত শর্মা চিৎকার ক'রে উঠলো। ওকি করছে ফাড়কর! ঠিক তাই। এই স্বপ্নের নায়ক হিসাবে বলবন্তজি নিজেকে কল্পনা করেছে অনেকদিন। ভারতের জওয়ানরাও খাদের দিকে ফিরছে ধাপে ধাপে আর ফাড়কর একা রিয়ারগার্ড একশ্যান নিচ্ছে রাইফেল তুলে। এক, দুই, তিন, সাত, নয়। নয়জন জওয়ান ফিরে আসছে আর ফাড়করের রাইফেল রুখে রেখেছে চীনাদের। দেখো হিম্মৎ।

সেই মুহূর্তের জন্য সূর্য ভারতীয় সকালের পরিচ্ছন্নতায় উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। সাব্বাস ফাড়কর।

কিন্তু—যারা পালাচ্ছিলো তারা নয়। তাদের সে হিম্মৎ ছিলো না। লুকিয়ে কেউ আঘাত করলো তাকে।

যুদ্ধক্ষেত্র কাঁদার জায়গা নয়। বলবন্তজি দু হাতে বুক চাপড়াতে লাগলো।

জওয়ানরা ফিরে এলো ঘাঁটিতে। ত্রিশজন গিয়েছিলো বরফ ঝরা অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে অদৃশ্য মায়াবী শত্রুকে রুখতে। ন'জন ফিরেছে তারা। ফাড়কর ফেরেনি, ফেরেনি ভারতের বিশজন জওয়ান। কিন্তু দুশ' চীনার সেই মায়াবী দুষমনি মুখ তারা লাথি মেরে ভেঙে দিয়েছে।

কিন্তু আবার আসবে হূন। এবার তারা প্রকাশ্যে আসবে। আসবে তরঙ্গের পর

তরঙ্গ তুলে। অন্ধকারের নিশ্চিন্ত সুযোগে যা তারা পারেনি এবার তা দখল করতে আসবে ক্ষুধার্ত ক্ষিপ্ত নেকড়ের মতো ঝাঁকে ঝাকে। আর মানুষের দুর্ভাগ্য এই : আখেরী হিসাব সে বিজয়ী হ'লেও অনেক খন্ডযুদ্ধে শয়তানকে জয়লাভ করতে দেখা যায়।

দিনের আলো স্পষ্ট হতেই চীনা দুষমন মোর্টার দাগতে সুরু করলো। দুপুর দশটার আগে দুবার তারা এগোলো দু ঝাঁকে। কিন্তু ভারতের সেই চারটি মেশিনগানের পোস্টে চার হাবিলদার তার জওয়ানদের নিয়ে শক্ত পাহারার ব্যবস্থা করেছিলো। দুবার জওয়ানরা চেষ্টা করেছিলো ফাড়কর আর তার সঙ্গীদের কাছে স্ট্রেচার নিয়ে এগোতে— দুবারে আটজন প্রাণ দিয়েছে। ফাড়কর পথের যে জায়গাটায় দাঁড়িয়েছিলো সেখানে প্রতি পাঁচ মিনিটে একবার গোলা পড়ছে—ওটাকে একটা দুর্গ মনে করেছে দুষমন।

কিন্তু দুপুর যখন শেষ হচ্ছে, ওরা এগিয়ে এলো। ফাড়করের সেই দুর্গের কাছাকাছি এসে গেলো তারা। পাহাড়ের ঢালু বেয়ে নামছে, পাহাড়ের ভাঁজ থেকে বেরোচ্ছে তিসরা পেলেটুনের পাশ কাটিয়ে পাঁচশ' চীনার একটি ঝাঁক। ছুটে আসছে তারা জোয়ারের মতো। প্রাণহীন বুদ্ধিহীন একটা নির্বোধ আগ্নেয় জড়তার শ্রোতের মতো। এবার বোধ হয় সাহসের, সহিষ্ণুতার, বীর্যের বাঁধ ভেঙে পড়বে।

প্রথম খাদেই লেপ্‌টেন্যান্ট করম বাহাদুর রাণা হাঁকলো—আর্মস অ্যা রেডি।

কিন্তু সুবাদার পীতমচাঁদ বললো, ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক।

খল খল ক'রে হেসে উঠলো করম বাহাদুর রাণা,—কেঁউ, কভি দেখা নেহি ট্যাঙ্ক?

নায়েক গুলাব সিং বললো,—সাব? সাব?

কমর বাহাদুরের ঈষৎ বাঁকা চোখ দুটোর দৃষ্টি তার কুকরীর মতো ঝক্‌মক্‌ ক'রে উঠলো। হাঁকলো সে, ফায়ার, ফায়ার।

হোক ট্যাঙ্ক। হাঁকলো সে, হর হর মহাদেও। লহড়ায়ে যা, লহড়ায়ে যা।

দ্বিতীয় এবং তৃতীয় খাদেও লাফিয়ে উঠেছিলো জওয়ানরা। তারাও দেখেছে ট্যাঙ্ক। সঙ্গীদের বন্ধুদের এই বিপদে তারা অস্থির হ'য়ে উঠেছিলো। কিন্তু হুকুম এলো : অপেক্ষা করো, অপেক্ষা করো। দ্বিতীয় খাদে লেপ্‌টেন্যান্ট চন্দ্রভান যেমন, তৃতীয় খাদে বলবন্তজিও তেমন। আবেগহীন নিরুত্তাপ কাঠিন্যে স্তব্ধ হ'য়ে রইলো পয়লা পেলেটুন। সঙ্গীন পরাও রাইফেলে।

এ যেন জাহাজডুবির পরে লাইফবোটে ভাসা। সঙ্গীকে ভেসে যেতে দেখেও চূড়ান্ত-ভাবে বোঝাই করা বোটে তাকে তুলে নিতে না পারার অসহায়তা।

নায়েক রামচলিত্তর এই সময়ে আবার সেই পাগলের মতো কাজটা ক'রে বসলো। সুরয দেবতা তার প্রার্থনা শুনেছে। এখন সে সব দেখতে পাচ্ছে। প্রচন্ড একটা দায়িত্বভার এসে পড়লো যেন তার উপরে। সে নিজের মনকে দুবার ধাক্কা দিয়ে নিলো। না জাম ধরতে সে দেবে না। মনে করো সেই একবার সুযোগ হারিয়েছো যখন সুবাস বাবু ডেকেছিলো। আর এই এবার ডাক দিয়েছে তারই দোসর নেহেরুজি। ট্যাঙ্ক, ট্যাঙ্ক। হায় ভগোয়ান! ট্যাঙ্ক যে! ট্যাঙ্কের বিরুদ্ধে চাই বাজুকা আর অ্যাণ্টিট্যাঙ্ক কামান। একি, একি, ভগোয়ান, আবার জাম ধরছে তার মন? নিশ্চয়ই তার যা করা উচিত তা সে করছে না, আর সে জন্যই এই ট্যাঙ্ক আসতে পেরেছে। এখন? এখন? অথচ সে নাকি একজন ভারতীয় অপ্‌সর এন. সি. ও! হঠাৎ সে প্রচন্ড শব্দে ফুকরে উঠলো : বলো বলো পন্ডিত নেহেরু কি—। একমুহূর্ত।

দ্বিতীয় মুহূর্তও পার হ'য়ে গেলো। তারপর দুটি খাদের পঞ্চাশজন জওয়ান আকাশকে স্তম্ভিত ক'রে বজ্রের মতো গর্জন ক'রে উঠলো—জয়।

এক নম্বর খাদের পিছনে বাঁয়ে দু নম্বর খাদ তার পিছনে ডাইনে তিন নম্বর—পয়লা পেলেটুনের।

এই মুহূর্তের জন্যই অপেক্ষা করছিল বলবন্তজি। দুশমনের এই উত্তাল জোয়ারকে রুখতে পারা যায় শুধু কলিজার জোরে। শ্রদ্ধা ভালোবাসার স্নিগ্ধতা যাকে বজ্রের চাইতেও দৃঢ়তা দিয়েছে। দুটো খাদ থেকে পঞ্চাশজন জওয়ান ছুটে বেরোল। যেন তারা পাগল, কিম্বা তারা যেন সেই সব সত্যাগ্রহী যারা চাবুকে পিঠের চামড়া ছিঁড়ে গেলেও লবনের হাঁড়ি ছাড়ে নি, কিম্বা ভারতছাড়ো ব'লে রাইফেলের গুলি নিয়েছিলো বুক পেতে, অথবা সেই সব জওয়ান যারা কুরবানির শপথ নিয়েছিলো এক নেতার মতো নেতার ডাকে। চীনা হূনদের দু পাশ থেকে গর্জন ক'রে উঠলো তারা ভারতমাতা কি—জয়।

যত সহজ ভেবেছিলো দুষমন তত সহজ নয়।

আবার খাদে ফিরে এলো জওয়ানরা। আর দুষমন যেন কোথায় তাদের ভুল হয়েছে তা ভাবতে ফিরে গেলো। হাঁ, তাদের ট্যাঙ্ক সত্ত্বেও পাহাড়ের ভাঁজটায় তারা আড়াল নিচ্ছে!

বলবন্তজি আকাশের দিকে তাকালো। ফাড়কর নেই, করমবাহাদুর নেই, চন্দ্রভান নেই। একশ' পঞ্চাশজনের চল্লিশজন অবশিষ্ট আছে। অদ্ভুতভাবে শূন্য হ'য়ে গিয়েছে তার মন, আর সেই শূন্য মনে একটা কথা ঘুরছে, আহত জওয়ানরা পড়ে আছে, তাদের কিছু করতে পারছে না সে। আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকালো সে যেন হেলিকপ্টারের খোঁজে। সে কি ওই আহত জওয়ানদের সেবা করার জন্য দু হাত তুলে এগিয়ে যাবে? কি করবে সে এখন? কেউ কি ব'লে দিতে পারে এখন কি তার করা উচিত? সে একবার ভাবলো সে যদি জেনারেল হ'তো তা হ'লে একা চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার অভ্যাস থাকতো। এ অবস্থায় কি পিছিয়ে যাওয়াই ঠিক হবে না? কি গুরুভার দায়িত্ব তার? দুষমনদের কাছে হারমানার দায়িত্ব।

নায়েক সুরযপ্রসাদ বললো,—আমরা পিছিয়ে যাবো। প্রস্তুত হ'য়ে আসবো। দুষমনকে শিখলাবো কি ক'রে লড়াই করতে হয়।

সুবাদার ললতাপ্রসাদ বললো,—ওয়াজিব, ওয়াজিব।

সুবাদার গণপৎ বললো,—আমরা এক কদম পিছিয়ে যাবো সে শুধু দুষমনের উপরে লাফিয়ে পড়ার জোর আনতে।

কিন্তু বলবন্ত শর্মা আকাশের দিকে তাকালো। আশা করার কোন যুক্তি খুঁজে পাচ্ছেনা কিন্তু আশা করছে একটা হেলিকপ্টার অন্তত দেখা দেবে আকাশে। এই বিকেল, তারপরে সন্ধ্যা এবং রাত্রি—তারপর হয়তো একটা পরিবর্তন আসবে। আর এক কম্পানি জওয়ান উঠে আসবে, হয়তো একটা দুটো পার্ব্বত্য বন্দুক।

বলবন্তজি তার চল্লিশজনের সৈন্যবাহিনীকে শেষবারের মত যার যার জায়গা নিতে বললো। পাথরের আড়ালে আড়ালে বুকে হেঁটে জওয়ানরা তাদের ধ্বংসে যাওয়া ঘাঁটির পিছনে স'রে গেলো। যেখানে দুটি খাদ আছে। সেই খাদ দুটিই শেষ খাদ। তারপরই পরাজয়। ঘাঁটি আর পরাজয়ের মাঝখানে নিজেদের দাঁড় করালো জওয়ানরা।

এখন কর গুণে গুণে ঘণ্টার হিসাব করছে বলবন্তজি। কাল সকাল পর্যন্ত ক'ঘণ্টা হয়?

সূর্য হেলে পড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে শীতও নামছে। বলবন্তজি বললো,—তোমরা খাবে

না কিছু? চাপাটি বানাও। সিগ্রেট টানছো না কেন? এখনও লড়তে হবে। লড়তে হবে। আর যাই হ'ক ঘাঁটি যদি কেউ ছাড়ে সে আমরা নই। বলো এই কম্পানি কখনও হার মেনেছে? এমন কোন খবর জানো? হার মানার প্রথম আর শেষ নজির রাখবো আমরা? এই অদ্ভুত প্রশ্ন ক'রে নিজেই সে হেসে উঠলো।

অপূর্ব একটা ভাব দেখা দিয়েছে নায়েক রামচলিত্তরের মনে। তাকে শান্তি বলা যায় না যদিও তা শান্ত কারণ সেখানে একটা কঠোরতা আছে। তাকে ঔদাস্য বলা যায় না, যদিও তা উদ্বেগহীন, কারণ সেখানে যেন কিছু উদ্গত হবে। কোন তুলনাতেই তার সে মনোভাবকে ধরা যায় না।

সুবাদার গণপত যখন আহত জওয়ানদের সরিয়ে আনা যাচ্ছে না ব'লে ক্ষোভ প্রকাশ করলো নায়েক রামচলিত্তর নিঃশব্দে চাপাটি ছিঁড়ে ছিঁড়ে মুখে পুরলো।

সিপাহী লছমনপ্রসাদ একটু ভয়ই পেয়েছে। লছমনপ্রসাদ তার ছোট ভাইও তো বটে। তার বেয়োনেটটা বেঁকে গিয়েছে। অভিজ্ঞতা না থাকার জন্যই সে মনে করেছিলো বেয়োনেটটাকে নষ্ট করার জন্য কেউ তাকে তিরস্কার করবে। কিন্তু এটা ব্যারাক নয়। তার প্রমাণ ললতাপ্রসাদ নিজেই তাকে একটা বেয়োনেট যোগাড় ক'রে দিয়েছে। লছমনপ্রসাদ বলছিলো যখন রামচলিত্তরের মনে শুধু এই কথাটাই ফুটলো—ওটা বোকামি। ট্যাঙ্কের গায়ে বেয়োনেট বেঁধে না তা যত জোরই তোমার গায়ে থাক।

খাদ থেকে উঠে দাঁড়ালো রামচলিত্তর ধীরে ধীরে। এদিক ওদিকে চেয়ে দেখলো। হ্যাঁ, সঙ্গীদের মৃতদেহগুলো চোখে পড়ছে। পাঁচশ গজ দূরে করমবাহাদুরের খাদ। হাঁ, ওখানে অনেক মৃতদেহ। নিজের ঠোঁটটাকে কামড়াতে লাগলো সে।

কিন্তু এদিকে দেখো বড়ো একটা পাথর। বেশ একটু আড়ালও তৈরি করেছে। পাথরটায় পিঠ দিয়ে নিজেদের খাদের দিকে মুখ রেখে বসলো সে। হাঁ, কিছু তো বটেই, সুনির্দিষ্টই সেই কিছুটা, কিন্তু খানিকটা অলস উদ্দেশ্যহীনতা দিয়ে সেই মূল্যবান কিছুর মুখ আবৃত। কি সেটা? সে মনের মধ্যে খুঁজছে।

একবার সে ভাবলো : সে যাই হ'ক এটা প্রমাণ হ'য়ে গিয়েছে যে প্রয়োজনের সময়ে তার রাইফেল জাম খেয়ে যাবে না। ট্রিগারে আঙুলে এক করতে অসুবিধা হয় নাই তার। এটাই হওয়া উচিত। সে যখন মনে প্রাণে স্থির ক'রে ফেলেছে যে সে নেহেরুর ডাকে সাড়া দেবে তখনও রোগ তাকে বাধা দেবে এমন হয় না। আর যখন সে সাড়া দিতে পেরেছে তখন আগেকার সে সব ঘটনাকে এখন বাদ দিলেও কোন ক্ষতি নাই।

কিন্তু এটা তার চিন্তার বিষয় নয়। বরং সে মুখ ঘুরিয়ে বসলো। যে দিকে দুষমন সে দিকেই মুখ ফিরালো সে। আর তখন তার চিন্তাটা আবার হাল্কা অলস মেঘের মতো ভেসে গেলো। চূড়ার পাশে এমন অলস মেঘকে ভাসতে দেখা যায়। আর তেমন মেঘ সেই পাহাড়ের বুকের ভিতর থেকেই উঠে আসে, কারণ পাহাড় নিজেও জানে না তার বুকের ভিতরে কি হচ্ছে। রামচলিত্তরের মুখে সেই শাদামেঘের ছায়াও পড়লো হাসির মতো হ'য়ে। লছমনপ্রসাদ বলেছে কথাটা। সামান্য অবসর পেয়েছিলো কিন্তু না ব'লে পারে নি : চন্দ্রভানজি ছিলেন ব্যারিস্টারের ছেলে, ব্যারিস্টারের পৌত্র। তিনি বলেছেন, যে মাটিতে চীনা দাঁড়িয়ে আছে তাতে তাদের হক নাই। তেওয়ারির মতোই শয়তানী ওদের। লছমন-প্রসাদ কি ভেবেছে যে চীনাদের ব্যাপারেও রামচলিত্তর সহনশীলতার বাড়াবাড়ি করবে? তাই মনে করিয়ে দিয়েছে নাকি এখানে চীনারাও আইনের প্যাঁচ লাগাবে? তেওয়ারি যেমন ঋণ

আদায়ের মামলা রুজু করেছে।

হ্যাঁ, লছমনপ্রসাদের ওটা অনভিজ্ঞতার ফল। কিছুটা বোকামিও বটে। নতুবা সে নিজে কেন আসবে সৈন্যদলে নাম লেখাতে? না সহিষ্ণুতা নয় এই কথাটা যেন ফুঁপিয়ে উঠলো তার মনে। কোন কোন বেকামি আছে যা সব সেরা বাহাদুরীর চাইতেও বাহাদুর। হাঁ, হাঁ, করমবাহাদুর রাণাকে বাহাদুর ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায় না। ট্যাঙ্কের হ্যাচওয়ের ভিতরে সে গ্রেনেড্ মেরেছে। সাবাস্ সাবাস্।

হঠাৎ তার বুকের ভিতরে, যা থেকে এই অলস চিন্তাগুলো উঠে আসছে, কিছু একটা যেন নড়ে উঠলো, যেন রক্ত ছলকে উঠলো।

প্রায় দু মিনিট ধ'রে কিছু যেন তার লক্ষ্যে আসছে। ডাইনের পাহাড়ের উপরে একটা মোর্টার বসাচ্ছে নাকি ওরা। বসাচ্ছে নয়, বসিয়েছে। তার পিছনে নড়ছে কিছু। ওটা একটা দুষমন অফসরই হবে।

রামচলিত্তর তার আতসচোঙটা বার করলো। তার রাইফেলের উপরে এই চোঙটাকে বসানোর মতো একটা খাঁজ আছে। নিশান দাগতে সুবিধা হয়।

ছোট টেলিস্কোপটা সে পরালো রাইফেলের মাথায়। যেখানে ওরা মোর্টারটা বসিয়েছে সে জায়গাটাকে আটশ'গজের চাইতে বেশী দূর মনে হ'চ্ছে না। রাইফেলটাকে পাহাড়ের খাঁজে বসালো রামচলিত্তর।

তার বুকের ভিতরে কিছু একটা ধাক্কা দিচ্ছে। ঠোঁটটাকে সে এমন ক'রে কামড়ালো যেন রক্ত দেখা দেবে। কিন্তু আটশ' গজ নয়? সে ছশ' সাতশ' গজ পর্যন্ত বুলশ্ আই ঠিকই বিঁধতে পারে।

শব্দটা হ'তেই রামচলিত্তর নিজেই চমকে উঠলো। তার রাইফেলটা ছুটে গিয়েছে। ট্রিগারটা টেনেছে সে তা হ'লে। আর, আর, বিঁধেছে, বিঁধেছে। মোর্টারের পিছনে চীনাটা পাক খেয়ে প'ড়ে গেলো। একটু যেন অবাক হয়েছে দুষমন, তাই নয়?

চীনা, চীনা, চীনা। থুঃ থুঃ ক'রে থুথু ফেললো রামচলিত্তর। হাঁ, করমবাহাদুর, চন্দ্রভানজি। কাবিল অফসর থে। লছমন প্রসাদই বলেছে করমবাহাদুর ট্যাঙ্কের গা বেয়ে উঠে গ্রেনেড ফেলেছিলো হ্যাচওয়ের জোড়ের মুখে।

তার আতসচোঙে ধরা পড়ছে মোর্টারের কাছে আর একজন এগোচ্ছে। ঘোরাচ্ছে মোর্টারের নলটাকে। নিশানা ক'রে মোর্টার দাগবে? আটশ' গজের উপরেই হবে? তা হ'ক। গুরুর নাম ক'রে মনে মনে কান মললো রামচলিত্তর। তারপর আবার ট্রিগার চাপলো সে। খল্‌খল্ ক'রে হেসে উঠলো—পড়েছে, পড়েছে। আর একটা চীনা পড়েছে।

হঠাৎ দুচোখ ভ'রে জল এসে গেলো রামচলিত্তরের। আর এতক্ষণে মনের সেই অলসভাবটা কেটে গেলো। পাথর হ'য়ে যাওয়া শোক, নিরুপায় ক্রোধ যেন ভাষা পেলো। শালে চীনি। রাইফেলটাকে একটু উঁচু করলো রামচলিত্তর। বহুদূরের ছায়ার মতো সাঁজোয়া গাড়ী একটা এগোচ্ছে দেখো। নামলো একজন গাড়ীর দরজা খুলে। গর্দান আর কন্ধা চোখে পড়ছে। হা হা ক'রে হেসে উঠলো সে দুরন্ত উল্লাসে। তারপর ঠোঁট কামড়ে ধ'রে পাথর হ'য়ে গেলো আবার। এক্ দো, তিন, মনে মনে বললো রামচলিত্তর, ট্রিগারটাকেও টানলো। গিরা, গিরা, চীনা গিরা। জায়গা থেকে একটু স'রে গেলো সে। হ্যাঁ, তাই বলেছে তার নিশানদাগার গুরু জমাদার খুরশেদ খান। খলখল ক'রে সে হেসে উঠলো।

এমন সময়ে ললতাপ্রসাদ বুকে হেঁটে তার পাশে এসে বসলো। তখন রামচলিত্তরের মনো হ'লো কাজটা সে ভালো করে নাই। যুদ্ধক্ষেত্র নিজের ঘৃণা, রাগ বা বাহাদুরী দেখানোর জায়গা নয়। মনে মনে একটা কৈফিয়ৎ দাঁড় করাতে চেষ্টা করলো সে। খুবই রাগ হয়েছিলো তার। তার দম বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছিলো। বুকের ভিতরে কিছু একটা ফেটে যাবে বলে মনে হচ্ছিলো। এরকম কিছু করতে না পারলে পাথরে মাথা ঠুকতে হ'তো তাকে।

ললতাপ্রসাদ বললো,—লড়াই করো, লড়াই করো। কমাণ্ডারজি সাবাস বলেছেন। হাসতে গিয়ে রামচলিত্তর বললো,—হে সুবাদারজি, হে—

এখন বিকেল হচ্ছে। ধ্বংসে যাওয়া ঘাঁটির কিছু পিছনে চল্লিশজন ভারতীয় জওয়ান শেষ খাদে যেখানে দাঁড়িয়েছে, সারাদিনের প্রচণ্ড শীত এখন সেখানে বরফের শীতলতা নিয়ে নামবে। বলবন্তজি আবার আকাশের দিকে তাকালো। ঘড়ি দেখলো। ঘণ্টা—আর ক'ঘণ্টা ঠেকিয়ে রাখতে পারবে তাই সে ভাবছে এখন। সে একবার ভাবলো সন্ধ্যার প্রথম অন্ধকারেই খাদ থেকে বেরিয়ে পিছনে স'রে যাওয়া যায়। এই চল্লিশটা প্রাণের দায়িত্ব সে আর বইতে পারছে না। পিছিয়ে যাওয়াই কি ঠিক নয়? মেশিনগানটার ওপর দিয়ে সে সামনের দিকে চাইলো। শত্রুরা অপেক্ষা করছে, কিন্তু কেন? আন্দাজ হয় সামনের মোর্টারের কাছে চার পাঁচ শ' অপেক্ষা করছে। ঘড়ি দেখলো বলবন্তজি। একটা দীর্ঘনিশ্বাস পড়লো তার। আকাশের দিকে তাকালো সে। সেই দারুন শীতেই যেন শিউরে উঠলো একবার। হঠাৎ তার মনে পড়লো তার নিজের গ্রামেই গত শীতে একটা মেডিক্যাল কলেজ হয়েছে। সেটা না হ'লে তার বদলে একটা হেলিকপ্টার হ'তে পারতো। বাইনকুলরটা চোখে তুললো আবার সে। স্বগতোক্তির মতো বললো,—ক্যা কিয়া যায়।

তার পিছনে লছমণপ্রসাদ চমকে উঠে বললো,—জি, সাব?

বলবন্তজি কথাটা নিজেকেই বলেছিলো। অনুচ্চারিত অংশটুকু এই ছিলো—পিছনে হঠা যখন চলতে পারে না, তখন চল্লিশজন দিয়েই চারশ'কে রুখতে হবে। কিন্তু চার হাজার যদি হয়? কি করা যাবে?

লছমণপ্রসাদ তার বেয়োনেটটাকে আর একবার পরীক্ষা করলো। হ্যাঁ, সে বলবন্তজির ঠিক পিছনেই থাকবে। বলবন্তজির সামনে মেশিনগান আর পিছনে সে, মৃত্যু তাঁকে ছুঁতে পারবে না। সে ভুলই করেছে সেই গোলমালের সময়ে করমবাহাদুরজির পিছনে সে থাকলে দুষমন সুবিধা পেতো না।

মনকে এই আশুব্যাপারে দৃঢ়নিশ্চয় ক'রে সে চিন্তার সময় পেলো। সে ভাবলো, রামসুভগকে বলতে হবে দেশে ফিরে—এই দুষমনদের কথা। এই ভয় যখন কাটিয়ে উঠেছি তেওয়ারীকেও ভয় পাওয়ার কিছু নেই। চীনাদের অনেক শক্তি আছে তা হ'লেও আমরা মাটি ছাড়ছি না। তেওয়ারিরও অনেক শক্তি আছে—তাকেও মাটি ছাড়বো না। হাঁ, লড়াই চলবে। সে নিজে না থাকলেও। রামসুভগ, তু চালিয়ে যাবি—তেওয়ারি আর তেওয়ারির উকীলদের সঙ্গে যুদ্ধ। তেওয়ারী আর তার ছেলের সঙ্গে। শালা বেটা শালা।

দিনের শেষ আলো নিভে আসছে পাহাড়ের গায়ে। থু থু ক'রে হাতে থুথু ফেলে, হাত দুটো ঘষে ধরবার জোর ফিরিয়ে আনলো হাতে লছমনপ্রসাদ। বৃথাই সে আখরার মাটি গায়ে মেখেছে যদি এই চীনা আর তার দোসর তেওয়ারি তার জমি কেড়ে নেয়।

আক্রমণটা এলো সন্ধ্যার ঠিক আগে। দূরের মানুষ তখন অস্পষ্ট মনে হচ্ছে। চারশ', পাঁচশ', হাজার চীনা ছুটে আসছে তাদের সাব মেশিনগান আর অটোমেটিকের গুলি

ছু‍ঁড়তে ছু‍ঁড়তে।

বাঁয়ের খাদ থেকে সুবাদার ললতাপ্রসাদ বললো,—সাব? সাব? সে কি ভয় পেয়েছে?

আরও কাছে আরও কাছে এগিয়ে আসছে তরঙ্গটা।

সুবাদার ললতাপ্রসাদ উৎকর্ণ হ'য়ে উঠলো হুকুমের জন্য। দু'শ গজ, দুশ' গজের মধ্যে এসে গিয়েছে দুশমন।

আশ্চর্য! কোন হুকুম নেই। সুবাদার ললতাপ্রসাদ ভাবলো—এবার তাহ'লে আমরা ধরা দিচ্ছি।

হঠাৎ মেশিনগানটা গর্জে উঠলো বলবন্তজির খাদে। ললতাপ্রসাদ রুদ্ধ চাপা গলায় তার খাদকেও হুকুম দিলো—ফায়ার।

আধঘণ্টা ধ'রে চেষ্টা করলো দুষমণ এই শেষ খাদদুটোকে দখল করতে। আর আধ-ঘণ্টা ধ'রে ভারতের সম্মান আর দুষমণের মাঝখানে মৃত্যুর প্রাচীর তৈরি করলো জওয়ানরা। হায়! দুষমণের কি শেষ নেই, শেষ নেই? খাদে এসে পড়ছে ওদের গ্রেনেড। খাদ থেকে লাফিয়ে উঠেছে জওয়ানরা, বলবন্তজির পাশে ছুটে আবার চেষ্টা করছে। হাঁ, এখানেই দাঁড়াবে তারা শেষবারের মতো। দশজন আসতে পেরেছে। ঘাঁটির ভাঙা দেয়ালের পাশে এখানেই তারা শেষবারের মতো দাঁড়াবে। বলবন্তজি তাদের নেতা, ভারতের প্রতীক।

দুষমণদের একজন অফসরই বোধ হয়। তার হাতের পিস্তলেই বলবন্তজি লুটিয়ে পড়লো। শেষবারের মতো হুকুম দিলো কম্পানিকে—কভার, কভার। আর তাকে পড়তে দেখে ফুঁপিয়ে উঠলো লছমন, অদ্ভুত একটা আর্তনাদ ফুটে বেরুলো তার মুখে। স্থানকাল ভুলে গেলো সে। দুষমণ, দুষমণ, আখেরি দুষমণ তার। ছাড়বে না সে, ছাড়বে না প্রাণ গেলেও। সে প্রতিজ্ঞা করেছিলো বলবন্তজিকে পিছন দিকে বাঁচাবে। দুষমণের উপরে লাফিয়ে প'ড়ে দুহাতে তাকে আঁকড়ে ধরলো লছমণপ্রসাদ। কে একজন গুলি করলো। লছমণপ্রসাদ শূন্য দেখতে লাগলো, শূন্য একটা খাদ বেয়ে যেন সে প'ড়ে যাচ্ছে। বিশাল বলবান দেহের শেষশক্তি দিয়ে কিছু একটাকে সে আঁকড়ে ধরলো।

পাহাড়ের ঢালু বেয়ে লছমণপ্রসাদের গুরুভার দেহের সঙ্গে চীনা অফিসারের অর্ধ-চেতন দেহটা গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে চ'লে গেলো।

তখন রাত হয়েছে। ঘাঁটিটা দখলে গিয়েছে দুষমণের। ভারতের পতাকা নামিয়ে ফেলেছে তারা। জওয়ানদের কম্পানিটা নিঃশেষ হয়েছে, পিছু হটে নি। তাদের দৃঢ়তায় ভগবান বিস্মিত হয়েছেন। চীনাদেরও কি অবাক লাগছে না?

আজও বরফ পড়বে। হু হু ক'রে সব উত্তাপ যেন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই অন্ধকার যেন সূর্য নিবে যাওয়ার পরের অন্ধকার। চীনারা আগুন জ্বালছে। অনেকটা দূরে দূরে ছড়িয়ে পড়ে পাহারা দিচ্ছে তাদের শান্ত্রীরা। ওদিকে তাদের রান্নার যোগাড় হচ্ছে।

ঘাঁটির নিচেই, পঞ্চাশ গজের মধ্যে পাহাড়ের ঢালুতে অন্ধকার। এই ঢালু জায়গাটাতেই খাদ কেটে কাল ভারতীয় জওয়ানদের রান্নার আগুন জ্বালানো হয়েছিলো। খাদটার ধারে রান্নার বাসনগুলো ছড়ানো। তিনজন চীনা পাহারা দিচ্ছে এদিকে। ঢালুটার কাছাকাছি পর্যন্ত আসছে এক একবার। দু একটা অলস রাইফেলের গুলিও এসে পড়ছে সেখানে।

সেই রান্নার খাদে নায়েক রামচলিত্তর স্তব্ধ হ'য়ে বসেছিলো। দুজন জওয়ান সেই

প্রবল শীত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই খাদে আশ্রয় নিয়েছে। রামচলিত্তর একেবারে বোকা হ'য়ে গিয়েছে যেন। তার মনে পড়লো বলবন্তজি চিৎকার ক'রে বলেছিলো—কভার। রামচলিত্তর যেন অর্ডারটা আবার শুনতে পেলো আর সঙ্গে সঙ্গে মাথা নিচু করলো। রামচলিত্তর ভাবলো : কেউ নেই, সে ছাড়া আর কেউ নেই যে জওয়ানদের হুকুম দিতে পারে। সেই যা নায়েক—দফিতা আছে। কিন্তু কভার তো নেয়া হ'লো, তারপর? এই রাস্তার খাদের পরে বোধ হয় ঘাঁটির সীমাও শেষ। তা হ'লে?

ব্যাপারটা ঘটে গেলো।

চীনা প্রহরী একবার খাদের কাছে এসে ভয়চকিত হ'য়ে ফিরে গেলো। ঘাঁটিতে আগুনের কাছে যারা ছিলো তাদের কিছু বললো। প্রায় পঞ্চাশজন চীনা রাইফেল নিয়ে ছুটে বেরিয়ে এলো।

নায়েক রামচলিত্তরের পাশে ছিলো দোয়ারকর সিং। সে বললো ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে, নায়েকজি, ক্যা কিয়া যায়।

নায়েক রামচলিত্তর ভাবলো, তাই তো। এখন তো আর কেউ অর্ডার দেবে না সে যদি না দেয়। তা হ'লে খাদ থেকে অন্ধকারে গা ঢাকা দেবে তারা যে যেদিকে পারে? যা করতে হবে এখনই করা দরকার। চীনারা এগোচ্ছে, সন্তর্পণে কিন্তু নিশ্চিতভাবে এগোচ্ছে। রাইফেল থেকে গুলি ছুঁড়ছে তারা অন্ধকারে।

এইবার হার হ'লো, ভাবলো জওয়ানরা। যেন এতক্ষণ তাদের হার হয় নাই। হায়, হায়, যদি বলবন্তজি থাকতো। গুঁটিসুটি বরং বসলো তারা। রাইফেলের নলগুলো তারা বাড়িয়ে ধরলো খাদের উপরে।

নায়েক রামচলিত্তর ভাবলো : এইবার এতক্ষণে ভারতের মান গেলো। বলবন্তজি, চন্দ্রভান, করমবাহাদুর নাই, সুবাদার গণপৎ, লছমনপ্রসাদও নাই। ওদিকে চীনারা এগিয়ে আসছে, সতর্ক পা ফেলে ফেলে পঞ্চাশজন দুষমন। চীনা, চীনা, ঠোঁট কামড়াতে লাগলো রামচলিত্তর।

রামচলিত্তর ভাবলো আবার, কি অদ্ভুত এই কম্পানি। শেষ পর্যন্ত এক নায়েকই কমান্ডার। তিন পেলেটুনের কুড়ানো ছয় জওয়ান। কিন্তু আর পনরো গজও নাই। অত্যন্ত ক্রোধে বাঘের চোখ যখন আগুনের মতো জ্বলতে থাকে, তখন তার উন্মুক্ত ব্যাদান বজ্রনাদ গর্জনের ভঙ্গিতে প্রসারিত থাকে, কিন্তু চাপা একটা গরগর শব্দই শুধু শোনা যায়। চীনা, চীনা, চীনা, রুদ্ধ নিঃশ্বাসে গরগর করতে লাগলো এই ঘৃণ্য জঘন্য নামটা রামচলিত্তরের গলায়।

না, রামচলিত্তর এমন যুদ্ধ আর কখনও দেখে নাই। সোমসের সেই যুদ্ধও নয়। এমন এক কম্পানি যার কমান্ডার একজন নায়েক। কিন্তু পনরো গজও নাই। ঝুজের সিং তবু তবু অফিসর ছিলেন। তা হ'লে এতক্ষণে কি ঘাঁটি ছেড়ে দিতে হবে দুষমনকে? তবে বলবন্তজি কভার নিতে হুকুম দিলেন কেন?

হঠাৎ রামচলিত্তর তার রাইফেল ধ'রে লাফিয়ে দাঁড়ালো। সেই অন্ধকারের বিভীষিকাকে খানখান ক'রে কম্পানির শেষ কমান্ডারের বজ্রগর্জন শোনা গেল : চা—র—জ।

আঁ আঁ আঁ—ছয়জন ভারতের জওয়ান লাফিয়ে পড়লো দুষমনের বুকে। এই সেই বেয়োনেট চার্জ যার ভয়ালস্মৃতি ভারতের জওয়ানদের দুষমনরা কোনদিনই ভুলতে পারে না। চা—র—জ। চীনাদের অগ্রগামী দলকে ছিন্নভিন্ন ক'রে আবার তারা এগোচ্ছে।

লড়ছে, আবার লড়ছে তারা!

সংবাদটা গ্রামে আনলো দোয়ারকা, হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার দু দিনের মধ্যে। রেল স্টেশন থেকে তার নিজের গ্রামে যেতে রামচলিত্তরের গ্রাম পার হ'য়ে যেতে হয়। সিপাহী দোয়ারকা সিং একমাস হাসপাতালে থেকে দু'মাসের ছুটিতে গ্রামে যাচ্ছে। ছুটি থেকে ফিরে আবার তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা হবে। তারপর সে আবার যাবে ঘাঁটিতে। তাদের কম্পানিটাতে আবার লোক নেয়া হচ্ছে। হাঁ, যাবে সে।

দোয়ারকা রামচলিত্তরের ঠিক পাশেই ছিলো যখন নায়েকজি সেই ভয়াবহ গর্জন ক'রে তার ছ'জনের কম্পানি নিয়ে দুষমনের উপরে লাফিয়ে পড়েছিলো। চীনাকে বুঝিয়ে দিয়েছিলো ঘাঁটি ছাড়ে নাই তখনও ভারতের পাহারাদাররা, হুকুম মানতে কভার নিয়েছিলো শুধু। আর সেই পাঁচজনের—পাঁচ বাঘের, (দোয়ারকা নিজেকে হিসাব থেকে বাদ দেয়, কারণ সে মনে করে রামচলিত্তর বা তার আর চার সঙ্গীর মতো বীর শুধু স্বর্গেই আছে। পাঁচ পাঁচ জন চীনাকে বেয়োনেটে ঘায়েল করলেও সে নিজে রামচলিত্তরের জুতো সাফ করার বেশী যোগ্যতা রাখে না।) হাঁ, সেই পাঁচ বাঘের থাবার সেই পঞ্চাশ চীনার বিশজন মাটিতে শুয়েছিলো।

অনেক দৃশ্যই দোয়ারকার মনে গেঁথে আছে। ফারকরজির সেই মৃত্যুঞ্জয়ী ভঙ্গি, করমবাহাদুরজির সেই ট্যাংক দখল করা, বলবন্তজির পাথরের মতো, হিমালয়ের মতো দৃঢ়তা, কিছুই ভোলার নয়। কিন্তু বিশেষ ক'রে দু তিনটে ঘটনা তার রোগশয্যায় বার বার মনে এসেছে। লছমনপ্রসাদ চীনা অফিসারটিকে শুধু দু হাতের কব্জির জোরে গলা টিপে মেরে ফেলেছিলো। তিসরা প্লেটুনের সুবাদার গণপৎ তার দশজনের দল নিয়ে চীনাদের দুশ' জনের দেয়াল ভেঙে কি অমিতবিক্রমে বলবন্তজিকে রক্ষা করার জন্য এগিয়ে এসেছিলো। আর রামচলিত্তরজি—চোখে জল এসে যায় দোয়ারকার—হাঁ, উন্‌হনে শের থা। এই গ্রামে সে এই কথাই বলবে। সুবাদার গণপৎ, নায়েক রামচলিত্তর আর সিপাহী লছমনপ্রসাদ এই জেলার মাটিকে সোনার চাইতে মূল্যবান করেছে।

তখন সন্ধ্যা হয়েছে।

দোয়ারকা গ্রামের মাঝখান দিয়ে চলেছে। তার মাথার টুপিটাকে সে কিছুক্ষণ আগে খুলে নিয়ে পকেটে পুরেছে। ডান হাতটা এখনও গলার সঙ্গে বাঁধা। কপালের পাশে একটা অ্যাডেসিব পট্টি। পথে সে নায়েক রামচলিত্তরের বাড়ির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলো, তখন থেকে আট নয় জন নানা বয়সের গ্রামবাসী তার পিছনে হাঁটছে। গ্রামবাসীরা জানে নায়েক রামচলিত্তর আর তার ভাই যুদ্ধে গিয়েছে। তারা গত দু মাসে শুনেছে যুদ্ধের অনেক খবর। যার যতটুকু ক্ষমতা তুলে দিয়েছে সরকারের হাতে। দুষমন চীনাকে দেখে নাই তারা, কিন্তু তারাও ক্রুদ্ধ হ'য়ে উঠেছে অন্তরে অন্তরে।

ভিড় আরও ভিড়কে আকর্ষণ করে। দোয়ারকা যখন রামচলিত্তরের বাড়ির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়েছে, আর তার পিছনে প্রায় একশ' জন গ্রামবাসীর একটা জনতা। নারী, বৃদ্ধ, যুবক, এমন কি শিশুরাও আছে।

দোয়ারকা বললো, এই কি বাড়ি?

জনতাও যেন উত্তর দিতে পারলো না। এটাই বাড়ি ছিলো বটে রামচলিত্তর আর লছমনপ্রসাদের। জনতা বিস্ময় বোধ করলো—এই জানা ব্যাপারটাই যে হঠাৎ এমন একটা প্রহেলিকার মতো বোধ হ'তে পারে তা কি তারা জানতো। হাঁ, এটা নায়েক রামচলিত্তরের

বাড়ি যেখানে ছিলো সেই জমিই বটে, কিন্তু দু মাস হ'লো অযোধ্যা তেওয়ারীর একটা গুদাম উঠছে এখানে। গুদামের পাশে গম ভাঙানো একটা কলও বসবে। কল এসে গিয়েছে দেখছো না? গ্রামবাসীরা এতদিন অযোধ্যার হাতফের অনেক জমির ঘটনার মতো মনে করে-ছিলো এ ঘটনাটাকেও। সহিষ্ণু কৃষক তারা, মেনে নেয়াই তাদের রীতি। আর এ বিষয়ে তো আদালতের হুকুম আছে। কিন্তু এখন যেন দোয়ারকার সামনে দাঁড়িয়ে তাদের মনে হচ্ছে ব্যাপারটায় আইনের ডিক্রি থাকলেও কোথায় কিছু গোলমাল আছে বড় রকমের।

কিন্তু দাঁড়াও, কি বলে শোন এই সিপাহী। দেখো, ওর হাত এখনও গলায় বাঁধা। হয়তো চীনাকে দেখে এসেছে, লড়ে এসেছে তাদের সঙ্গে। এক শত জনের নির্বাক দৃষ্টিতে উচ্ছ্বসিত সাব্বাস শব্দ সেই সান্ধ্য অন্ধকারের দিগ্‌মণ্ডল থৈথৈ করছে দোয়ারকাকে ঘিরে।

দোয়ারকা বললো,—মা কোথায়? রামচলিত্তরের গর্ভধারিণী?

ভিড়ের প্রান্তে দেখা গেলো এক শীর্ণা বৃদ্ধাকে। তার পিছনে ময়লা শাড়িতে মুখ ঢাকা এক গ্রাম্য বধূ। আর তার পাশে সারা দিনের চাষের ধুলোয় যার মুখ ঢাকা আঠারো উনিশ বছরের এমন এক গ্রাম্য তরুণকে দেখা গেল।

দোয়ারকা আবার প্রশ্ন করলো,—তোমরা কি এখনও নায়েক রামচলিত্তরের আর লছমনপ্রসাদের গর্ভধারিণীকে চেনো না? অবাক করলে আমাকে!

নতুন একটি গলার স্বরে জনতা ফিরে তাকালো এবং তাদের অনেকদিনের অভ্যাস মতো আশস্ত হ'লো। হাঁ, অযোধ্যা তেওয়ারী এসে গিয়েছে। সেই বললো,—আরে আগে বঢ় বুড্‌ডী।

বৃদ্ধা এক পা অগ্রসর হ'লো। কিন্তু কেউ কি বুঝতে পারছে না—তার পা দুখানা কেমন অবশ হ'য়ে আসছে? কেউ কি বুঝতে পারছে—ময়লা শাড়িতে মুখঢাকা বৃদ্ধার আড়ালে দাঁড়ানো গ্রাম্যবধূটির দৃষ্টি ইতিমধ্যে অশ্রুতে অন্ধ হ'য়ে গিয়েছে, ফোঁপানি ঢাকতে পারছে না সে আর।

বৃদ্ধা শুধু বললো,—বেটা—

আর তাই শুনে সিপাহী দোয়ারকা সিং বললো,—মায়ী, অপনে কে দো বেটে শের থে। নোঁহি নোঁহি, রামচন্দ্রজির অবতার ছিলেন তাঁরা।

অতীত কাল, অতীত কাল। তবে তারা নেই? একটা গুঞ্জন উঠলো জনতার মধ্যে। কিন্তু স্তব্ধ হ'য়ে গেলো তারা। পাথর হ'য়ে গেলো রামচলিত্তরের জননী। অশ্রুধারায় অন্ধ সেই গ্রাম্যবধূ দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ঢলে প'ড়ে যাচ্ছিলো, রামসুভগ হাত বাড়িয়ে ধরলো তাকে।

আর দোয়ারকা তখন বর্ণনা করলো সেই অকুতোভয় লছমনপ্রসাদের কথা যে চীনা অফিসরকে শুধু দু হাতে গলা টিপে নিধন করেছিলো। বর্ণনা করলো কম্পানির সেই শেষ কমাণ্ডার নায়েক রামচলিত্তরের কথা। স্বব্ধ জনতা সে বর্ণনার উত্তাপে দিশেহারা হ'য়ে হঠাৎ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। জয়—জয়।

একমুখ হাসি হেসে অযোধ্যা তেওয়ারী বললো,—তা তো হবেই, হতেই হবে। বিলকুল! এই গ্রামের মাটির গুণ আছে। আমরা কি কম করেছি? দু হাজার পান্ টাকা তুলে দিয়েছি আমরা এই গ্রাম থেকে!

জনতার মনে তখন দোয়ারকার বর্ণনা আগুনের মতো জ্বলছে, যে আগুন অশ্রুর মতো তরলও। যখন দোয়ারকা বললো, সেই দারুন শীতে তারা ছাই-এর খাদে কি ভাবে অপেক্ষা

করছিলো, চীনা দুশমন এগিয়ে আসতে কি ক'রে সেই দুজন ভারতীয় জওয়ান নায়েক রাম-চলিত্তরের শেষ হুকুম 'চারজ' শুনে বেয়োনেট নিয়ে লাফিয়ে পড়েছিলো—তখন জনতা উত্তেজনায় দুলতে লাগলো। ফুঁপিয়ে উঠলো কেউ।

অযোধ্যা বললো,—হতেই হবে। ওদের বাপ মরলে আমার খামারেই মানুষ হয়েছে তো! আমিই ওদের মানুষ করেছি।

কিন্তু জনতার মধ্যে থেকে কে একজন তীব্র চাপা গলায় তাকে খামোশ হ'তে বললো।

অযোধ্যা বললো,—তা, সিপাহী, আমরা গ্রামে ব'সেও অনেক কিছু করছি।

একজন বললো,—গ্রামের সুবিধার জন্যে গম কিনে মজুত করছো তাই পাঁচটাকার বেশী দিতে পারো নি চাঁদা তাই না?

কিন্তু জনতা আবার শুনতে চায়, কম্পানির শেষ কমান্ডার নায়েক রামচলিত্তরের সেই শেষ অর্ডার 'চারজ' কথাটাকেই। ততক্ষণে ভিড় আরও বেড়েছে। নতুন যারা এসেছে তাদের মধ্যে থেকে অনুরোধ আসছে—আবার বলো সিপাহীজি, আবার বলো আমাদের এই গ্রামের রামচলিত্তর আর লছমনপ্রসাদের কথা, বলো পাশের গাঁয়ের সুবাদার গণপতের কথা। এই অনুরোধ করতে গিয়েও আবেগে তাদের গলা ধ'রে আসছে। কে'দে ফেললো কেউ।

অযোধ্যা বললো,—তোমরা আমার কথা শুনছো না।

—কে শুনতে চায় তোমার কথা? জনতা উত্তর দিলো

—আর চীনাদের সেই সব ভাই-এর কথা? জনতায় প্রতিধ্বনি উঠলো।

একজন এগিয়ে এলো। দোয়ারকাকে সিগ্রেট দিলো সে। কিন্তু হাতভাঙা দোয়ারকা সিগ্রেট ধরাবে কি ক'রে? তা অনুভব করে আহা আহা ক'রে উঠলো জনতা। জনতার একাংশ ব'লে উঠলো—তাঁরা শের ছিলেন, আমাদের সম্মুখে দেখো এই আর এক শের ই হিন্দ।

একজন এগিয়ে গিয়ে দোয়ারকার সিগ্রেট ধরিয়ে দিলো।

তেওয়ারী বললো,—কিন্তু তোমরা কিছু বুঝতে পারছো না। এই যুদ্ধের কারণ কি তা জানো না। ওই যে পয়লা দোসরা তিসরা যোজনা তাতেই আমাদের দেশ দুবলা হয়েছে।

একজন বললো,—ধনী হয় নি?

অযোধ্যা হেসে বললো,—ধনী যদি দুবলা হয়—

একজন চিৎকার করে উঠলো,—খামোশ।

অন্য একজন বললো,—দেশকে খুব ভালোবাসো না, মহাজন? সরকার ট্রাক চেয়ে-ছিলো আর তখন সে জন্য ট্রাকের এঞ্জিন বিগড়ে রেখেছিলে, তাই নয়?

জনতার একাংশ ফিরে তাকালো তেওয়ারীর দিকে। অবাক বোধ করছে তারা। এই তেওয়ারী একদিন বলেছিলো: সিপাহীদের জন্য আমাদের কিছু করার নাই। দেশ স্বতন্ত্রতা পাওয়ার পর আমরা ট্যাক্স দিয়েছি কাজ কারবার করেছি সিপাহীরা পনেরো বছর তনখা নিয়েছে এতদিনে কাজ পড়েছে তাদের। কাজ করুক। অবাক লাগছে জনতার। শুকনো বৃদ্ধটাকে পাকা শয়তান মনে হচ্ছে।

একজন বক্তৃতার ঢঙে বললো,—আমরা শুনবো না এই অযোধ্যা তেওয়ারীর বজ্জাতির কথা। নায়েকজির বাড়িতে গমের গুদাম তুলতে আমরা দেবো না।

একজন বিদ্রূপ করলো,—সরকারের যোজনার চাইতে তেওয়ারীর যোজনা ভালো হলেও।

প্রথমজন বললো,—আমরা যাবো সদরে। আমরা সেখান থেকে নতুন আইন আনবো। হটাও এই গমের গুদাম। হটাও। দুশমন চীনা, আর দুশমন এই তেওয়ারী।

অন্ধকারে জনতার মুখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না আর। স্তব্ধ, জনতা। শোক তাদের ক্লান্ত করেছে কিন্তু ক্রোধও ফুটে উঠছে তাদের মনে। আবেগে তাদের বুক কেঁপে কেঁপে উঠছে। কিছু একটা তখনই করা দরকার। কিছু একটা ফুঁসে ফুঁসে উঠছে।

হঠাৎ সেই অন্ধকারের একটা দিক আলোকিত হয়ে উঠলো। আরে আগুন, আগুন। অযোধ্যা তেওয়ারীর গমের গুদামের জন্য ভারা বাঁধা হয়েছিলো, তার তলায় জমা করা হয়েছিলো কাঠ। সে সবই জ্বলে উঠেছে দাউ দাউ ক'রে।

কারা হাততালি দিলো আনন্দে। কে একজন চিৎকার করে বললো,—পোড়াও, পোড়াও। তেওয়ারির চিতা ওটা।

ভিড়ের যেখানে গাঢ় অন্ধকার যেখানে রামসুভগ ঠোঁট চেপে ধরছে দাঁতে। কিন্তু বুকভরা হাহাকার করা কান্না সে কি ক'রে দমন করবে? উদ্গত অশ্রুর চাপে তার হৃৎপিণ্ড যেন উল্টেপাল্টে যাচ্ছে। আর সে কান্না যেন আগুন হ'য়ে উঠতে চায়। জ্বলতে চায়। চাচাজি লছমনপ্রসাদ—বাপ যখন যুদ্ধে তখন এই বুড়ো ছেলেকেও কাঁধে ক'রে বেড়াতো চাচা। চাচাজি ব'লে চিৎকার ক'রে উঠতে যাচ্ছে তার সমস্ত অন্তর। কান্নায় লুটিয়ে পড়তে চাচ্ছে। আর বাবা! হাঁ, এতদিনে সে বুঝতে পারছে। বুঝতে পারছে কেমন ছিলো সেই ঠাণ্ডা বিনয়ী মানুষটি। আগে জানলে সে কতবার ক'রে প্রণাম করতে পারতো তাঁকে যখন তিনি বাড়িতে আসতেন। পিতাজি, পিতাজি—

দাউ দাউ ক'রে আগুন জ্ব'লে উঠছে অযোধ্যা তেওয়ারীর অতিলোভকে পুড়িয়ে যেন তা জনতার ক্রোধ। জনতার মুখে সেই আগুনের ছাপ যেন তা প্রমাণও করছে। দীর্ঘছায়া পড়েছে জনতার মানুষগুলোর—যেন তা প্রমাণ করছে এই সাধারণ মানুষগুলোর প্রকৃত আয়তন কত বিরাট হ'তে পারে।

সেই জনতার আড়ালে রামসুভগ বললো,—মা দাদীকে দেখো। বলতে গিয়ে সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো। তারপর সে নিঃশব্দে স'রে এলো। এবার সে কাঁদবে। মাটিতে লুটিয়ে পড়ে কাঁদবে বুঝি। সে আর দাঁড়াতেও পারছে না।

দাঁতে দাঁতে চেপে সেই অন্ধকারে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফোঁপানি চাপতে চাপতে ছুটে চলেছে রামসুভগ। গোরখপুর সহর অনেক দূর। যেতে একবেলায় কুলোয় না। তার হাতে সময়ও নেই। সময় নেই, এ কথাটাই যেন ফোঁপানি হ'য়ে উঠে আসছে। এই অন্ধকারে সে কি একবার বাবা ব'লে চিৎকার ক'রে কেঁদে উঠবে। উৎক্রোশ কান্নায় হাহাকার করে ডাকবে বাবাকে? দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে ধরলো সে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস পড়ছে তার। বুক-পাট কাঁপছে থর থর ক'রে। দুশমন, দুশমন, চীনা, চীনা, চীনা। হাঁ, সে জানে গোরখপুরের সহরে রংরুট অফিস কোথায়। সকলের প্রথম সারিতে সকলের আগে দাঁড়াবে সে। নায়েক রামচলিত্তরের রক্ত তার দেহে কান্না হ'য়ে ভেঙে পড়তে চাচ্ছে, কিন্তু সে কান্না আগুনের স্রোত। সে আগুন চিৎকার করে উঠছে—চা—র—জ!

চা—আঁ—আঁ—র—জ।

ইশারা

স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়

চোখ মেলে দেখল পশ্চিমের জানালাটার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে পড়ন্ত রোদ এসে পড়েছে আলমারীর পাশে। গড়িয়ে উঠে আঁচলটা বুকের ওপর তুলে দিল কাজল। ওমা, কি ঘুম ঘুমিয়েছিলো! সন্ধ্যা হতে আর কিই বা দেরী! আঁচল দিয়ে ঘাড়ের ঘাম মুছল। মসৃণ কাঁধটা ব্লাউজের সঙ্গে লেপ্টে গেছে। এক কাত হয়ে শুলে গরমের দিনে আজকাল এমনি হয়। একটু মোটাও হয়েছে কাজল। ওর শ্যামল রঙ উজ্জ্বল হয়ে উঠছে দিন দিন। একটুতেই যেন ঘেমে হাঁপিয়ে অস্থির হয়ে ওঠে। কি জ্বালা!

ঘাড়ের কাছে ঘামে ভেজা চুল আর একবার মুছে উঠে পড়ে। মেজেতে একটা জামা আর প্যান্টুলন গড়াগড়ি যাচ্ছে দেখে বোঝে পার্থ ইস্কুল থেকে এসেছে। শম্পা আসেনি এখনো। আজ শনিবার। পড়ার ক্লাসের পর গানের ক্লাস আছে শম্পার। ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে। পার্থ কি ইস্কুল থেকে এসে না খেয়ে বেরিয়ে গেল? কি ঘুমই ঘুমিয়েছিলো আজ!

উঠে নীচে নেমে আসে কাজল। হঠাৎ কানে আসে পাশের বাড়িতে খুটখাট আওয়াজ, দু-চারজন মানুষের গলা। বাড়িটা তো দেড়মাসের ওপর খালি ছিল। তবে কি নতুন ভাড়াটে এলো?

—অ দিদি! নীচের ঘরের ভাড়াটে চন্দনার মাকে ডাকলো কাজল। উঁকি মেরে দেখল চন্দনার মা রাত্তিরের কুটনো কুটছে বসে। ঘরে ঢুকে চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করলো ও।—ও বাড়িতে কি ভাড়াটে এলো?

চন্দনার মা মানুষটি দেখতে মোটেই ভাল নয়। কিন্তু কাজে ভাল। কথা কম বলেন, কাজ করেন বেশী। যে কটি কথা বলেন যেন উপদেশ দেন। দু'ছেলে এক মেয়েকে সর্বদাই সর্বপ্রকার উপদেশ দিয়ে থাকেন। স্বামীকে জ্ঞান দান করতে গেলে, হয়তো স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে জ্ঞান গ্রহণ করতে দ্বিধাবোধ করেন, তখন বেশ কুটোকুটি লেগে যায়।

কথায় কথায় জানা গেছে উনি হেড মাস্টারের মেয়ে। পিতৃ ঐতিহ্য বজায় রেখে সর্ববিষয়ে সকলকে জ্ঞান দান করবার চেষ্টা তার পক্ষে কিছু অন্যায় নয়। প্রৌঢ় সেন মশাই মাঝে মাঝে অবাধ্য ছাত্রের মত বিদ্রোহ করে বসলেই শুরু হয় মাস্টারী বকুনী।

—তাই বোধহয় এলো। চন্দনার মা আলুর খোসা ছাড়াবার দিকে নজর রেখেই বলেন। ভাবটা এই যে তাতে আমার কোন কৌতূহল নেই। এবং পরের বাড়ি সম্বন্ধে কৌতূহল থাকা উচিত নয়। কাজলের কৌতূহল ষোল আনা। গলির কাছে এসে উঁকি মারে। হ্যাঁ। ঠিক। ঠেলাগাড়ি থেকে মালপত্তর নামান হচ্ছে, বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভদ্রলোকটি, ভদ্রলোক বললে একটু বেশী বলা হয়, ছেলেটি মালপত্তর ওঠানামার তদারক করছে। পরিষ্কার গায়ের রঙ, লম্বা, সুশ্রী চেহারা। পরনে দামী ট্রাউজার, গায়ে হাতকাটা সার্ট। চেহারায় পোষাকে বেশ রুচি আছে।

মালপত্র দেখে অবস্থা বোঝা যায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে না দেখে পারে না কাজল। এক সেট কৌচ, স্টিলের আলমারী, আধুনিক ছাঁচা পোঁছা সুন্দর একটি খাট, আরেকটি সিঙ্গল খাট। বড় বড় কয়েকখানি ফ্রেমে বাঁধান হাতে আঁকা ছবি, হিটার, রেডিও—কি নেই?

অবস্থা মোটেই খারাপ নয় মনে হচ্ছে।

কাজলের মুখটা মুহূর্তের জন্যে একটু শুকিয়ে ওঠে। কতদিন ও ওনাকে বলেছে এই লতাফুলওলা খাটটা বেচে দিয়ে আজকালকার ডিজাইনের একটা খাট কেনো। তা বললে ভদ্দরলোক হুঁ হাঁ করে কাটিয়ে দেবে। এবারে কাজল কেনাবেই।

—অমন উঁকি ঝুঁকি মারলে ভদ্রলোক কি মনে করবে কাজল? চন্দনার মা কুটনো থালায় নিয়ে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে বলে গেলেন। ওঁর উপদেশটা এখন মেনে নেয়াই ভাল। রাজ্যের কাজ পড়ে রয়েছে। উনি এসেই চা চাইবেন। পার্থ শম্পা এসেই খাবার চাইবে। এবারে উনুনটায় আঁচ দিয়ে ঘরদোর পরিষ্কার না করলে বিপদ হবে।

রান্নাঘরে চলে এলো কাজল। উনুনের ছাই পরিষ্কার করতে করতে খাটটার কথা ভেবে কাজলের মনটা বিস্বাদ লাগে। কি সুন্দর খাটখানা। প্লেন আজকালকার ডিজাইন। দেখলে মনে হয় ছিমছাম নিরাভরণ আধুনিক সুন্দরী। ও খাটের নিশ্চয় অনেক দাম। ওনাকে বললেই তো হোল না। হাজার টাকা যদি দাম হয়, উনি কোথা থেকে অত টাকা পাবেন? গবরমেণ্টের চাকরী, চারশ টাকা মাইনে। পুজোয় পার্বনে উপরী পাওনা কিছুই নেই। ওঁর ওপর তো চাপ দিলেই হোল না! ওই তো উনি এসে পড়েছেন। জুতোর শব্দ পেয়ে সচকিত হয় কাজল। উনুন পরিষ্কার করে আঁচ দিয়ে রান্নাঘর ধুয়ে ওপরে যায়। কই না। উনি তো আসেন নি! জুতোর শব্দ পেলো গলিতে। ওহো! তবে বোধহয় ওই নতুন ভাড়াটেদের ছেলেটি। ওর পায়েও ফিতে বাঁধা জুতো।

চমকে ওঠে কাজল। ও বাড়ি থেকে খিল খিল হাসির আওয়াজ ভেসে আসছে। মেয়ের হাসি। ঘর দোর গুছোন ফেলে রেখে জানলায় গিয়ে দাঁড়ায় ও। নীল পর্দাটা একটু সরালে ওদের বাড়ির বারান্দার সবটা দেখা যায়। বাঁ হাতের দু'আঙুলে আলতো করে পর্দাটা একটু সরায় কাজল। হলুদ রঙের একটি মেয়ে, চোখদুটি কালো ডাগর। একমাথা মিশ-কালো কোঁকড়া চুল। চোলির মত জামা গায়ে, সাধারণ সিল্কের গাঢ় খয়েরী রঙের একটি শাড়ি পরনে। ছিপছিপে বৌটি বয়েস কুড়ি একুশের বেশী কিছুতেই নয়। হাসির ঢেউয়ে যেন দুলে উঠছে।

—কি বাড়িতেই এনে তুললে। গলার স্বরটি একটু মোটা, কিন্তু ভারী মিষ্টি।

কাজলের চোখটা একটু জ্বালা করছে, আর মনের কোথায় যেন একটু চিনচিন করছে। নিষ্পলক চোখে দেখতে দেখতে কাজল কখন যে ওই বৌটির সঙ্গে নিজের তুলনা করে ফেলেছে নিজেই জানে না।

অল্পবয়সী লোকটি উত্তরে বৌটির কাঁকালে একটা চিমটি কাটলো, না কি করল, মেয়েটি উঃ! অসভ্য! বলে ডাগর চোখদুটোয় তর্জন করে উঠল। লোকটি হাতটা বাড়িয়ে বৌটির কোমর জড়িয়ে টানতে যেমন যাবে, এই সময়টায় নিজেরই অজ্ঞাতে ভাল করে দেখবার জন্যে কাজল পর্দাটা আরও খানিকটা সরিয়ে ফেলেছিল। পড়বি তো পড়, বৌটার চোখ পড়ল পর্দার দিকে কাজলের চোখে। নিমেষে পর্দাটা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে কাজল সরে দাঁড়াল। লজ্জায় ওর মুখটা মুহূর্তে শুকিয়ে উঠলো। ছি, ছি, কি মনে করলো বৌটা। লোকটাই বা কি মনে করবে! বড় বিশ্রী হোল ব্যাপারটা। যাক গে যাক, তারই বা কি এমন দোষ! এত আদিখ্যেতাই বা কেন? দিনের আলো না যেতেই বৌকে জড়িয়ে ধরা, চিমটি কাটা, এগুলোও কিছু ভদ্রতা নয়? বেহায়ার মত কাজ করলে যে দেখে ফেলবে তারই বা এমন কি লজ্জা! সে দেখবে, একশবার দেখবে। রোজ দেখবে।

দুম দুম করে দোতলা থেকে নেমে যায় কাজল। রান্নাঘরে গিয়ে জোরে জোরে উনুনে হাওয়া করতে থাকে। নিভু নিভু হয়ে গেছে উনুনটা, বাতাস না করলে আঁচ উঠবে না। ছোট্ট কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম বাঁ হাতের উল্টো পিঠে মুছে কাজল ভাবে, ও বৌটা কি এমনি করে আগুন দেয়। নিশ্চয়ই নয়। পয়সাওলা মানুষের বৌ, বামুন চাকর যে আছে এতে আর সন্দেহ কি? চেহারাই তো পটের বিবি। দেখলে তো নড়ে বসতে জানেন বলে মনে হয় না।

আবার জুতোর শব্দ পায় কাজল। ফিরে দেখে উনি এসেছেন। এসেছেন তো এসেছেন! একটু যেন ব্যাজার হয় কাজল। আসামাত্র ছুটে গিয়ে পোষাক খোলবার পর তুলে রাখা, সাবান তোয়ালে এগিয়ে দেয়া, চা খাবার সামনে এনে ধরা, অত আদিখ্যেতা আর পোষায় না! জবাবে তো উনি গম্ভীর মুখ করে জিজ্ঞেস করবেন, পার্থ ফিরে পড়তে বসেছে কিনা, শম্পার কাশিটা একটু ভাল হয়েছে কিনা! দূর, দূর, এমন গোমরা মুখো মানুষের সঙ্গে কথা বলতে যাওয়াও ঝকমারী। যা খুশি করুক। সেও এবার থেকে মুখ গোমরা করে জিজ্ঞেস করবে, তেলটা এ মাসে দোকান থেকে বাকীতে আসবে কি না? বা কাল অপিস-ফেরত এক পাউণ্ড চা আনতে যেন ভুল না হয়।

ওপর থেকে হাঁক আসছে,—কই গো, শুনছ? উনুনে কেটলীটা চাপায় কাজল। না শোনবার আবার কি আছে, সে তো কানে কালা নয়? চেঁচাতে ইচ্ছে হয়েছে চেঁচাক।

—বলি, শুনতে পাচ্ছ?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে পাশের বাড়ির দিকে নজর পড়ে ওর। একজোড়া ডাগর কৌতূহলী চোখ তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। বোধহয় ওনার চিৎকারে আকৃষ্ট হয়েছে। ভ্রূকুটি করে ওপরে উঠে আসে কাজল। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই বলতে লাগল,—বলি, একটু আক্কেল হায়াও নেই গা! ষাঁড়ের মত চিৎকার করছ কেন? হয়েছে কি?

শম্পার বাবা অবাক। —আরে! তুমি আমাকে যা খুশি তাই বলতে শুরু করেছ। ষাঁড় বললে? কাজল নিজে একটু লজ্জিত হয়েছে ঠিকই। কিন্তু এ সব মানুষের কাছে লজ্জা দেখালেই পেয়ে বসবে। পাল্টা অবাক হবার ভান করে বললে,—কি যা তা বলছ? আমি তো বললুম ষাঁড়ের মত।

—ওই একই কথা হোল।

প্রতিবাদ করে কাজল,—না, এক কথা হোল না। যাক গে, কি বলছিলে বলো।

পোষাক ছেড়ে লুঙ্গি পরে ভদ্রলোক বলল,—না, বলছিলুম শম্পা কোথায়? ওর উলের রংটা—। কথা শেষ হবার আগেই গম্ভীর হোল কাজল, এই শুরু হোল শম্পা আর পার্থর খবর। বললে,—শম্পা কোথায়, আমি কি করে জানব? আমি তো তোমার মেয়ের পেছন পেছন বেড়াই! ঘুরে সিঁড়ি দিয়ে নেমে চলল কাজল। নামতে নামতে ঠিক চোখটা ঘুরে গেল ওদের বাড়ির দিকে, ঠিকই দেখল বৌটা তখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সিঁড়ির রেলিং ধরে, ওর দিকে তাকিয়ে। কাজলের মনে হোল একটু যেন হাসল বৌটি। ভ্রূদুটো কুঁচকে উঠতে গিয়েও আবার স্বাভাবিক হোল। কাজলও একটু যেন হাসল।

বৌটি কথা বলল,—আপনারা বুঝি এই বাড়িতে থাকেন? কতদিন আছেন?

কাজল ওদের সিঁড়ির রেলিং ধরে দাঁড়াল, বললে,—অনেক দিন আছি। আপনারা তো আজ এলেন, কোথায় ছিলেন এর আগে?

—বৌবাজারে। ওখানেই আমার শ্বশুর বাড়ি। মিত্তিরদের বাড়ির নাম শোনেন নি?

আমার শ্বশুর বাড়ি। বাপের বাড়ি খিদিরপুরে।

মিত্তিরদের বাড়ির নাম যদিও কাজল শোনেনি, তবু এটা ভেবে নিতেই হয় যে নিশ্চয়ই মস্ত ধনীর বাড়িই। বলে,—শ্বশুর আছেন?

—না, ভাসুর দুজন আছেন, এ ছোট ছেলে।

আর বলতে হয় না। কাজল মেয়ে মানুষ। কাজল বেশ বুঝতে পারে, নিশ্চয় বৌটি ভাসুরদের সঙ্গে আলাদা হয়ে বাসা করেছে।

বৌটি পালটা প্রশ্ন করে এবারে।—আপনার?

—আমার শ্বশুর শ্বাশুড়ী নেই, তাঁরা স্বর্গে গেছেন। কাজল মুখ টিপে হাসে। ছেলেপুলে হয়নি বুঝি এখনো?

বৌটি সলজ্জ হেসে মুখ নীচু করে। তারপর ডাগর চোখদুটি তুলে বলে,—না।

শম্পার বাবার গলা শোনা যায়,—কই গো, চা হোল?

—অই। কাজল লাজুক হয়ে হাসবার চেষ্টা করে। অই চায়ের তাগাদা এসেছে। চলি, আবার পরে গল্প করবো ভাই।

নেমে যায় কাজল। মনটা তেমনি চিন্‌চিন্‌ করতে থাকে। উনুনের পাশে এসে দেখে কেটলীর জল ফুরিয়ে এসেছে। আবার এক গেলাস জল ঢেলে দেয় কেটলীতে। চা করতে দেরী হয়ে গেল আজ। তা হোক। পাড়াপড়শীর সঙ্গে একটু আলাপ-সালাপ না করলেও চলে না! চন্দনার মা এসে দাঁড়ায়রান্না ঘরের সামনে।—তোমার ঘরে কালোজিরে আছে?

—আছে। কাজল উঠে কৌটো খুলে একটু কালোজিরে দেয় চন্দনার মায়ের হাতে। চোখ টেরিয়ে ও বাড়ির সিঁড়ি দেখিয়ে বলে, আলাপ হোল। ভাসুরদের সঙ্গে আলাদা হয়ে বাসা করেছে। বৌবাজারে শ্বশুর বাড়ি। বাপের বাড়ি খিদিরপুরে।

—অ! তোমার সব খবর নেয়া হয়ে গেছে দেখছি! বলে চন্দনার মা চলে যায়। পেছনে শম্পা। এতক্ষণে মেয়ের বাড়ি আসবার সময় হোল। শম্মার চেহারার সঙ্গে ওই বৌটার চেহারার একটা তুলনা না করে পারে না কাজল। অমন ছিরি না হলে কি আর অমন ঘরে বিয়ে হয়। শম্মার নাকটা বাবার মত মোটা। ঠোঁট দুটোও। যেমন বাপ তেমনি মেয়ে! এমন ছিরি না হলে এমন বরাত!

গলায় ঝাল এনে বললে কাজল,—কোথায় যাওয়া হয়েছিল শুনি?

শম্পা ভয়ে ভয়ে বললে,—বেলাদের বাড়ি গিয়েছিলুম মা, বেলা কিছুতেই ছাড়ছিল না। নীরবে কেটলীটা নামিয়ে চা ছেঁকে দুধ চিনি মিশিয়ে শম্পার দিকে তাকিয়ে বলে, —যাও। বাপকে চা দিয়ে এসো।

শম্পা চলে যাচ্ছিল, সেদিকে তাকিয়ে বলে,—চা-টা ডিমটা এখন তুমিই করতে পারো। বয়েস কম হোল না। কচি খুকী সেজে আর কতদিন থাকবে?

চাল ধুয়ে এবার ভাত চড়িয়ে দিতে হবে। চাল ধুতে ধুতে খিল খিল হাসির আওয়াজ কানে এলো। ওই বৌটিই হাসছে। ছেলেমানুষ বৌটি, ওদের হাসাহাসিটা কিছু নিন্দের নয়, তবু পাশের বাড়ি থেকে শোনা যাচ্ছে, এ আবার কেমন হাসি রে বাপু! যাই বলো বৌটির গলার স্বর যে একটু মোটা তাও নয়, জোরালোও বটে। মেয়েমানুষের এত হেঁড়ে গলা ভাল নয়। ভাল নয় কি করেই বা বলা যায়। অমন সুন্দর সুপুরুষ স্বামী, এমন সুখের জীবন, অমন রূপ! খারাপ তো কোনদিকেও নয়। উঃ! কি গরম পড়েছে আজ! কপালের বিন্দু বিন্দু ঘাম মোছে কাজল। কানদুটো যেন গরম হয়ে উঠেছে।

ঠোঁট শুকিয়ে আসছে।

শম্পা এসে হাজির।—মা, দাদা এসেছে, একটু চা চাইছে।

পার্থ এসেছে! কখন এলো? একটুও তো টের পায়নি কাজল। এত অন্যমনস্ক ছিল, যে পার্থ কখন রান্নাঘরের সামনে দিয়ে দোতলায় উঠে গেছে টের পায়নি। হাঁড়িতে ফুটন্ত জলে চাল ছেড়ে দিয়ে কাজল বলে চা কেন? ও তো দুবেলা চা খায় না!

শম্পা বললে,—কি জানি, বললে, গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে। একটু চা খাবে। জানো মা, ও বাড়ির বৌটা আমার সঙ্গে কথা বলছিলো এতক্ষণ।

কাজল তাকায়।—তোর সঙ্গে? কেন, কি বলছিলো?

—বলছিলো তুমি কোন ক্লাসে পড়ো। কোন ইস্কুলে? জানো মা, বৌটা আই-এ পাশ। বি-এ পড়তে পড়তে বিয়ে হয়ে গেছে। বললে, বিয়েটা না হলে ও এম-এ পর্যন্ত পড়ত। আমাকে কি বললে জানো মা? বললে, খবরদার পড়া শেষ না করে বিয়ে কোর না। বলতে বলতে শম্পা খিল খিল করে হেসে উঠল। কাজলের শুনতে ভাল লাগল না। এ সব কি কথা! এইটুকু মেয়ের সঙ্গে বিয়ের কথা কেন? বিয়ের মর্ম ও কি বোঝে শুনি?

মায়ের মুখ গম্ভীর দেখে শম্পা হাসি থামাল। ভয়ে ভয়ে বলল, দাদার চা হবে না মা?

—না, এই সবে চাল ছেড়েছি। এখন হাঁড়ি নামালে চাল সেদ্ধ হবে না। বলগে যাও পরে দোব। আর তুমি পড়তে বসোগে যাও।

শম্পা আর কথা না বাড়িয়ে উপরে উঠে গেল। কাজল একটা কিছু না করে আর বসে থাকতে পারবে না। রাত্তিরে মাছ রয়েছে, ঝোল হবে। তরকারি কিছু হবে না, তবু কুটনোর ঝুড়িটা নামিয়ে নিয়ে বসল। মোচা রয়েছে। মোচা দুটো কুটে রাখলে কাল সকালে অপিসের সময়ের আগেই রান্না করে দেয়া যাবে। মোচা কুটতে বসলো কাজল।

চন্দনার মা এসেছে। ও'র রান্না হয়ে গেছে। এসেছে নিশ্চয় দুটো উপদেশ দিতে। অন্যদিন ভাল লাগে। আজ কিন্তু খুব বিরক্ত হোল কাজল। কথা বলল না।

চন্দনার মা একটা পিঁড়ি নিয়ে বসল। বসেই বলল,—মোচার ঘণ্ট করবে? তা একটু ঘি গরমমশলা দিও বাপু, তা নইলে কেমন যেন ঘাস-ঘাস গন্ধ হয়।

কথা বলল না কাজল। একটু ঠোঁট বিস্ফারিত করে মুখখানা হাসি-হাসি করে সম্মতি জানাল মাত্র।

—ও বাড়ির বৌটা কিন্তু সুন্দরী খুব। গিয়েছিলুম একটু দোরের সামনে। তোর কথা বললে।

কাজল তাকাল, অর্থাৎ কি বললে?

চন্দনার মা হাসল।—কি আর বলবে? তোমার মেয়েটিকে ওর বড় ভাল লেগেছে। বললে, কি সুন্দর মেয়ে! তা শম্পা আমাদের মেয়ে তো ফ্যালনা নয়। তোমার কথাও জিজ্ঞেস করছিলো।

কাজল উঃ করে উঠল। অন্যমনস্ক হয়ে আঙুল কেটে গেছে। ঘটি থেকে জল নিয়ে আঙুলে দিলে।

—কি হোল? বলে এগিয়ে এলো চন্দনার মা।

কাজল বললে,—কিছু না। একটু কেটেছে। অমন কত কাটে। আমরা তো আর পটের বিবি নই! খেটে খেতে হয়। কথাটা কাকে উদ্দেশ্য করে বলা চন্দনার মা ঠিক বুঝল না। না বুঝে একটু হাসল মাত্র। সিঁড়িতে জুতোর শব্দ। উনি বেরোচ্ছেন।

—কই গো, একটু ঘুরে আসছি! কাজল উত্তর দেয় না। অপিস থেকে এসে মাঝে মাঝে তাস খেলতে যাওয়া হয়। বাড়িতে নাকি মন টেঁকে না। তা আর টিঁকবে কেন? বৌকে তো বড় ভালবাসে, তাই সকালে উঠে দাড়ি কামিয়ে চান করে খেয়ে অপিস, অপিস থেকে এসে দু'একবার—কই গো, হ্যাঁ গো,—তারপর তাস খেলতে যাওয়া, তাস খেলে এসে খেয়ে উঠে ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোন। কতকাল ধরে তো এই একই রকম চলছে। মুখটা বিস্বাদ লাগে কাজলের। কপাল ঘেমে ওঠে। ঘাম মুছে মোচা কুটতে থাকে ও।

কথা বিশেষ জমলো না দেখে চন্দনার মা উঠে চলে যায়।

কাজল আপত্তি জানায় না। বরং চলে যাওয়াতে খুশিই হয়। কেমন একটা অস্বস্তি বোধ করে ও। কুটনো কোটা ফেলে বঁটিটা কাত করে রেখে উঠে পড়ে। খুব সন্তর্পণে কাজল উপরে উঠে আসে। শোবার ঘরে পাশের ঘরের পার্থ আর শম্পা পড়তে বসেছে। ওরা যেন টের না পায়। খুব সন্তর্পণে শোবার ঘরের পশ্চিম দিকের জানলার পর্দাটা সরায়। ওদের বাড়ির বারান্দার সামনের ঘরটা দেখা যাচ্ছে। ওই তো বসেছে দুজন দুটো চেয়ারে। সামনা-সামনি, মুখোমুখি। বুড়ি ঝি-টা এসে দু কাপ চা দিয়ে যায়। ঝি চলে যেতেই ওরা অকারণে হেসে ওঠে। ওমা, একি গো! হঠাৎ লোকটি বৌটির গলা ধরে সামনে টেনে এনে একটা চুমু। চুমুর কি শব্দ রে বাবা! ছ্যাঃ, ছ্যাঃ! সমস্ত শরীরটা চনচন করে ওঠে। স্নায়ুর জালে কাঁপন ধরেছে। কাজলের মুখখানা রক্তাভ হয়েছে। নাকের ডগা আর কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। দ্যাখ কান্ড! মুখ ধুলে না গা! এঁটো মুখে দুজনে চা খেতে শুরু করে দিয়েছে। ঘেন্নাপিত্তি নেই, না কি? মরণ আর কি!

সর্বাংগ দিয়ে যেন আগুন বেরোচ্ছে। কি গরম পড়েছে আজ! যাই বলো শম্পার বাবা এ সব দিক দিয়ে খুব ভাল বলতে হবে। এতটুকু অসভ্যতা নেই। এমন ভদ্র আর নিরীহ মানুষ দেখা যায় না। দিন দুপুরে কখনো তার গায়ে হাত দেয় নি। কে বলতে পারবে বলুক তো বিয়ের পর কোন অসভ্যতা তাদের ভেতর কেউ দেখেছে কিনা! কক্ষনো নয়।

ছেলেমানুষ বরটা হঠাৎ হেসে উঠেছে। দাঁতগুলো কিন্তু সুন্দর। ঝকঝকে যেন সাজান মুক্তো। নাকের নীচে এক চিলতে গোঁপ। বৌটার সুড়সুড়ি লাগে না? গোঁপ দুচক্ষে দেখতে পারে না কাজল। ও'রও গোঁপ ছিল, নাকের নীচে একটা মস্ত মাছির মত। দুদিন বলবার পরেই কামিয়ে ফেলেছে। আর কখনো গোঁপ রাখেনি।

ওই উঠল। লোকটা ট্রাউজার সার্ট পড়ে বোধহয় কোথাও বেরোচ্ছে। না বাপু, এবারে পর্দাটা বন্ধ করা যাক, বেরোবার আগে নিশ্চয় আবার বৌটাকে আদর-টাদর করবে। না, একি! দোরটা বন্ধ করে দিল। বন্ধ করলো কেন? তবে কি বেরোবে না?

—মা, দাদার চা দিলে না তো? শম্পার ডাকে যেন চমকে উঠল কাজল। শম্পা বললে,—ওখানে কি দেখছ মা?

কাজল ধমকে উঠল।—কি আবার দেখব। ব্লাউজটা ছাতে মেলে দিয়েছিলুম, সেটা আর পাচ্ছি না। ছাত থেকে কোথাও উড়ে-টুড়ে পড়ল কিনা কে জানে? তোমাদের জ্বালায় তো দিনরাত্তির জিনিস হারাচ্ছে। একটা জিনিস ঠিক জায়গায় পাবার জো নেই। বলতে বলতে কাজল নীচে নেমে চলল। এবার রান্নায় মন দিতে হবে। এখন আর নয়। রান্নাবান্না খাওয়া-দাওয়া সেরে শোবার আগে একবার জানলার ধারে আসবে। না এসে পারবে না।

রাত সাড়ে এগারোটায় রান্না খাওয়া মিটল। এতক্ষণ কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল

না ও বাড়ি থেকে। শম্পা পার্থর পড়া শেষ হোল, খাওয়া হোল। উনি এলেন দশটায়। অকারণে কাজল চটল।—এত রাত্তিরে আসা আর চলবে না। আমার শরীরে বয় না! রান্না সেরে তোমার জন্যে ভাত নিয়ে বসে থাকব। আমি কি রাঁধুনী!

শম্পার বাবা ভারী ভীতু মানুষ। কথা বাড়াতে ভয় পায়। একটা কথাও না বলে খাওয়া সেরে কাজলের দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে একবার হাসল। তার সামনের একটা দাঁত আধখানা ভাঙা। মোটা নাকের নীচে দাঁত বেরোলে অদ্ভুত দেখায়। গায়ে জ্বালা ধরল কাজলের। (মানুষের দাঁত ঝকঝকে মুক্তোর মতও হয়) এ কি জ্বালা আজ। (হাসিটাই মানুষের সৌন্দর্য)। না, না, ওসব হাসি নয়! কাল থেকে রাত করে এলে ভাত ঢেকে রেখে চলে যাব। আমি কারো কেনা বাঁদী নই। (কোনদিন কি দুজনে বসে দু কাপ চা খেতে নেই। চা খেতে বসে একবার ডাকতে নেই!) বেশ তো ঠাকুর-বামুন রাখো। আমাকে দিয়ে আর কতকাল খাটাবে? বিয়ে করেছ না ঝি এনেছ। ঝি ছাড়া আবার কি!

শম্পার বাবা আর একটা কথাও না বলে আঁচিয়ে ওপরে উঠে গেল। কাজল খেতে বসল। দূরদূর, খাবে কি! খাবার সব বিস্বাদ লাগছে! কিছুতে স্বাদ নেই। প্রায় না খাওয়ার মত দুটিখানি খেয়ে ওপরে উঠে এলো। ঘরে ঢুকে দেখল সব ঘুমে। সবাই। শম্পা ওপাশে শুয়ে আছে। পার্থ ও ঘরে। আর উনি! কি ঘাম ঘামছে। মোটা পেটটা নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে ওঠানামা করছে। বুকের লোমগুলো ঘামে লেপটে গেছে। কি বিশ্রী! কাজল ফ্যানের স্পীড বাড়িয়ে দিয়ে আলোটা নিভিয়ে দেয়। জানলার ধারে যায়। পর্দাটা একটু সরায়। ঘরের দরজা বন্ধ থাকবার কথা। ঘর খোলা এত রাত্তিরে! ওই তো বৌটা। বৌটা একা জানলার ধারে বসে রয়েছে। তবে কি স্বামীর জন্যে অপেক্ষা করছে। তাই হবে। যাক গে, যাক, শুয়ে পড়া যাক। না, দেখাই যাক লোকটি কখন আসে! কত সময় কেটে যাচ্ছে। অনেক সময় গেল।

কাজল আলোটা জ্বালালো। ঘরের মানুষটার দিকে চোখ পড়ল। একটু হাঁ করে ঘুমোচ্ছে। দুটো ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে ভাঙা দাঁতটা দেখা যাচ্ছে। অসহ্য। অসহ্য লাগছে কাজলের। ঘড়িতে দেখে রাত প্রায় বারোটা। জুতোর শব্দে চমকে আলোটা নিভিয়ে দেয় ও। পর্দাটা ফাঁক করে দেখে ওদের বাড়ির লোকটা ফিরেছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠছে। লম্বা সুঠাম দেহ। মুখখানা আপেলের মত রক্তাভ।

বৌটি বেরিয়ে এসেছে ঘর থেকে। লোকটাকে ধরে দুহাতে।—ছেড়ে দাও—ছেড়ে দাও বলছি! এ আবার কি! এমন জিভ আউড়ে কথা বলছে কেন? বৌটা ছাড়ছে না। —আজ আবার গিলে এসেছ? (তবে কি অমন সুন্দর মানুষটা মাতাল হয়ে এসেছে! কি সর্বনাশ!)—বেশ করেছি! তোর বাপ খাইয়েচে?—ছোড় দে! (রাম, রাম, কুচ্ছিত গালা-গাল করছে বৌটাকে। কানে শোনা যায় না এমন গালাগাল!) ছাড় বলছি!—ওগো চুপ করো। পাড়ায় নতুন এসেছি। একটা কেলেঙ্কারী কোর না।—তবে রে!—(আহা হা! ঠাস ঠাস করে দুটো চড় মারলে গা!) বৌটা এদিক ওদিক তাকিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে ঘরে ঢোকে। দোরে খিলের শব্দ হয়। মাঝে মাঝে একটু তর্জন ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না।

মাথাটা ঝিম ঝিম করছে কাজলের। কানের পাশ দিয়ে ঘাম গড়াচ্ছে। ঘাড় ভিজে উঠেছে। দেহের সব গরম যেন ঘাম হয়ে গলে পড়ছে। (মুক্তোর মত ঝকঝকে দাঁত। ভাসাভাসা চোখের নীচে টিকালো নাক। এক মাথা থোপা থোপা চুল। ঠাস ঠাস চড়।

খিস্তি। গালাগাল।) কাজলের সমস্ত শরীরটা ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে। আঁচলে ঘাম মুছল কাজল। (নাকের তলায় কি সুন্দর পাতলা। শব্দ করে চুমু খেলো। কত ভালবাসা! বাপমা তুলে গালাগাল! চড় খেয়ে খেয়ে নরম গাল দুটো রক্তবর্ণ।)

কাজল ধীরে ধীরে বিছানায় এসে শুয়ে পড়ে। আঃ! কি আরাম! আস্তে আস্তে পাশের মানুষটার বুকের ওপর একটা হাত তুলে দেয়। লোমশ বুকখানা। নিরীহ পোষা জানোয়ারের মত। বড় ভদ্র। বড় শান্ত। (তার গালে গায়ের জোরে দুটো চড় কেউ মারল না। তাকে কেউ সবল শক্ত হাতে কোনদিন পিষে ফেলল না! ওহ্!)

বুকের ওপর থেকে হাতখানা সরিয়ে নেয় কাজল। নরম লোম ভেলভেটের মত। বড় নরম। কাঁটা নয়। কাঁটার খোঁচা নয়। বড় ভীতু. বড় বাধ্য! (ঘরে কি আরও মারছে নাকি বৌটাকে? বড় বড় শক্ত হাতের ঠাস ঠাস চড়! অশ্রাব্য গালাগাল!) একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কাজল পাশ ফিরে শোয়।

রূপনগরের উপাখ্যান

প্রভাত দেবসরকার

অনেকদিন আগে একবার এসেছিল, মনে পড়ছে। এই-ই বাড়ি বোধ হয়! প্রকান্ড প্রাচীর-ঘেরা, বৃহৎ ফটক-ওয়ালা, অগণিত শ্বেতপাথরের নারীমূর্তি অধ্যুষিত, লোকে-জনে কোলাহলে পরিপূর্ণ!

আরো মনে পড়ছে, রেল-স্টেশন থেকে রূপনগর অনেকখানি পথ—সেদিন মশালের আলোয় আলো হয়ে উঠেছিল। বাজনা-বাদ্যি আর রোশনাই নিঃঝুম অন্ধকারকে ঠেলে ঠেলে জমিদার বাড়িতে এসে পৌঁচেছিল! একটি বর-যাত্রীর সঙ্গে রমেশ সেদিন এসেছিল। কে বলবে রূপনগর অজ পাড়া-গাঁ, যেন একটা স্বপ্নের রাজ্য, রাজকুমারীর সন্ধানে তারা সেখানে এসেছিল!

ভাঙা পাঁচিলের একধারে রিক্সাটাকে রেখে রিক্সাওলা বললে,—এই বাড়ি মল্লিকবাবুদের!

—কিন্তু? কিন্তু-ভাবটা মনে রেখে সন্তর্পণে রিক্সা থেকে নেমে রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে চোখ ফিরিয়ে আশপাশ দেখে নিলে রমেশ। ঠিক চেনা-চেনা লাগছে না, অথচ মনে হচ্ছে যেন সে-ই!

রিক্সাওলা বললে,—এই বাড়িতে উচ্ছেদমামলার আপিস বসেচে।

রমেশ আর একবার চারদিক দেখে বললে, ভেতরে যাবে না? থামলে যে!

—না বাবু, এই চেন্নার পারে যাই না! জিনিসপত্রগুলো প্রায় রাস্তার ওপর নামিয়ে দিয়ে রিক্সাওলা বললে।

—কেন? তুমি চলতো, দেখি কে কি বলে! জিনিসগুলো রমেশ রিক্সার ওপর তুলে দিলে।

রিক্সাওলা ইতস্তত করলে, রমেশের মুখের দিকে সবিস্ময়ে চাইলে, যেন একটা অন্যায় কাজ তাকে করতে বলা হ'য়েছে! শেষে রিক্সাটা ঠেলে দিয়ে বললে, চলুন তা'লে ভেতরে নে যাচ্চি!

পাঁচিলের এক জায়গায় নয়, ছিদ্র শত-সহস্র; ভগ্নদশা সর্বত্র! মানুষ কেন ইচ্ছে করলে হাঁতি ঢুকে যেতে পারে। ফটক নিশ্চিহ্ন হ'য়ে সিংহদ্বার হা-হা করছে। রমেশ ভেবে পেল না, বাইরে থেকে রিক্সা-গাড়ি ভেতরে ঢুকতে দিতে আপত্তি কেন।

কলকাতার বাবুর সাহচর্যে রিক্সাওলার সাহস সঞ্চার হয়েছে—বললে, এই তানাতি আসি, চেন্নার ঐ খেজুর গাছটা; তা'পর যার দরকার হয় নোক ডেকে মাল বই করে নে যায় ভেতরে—আমরা ঢুকিনা জমিদার বাড়ি! আপনি আজ প্রেথম পথ দেকালেন!

—কেন, আর একটু এগিয়ে যেতে তোমাদের কি আপত্তি? রমেশ জিজ্ঞেস করলে।

সাইকেল-রিক্সাটা ঢক্ ঢক্ করে নড়ছে বাঁধান ইঁটের খানা-খন্দরে, রিক্সাওলার হাত কাঁপছে হ্যান্ডেলের ওপর।

—আপত্তির আর কি! ছোটবাবু আগ করেন, গালাগাল দেন, তেড়ে মারতে আসেন।

বললেন, খপরদার পাঁচিলের এধার এয়েচো কি মজা দেকিয়ে দুবো! খুব গুরুত্ব দেয় বলে মনে হয় না কথাটার, রিক্সাওলা এমনি ভাবে বললে।

আবার চারপাশ দেখে রমেশ বললে,—কই, কেউ তো আসছে না তেড়ে, বলছে না কিছু?

ইঁট-বাঁধান পথটা অব্যবহারে লতাপাতা আর ঘাসে ঢাকা পড়েছে, কোথাও রোদে-জলে শান দিয়ে দিয়ে ছুরির ফলা ক্ষয়ে-যাওয়ার মত অবস্থা হয়েছে।

আগে আগে রিক্সাওলা সাবধান ক'রে বললে,—আস্তার মাঝদে' আসবেন বাবু, ও শালা ঘাসের মদ্দি তেঁতুল বিছে থাকে!

তেঁতুল বিছা কেন, সাপ-খোপ থাকাও বিচিত্র নয়! রমেশ রাস্তার মাঝখান দিয়ে হাঁটছিল, সামান্য ঘাসের স্পর্শে চমকে উঠছিল, ঐ বুঝি বিছা বা সাপ বেরল!

রিক্সাওলা পিছন ফিরে ফিরে বললে,—খোরোর সময় বেশি থাকে, এখন শালারা তেমন বেরয় না, গর্তের মদ্দি সিঁদিয়ে থাকে!

রমেশ বিরক্ত হ'য়ে বললে,—দাঁড়ালে কেন, চল চল!

—আপুনিও তো দাঁইড়েচেন! বলুন কোন মহলে যাব? রিক্সা থামিয়ে রিক্সাওলা বললে।

জায়গাটা যেন একটা বৃহৎ বৃত্তের মধ্যবর্তী; চোখ ঘুরিয়ে পাঁচিল-ঘেরা বাস্তুর সবটুকু দেখা যায়। ইঁট-বাঁধান রাস্তাটা সরল রেখায় জলের দাগের মত চতুঃপার্শ্বে গড়িয়ে আছে; কখনো সেটা শান-বাঁধানো সদর পুকুরের ঘাটে এসে নেমেছে, কখনো ওধারে খিড়কির পুকুরের শ্বেতপাথরের চত্বরে গিয়ে থেমেছে; কখনো বা সোজা অন্দর মহলে চলে গেছে! মাটিকে মাড়িয়ে চলার দায়কে মল্লিকবাবুরা অস্বীকার করেছেন, পণ করেছেন ধুলোমাটি লাগতে দেবেন না পুরনারীদের আলতা-পরা পায়ে!

—যেখানে অফিসঘর হ'য়েছে, সেইখানে নিয়ে চল। অফিসের লোক তো এসেছে আগে! বৃত্তের মধ্যবর্তী হ'লেও ঠিক ঘরখানা খুঁজে পাওয়া যেন দুষ্কর। মাঠের মধ্যে দাঁড়িয়ে পথ হারানর মত অবস্থা।

রিক্সাওলা সোজাসুজি জবাব দিলে,—আমি জানি না বাবু! তেনারা কখন কার রিস্‌কায় এয়েচে কে জানে!

—চল আর একটু এগিয়ে, পথটা শেষ হোক!—কুড়ি বছর আগে সুশান্তর বিয়ের বরযাত্রী হ'য়ে এসেছিল, জমিদার-বাড়ির ভেতরের পথ-ঘাট কিছুই মানসপটে জাগছে না। এক রাত্রের ব্যাপার স্বপ্নের মত।

কিন্তু আজ সে-স্বপ্ন যেন বিভ্রান্তির সৃষ্টি করছে। যেন সেদিনকার স্মৃতিকে এই মুহূর্তে কাজে না লাগাতে পারা স্মৃতি-বিভ্রমের সামিল। হ্যাঁ, সেদিন এই ইঁট-বাঁধান পথের ওপর দিয়েই ইয়ার-বন্ধু তারা কজন এসেছিল—ঐ যে পুকুরটার বেদীগুলো ভেঙে গেছে, পাড়ের পাম গাছগুলো বজ্রাহত হ'য়ে আছে, একটা হাত-ভাঙা, পা-ভাঙা পরীর পাথর-মূর্তি মুখ গুঁজে মাটিতে পড়ে আছে, ওগুলো সে-রাত্রে মায়ার সৃষ্টি করেছিল। সুশান্তর বিয়েতে একটা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ হ'য়েছিল। বড়লোক বটে রূপনগরের মল্লিকরা!

রিক্সা ঠেলে রিক্সাওলা বললে,—পথের শেষ কি এখনি হ'বেন, বাড়ির মদ্দি পথ! গোনক ধাঁধাঁ!

—তা হ'লে সামনের বাড়িটার দরজায় রাখ। আমি ভেতরে গিয়ে দেখি! রমেশ এগিয়ে

গেল।

দরজায় রিক্সাটা রেখে একটু তফাতে রিক্সাওলা অপেক্ষা করলে। ইঁট-বাঁধান পথের নীচে এসে দাঁড়াল। একটা অফলা লিচু গাছের ঝাকড়া মাথা মাটিতে ছায়া ফেলেছে, ডাল-পালার খোঁচায় খোঁচায় দোতলা বাড়ির শেওলাধরা থামের মাথার পঙ্খের কাজগুলো ক্ষয়ে গেছে। একটা জুড়িগাড়িতে ঘেরাটোপ দিয়ে ঘেরার মত বাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে, অসূর্য-ম্পশ্যারা বহিরাগমন করবেন বোধ হয়।

এই মল্লিকবাবুদের সদর বাড়ি! অনেকটা জায়গা জুড়ে। আগে এর অনেক নাম ছিল, কাছারী বাড়ি, তোষাখানা, নাটমন্দির, লোকের যা মনে আসতো তাই বলতো! বাবুদের সঙ্গে দেখা করবার দরকার হ'লে এখানে এসে ধর্না দিতো। সব সময় লোকজনের সাড়া মিলতো।

রিক্সাওলা লিচুতলায় সরে গিয়ে সোজাসুজি বাড়িটার দিকে চাইলে, এই প্রথম সে জমিদারবাড়ি সওয়ার নিয়ে আসেনি, এর আগেও কয়েকবার এসেছে যখন ফটকের এদিকে ঢোকবার কোনো মানা ছিল না, অনেক মাল-পত্রও বয়েছে! তখন এমন খাঁ-খাঁ নির্জনতা ছিল না। গাছের পাতা-পড়ার শব্দ এমনি করে শোনা যেত না।

এ বাড়ির গেটও ভাঙা, কপাটও জীর্ণ। ঘেরাটোপের ফাঁকে ফাঁকে আলো-ছায়ার ছাপ যেন ফটকের পথটার ওপর! কাঠের জাফরিগুলো সব রোদে-জলে গলে গেছে।

কিন্তু কলকাতার বাবু এতক্ষণ ভিতরে গিয়ে কি করছেন? মাল-পত্র খালাস করে তাকে ছেড়ে দিলেই পারেন! এতক্ষণ দু'বার ইস্টিশানে ছুটে যেতে পারতো সে যাত্রী আনতে!

ভাঙা গেটের সামনে দাঁড়িয়ে চলনের পথটায় উঁকি মেরে রিক্সাওলা হাঁক দিলে, —ও বাবু! বাবু গো!

আর অবাক হ'য়ে রিক্সাওলা শুনলে, ডাকটা তার কানেই ফিরে এল : বা—উ—গো—ও!

রিক্সাওলা তিনবার ডাকলে। সেই বারবার প্রতিধ্বনি উঠল, ডাক ফিরে এল! শূন্য কুম্ভের মত।

রিক্সাওলা ভয় পেল। রিক্সা নিয়ে তার ছুটে পালাতে ইচ্ছে করল। কে যেন একদিন বলেছিল, জমিদার বাড়িতে আজকাল ভূত বাস করে। দিনের বেলায়ও ভূত দেখা যায়।

ডাক শুনে যিনি সামনে এসে দাঁড়ালেন, তিনি অবশ্য ভূত নন। জল-জ্যান্ত মানুষ! জমিদার বাড়ির এক মালিক। ইনিই সেই ছোটবাবু, যিনি জমিদার বাড়ির ভাঙা পাঁচিলের এপারে রিক্সাওয়ালাদের প্রবেশ নিষেধ করে' দিয়েছেন। নাতিদীর্ঘ, তাম্রবর্ণ, কৃশকায়, দীর্ঘ-নাসা, বিরল-কেশ, মুণ্ডিত গুম্ফ!

রিক্সাওলা জমিদার বাড়ির ফটকের এপারে রিক্সা আনার কারণ দেখালে,—ওনার কথায় এলুম বাবু! উনি বললেন সে-আমি বুঝবো! বললে, ভয়টা কি?

আশ্চর্য ছোটবাবু আজ কিছু বলছেন না, পায়ের জুতো নিয়ে তেড়ে মারতেও আসছেন না। কেমন যেন অবাক হ'য়ে রিক্সাওলার মুখের দিকে চেয়ে আছেন। সামনে লিচু গাছের পাতা গুনছেন যেন।

রিক্সাওলা অপরাধ লঘু করবার প্রাণপণ চেষ্টায় বললে,—ওনারা কোলকাতার বাবু কিনা সেই তানাতি হাঁটতে পারেন না! রিস্‌কা আনবো না বলতে সে কি আগ! মানা শুন্‌লে না বাবু!

এতক্ষণে লক্ষ্মীকান্ত মল্লিক কথা বললেন,—কে বাবু? কার কথা বলছো?

—ওই যে কোল্‌কাতা থেনে আপিস করতে এয়েচেন! রিক্সাওলা ভয়ে ভয়ে বাবুর মুখের দিকে চেয়ে বললে।

ছোটবাবু আজ মাটির মানুষ কোন খবরই রাখেন না তাঁর জমিদারীতে কি হচ্ছে না হচ্ছে। এই দুদিন আগেও রাস্তার ওপারে রিক্সা নিয়ে যেতে যেতে সে দেখেছে, ছোটবাবু রোদের মধ্যে উদোম গরুগুলোর পেছনে দৌড়োদৌড়ি করছেন। খুব শাসাচ্ছেন। আবার ফেরবার পথে নিস্তব্ধ দুপুরে বাড়িটার দিকে চেয়ে সে ভেবেছে, ছোটবাবুর আচ্ছা কাজ হ'য়েছে, ছাগল-গরু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছেন! ঐ তো পাঁচিলের দশা, ছেঁড়া কাপড়ের মত কোন দিক সামলাবে! জমিদারী নাকি চলে গেছে! শুনেছে, বাবুরা পড়ে গেছে!

—আপিস? যেন একটা ফুৎকার দিলেন লক্ষ্মীকান্ত, বাড়িটাকে আপিস-আদালত ক'রে তবে ছাড়লে!

অন্যায়টা কি, রিক্সাওলা বুঝতে পারে না, পোড়ো বাড়িটায় না হয় লোকজন এল-গেল! সরকারী আপিস খারাপ কি? কাশীবাবু তো ভালই মতলব করেছেন!

লক্ষ্মীকান্তবাবু হঠাৎ ভেঙচে উঠলেন, জমিদারী গেছে, এবার বাড়িটাও যাবে! পথে বসবে! আইন হ'য়েছে, আর রক্ষে আছে! যত সব ছোটলোকের রাজত্ব!

বছর দুই আগের মত আর তেমন উৎসাহ বোধ করা যায় না জমিদারী উচ্ছেদের আইন নিয়ে। কি হলো ওতে? জমিদাররা গেলেন, কিন্তু প্রজারা কি এলেন আসর জুড়ে? চোঁতা কাগজপত্তর নিয়ে টানাটানি কেবল! মাটির ভাগ কি হ'লো?

বরং চোখের ওপর এইসব দেখলে কষ্টটা কেবল বাড়ে। কত বড় বাড়ি আর কত বড় লোক ছিল রূপনগরের বাবুরা! লোকের মুখে সাত রাজ্য ছাড়িয়ে ধন-জনের নাম ছুটে বেড়াত। রূপনগর মানেই তো মল্লিকরা! এখন সাত ভাতারের কাণ্ড হয়েছে, কেউ কাউকে চেনে না! রূপনগর কেবল খোলস-ছাড়া একটা নাম, যার না আছে কোন আকর্ষণ না কোন মোহ-মায়া! বার মাসে তের পার্বণ আর কে করবে?

হঠাৎ লক্ষ্মীকান্ত ক্ষিপ্ত হ'লেন,—হঠাও, হঠাও এখান থেকে! কতবার বলিছি গ্রাহ্য হয় না, সেই ভেতরে আসবে তোমরা? কেন, বেওয়ারিশ পেয়েছ?

রিক্সাওলা হতভম্ব হ'য়ে কি করবে ভাবতে যেন সময় নেয়।

লক্ষ্মীকান্তবাবু চেঁচাতে লাগলেন,—বেরোও, দূর হও সামনে থেকে। ভেবেছো কি তোমরা সব, সরকারী রাস্তা পেয়েছো? মনে করেছো, বাবুরা মরে গেছে?

—না বাবু। আমি তো বনুনুম আপনায় কোলকাত্‌তার বাবু একজন এ্যালেন, জোর করে টেনে আনলে, কিছুতে শুনলে না! আমার দোষ নেই! রিক্সাটাকে লিচুতলা থেকে খানিকটা তফাতে নিয়ে যেতে যেতে রিক্সাওলা বললে।

লক্ষ্মীকান্ত ভেঙচে বললেন,—কচি খোকা, বললে আর উনি করলেন! তোকে যদি কেউ ঘরে আগুন দিতে বলে তুই ঘরে আগুন দিবি? বুঝি না তোমাদের বজ্জাতি! বাবুর কাছ থেকে বেশি পয়সা নেবার ফন্দি!

নিজমূর্তি ধরে লক্ষ্মীকান্ত মল্লিক হাতের কাছে কি যেন সন্ধান করতে লাগলেন। রিক্সাওলা প্যাডেলে পা দিলে, দরকার কি পাগলের সঙ্গে হাঙ্গামা ক'রে! পাঁচিলের ওপারে গিয়েই দাঁড়াচ্ছে! ফটকের বাইরে এসে একবার বাবুগিরি ফলাক না দেখি, মজা দেখিয়ে দেবে!

পিছন থেকে ডাক এল,—এই, এই রিক্সাওলা কোথায় যাচ্ছ? মাল নামালে না, পয়সা নিলে না? রমেশ বেরিয়ে এসেছে কাছারীবাড়ি থেকে।

রিক্সার মুখ ফিরিয়ে রিক্সাওলা পিছন ফিরে দেখলে, লক্ষ্মীকান্তবাবু হাতে একটা শুকনো লিচুডাল নিয়ে কেমন অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, নিজমূর্তি কেমন এলিয়ে গেছে, লম্বা নাকের ছায়ায় চোখ দুটো ঢাকা পড়েছে। তুলোর বালাপোষটা ধুলোয় লুটচ্ছে।

রিক্সাওলা দূর থেকে হাত দিয়ে লক্ষ্মীকান্তকে দেখিয়ে দিলে।

রমেশ বললে,—কি হয়েছে?

লক্ষ্মীকান্ত লিচুর ডালটা আছড়ে ভেঙে বললেন,—মাথা আর মুণ্ডু! নিকুচি করেছে জমিদারীর! উনি বসে বসে হাঁড়ি-কুড়ি, নুড়ি-পাথর যোগাড় করবেন, আর আমি শালা আটকে বেড়াব! বয়ে গেছে!

লক্ষ্মীকান্ত মুখ বিকৃতি ক'রে সামনের রাস্তা দিয়ে কাছারী বাড়ির ওধারে চলে গেল।

রমেশের জিনিসগুলো বাড়ির ভেতর বয়ে নিয়ে যেতে যেতে রিক্সাওলা বললে,—মাথা খারাপের নোক্ষণ বাবু! আপুনি এসে না পড়লে হ'য়েছিল আর কি!

রমেশ হেসে বললে,—লক্ষণ কি, পুরোপুরিই খারাপ বল! লোকটা কে?

—ঐ তো ছোটবাবু! লাঠিটা দেখলেন না? মোটমাথায় পিছনে তাকিয়ে রিক্সাওলা বললে।

—শুকনো গাছের ডাল, ভয় নেই! রমেশ হাসলে।

—শুকনো হাড়ে ভেল্কি খেলেন বাবু, সময় সময়!

ভেল্কি কিছু না দেখলেও লক্ষ্মীকান্ত মল্লিককে মাঝে মাঝে সদর বাড়িতে দেখা গেল। নতুন অফিসের নোটিশ বোর্ডটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে পড়েন, পশ্চিমবঙ্গ ভূমিসংস্কার সংস্থা!

একদিন সরাসরি অফিস ঘরে ঢুকে পড়ে' লক্ষ্মীকান্ত জিজ্ঞেস করলেন,—হাকিম সাহেব, তোমাদের কাজটা কি? বেশ তো সাজিয়ে বসেছ!

বয়সে অনেক বড়, সুতরাং সম্বোধনের ত্রুটিটা রমেশ গায়ে মাখে না, চেয়ার এগিয়ে দিয়ে বললে,—এই জমিদারী আইনের বাকি কাজটা শেষ করা আর কি!

বালাপোষটা কাঁধের ওপর থেকে পিঠের দিকে ফেলে লক্ষ্মীকান্ত চেপে বসে বললেন, —আবার বাকি কাজ কি হে, এক ঘায়েই তো সাবাড় করে' দিয়েছ?

এরপর কি বলা উচিত হবে রমেশ ভেবে পেলে না। হাতের কাগজে মন দেবার চেষ্টা করলে।

লক্ষ্মীকান্ত মল্লিক লক্ষ্য ক'রে বললেন,—ওটা কি করছো হে?

রমেশ আমতা-আমতা ক'রে বললে,—একটা লিস্ট!

—আবার লিস্টি! ভাগ-বাঁটোয়ারার নেমন্তন্ন বুঝি?

—আজ্ঞে না! কাগজ যাঁদের আছে তাদের নোটিশ করছি এসে স্বত্ব ঠিক করে যাক।

—ঐ হ'লো! এখন কত মালিক জুটেছে! সবাই বলছে জমি তার, বাপ-ঠাকুর্দার, চোদ্দ-পুরুষের, চাষ করেছে চিরকাল! এদিকে আসল মালিক উড়ে গেল!

যেন সান্ত্বনা দেবার জন্যে রমেশ বললে,—কাগজ দেখাতে না পারলে আমরা রেকর্ড করি না! জমি মালিকের থাকবে!

—তা আর পারবে না! ঐ কাগজে কোম্পানী চলেছে, এখন তোমরা চালাবে! খাজনার রসিদ আবার কাগজ হ'লো কবে থেকে? লক্ষ্মীকান্ত প্রশ্ন করলেন।

—আইনে প্রজাস্বত্ব সাব্যস্ত করতে—

বাধা দিয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে লক্ষ্মীকান্ত বললেন,—থাক থাক, আর বলতে হবে না, তোমাদের বিচার জানা আছে! জমির মালিককে তাড়ানই মতলব!

—তা নয়, তা নয় মানে—রমেশ আমতা আমতা করলে। হাজার হোক এ'দেরই বাড়িতে বসে জমিদারী উচ্ছেদের মামলা করতে হবে। দরকার কি মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা দিয়ে।

—মানে খুব বোঝা আছে! পরের ধনে পোদ্দারী করবে! লক্ষ্মীকান্ত ঘর থেকে ঠিকরে বেরিয়ে গেলেন। ঘরে বসে বসে রমেশ শুনলে, তখনো লক্ষ্মীকান্ত মল্লিক শূন্য বাড়িটাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছেন,—থাকতো ইংরেজ কেমন এই দশা করতো দেখা যেত! এখন তোমার ধন তোমার নয়, যত ছোটলোকের!

ছোটভাই কাশীকান্ত কিন্তু ভিন্ন প্রকৃতির। অন্তত এই ভগ্ন-দশা আর ক্ষয়িষ্ণু অবস্থার মধ্যে রমেশ যেটুকু আবিষ্কার করতে পেরেছে তাতে বুঝেছে। তিনি অমন লক্ষ্মীকান্তর মত সদরবাড়িতে সরকারী আমলার কাজ-কর্ম দেখতে ছুটে-ছুটে আসেন না। তাঁকে ধারে-কাছে দেখাও যায় না।

রমেশই তাঁকে আবিষ্কার করলে। একদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে জমিদারবাড়ির ভাঙা প্রাচীরের এলাকা ছাড়িয়ে লাল-সুরকি আর খোয়ার পথ ধরে সে ইস্টিশানের দিকে এগিয়ে চলল। সেই কদিন আগে এসে বাড়িটার মধ্যে ঢুকেছে আর বেরন হয়নি। উচ্ছেদ-মামলার কাজও এখনো আরম্ভ হয়নি। সহকারী তিনজন ছুটি নিয়ে ফ্যামেলী আনতে গেছে। খুব সম্ভবত নোটিশ পেয়েই লোকজন ছুটে আসবে, তখন আর বেড়িয়ে-চাড়িয়ে দেখবার সময় হবে না। জমিদার-বাড়ি ছাড়াও তো রূপনগরে দেখবার আরো কিছু থাকতে পারে! সরকারী চাকরি, কবে বলতে কবে এখানকার মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে কে জানে!

রূপনগরে গাছপালাই বেশি। সব সময় মাচার তলায় ছায়া-ছায়া অন্ধকার যেন গ্রামখানা জুড়ে! মল্লিক বাড়ি থেকে আরো দু মাইল পথ রেল-স্টেশন! এখন শীত, পল্লী-প্রকৃতি কেমন জড়-সড় যেন, পথের লাল ধুলোয় গতরাতের হিম-পড়ার দাগ, রিক্সা-সাইকেলের চাকার চিহ্ন! গ্রামের এখন অনেক উন্নতি হয়েছে পথ-ঘাটের দিক থেকে। ধুলো-কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে আর রেল-চড়তে হয় না, চাল-চিঁড়ে বেঁধে গ্রামান্তরে যেতে হয় না। তবু মনে হয় উন্নতিটা তেমন স্পষ্ট নয়। কলকাতার ছেলে রমেশ, পাকা রাস্তা আর রিক্সা-গাড়ি অনেক দেখেছে জ্ঞান হওয়া থেকে! প্রথম প্রথম চোখে ভাল লাগলেও অকারণ এত গাছ-গাছালির ভিড় তার ভাল লাগে না। এখানে গাছপালা কেটে বসতি বসিয়ে, কল-কারখানা ফেঁদে শহর বসান যায় না? ঐ জমিদার বাড়ি ভেঙেচুরে বিরাট এক ফ্যাক্টরি করা যায়! বাহান্ন বিঘা জমি জুড়ে বসত-বাটি কম নয়!

যেন কিসের কারখানা করা যায়, অনেকক্ষণ থেকে ভাবতে ভাবতে রমেশ জমিদার বাড়ি থেকে বেরিয়েছে। উপস্থিত রূপনগরের সমৃদ্ধি সাধনের অনেক যেন সম্ভাবনা আছে। একদিন ইচ্ছে করলে ওই মল্লিকরাই প্রভূত ধনের অধিকারী হতে পারতেন, টাটা-বিড়লার সমকক্ষ!

কিন্তু সে-সময় তাঁদের কারোই খেয়াল হয়নি, একদিন জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ হবে

—জমির মালিক বলতে জমিদার নামে কাউকে আর বরদাস্ত করতে হবে না। মনে আছে সুশান্তর বিয়েটা সেদিন খুব ধুম-ধামের সঙ্গে হয়েছিল; এই পথে রাতের বেলা অনেক মশাল পথ-দেখাতে এগিয়ে এসেছিল। সুশান্ত সবে এম-এ পাশ করেছে কৃতিত্বের সঙ্গে। রূপনগরের মল্লিকবাবুরা ঠিক সন্ধান করে সামান্য ঘরের ছেলেকে নিজেদের ঘরে তুলে এনেছিলেন। সুশান্তর বিয়ের দিন ভোর রাত্রে স্টেশনে ফিরতে ফিরতে অনেক পোড়া তুবড়ির খোল আর রোশনাই-এর পোড়া কাঠি পা দিয়ে রাস্তার ওপর থেকে সরিয়ে দিতে দিতে বরকন্দাজ বলেছিল,—এবার বিয়ে বাড়িতে অনেক বাজি পুড়েছে! ছোটবাবু ঢালাও হুকুম বরকন্দাজ বলেছিল,—এবার বিয়ে বাড়িতে অনেক বাজি পুড়েছে! ছোটবাবু ঢালাও হুকুম দিয়েছেন। আজও পুড়বে!

রমেশ তখন অন্য কথা ভাবছিল। সুশান্ত এম-এ পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করেছিল বলে এতবড় বাড়িতে বিয়ে করল। লেখাপড়ায় কৃতিত্বের মূল্য যেন জাজ্বল্যমান, হাতে হাতে ফল দিলে! সুশান্ত কি ছিল, কি হ'য়ে গেল! অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা পেলে!

এখন সে কোথায় কে জানে।

সেদিন সব মিলিয়ে যে মনোভাব মনকে ভারাক্রান্ত করেছিল আজ কুড়ি বছর পরে তার কিছু অবশিষ্ট না থাকলেও একটা অবুঝ বিস্ময় যেন থেকে যায়—যা কখনো ভাবা যায় না, তা কেমন করে ঘটে? একদিন সুশান্তর শ্বশুররা কত বড় লোক ছিলেন, কি হ'য়ে গেছেন! ভোগের চেহারার কি হ'য়েছে? আর সরকার বেছে বেছে তাকেই এখানে এনে ফেলেছে তারই বিলিব্যবস্থা করতে? এ কি পরিহাস নয়? কোন কৌতুক নয়, অদৃশ্য পুরুষের?

ভোরের আলো ফুটেছে। রাস্তার উল্টো দিক থেকে এক ভদ্রলোক ত্বরিৎ পায়ে এগিয়ে আসছেন দেখা গেল। চেহারার সঙ্গে জমিদার বাড়ির সাদৃশ্য খোঁজবার আগেই ভদ্রলোক সহাস্যে সম্ভাষণ করলেন,—প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন? খুব ভাল, রূপনগরের জল-হাওয়া ভাল!

ভদ্রলোকের হাতে একটা পোড়ামাটির পুতুল, মনে হয় মাটির মধ্যে থেকে এই মাত্র উদ্ধার করা হ'য়েছে।

ভদ্রলোক নিজে থেকে বললেন,—আমারও বেড়ান অভ্যেস আছে, মানে হ'য়েছে! দেখছি ভালই অভ্যেসটা। অনেক কিছু দেখা যায়।

একটু বেশি গায়ে-পড়া মনে হয়, নাকি নতুন লোক পেয়ে মন খুলে দিয়েছেন? কেউ বলে না দিলেও ভদ্রলোককে মল্লিক বাড়িরই বিশিষ্ট একজন ভাবা রমেশের পক্ষে অসম্ভব মনে হয়নি।

পুতুলটা এমন কিছু দ্রষ্টব্য নয়, নতুন দেশে নতুন কিছু দেখার মতও নয়। রমেশ এক নজরে ভদ্রলোকের আপাদমস্তক দেখে নিলে। যদি মল্লিকবাবুদের এক জন হন তা'হলে বলতে হয়, উনি লক্ষ্মীকান্ত মল্লিকের চেয়ে স্বাস্থ্যবান। বর্ণ উজ্জ্বল, দীপ্ত কপাল, নাসিকাগ্র ঈষৎ নম্র!

ভদ্রলোক নিজের কথাই বললেন,—ঐ রাস্তার ওদিকে খানিকটা মাটি চাপা পড়ে পুতুলটা পড়েছিল, মাথাটা কেবল দেখা যাচ্ছিল! ক'দিন দেখার পর আজ সন্দেহের নিরসন হ'ল! টেরাকোটা শিল্পের চমৎকার নিদর্শন, কি বলেন?

আপন উৎসুক মুখটা উদ্যত পুত্তলিকার স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রমেশ বললে,—আমি ঠিক

জানি না। টেরাকোটার ঘোড়া দেখেছি কলকাতার কিউরিওর দোকানে, পুতুল দেখিনি!

পুতুলটাকে হাতের চেটোয় শায়িত করে মল্লিক বাড়ির ভদ্রলোক বললেন,—হাতি, ঘোড়া, পুতুল সবই টেরাকোটা শিল্পে সম্ভব! পোড়ামাটির এ এক আশ্চর্য কারু কাজ মশাই! এদিকে তেমন নেই, বিষ্টুপুরের ওদিকে মন্দির, দালান-কোটায় এখনো এর বিস্তর চিহ্ন! মৃৎ এবং স্থাপত্য-শিল্পের খাঁটি বাঙালী ভাব ওর মধ্যেই আছে!

রমেশ বঙ্গ সংস্কৃতির প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্বন্ধে কিছুমাত্র অবহিত নয়। ইতিহাস দিয়ে কোনদিন এ সব জিনিস বিচার করে দেখেওনি। দালান-কোটা, মন্দির, গির্জা, মসজিদ, স্মৃতি-সৌধ যা দেখেছে তা দেখার আনন্দেই দেখেছে; কোনদিন ভাবেওনি মানব সংস্কৃতির কোন ক্রম বা ধারা তার মধ্যে নিহিত আছে। মুসলমানী কি খৃস্টানী, কি ভারতীয় কি বঙ্গীয়, অত গবেষণা করে দেখেনি। টেরাকোটা নামটা শোনা, শিক্ষিত ভদ্র মানুষরা বলে, তাই শুনেছে।

রমেশকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক হেসে বললেন,—ও বুঝেচি, এসব বিষয়ে আপনার ইণ্টারেস্ট নেই! না-থাকারই কথা, আপনারা হ'লেন আধুনিক!

—তা নয়, মানে—রমেশ আমতা-আমতা করলে।

—ঐ হ'লো! ভদ্রলোক যেন ক্ষুণ্ণ হ'য়ে পুতুলটাকে হাতের মুঠোর মধ্যে লুকিয়ে ফেল্‌লেন। তারপর দুপা এগিয়ে তিন-পা পিছিয়ে এসে বললেন, সময় হ'লে আমার মিউজিয়ম দেখে যাবেন, ইণ্টারেস্ট পাবেন। আপনি যেখানে অফিস করেছেন তার পশ্চিম দিকের বাড়িটায় আমার আস্তানা! আসবেন, অনেক জিনিস দেখাব যা আপনাদের কলকাতার যাদুঘরেও দেখেননি!

ছেলেমানুষের মত বিস্ময় প্রকাশ করে রমেশ বললে,—আপনি বুঝি প্রত্নতত্ত্ব নিয়ে গবেষণা করেন?

ভদ্রলোক হেসে উত্তর না দিয়ে সোজা চলে গেলেন।

তা হ'লে ইনিই সে-ই কাশীকান্ত মল্লিক! ছোটবাবু লক্ষ্মীকান্ত মল্লিকের মতে পাগল, খেয়ালী, যত রাজ্যের নুড়ি, পাথর আর ভাঙা হাঁড়ি-কুঁড়ি সংগ্রহ করেন! দুই ভায়ের মিল চমৎকার! একজন জমিদারী চলে-যাওয়ার দরুণ হায়-হায় করছেন, আর একজন সেই জমিদারীর আশ-পাশ খুঁড়ে পুরোন ইতিহাসের পাঠোদ্ধার করছেন।...

এদিকে নোটিশ পেয়ে দলে দলে লোক আসতে আরম্ভ করল। মল্লিক বাড়িতে উদয়-অস্ত মেলা বসে গেল। জমির মালিকানা নিয়ে দিন-রাত হৈ-হল্লা চলল। সারা-দিনের কাজে ক্ষুদে হাকিম রমেশ ক্লান্ত! ব্যতিব্যস্ত হয়ে একদিন সে ওপরে লিখে পাঠালে, একা তার পক্ষে সুস্থির হয়ে কাজ করা অসম্ভব। রূপনগরের ভূমি বিধিবদ্ধভাবে বণ্টন করার ব্যাপারে আরো লোকের প্রয়োজন। অশিক্ষিত চাষী-প্রজা এরা কিছুই মানতে চায় না—কেবল 'দাও-দাও,' 'আমার-আমার' বলে' চীৎকার করে, কোন কথা বোঝালে বোঝে না।

রমেশ আরো লিখলে, যদি লোক পাঠান একান্ত সম্ভব না হয় তা হলে যেন সদর থেকে দু'পাঁচজন সশস্ত্র পুলিশ পাঠান হয়! এই সব ভূঁই-ফোঁড় জমির মালিকরা কখন কি ক'রে বসে কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। ইতিমধ্যে এরা জমিদার বাড়ির অনেক ক্ষতি সাধন করেছে। আমবাগান নষ্ট করেছে, পুকুরের মাছ মেরেছে, পাঁচিলের ইঁট ছাড়িয়ে নিয়ে

গেছে। তবে আসল জমিদার যাঁরা তাঁরা শান্ত আছেন। কাজে সহযোগিতাই করছেন।

এরপর হঠাৎ একদিন রাতে বৃষ্টি হল। শীতকালের বৃষ্টি, প্রচণ্ডতা যেমন তীব্রতাও তেমনি। লেপের মধ্যে রমেশ কেঁপে উঠল। জমিদার বাড়ির পুরোন চাকর পবনকে ডেকে ঘরের দরজা-জানালা সব বন্ধ করিয়ে দিলে। বাইরে বাতাসে কাছারী বাড়ির ভাঙা দরজা-জানাগুলো আছাড় খেয়ে খেয়ে আরো ভগ্নদশায় পেঁাছল। রমেশ চোখ-কান বুজে লেপ মুড়ি দিয়ে বিছানায় পড়ে রইল।

পরের দিন সকাল বেলা উঠে রমেশ ঠিক খেয়াল করতে পারলে না, ঘুম তার কখন এসেছিল, কখন গিয়েছিল, সারারাত নিদ্রাহীন কেটেছিল কি না!

ঘরের জানালা খুলে দিতে জমিদার বাড়ির অন্তঃপুরবাটিকার বিধ্বস্ত আমবাগানটা চোখে পড়ল। কাল রাতের বৃষ্টিতে ডাল-পালার যত ক্ষতিই হোক, আজ সকাল বেলার মৃদু বাতাসে আন্দোলিত আম গাছগুলো যেন সদ্যোস্নাত, পরিতৃপ্ত নারীর মত সিক্ত কেশ-মার্জনায় রত! জমিদার বাড়ির বুড়ো আমগাছগুলোয় বউলে ভরে গেছে, যেন বর্ষীয়সী মহিলারা পুত্রবতী হয়ে সলজ্জ হাসছে।

জমিদার বাড়ি থেকে পবন এসে দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে জানালে, কাশীকান্তবাবু হাকিম সাহেবকে ডাকছেন!

রমেশের মনটা বিরূপ হ'য়ে উঠল।

যেন হুকুমের চাকর পেয়েছেন, ডাকলেই অমনি যেতে হ'বে!

ছুটির দিনটা সকাল থেকেই প্রত্নতত্ত্বের গবেষণা শুনিয়ে মাটি করে দেবেন! দুই পাগলের মাঝখানে পড়ে প্রাণ অতিষ্ঠ আর কি!

গতকাল ভূমিহীন কৃষকদের ভিড় দেখে লক্ষ্মীকান্তবাবু ক্ষিপ্ত হ'য়ে বলেছিলেন, তুমি বলে এমনি ঝামেলা সহ্য কর, আমি হ'লে গুলি মেরে বেটাদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিতুম! যত সব জালিয়াৎ এসে জুটেছে। জমি চাই!

তার আগের দিন সন্ধ্যে বেলায় টেবিল ল্যাম্পের আলোর সামনে বাটনা-বাটা ছোট্ট একটা শিল দেখিয়ে কাশীকান্তবাবু নিজের পাণ্ডিত্য জাহির ক'রে বলেছিলেন, কিছু বুঝতে পারছেন, না?

বোঝবার কিছু ছিলও না। কারো পরিত্যক্ত বাটনা-বাটা শিল, রূপনগরের কোন পোড়ো ভিটে থেকে সংগ্রহ হ'য়েছে নিশ্চয়ই!

কিন্তু কাশীকান্ত বললেন,—শিলের ওপর এই যে অস্পষ্ট দাগগুলো দেখছেন ওগুলো নির্ঘাৎ মহারাজা অশোকের আমলের কোন লিপি!

রমেশ ভয়ে ভয়ে বললে,—তাঁর শিলা-লিপি শুনেছিলুম পূর্বাঞ্চলে গঙ্গা পেরোয়নি!

কাশীকান্তবাবু প্রমাণ আনতে পাশের ঘরে উঠে গিয়ে প্রকাণ্ড একটা এ্যালবাম এনে সামনে মেলে ধরলেন—ক্ষুদ্র, বৃহৎ বহু শিলাখণ্ড এবং উৎকীর্ণ অনেক লিপির প্রতিকৃতি দেখালেন। বললেন, তাঁর আবিষ্কৃত শিলা-খণ্ড এবং তদুপরিস্থ লিপির সঙ্গে সামঞ্জস্য আছে। রমেশ স্বীকার করলে আছে। মহারাজ অশোক যখন ভারতের বাইরে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্যে লোক পাঠাতে পারেন, তখন মানুষের সুবুদ্ধি জাগ্রত করার জন্যে ভারতের যে-কোন স্থানে শিলা-খণ্ডও প্রোথিত করতে পারেন!

কাশীকান্ত আরো বললেন,—চৌদ্দপুরুষ আগে এখানে আমাদের পূর্বপুরুষরা বসবাস আরম্ভ করেন। সে-সময় কিছু কিছু পাথরের, হাড়ের তৈরী শিকারের হাতিয়ার

পাওয়া গিয়েছিল—উঠে গিয়ে একটা কাঠের-বাক্সে-ভরা জিনিসগুলো এনে কাশীকান্ত দেখালেন।

রমেশ বিস্ময় বোধ করলে, ভদ্রলোকের উৎসাহ আছে।

কাশীকান্ত বললেন,—আমার বিশ্বাস আমাদের পূর্বেও এখানে মানুষের বসতি ছিল এবং তারা অস্ট্রো-মঙ্গোলীয় জাতির বংশধর ছিল। শিকারের জিনিসগুলো তার প্রমাণ!

কাশীকান্তবাবু থামলেন, আপন সংগ্রহ-শালার গৌরব আপনি যেন উপভোগ করলেন। বললেন,—তবে কিন্তু ভাববেন না, তারা আমাদেরই পূর্বপুরুষ! আমরা কিন্তু খাঁটি আর্য।

আর্য-ই বটে! রমেশ মনে মনে হাসলে। জমিদার তনয় প্রত্নতত্ত্বের গোড়ায় গলদ ক'রে বসে আছেন! হয়তো ভেবেছেন আধুনিক কালের বি-এ, এম-এ পাশ-করা ছেলে-ছোকরারা পূর্বপুরুষদের খবর কিছুই রাখে না।

গোড়ায় গোড়ায় কাশীকান্তবাবু রেখে-ঢেকে খেতেন। এখন সামনে নিয়েই বসেন। সামনে আলমারী ভরা বইয়ের মধ্যে তরল পানীয়ের নিমিত্ত কাঁচের অনেক পাত্র সাজান আছে।

শ্বেত-পাথরের টেবিলে নিজের পান-পাত্রটা নামিয়ে কাশীকান্ত বললেন,—জানো হাকিম, তোমাদের এই ব্যাপারে আমি অংশীদারদের সঙ্গে ঝগড়া করেছি। বলেছি, ইতিহাস বলছে জমির মালিক আর মল্লিকরা থাকতে পারে না! সব মুখ্যু, বুঝলে না, আমার কথা শুনলে না! এখন কেমন হল—নিলে তো তোমরা কেড়ে?

কাশীকান্তর মুখের হাসিটা দেখে রমেশ চমকে উঠলো, কেমন অস্বাভাবিক যেন। জমিদারীর কথা উঠলে লক্ষ্মীকান্তর মুখে এমন দুষ্ট হাসি দেখা যায়।

রমেশ তাড়াতাড়ি বললে,—আমরা নেব কেন! জাতীয় সরকার আইন করেছে—Abolition of Zamindary Act 1953!

কাশীকান্ত পানপাত্র নিঃশেষ করে বললেন,—ও আমি অনেক কাল আগেই এঁদের সবাইকে বলেছিলুম, প্রত্নতত্ত্বের সংগ্রহ করে দেখিয়ে দিয়েছিলুম চোখে আঙুল দিয়ে, কিছুই থাকে না চিরকাল! সব ব্যাপারে একটা পরিবর্তন আছে!

আবার হাসলেন কাশীকান্ত মল্লিক। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে আলমারী খুলে একটা কাঁচের গ্লাস বার করে ঢক্ ঢক্ করে তরল পানীয় ঢেলে বাড়িয়ে ধরে বললেন, —নাও খাও! কেবল বসে বসে দেখবে, তা কখনো হয়? নাও, চুমুক মারো!

ভয়ে ভয়ে রমেশ পান-পাত্র এক ঢোকে শেষ ক'রে দিলে। কাশীকান্ত কোন আপত্তি শুনলেন না। রমেশের চোখের ওপর এক অদৃষ্টপূর্ব জগৎ চমকে উঠল—কাশীকান্তর সংগ্রহশালা সজীব হ'য়ে মুখর হল। অনাচ্ছাদিত, নিরাবরণ নারী-দেহের তরঙ্গ হিল্লোলে ঘর ভরে গেল।

হাত ধরে দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়ে কাশীকান্ত বললেন,—আবার এসো, বহুকাল মাইফেল করা হয়নি, ও কর্ম্ম বহুকাল উঠে গেছে! একলা-একলা কি ভাল লাগে?

রমেশ দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অবাক হ'য়ে গেল। কাশীকান্ত মল্লিক চোখ বুজিয়ে খাটের ওপর বিছানার সঙ্গে যেন মিশে আছেন। তাঁর মাথার কাছে কুৎসিত দর্শনা এক মহিলা বসে আস্তে আস্তে মাথায় হাত বুলচ্ছেন। অস্ফুটে বুঝি জিজ্ঞেস করলেন,—আর কি কষ্ট হচ্ছে?

মুখ বিকৃত করে কাশীকান্ত মল্লিক বললেন,—না। যাও, যাও!

তারপর চোখ খুলে বললেন,—এই যে হাকিম সাহেব, এসেছো? তোমার সঙ্গে একটা পরামর্শ ছিল।

রমেশকে ইতস্তত করতে দেখে কাশীকান্ত বিরক্ত হ'য়ে বললেন,—আঃ যাও না! বল্‌লুম না আমার কিছু হচ্ছে না।

মহিলাটি উঠে সরে গেল।

কাশীকান্ত বিছানার ওপর উঠে বসে বালিশ ঠেস দিয়ে বললেন,—ও মাগী ঐ রকম, সব ব্যাপারে থাকবে। পবনকে দিয়ে ডাকতে পাঠিয়েছি, ঠিক খেয়াল আছে, এসে বসে আছে। জ্বালাতন করে মারলে, কিনা কাশীবাবুর অসুখ করেছে!

দর্শনে কুৎসিত হ'লেও স্বভাবে মহিলাটিকে সুদর্শনই মনে হয় রমেশের। অন্তত সেবাপরায়ণা!

কাশীকান্ত মল্লিক বললেন,—যাক গে, যা বলছিলুম একটা পরামর্শ দিতে হবে। আমার কিছু বিষয়-সম্পত্তি আছে বেনাম করা, তার ব্যবস্থা করতে হবে। অবশ্য বিষয়টা আমার নয়, ছোড়দার।

রমেশ চুপ করে শুনলে, কোন মন্তব্য করলে না। কাশীকান্ত খানিকটা কি ভাবলেন, তারপর বললেন,—ছোড়দার কাছ থেকে জোর করে নিয়ে নিয়েছি, ও'র মেয়ের নামে রেকর্ড করিয়েছি। কিন্তু সে-মেয়ের—

কাশীকান্তবাবু থামলেন, আবার যেন কি ভাবলেন। বললেন,—না, তোমাকে বলতে কোন বাধা নেই—সে-মেয়ের কোন সন্ধান নেই। খুব ঘটা করে তার বিয়ে দিয়েছিলুম, খুব বিদ্বান বর দেখে জামাই করেছিলুম, কমলা মার জন্যে সম্পত্তি বাঁধা দিয়েছিলুম, কিন্তু সেই কমলা মা-ই স্বামীর ঘর করতে পারলে না, আজ পনের ষোল বছর সে কোথায় যে গেছে কেউ জানে না, অনেক সন্ধান করেছি কোনই খবর পাইনি।

রমেশ জিজ্ঞেস করলে,—কেন, আপনার ভাইঝির স্বামী নেই?

—আছে, কিন্তু সে আমাদের পয়সায় বিলেত ঘুরে এসে আমাদেরই মেয়েকে তাড়িয়ে দিয়ে কলকাতার এক আধুনিক ধনীর আধুনিকা শিক্ষিতা কন্যাকে বিয়ে করে ঘর-সংসার করছে। শুনেছি খুব বড় দরের চাকরি করে সুশান্ত!

—সুশান্ত? রমেশের মুখ দিয়ে কথাটা যেন ছিটকে বেরিয়ে এল।

—কেন, চেন নাকি? একটা জানোয়ার, লোফার, প্রতারক!

—আপনারা কেস করেনি কেন?

—সে তো আরো কেলেঙ্কারী! রূপনগরের মল্লিকদের কথা খবরের কাগজে ছাপা হ'বে, একে জমিদারী নেই বলে লোকে মানে না, তখন তো গায়ে থুতু দেবে!

—তা নয়, ভদ্রলোকের উচিত শাস্তি হত!

—উচিত শাস্তি কেউ কারো করতে পারে না এক ভগবান ছাড়া। তার সাক্ষী আমাদের দেখ না, বিশ বছর আগে দুর্ভিক্ষ পীড়িত যাদের মুখের ওপর গেট বন্ধ করে বলেছিলুম, ভাগো ভাগো, এখানে এসেছো ভাত চাইতে! কেন, দানছত্তর খুলেছি তোমাদের জন্যে? সিং দরজার ওপারে রোজ অমনি এসে দুচারটে মরে পড়ে থাকতো, কখনো শ্যাল-কুকুরে টেনে নিয়ে যেত, কখনো গ্রামের কেউ আগুণ জ্বালিয়ে সংকার করতো। এখন সেই তারাই আবার ভিন্নরূপে ফিরে এসেছে, তোমাকে ছেঁকে ধরেছে, জমির মালিক বলে দাবী করছে।

পারবে ছোড়দা ওদের ঠেকাতে? যাক, যা বলছিলুম, বেনামী জমিগুলো তুমি বেচে দিয়ে টাকাটা আমায় দাও, এখান থেকে চলে গিয়ে মেয়েটার খোঁজ করবো। অনেকে তো জমি চাইছে, কাউকে গছিয়ে দাও।

রমেশ বললে,—তা না হয় করলুম, কিন্তু আপনার এই মিউজিয়ম, এর কি করবেন?

কাশীকান্ত হেসে বললেন,—সরকারকে দান করবো! কাছারী বাড়ির মত এও একদিন কাজে লাগবে, দেখে নিও। মল্লিকদের নাম থাকবে!

রমেশ বললে,—দেখি!

কাশীকান্ত বিছানা ছেড়ে উঠলেন। আলমারী খুলে গেলাস বার করলেন, দেরাজ থেকে বোতল।

রমেশ বললে,—সকাল থেকেই সুরু করলেন?

গ্লাসে তরল পানীয় ঢালতে ঢালতে কাশীকান্ত বললেন,—কাল তো তুমি এলে না, সন্ধ্যে থেকে চলেছে। রাতেও বেশ ঠাণ্ডা পড়েছিল তার ওপর বৃষ্টি...বুঝলে না, বাঁচতে হবে তো! মাত্রা বেশি হ'য়ে গিয়েছিল, খোঁয়াড়ি ভেঙে নিচ্ছি!

রমেশ বললে,—এ বয়েসে আর এসব করা উচিত নয়! সহ্য হবে কেন?

কাশীকান্ত হাসলেন—এখন অসহ্য হ'লেই তো বেঁচে যাই হাকিম! অনেক সহ্য করে তো দেখলুম। ভেবেছিলুম, এইসব মূর্তি, পাথর, শিলা সংগ্রহ করে রূপনগরের একটা ইতিহাস লিখে যাব, কার পর কি! মল্লিকদের আগে যারা ছিল তাদের কথাও টেনে বার করবো। কিন্তু হলো না। কমলা মায়ের ভাবনায় মন বড় চঞ্চল হয়ে আছে—এখানকার বাস উঠিয়ে কলকাতা কি আর কোথাও গিয়ে দেখবো। তুমি আমাকে সাহায্য করবে না?

রমেশ মাথা নাড়লে। খোঁয়াড়ি ভাঙ্গার বদলে নেশা যেন আরো চাগাল।

কাশীকান্ত বললেন,—কি দরকার বাবা ঝামেলা করে, ছোড়দাকে কবে থেকে বলছি, যা গেছে তা নিয়ে আর মাথা ঘামিও না। জ্ঞাতি-গোত্র কেউ যখন চাইলে না, তোমার অত কেন। ছেলেরাও তো বলে দিয়েছে, দেশে তারা আসবে না! তা হ'লে আর কার জন্যে? ছোড়দা বড় অবুঝ, আমার সঙ্গে ঐ নিয়ে রাগারাগি, বিষয় বিষয় করে অস্থির! এদিকে মেয়েটাকে যে এক চামারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে সে-খেয়াল নেই! যাক গে, তুমি খদ্দের দেখো ভায়া, কিচ্ছু রাখবো না, বেচে কিনে চলে যাব ঠিক করেছি—

তারপর রূপনগরে পোড়ামাটি শিল্পের আবিষ্কার হিসাবে সেদিনের সেই পুতুলটা রমেশের হাতে দিয়ে কাশীকান্ত বললেন,—এটা তোমাকে দিলাম, হাকিমী করতে যেখানেই যাবে মনে থাকবে।

শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর শূন্য কাঁচের গ্লাসটা নামিয়ে রাখতে গিয়ে ঠক্ করে শব্দ হল। মনে হল শব্দটা যেন খুব জোরে হল।

আর ঠিক সেই সময় পবন হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে এসে কাঁদন-মাদন হ'য়ে বললে,—বাবু সব্বনাশ হয়েছে, ছোটবাবু দুধ-পুকুরে ডুবে মরে ভাসছে।

মদের গ্লাশ-নামান শব্দটা মিলিয়ে গিয়ে একটা শব্দহীন নীরবতা ঘরময় বিরাজ করতে লাগল।

কাশীকান্ত আলমারীর মধ্যে কাঁচের গ্লাস বন্ধ করে বললেন,—তুই যা, আমি যাচ্ছি।

রমেশও উঠে গেল।...

বছর তিন-চার পরে স্থানান্তরে বদলী হ'য়ে রমেশ প্রাক্তন এক সহকর্মীর কাছ থেকে হঠাৎ একটা চিঠি পেল।

'...রূপনগরের কথা মনে আছে তো? এখন এলে আর চিনতে পারবেন না। আমি এখানে আবার চাকরি নিয়ে এসেছি; অবশ্য আর সরকারী চাকরি নয়। সেই যে জমিদার বাড়ি মল্লিকদের, ওখানে এখন একটা ফ্যাক্‌ট্রি তৈরী হ'চ্ছে তার কাজে লেগে গেছি। মল্লিক-বাড়ির চিহ্নমাত্র নেই, সব ভেঙে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হ'য়েছে... জমিকে কংক্রীট ঢেলে সমান করা হ'চ্ছে। গাছ-পালা সব কেটে ফেলা হ'য়েছে।...এতদিন পরে সেই লক্ষ্মীকান্তবাবুর মৃত্যুর কারণটা লোকের মুখে জানতে পারা গেল...দুই ভাইয়ে এক মেয়েমানুষ নিয়ে গোলমাল ছিল!...কমলা বলে ওঁদের কে এক মেয়ে ছিল, যার খুব ধুমধাম করে বিয়ে হ'য়েছিল এক লেখাপড়ায় রত্ন ছেলের সঙ্গে, সে নাকি ছোটবাবুর মেয়েই ছিল না, কাশীবাবুর ঔরসজাত...সে-মেয়েমানুষটিকে আপনি হয়তো দেখেছেন... দেখতে খুব বিশ্রী, কালো, মোটা-সোটা, গোলগাল...ছোটবাবুর মৃত্যুতে ঐ-ই তো কাশী-বাবুকে সান্ত্বনা দিয়েছিল ঘাটে বসে...বেশ হ'য়েছে দেশ থেকে জমিদারী উঠে গিয়েছে, যত সব নোঙরামী!...আপনার শুনলুম প্রমোশন হ'য়েছে—সত্যিকারের হাকিম! খুব ভালো...'

জলের দাগ

সুধাংশু ঘোষ

বিকেলের দিকে হালকা বৃষ্টির গুঁড়ো হাওয়ায় উড়ে এল। ঝিরঝির বৃষ্টি নয়, তার থেকেও অনেক মৃদু। বৃষ্টির জন্যেই যে বাংলোয় আটকে থাকতে হল এমন নয়। আগে থেকেই ঠিক ছিল, আজকের দিন আর রাতটা এখানে কাটিয়ে কাল ভোরে আরও উত্তরে যাবে। শীত বৃষ্টির মত মৃদু, কাঁপুনি ধরার মত কিছু নয়। তাছাড়া টেবিলে উদার আয়োজন। শরীর উষ্ণ রাখার পক্ষে যথেষ্ট। অসম্পূর্ণ বৃত্তের মত বাংলোর কাঠের বারান্দায় ভারি গোলটেবিলটা পেতেছে। তার ওপর পূর্ণ পাত্র। মুখের কাছে আনলেই স্বর্ণাভ পানীয় থেকে মৃগনাভির গন্ধ আসছে। এখানে বড় সস্তা। আবগারীর বালাই নেই।

দুপুরের একটু পরেই কোন্ এক পাহাড়ী নদী থেকে দুটো মাছ ধরে এনেছিল বংশীলাল। এখন বাংলোর রান্নাঘরে বসে স্টোভ জেবলে সেই মাছ কড়া করে ভাজছে বংশীলালের বউ। রান্নাঘর থেকে বংশীলাল গরম মাছভাজা প্লেটে করে এনে বারান্দায় উৎপল আর ললিতার টেবিলে রাখছে। ইতিমধ্যে তিনচার দফায় শূন্য প্লেট নিয়ে গিয়ে আবার ভরে এনেছে। ভাজা মাছের গায় ক্ষুদ্র সূক্ষ্ম তৈলাক্ত বুদ্‌বুদ্‌গুলো কিছু বাইরে ফাটছে, কিছু উৎপলের জিভের ওপর আর দাঁতের তলায়। মৃগনাভির গন্ধ মেশান স্বর্ণাভ পানীয় উৎপলের ঠোঁটের তেল পুরোপুরি ধুয়ে নিতে পারছে না। ললিতা এতক্ষণ ধরে দু'খানা মাত্র মাছভাজা মুখে তুলেছে, আর একটি মাত্র পাত্র এখনও নিঃশেষ হল না।

সামনে হাজার দুয়েক ফুট উঁচু পাহাড়। তার খাড়াই থেকে ফিনকি দিয়ে জলের ছড় নামছে। ঢালুতে নেমে তা-ই ফেনশুভ্র দুরন্ত নদী। এখানে, অনেকটা দূরে, তার গর্জন মৃদু হয়ে কানে বাজছে গানের মত। বরং রান্নাঘরের স্টোভের ধ্বনি অনেক বেশি তীব্র।

উজ্জ্বল আলো নেই। বড় বেশি ম্লান বিকেলটা। তাছাড়া বিকেলও প্রায় শেষ হল, একটু পরেই সন্ধ্যে নামবে। বাংলোয় বৈদ্যুতিক আলো নেই। বংশীলালের বউ কেরোসিনের আলো জবালবে। সব গুছিয়ে রেখেছে। হোল্ডল বিছিয়ে সযত্নে ললিতা আর উৎপলের বিছানা পেতে রেখেছে একটা ঘরে। মেয়েটা বংশীলালের তুলনায় অনেক কাল। শরীর আশ্চর্য সুন্দর। একটি মাত্র কথায় বলা যায়, ভয়ঙ্কর। প্রায় মোটেই কথা বলে না, বোবা বলে সন্দেহ হতে পারে। শুধু সব সময় সারা মুখে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে রেখেছে। সুবিন্যস্ত সাদা দাঁতের সারিতে, পিঙ্গল তীক্ষ্ম চোখে কী এক দুঃসহ রহস্য যেন লুকিয়ে রেখেছে। গলায় বড় বড় রক্তরঙ পাথরের একটি বিচিত্র মালা। প্রত্যেকটি পাথরে যেন মৃগনাভির গন্ধ মেশান এক একটি পাত্র স্বর্ণাভ পানীয় জমে আছে। স্বর্ণাভ পানীয় জমে গিয়ে এখন রক্তরঙ।

মেয়েটার নাম জানে না ললিতা। প্রথম দর্শনেই জানতে চেয়েছিল, পারে নি। আজ সকালে বেলা বাড়লে সৌভাগ্যের মত বংশীলাল এসে পড়ার পর, তার সঙ্গে একটু ভাল করে পরিচয় হবার পর, মেয়েটা এসেছিল। বংশীলাল সলজ্জ হেসে বলেছিল, আমার জরু। এক নজর দেখেই মুগ্ধ হয়েছিল ললিতা। নাম জানতে চেয়েছিল, পারে নি। মেয়েটা ললিতার কথার কোন জবাব দেয় নি। শুধু সারা মুখে নিঃশব্দ হাসি ছড়িয়ে দিয়েছিল।

—তুমি কী যেন ভাবছ? উৎপল শব্দ করে একটা শূন্যে পাত্র টেবিলের ওপর রাখল।

—ভাবছি না কিছু।

উৎপল কয়েকশ' মাইল মোটর চালিয়ে এসেছে। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। ললিতার তেমন কোন ক্লান্তি আসে নি। এখানে শেষ বেলাটা এমন করে বসে কাটাতে ভাল লাগছে না। ললিতা ত মোটর চালায় নি, শুধু উৎপলের পাশে বসেছিল। এখানে এখন এই বাংলোর বারান্দায় সব কিছু কেমন মৃদু আর ম্লান। হাওয়ায় আর বৃষ্টির গুঁড়ো ভেসে আসছে না। বিকেলটা নিঃশেষ হয়ে এল। সামনের দু'হাজার ফুট উঁচু পাহাড় আর তেমন স্পষ্ট নেই। তবু এখন একবার বেড়াতে বেরলে হয়ত ভাল লাগত।

বংশীলালের বউ নিজে একবার এল মাছভাজা নিয়ে। প্লেটটা ললিতার দিকে এগিয়ে রাখল। কথা বলল না, শুধু দু'সারি সুবিন্যস্ত সাদা দাঁত বিকশিত হল একবার। তার তেলসিক্ত কাল ঠোঁট চিকচিক করছে। ভাজতে বসে নিজেকে বঞ্চিত করে নি তাহলে বংশীলালের বউ! ললিতার হঠাৎ হাসি পেল। তখনই, বংশীলালের বউয়ের রান্নাঘরে ফিরে যাওয়ার দিকে চোখ রেখে, হাসি মিলিয়ে গেল। কী ভয়ঙ্কর সুন্দর শরীর!

কলকাতা অনেক পিছনে হারিয়ে গেছে। কলকাতার প্রতিদিনের অনুষঙ্গ নিশ্চিহ্ন। যে-টিলার ওপর এই বাংলো তার সামনের ঢালু জমিতে ফেনশুভ্র নদী। তার ওপারে পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে ফিনকি দিয়ে জলের অজস্র ছড় নামছে। বাংলোর বারান্দার কাঠের রেলিংয়ের পরই ফুলের বাগান। শীতের দেশের ফুল। অনেক স্ন্যাপড্র্যাগন আর লার্কস্পার। ঢালুতে নামবার মুখে দুটো ভারি গাছে দুটো আনারসের মত ফুল। ললিতা নাম জানে না।

পাঁচসাত বছর আগে একবার এই অঞ্চলে বেড়াতে এসেছিল। সঙ্গে উৎপল ছিল, আরও দু'জন বন্ধু ছিল, তাদের স্ত্রীরা ছিল। বয়েস কম ছিল তখন। খুব অল্পেই তখন খুশীর ঢল নামত। উপকরণ অনাবশ্যক ছিল। এখনকার মত হন্যে হয়ে সুখ খুঁজে ফিরতে হত না। সুখের অবয়ব তখন যেন ধরাই ছিল হাতের মুঠোয়। এখন, মাত্র পাঁচসাত বছরে, সব কেমন ভোঁতা হয়ে এসেছে। খুব তীক্ষ্ন রগরগে কিছু না হলে এখন আর অনুভবে খোঁচা লাগে না। অথচ বাসনা তীব্রতর, হ্যাংলামি বেড়ে গেছে, প্রতিদিন বাড়ছে। সব হারিয়ে যাবার, হাতের মুঠো শিথিল হয়ে যাবার আতঙ্ক সর্বক্ষণ শরীরমনে সঞ্চারিত।

উৎপল কয়েকশ' মাইল মোটর চালিয়ে এসেছে। নিশ্চয় খুব ক্লান্ত। ভাল করে চোখ খুলে তাকাতে পারছে না। কলকাতার কাজের চাকা থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে একমাসের জন্যে। বিশ্রাম চাওয়া, আলস্যে এলিয়ে থাকা স্বাভাবিক। এই উৎপল একবার কলকাতায় একটা কাণ্ড করেছিল। এক সান্ধ্য আসরে উড়োজাহাজের পাইলট ক্যাপ্টেন যোগীন্দর ভইশ ললিতার কোমর জড়িয়ে নেচেছিল, উড়ে উড়ে নেচেছিল। প্রায় পঁচিশ গজ দূর থেকে হাতের পাত্র ছুড়ে ফেলে দিয়ে সুন্দরবনের বাঘের মত লাফিয়ে এসেছিল উৎপল। সেই ঘটনা আর আজকের মধ্যে মাত্র পাঁচসাত বছরের ফারাক। এখন উৎপল ভাল করে চোখ মেলে তাকাতে পারছে না। মায়া হয়। আজ রাত্রে আর কিছু খাবে না উৎপল, ললিতাও না। আজ রাত্রের মত উৎপল একবার মরে যাবে। সকালবেলা যন্ত্রের মত স্টীয়ারিং ধরবে আবার। আরও উত্তরে যাবে।

এতক্ষণে হাতের পাত্রটি শূন্য হল। হঠাৎ চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়িয়ে বংশীলালকে ডাকল ললিতা। সেই ডাকে একটু চমকে উঠেই আবার থিতিয়ে গেল উৎপল। রান্নাঘরের দিক থেকে এসে বংশীলাল সামনে দাঁড়াল। বারান্দার হাওয়ায় মৃগনাভির সুবাস তীব্রতর

হল। প্রসাদে তাহলে কার্পণ্য ছিল না! উৎপলের তুলনায় বংশীলালের শরীরের উচ্চতা কম। গায়ের রঙ কাল নয়, তবু উৎপলের তুলনায় অবশ্যই অনুজ্জ্বল। পেশীগুলো নিটোল নয়, মনে হয় বড় কঠিন আর কর্কশ।

ক্লান্তিহীন, অথচ কেমন যেন অলস গলায় ললিতা বলল, চল একটু বেড়িয়ে আসি, বংশীলাল। তোমাদের জায়গাটা আমাকে একটু ভাল করে দেখাও। কাল সকালেই ত চলে যাব। বংশীলাল উৎপলের দিকে তাকাল, উৎপল কষ্টে চোখ খুলে বংশীলাল আর ললিতার দিকে। সে এখন উঠবে না, গলায় এমন ইঙ্গিত মিশিয়ে উৎপল বলল, কোথায় যাবে?

ললিতা কোন উত্তর দিল না। সামনের ছায়াছায়া পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে যেখানে ফিনকি দিয়ে জলের ছড় নামছে সেদিকে তাকিয়ে শুধু একটু হাসল।

বারান্দা বাগান পার হয়ে ঢালুতে নেমে এল, সামনে বংশীলাল, প্রায় পাশে ললিতা। উৎপল তাকিয়ে আছে কি না, পিছন ফিরে দেখল না। বাংলোর পশ্চিম কোণে গাড়িখানা রয়েছে। চার চাকার গায় বংশীলাল পাথরের মাঝারি টুকরো চেপে দিয়েছে, গড়িয়ে যেতে পারবে না। গাড়ির গায় ধুলো নেই, বংশীলাল ধুয়ে মুছে দিয়েছে। কয়েকটা শুকনো হলুদ পাতা শুধু এখানে ওখানে খসে পড়ে হাওয়ায় কাঁপছে।

আজ সকালে বেলা বাড়লে ইস্পাতের দড়ির সেতুটা পার হয়ে বাংলোর কাছাকাছি এসে উৎপলের মোটর একেবারে অচল হয়েছিল। অনেক আগে থেকেই বুঝেছিল, মোটরের অন্ত্রে কোন কঠিন ব্যাধি হয়েছে। উৎপল নিজে কয়েকবার বনেট তুলে রোগ ধরতে পারে নি। অচল গাড়ি ঘিরে দু'দশজন লোক জমে গিয়েছিল। এমন সময় সৌভাগ্য বংশীলাল হয়ে উদয় হল। এসে কয়েক মিনিটের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটরের বেকিলাইটের ঢাকনা খুলে প্লাটিনাম পয়েণ্ট না কী একটা যেন বার করে আনল। এক টুকরো শিরীষ কাগজ দিয়ে পয়েণ্টটা ঘষে দিল একটু। রোগমুক্ত মোটর নিখাদ গর্জন করে স্বাস্থ্যের উল্লাস শোনাল।

উৎপল মুগ্ধ। তখন থেকে বংশীলাল লেগে রয়েছে। দুপুরের পরে কোন্ পাহাড়ী নদী থেকে দু'টো মাছ ধরে এনেছে, কয়েক পাত্র ভরে মৃগনাভির সুবাস কিনে এনেছে। এখানে বড় সস্তা। আবগারীর বালাই নেই। বংশীলাল ভাল হিন্দি জানে, বাঙলা ইংরেজিও কিছুকিছু। শৈশবে নাকি কোন্ এক মিশনারি স্কুলে পড়েছিল চার বছর।

ইস্পাতের দড়ির সেতুটা বাঁয়ে রেখে ডাইনে ঘুরল। একশ' গজের মত দীর্ঘ সেতু, তার প্রায় একশ' গজ নিচে ফেনশুভ্র দুরন্ত নদী। দুই দেশের সীমানা এই নদী। অজস্র কাঠের টুকরো স্রোতে ভেসে যাচ্ছে, পাথরের চাঁইয়ে আটকে আছে অজস্র। নদীর এপারে আবগারী কর নেই, ওপারে প্রচুর। কাঠকুড়ুনি বুড়িরা ভার মাথায় নিয়ে একসঙ্গে চারপাঁচ জন হাত ধরাধরি করে স্রোত ঠেলে নদী পার হচ্ছে। বংশীলাল জানাল, ওদের কাছে কাঠ ছাড়া আরও কিছু অবশ্যই লুকোন আছে; এমন সব জিনিস যা আবগারী করের এক্তিয়ারে পড়ে। বুড়িগুলো টলে পড়তে গিয়ে সামলে নিচ্ছে, হাসছে কি না এতদূর থেকে ভাল করে দেখা যায় না।

নদীর পাড় বরাবর মোটর আর গরুর গাড়ি চলার রাস্তা। সেই রাস্তা বাঁয়ে রেখে আবার ডাইনে ঘুরল। দু'পাশে কমলালেবুর বাগান। আর অল্প দূর এগিয়ে একেবারে বদলে গেল নিসর্গ। কোন সুদূর শহরের একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ যেন কোন ভয়ঙ্কর পারমাণবিক অস্ত্রের আঘাতে পাহাড় নদী ডিঙিয়ে এখানে এসে ছিটকে পড়েছে। বাংলোর দিকে বৈদ্যুতিক আলো নেই, এখানে আছে। নদী থেকে সরে এসে ডাইনামোর বিরামহীন

ঝিকঝিক কানে বাজছে। এই মাত্র জ্বলল আলোগুলো। বিকেল কখন ফুরিয়ে গিয়ে চারপাশে পাতলা অন্ধকার প্রসারিত। হালকা কুয়াশা ভাসছে।

শহরের ক্ষুদ্র ভগ্নাংশটা পার হয়ে এসে পথ বড় বিপজ্জনক। ললিতা অল্পেই হাঁপিয়ে উঠল। হয়ত সামনেই চড়াই; কষ্ট করে ওপরে উঠলে আবার হয়ত সামনেই এবড়োখেবড়ো পাথুরে পথের মারাত্মক ঢাল। সাহায্য ছাড়া এগোন ললিতার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। শহুরে আলো এখানে নেই। একবার প্রায় কাঠকুড়ুনি বুড়িদের মত টলে পড়ছিল ললিতা। বাঁ কাঁধে বংশীলালের থাবার মত হাত তাকে বাঁচাল। বংশীলালের হাত ধরে পার হতে হল খানিকটা পথ।

উৎপল নিজে গাড়ি চালায়। হাতের তালু কিছু শক্ত। কিন্তু বংশীলালের হাতের চেটোর চামড়ার তলায় বোধহয় ইস্পাতের দড়ি আছে। এমন কঠিন করে জড়ায়!

পাহাড়তলির দিকে এগোতে এগোতে ডাইনামোর বিরামহীন ঝিকঝিক মিলিয়ে গিয়ে, দুরন্ত জলস্রোতের গর্জন ক্রমান্বয়ে তীব্রতর হল। যেখানে পাহাড়ের খাড়াই থেকে জলের ছড় নামছে, হয়ত এই জায়গাটা তার কাছাকাছি। ডান দিকে ঘুরেঘুরে হয়ত তারই কাছে আবার ফিরে এসেছে। অথবা হয়ত তার অন্যদিকে ঠিক তারই মত আর একটা জায়গা।

বাংলো থেকে এতদূর চলে আসার কি কোন মানে আছে। হয়ত নেই। কিন্তু ললিতার ভাল লাগছে। এখানে অন্তত বাংলোর বারান্দার সেই মৃদু ম্লান বিষণ্ণতা নেই। মৃগনাভির সুবাসে সেই বিষণ্ণতা কাটে নি। অথচ এখানে বাইরে পাতলা অন্ধকার প্রসারিত, হাওয়ায় কুয়াশা ভাসছে, পাথুরে পথ বিপজ্জনক, দুরন্ত জলস্রোতের গর্জন তীব্রতর, বংশীলালের হাতের চেটোর চামড়ার তলায় ইস্পাতের দড়ি লুকোন আছে। ললিতার শান্তি নেই, সুখের পিছনে হন্যে হয়ে ছুটে প্রায় কিছুই মেলে না। তবু, এই মুহূর্তে, যেন ভাল লাগছে। এমন মুহূর্তজীবী সুখের জন্যেও ললিতা অনেক দাম দেবে।

পাহাড়তলির গ্রামটাকে ঠিক গ্রাম বলা যায় না। দূরে দূরে দশবারখানা ঘুপসি ঘর। তার একটা বংশীলালের আস্তানা। ঘরগুলো যে কী দিয়ে তৈরি বলা মুশকিল। কাঠ, টিন, টালি, এ্যাসবেস্টস, ইট, পাথর—সব কিছুর অপূর্ব মিশেল। অথচ দেখতে প্রায় গুহার মত। এত কাছ থেকেও এখন অন্ধকারে সব একাকার। শুধু প্রত্যেকটি ঘরের চালের ওপর কুয়াশার সাদা আস্তরণ স্পষ্ট। বংশীলাল একটু আগে আঙুল দিয়ে তার ঘর দেখিয়েছে। বংশীলালের ঘরে, বলা বাহুল্য, এখন কেউ নেই। অন্য ঘরগুলোর কোনটাই কাছাকাছি নয়। তবু ওই সব ঘরের বাসিন্দারা কোথায় গেল। বাইরে অন্তত একজনকেও দেখা যাচ্ছে না। হয়ত কেউ শহরে বাজারে গেছে, কেউ ঘরের মধ্যে। ইতিমধ্যে শীত একটু ধারাল হয়েছে।

—তোমার ঘর ভাল করে দেখব, বংশীলাল। এই বয়েসেও গলার স্বর এমন আদুরে-আদুরে হতে পারে ললিতার জানা ছিল না।

দুজন ঘরের মধ্যে এল। বংশীলাল কেরোসিনের আলো জ্বালতে চেয়েছিল, ললিতা জ্বালতে দিল না। ঘরের মধ্যে অনেক বেশি অন্ধকার। প্রথমে কিছুই চোখে পড়ল না। শুধু বোঝা গেল ঘরের মেঝে পাথরের। একটু পরে চোখ অভ্যস্ত হলে এক পাশে একটা বিছানার আদল দেখা গেল। পাথরের টুকরো সাজিয়ে উঁচু করে তক্তা পাতা হয়েছে, তার ওপর বিছানা। সেই বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসল ললিতা। আর এক পাশে দেওয়ালে জানলার মত একটা কিছু ছিল। তার ওপর বংশীলাল বসল। বংশীলালের মুখ দেখা

যাচ্ছে না, চোখও না। তার অবয়ব যেন শুধু গভীরতর অন্ধকার। ঘরের নিচু দরজাটা খোলা। তবু বাইরে থেকে আলো আসছে না। বাইরেও এখন প্রায় সমান অন্ধকার।

ললিতা বাংলোর বারান্দা থেকে বাইরে আসতে চেয়েছিল। এখন আবার কী যে হল, অনেকটা পথ হেঁটে বংশীলালের ঘুপসি ঘরের বিছানায় এসে বসল।

কাছেই কোথাও পাহাড়ের খাড়াই বেয়ে ফিনকি দিয়ে জলের অজস্র ছড় নামছে। তার গর্জনে কোন কথা বলা অর্থহীন। এই বিছানা নিশ্চয়ই নোংরা, হয়ত দুঃসহ দুর্গন্ধ। কিন্তু তার থেকেও তীব্র মৃগনাভির সুবাস। শীত আরও বেড়েছে। জুতো সরিয়ে পায়ের আঙুল দিয়ে পাথরের মেঝে ছুঁয়ে দেখল, ঠান্ডা। এখন এই মুহূর্তে পাহাড়তলির এই ঘর, উঁচু থেকে পাথরের ওপর জল আছড়ে পড়ার নিখাদ ধ্বনি আর অন্ধকার ছাড়া পৃথিবীর অন্য সব কিছু যেন কোন অতলে অবসিত। ললিতা বিছানায় পা ঝুলিয়ে বসেছে, সামনে জানলার খাঁজে বংশীলালের অবয়বের গভীরতর অন্ধকার। ললিতার শান্তি নেই।

এতটা পথ হেঁটে এসে মনে হল, এখন এই ঘরে এই বিছানায় একটু গা এলিয়ে দিলে হয়ত ভাল লাগবে। পা দুটো তুলে এনে বিছানায় শরীর ছড়িয়ে দিল ললিতা। অনুচ্চ গলায় বলল, বালিশ কোথায়?

পাথরের ওপর জল আছড়ে পড়ার শব্দে সেই মৃদু কথা বংশীলালের শুনতে পাওয়া স্বাভাবিক নয়। কিন্তু বংশীলালের কান অভ্যস্ত। জানলার খাঁজ থেকে এক চাপ গভীরতর অন্ধকার উঠে এসে বিছানার এক কোণ থেকে একটা বালিশ টেনে এনে ললিতার মাথার তলায় পেতে দিল। ললিতার চুলে বংশীলালের আঙুল জড়িয়ে গেল। নিজের হাত বাড়িয়ে বংশীলালের চারটে আঙুল শিথিল মুঠোয় ঢাকল ললিতা, হয়ত চুল থেকে সরিয়ে দিতে চাইল। হাতের চেটোর চামড়ার তলায় ইস্পাতের দড়ি লুকোন আছে। এমন কঠিন করে জড়ায়!

অনেক উঁচু থেকে পাথরের ওপর জল আছড়ে পড়ার গর্জন তীব্রতর হল। ফেনশুভ্র স্রোতস্বতীর একটা নতুন দুরন্ত শাখা প্রসারিত হয়ে ললিতার শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে গেল। পাহাড়ের খাদ, গুহা আর পাতালের আদিম অন্ধকার লাফ দিয়ে উঠে এসে এই ঘরে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেই অন্ধকার চিৎকার করে উঠল, জলের গর্জন ছাপিয়ে চিৎকার করে উঠে নিজের শরীর ফালাফালা করে দিল। সেই অন্ধকারের পরমাণুগুলো ভয়ঙ্কর শব্দে ফেটেফেটে গিয়ে চরাচরে বিচ্ছুরিত হল।

অনেকটা সময় পরে বেরিয়ে এল ঘর থেকে, বংশীলাল আগে, প্রায় পাশে ললিতা। বংশীলালের হাত ধরে বেসামাল পা ফেলেফেলে শহরের ভগ্নাংশে ফিরে এল। সেখান থেকে আরও কিছু অসমান পথ পার হয়ে বাংলোর সীমানায় পৌঁছে গেল। বাংলোর সীমানায় এসে বংশীলাল ফিরে গেল, উধাও হল অন্ধকারে।

বাংলোর বারান্দায় উঠে দেখল, ঘরের দরজা খোলা। এখানে চোরটের নেই। বংশীলালের বউ নেই, এতক্ষণ থাকবার কথা নয়। রান্নাঘরের সব কাজ সেরে চলে গেছে।

বিছানায় আজ রাত্রের মত মরে আছে উৎপল। জানলা দিয়ে কোথা থেকে যেন ঈষৎ কৃপণ আলো আসছে। বিছানার ললিতার অংশে ছায়া পড়েছে উৎপলের শরীরের। জানলার ওপাশে খানিকটা দূরে একখানা ছোটঘর আছে। একটি বন্দুকধারী পাহারাদার থাকে সেই ঘরে। সেই ঘরের সামনে এই ক্ষুদে শহরের বিশুদ্ধ জলের ট্যাংক্। লোকটি জলের ট্যাংক্ পাহারা দেয়। হয়ত তার ঘর থেকে জানলা দিয়ে একটু কৃপণ আলো আসছে।

ললিতা সন্তর্পণে বিছানার নিজের অংশে শুয়ে পড়ল। শুয়েই মনে হল, পিঠের তলায় ঘাড়ের কাছে কী যেন বিঁধছে। পিঠের তলায় হাত বাড়িয়ে বিছানা থেকে কয়েকটা পাথরের টুকরো তুলে আনল। চোখের সামনে ধরে সব কিছু বড় রহস্যজনক মনে হল। বিছানা থেকে উঠে দ্রুত অথচ নিঃশব্দে জানলার পাশে একটু বেশি আলোয় চলে এল ললিতা। চোখের সামনে হাত মেলে ধরল। তিনচারটে কঠিন মসৃণ রক্তরঙ পাথরের টুকরো। প্রত্যেকটি পাথরে যেন মৃগনাভির গন্ধ মেশান এক-একটি পাত্র স্বর্ণাভ পানীয় জমে আছে। স্বর্ণাভ পানীয় জমে গিয়ে এখন রক্তরঙ। এক মুহূর্তের জন্যে মনে হল, সেই রক্তরঙ যেন হঠাৎ চিৎকার করে উঠল।

আবার নিজের বিছানায় ফিরে এসে পাথরগুলো মেঝেয় গড়িয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল ললিতা। ভয় হচ্ছিল সহজে ঘুম আসবে না। ঘুম এল, কিছুক্ষণ পরে গভীর ঘুম এল।

সারা রাত নিখাদ ঘুমে ডুবে থেকে সকালবেলা উৎপল আর ললিতা সব গুছিয়ে নিয়ে মোটরে উঠল। সামনের আসনে পাশাপাশি বসল দুজন। স্টার্ট দিয়ে যন্ত্রের একটানা গর্জনে স্বাস্থ্যের উল্লাস শুনল। বাংলোর ঢাল বেয়ে নেমে এসে নদীর পাড় বরাবর রাস্তায় ডাইনে মোড় নিল। কুয়াশা নেই, বৃষ্টির বিন্দু নেই, অন্ধকারের বিন্দুমাত্র গ্লানি নেই কোথাও, সকালবেলার প্রথম রুদ্দুরে দুজনের মুখ হাসিহাসি।

ফেনশুভ্র দুরন্ত নদীটার ওপর আর একটা সেতু। ইস্পাতের দড়ির ঝুলন্ত সেতু নয়, লোহা আর কংক্রিটের। সেই সেতুটা পার হতে হল। সেতু পার হয়েই সামনে সিংটাম বাজার। বাজারের রাস্তায় পেঁছিলে পাহারাদার খবর দিল, গ্যাংটকের পথে ধ্বস নেমেছে, ব্ল্যাস্টিং হচ্ছে, এখন ওদিকে গাড়ি যাবে না, এখানে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে।

এক পাশে গাড়ি রেখে উৎপল আর ললিতা নামল। যেন পৃথিবীতে যত পণ্য আছে সব এই রাস্তার দুপাশে মাটিতে চটের ওপর সাজান। নানা বিচিত্র সবজি, ফুলের গাছ, ফল; চাল, ডাল, নুন, লঙ্কা, আলু, পেঁয়াজ, মাছ; পরিচ্ছদ, কাচের চুড়ি, নানারঙের খেলনা, খইনির তামাকপাতা। চালের স্তূপের দিকে তাকালে হঠাৎ চাল বলে মনে হয় না। অস্বাভাবিক মোটা আর লাল। এই চাল এরা খায়, ভাবলে যেন কেমন লাগে। এখানে বড় ভিড়। রাস্তা দিয়ে হাঁটাই মুশকিল।

এই সব পসরার পাশ কাটিয়ে একটু এগোলে কয়েকটা চায়ের দোকান। উৎপল বলল, এস, আবার একটু চা খাই।

ললিতারও তাই ইচ্ছে। দোকানটার বারান্দায় দু'খানা বেঞ্চ পাতা আছে। ভিড় কম। বসার জায়গা মিলল, কিন্তু প্রচুর শুভেচ্ছা সত্ত্বেও, চায়ে এক চুমুক দিয়েই ললিতা হেসে বলল, অসম্ভব। ভয়ঙ্কর মিষ্টি।

চায়ের দোকানের বারান্দা থেকে নেমে এসে চারটে আপেল কিনল উৎপল। আবার গাড়িতে ফিরে এসে বসল। ললিতা জানে যে উৎপল জানে, উৎপল জানে যে ললিতা জানে। অথচ আপেলে দাঁত বসিয়ে দুজনে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে ছেলেমানুষি খুশীতে মধুর মধুর করে হাসল।

পাহারাদার খবর দিল, রাস্তা সাফ, যেতে পারেন।

নিখাদ গর্জনে স্বাস্থ্যের উল্লাস শুনিয়ে উৎপল আর ললিতার মোটর আরও উত্তরে চলে গেল। এক রাশ ধুলো উড়ে এল অস্বাভাবিক মোটা আর লাল চালের স্তূপে, খইনির তামাকপাতায়।

আধুনিক সাহিত্য

সাম্প্রতিক বাংলা কথাসাহিত্যে কমলকুমার মজুমদার একটি বহুবিতর্কিত নাম। তাঁর "অন্তর্জলী যাত্রা" উপন্যাস (১৩৬৯) ও "নিম অন্নপূর্ণা" গল্পসংগ্রহ (১৩৭০) নিয়ে তর্ক-বিতর্ক ও মতানৈক্যের ধূলিজাল সৃষ্টি হয়েছে। সমালোচক মহলেও দ্বিধার অন্ত নেই—কেউ কেউ লেখকের চিন্তার অভিনবত্বে ও রচনারীতির মৌলিকতায় হতচকিত, বিস্মিত, আবার কেউ কেউ একে 'একটা নূতন কিছু করা'-র উৎকট প্রচেষ্টার বেশি কিছু ভাবতে পারেন নি। পাঠকসাধারণ ও সমালোচকদের এই দ্বিধাগ্রস্ত মনোভাব কমলকুমারের রচনার প্রতি কৌতূহলী করে তুলেছে। নির্জলা প্রশংসা বা অবিমিশ্র নিন্দা—দুই-ই সত্যোদ্ঘাটনে অপরাগ, কারণ বিশ্লেষণের অনাসক্ত বস্তুধর্ম সেখানে স্বভাবতই দুর্বল ও পক্ষপাতদুষ্ট।

"নিম অন্নপূর্ণা" বইখানি নিয়ে আমরা আলোচনা করব। এই বইতে চারটি গল্প স্থান পেয়েছে : 'নিম অন্নপূর্ণা,' 'ফৌজ-ই-বন্দুক,' 'তাহাদের কথা' ও 'মতিলাল পাদরী'। প্রথম গল্প 'নিম অন্নপূর্ণা' একটি নির্মম-করুণ কাহিনী। ব্রজ ও প্রীতিলতার দুঃখের সংসার। সহর কলকাতার ভূগর্ভ-অন্ধকারের কাহিনী। ব্রজর ক্ষয়রোগ ধরেছে, প্রতিদিন অল্প অল্প জ্বর হয়। রোগগ্রস্ত স্বামী ও দুই মেয়ে যূথী-লতিকে নিয়ে প্রীতিলতার দারিদ্র্যক্লিষ্ট সংসার। আকাশে বোমারু বিমানের মর্মভেদী শব্দ, নীচে দুর্ভিক্ষের কলকাতা। কাহিনীর এই অংশটুকুর কোনো অভিনবত্ব নেই, গল্পটির আসল রহস্য নিহিত আছে শেষাংশে, প্রীতিলতার নিম-অন্নপূর্ণা হয়ে ওঠার আকস্মিক দুর্ঘটনার মধ্যে। অশীতিপর বৃদ্ধকে হত্যা করে তার বস্তা করায়ত্ত করে প্রীতিলতা অন্নপূর্ণা হয়েছে—বহুদিন পরে স্বামী ও মেয়েদের গরম ভাত বেড়ে দিচ্ছে। এ কাহিনী যেমন নির্মম তেমনি করুণ। 'নিম অন্নপূর্ণা' নামকরণে যেন এক বজ্রদীপ্ত আয়রনি সচকিত হয়ে উঠেছে।

'ফৌজ-ই-বন্দুক' গল্পটি একটি তরুণ সৈনিকের স্মৃতি-চিন্তা কল্পনা-সংবেদনের উপর ভিত্তি করে রচিত। যুদ্ধক্ষেত্রের বীভৎস পরিবেশ; বিধ্বস্ত ও ভগ্নপ্রায় একটি বাড়ির ভিতরে তরুণ সৈনিক করতার সিং প্রবেশ করেছিল। সেখানে সে এক অপূর্ব রমণীমূর্তি দেখে অভিভূত হয়েছিল : 'মেয়েটি তখনও জড় শ্বেতসুন্দর চাদরের উপরে মার্বেলের মহিমার মধ্যে স্থির; চক্ষুদ্বয়, করতারের হাড়ের সঙ্গে মাংসের বন্ধন ছিন্ন যদিও করেনি তবুও তাকে বোকা সচকিত করেছিল, মোমবাতি জ্বালার অর্থ এই যে মৃত্যুকে পথ দেখিয়ে আনা।' করতারের মোহগ্রস্ত মনের বিচিত্র ছায়াছবি গল্পটির একটি বিস্তৃত অংশ অধিকার করেছে। এই মোহগ্রস্ত তরুণ ফৌজ লড়াইয়ের আওয়াজ ও কামানের গর্জনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চীৎকার করে উঠেছিল, 'আই ল্যভ ইউ।' মেয়েটিকে সে আর দেখতে পায় নি। দ্বিতীয়বার খুঁজতে গিয়ে—

'এ ঘর সেই ঘর, দাঁতে দাঁতে তার রাগ শাণিত হয়ে উঠছিল। বদরাগী নাম নম্বর-ওয়ালা ফৌজকে সে আর ধরে রাখতে পারল না। হাতের বন্দুক উঠে এল, খুট করে শব্দ হল, এবং দেওয়ালে মেয়েটির আলেখ্য ঝাঁঝরা হয়ে গেল।'

'গুলির শব্দ যেমত শোনা গিয়েছিল তেমনই এও সত্য যে 'আই ল্যভ ইউ' কথায়,

দিক সকল, যুদ্ধক্ষেত্র, এই প্রথম মুখরিত হয়ে উঠেছিল।'—এ উপসংহার তীক্ষ্ম ও ধারালো।

'তাহাদের কথা' একটি বিচিত্র পারিবারিক জীবনের কাহিনী। শিবনাথ পাগল, লোকে তার পিছনে লাগে। তাই তার ছেলে জ্যোতি সব সময়েই তাকে চোখে চোখে রাখতে চায়। মেয়ে অন্নপূর্ণা চাকরি করতে যায় বাপের বয়সী এক লম্পট ডেপুটির বাড়ি। শেষ পর্যন্ত শিবনাথের হাতে তার স্ত্রী-পুত্রকন্যা শিকল পরিয়ে দিতে বাধ্য হয়। সমস্ত পরিবারের করুণ অসহায়তা গল্পটির শেষে মূর্ত হয়ে উঠেছে। লোহের শৈত্য নিজের গালে অনুভব করে যখন শিবনাথ বলে, 'খুব ঠান্ডা রে খুব ঠান্ডা।'—তখন যথার্থই মর্ম স্পর্শ করে।

গল্পচতুষ্টয়ের সর্বশেষ গল্প 'মতিলাল পাদরী' একটু স্বতন্ত্র আস্বাদনের, কিন্তু বলিষ্ঠতায় ও বক্তব্যের দূরস্পর্শিতায় পূর্ববর্তী গল্প তিনটিকে অতিক্রম করেছে। বৃদ্ধ মতিলাল পাদরীর আর কিছু প্রার্থনা ছিল না, তিনি শুধু চেয়েছিলেন, 'পূর্ণাঙ্গ ক্রিশ্চান' হতে। আষাঢ় মাসের মেঘদুর্যোগময় রাত্রিতে কুকুরের চীৎকারে সন্দিগ্ধ হয়ে পাদরী দেখেন এক আসন্নপ্রসবা সাঁওতাল মেয়ে, তার কণ্ঠে আর্তধ্বনি। যথাসময়ে মেয়েটি একটি সুন্দর ছেলে প্রসব করল। বৃদ্ধ পাদরী ভক্তিভরে বাইবেল পড়লেন, তাঁর ধারণা হল যীশুই বোধ হয় ঝড়জলের রাত্রিতে ভূমিষ্ঠ হলেন। তাই পরমানন্দে তিনি বলে উঠলেন, 'আজ এক সোনার মানুষ জন্মাইছেরে।' কিন্তু শিশুর মাকে নিয়ে নানাগুঞ্জন উঠল, পাদরীর সামনে মুখ ফুটে কেউ কিছু বলে না। মাঝে মাঝে শিশুর মাতা ভামরের আচরণে হৃদয়াবেগ ও চিত্তচাঞ্চল্য প্রকাশ পায়। সরলহৃদয় পাদরীর কাছে তা নূতন তাৎপর্য মণ্ডিত হয় : 'মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বৃদ্ধ বললেন, 'প্রভুকে ধন্যবাদ তুমি নবজীবন পেয়েছ মা। একে দেখ' বলে শিশুপুত্রকে দেখালেন।'

এ পর্যন্ত গল্পটি চলেছে সরলরেখায়। এক নির্মম ও প্রবল ধাক্কায় গল্পটির গতিপথ বক্ররেখায় আবর্তিত হয়েছে। ফাল্গুনের মদির রাত্রি তখন মহুয়ার গন্ধে প্রমত্ত। ভ্রাম্যমান পাদরীর সামনে মহুয়াকুঞ্জের মধ্যে চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হল সম্ভোগক্লান্ত মদিরামত্ত ভামরের নির্লজ্জ বিবসন দেহ। সেই মুহূর্তে আদর্শবাদী পাদরীর সমস্ত স্বপ্ন ধূলিসাৎ হল। তাঁর অন্তর্দ্বন্দ্ব ও বিচিত্র বেদনাকে লেখক বলিষ্ঠ চিত্রকল্পের আগ্নেয় স্বাক্ষরে রূপ দিয়েছেন :

'এখন গির্জার মাঠে। মনে হল একবার প্রার্থনা করতে, কিন্তু দেহের অন্তরে যে মন, সে ত নিশ্চয়ই, এমন যে অস্থিনিচয় তাও চূর্ণীকৃত। যে মতিলাল পাদরী এক পলকের জন্য পরম পিতাকে ভুলে যায়, তাহলে তার আর অস্তিত্ব রইল কোথায়? ঘোড়ার ছুটন্ত পা তাঁর মধ্যে ঢুকে পড়েছে, এখন বুক নেই, হৃদয় কোথায়? আত্মা সে ত বাইবেলের একটি লাইন মাত্র, বিধর্মীরা যার কাগজ পুড়িয়ে ছেলের দুধ গরম করে।'

'কোথাকার একটি পাশবিক জঙ্গল চলতে চলতে এসে তাঁর মধ্যে আশ্রয় নিয়েছে। ক্লান্তি তাঁর নেই, আজকের পৃথিবী সেটুকু অপহরণ করেছে, দূরের পাপিয়ার ডাক তাঁকে ফেরাতে পারেনি যেখানে সৃষ্টির শেষ মাধুর্য ছিল। অকারণে নিজের মনে হল, আমার ভক্তি ছিল না, ছিল ভীরুতা।'

'স্ফীত নাসাপুট, উষ্ণনিশ্বাস, কুঞ্চিত চোখ আর ভয়ঙ্কর দাঁত যখন লাগাম ধরে তখন তারা আর এক কথা ভাবায়, আর এক পথ দেখায়। শুধু মনে হল 'আমি ঠকেছি' আর একবার মহুয়া কুঞ্জের সেই উদ্ভিন্ন যৌবনা দেহটির কথা মনে পড়ে, আর তিনি পাগল

হয়ে যান।' (পৃ ৯৮—৯৯)

শিশুটিকে কোলে নিয়ে তিনি নির্জন অরণ্যে চলে যান, পাদরী সত্তাকে ভুলতে চান। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উন্মত্ত পাশববৃত্তি পরাজিত হয়, মতিলাল স্বক্ষেত্রে ফিরে আসেন; আর ছেলেটির মুখখানি হাঁটুতে 'বুলাতে বুলাতে চোখের জলে ধোয়াতে ধোয়াতে' বলেন, 'আমি সত্যই ক্রিশ্চান নাই গো বাপ।' একটি মানুষের বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রণার কাহিনীকে উদ্‌ঘাটন করে লেখক একটি বলিষ্ঠ পরিণতির ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এই হল কমলকুমার মজুমদারের গল্পগুলির একটি দিক, যেদিক তাঁর স্বাভাবিকতা ও শক্তির দিক। ছোটগল্প সম্পর্কে যাঁরা দ্রুতলয়ের কাহিনী প্রত্যাশা করেন, তাঁরা নিঃসন্দেহে গল্পগুলি পড়ে হতাশ হবেন। গল্পগুলির পদক্ষেপ অতিমন্থর। 'নিম অন্নপূর্ণা' গল্পটিতে এই মন্থরতা কোথায়ও কোথায়ও পীড়াদায়ক। গল্পটির প্রথমেই যূথী, পাখী ও খেতুরমা-র প্রসঙ্গ অনাবশ্যকভাবে দীর্ঘ ও গ্রন্থীবহুল। যে কোনো খুঁটিনাটি বর্ণনাই লেখকের প্রিয়। লেখক উদ্দেশ্যহীন রেখাঙ্কনে এখানে মেতে উঠেছেন, এর চূড়ান্ত পরিণতির দিকে তিনি লক্ষ্যহীন। অথচ এই রীতি 'ফৌজ-ই-বন্দুক' গল্পে বেমানান হয়নি, কারণ এই কাহিনীর শিল্পরীতিই মন্থর বিবৃতির। অনাবশ্যক খুঁটিনাটি বর্ণনা ও কাহিনীর কোনো একটি অংশের প্রতি অতিনিবদ্ধতা অনেক সময় গল্পগুলিকে দুর্বল করেছে।

গল্পগুলিকে একটানা পড়ে যাওয়া সম্ভব নয়, সহজ আস্বাদন এখানে ঘটে না। কারণ পদে পদে হোঁচট খেতে হয়, থামতে হয়, খানিকটা পড়ে আবার তা গোড়া থেকে পড়তে হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির শিখাকে সতর্কভাবে জেবলে রাখতে হয়। সহজ রস-সম্ভোগের এই অন্তরায় পাঠকচিত্তকে পীড়িত করে। এর প্রধান কারণ হল ভাষা ও পদবিন্যাসের অস্বাভাবিকতা। ভাষা ও পদবিন্যাসের কসরৎ বুঝতেই যদি পাঠক গলদ্‌ঘর্ম হয়ে ওঠে, তা হলে গল্পরসের আস্বাদন করবে কখন? 'আপনার' না লিখে 'আপনকার' লেখার কোনো সার্থকতা আছে কি? 'এমত', 'যেমত', 'করত' অজস্র ধারায় বর্ষিত হয়েছে। নূতন শব্দ তৈরি করতে গিয়ে উৎকট মৌলিকতার পরিচয় দিয়েছেন লেখক।

গল্পগুলি সাবলীল নয়, জোর করে টেনে নিয়ে যেতে হয়। পদবিন্যাস জটিল, ঘোরালো; ফলে বক্তব্য যথেষ্ট স্পষ্ট নয়, ঝাপসা। কমলকুমার মজুমদারের গদ্যরীতির সবচেয়ে কাছাকাছি বোধহয় সুধীন্দ্রনাথ দত্তের গদ্য। তবে দুয়ের মধ্যে পার্থক্যও কম নয়। সুধীন্দ্রনাথের গদ্যেও পদবিন্যাসগত কৌটিল্য স্বপ্রকাশ। তবে তাঁর গদ্যে তৎসম শব্দের প্রাচুর্য লক্ষণীয়। কমলকুমার মজুমদারের ভাষা নানা ভাষার মিশ্রণে তৈরি—সংস্কৃত ও চলতি একাসনে বসতে আপত্তি করে না। বক্তব্যের মধ্যে আবেগ নেই, নিরুত্তাপ বিবৃতিকে ঘোরালো রেখায় আঁকার জন্য একটি শব্দ বা একটি বাক্যাংশকে কমা দিয়ে নানাভাবে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। তাছাড়া দ্বৈতপ্রয়োগের অজস্রতায় গল্পগুলি পরিকীর্ণ। যেমন : 'এইটুকু ভদ্রগোছের পাশবিকতা এর মধ্যে ছিল বলেই, তৎকালেই, **সে, করতার** আকাশে তারা আছে কিনা দেখতে চেয়েছিল। 'সে' এবং 'করতার' একই কথা। এই জাতীয় প্রয়োগ গল্পের প্রবাহকে ক্ষুন্ন করেছে।

কমলকুমার মজুমদারের এই রীতি এখনো পরীক্ষার পর্যায় অতিক্রম করতে পারেনি। কারণ তাঁর বাচনভঙ্গি ও ভাষাবিন্যাস চেষ্টাকৃত, কৃত্রিমতা ধরা পড়ে। মনে হয় জোর করে এই উদ্ভট ভঙ্গী ও ভাষা তিনি চালাবার চেষ্টা করেছেন। এ ভাষা এখনো

স্টাইলে পরিণত হয়নি। অথচ লেখক যে শক্তিহীন একথা বলা যায় না, গল্প লিখতেও তিনি জানেন। কিন্তু বহিরঙ্গকে মাত্রাতিরিক্ত রূপে মৌলিক করতে গিয়ে, সেইদিকে বেশি জোর দিয়ে গল্পকেও মাঝে মাঝে দুর্বল করে ফেলেন। যেখানে বহিরঙ্গের অত্যাচার অপেক্ষাকৃত কম, সেখানে গল্পাংশ অনেকখানি রাহুমুক্ত, যেমন 'মতিলাল পাদরী' গল্পটি। কমলকুমার মজুমদার নূতন ধরনে গল্প লিখেছেন, কিন্তু এই পদ্ধতির মধ্যে এর আত্ম-ক্ষয়কারী অপচয়ের বীজও নিহিত আছে। এতবড় দায়িত্ব নিয়ে তাঁর পথ আর কেউ অনুসরণ করবেন কি ? *

রথীন্দ্রনাথ রায়

* নিম অন্নপূর্ণা—কমলকুমার মজুমদার। কথাশিল্প প্রকাশ। কলিকাতা ১২। মূল্য সাড়ে তিন টাকা।

সমালোচনা

ক্রীতদাস ক্রীতদাসী—সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়। এসোসিয়েটেড পাবলিশার্স। কলিকাতা ১২। মূল্য ২·৫০।

যে-কোন দেশেই নতুন ধরনের সাহিত্য প্রয়াস যে মানুষ খুব অনায়াসে গ্রহণ করতে পারে তা নয়। আমাদের দেশের পাঠক সমাজের নতুনের প্রতি বিরূপতা আরও বেশী। জীবনের অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, সাহিত্য-রুচিতেও তেমনি অভ্যাস বলে একটা জিনিস আছে। এক ধরনের সাহিত্যের রস গ্রহণে আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেলে সেই ধরনের মধ্যে সামান্য নতুনত্বকে আমরা হয়তো বৈচিত্র্যের মোহে সম্বর্ধনা জানাই; কিন্তু প্রকৃত নতুনের সামনে আমরা থমকে দাঁড়াই। আমরা তাকে উদ্ভট বলে পাশ কাটিয়ে যেতে চাই। একটু চেষ্টা করলে আমরা যে এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রস-জগতের সন্ধান পেতে পারি, সে সম্ভাবনার কথা আমরা ভাবি না।

শুনতে পাচ্ছি আমাদের দেশের যে স্বল্পসংখ্যক তরুণ লেখক পরীক্ষামূলক গল্প উপন্যাস লেখায় ব্রতী হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে অনেককেই পাঠক সমাজের বিরূপতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বুদ্ধিজীবী সমাজকে তাঁরা চমৎকৃত না হোক চমকিত করতে চেয়েছিলেন; কিন্তু বুদ্ধিজীবীরা চমকিত হতে রাজী হননি। রাগে দুঃখে অভিমানে তাঁরা নাকি আবার কম-বেশী প্রচলিত রচনা-রীতির দিকে ফিরে যাচ্ছেন।

এ খবর যদি সত্য হয়, তবে এ জন্য আমি খুব দুঃখিত নই। এ-সব লেখকের মধ্যে খুব সম্ভব এমন কোন প্রকৃত নতুন মানসিক অভিজ্ঞতা বা উপলব্ধি ছিল না যা নতুন কায়দায় ছাড়া প্রকাশ করা যায় না। বিদেশে পুরোনো হয়ে গেছে অথচ এ-দেশে নতুন, এমন কতকগুলো রীতিকে তাঁরা শুধু নতুনত্বের মোহে অনুকরণ করতে চেয়েছিলেন। এ জাতের অনুকার প্রবৃত্তি কখনও সুফল দেয় না।

শ্রীসন্দীপন চট্টোপাধ্যায় পরীক্ষামূলক রচয়িতাদের অন্যতম। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে যে চারটি গল্প স্থানলাভ করেছে, এ ক'টি ছাড়া তাঁর আর কোন রচনা পড়ার সুযোগ আমার হয়নি। নবতর রচনায় পরীক্ষামূলকতার ধারা তিনি ত্যাগ করেছেন কিনা আমি জানি না। তবে এই চারটি গল্প পড়ে মনে হয়েছে নতুন রীতি গ্রহণ করার কিছু অধিকার তাঁর আছে।

আমার আরও মনে হয়েছে যে শ্রীযুক্ত চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে শক্তি এবং সম্ভাবনা আছে। তার মানে এই নয় যে আলোচ্য গল্পগুলো সার্থকতা অর্জন করেছে। কিন্তু এগুলোর মধ্যে নানা অপূর্ণতা লক্ষ্য করলেও আমি অনুভব করেছি লেখকের একটি শিল্পী মন আছে এবং গভীর জীবন-যন্ত্রণা তাঁকে রচনায় প্রবৃত্ত করেছে।

লেখকের লক্ষ্য হচ্ছে মানুষের চেতনা প্রবাহকে গল্পের কাঠামোর মধ্যে উপস্থাপিত করা। চেতনাপ্রবাহকে উপস্থিত করার উপায় হল মানস-কথন বা mental monologue। কাজেই এই গল্পগুলিতে মানস-কথন বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই রীতি বাংলাদেশে মোটেই নতুন নয়। বোধহয় শ্রীবুদ্ধদেব বসু সর্বপ্রথম মানস-কথনকে

প্রধান করে কিছু গল্প ও উপন্যাস লিখেছিলেন। শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্যও এই রীতি অনুসরণ করেছেন; কিন্তু তাঁর মধ্যে সমাজ চেতনা প্রবলতর বলে তিনি একটি স্বতন্ত্র পথ রচনা করেছেন। বুদ্ধদেবের পর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী এবং তারপর সন্দীপনবাবুর মধ্যে একটি বিশিষ্ট ধারার ক্রমবিকাশ দেখতে পাচ্ছি।

বুদ্ধদেব বসুর কবি-প্রকৃতির পক্ষে এই মানস-কথন পন্থার খুব উপযোগিতা ছিল। সেই জন্যই বুদ্ধদেবের মানস-কথনের মধ্যে অনেক ইমেজের খোঁজ পাওয়া যায়। কিন্তু প্রথম যুগে বুদ্ধদেব পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন তাঁর কবিত্বশক্তির জোরে নয়, ভাষার জোরে। এই ভাষা পরিমার্জিত ও পরিশীলিত; যাকে আমরা শহুরে উজ্জ্বলতা ও কৃত্রিমতা (urbanity) বলি, প্রমথ চৌধুরীর পর বুদ্ধদেব বসু ভিন্নভাবে সেই জিনিস আমদানী করেছিলেন বাংলা ভাষায়। এই কাজ করতে গিয়ে তিনি ইংরাজী ভাষার বাক্য গঠন প্রণালীকে, বিশেষ করে Clause এবং phrase-এর ইংরাজী সুলভ ব্যবহারকে বাংলায় অনুসরণ করতে চেষ্টা করেছিলেন। উপন্যাসের মধ্যেও তিনি দীর্ঘ দীর্ঘ বাক্য ব্যবহার করেছেন, এবং তাতে উপন্যাসসুলভ অন্তরঙ্গতা ব্যাহত হয়নি। বুদ্ধদেবের পরে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মধ্যেও ভাষার এই উজ্জ্বলতা ও পরিমার্জনার ছাপ দেখা যায়। কিন্তু জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর মানস-কথনে ইমেজের বদলে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উদ্ঘাটনের চেষ্টা বেশী। অপর পক্ষে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায়কে আমার কাছে প্রায় বুদ্ধদেবের মন্ত্রশিষ্য বলে মনে হয়েছে। তিনিও ইংরাজী-সুলভ বাক্য-রীতিকে অনেক জায়গায় গ্রহণ করেছেন, অনেক জায়গায় বড় বড় বাক্য ব্যবহার করেছেন। তাঁর মানস-কথনের মধ্যে প্রচুর ইমেজের ব্যবহার রয়েছে, এবং, যা বুদ্ধদেবের মধ্যে বিরল-দৃষ্ট, কিছু কিছু প্রতীক ব্যবহারের চেষ্টাও আছে।

কিন্তু সাহিত্যের ফলশ্রুতির বিচারে সন্দীপন চট্টোপাধ্যায় এখন পর্যন্ত বুদ্ধদেব বা জ্যোতিরিন্দ্রের কাছাকাছিও পেঁৗছুতে পারেননি। অবশ্য আমি আশা করছি তিনি কালক্রমে শৈল্পিক সম্পূর্ণতা অর্জন করতে পারবেন। আপাতত আমার মনে হচ্ছে শৈল্পিক সামগ্রি· কতা বোধ তাঁর মধ্যে এখনও যথেষ্ট বিকাশলাভ করেনি। প্রথম গল্পটি ধরা যাক। গল্পটির নাম 'বিজনের রক্তমাংস'। এই নামকরণের মধ্যে অনেক তাৎপর্য নিহিত আছে। প্রথমতঃ, বিজনের গলা দিয়ে রক্ত উঠছে, সে ক্ষয়রোগী; তার দেহ থেকে ক্রমাগত রক্তমাংস ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে এই অর্থে 'রক্তমাংস' নামকরণ সার্থক। দ্বিতীয়তঃ, বিজনের মধ্যে স্থূলে জৈব কামনা খুব প্রবল; এই অর্থেও 'রক্তমাংস' নামকরণ উপযোগী। তৃতীয়তঃ, বিজন যে রক্তমাংসের দুর্গে, অর্থাৎ জৈবধর্মবিশিষ্ট শরীরের দুর্গে বন্দী এই বোধে সে পীড়িত; এখানেও আমরা 'রক্তমাংস' নামের সার্থকতা দেখতে পাচ্ছি। কাজেই লেখকের মধ্যে যে ব্যঞ্জনাধর্মিতা আছে, তাঁর দৃষ্টি যে যথেষ্ট গভীরে প্রসারিত তার পরিচয় এই নামকরণের মধ্যে আছে। গল্পটির মধ্যে কতকগুলো উপমার ব্যবহার খুবই সুন্দর; যেমন : 'বৃষ্টি থেমে গেছে, শোকের মত ফোঁটা ফোঁটা এখন পড়ছে', 'লম্বা লম্বা মাথা-ভাঙ্গা-কানের ভেতর থেকে ঝুলে রয়েছে কয়েকগাছি চুল, যেন দুটো জামরুল গোঁজা দু'কানে'।

একটি রোগগ্রস্ত মনের মানস-যন্ত্রণাকে চিত্রিত করাই এই গল্পের লক্ষ্য। মানস-কথনের মধ্যে এই মানস-যন্ত্রণাটিকে লেখক অত্যন্ত ব্যঞ্জনাধর্মী এমনকি সঙ্কেতময়ী ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এখানে লেখকের ক্ষমতাকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। নায়ক রোগগ্রস্ত; সে মানে যে আধুনিক চিকিৎসার দ্বারা সে সেরে উঠতেও পারে। কিন্তু

'আমি যদি বেঁচে উঠি অর্ধজীবিত হয়ে বেঁচে থাকতে চাই না, এর চেয়ে মেরুদণ্ডহীন হলেও কেঁচোর সম্পূর্ণ জীবন আমার কাম্য'। কাজেই নায়ক জীবনের এক সুস্থ স্বাভাবিক পরিপূর্ণতা কামনা করেছিল, কিন্তু তা থেকে সে চিরকালের জন্য বঞ্চিত হতে চলেছে! অথচ এ জন্য কাকে সে দোষ দেবে? সে কি নিজেই ক্ষয়িষ্ণুতার পথে গা ভাসিয়ে দিয়ে এই পরিণতিকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলে নি? লেখক বলেছেন, 'নইলে কীসের ভুলে, কার ওপর অভিমানে, কাপের পর কাপ চা খেয়ে, সারা রাত ধরে মদ খেয়ে, একটা সিগারেটের পর আর একটা সিগারেট ধরিয়ে নিয়ে, স্বাস্থ্য খরচ করে করে—হ্যাঁ, অসুখটা সে নিজেই ডেকে এনেছে।' ব্যাধির অনিবার্যতার চেতনা থাকলে সে হয়তো এত অনিয়ম করত না। ব্যাধির চেতনা সুস্থতাকে মূল্যবান করে, যেমন মৃত্যুর চেতনা জীবনকে মূল্যবান করে। নায়ক ভাবছে: এই-সব লোক এরা প্রত্যেকে বীজের মত এক একটি মৃত্যু নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এরা প্রত্যেকটি লোক আলাদা, কারণ এদের প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে তার নিজস্ব এবং আলাদা আলাদা মৃত্যু।'

এইভাবে রোগজীর্ণ যন্ত্রণাকাতর ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতার চিত্রণে লেখক যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। নায়কের মনের বিভিন্ন সংগত উপাদানকে লেখক উপস্থিত করতে পেরেছেন, তার সম্পূর্ণ জীবনের আকাঙ্ক্ষা, আর সেই সঙ্গে নিজেকে ক্ষয় করে ফেলার প্রবণতা; তার অসুস্থ যৌন কামনা আর সেই সঙ্গে নীতিবোধ; তার যন্ত্রণাবোধ আর সেই সঙ্গে অপরাধ চেতনা। এক কথায় আধুনিক হতাশাগ্রস্ত ক্ষয়িষ্ণু মানসিকতার এক চমৎকার চিত্র এই নায়কটির মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। তথাপি গল্পটি কয়েকটি বিচ্ছিন্ন চিত্রের সমষ্টিমাত্র হয়ে উঠেছে। বাড়িতে, আপিসে, গণিকালয়ে, নৈশ-স্বপ্নে, নায়কের কতকগুলি বিচ্ছিন্ন চিত্র আমরা পাচ্ছি। এগুলোকে গ্রথিত করে লেখক কোন সামগ্রিক অনুভূতি সৃষ্টি করতে পারেন নি।

লেখকের পরবর্তী দুটি গল্প, 'দশ বছর পরে একদিন' এবং 'মীরাবাঈ', গল্প হিসাবে অধিকতর সার্থক। কিন্তু গল্পগুলি মোটামুটি প্রচলিত প্রাকৃতবাদী ধারায় লিখিত। শেষের গল্পটির নামে বইটির নামকরণ করা হয়েছে বলে মনে হয় এই গল্পটির মধ্যে লেখকের অনেক উচ্চাশা লুক্কায়িত আছে। প্রাকৃতবাদী কাঠামোর মধ্যে আত্মকথনকে প্রাধান্য দিয়ে লেখা এই গল্পটি একটি রোমাণ্টিক প্রেমের গল্প। গল্পটির মধ্যে লেখক ভঙ্গীগত চাতুর্যের সাহায্য নিয়েছেন; এবং তা কাজে লাগানোর জন্য উপযুক্ত ভাষার জোর লেখকের আছে। গল্পটির শেষে লেখক একটু তাৎপর্যহীন হেঁয়ালী সৃষ্টি করেছেন। হঠাৎ কেন পুলিস এল, হঠাৎ কেন নায়িকা বলল, 'তুমি আমাকে বিধবা করেছ'? চাতুর্য দিয়ে যে নিছক কৌতুকের চেয়ে বেশী কিছু সৃষ্টি করা যায় না এ গল্পটি পড়ে বোঝা গেল।

বস্তুতঃ এই বইয়ের প্রথম গল্পটি সার্থক গল্প না হলেও সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ গল্প। লেখক সম্পর্কে যে আমি আশান্বিত বোধ করেছি তা প্রধানতঃ এই প্রথম গল্পটির জন্যই। লেখকের ভাষার জোর আছে, অনুভূতির তীব্রতা ও সূক্ষ্মতা আছে। কিন্তু যে যন্ত্রণাবোধের ভিতর থেকে তিনি লিখেছেন, সেই যন্ত্রণাকে দূর থেকে দেখার শিল্পী-সুলভ অভ্যাস এখনও তাঁর অনায়ত্ত। তরুণ লেখক অদূর ভবিষ্যতে সে অভ্যাস আয়ত্ত করতে পারবেন বলে বিশ্বাস করি।

অচ্যুত গোস্বামী

জলভ্রমি—সতীনাথ ভাদুড়ী। বাক্ সাহিত্য। কলিকাতা ৯। মূল্য তিন টাকা।

বাংলা কথাসাহিত্যের দুটি শাখায়—উপন্যাসে ও ছোটগল্পে সতীনাথ ভাদুড়ী চিহ্নিত স্বাতন্ত্র্যে নিজের প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন। তাঁর "জাগরী" ও "ঢোঁড়াই চরিত মানস" উপন্যাস দু'খানির ভিন্ন বক্তব্য। রীতিও পৃথক। সেখানে তাঁর লেখনীর সব্যসাচীসুলভ দক্ষতার পরিচয়ে আমরা মুগ্ধ হয়েছিলাম। তাঁর গল্প আমি বেশি পড়িনি। তবে অনেক-দিন আগে লেখা 'আন্তর্জাতিক' গল্পে তাঁর পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক ও সামাজিক চেতনার সঙ্গে লক্ষ্য করেছিলাম গল্প গড়বার নিখুঁত কৌশল। মেদহীন সুঠাম দেহের মত তাঁর ঐ গল্প। তাঁর প্রগতিশীল চিন্তার সঙ্গে মিলেছিল ভারত-নেপাল সীমান্তের মাটি ও মানুষের চমৎকার ছবি। গল্পটি যেখানে বেদনার্ত রঙে শেষ হল সে তার সার্থক সূর্যাস্ত। সতীনাথ ভাদুড়ীর লেখায় মাত্রাবোধ বিঘ্নিত হতে বড়ো দেখা যায়নি।

আর কুশী নদীর বন্যার পটভূমিকায় লেখা আরেকটি গল্পে সতীনাথবাবুর পূর্ণিয়া অঞ্চলের ব্রাহ্মণ, ভুঁইহার, অচ্ছুৎ প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি-বর্ণের সামাজিক 'সংস্কার' ও তার প্রতিক্রিয়ার বাস্তব-চিত্র ফুটেছিল। বন্যার প্রকোপ বহু ধন-জনের সঙ্গে ভাসিয়ে নিয়ে গিয়েছিল বিভিন্ন জাতি-বর্ণের মধ্যেকার স্পৃশ্য-অস্পৃশ্য 'সংস্কারে'র পাঁচিলকে, কিন্তু বন্যার জলে যেই টান ধরল, ডাঙ্গা উঠল জেগে, অমনি ভাঁটা পড়ল ঈষৎ আগের উদার মনো-ভাবে, সহবেদনায়, মাথা তুলল পুরোণো 'সংস্কার', বর্ণবৈষম্য, বড়ো ছোটর মারামারি। প্রথম গল্পটিতে বাস্তবতার সঙ্গে আবেগ ছিল, শেষেরটিতে সমাজ-বিজ্ঞানীর তীক্ষ্ন নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে।

যে দুটি গল্পের কথা উল্লেখ করলাম একদিক থেকে তারা 'আঞ্চলিক' এবং সতীনাথ-ভাদুড়ী যিনি যোগাবানী-কাটিহার অঞ্চলের মানুষ তাঁর কাছে নেপাল সীমান্ত বা কুশী-নদীর বন্যা অত্যন্ত বেশি চেনা জানা। যেমন তারাশঙ্কর জানেন দামোদর বা ময়ুরাক্ষীর বানকে, রাঢ়ের বিভিন্ন অঞ্চলকে, আউরি, বাউরি, সাঁওতালকে।

"জলভ্রমি"তে নানা ধরনের গল্প আছে। যে সব ঘটনা একান্তই সাময়িক, কিছুটা বিদ্রূপধর্মী, তাকে নিয়ে লেখা 'চরণদাস এম. এল. এ' গল্পটি নিতান্তই কাঁচা লেখা। বোধ-করি কোনো পূজাসংখ্যার পাতা ভরাতে লেখা। ততোধিক বাজে লেখা শেষ গল্প 'হিসাব-নিকাশ'। রাজশেখর বনফুল বা বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের রচনার ধারে কাছে আসবার যোগ্যতা নেই এসব গল্পের। 'মহিলা-ইন-চার্জ' গল্পও বনফুলকেই স্মরণ করায়। এগুলির মধ্যে সতীনাথবাবুর শক্তির চেয়ে অক্ষমতার প্রকাশই বেশি। 'দাম্পত্যসীমান্তে' গল্পটিতে কোনো মুন্সিয়ানা নেই; ভাববার ভাবাবার কিছু নেই। গল্পের শেষদিকে যে নাটকীয়তা রচিত হয়েছে তার অনিবার্যতা নেই। অথবা 'দুই অপরাধী' গল্পে ড্রাইভার ও অমলেশ কেন কোথায় অপরাধী তার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট নয়। গল্প লেখা হয় পাঠকের জন্য, সেই পাঠক যাতে ইঙ্গিতটি ধরতে পারে সেইদিকেই গল্প রচয়িতার দৃষ্টি থাকবে। এখানে তার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়।

বরং প্রশংসা করতে পারি 'কৃষ্ণকলি' গল্পটিকে। বাবা ও মেয়ে দুজনেই দুজনের দুটি প্রচ্ছন্ন দুর্বলতাকে লুকিয়ে রাখতে চাইছেন। বাবা চেয়েছেন তাঁরই ছদ্মনামে লেখা 'কুরূপা মেয়ে ও সমাজ' বইখানির সমালোচনা যেন তাঁর অবিবাহিতা মা-হারা কুরূপা মেয়ের নজরে না পড়ে। আর মেয়ে চেয়েছে একদা যার সঙ্গে তার বিবাহ স্থির হয়েও ভেঙ্গে গিয়েছিল

সেই ছেলেটির কৃতী জীবনের পরিচয় ও তার ফটো বাবা যেন না দেখতে পান। কিন্তু গল্পটির শেষে বাবা যেন ধরা পড়ে গেলেন। সূক্ষ্ম অথচ সহজ মনোবিশ্লেষণে গল্পটি দাঁড়িয়ে গেছে। 'জলভ্রমি' গল্পটিতে ছেলে রহিমের বিবির ব্যবহারে বিরক্ত ও চরিত্রে সন্দিগ্ধ শীর্ষাবাদিয়াদের বুড়ো হাসানু বানের জল ঠেলে যখন পুত্রবধূর গলায় হেঁসো বসাতে স্থির সংকল্প তখনই সে আবিষ্কার করল তার ছেলে রহিম আর ছেলের বউ ভেলায় করে গরু-মহিষের খাদ্য ভুট্টাগাছের বোঝা এনে জমা করে রাখছে। কাজেই নিজের 'কৈফিয়ৎ' খুঁজবার জন্য হেঁসো দিয়ে কাটল লুঙ্গির কোণা, পীরের ভিটার গাছের ডালে মানত করে বেঁধে দিতে বলল ন্যাকড়ার সেই ফালিটা। এই anti climaxএ গল্প শেষ কিন্তু তাতেই গল্পটি উপভোগ্য।

এই বইয়ের সবচেয়ে ভালো গল্প 'স্বর্গের স্বাদ'। বৈদিক যুগের যজ্ঞের পটভূমিকায় নতুন সোমকথা রচনা করেছেন শ্রীযুক্ত ভাদুড়ী। দরিদ্র, চর্মদুষ্টা, স্বামীপরিত্যক্তা অপালার জীবনে সোমপায়ী ইন্দ্রের সহসা আবির্ভাব ও দেহ সম্ভোগ মর্ত্যের মাটিতে যেন অমর্ত্য-সুধা বহন করে নিয়ে এলেন। 'স্বর্গের পরশ পাওয়া মর্ত্যটুকুও অপালার কাছে স্বর্গই'। ইন্দ্রের বরে দারিদ্র্য গেল, দেহত্বক পরিশুদ্ধ হল। কিন্তু ইন্দ্র-স্পর্শ সারা দেহে মনে যে অমৃতের স্বাদ রচনা করে দিল তারজন্যই এতদিন চাতকের মত উন্মুখ হয়ে ছিল নারীসত্তা। গল্পটির পরিবেশ রচনা ও ব্যঞ্জনা সৃষ্টি উভয়ই সার্থক। দুঃখের কথা লেখকের এই গল্প-গুলিতে যুগ বা জীবনের গূঢ়রহস্য বা গভীরতার কোনো স্পর্শ নেই। অথবা হাস্যের সঙ্গে অশ্রুর আভাস মিলে যে উচ্চাঙ্গের 'হিউমার' গড়ে ওঠে তারও দেখা কিছু মিলল না।

দেবীপদ ভট্টাচার্য

আলোর বৃত্তে—সমরেশ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ। কলিকাতা, ১২। মূল্য তিনটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

বাংলা সাহিত্যের সেই ফসলের কাল আজ সম্ভবত আমাদের অজেয় বিস্ময়। সেই সার্থকতার ঐতিহ্যের দিকে আজ আমরা শুধু পিছন ফিরে তাকাচ্ছি। কিন্তু কিছুকাল আগে পর্যন্ত আমাদের মনে এই ব্যার্থতাবোধ শিকড় মেলতে পারেনি। কারণ সংখ্যায় অল্প হলেও, বেশ কয়েকজন লেখক, তাঁদের ক্ষমতা ও শিল্পবোধের পরিচয় দিয়েছিলেন। জীবনের বিভিন্ন স্তরে তাঁদের আনাগোনা। ফলে অভিজ্ঞতা দিয়ে সময়কে তারা চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যেই আরো দু একজন এমনও ছিলেন, যাঁদের গতিপথ জীবনের একটি বিশেষ লক্ষ্যে ধাবিত। তাঁদের দিকে সকলে উদগ্রীব হয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেছিলেন। সমরেশ বসু এমনই একজন লেখক।

তেমন লেখক খুবই অল্প, যাঁদের স্বীকৃতি বহু গ্রন্থ প্রকাশের অপেক্ষা রাখেনি। সমরেশ বসু অবশ্যই সেই সৌভাগ্যে প্রতিষ্ঠিত। তাঁর প্রথম উপন্যাস, এক বিচিত্র আব-হাওয়ার স্মৃতি। আর সেই অসাধারণ আস্বাদ, পাঠকমন থেকে অবসিত হবার আগেই তিনি আরো অনেক বিচিত্রতর গল্প ও উপন্যাস আমাদের উপহার দিয়েছেন। তাঁর লেখায়, সব সময়েই এক আপাত অজানা জগতের সন্ধান পাওয়া গেছে। অথচ এই জগতের মানুষ

আমাদেরই প্রতিবেশী।

বিষয় বস্তুর বিভিন্নতা, অভিনব সব চরিত্রের সংস্থাপনা, সহজেই সমরেশ বসুর প্রতি আমাদের আকৃষ্ট করল। কিন্তু কিছুকালের মধ্যেই, তাঁর লেখা আর তেমন ভাবে আমাদের আকর্ষণ করতে পারল না। মনের ওপর কোথায় যেন এক অতৃপ্তির ছায়া পড়ত। যে জীবনকে নিয়ে তিনি প্রথম লেখার আসরে অবতীর্ণ হলেন, সে জীবনের মূল্যহীন আশ্রয় তাঁকে গভীরভাবে আচ্ছন্ন করেছিল। সেই আবেশের ফলেই তাঁর লেখায় একটি দার্শনিক ভিত্তি তৈরী হল না। জীবনবোধের কোনো সংজ্ঞা নির্ণয় করা সম্ভব হল না। যদিও, প্রবক্তার ভূমিকা তিনি গ্রহণ করুন, এ আমরা চাইনি। তবু মনে মনে প্রার্থনা করেছিলাম, তাঁর বক্তব্যের কোনো বিন্দু নির্ভরতা। যা দিয়ে তাঁর রচনার বিশেষ ভঙ্গী, পাত্র পাত্রী নির্বাচনের সহজ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সম্ভব। আর সেই সঙ্গে আমরা আশা করেছিলাম, তাঁর লেখা, অন্তত এতদিনের অনুশীলনে পরিচ্ছন্ন হবে। লেখার আঙ্গিক বিশেষ কারু-কর্মের উদাহরণ হবে। বিষয়ের অভিনবত্বই নয়, প্রকাশের মাধ্যমকেও তিনি বিশেষ অর্থে প্রতিষ্ঠিত করবেন।

দুর্ভাগ্যবশত সমরেশ বসুর একান্ত গুণগ্রাহীও স্বীকার করবেন, আলোচ্য গ্রন্থে সে প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। শুধু তাই নয়, মনে হওয়া স্বাভাবিক, তাঁর সেই প্রাথমিক প্রতিশ্রুতি পালনেও আজ যেন তিনি অনিচ্ছুক। তাঁর আগের লেখার সেই স্বচ্ছন্দ প্রবাহ, চরিত্রগুলির সঙ্গে সেই ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তাবোধ এবং সেই আন্তরীকতার সুরও আজ অবসিত। এ কারণেই, তাঁর সাম্প্রতিক গল্প গ্রন্থ, "আলোর বৃত্তে," নানা ভাবে হতাশার কারণ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এই গ্রন্থে সংযোজিত শেষ গল্পটির নাম অনুসারেই গ্রন্থের নামাকরণ।

যে কোনো গল্প সংকলনের ক্ষেত্রে লেখকের অনেকগুলি দায়িত্ব আছে। গল্প-সংগ্রহ যে ক্ষেত্রে কয়েকটি গল্পের সমষ্টিমাত্র, সে ক্ষেত্রে অবশ্যই মনে হবে, তা কোনো ব্যবসায়ী বুদ্ধি প্ররোচিত। গল্প-সংগ্রহের মোটামুটি দুটি স্বীকৃত ভিত্তির একটি হল, চিহ্নিত সময় এবং অন্যটি বিষয়ের অন্বয়। কিন্তু সমরেশ বসু এর কিছুই অনুসরণ করেন নি। গ্রন্থে সন্নিবেশিত ছটি গল্প, ছটি ভিন্ন বিষয়বস্তু নির্ভর। আর যতদূর মনে হয়, তা লেখকের মানসিকতার বিশেষ কোনো কাল আশ্রয়ী নয়। লেখকের ব্রাত্যের অধিকার অবশ্যই আছে। অবশ্যই তিনি নিয়মভঙ্গ করতে পারেন। সেক্ষেত্রে এই নিয়ম বিমুখতা কোনো যুক্তি অথবা নীতি নির্ভর হওয়া উচিত। তাই এমন অবস্থায় প্রয়োজন একটি মুখবন্ধের।

"আলোর বৃত্তে" সন্নিবেশিত গল্পগুলি পড়ে মনে হয়, লেখক যেন হৃত বৈশিষ্ট্য। বিদুল্লতা, আলোয় ফেরা অথবা মাঝখানে—মনে হয় গল্প লেখার সমস্ত নীতিকে পরিহার করেছে। সন্দেহ হয়, তাঁর গতি বুঝি আজ স্তব্ধ। এবার তিনি পেছনের দিকে তাকিয়ে। হয়ত তাঁর সাম্প্রতিক পদচারণা সেই পথেই।

গল্প চরিত্রের প্রোফাইল। আর সে জন্যই তা পোর্ট্রেট পরিপন্থী। সেখানে মুখের প্রতিটি রেখার চিত্রায়নের চেষ্টা গল্প লেখকের বিরুদ্ধেই যাবে। বিশেষ করে আলোয় ঘেরা গল্পটি পৌনপুনিকতার এক উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। আজকের দিনে গল্প স্কেচেরই সঙ্গে তুলনীয়।

অবশ্যই এক দিক থেকে সমরেশ বসুর এই গ্রন্থটি বিশিষ্ট। তাঁর নির্বাচিত চরিত্রগুলি, অধিকাংশ গ্রন্থে, আমাদের অচেনা। এক বিচিত্র পরিবেশে তিনি আমাদের

মুগ্ধ যাত্রার পরিচালক। তাঁর চরিত্রগুলি সব সময়েই বিচিত্র পরিবেশের পরিপূরক। তাই মনে হত, জীবন সম্পর্কে তাঁর বোধ নানাশ্রয়ী নয়। কিন্তু আলোচ্য গল্পগুলি তাঁর অভ্যস্ত বক্তব্যের ব্যতিক্রম। সেই বিচারে গ্রন্থটি পাঠকমনে আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারে।

অনেক বিচ্যুতি, অনেক অমনোযোগ এবং শৈথিল্য সত্ত্বেও, পাঠক শেষ গল্পটি পড়ে হয়ত আশান্বিত হবেন। আলোর বৃত্তে গল্পটি অনেক স্থানে, আবার পুরণো সমরেশ বসুকে মনে করিয়ে দেয়। একমাত্র এই গল্পেই যেন, তিনি গল্পের রীতি কিছুটা অনুসরণ করেছেন।

নৃপেন্দ্র সান্যাল

অধ্যাপকের স্ত্রী—অশোক রুদ্র। ন্যাশ্যানাল পাবলিশার্স। কলিকাতা ১২। মূল্য দুই টাকা।

কয়েক বছর আগে শ্রীযুক্ত শম্ভু মিত্রের প্রযোজনায় 'বহুরূপী' সম্প্রদায় ইবসেনের "ডল্‌স্‌ হাউস"-এর এক বাংলা প্রতিরূপ, "পুতুল খেলা", পরিবেশন করেছিলেন। "পুতুলখেলা" অত্যন্ত সু-অভিনীত হয়েছিল, এতটা যে ঘটনার প্রবাহ-শীর্ষারোহণ-পরিণতি অনেকের কাছেই অবৈকল্য-অটুট বলে ঠেকেছিল : নাটকটি যে অনুবাদ, যে বাঙালি আবেগালেখ্য চোখের সামনে উন্মোচিত হচ্ছে, তা যে ভুঁয়ো, সত্তর-আশি বছর আগেকার স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সমাজকে নকল করে বানানো, তা উপস্থিত মুহূর্তে অনেকের কাছেই মনে হয়নি।

কিন্তু অশোক রুদ্রের হয়েছে। চিন্তাবিদ, এবং সেই সঙ্গে ধ্রুপদী-অর্থে তার্কিক হিসেবে শ্রীযুক্ত রুদ্রের খ্যাতি যথেষ্ট; যে-যে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি "পুতুলখেলা" দেখতে গিয়েছিলেন, তাঁদের মুখে সে-সন্ধ্যায় তাঁর উত্তেজিত প্রতিবাদের বর্ণনা ইতিপূর্বে পেয়েছিলাম। "অধ্যাপকের স্ত্রী" পাঠান্তে সে-বর্ণনার মধ্য দিয়ে পুনর্বার স্মৃতিচারণ করা গেলো।

তর্কের মূল সূত্রটি প্রমাণ করার জন্যই শ্রীযুক্ত রুদ্রের নাটক মক্সো করা। "পুতুল-খেলা" দেখে তাঁর মনে হয়েছিল, 'পরিণতিটি বর্তমান বাংলা সমাজের উপযোগী হয়নি'। নোরা-র কায়দায় বাঙালি বৌ স্বামী-সংসার পরিত্যাগ করে পৃথিবীর ঘোর-লাগা পথে অম্লান বিক্ষেপে বেরিয়ে যাবে, শ্রীযুক্ত রুদ্র তা আদৌ মানতে রাজি নন; আমার সন্দেহ বাংলা সমাজের প্রতিক্রিয়াজরাজীর্ণ অবস্থা সম্পর্কে তাঁর মনে কোনোরকম আশারই দ্যোতনা নেই। বাইরের নীলিমার হাতছানি যদিও "অধ্যাপকের স্ত্রী"-র নায়িকা নীরাকে গোড়ার দিকে উদ্বেল-উতরোল করে তুললো, শ্রীযুক্ত রুদ্র নির্মম কলম চালিয়ে শেষ পর্যন্ত সে-বিপ্লবঅস্থিরতাকে নির্বাপিত করে দিয়েছেন। শেষ দৃশ্যে আমরা তাই দেখতে পাচ্ছি নীরা অনুরাগী প্রেমিককে বিদায় করে দিলো, এবং অধ্যাপক স্বামী কমলের পায়ের কাছে বসে সাশ্রুনেত্রে নিজের দাসী-ত্ব স্বীকার করলো, এমনকি বলা চলে, সোচ্চার দীনতার সঙ্গে হাওয়ায়-হাওয়ায় জ্ঞাপন করলো।

অশোকবাবুই হয়তো ঠিক, কিংবা হয়তো তিনি নন। এ-বিষয়ে খুব প্রত্যয়ের সঙ্গে কোনো-কিছু বলা মুস্কিল। বাংলা সমাজ নিটোল-নিভাঁজ-নির্দ্বন্দ্ব কোনো অবয়ব নয়, তার মধ্যে অনেক স্তরভেদ আছে : তাপসবাবু-শ্যামলবাবুদের সমাজে যা সাধারণত ঘটে থাকে না, পার্থপ্রতিম-উন্মথশীলদের আলাদা সমাজেও যে তা ঘটবে না তা কেমন করে বলি?

তাছাড়া, পরিসংখ্যান-বিজ্ঞানে অত সুপণ্ডিত হয়েও মনে হয় অশোকবাবু আপেক্ষিকতাবাদ একপাশে আপাতত সরিয়ে রেখেছেন, কারণ সত্তর-আশি বছর আগে নরওয়ে-সুইডেনে যেমনটি হতো, সে রকম ঘটনা এই তিন পুরুষ বাদে বাংলা দেশে সংঘটিত হয়তো হলেও হতে পারে।

কিন্তু আমার প্রধান আপত্তি তা নিয়ে নয়। আমার প্রধান সন্দেহ "অধ্যাপকের স্ত্রী" আদৌ নাটক হয়েছে কিনা। কথোপকথনের প্রবাহ আমার কাছে খুব অবাংলা-অবাংলা ঠেকলো : কী জানি, লেখক হয়তো বলবেন বাংলা সমাজে এমনধারা কথাবার্তাই আজকাল হয়ে থাকে। তাহলেও বলবো, ভাষা নিখুঁত হলেও নাটকীয় লক্ষণগুলি কোথায় : কাহিনী অত্যন্ত ঢিলে তালে এগিয়েছে, যে-প্রসঙ্গটির ভূমিতে দাঁড়িয়ে ঘাত-প্রতিঘাতের বিস্তার, তা-ও কেমন নিরুত্তেজ, উত্থান-অবরোহণ যেন নেই-ই, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সানু-নাসিকতা। অবশ্য চোখের সামনে হতে না-দেখলে নাটকীয় সমস্ত গুণগুলি প্রতীয়মান হয়না, কিন্তু এক্ষেত্রে সন্দেহ হচ্ছে দেখলে পরেও আমার আপত্তি বাড়তো বই কমতো না।

শ্রীযুক্ত রুদ্রকে সসংকোচে বলছি, 'বহুরূপী'-কৃত নাটকটি "পুতুলখেলা", "পুতুল-নাচ" নয়।

অশোক মিত্র
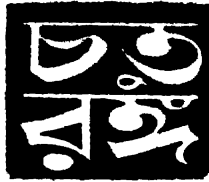
অনেক রাত

মণীশ ঘটক

অনেক রাত।
ভিজে এলোচুলে চোখমুখ ঢাকা
অকস্মাৎ,
কে এসে বাড়ালো শীতল হাত,
তুহিন শীতল হিমেল হাত।
খোলা জানালায় উত্তর বায়
ঘরে ঠেলে দিলো আঁধার রাত।
মেঘে আধো ঢাকা ম্লান চাঁদ বাঁকা
বোবা ইসারায় জানাতে চায়
যাবি ত আয়,
মেঘের ওপারে আরেক আকাশ যেখানে অযুত তারার সাথ,
চোখে চোখে আর কানে কানে কথা সারাটি রাত!
যেতে যদি হয়
ওরে নির্ভয়
কসে' ধর ওই বাড়ানো হাত,
থাক পিছে পড়ে' এক ঘর ভরা অনেক অনেক অনেক রাত॥

বিচিত্র সংসার

অমিয় চক্রবর্তী

(বিদেশী)

"যেখানে ছিলেনা কখনো
সেই ঘরে
দিনে দিনে ক্ষুধার অক্ষরে
মানে নেই কোনো
চেয়েছি তোমাকে বুকে ভ'রে।
কত বছরের পরে এসে
দেয়ালের ডোরা-নক্সা ফুল-নীল
পুরোনো সুবাস-শিশি রকে
একার সে ঘরে পাই শূন্যে মিল;
আল্‌মারিতে কিছু অন্য বই,
কিছু স'রে-যাওয়া আর ঠিক একই মেশে
চেনার পলকে।
হঠাৎ চেয়ারে ব'সে তবু তৃপ্তি পাই—
এই চিঠি রেখে যাই।"

(বিদেশিনী)

"ও ঘরে যাইনি আমি, দূরত্বের
স্রোত আর সময়ের খেয়াপার
হল সে চক্ষের জলে, এ মন-শরীর
তোমারি আপন ছিল, আছে,—দৃষ্টি-ঘের
পায়নি প্রত্যেক দিন রান্না-ঘরে, টেবিলে তোমার
পাশে এসে বই-পড়া, দূরে চাওয়া স্থির
সান্নিধ্যের, তবু জপে জেনেছি সংসার।
তুমি চ'লে গেছ আজ পেয়েছি তোমার শেষ লেখা,
যে-ঘরে কেউই নেই তার বন্ধে দুজনের দেখা॥"

(প্রতিবেশী)

একক পাহাড়-তলি, রঙা শূন্যে মেঘে গাঁথা,
দুপুর নিবিড়,
পাড়ার শিশুর ভিড়
আইস্‌-ক্রীম্‌ গাড়ি ঘিরে খুসি হাত-পাতা,
হাওয়ায় পিয়ানো ধ্বনি, ফুলের আবির :
এই পরিবেশ ছিল সেদিনেও বসন্ত বেলার—
যে-ঘরে মেলেনি ওরা, তারি ঐ দেখ খোলা দ্বার॥

বিফল নায়ক

প্রেমেন্দ্র মিত্র

অন্ধকারে ডুব দিয়ে নিরাময় হয় হয়ত কেউ
কেউ চায় শুধু স্বচ্ছ আলো দিয়ে হৃদয় ধোয়াতে।
আছে এক মূঢ়মতি আলোঅন্ধকারে ভেদাভেদ
বোঝে না যে, সাধেনা'ক জীবনের নির্যাস চোয়াতে।

একদিন সেও বুঝি হ'তে চেয়ে মামুলী নায়ক
পরিপাটী গেঁথেছিল সুখ দুঃখ উৎকণ্ঠা হতাশা,
সাজিয়েছিল আখ্যায়িকা শাদা কালো নক্সাকাটা ছকে,
পঞ্জিকা নির্ভুল জেনে লগ্ন ধরে' মেটাতে পিপাসা।

তারপর সেজেগুজে ভূমিকায় নেমে এসে দেখে
গল্প সব ধুয়ে মুছে বয়ে যায় কৌতুকে সময়,
দিগ্বিদিক অনিশ্চিত, চিহ্ন সব অস্থির বিভ্রম,
ব্যাপ্তি বিন্দু সমার্থক, এক-ই সুরা সংশয় বিস্ময়।

বৈদেহী

বিষ্ণু দে

আমার প্রদীপহীন নিত্যসন্ধ্যা তোমার তুলসীমঞ্চে নত,
হে বৈদেহী, অয়ি পতিব্রতা!
অশোককাননে নই রক্তময় ফুলখেলা-রত,
তোমার গন্ডীতে জানি অবান্তর আমি আর আমার তীব্রতা।

আমার আকাঙ্ক্ষা তাই তোমাকেই বন্দনায় ঘিরে,
তুমি পুণ্যভূমি দ্বীপ আমার সমুদ্রে,
সুন্দরী অপাপবিদ্ধা! শুধু হৃদয়ের বালুতীরে
জলে জলে ঢেউ তুলি দিনে, রাত্রে মেঘে আর রৌদ্রে॥

পৌষের কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

বৃক্ষে চেয়ে থাকি—
প্রথম প্রাণের দিকে, পৌষের সকালে :
চোখ হয়ে যায় বুঝি পাখী
বসে ডালে, নিতে যেন আলোর মতন
স্তব্ধতার বেগ।
মাটি তাকে ভালোবাসে, ভালোবাসে মেঘ,
ফাল্গুন যৌবন দেয় ফিরে-ফিরে ডালে
সহজ, পুষ্পিত, অযতন।

শেষ-প্রাণ কী বঞ্চিত আমি!
একবার পৌষ এলে নেই আর আরম্ভ আগামী,
নেই প্রীতি কোনো চৈতী রাতে।
তোমাকে রাখব কোন্ মাটির শয্যাতে,
কোন্ বা মেঘের ধারা-স্নানে?
কোন্ ফুল ফুটবে বা তোমার বাগানে!

কাল

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

অপব্যায়ী কাল যবে ক্রমাগত তর্ক জোড়ে
অবনতি নিয়ে; দিনকে প্রণতি জানিয়ে
ময়ূরের মতো সূর্য নৃত্য সাঙ্গ করে
পাড়ি দেয় নতুন আসরে; তখন একাকী মন
কেরানীর ক্লান্ত পায়ে ইতস্তত ঘুরে
স্বাদহীন স্বেদবহু সত্তাটুকু টেনে-টেনে নিয়ে
নিজের খুপরির দিকে যায়।
অন্য দিকে প্রবল বন্যায় প্রাণ তার টুকরো-টুকরো।
কানে তালা, তবু যেন প্রলয়ের ঝড়ের কণিকা
আভাসে সঙ্কেত জানায়।
একবার ভাবে আমি অবিস্মরণীয়
আবার হোঁচট খেয়ে দু'টো পা-ই ভেঙে
নির্বিকল্প আকাশকে দেখে।

সেখানে কার সে চোখ কোমল-মিনতি-ভরা?
অভিসার-উৎকণ্ঠা চাঞ্চল্যে
আবেশে রভসে স্নান করে
বারবার ওড়না-খসা কোন সে অপ্সরা?

বসন্ত-সংবাদ

হরপ্রসাদ মিত্র

সময় সমুদ্র নয়,—মনে হচ্ছে ছায়ার শিবির!
যেন কোনো আবরণ, অবরুদ্ধ ইন্দ্রিয়ের বেড়া,
চারদিকে নিস্তব্ধ রাত্রি অন্ধকার, ঠাণ্ডা হিমহিম,
কিছুই যাচ্ছে না দেখা দু'একটি জোনাকিও নয়,
শুধুই অস্তিত্বমেঘ দৃষ্টিহীন, দর্শকবিহীন।

একান্তে গা-ঘেঁষে বসে পোষা রোগা কুকুর সঙ্গীকে
বলি—'তুই প্রভুভক্ত,—আমি প্রভু,—তোর কুঁই-কুঁই—
শুনছি তোর অসন্তোষ, প্রতিবাদ, বিরক্তি এবং
মনে মনে কে না জানে এ-সকলি কুকুরের ঢং!
সহ্য করে টিঁকে থেকে দেখেই যা এই অন্ধকার।'

'অংশত উটপাখি আমি',—সে বল্‌লে কথার উত্তরে—
'কখনো লুকোই সত্যি ভয়ে, ঘুমে, জড়তায় ঝুঁকে;
কিন্তু সে তো রোজ নয়,—গন্ধ পাই বারুদে, বন্দুকে-
দুর্জনের হিংস্র হাত রক্ত খোঁজে শান্তির জঙ্গলে;
তখন আমার মধ্যে জ্বলে ওঠে সিংহের যন্ত্রণা
অংশত সিংহও আমি, শান্তি নয় আমার সান্ত্বনা।'

সিংহের বিক্রমে আর উটপাখির সারল্য-সংঘাতে
জর্জর কুকুর কাঁদে,—এ-খবর বসন্ত-সংবাদে
থাক্, লেখা থাক্, থাক্। নিতান্তই ব্যক্তিগত বটে।
বাইরে বসন্ত এলো, শিমুলে কাঞ্চনে তা তো রটে।

বর

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

কৃপণ দেবতা,
দিলে যদি কেন দিলে আধখানা বর
এত জ্বালা এত দুঃখ প্রকাশের
ক্ষীণ কণ্ঠস্বর।

অফুরন্ত দিয়েছ পিপাসা
দিলে কেন বিন্দু বিন্দু জল
সম্রাটের স্বপ্ন দিলে চোখে
ঘরে ক্ষুদ কুঁড়োর সম্বল।

কৃপণ দেবতা,
কিংবা কৃপণ নও
তুমিও আমারই মত
অসহায় অথচ দুর্বল
তুমিও আমারই মত
আত্মশূলে নিয়ত বিক্ষত
দ্বিধাজীর্ণ, পীড়িত জর্জর
তোমারও ধ্যানের যোগাসন
স্খলিত কম্পিত টলোমল
সহস্র সুখের বাসনায়
যে সুখ মুহূর্তপরে
অকিঞ্চিৎকর।
দুর্বল দেবতা
তাই দিবা দৈব বাণী
রুগ্ন, ক্ষীণ, আর্ত কণ্ঠস্বর?

বিজয়া দশমী

সুশীল রায়

ভাগ্যের বিড়ম্বনা নিয়ে দৃষ্টি মেলি নভ-সীমান্ত অবধি
খুঁজি প্রতিপদের চন্দ্রিমা—
সোনালি বঙ্কিম সূক্ষ্ম সামান্য রেখার সূত্র যদি
উপহার দেয় চোখে উদার নীলিমা।
আশ্চর্য চন্দ্রের খোঁজে তারারাও হয়ে আসে অচিরে নিষ্প্রভ,
গভীর গহ্বর মাত্র হয় মহাশূন্য—নীল নভ।
সুতরাং সুতরাং সুতরাং, বন্ধু, সুতরাং
যেটুকু আলোর আশা ছিল ভাগ্যে, তাও হারালাম।
আকাশ হয়েছে তাই অন্ধকার—নীল, শুধু নীল—
একাকার হয়ে মুছে গেছে সব আলোর মিছিল।
দুঃখকে দৈবাৎ পাই, পেয়েছি হঠাৎ যদি তাকে
বিপুল ইচ্ছার সঙ্গে বাঁধি তাকে শক্ত সাত-পাকে।
কিন্তু দুঃখময় সেই রাত্রিটার ক্লান্ত অবসানে
দ্বিতীয়ার চন্দ্র আসে, অদ্বিতীয় সুখ সঙ্গে আনে।
আকাশে আশ্চর্য চিহ্ন এঁকে
মুক্তির আস্বাদ দেয় যাবতীয় যন্ত্রণার থেকে।
আমাকে দিয়েছে মুক্তি, করেছে অসীম সুখে সুখী
ওই বিধুমুখী।

রাত্রি কাটে একে-একে, কলায়-কলায় বাড়ে শশী,
নিবিড় নেপথ্যে সাঙ্গ ক'রে সাজসজ্জা প্রসাধন-পটিয়সী
চন্দন-বর্ণের অঙ্গবাস প'রে প্রকাশ্যে বাহির
হয় দীপ্ত সুবর্ণশরীর।
কলায় কলায় শেষে যৌবনের মূর্ত চতুর্দশী
ষোলোকলা পূর্ণ ক'রে হয়ে ওঠে নিটোল ষোড়শী।
এত যদি জানা, তবে অযথা কেন এ-অন্বেষণ
কেন সে সোনালি সূত্র খুঁজে মিথ্যা রাত্রি-জাগরণ?
ক্রমে-ক্রমে সপ্তমী ও অষ্টমী নবমী আসে নভে
ভুবন আলোকময় হয়ে ওঠে আকুল গৌরবে।—
জীবনে পার্বণ আসে, ষোড়শোপচারে পূজার্চনা
করার আকাঙ্ক্ষা জাগে, পাই তার প্রবল প্রেরণা।
ইচ্ছা হয়, ওই আলোকের হ্রদে করি অবগাহন, এবং
আহরণ করে আনি জ্যোৎস্নার মতন স্বচ্ছ রং

চন্দ্রের অঙ্গের থেকে কেড়ে নিয়ে সমস্ত মহিমা
গড়ে তুলি ধীরে-ধীরে মনোমত মঙ্গল-প্রতিমা।
কিন্তু মাটি গলে যায়, হায় হায়, অকাল বন্যায়
চোখের কলঙ্ক তার সব রং ধুয়ে-মুছে দেয়।
বিসর্জনের বাজনা বেজে ওঠে সবার প্রথমই
দ্বিতীয় চিন্তার আগে ঘটে তাই বিজয়াদশমী।

আমার প্রধান শত্রু

মণীন্দ্র রায়

আমার প্রধান শত্রু গল্পে পড়া সেই অপরাধী,
খুনের অত্যন্ত কাছে দুঃসাহসী যার আনাগোনা;
তদন্তের সব সূত্রে যতো তাকে বেড়াজালে বাঁধি
তবুও সে নিরাপদ; বর্ম তার লোক-হিতৈষণা।
আশ্চর্য ছলনা বটে! কী নিপুণ সেই কারিগরী,
চারিধারে ধ্বংস তবু স্নায়ু তার আপাত-নির্ভীক।
জীবনে ডাকিনী যতো সবই যেন প্রেমিকা অপ্সরী:
স্বপ্নের হরিৎ শিল্পে ভ'রে দিতে চায় দশদিক।

অথচ নির্মম কাল আবাল্যের সঞ্চিত পসরা
প্রক্ষিপ্ত ঘোষণা করে। ব্যর্থ হয় সকল প্রস্তুতি।
আমার নিহিত শত্রু মহত্ত্বের সে তুচ্ছ মহড়া—
প্রাণান্তক প্রয়োজনে কোনো কাজে লাগে না যে-পুঁথি।
ফলে আজো অর্ধ পশু অর্ধেক দেবতা এ হৃদয়
খোঁজে মানুষেরই ভাষা : পতনের উত্থিত বিস্ময়॥

মর্সিয়ার পর

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

রাস্তায় লাইনবন্দী শোক
রাস্তায় লাইনবন্দী শোক

যেন ফুরোতে চায় না

আগে আগে
আগে আগে
মুখ নিচু ক'রে আছে
দুলদুল

পিঠে সওয়ার নেই
পিঠে সওয়ার নেই

পেছনে থেমে থেমে
থেমে থেমে
মহরমের বাজনা

হায় হাসান হায় হোসেন
হায় হাসান হায় হোসেন ব'লে
বুক বাজাতে বাজাতে চলেছে আমার ভাই

আর আমি
ঠা ঠা রোদ্দুরে দাঁড়িয়ে দেখছি

মাটির ফুটো সরা থেকে
ফোঁটা ফোঁটা
জলে

নিষ্পত্র মরা ডালে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে
চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে--

নতুন জীবনের
বীজমন্ত্র ॥

শেষ খুঁটিগুলো

অরুণকুমার সরকার

শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত ক'রে ধরে রাখতে চাই।
একে একে বাড়ি ঘর ভেসে গেল প্রবল জোয়ারে
ভাই গেল বন্ধু গেল পুত্র কন্যা পরিবার তাও
ক্রমেই অদৃশ্য হয়ে বাঁক নিল দূরবর্তী স্রোতে
শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত ক'রে ধরে রাখতে চাই।

শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত ক'রে ধরে রেখে দিয়ে
এ-বিশ্বাস নিয়ে যেন মৃত্যু হয় আমার, ঈশ্বর :
এইখানে একদিন মানুষেরা ঘর বেঁধেছিল
পুত্র কন্যা পরিবার ভাই বোন বন্ধু পরিজন নিয়ে
এইখানে একদিন মানুষেরা ঘর তুলবে এসে
নতুন খড়কুটো নিয়ে পরস্পরকে ভালোবেসে।

শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত ক'রে ধরে রাখতে চাই॥

দিবাস্বপ্ন

অরুণ ভট্টাচার্য

আমি একটা মন্দিরের পাশ দিয়ে হাঁটছিলাম।
প্রকাণ্ড মন্দির দীর্ঘ দরজা নিস্তব্ধ সিঁড়ি অন্ধকারে
বহুদূরে চলে গিয়েছে। কে আমাকে
ভীষণ জোরে বলল, মন্দিরে ঢোকো।
আমি ভয় পেলাম, ভীষণ ভয় যেমন
ছেলেবেলায় পেয়েছি রাতদুপুর একলা ঘরে
দৈত্যদানোর আজগুবি স্বপ্ন দেখে।

আমি মন্দিরের দরজায় ঢুকলাম। একটা দরজার পর
আবার দরজা আবার দরজা আবার
তারপর অন্ধকার সিঁড়ি। উপরে উঠছি উপরে উঠছি উপরে...
ভীষণ ভয় করছে হাত পা কাঁপছে গা গুলোচ্ছে ঝিমঝিম
করছে মাথাটা। আমি আর পারছিনা। আর পারছিনা।

এইবার নামতে হবে। কেননা আর
সিঁড়ি নেই উপরে উঠবার। আবার নামছি নামছি নামছি...
টলতে টলতে নামছি হাত পা কাঁপছে বেহুঁস মাতালের মত,
অন্ধকার, দেখতে পাচ্ছিনা কিছু অস্থির চেতনায়
কাল পরশু তারও পরের দিন পরের দিনের কথা সব
উলটপালট মনে আসছে। মনে হচ্ছে আমি সব
ভবিষ্যতের কথা জানি অতীতের কথা জানি আর
বর্তমানকে নিয়ে রবারের বলের মত খেলা করতে পারি। নামছি পাতালে এবং
এইসব আবোলতাবোল মনে হচ্ছে।

কে আমাকে ভীষণ জোরে আর একবার বললো, এইবার থামো।
আমি আচমকা থামলুম।

সামনে জলধারা বইছে বইছে বইছে

উচ্ছ্বসিত উৎসব থামে না

রাম বসু

চন্দন-কবাট বন্ধ তবু সেই জলের কীর্তন
অঙ্গভারহীন নৃত্যে রূপকার সমুদ্র হয়ত।
অথচ কি আর আছে শরীরের নগ্ন দ্যুতি ছাড়া
যা মৌন গাছের দ্বীপ মূলহীন জলন্ত হলুদে
মেরু পাহাড়ের দিকে তুলে ধরে সর্বস্ব, সংকেত
চিরকাল পৃথিবীর অঙ্গারের সাক্ষী হয়ে রয়
পূর্ণিমা উপছে পড়ে হৃদয়ের চিতা ভস্মাধারে।

প্রেম, মিথ্যার কিন্নরী, আচ্ছাদিত নই আর আমি
কোন ওষ্ঠে, কোন ফুলে মরণের পীত গন্ধ নেই?
নিষ্ঠুরতা, জীবনের স-বর্ণা জননী, দগ্ধ কর
সময় মন্থন করে স্মৃতি তুমি যে শব সাজাও
অপূর্ণ ইচ্ছার কেন্দ্রে তার আর উজ্জীবন নেই
তবু সে বেহালা যেন অন্ধ গুণী বাদকের হাতে
আত্ম-হননের মঞ্চে রাজপুত্র ধ্যানের গৌরবে।

ওগো বহমান ঋতু উচ্ছ্বসিত উৎসব থামে না।
কার কণ্ঠ এত গাঢ় কে জীবন্ত জলের চেয়েও?
ছায়াময় মণি ধৌত শিলাতটে বসো শুভ্রতায়
যে বিচিত্র উচ্চারণ নুন মাটি বিষের অতলে
তাৎপর্য, গোলাপ গুচ্ছ,—সে-ই তুমি স্রষ্টা ও সৃজিত
দু চোখে উৎসব নিয়ে মাথা পাত জলের জটিলে
কারণ কৃপাণ চেনে নিঃস্ব নগ্ন শিল্পীর বয়ান।

হাসপাতাল

বীরেন্দ্রকুমার গুপ্ত

তখন সায়াহ্নকাল। তবু কলকাতার আকাশ
উদ্ভিন্ন—দুসারি আলো দূরে রাখে আবিলতা ভয়।
তবুও নামছে মৃত্যু হাসপাতালে—কঠিন সময়।
তবু কি আশ্চর্য! পাশে দেখি হাসছে ইউক্যালিপ্‌টাস।
সব বিষণ্নতাহীন কখন উজ্জ্বল নীল ঘাস।
ক্লোরোফরমের গন্ধ ঠাণ্ডা ঘর—ছুরি কাঁচি—নানা
শব্দের মূর্ছনা ঠেলে অবশেষে অন্বিষ্ট বিছানা
পেলাম। সদ্যাই ঝরা তনুলতা—ফুলের সুবাস।

নার্সের লজ্জিতকণ্ঠ—সহানুভূতিতে পাঁচজন
সাড়া দিল। অপারেশন টেবিলের বিব্রত ডাক্তার!
আশ্চর্য! মোছেনি কিন্তু মেয়েটির মুখের পাউডার,
সারা চোখেমুখে তার অপার্থিব স্বপ্নের অঞ্জন।

মনে হল : মগ্নঘুমে নিশ্চেতন, তবু কেশপাশ
আশ্চর্য কি শ্রী-তে মাখা! নক্ষত্রখচিত নীলাকাশ॥

ভদ্রলোক

আনন্দ বাগচী

সমস্ত সংসারচিত্র ধরা ছিল অ্যালবামের মত
কত দৃষ্টিকোন্ থেকে ক্ষিপ্রমুষ্ঠি ভ'রে তোলা ছবি,
রূপসাগরের থেকে ডুব দিয়ে তোলা শঙ্খ, কড়ি
অনেক বয়স, মুখ, আলোছায়া অন্ধকার স্মৃতি
চতুর্দিক সুরে তালে বাঁধা এক গৃহস্থালী যেন।
সমস্ত মসৃণ চলছে, নিপাট নিখুঁত ভদ্রলোক,
প্রতিবেশীদের ঈর্ষা, এবং সন্দেহ কৌতূহল
অবিরাম ঘিরে আছে, গল্পাবলী নিত্যপ্রচারিত।

আত্মমগ্ন সুখী লোক, সুগভীর দূরত্বের মত
নির্লিপ্ত নির্জন সন্ধ্যা টিপয়ের সামনে ব'সে কাটে;
সকালে আয়নার সামনে, জানালায়
দাড়ি কামানো সরঞ্জাম
সঙ্গে নিয়ে, আড় চোখে খবর কাগজ পড়া চলে।
কারো সঙ্গে কথা কইতে শোনা যায়নি টেলিফোনে ছাড়া,
নিঃসঙ্গ একাকী শুধু এক ঘরে, কি রহস্য, জোয়ার ভাঁটায়
দিনরাত্রি কেটে যায় শুধু বই প'ড়ে বই পড়ে।
কখনো গভীর রাত্রে আলো জ্বলে দিস্তে দিস্তে কাগজের স্তূপে।
কোন্ উপজীবিকায় বাঁধা, কোন্ স্মৃতিকথা দিয়ে
অজ্ঞাত সংবাদ সব; জনমত অসহিষ্ণু ঘোরে॥

সেই মুখ

সুনীলকুমার নন্দী

মেঘের ভাঁজে ভাঁজে   নীলাভ জলকণা
স্মৃতির চুড়ো বেয়ে   দিলোরে ঝাঁপ দিলো·
পাথুরে পথে পথে   গড়ায় জলরাশি।

গড়ায় জলরেখা   গড়ায় ঢালু খাদে—
এই কি সেই জল   ভাসে কি সেই মুখ
যে এসে ঢেউ দিলে   বক্ষে নটরাজ
দুবাহু মেলে দেয়   চক্ষে টল্‌মল্‌
সবুজ...থই থই   স্বপ্নশস্যে...

হায়রে জলরেখা   কোথায় সেই মুখ!

গুলমার্গ থেকে খেলানমার্গ

শান্তিকুমার ঘোষ

প্রাণের সবুজ প্রাণ মেলে হও উপত্যকা অভিরাম শোভন বিস্তারে
আরোহ কি অবরোহ মঞ্জুল বিস্মিত ছন্দ...
গুল্ম ঘাস বুকের আঁচলে আঁকা ফুলের চুমকি।
প্রথমে বেষ্টনী ঘন সারিবন্ধ হানচীর. সবুজ আঁধার;
স্পর্ধিত শিখর পিছে চাইছে আকাশ ছুঁতে, ছিঁড়তে আড়াল।

তুমি বৃক্ষরেখা পার হ'য়ে এসেছ শিখরে :
এখানে বিরল তৃণ, তুষারের কারুশিল্প—শীতল আভার।
নীলের চাইতে নীল অকৃপণ মুক্ত রুচি আকাশী প্রণয়।

তামাম কাশ্মীর নীচে :
কুয়াশার স্বচ্ছ স্তর অন্তর্বাস ফুঁড়ে জাগে
তরুণ চেনার শ্রেণী, জলের কলকা আঁকা নদীর ঘুরুনি।
এখানে মুকুর দ্যাখে ঝর্ণার অধিষ্ঠ দেবী সেতারবাদিনী,
ওখানে কুসুম গাঁথে নিসর্গসুন্দরী।

লণ্ঠন জ্বেলে

মৃগাঙ্ক রায়

প্রব্রজ্যা নেননি, স্বেচ্ছানির্বাসনে গেলেন ঊনপঞ্চাশে
অর্থাৎ পরিচিত মুখের প্রহার থেকে অপরিচিতে;
চিরকুমার, স্বজনবিরহিত, একা, যেন পৃথিবীতে
শুধু তিনিই আছেন
আর কেউ ছিল না, নেই আকাশ অবধি;
হাহাকার নিয়ে চলে গেলেন ঊনপঞ্চাশে।

তাঁর সেই দৃশ্যের ভিতরে একটি বালককিশোর ছিল;
মধ্যরাতে নক্ষত্রনির্ণয় করেছে দু'জনে, অথবা হলুদ লণ্ঠন জেবলে
মেঘদূত পাঠরত ঘাসের ওপরে; গাছ,
অন্ধকার ডাল মেলে আছে, শৃগাল চীৎকার করে যূথবদ্ধভাবে।
সেই দূর থেকে উঠে এসে বালককিশোর
বহুতর প্রসঙ্গের ভিতরে ও বাহিরে গিয়ে
আপাততঃ প্রাকচল্লিশের লোহিত কুয়াশা পেয়েছে।
সে থাকবে সংসারে ফাটা কাঁচের ওপর, আচ্ছন্ন, বেদহীন;
প্রেম আর স্নেহ এসে নিঃসঙ্গ করে দেবে তাকে।
ফিরবে না, তারা কেউ আর মুখোমুখী হবে না কখনো
যদিও ভাববে প্রতিদিন, লণ্ঠনটা নিভিয়েছিল কি কেউ?

নদীকে

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

আমি কি তোমার মতো হতে পারি পাহাড়িয়া নদী?
আমি কি তোমার মতো পেতে পারি বুকের গভীরে
প্রণয়ী আকাশ গাঢ়? শুনি সিক্ত নীলাভ সমীরে :
'তুমি যে মানুষ, তুমি দোলনা থেকে সমাধি অবধি
অজস্র ইচ্ছার বন্দী, ক্রীতদাস' বলে কল্লোলিনী,
'মারীর মাছির মতো অর্থ নারী কীর্তি ক্ষমতার
কামনায় বিপর্যস্ত প্রতিদিন অস্তিত্ব তোমার,
সত্তার সমস্ত তুমি তাকে দাও যে-প্রেম স্বৈরিণী।'

নদী তুমি বলো বলো কেন আমি মানুষ হলাম?
কে আমায় বেড়ি দিল, কে আমায় জন্মের মৃত্যুর
দাসখতে লিখিয়ে নিল আমার নির্বোধ হাতে নাম?
আমার প্রমায়ু কেন বাঁধা পথ, পথে ধাঁধা সুর?
তোমার মতন আমি বুকে নিয়ে আকাশ অবাধে
বলো কবে নদী হবো, মন আমার কাঁদে আজ কাঁদে॥

শবরী-স্তোত্র

প্রমোদ মুখোপাধ্যায়

'উঁচা উঁচা পাবত তঁহি বসই সবরীবালী'
—শবরপাদ

উঁচু পাহাড়ের উপত্যকার
আড়ালে নীরবে শবরীবালা,
দীঘল-নখর-শোভিত আঙুলে
গাঁথো একমনে গুঞ্জামালা।

চিকণ পাতার মত তাম্রাভ
অধরোষ্ঠের মধু যে খাঁটি,
নীল নবঘন-কান্তি উজাড়
অঙ্গ তোমার শীতলপাটি।

জানু-জঙ্ঘা ও পদ-সুষমার
উপমা না পাই তুলনাহীনে!
ত্রিবলীতটের রোমাবলী, তার
কোমলতা নেই শষ্পে, তৃণে।

শিকারের খোঁজে আমি সারাদিন
তোলপাড় করি অরণ্যানী,
উঁকি দিয়ে যাই, চোখ দিয়ে ছুঁই,
দেখা হয়,—তবু দেখোনা জানি।

মন বিনিময় হলে কোনোদিন
সরস হৃদয়ে জাগলে প্রীতি,
আমিও যে এক শবরকুমার
আশ্লেষে জেনো, সে পরিচিতি।

অতুলন দুটি উরসে আঁকবো
নখর-আঘাতে চন্দ্রলেখা,
যমজ টিলার মাঝে মনে হবে
দ্বিতীয়ার চাঁদ দিয়েছে দেখা।

দুটি রম্ভোরু, মঙ্গল-তরু
বিবাহ-বেদীর তোরণ-দ্বারে,

সংবাহনের আদরে সাজাবো
স্বেদ-বিন্দুর মুক্তাহারে।

রভসে-বিবশ বিহ্বল রাত
নিঃশেষে শেষ হবে না, ওরে!
দুয়ার প্রান্তে থমকে দাঁড়াবে
আরক্ত ঊষা, ক্ষণেকতরে।

ছয়ঋতু-সহচরীরা তোমার
গুঞ্জন করে, শবরীবালা!
আমার ব্যাকুল বাহুদুটি করো
তোমার গলার গুঞ্জামালা।

স্বর্গে গেলাম দর্শক হিসেবে

(দান্তের কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা পূর্বক)

শামসুর রহমান

মোল্লা-পুরুত এখনো রটায়
স্বর্গলোকের বিজ্ঞাপন।
নানা মুনি তার নক্সা আঁকেন,
ব্যাখ্যা করেন বিজ্ঞজন॥

দৈবদয়ায় একদিন ঠিক
পৌঁছে গেলাম স্বর্গলোকে।
স্বর্গতো নয়, আমার শহর
দেখতে পেলাম চর্মচোখে॥

সেখানেও লোক রাস্তা খুঁড়ছে,
মন্ত্রী হচ্ছে, কিনছে নাম।
চৈত্রদুপুর পুড়ছে সেখানে,
গলছে রাতের মধ্য যাম॥

ইলেকট্রিকের হঠাৎ-আলোয়
ঘরের জানলা খুলছে কেউ।
ব্যস্ত মানুষ, মন্থর গাড়ি,
বড়ো রাস্তায় ভিড়ের ঢেউ॥

এয়ারপোর্টে প্লেন নেমে আসে,
ট্রেন চলে যায় শেষ রাত্রে।
সেখানেও দেখি তর্কের থীম
ফকনার কিবা সার্ত্রে॥

বক্তা ছড়ান ধরতাই বুলি,
রাজায়-রাজায় বাঁধে লড়াই।
টগবগ ক'রে ফুটছে নিত্য
জটিল মতামতের কড়াই॥

দোকানে সাজানো বিদেশী কবির
আনকোরা বই দিচ্ছে উঁকি।
ঘটি-বাটি-ভিটে বাঁধা রেখে কেউ

ফটকা বাজারে নিচ্ছে ঝুঁকি॥

ডাক্তার এলে ভিজিট চুকিয়ে
গৃহী মোছে তার চোখের জল!
বাতাসে কাঁপছে মৃদু খড়খড়ি,
রোগীর শিয়রে শুকনো ফল॥

তরুণী টেবিলে খাবার সাজায়,
খবর পড়েন বুড়ো হাকিম।
মুড়মুড়ে দুটি টোস্টের ফাঁকে
নিবিড় হলুদ সোনালি ডিম॥

কফির গন্ধে উন্মন মন,
কাণ্ডিভেরাম কৌচে লোটে।
প্রেমিকের চোখ বালবের মতো
দীপ্ত ভাষায় ঝলসে ওঠে।

রাতের আঁধারে ফুটপাতে আসে
ভিখিরিণী তার নি-ছাদ ঘরে;
ঘাগড়া দুলিয়ে কুষ্ঠরোগীর
ঠোঁট চেপে ধরে কামের জ্বরে!

অক্ষর গুণে পংক্তি মেলায়
রাগী যুবকের দলের চাঁই
ক্ষিপ্রকলায় চিত্র আঁকছে
রঙ ছুঁড়ে দিয়ে যাচ্ছেতাই!

রবিঠাকুরের গান ভেসে আসে,
হেঁটে যায় লোক সুরের টানে।
পিকাসোর ছবি ড্রইংরুমের
দেয়ালকে দেয় অন্য মানে॥

সহমরণ

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

যেন কাল মরে যাবো ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে
গোধূলির দিকে আমি বিদায়ের অস্ত্র তুলে ধরি—
গোধূলি কি ফসলের বিবর্তন? নাকি উল্লুকের
প্রশান্ত নাচের ভঙ্গী? দুঃখ ঝরে রক্তের মতন, ঝরে যায়
কিংবা রক্ত দুঃখের মতন—যেন কাল মরে যাবো
ক্ষণকাল সেই কথা ভেবে আমি গোধূলির কাছে
কালো শিল্প দীক্ষা নিতে আসি—

থামেনা বাতাস, এত দীর্ঘশ্বাস তোমাকে মানায়?
বলো বলো চুপ করে চেয়ে থাকা কবরের পাশে বসা নয়
মূর্খেরা বিশ্রাম করে ইজেরের ইলাস্টিক খুলে
সুখ
ভাঁড়ারে জমানো আছে, যেমন ফুলের কাছে কাঁচাপয়সা
রোজ ঝনঝনায়
আমি তার চেয়ে ঢের দূরে, আমি প্রত্যেক উত্তর
শেখাই প্রেতের কণ্ঠে, প্রত্যেক অনভিপ্রেত মুখ
গোধূলিকে মান্য করে,—মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা দু'একজন
হাসপাতালে মরে
দু'একজন হাসাহাসি করে যায় বিকেল চারটের রেস্তোরাঁয়
অতিশয় তেষ্টা পেলে কোনো কোনো পাখি ডুব দেয়
লবণ সমুদ্রে
এবং ওঠেনা।

কি যেন হয়নি শেষ, ঘুমের আবেশে অন্ধকারে
মনে পড়ে; না মনে পড়ে না, কিংবা মনে-পড়া মনের গহ্বর
নারীর লজ্জার মতো খুলে যায়, সন্তর্পণে নিজেকে ঠকিয়ে
দশদিকে চেয়ে দেখি, যেন কেউ হঠাৎ না দেখে, যেন চোখ
বিদায়ের হেমন্তের অপ্রেমের অসুখের বিস্মৃতির ললাট এড়িয়ে
মহিষ বাহন হয়ে ফিরে আসে, হাসে জ্যোৎস্না ইয়ার্কি মায়ায়—
মন কেন এত খুশী—যেন একই বালিশে দু'জনে মাথা রেখে
আমি ও আমার মৃত্যু শুয়ে আছি, চুপচাপ, শুয়ে আছি, যেন
একই স্বপ্ন দুজনে দেখেছি।—

হলুদবাড়ি

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি, সামান্য তার উঠান
ইঁটের পাঁচিল জাফ্‌রি-কাটা সিঁড়ি
এই সমস্ত—গড়েছে মিস্তিরি।
বাড়ির ওপর তার যে ছিলো কি টান
মুখের মতো রাখতো পরিপাটি
যাতে বিফল বলে না, বিচ্ছিরি
কিংবা শূন্যসম্মেলনের ঘাঁটি।
মাঠের ধারে গড়েছে মিস্তিরি
হলুদবাড়ি, যেখানে মেঘ করে
এবং দোলে জাফ্‌রি-কাটা সিঁড়ি
ভাগ্যবিহীন, তুচ্ছ আড়ম্বরে।
হঠাৎ সেদিন সন্ধ্যাবেলা সড়ক
কাঁপিয়ে গাড়ি দাঁড়ালো দক্ষিণে
দৌড়ে এলো মজা দেখার মড়ক
নিলেন তিনি সকল অর্থে কিনে—
লোকালয়ের বাহির দিয়ে সিঁড়ি
বদল করে দিলো না মিস্তিরি।

তালমাতাল

নিখিলকুমার নন্দী

আমাদের এই ইচ্ছাগুলি
নিতান্ত বুলবুলি হত যদি
নদী আর সমুদ্রের গান শোনাত না...
ফাল্গুনের অবচয়ে তবে
বৈশাখের শ্রাবণের বৈভবে ভৈরবে ফিরে ফিরে
ক্লান্তনীড়ে ক্লান্তিহীন প্রণয়ের কান্না শোনাত না...

আমরা একান্ত-কান্তিময় কান্তিহারা
নিবিষ্ট নিষ্পিষ্টপ্রাণ সনির্বন্ধ কবন্ধ পাহারা সারা পাহাড়ে জঙ্গলে
হতাম, অন্যের মনে মঙ্গলে না হয়ে কোন প্রভাতী প্রপাত।
মুক্ত দ্বারপথে
বসন্ত বর্ষা ও শীতে ধেয়ে যায় গেয়ে যায় জগতে জীবনে যেই বিচিত্রের
লক্ষ প্রয়োজনে তার নাট্য ও নৃত্যের বুকে হত সুখে যবনিকাপাত।

হায় সেই সুখ সেই সুখের কাঙাল
তারা সুখে থাক্ থাক্ রক্ততাল বেজে যাক বসন্তে বসন্তবার্ষিকীতে
তারপর হিম তারা শীতে ও নৈঋতে ঘন মেঘপুঞ্জে সঘন ঘনালে...
তখনো আমরা মনে-মনে
সুদুর্গম বনে বনে পথে পথে সুদূরের ফিরব নির্জন
নিঃসঙ্গ না হয়ে বয়ে সজ্জন বাতাসে ঘাসে আকাশের শান্ত রুদ্র তালে ও মাতালে.

সুদূরে যাবো না

বাসুদেব চট্টোপাধ্যায়

কোনদিন কা'রো হাসি আমার মায়ের মতো মধুর দেখিনি
দেখিনি ফুলের রুচি আমার প্রিয়ার চেয়ে সম্পন্ন নিটোল
সাতরঙ্ প্রসাধনে সংঘবন্ধ উদ্যানে যখন,
আমার পিতার বুকে বয়স্ক বৃক্ষের সহিষ্ণুতা
অসংখ্য পাখির নীড়ে সুবিশাল গাছের সংসার—
তবুও আশংকা থাকে অহোরাত্র জাগরণ, ঝড় শুধু ঝড়……
ঝাপ্সা বৃষ্টির দম্ভ ক্রমশঃ নিষ্প্রভ ক'রে লণ্ঠনের উৎকণ্ঠা নেভালে
প্রলোভনে অন্ধকার বহু বহু ডিগ্রি নীচে সহসা তাকায়:
যেন কা'র করতলে কতকাল শুয়ে আছি কত ক্ষুদ্র নিজের পরিধি
আর্তনাদে অসহায় বড়ো ঠান্ডা মেরুর সীমানা।

কা'রো কোনো আর্তনাদ আমার মায়ের চেয়ে কোনদিন গভীরে কখনো
'বাসু' ব'লে ডাকে নাই, অমন করুণ আর অত তীব্র ডাকতে পারে না:
আমি যেতে চাই না সুদূরে
অথচ নিয়ত ক্লেশ নিহত সূর্যের দিকে চেয়ে
আহা, কত সাধ ছিলো কত ইচ্ছা একদা অতীতে
(ছেলেটির ভবিষ্যৎ আছে)
আহা, প্রতিশ্রুতি ছিলো কিন্তু অপচয়…..
সময়ের পদশব্দ সরীসৃপ সতর্কতা নিয়ে
শব্দের শুশ্রূক হ'য়ে ক্রমে ধীরে ভর করে প্রতিবেশী হাওয়ার তল্লাট,
সমুদ্র বাতাস আসে উল্লাসে উল্লুক—
অকস্মাৎ আক্রমণ, জানালার আর্তনাদ শুনে
দু'হাত সাঁড়াশীশক্ত, কবাটের টুঁটি চেপে ধ'রে
ব'সে ভাবি : অন্তরীণ প্রতিশ্রুতি মাথা কুটে মরুক দেয়ালে
আমি দূরে যাবো না কখনো।
কোনদিন দুঃসময় অতর্কিতে দরোজার কড়া নাড়া দিলে
সমবেত কণ্ঠস্বরে : বাসু বাড়ী নেই…
যেন বাসু কালরাত্রে মারা গেছে কলেরায়, কঠিন ব্যাধিতে!
পশ্চাতে মায়ের ছায়া চতুর্দিকে পিতার পরিখা
কাছাকাছি দীর্ঘশ্বাস, ভীরু বুক, দু'টি চোখ ডাগর করুণ…
আমার সকল ইচ্ছা রৌদ্রপুষ্ট ছায়ার শরীর:
যেতে আমি চাই না সুদূরে
পুষ্পিত স্নেহের বৃন্তে নির্বাসন আকাঙ্ক্ষিত দূরের আকাশ

অকৃপণ নিকট পৃথিবী।

আমার মায়ের বুকে ভালোবাসা কি গভীর পৃথিবীর মাটিও জানে না,
আমার পিতার চেয়ে সহিষ্ণুতা কোনো বৃক্ষ শেখেনি কখনো,
আমার প্রিয়ার মুখ সবচেয়ে সূর্যমুখী সম্ভ্রমে গৌরবে
হৃদয়-সর্বস্ব প্রেম তবু কোনো ফুল তার উপমার উত্তাপ আনে না......

কোনদিন সুদূরে যাবো না।

শেষ সংবাদ

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

চেনা যাবে একদিন কত লক্ষ সন্ধ্যা ভেঙে সনাক্ত হয়েছে এই গান।
চারিদিকে সময়ের সংঘবদ্ধ মেধার বিপ্লব পার হয়ে
যখন শরীরে আর অনুধাবনীয় কোনো রাত্রি বাকি নেই
প্রতিটি পাখির ডাকে কেন চমকায় ঘড়ি, হৃদয় কেন বা
এ জন্মের প্রাণহীন যে-কটি বসন্ত আজো সূর্যে জমা আছে
তার শেষ সংঘর্ষ সৎকার লেখে সাদা কাগজের মতো প্রকাশ্য সাদায়।
হয়তো এযুগে আর ক্ষমায় প্রস্তুত অন্য আত্মক্রীড়া নেই:
আজ এই উনিশশো-তেষট্টি দীর্ঘ বছরের আয়ু ভরা সংকুল পৃথিবী
অনবদ্য প্রেম কিংবা প্রাতস্মরণীয় বহু মনীষায় উদ্বেল হয়েও
সমাধির কাছে কেন নত ফিরে যায়
ফুলের সংকোচ হাতে নিয়ে-- কেউ তা বোঝেনি।
যুদ্ধও বোঝেনি ওই চুম্বন মিলিত মুখে সশব্দ বারুদ
যোগ্য বিরুদ্ধতা নয়, যদিও নিয়তি ক্রমে অনুপরমাণু দম্ভে প্রহরাবিনীত।
যদিও পৃথিবী জানি ততটা উদ্ভিদ নীল দুচোখে হবে না
এবং নিজের সঙ্গে বিজ্ঞান এমন ভয়াবহ
প্রতারণা করেছে বলেই তোমাকে এখন আমি
নিশ্বাসের সত্যে বুকে ছড়ানো দেখি না।

তথাপি বিজ্ঞান নিয়ে মানুষেরই সাথে কথা চালাচালি হলো!
সময়ের ক্লান্তি নেই, দুঃখে ক্লান্তি আছে কি তোমারো?
না হোলে কপোত কেন নিয়মিত সভাসম্মিলনে
মনুষ্যত্ব নষ্ট করে শান্তির প্রার্থনা নিয়ে ঊর্ধ্বে উঠে যায়,
শান্তির সংবিৎ নিয়ে অশ্রুআরাধনা সাধ নিয়ে
দেশে বা বিদেশে কেন বারবার সুরু করতে হয়
অন্ধ মূঢ়তার গোলটেবিল বৈঠক!
আর কি আশ্চর্য দেখি তখনো নির্ভয়
সততার কথা প্রায় চীৎকারের মতো লেখা হয়
লোকসফলতাভরা বই-এর তৎপর এডিশনে।
যে মুখ ফোটেনি গন্ধে, যে মুখে সতীর্থ নয় সমাজের কোনো সৎসাহস
তারাও তুলেছে গ্রীবা, সাহিত্যকে নিয়ে গেছে সংবাদপত্রের মতো শিল্পব্যবহারে।
কে আমি এখনো তবু প্রতিটি ফুলের কাছে দীন হয়ে যাই;
শিশুর হাসির কাছে, তার ব্যগ্রবাহু মেলে দেওয়া
অনায়াস বিশ্বাসের কাছে দ্রুত নতজানু হতে চাই ঈশ্বরেরো অধিক আগ্রহে;

তাকে কোন উদ্যম সাজাবে ব্যর্থ ছন্দসতর্কতালীন ক্লান্ত কবিতায়?

আমার সাধ্যের মধ্যে এ-রকম দোলাচল, উৎকণ্ঠ বিষাদ
প্রতি সূর্যে জেগে ওঠে, প্রতিদিন পাখির ধিক্‌কারে
চমৎকার দুর্বার ঘাড়, যেন মনে হয়
বহুদিন তুলনামূলক বাঁচা হলো
যুদ্ধে, লোভে, পরস্বহরণে বহুদিন।
তবু শান্তি নেই, নেই শান্তি নেই, চীৎকার করে তাকে খুঁজতে গেলে শুধু
শতাব্দীর সব চিহ্ন গম্বুজ প্রাসাদ
ব্যক্তির মৃত্যুর মতো কবির বুকের হাড়ে গণনাবিহীন ভেঙে পড়ে।

এপিটাফ

এখানে ঘুমায় এক মানব শরীর
যার হৃদয় জাগিতে গেছে অসমাপ্ত কবিতার শ্মশান অবধি।

অতি অবাধ্য এক পাখিকে—

নবনীতা সেন

পাখি, তুমি আর এসো না, এসো না, শহরে
এখানে তোমার থাকাটাই অশোভন
পাখি তুমি আর ঢুকোনা আমার এঘরে
তাড়াতে তোমাকে চলে যায় বহুক্ষণ।

পাখি, তুমি বাপু বনেই বেড়ালে পারো
'বন্যেরা বনে সুন্দর' শোনোনি কি,
এখানে শিক্‌লি, খাঁচা টাচা আছে, আরো
কতো ফাঁদ, তার দিতে হ'বে লিষ্টি কি?

কড়িকাঠে ঝোলে বিজলী পাখার ফাঁসিকাঠ
সেখানে উড়লে পটোল তুলবি, পাখি রে
কবে যে গুটোবি শহরে আসার এই পাট
মরণের ভয় একেবারে নেই নাকি রে?

এই তো দ্যাখ্ না আমাদের দিকে তাকিয়েই
বন থেকে এসে বনে ফিরে গেছি সহজে
ঘরবাড়ি গড়ে কেবল তোকেই ফাঁকি দেই
ঘন অরণ্যে জ্বলে দাবানল মগজে।

পাখি, তুমি জানো এভাবে আসার কী মানে?
তোমার ভ্রান্তি আমার শান্তি কাটছে
পাখি, তুই যদি আবার আসিস্ এখানে—!
—ডানার শব্দে ই'টের দেওয়াল ফাট্‌ছে!

মৃত্যুর পরে

জিয়া হায়দার

আমার মৃত্যুতে কেউ কাঁদলো না, কেউ
মুহূর্তের দীর্ঘশ্বাসে, এমন কি, আরো
একটু হালকা করলো না ঘরের বাতাস ;
বরং খুশিতে সেই উন্নাসিক গুণী
পাইপের ধোঁয়া ছেড়ে নড়ে চড়ে বসলেন চেয়ারে
(মহাগুণী দেখে যিনি মৃদু
বিনীত হাসির ছটা ছিটোন), বললেন : 'বেশ,
তাহলে আরেকটা বেড খালি হলো—
হুঁ, তা' ছেলেটা ভালোই ছিলো।'
পাইপের পুড়ন্ত তামাক
কাঠিতে নাড়লেন পুনরায়।

চারজন বেয়ারীশ এসে
রপ্তানী দ্রব্যের মতো আমাকে নির্মম
বাঁধনে জড়ালো কষে, নিয়ে যেতে যেতে
কাঁধ বদলানোর প্রয়োজনে, হয়তোবা অজুহাতে তারা
রাখলো রোদ্দুরের তাতে।

ভক্ষুণি কোথেকে
একপাল কাক এসে পাতালো মিতালি ;
অজস্র চীৎকারে বললো : 'তুই চলে আসবার পর
একজন বলেছিলো—তুই নাকি ভালোই, সর্বদা
সবাইকে কাছে পেতে চেয়েছিলি আপনত্ব-স্নেহে ও বিশ্বাসে,
কিন্তু—এটুকু বলেই সেই একজন
থেমে গিয়েছিলো, চমকে ইতিউতি তাকিয়ে আবার
বলেছিলো—ভালোই হয়েছে।'

আরেকটি কাক, তার দেহের বরণ এককালে
সাদা ছিলো, বোধ হয় দলপতি সেই,
পূর্ববর্তী বক্তার চেয়েও
অধিক উল্লাসে জানালো যে, কে নাকি বলেছে :
তুই নাকি সে জন্যেই সবার ঘৃণাতে
বিশেষিত হয়েছিস, আর

এ জন্যেই কোনোদিন ভুলেও কখনো
কেউ স্মরণে আর্নোন তোকে, নিতান্তই
দায়ে পড়লে, তারপরই পুনরায় যে কে সেই।

অতএব তুই যে প্রগাঢ় সাধে বলেছিলি :
'আমাকে কবর
দিয়ো সেইখানে, যেখানে সরস পলিমাটি,
সবুজ, হলুদ শস্যে আত্মহারা স্নেহবতী আবেগে পোয়াতী,
আমি যার অবোধ ফসল--'
তারা এ-ও ভুলে গেছে।

'তাই—'
বেয়ারীশ বাহকের দিকে মুখ রেখে দলপতি কাক
বললো অনুরোধের ভংগীতে :
'তাই তোমরা রাখো এই মাঠের ভাগাড়ে,
বেঁচে থাকতে বন্ধু যার কখনো ছিলো না,
অন্তত এখন আমরা হতে পারি, যদি......

অসংলগ্ন ইতিকথা

চিত্ত ঘোষ

সময় প্লাবিত অস্থি, ইতস্তত ভাসমান বয়া :
বয়েস বকুল হও। এই লগ্ন আলোকিত কর।
শূন্যতা সজ্জিত কর দেবদারু পাতায়।
অগ্নিময় জল ঠাণ্ডা। কেননা সে প্রতিবিম্ব।
অতিশয় নিমগ্ন ভূমিতে
ধীরে ধীরে নেমে যাও অতিনিম্নে মজ্জার খনিতে
স্মৃতি সত্তা আলোড়িত কর।
বুঝলে হে বুকের বোঝা, একটু ঘুমাও—
তা নাহলে সারারাত, তা নাহলে সারাদিন, তা নাহলে সারারাত
তা নাহলে সারাদিন, নড়বড়ে, নকল নগ্ন, ঘোলাটে চোখের মত
ভেতরে ভেতরে সব গভীর গড়বড়
উল্টো পাল্টা, সোজা উল্টো, ফের সোজা, ফের... ...।

এসো হে এসো হে এসো
তোমরা সব আশ্চর্য অতিথি এসো
উপস্থিত হও।
দূর, বড় দূর ঠেকে।
কালেভদ্রে দেখা কথা বিনিময়।
বৃক্ষবন কেবলই লোপাট দেখে
জায়গাটা কি ভয়ানক অচেনা বা ভয়াবহ মনে হয়েছিল?
অনেকেই আজকাল ভাল করে পথঘাট প্রতিবেশী কিছুই জানে না।
অনেকেরই নামধাম পরস্পর পরিচয় নেই।
অতএব অগত্যা ইত্যাদি...।
এসো হে এসো হে এসো
কম্পিত কাতর ঠোঁট নিয়োজিত কর।
ধাতব উল্লাস নেই কেন?
সমস্ত বাতাস কেন হিমস্রোত নদী!

আমার সময় জানো একমাঠ রোদ্দুর
জলে নেমে খেয়া ধরেছিল।
তারপর যেতে যেতে যেতে যেতে যেতে
কোথায় যে গেল!
আমরা এত প্রতারিত কেন?

আমরা যেন এক দৈর্ঘ্যে সব এ'টে গেছি।
বড় ভয়ানক সব দিনের চেহারা।
কোনো স্বাদ উপাদেয় নয়।
আসলে সমুদ্র দেখতে ভীষণ বিষণ্ণ লাগে।
বরঞ্চ পাহাড় রমণীয়।
কোথাও হৃদয়ধ্বনি নেই
এমন নিভৃতি নেই যেখানে উজ্জ্বল, উলঙ্গ হওয়া যায়
গভীর নিমগ্ন হওয়া যায়।
আমরা যেন সময়ের তর্পণের জলে
নিবন্ত হৃদয়শব্দ শুনি।
নিবন্ত হৃদয়শব্দ শুনি॥

রূপ রং গন্ধ

জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়

ইচ্ছার যদি কোন রূপ থেকে থাকে
তুমি তবে সেই সন্ধ্যার মেঘমালা,
জলস্রোতধারা ঘনান্ধকারে ঢাকে
ডালপাতাসহ একরাশ গাছপালা।
ইচ্ছার যদি কোন রং থাকে তবে
তুমি আহা, সেই দিগন্তলীন আলো,
সব কোলাহল এই পারে শেষ হবে,
দূর দীপাধারে নক্ষত্রটি জ্বাল।

ইচ্ছার যদি আছে দূরবনগন্ধ,
তুমি জেন, সেই শেষরাতে ঝরাফুল,
ভোরের বাতাসে বাতায়ন যদি বন্ধ,
খুলে, মেলে দেবে একরাশ ভেজাচুল।
ইচ্ছা এমন বহুবিধ আহা যদি:
ইচ্ছার মত তুমিও কি নিরবধি—

অপ্সরীর জন্য বিনামূল্যে মুক্তোমালা

সুনীল বসু

হাতের উপরে ধরা তীক্ষ্ণ নখ, পোষা বাজপাখি
সম্মুখে চলেছে খোজা, হস্তধৃত রক্তাভ মশাল;
নীলার আংটি ওষ্ঠে ছুঁলে রোগ-শোক-ব্যাধি সব ফাঁকি
হে যুবতী শোন, কিছু কিছু জানি, ভেল্কি, ইন্দ্রজাল!

পরিধানে ঢিলে-ঢোলা মান্ধাতা যুগের আলখেল্লা
জোব্বার ভিতরে আছে মনাক্কা ও পেস্তা, বেদানাটি
রেড্-ইণ্ডিয়ান যোদ্ধা মন্ত্রপূত রুবির মালাটি
দিয়েছে একদা, শতবর্ষ থাকবে, তীক্ষ্ণ যার জেল্লা।

অনেক ঘুরেছি দেশ, দেশান্তর অবশেষে সবে
এখানে, দেখেছি বালিদ্বীপ, মস্ত সিংগাপুর, জাভা,
অবশেষে রুক্ষ মরু উটের আরোহী এ আরবে,
দেশ থেকে দেশ ঘুরে চলে যাব, আদ্দিসআবাবা।

কোন বস্তু চাও তুমি, সিরিয় কপোত, মুক্তো, টিয়া?
চাও যদি অনায়াসে দিতে পারি ঝুঁটি কাকাতুয়া
গল্প শোন, যদি তুমি না-ই দেখে থাকো আল্‌জিরিয়া
তাতার নারীর নৃত্য, দস্যুদের আড্ডা, হল্লা, জুয়া!

এই মুক্তো মালাটির বড় যাদু, রোগ শোক জরা
আসে না শিয়রে তার, কণ্ঠে পরো, খুলে ঘোমটা-বোরখা,
স্বামীপুত্রে সুখী হও, রাজরানী, রাজপুত্র খোকা
বিনামূল্যে দেব মালা, বিদেশিনী, যেহেতু অপ্সরা!

ভূতগ্রস্ত

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

পূর্ণতা ভূতগ্রস্ত; দিকে দিকে এই শোনা যায়।—
এই সূত্রে লিখে রাখি—বহুকাল দৌড়োতে পারি না;
দেখতে ভুলেছি আরো অভিষেক; কয়েকশ' মাইল
অন্ধকার ভূমি-দখলের যুদ্ধ আরো।...
তাহলেও, কতোদূর গিয়েছে তাদের দলবল,
জোরে হেঁটে গেলে আর কতোটা নিজস্ব ব্যবধান
কাটিয়ে উঠবো, কিংবা আরো দূরে রয়ে যাবো আমি!
দেখাও তোমার বুক, ভদ্রতা পর্যন্ত সমর্পণ:—
এই শর্ত করে কার উদ্দেশে লিখিত, দেখি প'ড়ে।
বিপন্নের মুখচ্ছবি টাঙিয়ে রেখেছি—সেকি শরৎ নামের
কেউ অকপটে দিয়েছিলো একদিন,—
বড়োই বিভ্রম এলো মনে।
সামরিক-শিক্ষাহীন মূর্খের আটাশ ইঞ্চি বুকে
যা-আছে, তা-ই কি নয় ভূতগ্রস্ত আজ?

নির্বাসন

দিব্যেন্দু পালিত

আবার ফাল্গুন চকিত উৎসবে রেখেছে সর্বদিক উম্ধৃত,
রেখেছে দশদিকে কেউ কি জানে কেন গোপন উৎসবের মুখ খুলে ;
ছায়ার বিচরণে মাধবী বৃক্ষের অচেনা উদ্বেগ স্পন্দিত—
ভুলেছি সেই গান যে-গানে একদিন ঘটেছে রক্তিম বিস্ফোরণ।

তবু সে পুনরায় স্মৃতির দায়ভার কাকে যে দিতে চায় রহস্য—
বুকের হাওয়া কার এখনো উপবাসী তাকিয়ে বহুদূর দিগন্তে!
হে আলো অম্লান এখনো জ্বলো কেন ফুলের অপবাদে উৎসাহে :
আমি সে পরবাসী ফিরছি ঘরে একা দীর্ঘদিন পরে চীৎকৃত।

দিও না দোষ তাকে দিও না ঘুমঘোরে অলীক তথ্যের তীব্র স্বাদ—
মাধবী বৃক্ষের সমূহ উদ্বেগ এখনো ছায়াচর উদ্যানে।
ছিন্নবাস তবু রাজার নন্দন ললাটে রাজটীকা দীপ্যমান :
বুকের থাকে থাকে রয়েছে স্বপ্নের অমল বোধগুলি সজ্জিত।

এমন দুর্দিনে স্পর্শ দিয়ে কেউ জোগাবে অস্থির বরতনু,
ফোটাবে দুই হাতে বিরল মুদ্রার নম্র ব্যথাতুর অঞ্জলি—
হাওয়ায় যায় ভেসে স্মৃতির সহোদর আনত সেই মুখ বিস্মৃত :
ভুলেছি সেই গান যে-গানে একদিন ঘটেছে রক্তিম বিস্ফোরণ।

ফিরে আসা

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

এখন ফেরার পথে বৃক্ষছায়া জোনাকির দল
সঙ্গী হয়। মনে পড়ে প্রাণপন ভেসেছি গ্রামের
রোমাঞ্চিত চন্দ্রালোকে, পিতামহী চরণকমল
রেখেছেন সেই ঘাটে, পদব্রজে যেখানে নামের
চিহ্নবহ ত্রুটি নেই, আজ যেন বহুকাল পর
তোমাতে পিপাসা জাগে, ফিরে যাবো তোমার সকাশে
চাঁদের অধিক নীলে শিশিরের পরিমল ঝড়
বুকের ভিতরে আর ফিরবে না শারদপ্রবাসে।

যখন যেখানে থামি পদতলে বৃক্ষছায়া নামে,
যে সব প্রাচীন বৃক্ষ কোনোদিন আসিবে না ফিরে
হঠাৎ গোধূলিবেলা আমি যেন তাদের শিবিরে
সব ক'টি পানপাত্র সাজিয়েছি দক্ষিণে ও বামে।
পার হয়ে আসি চাঁদ নদী মাঠ পবন পাহাড়,
ফেরা তো সহজ, কিন্তু পদশব্দে খুলিবে কি দ্বার!

খেজুর গাছের দেহ

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

খেজুর গাছের দেহ কেটে নাও, গাঢ়
কণ্ঠদেশ ফুটো ক'রে সুমার্জিত নল
পুঁতে দাও; রক্তআভা ঘন রস ক্রমে
ঝরুক ঝরুক একা সারারাত্রি ধরে।
বৃহৎ আকার নীল কলসির থেকে
এর কম ঝরে চন্দ্র, ঝরে রৌদ্রকণা।

আকাশে বৃক্ষের মতো স্তব্ধ থাকা পাপ।
মর্মে যত আলোড়ন উজ্জ্বল ক্ষরণে
ব্রহ্মাণ্ডে নিক্ষেপ কর তুমুল উল্লাসে।
বৃথা ভয় কর এই প্রচণ্ড বিলাস—
ক্ষত কর, কেটে ফেল গাছের মতোন
নির্জনতা; গতিহীন স্থাণুত্বে কেবল
আয়ু যায়! নিরুপায় পল্লব কাঁপায়ে
স্পন্দন ফুরিয়ে আনা মহাপাপ।
অন্তত শিখরে রূঢ় বজ্রপাত ভালো
নাহলে গভীর তীক্ষ্ণ নল চেঁছে নিয়ে
বসাও মর্মের স্তূপে; সারারাত্রি ধরে
ঝরুক রক্তাভা রস, উজ্জ্বল তরল।

রক্তের ভিতরে

প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়

বুকের ভিতরে ছিলে, রক্তের ভিতরে, দোলাচল
স্তব্ধ ক'রে জেগে-ওঠা তীব্র দ্যুতিময় অভিজ্ঞতা,
লক্ষ শিরা-উপশিরা, প্রবাহ, স্পন্দন; অবিরল
নিঃশ্বাসের শব্দে-ভাঙা সময়ের শীতল স্তব্ধতা
রক্তের ভিতরে স্রোত, বুকের ভিতরে পথ; চলে
অবিচ্ছিন্ন ধ্বংস ও নির্মাণ। তুমি ছিলে, তুমি থাকো,
গোলাপবাগানে সূর্য শেষবার রক্তাক্ত অতলে
ডুবে গেলে, জেগে-ওঠা মুহূর্তের উন্মোচিত সাঁকো।

অথচ স্পষ্টতা এক পুরনো ঘড়ির ব্যবহৃত
হৃৎপিণ্ড, মরিচা-পড়া সময়, স্পন্দনস্তব্ধ গতি,
তুমি শব্দ নও, তুমি ভাষা নও, জীর্ণ, বাসী, মৃত
ছন্দ কিংবা মিল নও: মুহূর্তের বিরল স্থপতি—
তীব্রদ্যুতি অভিজ্ঞতা, ধ্বনিময় অদৃশ্য নিখিলে
বুকের ভিতরে, তবু, রক্তের ভিতরে, তুমি ছিলে॥

মনসিজ

অমিতাভ চট্টোপাধ্যায়

চোরালণ্ঠনের বাতি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মধ্যরাতে
একা...বাঁকাগলি, ফাঁকা। যেন কেউ এসেছিলো আজ
দরজার হাতলে হাত রেখেছিলো শীতল ইস্পাতে
বাড়ির ভিতরে অই ঘোরে তার শিথিল আওয়াজ।

পাতা...পোড়ো পাতা যায়, পাতাগুলি বিচূর্ণ হাওয়ায়
অই বাড়ি, বাঁকাগলি...দূরে অন্ধ কক্ষগুলি তার
খুব আস্তে হাস্য করে—খণ্ড, শ্বেত...ভূতের জ্যোৎস্নায়:

আমারে বিনষ্ট করে আমরাই দুস্তর হাহাকার।

নির্জন দর্পণে মুখ

বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায়

দিনের ভাঁড়ামি শেষ হ'লে
সন্ধ্যা আনে বিষণ্ণ প্রত্যয়,—
নারী, মিত্র, প্রেম, নীতি,...সব
অতিক্রত ছায়া মনে হয়......

কালকের প্রতিশ্রুতি আজ
ভুলে যাওয়া কতই সহজ;
প্রণয়, প্রভাতে তোলা ফুল
ফুলদানিতে বাসি হয় রোজ।

লুব্ধ মন, রাতের তিমিরে
মৃত্যু পায়; বদ্ধ জলাভূমে
ঘোরে, ক্ষুব্ধ আলেয়ার তীরে।
প্রতিষ্ঠার পদতল চুমে

বেচি আত্মা কাঞ্চনের দামে।
অবিবেকী প্রবৃত্তির পাপে,
লিপ্ত হই আত্মনাসী কামে—
পরে, পুড়ি, ব্যর্থ মনস্তাপে।

প্রসাধিত দম্ভের পুতুল—
মুখ দেখি বিলাসী মুকুরে।
রক্তের গোপন দোষ তবু
অস্থিমাংস খায় কুরে, কুরে।

আদিকণ্ঠ : অস্তিত্ব

দুর্গাদাস সরকার

অস্তিত্ববোধের কাছে। দিনান্তের পর অন্ধকারে
হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটি একা একা পঙ্গুর মতন
অক্ষত শরীরে। আর, শুনি এক গভীর গর্জন।
যেন অতীতের অন্ধ ম্যামথের বিভ্রান্ত চীৎকারে
সমুখে এ-গর্জন, ক্রন্দন কোনো বন্ধ সীমানায়।
মিলিত কণ্ঠের স্বর নয়। শুধু এক এক মানুষ
প্রৌঢ়ত্বে যখন খোঁজে জীবনের বিগত প্রত্যুষ
আয়ুর ঘণ্টাটা বাজে সশব্দে তখনি বারোটায়।

সে-ধ্বনিতে শুধু আমি নই : আরো সকলেই জাগে
বনের পাখিরা ডেকে ওঠে। কোনো বুভুক্ষু শৃগাল
একবার কণ্ঠ তুলে চুপ। হয়তো ডাকবে ফের কাল
তথাপি সে এক ভয় পৃথিবীর করুণ সংরাগে।
তখনো আর এক কান্না শুনেছি সে গভীর প্রহরে
মায়ের যন্ত্রণা-ছিন্ন আদিকণ্ঠ স্বস্তির ভেতরে।

ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর

মৃত্যুঞ্জয় সেন

পরিচিত দুঃখের আড়ালে
তোমাকেই মনে পড়চে
পুতুল ভাঙ্গার মত আমার দুয়ারে
অদ্ভুত খেলা চলচে
আর একটু সুখের হাত বাড়ালে
ছুঁয়ে দেবো ফুল, জংধরা লোহার চুল।

হেকেটি! চারিদিকে ক্রুর চোখ, এখনো ওরা চিৎকার করচে
আমাকে ডেকে নাও, ঝাউপাতার মত স্বস্তি সেখানে
তোমার বন্দর প্যাভেলিয়ানে;
নিঃসঙ্গ দুর্ভোগ, অপমানের অনবদ্য সংকলন ঘটচে
—এখানে
হোম্যে হয়ে ঘুরে ঘুরে যুগ যুগ পর পর
মনটা এক অদ্ভুত বেদনায় আচ্ছন্ন
হেকেটি, তাই এ ঐতিহাসিক কণ্ঠস্বর
তোমার নিমন্ত্রণে হতে চাই নিমগ্ন॥

য় মেঘ

মানস রায়চৌধুরী

ওরা কি পুজোর মেঘ, তোমার চোখের পাশে যারা সারাদিন
অনলস ঝুঁকে আছে। সারাবেলা যারা ক্লান্তিহীন
তোমার মুখের পাশে মুখের ঘুমন্ত আভা করে আছে অতীব মধুর?
ওই মেঘগুলি যেন তেইশ বছর ধরে শারদীয় রৌদ্রের সুদূর
সম্ভাবনা সরিয়ে রেখেছে মুখে। ভূমণ্ডল জুড়ে
সকল ঋতুর হবে অবসান, হেমন্তের ফলগুলি অথবা গ্রীষ্মের মাটি খুঁড়ে
আখের নির্মল সুধা উঠে আসবে গেলাসে পানীয়ে—
দেখেছি সমস্ত শোভা ক্রমধাবমান শুধু কদম্বের আর্দ্র ছায়া নিয়ে
পুজোর মুখগুলি থাকে অবাঞ্ছিত তোমার চোখের কোলে কেন আজীবন।

পিঁপড়ে

পৃথিবীন্দ্র চক্রবর্তী

মুখে ছিঁড়ে মাংস
কী ফুর্তি
কাঁধে কাঁধ দিয়ে ছুটে চ'লেছে
পিলপিল পিলপিল

বারান্দা ডিঙিয়ে
দেয়াল বেয়ে
কোন গুহার দিকে
পিলপিল পিলপিল

কাল ম'রেছে কাকটা
এরই মধ্যে খতম
কাকও এসেছে দশ রাজ্যির
পিলপিল পিলপিল

ডানার বাতাস
আর কা কা
এদিকে মুখে দলা
পিলপিল পিলপিল

চ'লেছে তো চ'লেছেই
কী ফুর্তি
পিঁপড়ের পলটন
পিলপিল পিলপিল॥

অধঃপতন

মলয় রায়চৌধুরী

এভাবে বিদীর্ণ করো প্রেমশিল্পকবিতাকে এমুড়োওমুড়ো
নিমীল কুমারীবুক নখে ছেঁড়ো নিষ্পেষণে ভালোবাসাদ্বিধা
প্রতিক্ষণ দগ্ধবাক অযাচিতে ছিন্ন করো অবলাগোলাপ
বিজনে গহন রৌদ্রে ভেঙে তুলে সচ্চরিত্র আমূলশিমূল
ভাসাও পাঁকের বক্ষে আয়োজনে সাড়ম্বরে বঁধু ভ্রূণমৃত
উদ্দাম জারজ রঙে ঘুরিয়ে নির্মম নামো সমর্পিতা সিঁড়ি:
ডুবে যাক ধানক্ষেত বন্যাভাবে দূরগ্রাম ছবি ছন্নছাড়া
পঞ্চক্রোশব্যাপী জোঁক ছেয়ে থাক পদপৃষ্ঠে আগাছাবিচুটি
পড়ে রবো স্মৃতিহীন অনাত্মীয় অন্ধকারে মৃত্যু ধবলিমা—

হলুদ মৃত্যুর ছল অগ্নিমৃগ অতিপ্রিয় অক্ষিবাতায়নে।
অনন্য সংসার গড়ো রক্তাঞ্জনা অতুলনারূপা
আদিগন্ত তেপান্তরে মরালের মোচড়ানো গ্রীবা মলয়জ।

সূর্যের জ্যোৎস্নায়

ইন্দ্রনীল চট্টোপাধ্যায়

অদ্ভুত ব্যবসা তার
ভালবাসা লেনদেন করে,
ডান বাম মুঠো খুলে
দেখায় সে সুমেরু কুমেরু;
থুথুতে ছিটোয় পুণ্য
পাপ তার সরল পানীয়;
বিবেকবর্জিত কিন্তু
শিশুদের সঙ্গে তাকে দেখি।
দেশকাল ছুঁয়ে থাকে
পাত্রাপাত্র ভেদ-ও সে করে;
অথচ করুণালীন
মানুষের গভীর স্বদেশ—
লুটায় সে দীর্ঘশ্বাসে,
তবু সেই নিরভিমানীর
জিভ থেকে পাওয়া যায়
সুস্বাদের আশ্চর্য আওয়াজ!

সেই অভাজন যায়
শ্মশান রাঙাতে ফুলে ফুলে,
অবিরাম বাড়িঘর
পলকে পলকে দেয় খুলে;
দেখি তার একাকীত্ব
তন্ময় সমাজ এক নিজে
নৈরাশ্যনিবিড় বন্ধু,
ছিন্নমূল বিধুর বর্বর!
অদ্ভুত ব্যবসা তার
স্থাবর জঙ্গম বিনিময়,
লেদেন ভূত ভবিষ্যৎ,
জনতা ও জন!
দেখি তার অভিভূত
ছায়াচ্ছন্ন মুখ বারবার,
পথে পথে সদরে বন্দরে
একা, সূর্যের জ্যোৎস্নায়।

দুইজন ফরাসি কবি

[যে দুজন ফরাসী কবির রচনার অনুবাদ এখানে দেওয়া হল তাঁদের মধ্যে একটা বিশেষ সাধর্ম্য আছে। দুজনের কবিতাই বস্তুমুখী বা বস্তুনির্ভর। দুজনেই মানুষকে পৃথিবীর দৃশ্যমান বস্তুর সঙ্গে একান্ত-ভাবে জড়িত ক'রে দেখেন। এ প্রসঙ্গে এঁদের বয়োজ্যেষ্ঠ ফ্রাঁসিস্ পঁঝ্-এর কথাও মনে আসে, যিনি বস্তু-বৃত্তান্তের এক প্রধান কথক। তাঁর কাছে পরে একসময় যাওয়া যাবে। কিন্তু এই সাদৃশ্য সত্ত্বেও ঝঁ ফলাঁ (Jean Follain, জন্ম ১৯০৩) এবং গিল্যাভিক্ (Guillevic, জন্ম ১৯০৭) নিকট নন, তাঁদের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। কারণ দুজনের পরিপ্রেক্ষিত, পদ্ধতি এবং অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। ব্যাখ্যা ক'রে বলা যেতে পারে, ফলাঁ যেন ছবি আঁকেন, তিনি বাস্তব স্থিতিকে শব্দে ধরেন, দৃষ্টিগোচর বিভিন্ন বিষয়কে তিনি তাদের অন্তরঙ্গ সত্তায় ফুটিয়ে তোলেন। দেখানোই তাঁর কাজ, নিজের কোনো প্রশ্নকে তিনি সামনে আনেন না। কিন্তু তাঁর চিত্রণ মারফৎ আমাদের তিনি বিশ্বনাট্যের শরিক ক'রে দেন। গিল্যাভিক্ নিজেকে তথা মানুষকে সরাসরি বস্তুর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেন। পদার্থদের জড়তায় নয়, তাদের অন্তর্লীন আবেগে তিনি একাত্ম হতে চান। তাদের সামনে তাঁর অশান্তি এবং আত্মীয়তা সমান প্রবল। বস্তু এবং বর্তমান বিপন্ন মানুষের এক আদিম অথচ নতুন সামঞ্জস্যের সন্ধানে তিনি ব্যাকুল। সেই সঙ্গে মানুষের মধ্যে সামঞ্জস্যও তাঁর সন্ধানের অন্তর্গত।

গিল্যাভিকের বলার ধরন ভাঙাচোরা, অনেকটা চাপা চীৎকারের মতো। তথাকথিত গীতিময়তা তাতে নেই। ফলাঁর কাব্যেও কাব্যিক 'লাবণ্য' অনুপস্থিত। ছোট ছোট কবিতায় তিনি তাঁর নিজস্ব বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত।

ফ্রান্সের সাহিত্যজগতে এই দুই কবির প্রতিষ্ঠা কেমন? (এর মতো করুণ শব্দ কবিদের ক্ষেত্রে আর নেই)। এক কথায় বলা যায়, দুজনেরই প্রতিষ্ঠা যথেষ্ট এবং পাঠকদের মনোযোগ ক্রমেই বাড়ছে। অবশ্য প্রত্যেকের সম্বন্ধেই সমালোচকদের সিদ্ধান্তের গরমিল আছে। যেমন, ফলাঁকে কেউ বলেন গৌণ কবি, কেউ বলেন শ্রেষ্ঠ কবি। (কাব্য সমালোচনা জিনিসটি যে কি মজাদার, এ তার আর একটি নমুনা।) তবে ফলাঁ জনপ্রিয় কবি। তার একটা কারণ বোধ হয় এই যে, তাঁর কবিতা পড়তে গেলে পাঠককে অভিধান খুলতে হয় না অথবা তত্ত্বকথা নিয়ে হিমসিম খেতে হয় না। এটা নিশ্চয় তার পক্ষে একটা বড় স্বস্তি।

ফলাঁর প্রথম চারটি কবিতা তাঁর বই থেকে সংগৃহীত এবং বাকী পাঁচটি ১৯৫৮ ও ১৯৬২ সালের সাময়িক পত্রিকার পৃষ্ঠা থেকে। গিল্যাভিকের প্রথম দুটি কবিতা তাঁর বইতে আছে; শেষের কবিতাটি ('তোমাকে লিখছি') প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬২ সালে এক সাময়িক পত্রিকায়, সেখান থেকে ওটি নিয়েছি।]

অরুণ মিত্র

মৃত্যু

ঝঁ ফলাঁ

জন্তুর হাড় দিয়ে
এই বোতামগুলো কারখানায় তৈরী হয়েছিল,

এক চোখধাঁধানো মজুরনীর
বুকের উপর
জামাটাকে তারা বন্ধ ক'রে রেখেছিল,
যখন সে মাটির উপর পড়ল
একটি বোতাম অন্ধকারে খুলে গেল
এবং রাস্তার নর্দমা সেটিকে নিয়ে
রেখে এল এক সৌখীন বাগান পর্যন্ত
যেখানে প্লাস্টারে গড়া
বনদেবীর এক হাস্যময়ী বিবসনা মূর্তি
খ'সে খ'সে পড়ছিল।

পাঁচিলের ধারে মেয়েটি

ঝঁ ফলাঁ

মেয়েটি তার মোজার রিপুগুলো দেখছিল,
কর্মকাণ্ডের শব্দ ঝিমিয়ে পড়ছিল,
নলখাগড়ারা হেলেদুলে পরস্পরকে ছুঁয়ে ছিল:
হাঁটু-মুড়ে-বসা ফ্যাকাশে রঙের মেয়েটিকে
মনে হচ্ছিল তার হাড়গোড়ের মতো।
সব সাহসকে মেরে ফেলে এমন নীল ছিল আকাশ
জীবন্ত আকাশ,
তার হাতের আঙুল প্রথম খুলল
যখন হল্‌দে পাঁচিলের পেছন থেকে
ক্ষীণ সঙ্গীত উঠল:
কাদা আর কুচোনো খড় মেখে গড়া সেই পাঁচিল
যুদ্ধের সময় শুকিয়েছিল,
সৈন্যেরা তখন তার উপর হাত রেখেছিল,
একজনের অঙ্গুষ্ঠ স্থূল অন্যজনের তর্জনী দীর্ঘ:
তারপর সেই পাঁচিলে ফুল ফুটেছে,
একটা সাদা ঘাগরার ঝলক তাকে ঋজু এবং অপরূপ ক'রে তুলল
এবং একটা ঘণ্টার ধ্বনি টলিয়ে দিল উপরের আকাশকে।

ছেলেটার ইস্কুল যাওয়ার পটভূমি

ঝ° ফল°্যা

পিপের মধ্যে বাসাবাঁধা
এই তরল নীরবতা,
কুমারীদের ত্বক গ্রাস করার বৃথা চেষ্টা করে
এই যে ক্ষুদে পোকারা,
শিয়ালকাঁটার কাছে দাঁড়িয়ে জল খায় যে কামাররা,
সোনালি মধু চোঁয়ায় যে মৌমাছিরা,
চোখধাঁধানো যে কড়াইগুলো
ভিজে ছাই দিয়ে মাজা হয়,
ঝড়শেষের শব্দ,
বাগানের মধ্যে জড়োকরা স্তূপাকার
ঘাসপাতা পোড়ানোর
ঝাঁঝালো ধোঁয়া
এবং রান্নাঘরের দেয়ালে
এক রাজার ছবি
এবং স্যাঁৎসেঁতে রাজ্যে
কাদা আর পলস্তারা,
এ সবই এক অসম্ভব প্রত্যয়ের বার্তাবহ:
ঐ তো সে ইতিমধ্যেই টিলার উপরে দেখা দিয়েছে
সেই বিধবা
যে হাত ধ'রে দূরের ইস্কুল পর্যন্ত নিয়ে যায়
ঝাঁকড়া লালচুলওলা ছেলেটাকে।

পর্যটকদের জন্যে চিহ্ন

ঝ° ফল°্যা

বিশাল পরিধির পর্যটকেরা
তোমরা যখন দেখবে একটি মেয়ে
মস্ত কালো একগোছা চুল
তার দীপ্ত হাতে মোচড়াচ্ছে
এবং উপরন্তু

দেখবে
এক অন্ধকার রুটির দোকানের কাছাকাছি
একটি ঘোড়া মরণের কোলে শুয়ে আছে
তখন এই চিহ্নগুলো থেকে বুঝবে
তোমরা মানুষের মধ্যে এসেছো।

প্রশান্তি

ঝ' ফল'্যা

দেয়ালের ছবিতে দেখা যায়
ঈশ্বর মেঘের মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসছেন।
সঙ্কীর্ণ এবং দীর্ঘ
এই গাঁয়ের আপিস-ঘরে
একটি কলমের শব্দ
মারা পড়তে পড়তে বে'চে ফিরে আসে
যুদ্ধবিগ্রহের পর।
বাইরে অতি মৃদু কাঁপে
জলাভূমির কাদামাটি,
পাতাঠাসা গাছের মধ্যে কাঠবিড়ালীটা
তামাসা করে পথিককে নিয়ে
যে স্পষ্টই দেখে তা,
একটা প্রকাণ্ড হাত এগিয়ে আসে
খরগোশটাকে ধরবার জন্যে,
সে এই মুহূর্তেই মরবে।

কম্পাস

ঝ' ফল'্যা

বেড়াঘেরা জায়গাটা
তার সমস্ত চৌরিফল নিয়ে ঝল্‌কায়,
অনিশ্চিত বাতাসে
একটা পুরোনো পতাকা কাঁপে

আবেগ-জাগানো এক বক্ষবাস
ছায়াদের মূর্ত ক'রে তোলে।
গোল টেবিলটার উপর
একটা হাতে গাল রেখে একজন
ইস্পাতের মুখওলা কাঠের কম্পাস দিয়ে
মসৃণ সাদা কাগজে
একটা পুরো বৃত্ত আঁকে,
ঝক্‌মকে যন্ত্রটাকে রেখে দেয়
তারপর মনে মনে
গোণে ঠিক কতদিন লাগবে
আগামী ঘটনাটা ঘটতে।

সময়ের মূর্তি

ঝাঁ ফলাঁ্য

গরীব রেস্তোরাঁয়
না জেনেই বসতে হয়
হতভাগা খুনীটার পাশে,
সে তাকিয়ে থাকে এক পরিচারিকার দিকে
যার মসৃণ কাপড় স্তনদুটিকে
পরিষ্কার ফুটিয়ে তুলেছে।
মেয়েটি অদৃশ্য হ'য়ে বাড়ী ফেরে
কালো চটিজোড়া পায়ে পরে
তার লালচে হাত দিয়ে
জানলা খুলে দেয় একটি রাত্রির নিশ্বাসের সামনে,
গাছের পাতায় শব্দ ঠাহর করে,
এমনিভাবে অন্য অনেকের মধ্যে
সময়ের মূর্তি হয়ে থাকে।

উৎকণ্ঠা

ঝং ফলংয়া

খাদের উপরে
মেঘেরা চলে,
তখন প্রতীক্ষার নীরবতার মধ্যে
সমতল অন্ধকার হ'য়ে আসে
তখন আগুন তোলার হাতাটা
পাথরের উপর প'ড়ে গিয়ে
কিষাণীকে শিউরে দেয়.
সে তার উৎকণ্ঠায়
একটা তোড়া বানায়
ফুল আর পাতা দিয়ে
তারপর তার সব চেয়ে ভালো ছেলেটির জন্যে
ক্ষীণ স্বরে গান গায়।

একটি দেশ

ঝং ফলংয়া

কুঁড়েঘরের ফাটলধরা দেয়ালগুলোকে
তারা দেখে.
ঢুকতে ইতস্তত করে:
শিশুদের সঙ্গে কথা বলতে হবে এমনভাবে
যাতে গলাবন্ধ মোটা কোটগুলোর চারপাশের
সেই ছায়াটা ভয় না পায়।
এইরকম দেশে
ঝুঁকে-পড়া গুম্মকে ঠেকায়
সাক্ষী গাছেরা
যারা দৈবক্রমে
অতি সুন্দর ক'রে বোনা একটি নীড়কে ধ'রে রেখেছে।

পাথরের দেশ

গিল্যভিক

পাথরের দেশ, ঝোপঝাড়ের দেশ--পাষাণস্তূপ
শুষ্কতায় কর্কশ।

ভূমি
টাটানো গলার মতো
একটু দুধ চায়,
পুরুষ ছাড়া নারী, পাহাড়
পোড়া উই-ঢিবির মতো,
জঠরহীন ভূমি, ধাতুবাদ্যের সঙ্গীত :
বিচারকের
মুখ।

এমন সব রাক্ষুসে জানোয়ার আছে যারা খুব ভালো,
যারা পরম স্নেহে চোখ বুজে
তোমার সামনে বসে
এবং তোমার কব্জির উপর
তাদের লোমশ থাবা রাখে।

এক সন্ধ্যায়—
যখন বিশ্বে সব কিছু রক্তাভ হবে
যখন প্রস্তরখণ্ডেরা তাদের পাগল গতি আবার শুরু করবে
তখন তারা জেগে উঠবে।

যখন মোরগ চীৎকার করল
রক্তমাংস আর সূর্যের সংবাদ,
যখন হাঁসমুরগীর সারা উঠোন
চীৎকার করল জমির জন্যে
তার অপমানের কণ্ঠ দিয়ে,

তখন সেটা এই নিয়মেরই কথা যে রাত্রি
নিজেকে ঘোষণা করে এবং স্পর্শ করে
তার ত্রাসের হাত দিয়ে,
সেইখানে যেখানে শিকারী কুকুর

কচি দূর্বার মতো নির্বল
কম্পমান মধুর শরীরগুলোকে চেনে।

হ্যাঁ, নদীরা—হ্যাঁ, গুহেরা,
আর তোমরা কুয়াশারা—আর তুমি
অবিশ্বাস্য কাঁচপোকা,

টিলার উপরে ফাঁপা বট
প্রকাণ্ড জন্তুর মতো বিদীর্ণ,

কে না শুনতে পাবে
তোমরা চীৎকার করছ
পাকবার মুখে শস্যের মতো?

—ধৈর্য ধরো, আর কয়েক শতাব্দী যাক
তখন আমরা বোধ হয় একত্রে পারব
একটা ফয়সালা করার সিদ্ধান্ত নিতে।

তুমি জেগে উঠে

গিল্যাভিক্

তুমি জেগে উঠে
এখনো দেখ ছায়ার বিরাট বিরাট গহ্বর,
পাথরের হাঁ-করা মুখ, দাঁত,
এক বিশাল আগুন
ধাতুকে লেহন করছে।

তুমি দেখেছ প্রজ্বলন্ত সমুদ্র থেকে অপসৃত লবণে
দীর্ঘ দগ্ধ গলির অন্ধকার আঁটা,
দেখেছ বিশাল জলভারের আন্দোলন—তোমার স্মরণ আছে
তাদের পরাজয়ের কোলাহল।

তুমি মহাবিশৃঙ্খলায় ভেসে যেতে যেতে
পাথরকে ঠেলছিলে হাসির দিকে,
খুঁজছিলে আগুনের বন্ধুতা।

তোমার কাটি তোমার মুখ জন্মের পথে বিমুক্ত করছিল উদ্ভিদদের
আর পশুদের যারা আশায় চীৎকার করছিল এবং দূরে গিয়ে
অপেক্ষা করছিল তাদের শরীরের জবরদস্ত তাগিদের জন্যে।

তুমি তোমার জিবের উপর লেগুনকে ধ্বনিত করছিলে,
তোমার আঙুল বাকল বেয়ে উঠছিল,
সমস্ত কাদা
তুমি তোমার ত্বকে মেখেছিলে।

এ আবার একটা দিন
এবং এ বিরামহীন
হাঁ-করা ফাটলের মধ্যে
অন্য সব অনুরূপ স্থান অভিমুখে

যেখানে বিশ্ব

সব কিছুকে নিজের বিরুদ্ধে পাওয়া
পাথরের হলুদ রং,
পাঁচিলের ভার
এবং ছাদের টালির উপর
বাষ্পের গান।

আমি তোমাকে লিখছি

গিল্যভিক

আমি তোমাকে লিখছি যে দেশ থেকে সেখানে অন্ধকার হয়েছে
কিন্তু রাত্রি নয়।
আমি তোমাকে লিখছি
কারণ অন্ধকার হয়েছে।
আমি তোমাকে লিখছি দেয়ালের উপর
অন্ধকারের একেবারে গভীরে।

অন্ধকার রয়েছে যেহেতু সে আমাকে তোমার কাছে লেখাচ্ছে
দেয়াল রয়েছে যেহেতু আমি তার উপর লিখছি

এবং তোমার জন্যে।
আমি জানি না এই অন্ধকার কি
আমি তার ভিতরে রয়েছি।
আমি অন্ধকারের একেবারে গভীরে দেয়ালের উপর তোমাকে লিখছি।

বেশীর ভাগ সময় দেয়ালটা সোজা খাড়া,
কিন্তু আমার মনে হয় সে বেঁকে যায়।
আমি যখন বলি
সে অন্ধকারের একেবার গভীরে
তখন আমাকে আশ্বাস দেবার জন্যেই বলি।
আমি তার উপর লিখছি
যাতে লেখাটা সার্থক হয়।

আমি তোমার জন্যে যা লিখছি
তা যদি তুমি এই দেয়ালের উপর পড়ো
তাহলে বোধ হয় তুমি জানতে পারবে
আমাকে কোথায় রাখা হয়েছিল।

কিন্তু যদি এমন হ'য়ে থাকে যে আমি লিখছি
তোমার দেয়ালের উপর,
যে অন্ধকারে তুমি আছ
তার একেবারে গভীরে দেয়ালের উপর
এবং যদি তুমি না জানতে পার
আমি তোমার জন্যে লিখছি?

আমি তোমাকে জানি, সূর্য,
আমি তোমাদের জানি, আপেলগাছেরা।
আমি জানি অন্ধকারের
অদ্ভুত বৈচিত্র্য
যার নাম আলো।
তার রাজ্যে আমি কেঁপেছি।

এই দেয়াল যার উপর আমি লিখছি
তার ওপারে
আমার কোনো দিগন্ত নেই।
আমি যা জানতে পারি
তার বেশী লিখব না।

অন্ধকারের একেবারে গভীরে
দেয়ালটা যে সত্যকে বিধৃত রাখে আমি তার কথাই লিখছি।

বাইরে অন্য এক কর্মভূমি
তূর্যে দিনকে প্রবলতর ক'রে শ্বসিত করতে হবে
যেমন পথে পথে একটি নগ্ন আগুন শ্বসিত হয়
যখন মধ্যাহ্ন এসে
সমগ্র স্থায়ী ভূমিকে উদ্দীপিত করে।
কিন্তু বাইরে কোথায় তোমাকে লিখব
এই দেয়াল বিনা?

বাইরে আমি আর জানব না
কাকে লিখছি।
এবং তোমার কাছে যার লিখতে হবে
বাইরে তার কি দশা হবে
আগুনে আর হাওয়ায়?

যদি না একদিন—
সেটা নাকি দিনই?—
আমরা একত্র হতে পারি
বাইরের জন্যে এবং অন্ধকারের জন্যে।

তখন আমাদের সম্মানে
আপেলগাছেরা, নদীরা
আলোয় জ্বলবে
অবশ্য আমাদেরই পরিমাপে।

তখন তুমি যা কিছু দেখবে মাধুর্যে ভাস্বর
আমি তার উপর লিখব
আমাদের চারপাশের সব জিনিসের উপর
বাইরে এবং অন্ধকারে।
তখন তোমাকে লিখবার জন্যে
আমার আর দরকার হবে না খুঁজবার
নিখোঁজ দেয়ালটাকে
যার উপর এখন আমি লিখছি।

তার পরে কি আসে যায়
অন্ধকার আর থাকল বা না থাকল

বিশাল আলোর মধ্যে
আলোর একেবারে গভীরে,
যেহেতু তুমি সেখানে থাকবে
একত্রে পথ হাতড়ানোর জন্যে
এবং যেহেতু আমি তোমাকে লিখব
তোমার শরীরের উপর আমার ওষ্ঠ দিয়ে।

ইত্যবসরে আমি তোমাকে লিখছি
সেই দেয়ালের উপর যা অন্ধকারের একেবারে গভীরে
'আমি তোমার জানুদুটিকে আশীর্বাদ করি,
আমি সেইদিনের কথা ভাবি
যখন তারা আমার হাতের নীচে কাঁপবে
যেমন পাতারা কাঁপে
সামান্যতর কারণে।'

এবং আমরা যাব
আরোগ্যসাধ্য আলোর অভিমুখে।

অনুবাদ : **অরুণ মিত্র**

মুচি আর তালকাহুয়ানো

প্যাব্লো নেরুদা

আমার নাম অলেগারিও সেপুলভেডা,
জুতো বানাই, মুচি।
সেই সেবারকার বিরাট ভূমিকম্পের বছর থেকে
আমি খোঁড়া।
পাহাড় গুঁড়িয়ে মস্তবড়ো একটা চাপ
পড়েছিলো আমার পায়ের ওপর,
মনে হয়েছিল যেন আস্ত দুনিয়াটাই ভেঙে পোড়লো।
পুরো দুদিন চেঁচিয়েছি সাহায্যের জন্য,
হা করলেই ধুলোবালিতে মুখ যেত ভরে,
কমজোর হয়ে আসতে লাগ্‌লো গলার আওয়াজ,
ভাব্‌লুম নিস্তার নেই এবার।
বিভীষিকার মতো মূঢ় মূক স্তব্ধ সেই ভূমিকম্প,
ধোপানিরা ডুক্‌রে কেঁদে উঠ্‌তে যেতেই
গুঁড়ো গুঁড়ো ধুলোর পাহাড় তাদের কণ্ঠরোধ করেছে।

এখন আমার ডেরা এইখানেই।
আজকের তৈরী স্যাণ্ডেল জোড়া হাতে নিয়ে
তাকিয়ে আছি নীল সমুদ্রের বিস্তারের দিকে,
কী বিরাট, কী অপরিসীম কী পরিচ্ছন্ন সে ব্যাপ্তি।
চঞ্চল ফেনিল নীল ঢেউগুলো
আমার দোরাগোড়ায় এসে আছড়ে পড়বে না ত?

তালকাহুয়ানো
নোংরা, ঘিন্‌জি, বস্তিসর্বস্ব,
ডোবাভরা পচাজল আর গরীবে ভরা মুল্লুক।
আমরা চিলির অধিবাসিরা,
রগচটা,
চটে উঠলেই মেরে বসি,
আর নিজেরাও মরি।

(তীব্র শাণিত বেদনার আবাস তালকাহুয়ানো,
পৃথিবীর পিঠে গলিত কুষ্ঠের মতো
দগদগে বিষাক্ত ঘা,

মরা মানুষের সহরতলী!
প্রশান্ত মহাসাগর পার হয়ে অন্ধকারে লুকিয়ে
তুমি কি সমুদ্রতীরে এসে বাসা বেঁধে ছিলে?
ছুঁয়েছিলে নিষ্পাপ সদ্যোজাত শিশুকে,
প্রস্ফুটিত গোলাপ কোরকটিকে
ক্লেদাক্ত লবণাক্ত পাপস্পর্শে?
দেখেছিলে তাকিয়ে আঁকাবাঁকা
গলিঘুঁজির পথ?
দেখেছিলে ভিখারিণী মেয়েকে
কাঁপতে কাঁপতে জানু উত্তোলন করে
চরম হতাশার দিকে
বোবা চোখে চেয়ে থাক্‌তে?
যে হতাশার পরপারে আর
চোখের জল কি ঘৃণার কোন অস্তিত্ব নেই?)

জী দোস্ত্‌,
আমি সেপুলভেডা,
পেশায় মুচি,
তালকাহুয়ানোর বড়ো বন্দরের
পেছনেই আমার আস্তানা।
আপনার হুকুমের চাকর,
ফরমাইয়ে দোস্ত,
গরীবের দরওয়াজা জান্‌বেন হরওখ্‌ত্‌ খোলা ॥

অনুবাদ : মণীশ ঘটক

আন্দ্রমিদ

জর্জ সেফেরিজ

আমার বুকের মধ্যে সেই ঘা-টা আবার মুখ খুলবে
যখন নক্ষত্রগুলো অস্ত যাবে, বিদ্ধ হবে আমার শরীরে
যখন নৈঃশব্দ্য নামবে মানুষের পায়ের পেছনে।

এই পাথরগুলো ডুবে যাচ্ছে সময়ের মধ্যে, ওরা আর কতদূর
টেনে নামাবে আমাকে?
সমুদ্র, সমুদ্র, কে শুকোতে পারে এই সমুদ্রকে?
রোজ ভোরে বাজপাখী আর শকুনগুলোকে হাতছানি দেয় হাত, আমি দেখি;
আমি বাঁধা এই পাহাড়ে—আমার যন্ত্রণার আত্মীয় যে।
আমি দেখি এই গাছগুলো যাদের নিঃশ্বাসে মৃতের কালো প্রশান্তি,
দেখি, পাথরের মূর্তির মুখাবয়বে অতিস্থির হাসি॥

অনুবাদ : মৃগাঙ্ক রায়

সুরমার রাজ্যে আমার বিমূঢ় স্বেচ্ছাচার

আর্নস্ট ডাউসন

কাল রাতে গতকাল রাতে আহা তার ও আমার অধরোষ্ঠ সন্নিধানে
ছায়া এসে পড়েছিল তোমার, সুরমা! তোমারই নিঃশ্বাস
আমার মগ্নতামধ্যে ঝরেছিল, মদ্যে ও চুম্বনে:
এবং প্রাচীন এক রক্তের সংরাগে আমি আর্ত ও নির্জন
হয়েছি নিঃসঙ্গ ঢের অবসন্ন আনত-সম্ভাষ:
আমি তো ছিলাম নিষ্ঠ নিরন্তর, সুরমা, স্বকীয় প্রণয়নে।

সারারাত বক্ষলীন অনুভবে স্পন্দিত যে আতপ্ত হৃদয়,
আমার বাহুর ঘন আলিঙ্গন অঙ্গীকারে প্রেমে ও নিদ্রায়
জড়িত শায়িত তার চুম্বন রক্তিম মুখে মধুর নিশ্চয়;
অথচ প্রাচীন এক রক্তের সংরাগে আমি আর্ত ও নির্জন
হয়েছি, জেগেছি যেই দেখেছি প্রভাতী আলো বিলগ্ন ধূলায়:
আমি তো ছিলাম নিষ্ঠ নিরন্তর, সুরমা, স্বকীয় প্রণয়নে।

অনেক ভুলেছি আমি, সুরমা, বাতাসে গেছি ভেসে,
ছুঁড়েছি গোলাপ কত, মত্ততায়, কলরোলে ফেনাবর্তময়,
হায়রে নৃত্যের ঘূর্ণী, বিস্মৃতির আবরণ, তোমার রভসে
অপচিত ম্লান পদ্ম জানি, তবু আর্ত ও নির্জন
হয়েছি প্রাচীন এক রক্তরাগে সারাক্ষণ, নৃত্যে নৃত্যে সুদীর্ঘ সময়;
আমি তো ছিলাম নিষ্ঠ নিরন্তর, সুরমা, স্বকীয় প্রণয়নে।

আকণ্ঠ চিৎকারে তৃষ্ণা: মত্ততর সুর আর সুতীব্র সুরার,
অথচ উৎসব যেই অবসিত বাতিদানে একে একে শিখা নিভে যায়,
তখন যে ছায়া পড়ে, সুরমা, তোমার ছায়া, এ-রাত্রি তোমার;
এবং প্রাচীন এক রঙের সংরাগে আর্ত, আর্ত ও নির্জন
আমি, আমি তৃষ্ণাদীর্ণ আমার বাসনারক্ত অধরতৃষ্ণায়:
আমি তো ছিলাম নিষ্ঠ নিরন্তর, সুরমা, স্বকীয় প্রণয়নে।

অনুবাদক: **নিখিলকুমার নন্দী**

আধুনিক সাহিত্য

মনকে চোখ ঠেরে লাভ নেই, স্বীকার ক'রে নেওয়া ভালো, বাংলাদেশ শেষ হয়ে আসছে। যে-জীবনদর্শনের রাজনৈতিক অভিব্যক্তিতে ব্যক্তিগত আস্থা রাখি, তারও সঙ্গে এ-বিষয়ে বিষণ্ণ মনের আড়াতাড়ি হ'তে বাধ্য, আপাতত চারিদিকে তাকিয়ে কোনোরকম আশার দ্যোতনাই অনুভব করতে পারছি না। সব-কিছুই ধ্বসছে, নয়তো ম্লানতায় শরীর ঢাকছে : কুশ্রীতা, হীনবৃত্তি, বিবেককে-ঢেকে-রেখে অনৃতভাষণের আস্ফালন, যারা অপেক্ষাকৃত সৎ তাদের মধ্যেও কী উচ্ছ্বসিত মৃত্যুকেলি। এবং সমস্ত ছাপিয়ে এক ভয়ংকর হিংস্র কূপমণ্ডূকতা। লক্ষণগুলি স্পষ্ট : বাংলাদেশ শেষ হয়ে আসছে, যে-রুপোলি শস্যের ঝিলিমিলি বাংলা সংস্কৃতি নামে খ্যাত হয়ে এসেছে, তা, পশ্চিমবাংলায় বিশেষ ক'রে, এবার মিলিয়ে যাবে। এখনো এটা বিশ্বাস করি সামাজিক-অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে গিয়ে এই প্রান্তের মানুষ নতুন-কোনো সাযুজ্যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছবে, হয়তো কুড়ি বছর বাদে, নয়তো তিরিশ বছর বাদে : কিন্তু তা হবে অন্য-এক সভ্যতা, যার স্বরূপ বর্তমান মুহূর্তে নির্ভুল অঙ্ক ক'ষে বলা মুশ্কিল। তবে রবীন্দ্রনাথের গান কিংবা জীবনানন্দর কাব্য দিয়ে গাঁথা যে-বাংলার মনোলীন আকাশ, তা প্রায় অবলুপ্ত। যে-হট্টগোলের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, যে-নোংরামির ক্লেদে উত্যক্ত-অবসন্ন হয়ে আছি, প'চে-যাওয়া মৃত্তিকার সাক্ষ্যবহন করছে তারা। খেদই বা করা কেন, আমাদের এটা বিসর্জনের রাত্রি : নিরাসক্ত চিত্তে, বর্তমান সত্তার উত্তরণ সম্বন্ধে মোহ ঘুচিয়ে ফেলে ভবিষ্যতের সম্ভাব্য উজ্জ্বলতার জন্য অপেক্ষা ক'রে থাকাই হয়তো ভালো।

স্বভাবতই, আমাদের সাহিত্যও প্রায় বিগত। সাহিত্যের দুই নির্ভর : এক, চিন্তার-কল্পনার থরোথরো ঘোড়সওয়ারবৃত্তি, দুই, ব্যবহার্য ভাষা সম্পর্কে অনুরাগউচ্ছল প্রেম, যা বিরংসার চেয়ে ঢের বড়ো। এই দুইয়ের সমন্বয় না-ঘটলে সাহিত্য ব্যর্থ, কবিতা অপারগ। কোনো দুঃসাহসী কল্পনার বিদ্যুচ্চমকই গেলো দশ বছরে বাংলার আকাশে ঝলসে গেছে ব'লে মনে হয় না : আয়োজন-আড়ম্বরের অভাব হয়নি, কিন্তু প্রতিভাকে বাদ দিয়ে কতদূর আর এগোনো যায়, এবং প্রতিভার দীপ্তি আপাতত বাংলাদেশে শেষ হয়ে এসেছে। বাংলা ভাষার প্রতি ভালোবাসা, তা-ও প্রায় নেই বললেই চলে : অন্যথা অন্তত শুদ্ধ-পরিশীলিত-বিনম্র অধ্যবসায়ের অভাব হতো না। প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে, নয়তো বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, সম্প্রতি যে-ধারার ভাষাচর্চা চলছে, তা প'ড়ে সন্দেহ হয়, যাঁরা লিখছেন, তাঁদের প্রাণে কোনোদিন প্রেমের ছোঁওয়া লাগেনি, তাঁদের উদ্দেশ্য ব্যভিচার। (অবশ্য টীকা যোগ করতে হয়, বিচারের মান নিম্নগামী, সেজন্যই যে-কেউ কল্কেও পাচ্ছেন, রচনা যতই নিকৃষ্ট হোক না কেন। এ এক পরস্পরাবদ্ধ সম্পর্ক : সমালোচক সমাজের রুচি তথা চিৎপ্রকর্ষের প্রতীক, অথচ তিনি একা ইতিহাসের পথ-চলাকে রুখে দাঁড়াতে অক্ষম, অন্যপক্ষে তিনিও ধাপে-ধাপে অবরোহণ করেন।)

শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে-সম্পাদিত "একালের কবিতা" সংকলনগ্রন্থে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের একটি অপরূপ কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে, নিচে সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি :

রাত্রিকে কোনোদিন মনে হতো সমুদ্রের মতো;
আজ সেই রাত্রি নেই।
হয়তো এখনো কারো হৃদয়ের কাছে আছে সে রাত্রির মানে;
আমার সে-মন নেই
যে-মন সমুদ্র হতে জানে।

একবার ঝরে গেলে মন
সেই ঝরাফুল আর কুড়োবার নেই অবসর;
তখন প্রখর সূর্য জীবনের মুখের উপর—
তখন রাত্রির ছায়া জীবনের স্নায়ুর উপর-
জীবন তখন শুধু পৃথিবীর আহ্নিক-জীবন॥

অবসরের অভাব ব'লে নয়, প্রকৃতির-ও-ঘটনার নিয়মেই ঝ'রে-যাওয়া মন আমরা আর কুড়িয়ে পেতে পারি না। অথচ আত্মহত্যাও যেহেতু প্রকৃতিবহির্ভূত, সমুদ্র-থেকে-নির্বাসিত সত্তা নিয়ে তাই আহ্নিক-নিয়মে টি'কে থাকতে হয়। কয়েক হাজার বছর বাদে পৃথিবী হয়তো অন্য-কোনো ধূমকেতু-বা-গ্রহ-বা-নক্ষত্রের চাপে পিষ্ট হবে, নতুন-কোনো প্রতিভাতে বিকিরিত হবে : কিন্তু ততদিন পর্যন্ত সানুনাসিকতার ক্লান্তি।

আমার বিবেচনায় বাংলাদেশ, এবং সাহিত্য, ও কাব্য, আপাতত এই পর্যায়ে। এবং সেজন্যই বিষ্ণু দে আমাকে এতটা বিস্মিত করেন। শ্রদ্ধা যেখানে পেঁছিনো কর্তব্য সেখানে শ্রদ্ধা পেঁছে দিয়ে আমরা নিজেরাই কৃত-কৃতার্থ হই। অন্য প্রবীণ কবিরা বহুদিন স্তব্ধ, এখনো-প্রবীণ-নন এমন অনেকে সৃষ্টিনিরাসক্ত : অথচ বিষ্ণুবাবুর কাব্যপ্রবাহ গেলো চার দশকে অনবচ্ছিন্ন থেকে গেছে। "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত", যা তাঁর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ, পুনর্মার্জিত শৈশবকবিতার সংকলন নয়, গ্রন্থিত কবিতাগুলির সব-ক'টিই ১৯৫৫ থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে রচিত। একশোরও বেশি কবিতা এই বইতে স্থান পেয়েছে, এবং, ধ'রেই নেওয়া যায়, উল্লিখিত সময়ে বিষ্ণুবাবু আরো অনেক কবিতা লিখেছেন যা "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে" আপাতত উহ্য।

সময় নিরানন্দ, আকাশ নিরবয়ব, তবু কী সেই ধৃতি যা চল্লিশ বছরের পরেও কবিত্বকে নিরুদাম হ'তে দেয় না? বিষ্ণু দে-র কারুকুশলতা বরাবর লোকের মনে চমক জাগিয়েছে, কিন্তু তা তো ভাবধর্মের পাশে তুলনায় নিকৃষ্ট, অনেক ক্ষেত্রে তাঁর কবিতা প্রাকরণিক প্রাখর্য দ্বারা ব্যাহতই হয়েছে। আমার মনে হয় যা তাঁর কাব্যকে বাঁচিয়ে রেখেছে তা তাঁর আশ্চর্য প্রেম, মমতাবোধ, আস্তিকতা। প্রেমের আধার একসঙ্গে তিনটি বিষয় : জীবন, জনতা, নদীমাতৃক বাংলাদেশ। বিষ্ণুবাবু ইতিহাসবোধে বিশ্বাস করেন, এবং সেজন্যই হয়তো অতীতে, পুরাণে, এমনকি রূপকথায় পর্যন্ত, সত্তার অন্বেষণ করেন, সেই সঙ্গে এটাও মানেন যে যে-সত্তা আপাতত ধূল্যবলুণ্ঠিত, প্রায়-পরিচয়হীন, তারও একদিন বিবাহলগ্ন আসবে। যিনি ভবিষ্যৎ মানেন, তিনিই আস্তিক, তিনিই প্রেমিক : বিষ্ণুবাবু খণ্ডিত-চূর্ণিত বাংলাদেশের ভূমিতে অবস্থান ক'রেও তাই নির্দ্বিধা বিশ্বাসে বলতে পারেন :

ক্ষোভ শুধু অপলাপ; আর নয়,
পাশে নয়, আকাশে তাকাও; স্নান করো;

ডুব দাও বজ্রে ও বিদ্যুতে,
আষাঢ়ের আমন-বৃষ্টিতে,
বীজকম্প্র শ্রাবণধারায়, কার্তিকের কুয়াশায় নবান্ন ভূষায়
মাঠে মাঠে, এখানে ওখানে, জেলায় জেলায়, দেহমনে,
সারাদেশে, যেখানে হারায় বিপাশার অশ্রুজল
কপিল গঙ্গার আলোনা নয়নে,
মুমূর্ষুর রূপনারায়ণে,
প্রাথমিক সত্তার ঊষায়॥

('আকাশে তাকাও', পৃষ্ঠা ১৩)

বিষ্ণুবাবুর কাব্যসাধনার মধ্যপর্যায় থেকে একটি লক্ষণ স্পষ্ট হচ্ছিল : তাঁর আধারে চতুরালি, প্রাকরণিক শৌখিনতা, ঠমক, অথচ তাঁর বক্তব্যে সরলতা, লোকনিষ্ঠা, ভক্তিবাদ। অনেক সময় এমন হয়েছে আধারের বাঁধার জন্য কবিতাতে কথকতার উপলগতি ব্যাহত হয়েছে, মাত্রাবৃত্তের চপলতায় কিংবা ভিলানেলের পোশাকি বাহারে তাঁর ভক্তিবিনতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়েছে। সৌভাগ্যত, বিষ্ণুবাবু এই উচ্চাবচতা সম্বন্ধে দ্রুত অবহিত হয়েছিলেন, মিল-বিহীন প্রবহমান পংক্তির বিস্তারে দ্বন্দ্বের নিরসন আবিষ্কার করেছিলেন। "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে" সে-রকম উজ্জ্বল পংক্তিযোজনার দৃষ্টান্ত প্রচুর। প্রবহমানতার দক্ষতর ব্যবহার বাংলা কাব্যে খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়, যা নিচের উদ্ধৃতিতে ভাবী সমাজের গৌরবগাথার কাহিনীবুননে নিয়োজিত হয়েছে :

ক্লান্তিতে কিসের ভয়?
ক্লান্ত হব দিনের কিনারে,
কলঘরের কাজ সেরে তুরপুন র‍্যাঁদার কিংবা তাঁতের
মিহি, মোটা হাতের সন্তোষ
সম্পূর্ণ দিনের ক্লান্তি।
ধ্যান আর বাস্তবের খেয়াপারাপারে
সম্মিলিত এক দলে
আদিগন্ত মাঠে ট্রাকটরের দীর্ঘ অভিসারে
মাটির যেমন ক্লান্তি আসন্ন ফসলে
সেই ক্লান্তি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত মহাশয়! ....
ক্লান্তিতে কিসের ভয়? মহাশয় এই ক্লান্তি নয়,
ভভঘুরে সমাজের বেকসুর গ্রামশহরের ক্লান্তি বড়ো ক্লান্তিকর :
জ্ঞানে ও বাস্তবে এক বিন্যস্ত জীবনে কর্মে ক্লান্তি নেই, আমরা সবাই ওরে ভাই
চাই সেই ক্লান্ত অবসর।

('স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ', পৃষ্ঠা ৫-৬)

নৈপুণ্যের অভাব ঘটলে আর-একটু হ'লেই যা রাজনৈতিক গলাবাজিতে দাঁড়াতো, আবেগ এবং বিন্যাসের সম-অধিষ্ঠানে তা আশ্চর্যনির্মল জীবনদর্শনের রূপ নিয়েছে।

'জ্ঞানে ও বাস্তবে এক বিন্যস্ত জীবন'-ই হলো বিষ্ণুবাবুর কবিকর্মের লক্ষ্য, নামকবিতাটি বাদ দিলেও অন্যত্র আরো অনেক কবিতায় তার অণুরণন, যেমন 'আকাশে তাকাও', 'আমিও তো', এরা ও ওরা,' 'পল রোবসন,' 'ভাষা,' 'আলেখ্য,' 'সুচিত্রা মিত্রের গান

শুনে', 'গ্রাম্য কবিতা' প্রভৃতিতে। বিষ্ণুবাবু লঘু পক্ষের কবিতা এখনো লিখছেন, সামাজিক ব্যঙ্গের ছটা বুলোনো কবিতা, তাঁর ছন্দ যেখানে শাণিত, ধারালো উক্তিতে কৌতুকের উচ্ছ্বাস, যেমন :

বেশ মনে আছে, সে দিনটা ছিল মোলায়েম,
রোদের নীলায় ছায়া ফেলেছিল শতমেঘ
মৃদু মল্লার, জর্দাফুলের কুঞ্জে
রাগ করেছিল অনেক নিকষ ভোমরা,
কথার অভাবে আমি গেলুম না সঙ্গে
যখন বাগানে দল বেঁধে গেলে তোমরা।

('যে কথা', পৃষ্ঠা ২৯)

কিন্তু বয়সের ঢল নেমেছে, অপরাহ্নের প্রসন্নতা, সুতরাং "চোরাবালি"-র কবি ঠিক যেখানে থেমে যেতেন "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে"র কবির পক্ষে তা প্রকৃতিবহির্ভূত, এখন বরঞ্চ এক মনোরম আত্মসমর্পণ :

বেশ মনে আছে, তোমার মধ্যবয়সে
আজ বলা যায় দীর্ঘ চেনার রঙ্গে
যে কথা সেদিন বলতে পারিনি রভসে।
সূর্যাস্তের শান্ত শুদ্ধ সাহসে
আসন্ন রাত করবে কি আজ মোলায়েম?

তরুণরা কুপিত হবেন, কিন্তু বাংলাদেশে কবিতার ঋতু, প্রায়ই মনে হয়, হয়তো আর শিগ্‌গির ফেরবার নয় : জীবনানন্দর ঘোর-লাগা আকুলিবিকুলি প্রচুর চোখে পড়ে, কিন্তু জীবনানন্দ-প্রতিম হৃদয়তা নেই তাতে, থাকা সম্ভবও নয়। আর যা চোখে পড়ে তা অনেকের সমস্বর স্বগত সংলাপ, যার আকৃতির আবেগ স্পষ্ট, কিন্তু এখন পর্যন্ত যার কোনো অবয়ব নেই। যা আদৌ চোখে পড়ে না তা কোনো প্রেমের বা প্রত্যয়ের বা জীবনবোধের উচ্ছল চীৎকার : কবিতার ধারা শান্ত হয়ে এসেছে, কবিতা টুকরো-টুকরো হয়ে গেছে, আধমিনিটের জন্য হয়তো কোনো কবিতাকে পছন্দ করা যায়, কিন্তু গেলো দশ বছরের অধিকাংশ কবিতাই জীবন থেকে অবচ্ছিন্ন, দেশ-এবং-জনতা থেকে স'রে-যাওয়া নিরালম্ব বস্তু, যাতে এমনকি কোনো নারীর শরীরের উন্মাদনাসঞ্জাত আবেগ পর্যন্ত নেই, প্রেমের কবিতা পর্যন্ত অর্ধস্ফুট সন্তাপ।

এই অবস্থায়, প্রারম্ভের উক্তিতে ফিরছি, আমার মনে আপাতত বিশেষ আশা নেই, এবং সেজন্যই প্রবীণের নিষ্ঠা আমাকে মুগ্ধ করে। "স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যতে" পুনরুক্তি, অতিকথন, বাস্পবিন্যাস অনুপস্থিত নয়, কিন্তু এসমস্তই এই মুহূর্তে উপেক্ষণযোগ্য ব'লে মনে হয়, কারণ বিষ্ণুবাবুর মহত্ত্ব তাঁর জীবনবোধের অবৈকল্যে। আজ থেকে দশ বছর আগে হয়তো তাঁর আবেগের প্রকাশ আরো অনেক স্রোতস্বতী ছিল, কিন্তু সেজন্য আক্ষেপ করবো না, নাস্তিক আমি, গৌরববোধ করবো এই ভেবে যে বিষ্ণুবাবু এখনো কবিতা লিখছেন, আরো লিখবেন, যে কবিতা আদর্শের প্রতিভূ, এবং প্রেমবোধে আপ্লুত-উদ্দীপ্ত।

এখানেই বক্তব্য সাঙ্গ করতে পারলে খুশি হতাম, কিন্তু বিষ্ণুবাবু-সম্পাদিত "একালের কবিতা" সংকলনগ্রন্থটির প্রসঙ্গে ফিরতে হচ্ছে। সংকলনটি আমাকে অত্যন্ত হতাশ করেছে। ইতিপূর্বে যাঁরা আধুনিক বাংলা কাব্যের সংকলনগ্রন্থ সম্পাদনা করেছেন, যেমন

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, আবু সয়ীদ আইয়ুব এবং বুদ্ধদেব বসু, আশা করেছিলাম তাঁদের সংজ্ঞা এবং বিচার পেরিয়ে বিষ্ণুবাবুর কাছ থেকে কিছু-কিছু নতুন সংজ্ঞার নির্দেশ পাবো। বাছাই-করা যেহেতু এক-হিশেবে সুসতর্ক সমালোচনা, এবং যেহেতু বিষ্ণুবাবু স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে সম্পাদনাকাজে হাত দিয়েছিলেন, ধ'রে নিয়েছিলাম আধুনিক বাংলা কবিতার বিবর্তন ও গতিরূপ সম্বন্ধে তাঁর কিছু আলাদা ক'রে বলবার আছে। সংকলনটি হাতে নিয়ে আবিষ্কার করলাম নিতান্তই থোড়-বড়ি-খাড়া : এবংবিধ সংকলনগ্রন্থে যাঁদের-যাঁদের কবিতা দেখতে আমরা অভ্যস্ত, তাঁরাই আছেন, এবং তাঁদের বাইরে বিশেষ-কেউ নতুন নেই। একমাত্র বলা চলা বিষ্ণুবাবু প্রমথ চৌধুরী ও অবনীন্দ্রনাথকে রবীন্দ্র-সত্যেন্দ্র দত্তর মধ্যবর্তী পরিসরে ঢুকিয়েছেন, তাছাড়া, তরুণতর অনেকের কবিতা স্থান পেয়েছে নিছক এই কারণে যে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৩ সালে; এঁদের কবিতা পূর্বেকার কয়েকটি সংকলনে ছিল না নেহাৎই তাঁরা তখনো লেখা শুরু করেননি, ব'লেই। কোনো বিশেষ কবির বিশেষ-বিশেষ কবিতা বাছাইয়ের মধ্যেও তেমন-কোনো দর্শনচিন্তার সাক্ষ্য পেলাম না : আমি-আপনি-যে কেউই হয়তো সে-কবির এই কবিতাগুলিই নির্বাচন করতাম, অর্থাৎ অধিকাংশ কবিতাই বড়ো-বেশি পরিচিত, সুতরাং যে-কোনো মামুলি সংকলনগ্রন্থে স্থান পাবার উপযোগী।

যেহেতু কবি-, এবং কবিতা-, বাছাইয়ে কোনো বৈশিষ্ট্য খুঁজে পেলাম না, অতএব বিশেষ আগ্রহ নিয়ে বিষ্ণুবাবুর লেখা মুখবন্ধটি পড়তে গেলাম। কিন্তু তা-ও ভীষণভাবে হতাশ করলো। কাব্যের যে-কোনো প্রকৃতির ছন্দে বিষ্ণুবাবুর যেমন অবলীলা-অধিকার, বাংলা গদ্যে তাঁর সেই পরিমাণ অস্বাচ্ছন্দ্য। আধুনিকতার সংজ্ঞা নিয়ে তিনি যে-আলোচনা করেছেন, তা তাই যথেষ্ট কসরৎ ক'রে উদ্ধার করতে হয় এবং অনেক কণ্ডূয়নের পরে যা বোধগম্য হয় তা মিলিয়ে দেখা যায় বিষ্ণুবাবু আধুনিকতার যে-টীকা পরিবেষণ করছেন ('যে স্তরে কবি আর ব্যক্তিসত্তার নির্বিশেষ আকৃতির নিরালম্ব প্রকাশ দিয়েই ক্ষান্ত থাকতে পারেননি, প্রয়াসী হয়েছেন প্রকাশকে বাঁধতে বিশেষের আততিতে, রূপের বা কাব্যশরীরের সজ্ঞান নির্দিষ্টতায়' সেখান থেকে আধুনিকতার শুরু), তা এতই অবিশেষ যে পরিশ্রম পণ্ডশ্রম ব'লে ঠেকে। (যে-কবি তাঁর কাব্যে অমন প্রবাহউচ্ছল, তাঁর গদ্য কেন এমন বিকলাঙ্গ তা নিয়ে হয়তো কোনো মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণা সম্ভব। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করছি, এই বাক্যবন্ধনীম্বয়ের অর্থ আমার অনুমানের বাইরে : 'রবীন্দ্রনাথের চোদ্দ পনেরো বছরের কবিতা থেকেই সচরাচর বাংলা কাব্যে আধুনিক পর্ব নির্দিষ্ট। অথচ যেহেতু প্রমথ চৌধুরী অবনীন্দ্রনাথ বা সত্যেন্দ্রনাথ রবীন্দ্রনাথের অনুজ তাই তাঁদের কবিতাও যদিচ পূর্ববর্তী, তবু স্মরণীয় মনে হয়েছে।') তাছাড়া, এক-হিশেবে এই সত্তরের দশকে একালের কবিতার সংজ্ঞানিরূপণের উৎসাহটিই অবাস্তব, অযৌক্তিক, বিশেষ ক'রে বিষ্ণুবাবুর পক্ষে।

সুতরাং শেষ পর্যন্ত আমি স্বস্তির সন্ধান করবো বিষ্ণুবাবুর কাব্যবিচারে নয়, তাঁর তত্ত্বপ্রেমে নয়, সন্ধান করবো তাঁর নিজের কাব্যে, তাঁর কাব্যে যে-শান্ত নিশ্চিত অকুণ্ঠিত প্রেম, তাতে। এই প্রেম দুর্মর, অনড়, তাই নমস্য :

> সে কবে গেয়েছি আমি তোমার কীর্তনে
> কৃতার্থ দোহার।
> পদাবলী ধুয়ে গেছে অনেক শ্রাবণে:
> স্মৃতি আছে তার।

রৌদ্রে-জলে সেই স্মৃতি মরে না, আয়ু যে
দুরন্ত লোহার।
শুধু লেগে আছে মনে ব্যথার স্নায়ুতে
মরুচের বাহার॥

('সে কবে'—"স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত", পৃষ্ঠা ১২)

অশোক মিত্র

স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যত—বিষ্ণু দে। সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১। মূল্য পাঁচ টাকা।

একালের কবিতা—বিষ্ণু দে সম্পাদিত। সম্বোধি পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড। কলিকাতা ১। মূল্য ছয় টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা (সুলভ সংস্করণ); আট টাকা (শোভন সংস্করণ)।

সমালোচনা

যে কোনো নিঃশ্বাসে—সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত। বসু চৌধুরী। কলিকাতা ৯। মূল্য দুই টাকা।
কণ্ঠে পারিপার্শ্বিকের মালা—করুণাসিন্ধু দে। গ্রন্থ-জগৎ। কলিকাতা ১২। মূল্য ২·০০
অলীক চতুর্ভুজ—দেবতোষ বসু। ক্লারিয়ন। কলিকাতা ১২। মূল্য দুই টাকা।
ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি—তুষার চট্টোপাধ্যায়। কবিপত্র প্রকাশ ভবন। কলিকাতা ২৬।
এক আকাশ অনেক তারা—লতীফা হিলালী। স্টুডেন্ট ওয়েজ। ঢাকা। মূল্য দুই টাকা।
বাংলা কবিতা—শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত। চতুর্থ পর্যায়। কলিকাতা ১৪। মূল্য চার টাকা।

পাঁচজন কবির পাঁচখানি কবিতা-সংগ্রহ, এবং তরুণদলের সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার একটি সুমুদ্রিত সংকলন—একসঙ্গে অনেকগুলি কবিতা হাতে পাওয়া পাঠকের পক্ষে ভরসার না হোক্ সুখের কথা। ভরসা করবার জোর পাওয়া সম্ভব নয়, কারণ, কবিতার জোরে দেশের অদৃষ্ট আলোর দিকে ফিরবে, এ-আশা একালে দুরাশা; কবিতা একালে চিন্তিত মনের এবং প্রায়-ক্ষেত্রেই বিষণ্ন কবিদের আত্মকথা! স্বদেশী-আমলের দেশাত্মবোধের প্রেরণা,—রজনীকান্ত, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল ইসলামের উদ্দীপনা—এমন কি চল্লিশের দশকের সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির উৎসাহের ভঙ্গি এখন আর 'আধুনিক' নয়। সময় বহতা নদী! অতএব সময়ের পুরোনো স্বাদের জন্যে তৃষ্ণার্ত হয়ে হাহুতাশ করা সংগত নয়। বর্তমানকে বিদ্যমান হিসেবেই দেখতে হবে।

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'সংসার সংলাপে' লিখেছেন—'আমার দর্শন ভাঙে দুর্গের বিক্ষোভ সবিরাম।' এবং এই অতি-সন্নিহিত আধুনিক কালের দৃশ্য ফুটেছে তাঁর 'ফলশ্রুতি'তে :

> আমরা ক'জন বন্ধু পরস্পর ঈর্ষা, শ্লেষ এবং শ্রদ্ধায়
> প্রধান বিষাদ নিয়ে সম্মিলিত হতে আসি আসক্তিখানায়।
> কার বুকে খনি আছে, কার স্পর্ধা কোনো একদিন
> দাঁড়াবে পর্বতপ্রান্তে চোখে নিয়ে আকাশ বিশাল
> জানে নি, জানেনা কেউ...তৃষ্ণা শুধু, তৃষ্ণা বাড়ছে, ঢালো
> আরো কিছু দাহ এ-গেলাসে।
> গারো কিছু দাহ এ-গেলাসে।

'যে-কোনো নিঃশ্বাসে' এই রিক্ততারই নানা তরঙ্গ। মৃত্যু, অভাব, আর্তনাদ, শ্মশান, ভাসান, প্রয়াণ ইত্যাদি শব্দের সংকেত এখানকার বিশেষ আয়োজন। তারই মধ্যে 'বোধন' নামে কবিতা আছে,—'দেখাবো' নামে অঙ্গীকার আছে,—'শিল্পীর স্পর্শ' নামে যথার্থ শিল্প-সত্যেরও ইঙ্গিত আছে। সে-কটি লাইন স্মরণযোগ্য :

> তুমি যাকে স্পর্শ করো সে-পাথর শব্দ হয়ে ওঠে
> কোণার্কে, সাগরতীরে, খাজুরাহো কিংবা অজন্তায়
> যত দৃশ্য বর্ণে গন্ধে নয়নাভিরাম হয়ে ফোটে

তোমার প্রাণের পুণ্য দুঃখের অচির মৃগয়ায়
সময়কে বেঁধে রাখে কালজয়ী মহিমার রূপে;

তিনি ঠিকই বলেছেন—

চতুর্দিকে শিল্প আছে। যদি বুকে তৃষ্ণা রাখা যায়,
জন্ম, মৃত্যু, ভালবাসা ফুটে থাকবে পাশের বাগানে,
শুধু তুমি একবার, একবার দুর্লভ দীক্ষায়
তাকে স্পর্শ করে বলো, 'প্রেম সব সমাধান জানে।'

কিন্তু সমস্যা এইখানেই। এবং এ-সমস্যা একালের অতিজনতারই সমস্যা, বোধ হয়। 'অভিজ্ঞান' কবিতাটিতে শ্রীযুক্ত সেনগুপ্ত পুনরপি পুরাতন এবং চিরন্তন সত্যই প্রকাশ করেছেন—'ভালবাসা তুমি চিরদিনের নিরুদ্দেশ সোনার হরিণ'!

এই রোমান্টিক অনুসন্ধান এবং বিষাদ এবং বাস্তব বাধা-বিপত্তির অনুভূতিই আজকের অপেক্ষাকৃত সুস্থ কবিরা উপযুক্ত শব্দে-ছন্দে-চিত্রকল্পে তাঁদের সাধ্যানুসারে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করছেন। তারই মধ্যে অপেক্ষাকৃত অসুস্থ বা স্বল্পদর্শী কবিদের কলমে ভঙ্গির বাড়াবাড়ি দেখা দিচ্ছে। হয় অতিরিক্ত দেহরাগ থেকে কতকটা ব্যাধির ভঙ্গি বা মুদ্রাদোষ, —নয়তো দুর্বোধ্যতা,—নয়তো উগ্র উপেক্ষাই মুখর হয়ে উঠছে! 'যে-কোনো নিঃশ্বাসে' সেদিক থেকে অনেকটা মুক্ত, অনেক সুস্থ যে, তাতে সন্দেহ নেই। অবশ্য, দু'একটি ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ অস্পষ্টতা যে ঘটেনি, তাও বলা যায় না, যেমন 'ভূমিকা' কবিতাটির নাম করা যায়। কিন্তু এ-দুর্বলতা তাঁর একলার নয়; একে দুর্বলতা বলতেই হয়; তবে ব্যক্তিগত নয়, এখনকার যুগলক্ষণ এই অস্পষ্টতা! এতৎসত্ত্বেও তিনি লিখেছেন—'সুস্থ হওয়া আজ বড় প্রয়োজন ছিল' ['কবির স্মৃতিফলকে'], যদিচ তা কোনো একটি সুস্পষ্ট এবং দীর্ঘস্থায়ী সিদ্ধান্ত হিসেবে নয়,—আত্মকথার আলোআঁধারির মধ্যেই এইরকম খণ্ড খণ্ড সুস্পষ্টতা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে গেছে।

শ্রীযুক্ত করুণাসিন্ধু দে সে-তুলনায় আরো অস্ফুটভাষী। তাঁর ভাষা-প্রস্তুতি এখনো প্রথম সন্ধানের স্তরে,—সূচনাপর্বের ঘাত-প্রতিঘাতে চিহ্নিত। অনেক ক্ষেত্রেই তিনি বিশেষ বিশেষ সুরের টানে কথা সাজিয়ে যেতে অভ্যস্ত; কবিমনের যে তীক্ষ্ণতার গুণে অভিপ্রায় স্পষ্ট হতে চায় কথায়,—কথার মর্মার্থ স্পষ্ট হয়ে ওঠে এক-একটি পংক্তিতে, স্তবকে এবং সম্পূর্ণ রচনার শরীরে,—করুণাসিন্ধুর স্পর্শকাতর মন এখনো কবিচেতনার সেরকম পূর্ণ সক্রিয়তায় পেঁছোয়নি। 'ভ্রিওলেটগুচ্ছ' থেকে তারই উদাহরণ হিসেবে কয়েকটি লাইন দেখা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন—

আমি যেন এক খেয়া পারাপার মাঝি
ঘাটে বসে থাকি বাদামে ফলাতে সোনা।
নৌকাশূন্য, কেউ হয়না রাজী...
আমি যেন এক খেয়া পারাপার মাঝি।
অথচ হৃদয় স্বপ্ন সুতোয় বোনা,
যাত্রী জোটে না, কড়িও যায় না গোণা;
আমি যেন এক খেয়াপারাপার মাঝি
ঘাটে বসে থাকি বাদামে ফলাতে সোনা।

এ-আত্মকথায় 'বাদাম' ব্যাপারটি তুচ্ছ এবং নিরর্থক। নৌকাশূন্য,—কেউ তো হয়না

রাজী,—হৃদয় স্বপ্ন সুতোয় বোনা,—যাত্রী জোটে না—ইত্যাদি সংকেতগুলির মধ্যে হঠাৎ 'বাদাম' এসে পড়েছে! বাদামের বদলে তিন-মাত্রার অন্য কিছুও হতে পারতো। তাতেও সুর বজায় থাকতো।

এই সুরেলা ভাবটুকুই তাঁর ব্যক্তিত্ব! এখনো ততোধিক কিছু পাওয়া যাচ্ছে না; এবং এই ক'লাইনের শূন্যতাবোধই মাঝে মাঝে অন্যান্য রচনায় অন্যান্য কথার সাহায্যে ব্যক্ত হয়েছে, যেমন 'অধুনা নিজেকে ভয়' লেখাটিতে তিনি জানিয়েছেন—

অধুনা, নিজেকে ভয়; স্বরূপে শঙ্কিত হয়ে উঠি।
মৃতমর্মে কৃতপাপ, অনুশোচনার শুষ্ক তাপে
অনার্দ্র, মাগে না ক্ষমা।

আগেকার আমলের গুরুচণ্ডালী-ভেদবুদ্ধি এখন আর চলছে না, চলবার নয়, সে-কথা ঠিকই। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শব্দের জাতিভেদের অনুভূতিবেদ্য অন্য দিকটিও ধর্তব্য। 'অনার্দ্র' শব্দের পরেই 'মাগে না ক্ষমা'-র 'মাগে' ক্রিয়াপদটি সেই অনুভূতির কষ্টিতে অসংগত বলে চেনা যায়। আর 'মৃতমর্মে কৃতপাপ,' উচ্চারিত ধ্বনির রম্যতা মাত্র! ও-কথার মানে কি? মরা মনে অতীতের পাপের অনুশোচনার দাহ আছে, সিক্ততা নেই, ক্ষমাপ্রার্থনা নেই—এই তো বক্তব্য। কিন্তু 'মৃতমর্মে কৃতপাপ,' এই কমা-চিহ্নিত ধ্বনিগুচ্ছ অসংগত স্বাতন্ত্র্যের দাবি নিয়ে উপস্থিত। করুণাসিন্ধুর কবিত্বের সম্ভাবনা আছে বলেই এসব কথা তাঁকে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি। তাঁর আরো মনোযোগী হওয়া দরকার। কবিতার সাধনায় অনেক 'মার' দেখা দিয়ে থাকে। সুর, শব্দ, প্রচারস্পৃহা ইত্যাদি বিষয়ে সম্পৃক্ত নানা মার-কে তাড়িয়ে, তবে ধ্যান শুদ্ধ হয়। তাঁর 'দুই দাবিদার'-এর শেষ লাইনে 'আলোক গিলেছে মাটি, অন্ধকার গিলেছে সন্তান' এইরকম আর-এক অনর্থের উদাহরণ। পৃথক একটি লাইন হিসেবে এ-উক্তিতে আকর্ষণ আছে, কিন্তু রচনাটির সামগ্রিক অন্বয়ে এ-লাইন সুসমর্থিত নয়। মানে অস্পষ্ট। এসব সত্ত্বেও তাঁর কোনো কোনো শব্দ-ব্যবহারে সম্ভবনাময় কবিত্বের ইশারা আছে। 'নক্তান্ধ ইচ্ছার জালে' [প্রতিবেশী শব্দ, ধ্বনি], 'অনবয়ব চাওয়া' [মালিনী] ইত্যাদি তারই উদাহরণ। তবু, তিনি এখনো যতো শব্দ-সন্ধানী, ততো শব্দশিল্পী নন; তাঁর যতিচিহ্নের ব্যবহারেও অনুভূতির নিশ্চিত প্রমাণের অভাব। আরো চর্চা দরকার। চর্চার পথেই তিনি তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছোবেন বলে বিশ্বাস করি।

শ্রীযুক্ত দেবতোষ বসুর "অলীক চতুর্ভুজ" গ্রন্থনামটিই প্রথম বিস্ময়কর বিজ্ঞপ্তি! সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নামে বইখানি উৎসর্গ করা হয়েছে। শব্দ-ব্যবহারের এই নবীন কবির রুচিগত অভিমুখিতার সেও অন্যতম ইঙ্গিত। নাম-কবিতাটিতে তাঁরও আত্মকথা শূন্যতা-বাচক—

প্রাসিদ্ধ স্মৃতির দেশে সুসংগত এখানে প্রস্থান।
দ্বারে মূর্ত অতনু মরণ।
একাকী ঘূর্ণিত বিশ্ব, কক্ষপথে আমি ধাবমান
সহযাত্রী শুধু মৃত মন।

এ-বইয়ের শাশ্বত, জল খেলা সাঙ্গ হলে, শিলালিপি, স্মৃতি, মৃত্যু, ইত্যাদিতে একালের বিষাদ, ব্যঙ্গ, বার্ধক্যেরই প্রতিধ্বনি! কিন্তু সবটাই মৃত্যু-সংবাদ নয়। 'মৃত্যু' কবিতারই শেষ লাইনে তিনি বলেছেন—'বুঝি এ সম্বন্ধ বিশ্বে সার কথা পুনরু-

জ্জীবন।' ছন্দের তীক্ষ্ণ বা মসৃণ বা চাতুর্যময় আবেদন সৃষ্টির দিকে একালে সব কবিই অল্পবিস্তর আগ্রহী এবং সমর্থও। দেবতোষও সেই সাধারণ প্রবণতার ব্যতিক্রম নন। বার্ধক্যের সঙ্গে ছন্দ-সচেতনা, শূন্যতাবোধের সঙ্গে শব্দ-সামঞ্জস্য ও শব্দ-আবিষ্কারের ঝোঁকে একালের নবীন কবিমানসের বিশেষত্ব বললে অন্যায় হয় না। দেবতোষের এই স্মরণীয় হাহাকারই তার দৃষ্টান্ত—

একথা স্বীকার্য বটে, লীলাক্রমে সমস্তই মায়া।
পারবশ্য স্বল্পস্থায়ী। প্রেম, প্রীতি শুধু উপচ্ছায়া।
যতই বয়স বাড়ে, নিয়মের রাজত্বে অতি দ্রুত
অমঙ্গলসূচক চিহ্ন দেখা দেয় প্রত্যহ প্রভূত।
অথচ সবাই চায় দোর্দণ্ডপ্রতাপ বাড়িগাড়ি
ভদ্রমহিলার সঙ্গ, চরিত্র বাঁচিয়ে ব্যবসাদারী।
বোঝে না সহসা কেন মাটি কাঁপে, স্বায়ত্তগরিমা
দ্রুত অপসৃয়মান। রমণীর কটাক্ষ, ভঙ্গিমা
কিছুই রাখে না বেঁধে ব্যস্ত ধ্বনিপ্রধান পৃথিবী
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন, যৌবন, উইঢিবি
পঞ্চাশোর্ধ্বে বনবাস, অনন্তর মেলে না স্বমতে।

ফলত প্রস্তুত আমি সর্বদাই চিতাভস্ম হতে।

['একটি বিচ্ছিন্ন সংলাপ']

শ্রীযুক্ত তুষার চট্টোপাধ্যায়ের মর্জি অন্যরকম। "ধ্বনি থেকে প্রতিধ্বনি" বইখানির তেতাল্লিশটি কবিতার নানা লাইনে 'মরণ', 'সর্বনাশ', 'পাপ', দুঃখ', 'অবক্ষয়' ইত্যাদি শব্দ আছে বটে, কিন্তু তাঁর 'পঞ্চাশে পার্শ্বস্থ কবিবন্ধুদের' উদ্দেশে উৎসর্গ-করা এই কবিতাগুলির অনেক ছত্রে অন্য স্বাদও স্পষ্ট; যেমন—'মধুপুরে কোজাগরী', 'কে যেন হাওয়ায়', 'উন্মেষের উপমা', 'স্বদেশ' ইত্যাদিতে। আকাশ, সমুদ্র ইত্যাদি রূপ ও রূপকের দিকে তাঁর আগ্রহ আন্তরিক এবং পৌনঃপুনিক। কোনো কোনো ছত্রের পুনরাবৃত্তির দিকে তাঁর বিশেষ ঝোঁকও এই কবিতাগুচ্ছে প্রকাশিত; যেমন 'বিস্মৃত স্মৃতি'তে 'সাজাল সন্ধ্যার সময় যৌবনে' এবং 'নিভৃত অঞ্জলি তিমির তর্পণে' লাইন দুটি আবর্তিত হতে হতে ভাবের ঢেউটিকেও ব্যক্ত করেছে, সেইসঙ্গে ছন্দ-বন্ধনেও কৌশলের উদাহরণ হয়ে উঠেছে। 'দূরে দাঁড়িয়ে দ্বিধা নখ খুঁটছে মুখে',—'ফুলদানিতে কিছু কৃতার্থ ফুল',—'গৃহপালিত আকাশ', —'অমনোনীত অন্ধকার' ইত্যাদি ভাবনার শব্দ-রূপ নিঃসন্দেহে তাঁর নিজস্ব কবিচেতনারই অভিব্যক্তি। বইখানির নাম-কবিতা থেকেই এই চারটি নমুনা স্মরণ করা গেল। এরকম আরো আছে। 'দুই বিকল্প' দুটি ঢেউয়ের সুন্দর সমাবেশ। এসব ক্ষেত্রে তাঁর আশা, সুখ, ঔৎসুক্য এবং বিস্ময়ের পরিচয় সংশয়াতীত। ছন্দের সচ্ছন্দতাও ঠিক সাধারণ নয়, বরং ততোধিক।

নানা রঙের অন্ধকারে ঝড় ঝাপটা জল
ঢেউ উঠছে ঢেউ ভাঙছে বাঁচার কোলাহল॥

'দুই বিকল্পে'র দ্বিতীয় তরঙ্গের এই শেষ দুটি লাইনেই তুষারের আত্মপরিচয় নিহিত। তিনি চিরকালের মানবজীবন-জলস্রোতের এই কোলাহল যে একালের নৈরাশ্যের

মধ্যেও অনুভব করেছেন, পাঠকের পক্ষে সেটা সত্যিই ভারি উপভোগ্য অভিজ্ঞতা।

"এক আকাশ অনেক তারা" বত্রিশটি কবিতার সংগ্রহ। পূর্ব-পাকিস্তানেও কবি-মানসের আধুনিক বেদনাভারই প্রধান কথা। লতীফা হিলালী 'পাথির পৃথিবী' কবিতাটির সূচনাতেই লিখেছেন—

যদিও আমরা এই পৃথিবীর অখ্যাত গলির অধিবাসী :
বেদনার অন্ধকার মুছে ফেলে তবু রোজ জেগে উঠি, হাসি।

'করুণ জলের রেখা', 'ধূসর বালুর স্তূপ', 'পাষাণ প্রাচীর রুদ্ধ করেছে পাথির মত প্রাণ' ইত্যাদি সংকেতের মধ্য দিয়ে তাঁর যে বেদনা অনুভূতিতে ধরা দেয়, সেটা কৈশোরক যন্ত্রণা বলে মনে হয়। প্রকৃতির দৃশ্যসুখ তাঁর অন্যতম সুখ। 'মেঘ-বিকেল', 'চৈত্র রাতের চাঁদ', 'বৃষ্টি, পরদা, হাওয়া' ইত্যাদিতে একদিকে এই রূপানুরাগ, অন্যদিকে 'ভুখা'-বোধও আছে, যেমন শেষোক্ত রচনার এই লাইনগুলিতে—

'চোখ ঝলসানো পণ্য সাজানো মহানগরীর পথ—
বাইরে রাত্রি। দোকানের কাঁচে বিদ্যুত্ত-ঝলা দিন
ভুখা জনতার লোভাতুর চোখ হীরার মতই জ্বলে
বিষণ্ণ মুখ।'......ইত্যাদি

শ্রীযুক্ত শান্তি লাহিড়ী নিজে কবিতা লেখেন এবং "বাংলা কবিতা" নামে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-প্রেরিত এক সংকলনমালা সম্পাদনায় তিনি যে এগিয়ে এসেছেন, সে খুবই সুখের কথা। প্রকাশককে ধন্যবাদ। বইখানির বহিরঙ্গে কোনো ত্রুটি নেই। কিন্তু সম্পাদনা এক গুরু দায়িত্ব।

এসব কাজে মাত্র একজন নির্বাচকের রুচি অনুসারে বোধ হয় সব সময়ে এগুনো যায় না। আজকাল বাংলাদেশে কবিদের সংখ্যা কম নয়, তাঁদের মধ্যে পৃথক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন স্রষ্টাও যে খুব বেশি আছেন, তা নয়। সে-ক্ষেত্রে সংকলনে যথার্থ প্রতিনিধিত্বের লক্ষণগুলি তুলে ধরা শক্ত কাজ। সেজন্যে ধৈর্য চাই, সতর্কতা চাই, পাঁচজনের পরামর্শ শুনে নিজের মতামত স্থির করাটাও দরকার।

এই কবিতাগুলির কথা ভাবতে ভাবতে একটি ছবি মনে এলো। গুহার মধ্যে একদল বন্দী মানুষ। তারা আলোর দিকে পিঠ ফিরিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছে। তাদের সামনে উঁচু দেয়াল। দেয়ালে ছায়ার মিছিল। সেখানে কতো লোকজন, কতো হাতিঘোড়ার ছায়া জাগছে, হারাচ্ছে। বন্দীরা শুধু ছায়াই দেখছে, ছায়াই দেখবে! কারণ, আলোর দিকে চোখ ফেরাবার স্বাধীনতা নেই তাদের।

প্লেটোর রূপক এটি। এই রূপকের সাহায্যে তিনি মানুষের জ্ঞানের সংকীর্ণতার ইশারা দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, সত্য আমাদের ইন্দ্রিয়ের অতীত। সত্যকে আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়বোধের ছায়া-জগতে কিঞ্চিৎ মাত্র দেখছি। সে দেখা খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ,—অতএব মূলত সে-অভিজ্ঞতা অলীক বললেই বা দোষ হবে কেন? কবির বোধও এ-অর্থে বিভ্রম মাত্র! কিন্তু সে-কথা অবান্তর। কাব্যের সত্য মনন, সত্য ভঙ্গি, যথার্থ যুগচেতনার কথাই ধর্তব্য।

এ শুধু একালের এই কবিদের রচনা-প্রসঙ্গেই নয়, সাধারণভাবে কবিদের কাব্যরচনার কথা ভাবতে ভাবতে ক্ষণিকের জন্যে এই রূপকটি মনে এলো। বলা বাহুল্য, এ কেবল

আনুষঙ্গিক স্মৃতি। কবিরা পাঠককে যা দিতে পারেন, তা আর যাই হোক্, 'সত্য' নয়। হয়তো কেবলি ইন্দ্রিয়বোধ,—কখনো ততোধিক ইঙ্গিত। তার বেশি কিছু পেতে হলে অন্য পথে পা বাড়াতে হবে। সে-পথ কবিতার পথ নয়। কিন্তু আলোচ্য পর্বের বাংলা কবিতায় মানব-জীবনসত্যের সেই ইন্দ্রিয়জ বিচ্ছুরণের যথার্থ প্রতিনিধিত্বের জন্যেই একখানি সংকলনের প্রয়োজনীয়তা। এইটুকুই স্বীকার্য।

বাংলাদেশে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী কবিদের কাব্যচর্চা কীভাবে, কোন্ পথে এগিয়েছে, সে-বিষয়ে নানা পত্র-পত্রিকায় নানা আলোচনা হয়েছে। কিন্তু আরো সামগ্রিক পরিচিতির জন্যেই উপযুক্ত প্রচারের চেষ্টায় শ্রীযুক্ত শান্তি লাহিড়ী এই সংকলন সম্পাদনা করেছেন। কিন্তু কেবল এইকথাই তাঁর প্রয়াসের পূর্ণ-পরিচয় নয়। তিনি সম্পূর্ণ বাংলা কাব্যের ধারাবাহিক সংকলন প্রকাশে উদ্যোগী। নিজের পরিকল্পনার কথা-প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—চর্যাপদ থেকে শুরু করে রামায়ণ-মহাভারতের বাংলা কবিতা, পদাবলী সাহিত্যের মাধুর্য, 'মঙ্গলকাব্যের লীলারসমাধুরী' ইত্যাদি তাঁর এই পরিকল্পনার প্রথম পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত; পলাশীর যুদ্ধ থেকে শুরু করে 'প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত' দ্বিতীয় পর্যায়ের; দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী কাব্যধারা তৃতীয়ের; এবং চতুর্থের কথা আগেই বলা হয়েছে—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান থেকে সন্নিহিত বর্তমান অবধি! এ যে খুবই উচ্চাকাঙ্ক্ষার চিহ্ন, তাতে সন্দেহ নাই।

একালের নবীনদলের বিভিন্ন গোষ্ঠী, আদর্শ, মতবাদ, পত্রিকা-পরিচিতি ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি পরবর্তী সংস্করণের ভূমিকায় উল্লিখিত হওয়া দরকার। আলোকরঞ্জন দাশ-গুপ্তের মতন যথার্থ ভাবুক, সতর্ক, পরিশ্রমী কবির বা শঙ্খ ঘোষ বা সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বা তারাপদ রায় বা শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের পৃথক পৃথক প্রশংসনীয় সন্ধানের দিকগুলি পাঠককে দেখিয়ে দেবার আয়োজন,—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের নাটকীয়তা আর কোনো-কোনো মাত্রাতিরেক,—সুনীলকুমার নন্দীর সূক্ষ্ম বোধ আর সুকুমার ভঙ্গি,—সুনীল বসুর রূপ-চিত্রণ বা চিত্রকল্পের ঐশ্বর্য এ-সংকলনে পুরোপুরি না হলেও অনেকাংশেই দৃষ্টিগোচর। কিন্তু পুরোপুরি কোনো-এক পর্বের সমস্ত লক্ষণ কোনো সংকলনেই বোধ হয় সাজিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়। শান্তিবাবু অনেক পরিশ্রমে অনেক কাজ এগিয়ে দিয়েছেন। 'ঘাসের কুশনে নীল জোনাকির পিন, মখমলে—ঢাকা ঘুম স্বপ্ন-মেঘ, ঝরে মুহূর্তের শাদা খৈ'— সুনীল বসুর 'একটি রাত্রির নক্সা'র এই দুটি লাইন যাঁরা লক্ষ্য করবেন, তাঁরা আমাদের এই কবিতার দেশে এই সাম্প্রতিকতম নৈরাশ্য, নৈরাজ্য, ধিক্কারের মধ্যেও ছবি আঁকবার, সুর সাধবার ঐকান্তিক আন্তরিকতা দেখে খুশি হবেন। আবার, এরই বিপরীত নজির হোলো সিদ্ধেশ্বর সেনের 'পৌত্তলিক'। স্বৈরিণীকে 'চোদ্দসিকে' খরচ করে ভালোবাসার নৈরাশ্য সেখানে যেন বিদ্রূপে ঢাকা বিষাদের জয়স্তম্ভ! প্রেম, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদি গভীর অনু-ভূতির ব্যাপারে বর্তমান কালের এই বিশ্বাস-অবিশ্বাস দুইই এ-সংকলনে উপস্থিত। তবে, অন্য দু'একটি কথাও বিবেচ্য। আনন্দ বাগচীকে আমি অলোকরঞ্জনের মতোই বিশেষ সমাদরণীয় মনে করি। 'কার্তিক রজনী পিনকুশনের মত নিবিড় নক্ষত্র জেবলে রেখে যন্ত্রণা পোহায়'—এ-গ্রন্থে প্রকাশিত তাঁর 'স্মৃতি'র এই উপমার মতন অজস্র সাদৃশ্য-উপলব্ধির নমুনা তো বটেই, তা ছাড়া তাঁর মগ্নতা এবং শিল্পিসুলভ স্থৈর্যের দিকও স্মরণীয়। তাঁর জন্যে আর একটু জায়গা থাকলে ভালো হোতো। শান্তিবাবু অবশ্য ভূমিকায় বলেছেন যে —'কবিতার আসল মানদণ্ড কী আমার জানা নেই।...আমার ব্যক্তিগত রুচি এবং কাব্যবোধ

যে কোন একজন পাঠকের রুচি এবং বোধের প্রায় কাছাকাছি থাকতে পারে সেদিকে বিশেষ যত্ন নিয়েছি এটুকু বলতে পারি।' তাঁর আন্তরিকতায় সন্দেহের কথা অবান্তর। সকলেই আছেন বটে, কিন্তু এঁদের বিশেষত্বের প্রতিনিধি যোগ্যতর রচনা হয়তো কেবলমাত্র সমবয়স্ক কয়েকজনের বা মোটামুটি একই সময়ের একজন নির্বাচকের রুচি ধরে নির্বাচন করা দুঃসাধ্য দায়িত্ব। কিছু কিছু বিস্মৃতি ঘটাও তো স্বাভাবিক। মৃত্যুঞ্জয় মাইতি, দুর্গাদাস সরকার এ-সংকলনের ছিয়াত্তরজন কবির সঙ্গেই গণ্য হলে মোট সংখ্যা না-হয় আটাত্তর হোতো। না-হয় আরো দু'একজন থাকতেন। এঁরা এ-খণ্ডে বাদ পড়লেন কেন? এসব কথা পাঠকের পরামর্শ হিসেবেই গ্রাহ্য।

হরপ্রসাদ মিত্র

Penguin Modern Poets. 1, 2 & 3. Penguin Books. London. 2*s*. 6*d*. each.

অজানার জয়ঘোষণা তো দূরের কথা, অতি পরিচিত দুয়ারটুকুও পার হতে সংশয় জাগে আমাদের, অন্তত পশ্চিমী কবিদের। দু দুটো বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহ পরিণতিতে আমরা যেখানে এসে দাঁড়িয়েছি সেখানে সন্দেহ, অবিশ্বাস, হতাশা, দৈন্য, গ্লানি, ব্যর্থতা, আদিম প্রবৃত্তির স্বচ্ছন্দ পদচারণা। শেলি ব্রাউনিঙ বা এ দেশের বৈষ্ণব কবিদের বা রবীন্দ্রনাথের প্রেমের আদর্শ আজ প্রত্নপ্রস্তুর মতো গবেষণার বিষয়ীভূত। তদ্গতচিত্ত প্রেমিক আজ নির্বোধেরই নামান্তর, প্রেমে পতন ছাড়া যে কিছু নেই সে কথা আর কেউ না হন, অন্তত পিটার পোর্টারের নায়ক জানেন। আর-দশজন স্বাভাবিক যুবকের মতো সে নায়ক একদিন একুশ বসন্তের তন্বীর প্রণয়ে সংরক্ত হলো, কিন্তু পিতামাতার সাংসারিক বিচক্ষণতায় সুরাভিজ্ঞ সম্পদ্শালী আইনজীবীর ভিড়ে হারিয়ে যায় তার প্রেয়সী। আর সেই সঙ্গে হারিয়ে যায় হতাশ প্রেমিক, পরিণামে যে যুবক

. . . sits alone in Libraries, hideous and hairy of soul,
A beast again, waiting for a lustful kiss to bring
Back his human smell, the taste of woman on his tongue (No 2, p. 88)

নিঃসঙ্গতা, শুধু নিঃসঙ্গতাই, বোধ করি এ কালের সঙ্গী। ইতিহাসের নানা সড়ক বেয়ে মানবতা যেখানে এসে পৌঁছেছে, সেখানে বড়ই হতাশা। যে-পরিবেশে আমরা বেঁচে আছি, মাঝে-মধ্যে ইচ্ছা করে প্রাণ খুলে কেঁদে লঘুভার হতে। সেই মনোভাবই পোর্টারের :

Wishing to cry as freely as they who died
In the Age of Faith (ঐ, p. 100)

কি আছে আমাদের?

We have our loneliness
And our regret with which to build an eschatology (ঐ)

বিষণ্ণতা, হতাশা, নিঃসঙ্গতা, অবিশ্বাস একদিনেই মানুষের উপর অধিকার বিস্তার করে না। দিনের-পর-দিন যে-মানুষ পৃথিবীতে অসাধুতা, প্রবঞ্চনা, কুশ্রীতা প্রত্যক্ষ করে, পরিণামে তার মানবিক মূল্যবোধ কতখানি অক্ষুণ্ণ বা অবশিষ্ট থাকে? সাংসারিকভাবে

প্রচণ্ড সফল লোকের সাফল্যের গোপন তত্ত্ব কি? কিংসলি অ্যামিস রূঢ়ভাবেই সে প্রশ্ন-তুলেছেন। এবং সে প্রশ্নের যে-উত্তর পেয়েছেন, সে কথা কবিতার ভাষায় ব্যক্ত হলেও আসলে তা সমাজতত্ত্বেরই এক্তিয়ারভুক্ত। অ্যামিসের মতে, আমাদেরই ব্যর্থ পরাজয়ের ভিত্তিতে সাফল্যধন্য সেই ব্যক্তির সমুচ্চ উত্থান। সেই ধরনের সফল ব্যক্তির গৌরবের পশ্চাতে বস্তুত

Our own nasty defeats, nastier victories (ঐ, p. 17).

যাদের অশ্রু ও দীর্ঘশ্বাসের বিনিময়ে কিছু সংখ্যক লোক কৃতী পুরুষ বলে সম্মানিত, সেই সব হতভাগ্যের কেউ যদি পৃথিবীকে মায়ের সার্বিক রূপে না দেখে দুশ্চরিত্রা কুলটা রূপে কল্পনা করেন তবে তাঁকে খুব বেশি দোষ দেওয়া যায় না। এবং এই ধরনের পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত প্রতীকে পরিবর্তমান চিন্তারই প্রতিফলন দীপ্যমান। পৃথিবীর বিরুদ্ধে আর. এস. টমাসের প্রচণ্ড ক্ষোভ, কঠোর নিন্দা, কারণ পৃথিবী কবিকে তার দাস বানিয়েছে :

She dragged me down,
Slurring my gait first, then my speech.
I never loved her, there's no ring
Binding us; but it's too late now.
I am branded upon the brow
With muck, as though I were her slave.
My clothes stink, where she has pressed
Her body to me, the lewd bawd,
Gravid as an old sow, but clawed. (No. 1, p. 109).

আর-একজন কবি—এলিজাবেথ জেনিংস—এই পৃথিবীর একটি শহরের গল্প শুনিয়েছেন। সেই শহরে একদিন রাত্রে আকস্মিক ও ত্বরিতভাবে শত্রুরা প্রবেশ করে। পরের দিন সকালে শহরটি দেখা দিল একটি haunted place রূপে যেখানে

Man meeting man speak cautiously. Old friends
Close up the candid looks upon their face.
There is no warmth in hands accepting hands;
ইত্যাদি (ঐ p. 53)

এই শহর কি প্রতীক-শহর? গভীরভাবে দেখলে উপরিউদ্ধৃত পংক্তি তিনটি আধুনিক মানুষের জীবনে অনেকখানি সত্য নয় কি?

তবু পৃথিবী সভ্যতার পথে অগ্রসরমান। অনস্বীকার্য পৃথিবীর প্রগতি। সেই প্রগতির চেহারা ও তাৎপর্য মার্টিন বেলের একটি কবিতায়, সেনাবাহিনীর যাত্রা, বাস, দৈনন্দিনের প্রতীকে! এই সৈন্যরা can't pass exams, কিন্তু get feet under the table. এবং Every else can get...Progress we call it. তাই By—The—Right—Quick—MARCH. (No. 3, p. 78).

সৈন্যদলের অনুষঙ্গে মনে পড়ে জর্জ বার্কারের রচনা। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সংবাদ দিতে গিয়ে বার্কার বলেন :

In the first year of the last disgrace
Peace, turning her face away,

Coughing in fire and laurels, weeping
Bared again her butchered heart
To the sunrise axe of her day. (ঐ, p. 26).

এইসব বিভিন্ন উদ্ধৃতি-কীর্ণ উপরের আলোচনা থেকে একটি জিনিস মনে হবে: সমালোচ্য তিনটি সংকলন-গ্রন্থের কবিদের অভিজ্ঞতার সাধর্ম্য। এঁরা সকলেই পশ্চিমী কবি এবং 'আধুনিক' শব্দটিকে এড়িয়ে বলা যায় 'সাম্প্রতিক' বা 'একালের' কবি। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের দুর্যোগ এঁদের বাসভূমির উপর দিয়ে বয়ে গেছে; হতাশা ক্লান্তি বিষাদ পশ্চিমের কাব্যে তাই স্বভাবী ঘটনা। তাই চার্লস কজলির তরুণ নায়ক ম্যালোনি যখন সরাসরিভাবেই বলে You don't need talent বা Life's a game (No. 3, p. 118) তখন বোঝা যায় মানবিক মূল্যবোধের ক্ষেত্রে পশ্চিমী জগৎ কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে, অগ্রজের অটল বিশ্বাস আজ কতখানি দূরে সরে দাঁড়িয়েছে।

আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, তবু আনন্দ তবুও মানবতা বেঁচে থাকে। এবং এই মহাসত্য এত হতাশার মধ্যে আজও সৃষ্টিতে পরিকীর্ণ। দেশ-কালকে অতিক্রম করে এই সহজ চিরকালীন সত্য মানবজন্মের ঘরে বারবার ফিরে আসে বলেই আজও পৃথিবীতে ফুল ফোটে, গান জাগে, কবিতা লেখা হয়। দ্বিতীয় সংকলন-গ্রন্থেই তাই সাক্ষাৎ মেলে এমন একজনের, যাঁর মনে এখনও সবুজ পত্রালির সুবপন প্রবাহিত হয়। এবং সেই কারণেই প্রেমের নিত্য নিঃসংশতায় অক্ষয় গৌরবে তাঁর প্রত্যয় গভীরপ্রসারী। প্রেমিক কবি ডম মোরেস প্রেমের সত্যতা সম্পর্কে অসন্দিগ্ধ:

I wake and found myself in love:
And this one time *I do not doubt* (ঐ, p. 64)

প্রেমের মৃত্যু নেই। সে অনাদি, অনন্ত। তার স্পর্শে মরণশীলও মৃত্যুঞ্জয় হয়ে ওঠে।

...her love at last expressed
Into my arms; and then I cannot die (ঐ, p. 59)

প্রেমেরই অপর নাম জীবন? সমার্থক না হোক, অন্তত জীবনের সার্থক অভিব্যক্তি যে প্রেমে তাতে সন্দেহ কি? সামগ্রিকভাবে সুস্থ সুন্দর জীবনের প্রতি তাই মোরেসের তীব্র অভীপ্সা। এবং এই কারণেই জীবনকে ধ্বংস করবার জন্য যারা সচেষ্ট, তারা যে সর্ববিধ ক্ষমার অযোগ্য, For Dorothy (ঐ, p. 52) কবিতাতে তা সহজ ঋজুতায় স্বতঃস্ফূর্ত।

এই জীবনবোধ একান্তভাবেই ভারতীয়। মানবজমিনে যদি ফসল না ফলে, ভারতীয় তার জন্য অপরের উপর দোষারোপ করে না, সে নিজেই তার অসাফল্যের কারণ খুঁজে নিয়ে বলে তার নিজের মনই কৃষিকাজ জানে না। সেই জন্য এক এক সময় মনে হয় যত দুঃখ-দুর্দশা-লাঞ্ছনাই ঘটুক না কেন, যথার্থ ভারতীয় কখনও পৃথিবীকে আদ্যন্ত পোড়ো জমি বলে কল্পনা করতে পারবে না, পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে কখনও ফাঁপা মানুষ বলে মনে করতে পারবে না। এত কথা বলার কারণ, সদ্য-উল্লিখিত ডম মোরেস জন্মসূত্রে ভারতীয়, যদিচ তাঁর শিক্ষা প্রবাসে। এবং আরও শুনতে পাই ইংরেজি কবিতা লিখে তিনি নাকি ওদেশে ইতিমধ্যেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

নানা অভিজ্ঞতার ঘূর্ণিপাকে জটিল হলেও জেনিংস, টমাস, অ্যামিস প্রমুখ কবিকুল যে জগৎসংসারের প্রতি আদ্যন্ত অপ্রসন্ন বা তাঁদেরও মনে যে আশা ও বিশ্বাসের সুপবন

প্রবাহিত হয় না, তা নয়। এবং মানুষের পক্ষে এইটিই স্বাভাবিক, যে-কারণে জীবনানন্দের লাস-কাটা ঘরের বিষাদাতিক্ত আবহেও গলিত স্থবির ব্যাং আরেকটি প্রভাতের ইশারায় দুই মুহূর্তের ভিক্ষাপ্রার্থী, রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের মাছি উড়ে যায় এবং পরিশেষে থুরথুরে অন্ধ পেঁচা জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য করবার আমন্ত্রণ জানায়।

এই আশাদীপ্ত জীবনবোধের চমৎকার প্রকাশ বার্কারের To My Mother কবিতায়, যে-কবিতায় 'এশিয়ার মতো বৃহৎ' যে মাকে only faith can move, এবং সেই কারণেই কবি বলেন :

So I send
O all my faith, and all my love to tell her
That she will move from mourning into morning. (No. 3., p. 21)

কিংবা ধরা যাক, অ্যামিসের A note on Wyatt (No. 2., p. 21), এই কবিতাটির সমাপ্তি-পংক্তি তো দূরপ্রসারী আশার, অন্যভাবে জীবনবোধেরই, দ্যোতক। প্রতীকিত Wyatt-এর উদ্দেশে কবির উক্তি :

Now, jolly ship, sign on a jolly crew :
God bless you dear, and all who sail in you.

চার্লস কজলির কবিতাতেও জাহাজ আশার প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। এবং এই জাহাজের তিনটি মাস্তুল, কবির চোখে তারা খ্রীস্টের জীবনের তিন-পর্যায়ের রূপক :

Three masts will grow on the green ship
Before she quits the quay,
For Father, Son and Holy Ghost :
Blessed Trinity (No. 3., p. 119)

অধ্যাত্মানুষঙ্গে অন্তর্মুখিনতা বা মগ্নচৈতন্যের আভাস দেখা দিয়েছে কারো কারো কবিতায়। লরেন্স ডুরল যেমন নিদ্রাকে তাৎপর্যময় মনে করে বলেন At the bottom of every soul a spoonful of sleep (No. 1, p. 46) অথবা এলিজাবেথ জেনিংস জানালা দিয়ে অন্ধকার রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এক সময় ভাবেন Something of me is out in the dark landscape.

আলোচ্য সংকলন-তিনটিতে কাব্যপ্রকরণগত উৎকর্ষ, চিত্ররচনার কারুতা, উপমা-উৎপ্রেক্ষার দ্যুতি দুর্লক্ষ্য নয়। যেমন :

Life has now
Contracted like the pupil of an eye
To a slit in space and time for images
(Lawrence Durrel, No. 1, p. 21)

..every season is a kind
Of rich nostalgia. (Elizabeth Jennings, ঐ, p. 51)

I have furnished my heart to be her nest
For even if at dusk she choose to fly

Afterwards she must rest. (Dom Moraes, No. 2, p, 59)

A rush of trumpets, ringing brass and vermilion—
The frescoed nymphs sprawl in a sea of sound
(Martin Bell, No. 3, p. 45)

See the moon her yellow landau
Draws across the fainting sky.
Night the Negro lays his fingers
On the lily-breast of day. (Charles Causley, ঐ, p. 99)

তিনটি সংকলনে মোট ন'জন কবি—লরেন্স ডুর্‌ল, এলিজাবেথ জেনিংস, আর. এস. টমাস, কিংসলি অ্যামিস, ডম মোরেস, পিটার পোর্টার, এবং জর্জ বার্কার, মার্টিন বেল এবং চার্লস কজলি; এবং কবিতার সংখ্যা মোট দু'শ পনেরো। কবিদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই মেজাজের এবং উচ্চারণভঙ্গীর পার্থক্য আছে। ডম মোরেসের সঙ্গে পিটার পোর্টারের বা এলিজাবেথ জিনিংসের সঙ্গে মার্টিন বেলের বা লরেন্স ডুরল-এর সঙ্গে আর. এস. টমাসের কবিচরিত্রের বা কাব্যপ্রকরণগত দূরত্ব নির্ণয় হয়তো দুরূহ নয়। এ'দের সকলেই অল্পবিস্তর খ্যাতির অধিকারী এবং প্রত্যেকেই ভালো কবিতা লেখেন। কিন্তু 'ভালো'র চেয়ে তাৎপর্যময় কোন বিশেষণ এ'দের রচনাবলি সম্পর্কে আরোপ করা যায় না। কাব্যের বহিরঙ্গবিষয়ে এ'দের সচেতনতা লক্ষণীয়, কেউ কেউ কবিতাকে রমণীয় করতে গিয়ে প্রায়-কৃত্রিম মসৃণ মাধুর্যে হারিয়ে গেছেন (প্রমাণ ডম মোরেস)। বিচ্ছিন্নভাবে বর্তমান কবিকুলের রচনায় মনোযোগ আকর্ষণের যোগ্য পংক্তি দীপ্ত হয়ে উঠতে দেখা যায়। কিন্তু সামগ্রিকভাবে কোন কবিতাই চিত্তে স্থায়ী ছাপ রেখে যেতে পারে না (জর্জ বার্কারের To my Mother এদিক থেকে ব্যতিক্রম)। এক এক সময় মনে হয়, হালের বাংলা কবিতার মতো হালের ইংরেজি কবিতাও এক জায়গায় থেমে আছে, যার ফলে গত দশ বছরে মহৎ কোন কবির সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। তবু হতাশা পোষণ করা অসমীচীন। নিরাপদ আশ্রয় ছেড়ে কবি নিশ্চয়ই একদিন দূরপথে যাত্রা করবেন, সূর্যোদয়ের অনুরাগের মতো জীবন আবার আরও বৃহৎ ও রক্তিম আয়তনে কবিতায় বিলসিত হবে, তা সে কবিতা যে দেশেরই হোক না কেন। এই আশাই কবিতার আশ্রয়স্থল।

কল্যাণকুমার দাশগুপ্ত

শুদ্ধ সীমায় যেতে—চিত্ত ঘোষ। নিউ এজ পাবলিশার্স। কলিকাতা ১২। মূল্য দুই টাকা

যে কবির অন্ততঃ একটি কবিতাও পঞ্চাশ বছর পরে সমান না হলেও যথেষ্ট উৎসাহ নিয়ে পড়া যায় এবং পাঠক (সংস্কারগ্রস্ত পাঠকের কথা অগ্রাহ্য) পুরস্কৃত বোধ করেন তিনি ধন্য এবং নিঃসন্দেহে প্রথম শ্রেণীর কবি। সারা পৃথিবী মন্থন ক'রে কবিতার ইতিহাস

পর্যালোচনা করলেও এধরনের কবি সামান্য কয়েকজনই মিলবে। অধিকাংশ কবি জীবিতাবস্থায়ই বর্জিত হন, পাঠকরা এককালে তার কবিতার রসাস্বাদে মুগ্ধ হলেও অচিরাৎ তার কবিতাকে নির্মমভাবে পরিত্যাগ করেন। কেননা, তার কবিতার অন্তঃসার ততদিনে শুষ্ক, রসহীন, আর স্বাদু নয়। তাছাড়া নতুন কবিরা খুব সম্ভবতঃ ভিন্নতর স্বাদের কবিতা এনেছেন ততদিনে। প্রাক্তন কাব্যরুচি অশ্রদ্ধেয় হয়েছে, পাঠকদের মানসিকতা পর্যান্তরে উপনীত হয়েছে।

আধুনিক কবিতাকে প্রায়শঃই আমি এই কালপরিমাপে মাপতে চেষ্টা করেছি। অবশ্য মানুষের মনীষা ভবিষ্যতে কোন্ ধারাশ্রয়ী হবে, তার ভাবনার বর্তমান ভূমি পরিবর্তিত হয়ে কোন্ ভূমিতে স্থাপিত হবে কিছুই জানা সম্ভব নয় বলে সমকালীন কবিতার কাল-পরিমাপের কাজও রীতিমত দুরূহ। তাছাড়া, ভাঁটার টানের মত ভাবনার ক্ষেত্রেও কখনো কখনো গতকালীন টান প্রবল হয়ে অতীতের বিস্মৃত বিষয়কে উদ্ধৃত ক'রে মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। ফলে বিচারের জটিলতা বাড়ে এবং সেই সঙ্গে ভুলের সম্ভাবনা। কিন্তু তবু এই বিচার নিরর্থক নয়। কেননা, এর ফলে হয়ত কবিরা শুধুমাত্র সমকালই নয়, উত্তরকাল সম্বন্ধেও সচেতন হবেন এবং অহেতুক আত্মাভিমান বা দম্ভের বশবর্তী হবেন না—যার নমুনা সাম্প্রতিককালে প্রায়শঃই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে। আর তাছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে এই পরিমাপের অনেকাংশই নির্ভুল বলে প্রমাণিত হবে। যেমন নিঃসন্দেহে বলা যায় যে বর্তমান শতাব্দীর পঞ্চাশের কবিদের কবিতা থেকে শুরু করে সাম্প্রতিককাল পর্যন্ত যত কবিতা লেখা হয়েছে তার সবই অদূর ভবিষ্যতে নিঃশব্দে বিস্মৃত হবে। তার পূর্ববর্তী আধুনিক কবিদের কবিতা সম্বন্ধে অবশ্য তর্কের অবকাশ থাকতে পারে। কালপরিমাপের এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে পারে যে এই স্তূপীকৃত ব্যর্থতা দিয়ে তাহলে কি হবে এবং ছোট বা মাঝারি কবিদের কাব্যরচনা কি অর্থহীন?

দূরদৃষ্টিতে যে-সব কবিতা ব্যর্থ তার সব-কিছুই যে ব্যর্থ এমনও নয়, সুতরাং ছোট বা মাঝারি কবিদের কাব্যরচনাও অর্থহীন নয়। প্রথমতঃ যে-সব কবিতা সমকালের রসনাকে তৃপ্ত করতে পেরেছে তারা আংশিকভাবে সার্থক। দ্বিতীয়তঃ পরবর্তীকালে সে-সব কবিতা অবলুপ্ত হলেও তারা যে ক্রমশঃ অগ্রসরমান কাব্যচিন্তার অন্তর্বর্তী ধাপ ছিল তার গৌরবও অকিঞ্চিৎকর নয়। তৃতীয়তঃ ছন্দ, শব্দব্যবহারপদ্ধতি, কাব্যরচনার ভঙ্গিমা, বিষয়নির্বাচন, ভাবনার আধার নির্ণয় ইত্যাদি বহু বিষয় ভবিষ্যতে নিঃশব্দে উত্তীর্ণ হয় এবং তখনকার কবিতাকে সমৃদ্ধ করে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে সাময়িকভাবে সার্থক কবিতাও রীতিমত শ্রদ্ধেয়, কবিতা হিসেবে তা প্রথম শ্রেণীর না হলেও এবং তার আবেদন চিরকালীন না হলেও।

পঞ্চাশের কবি চিত্ত ঘোষের কবিতাও একালের অন্যান্য কবিদের কবিতার মত স্বল্পায়ু। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে তিনি কি সমকালে সার্থক? যে কবিতা চিরকালীনতা থেকে বঞ্চিত সমকালীন সার্থকতাবিষয়ক বিচারই তার অন্যতম প্রধান বিচার। একালের কবি হিসাবে আমিও চিত্ত ঘোষের সার্থকতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ। চিত্তবাবুর "শুদ্ধ সীমায় যেতে" পড়লে যে বিষয়টি কিছুতেই নজর এড়াবে না সে হচ্ছে তাঁর অকম্পিত যুগচৈতন্য। অবশ্য এমন নয় যে, এ চেতনা একমাত্র চিত্ত ঘোষের কবিতায়ই প্রকাশিত; একথা বলাই বাহুল্য যে একালের বহু কবির কবিতাই এই বিশেষ মানসিকতাদ্বারা চিহ্নিত। চিত্তবাবুর কবিতা এক বিশিষ্ট অনুভবের প্রকাশক যা তাঁর নিজস্ব, সুতরাং তাঁর কবিতা যুগচৈতন্যের

দিক থেকে অন্যান্য কবিদের সঙ্গে সমগোত্রীয় হলেও বিশিষ্ট। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে তাঁর 'হৃদয়ের পাপ', 'এই অন্ধকার', 'দিনের পাথর', 'চিত্রপট', 'তুমি যেন পারো', 'প্রতিবিম্ব', 'শুদ্ধ সীমায় যেতে' প্রভৃতি।

'হৃদয়ের পাপ' কবিতার প্রথম অংশে চৌরঙ্গীর বর্ণনা কলকাতার ক্লেদাক্ত অধিবাসের নিখুঁত এবং বাস্তবনিষ্ঠ চিত্র। এই পরিবেশে সৃষ্ট যে মানুষ তার মন কখনোই শুদ্ধি লাভ করতে পারে না, কবিও পারেন নি। সুতরাং প্রেয়সীকে শুদ্ধ প্রেম উপহার দিতে অপরাগ হয়েছেন তিনি। যা দিয়েছেন, দিতে পেরেছেন তা ভয়াবহ—'তোমাকে পেরেছি দিতে হৃদয়ের সর্বাধিক পরিণত পাপ।' প্রেমের এমন ভয়ংকর উপলব্ধি সাম্প্রতিকালে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। আবার 'তুমি যেন পারো' কবিতায় :

'রাস্তার মুখোশ আলো। পরিণাম জল্পনা, কল্পনা
দুপুরে কলের গান, প্রথম লজ্জার কথা বলব কি বলব না
রেস্তোরাঁ তর্কের স্তূপ : অনুকম্পা, প্রেম না বয়স,
বালুতে গড়ায় জল ফুটো করা চোখের কলস।'

অথবা

'পুরনো পাতাল প্রতিবিম্বিত পলে
পুরনো রাত্রি গলে গলে স্মৃতি, নদী
হেঁটে হেঁটে ক্লান্তিকে পায় বেঁধে,
আমি নির্জন শোকের পাথরে বসি।' ('শুদ্ধ সীমায় যেতে')

এবং তারপর :

'বৃষ্টিতে বিস্ময় মুছে অবিরাম অভ্যাসের বোঝা
ঘুরে ঘুরে কত খুঁজব প্রত্যয়ের পিত্তল দরোজা। ('প্রতিবিম্ব')

এবং তারপর :

'বর্শা হাতে হে পাষাণ প্রদীপ্ত প্রহর
ঘুমন্ত বাঘের নদী পার হতে হবে।' ('এই অন্ধকার')

উপরের উদ্ধৃতি ক'টি পরপর সাজালাম চিত্তবাবুর যুগচৈতন্যের স্তরনির্ণয় করবার জন্যে। শুধু ভাবনাই নয় তার প্রকাশও বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়। উদ্ধৃতি ক'টিতে যে-সব চিত্রকল্প চিত্তবাবু ব্যবহার করেছেন তার সবক'টিই নতুন এবং যথাযোগ্য। 'ফুটো করা চোখের কলস', 'প্রত্যয়ের পিত্তল দরোজা' বা 'ঘুমন্ত বাঘের নদী' নিহিত অর্থের ব্যঞ্জনায় ঐশ্বর্যশালী।

চিত্রকল্প রচনায় চিত্তবাবুর দক্ষতার আরো পরিচয় পাওয়া যাবে তাঁর 'ঘুমিয়ে', 'চিত্রপট', 'বিকেল পেরিয়ে' প্রভৃতি কবিতায়; উদাহরণ দিচ্ছি :

(১) ফুল ঝরে যায় সারাদিন
ছায়া শুয়ে থাকে পা মেলে। ('ঘুমিয়ে')

(২) আহা, মোম জ্বালে সাদা হাত
সারা রাত নিস্তব্ধ। ('ঘুমিয়ে')

(৩) কি নাম, কি নাম যেন, কি কথা কি কথা যেন কার
পালিত পেরেক থেকে নিঃসম্বল-জিভছোলাটার
ঝুলে থাকা। ('চিত্রপট')

(৪) বাইরে শীতের তাঁবু। বাতাসে হিমের সাদা গুঁড়ি
তীক্ষ্ন চোখে চেয়ে থাকে টেবিলের রুটিকাটা ছুরি। ('চিত্রপট')
(৫) অন্ধকারের লম্বা আঙুলগুলো আমাদের গায়ে এসে ঠেকে।
('বিকেল পেরিয়ে')

"শুদ্ধ সীমায় যেতে" চিত্তবাবুর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। তাঁর প্রথম গ্রন্থ "অন্তরা" প্রকাশিত হয়েছিল প্রায় বারো বছর আগে। "অন্তরা"র কবিতায় অনেক দুর্বলতার চিহ্ন ইতঃস্তত ছড়ানো ছিল আর তাছাড়া ছিল জীবনানন্দ দাশের অনায়াসলক্ষ্য প্রভাব। সেখান থেকে চিত্তবাবু অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছেন। এই দুই পর্যায়ের কবিতার মধ্যে মিলের প্রধান বিন্দু দুটি : সমাজচেতনা এবং চিত্রকল্প। চিত্রকল্প রচনায় চিত্তবাবু তখনো এতো দক্ষ হন নি, তার প্রকাশ সংহতিলাভ করে নি, কিন্তু তারা নিঃসন্দেহে বর্তমানেরই পূর্বাভাস। যেমন : 'মেঘগুলো ছেয়ে ফেলে ঢেকে দেয় পৃথিবী/বৃষ্টিরা ছুটে যায় পা ফেলে' বা 'রাত্রির নিষ্ফল চাঁদ দেবদারু গাছ বেয়ে ওঠে।'

মৃগাঙ্ক রায়

Anthology of Modern Poetry. *Edited By* John Wain. Hutchinson. London. 16*s*.

আমি উপন্যাস কম পড়ি, হালের ইংরেজি উপন্যাস আরো কম। কাজেই জন ওয়েইন কী ধরনের উপন্যাস লিখে থাকেন তা আমার জানা নেই। কিন্তু তিনি উপরন্তু কবিও। এবং কবিতা, বিশেষ ক'রে আধুনিক কবিতা, পড়া যেহেতু আমার বাতিক কাজেই হালের এই ঔপন্যাসিক-কবিটি মডার্ন পোইট্রির কী সঙ্কলন ছাপিয়েছেন তা কৌতূহল নিয়ে পড়তে বসেছিলুম। বইটি পড়ে আমার অনেক উপকার এবং জ্ঞানলাভ হয়েছে।

আমি বাংলাদেশের কবিতার হাওয়ায় মানুষ, আধুনিক কবিতা যেখানে ঘটনাচক্রে আমারই সমবয়সী। কৈশোর থেকেই শুনে আসছি, আধুনিক কবিতা নামক বাংলা-সরস্বতীর এই সন্তানটি অতি কুসন্তান, সদ্বংশজাত নয়। বহু কটূক্তি ধিক্কার সহ্য ক'রে তবু সে বেচারা টিঁকে গেল। তার গুণগৌরব চরিত্রলক্ষণ এবং কুলপরিচয় নিয়ে গবেষণা করলে দেশের বয়োজ্যেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইদানীং উপাধী দিতেও সঙ্কোচ করা হয় না। এমন কি সেই কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের ছুতো করে যে-কারো পক্ষেই আজ পুণ্যতোয়া গঙ্গার সমীপবর্তী আকাশে বাণী ছড়িয়ে আসাও সম্ভবপর।

কিন্তু দিন কারো সমান যায় না। বাংলা কবিতারও দিন নাকি বদলাচ্ছে। খুব সম্প্রতি ক্ষীণ একটা দ্বিতীয় দফা জনরব শোনা যাচ্ছে যে চল্লিশ না-পেরোতেই সেই আজন্ম-ধিক্কৃত আধুনিক বাংলা কবিতার ভাতজল বুঝি ঘুচলো। ১৯২৫ সালের আগে জন্মেছেন যে-কবিরা, শুনে রাখুন,—আবিষ্কার করা গেছে যে সুলিখিত পদ্যের অতিরিক্ত কিছুই আসলে আপনাদের দেবার ছিল না। আপনাদের এতে উল্লসিত হওয়াই উচিত, কেননা ছন্দে মিলেই আসল গলদ বলে আপনাদের বিরুদ্ধে এতদিন ধরে জনরব চলে আসছিলো। কিন্তু সে-যাই হোক, ১৯৫০ সালের কাছাকাছি এসে গাঁটের সেই কড়িও বেবাক খরচা হ'য়ে

যাওয়ায় আধুনিক বাংলা কবিতা কাজেই নিরন্ন নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছে। এর পরেই প্রলয়। কিন্তু হতাশ হবার কিছু নেই। প্রলয়ান্তিক নব-মন্বন্তরের নিষ্কলঙ্ক নীলাকাশে অপাপ-বিদ্ধ 'আরো-আধুনিক' বাংলা কাব্যের যে-সব কলি ফেরানো হবে তার খসড়া চক্ষুষ্মান পাঠকগণ এখন থেকেই সংগ্রহ করতে পারেন। রীতিমতো রোমাঞ্চকর উপসংহার এই-গল্পটির।

কিন্তু রোমাঞ্চে বাংলাদেশই অদ্বিতীয় নয় তার প্রমাণ পেলুম জন ওয়েইন্-কৃত সংকলন গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করে। ইনি অবশ্য এমন কোনো চাঞ্চল্যকারী উক্তি করছেন না যে পঞ্চাশ বছরের পুরনো আধুনিক ইংরেজি কবিতাকারদের পক্ষে পদ্য ছাড়া কিছু দেবার ছিলো না। তবু তাঁরও যা-মৌল বক্তব্য তার সঙ্গে হালের বাংলা জনরবের আশ্চর্য সাদৃশ্য দেখে চমৎকৃত বোধ করছি। তিনি বলছেন, কাব্যে আধুনিকতা জিনিসটা আসলে হচ্ছে বিশেষ একটা পদ্ধতি এবং মনোভাবের নাম। এই পদ্ধতি এবং মনোভাবের লক্ষণগুলিকে তিনি পাঠকদের সুবিধার্থে এক-দুই-তিন ক'রে সাজিয়ে দিয়েছেন। যথা : আধুনিক কাব্যের ইংরেজ পিতামহগণ, অর্থাৎ পাউন্ড, এলিয়টরা, ছিলেন মানসিক ভাবে আন্তর্জাতিকতা-সম্পন্ন, কেননা তাঁরা ইংলিশ চ্যানেলের পরপারবর্তী ফরাসী কবিতাকে আবিষ্কার এবং আত্মসাৎ করেছিলেন; তাঁদের কৌতূহল অতীতে অ্যাংলোস্যাক্সান, রেণেসাঁস্ ল্যাটিন প্রভৃতি নির্জনতার দিকেও ধাবিত হয়েছিল; এবং, তৃতীয়তঃ, তাঁরা মুখের ভাষাকে বিম্বান বানিয়ে কবিতার সঙ্গে তার বিয়ে দিয়েছিলেন। কাজেই যে-যে অর্থে কারো পক্ষে 'রোমান্টিক' কিংবা 'অগাস্টান' বলে পরিচিত হওয়া সম্ভব, সেই সেই অর্থে 'আধুনিক' হওয়াও আশ্চর্যের কিছু না। তবে কিনা একদা সাধ্য মিটাফিজিকল্ কবিতার মতোই আধুনিকতার এই ধারাটিও ইদানীং নেহাৎ সেকেলে এবং মামুলী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এবং আজকালের যারা তরুণ কবি তারা অনেকে নাকি এর মধ্যেই নিঃশব্দে 'উত্তর-আধুনিক' কাব্যরচনায় চিত্তসংযম করেছেন।

অনেকে। কিন্তু সম্পাদক তাঁদের নাম ফাঁস করেননি। ধরে নিচ্ছি তাঁদের কেউ কেউ বর্তমান সংকলনেও উপস্থিত। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে, যাঁদের রচনা পঞ্চাশ সালের আগে বেরিয়েছে তাঁদের যেহেতু তিনি আধুনিকতার সংজ্ঞা দিয়েছেন, কাজেই একথাও ধরে নেওয়া যায় যে এই কীর্তিস্থাপন করেছেন সম্পাদকেরই সমকালীন কবিকুল। যে-সব সামান্য গুণে এ'দের কবিতাবলী ভূষিতা তা হচ্ছে এই : 'আধুনিকদের' তুলনায় এ'রা নাকি কবিতার গঠনপারিপাট্যে অধিক মনোযোগী, অর্থাৎ এ'রা ফ্রি-ভর্স লেখেন না, সনেট-ওড্-বা চিরকালীন চেহারার লিরিক লেখেন; এ'দের কবিতা সরবে অর্থাৎ বেতারে কিংবা কবিমেলায় পাঠ করবার উপযোগী; এবং এ'দের সরল সিধে বক্তব্যের মধ্যে আদৌ কোনো ঘোরপ্যাঁচ থাকে না। এ ছাড়াও সম্পাদক আরো একটি মূল্যবান তথ্য এই সূত্রে নিবেদন করেছেন, তিনি নিজে এমন স্পষ্ট ক'রে না বললে অব্যবসায়ীর পক্ষে যা অনুমান করা দুরূহ হোতো। মার্শালপ্ল্যানের দেশ মার্কিনডাঙ্গাতেও যে কবিতা লেখা হয়, জন্ ক্রো র‍্যান্সম্, অ্যালেন টেট্, ওয়ালেস্ স্টিভেন্স, মারিয়ান মুর প্রভৃতি নাম যে কবিতা লিখেই বিখ্যাত তা নাকি ১৯৪৮ সালের আগে ইংরেজ ছোক্রা কবিরা জানতেনই না। অক্সফোর্ডে একদা ডিলান্ টমাস্-এর মুখে আবৃত্তি শুনে, এ'দের হঠাৎ চৈতন্য হোলো যে স্বদেশীয় আধুনিকতার ইস্কুলে নবীনদের কিছুই শেখার নেই, দু-চারটে আদবকায়দা ছাড়া; এবং স্থির ক'রে ফেললেন যে এবার পাঠ নিতে হবে মার্কিন কবিদের দরবারে।

জন ওয়েইন্‌-এর ভূমিকা পড়ে স্পষ্ট বোঝা গেল ইংরেজ ভাষার মাতৃভূমিতে কবিতার বনেদি আসর রুগ্ন বালখিল্যদের বুকডন্‌-বৈঠকের আখড়াতে পরিণত হয়েছে। বিশশতকী কাব্যোৎকর্ষের প্রায় সবটুকুই ভেট্‌ এসেছিল ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের বাইরে থেকে। নির্বাচিত কবিতার সংখ্যাধিক্য থেকে যাঁকে জন ওয়েইন্‌-এর মতেও এ শতকের আধুনিক মহাকবি বলে অনুমান করা যায়, সেই উইলিয়ম বাটলার ইয়েট্‌স্‌ও ছিলেন এরিন্‌-এ ইংরেজ কলোনির প্রজা। আধুনিকতার ধড়াচূড়া না নিয়েও তিনি অগ্রসরদের পুরোভাগে গিয়ে আসন নিতে পেরেছেন। অন্যপক্ষে খাস্‌ আধুনিকতার সূত্রপাত করেছিলেন যাঁরা, সুদীর্ঘ মানসভ্রমণান্তে ক্লোরে-কে যাঁরা অন্বিষ্ট পেনেলোপী ব'লে মেনেছিলেন, তাঁদের কেউ এসে-ছিলেন আইডাহো-র প্রেইরি থেকে, বস্টনের ভাটপাড়া থেকে কেউ। উত্তর-আধুনিকরা খুব আর নতুন কী করলেন? তারাওতো মার্কিনি দেনাতেই সর্বস্ব বিকিয়ে দিতে বসেছেন। তফাৎ এই যে কাব্যের প্রাণবান ধারা প্রবাহিত নেই জ্ঞান ক'রে আধশতাব্দী আগে পাউন্ড-এলিয়ট-রা যে-দেশ ছেড়ে এসেছিলেন, এ'রা ভূগোলের অস্তিত্ব মেনে ঘুরতে ঘুরতে সেই দেশে ফিরেই নিরেট গুরুর সন্ধান পেয়েছেন। মার্কিনি কবিরা এতে বিব্রত বোধ করলে অবাক হব না। তাঁদের অনেকে আবার নামকরা সব বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর।

জন্‌ ওয়েইন-এর বইটি ছোটো। সোয়াশো পৃষ্ঠার কিছু বেশি জুড়ে নাতিদীর্ঘ কবিতার সংকলন। বাকি ষাট পৃষ্ঠায় ভূমিকা, প্রবন্ধ, কৃতজ্ঞতা স্বীকার, ইত্যাদি। ধরা হয়নি এমন ইংরেজ কবিদের মধ্যে রয়েছেন ঈডিথ সিট্‌ওয়েল আর ডে লুইস্‌। এত সোরগোল ক'রে মার্কিনি কবিতা আবিষ্কারের পরেও রবার্ট ফ্রস্ট কেন চোখে পড়লেন না বলা দুষ্কর। তাছাড়া হার্ট ক্রেন্‌, হিলডা ডুলিট্‌ল্‌, এমিলি ডিকিন্‌সন্‌, মারিয়ান মুর, ম্যাক্‌লিশ্‌, কিংবা সম্পাদকেরই সমসাময়িক স্নড্‌গ্রাস্‌, ডিকি, রিচর্ড রাইট্‌, রবার্ট ব্লাই—এ'রাই বা কী দোষ করলেন?

আমার সন্দেহ স্কুলের পাঠ্য ক'রে তোলার অভিপ্রায় নিয়েই মূলত বইটি প্রস্তুত করা হ'য়েছে। এবং সে-হিসেবে এই খেটেখুটে লেখা ভূমিকা আর পরিশিষ্টের প্রবন্ধ দুটি কাজে লাগবে। পরীক্ষক ভজানো প্রশ্নোত্তর রচনা করাই কাব্যপাঠের প্রধান উদ্দেশ্য যাঁদের কাছে নয় তাঁরা বরং এই একটি খাঁটি সমস্যা বইটি থেকে আদায় করতে পারবেন যে আধুনিক কবিতা নামক জিনিসটা সত্যি কাকে বলে? সে কি নিছক একটা পদ্ধতির নাম? তাহলে ইয়েট্‌স্‌-কে কেন এর মধ্যে টানা? তিনি তো কদাচ দান্তের আপন ভাষার মাধুরী কিংবা গ্রীক কি চীনা হরফের কারিকুরি সেলাই ক'রে দেন না তাঁর কবিতার পাৎলুনে? অথচ তিনিও যে আধুনিক তা আধুনিকরাই স্বীকার করেন। আধুনিকতা কি তাহলে কালের মাপে? মেজাজের মাপে? পদ্ধতি গুণে? নাকি ঊনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে শুরু ক'রে, অভূতপূর্ব কোনো চিত্তবিপ্লবের ফলে, কবিতা জিনিসটাই আসলে কী সে-বিষয়ে আমাদের মনোভাব যে বদলে গিয়েছে তারই সঙ্গে চরিত্র মিলিয়ে আধুনিকতা? জন ওয়েইন তার কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা করেননি। হয়তো একদিন শুনতে পাবো রেনেসাঁসের মতোই আধুনিক কবিতা জিনিসটাও ইতিহাসে কখনো ঘটেইনি। টেনিসন্‌ সুইন্‌বর্ন ভিক্তর উগো ছিলেন বলেই না এতো কাণ্ড!

নরেশ গুহ

পঞ্চবিংশতিতম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা

মাঘ-চৈত্র ১৩৭০

ইভান দেনিসোভিচের জীবনের একদিন

আলেকজান্দার সল্‌ঝেৎসিন

ভোর পাঁচটায় বাজল কোতোয়ালিতে ঘুম-ভাঙানোর ঘণ্টা। রোজ যেমন বাজে। টানা লোহার গায় ঢং ঢং করে হাতুড়ি পেটানোর আওয়াজ। জানলায় কাঁচ, কাঁচের গায় দু'আঙুল পুরু বরফ—তার ভেতর দিয়ে চিঁ চিঁ করে এসে হঠাৎ ঝট করে শব্দটা থেমে গেল। সকালটা ছিল কনকনে ঠাণ্ডা। পাহারাঅলা সেপাইয়ের তাই ধরে ধরে ঘণ্টা বাজাবার মত মেজাজ ছিল না।

জানলার বাইরে তখনও ঘুটঘুটে অন্ধকার। মাঝরাতে উঠে টুকরিতে বসতে গিয়ে শুখভ যেমনটি দেখেছিল ঠিক তেমনি। বাইরের হাতায় দুটো হলুদবর্ণ আলো, একটা আলো ক্যাম্পের ভেতরে—চারদিকের মিশকালো অন্ধকারে জানলাটাই যা একটু চিকচিক করছে। অন্যদিন এতক্ষণে লক-আপ খুলে যায়। যারা হাঁড়ির কাজ করে, তারা এসে পড়ে। বাঁকে করে পেচ্ছাপের টিন ওঠানোর ঘটাংঘট্ ঘটাংঘট্ শব্দ হয়। আজ এখনও শুখভ তাদের কারো কোনো সাড়া পেল না।

ভোরের ঘণ্টা বেজে গেছে অথচ শুখভ শুয়ে আছে, এমন কখনও হয় নি। ঘণ্টা শোনামাত্র শুখভ রোজ উঠে পড়ে। ফাইলে দাঁড়াবার আগে সকালে হাতে ঘণ্টা দেড়েক সময় মেলে। এই সময়টা সরকারের নয়—যার যার নিজের। ক্যাম্পের যারা ঝানু লোক, তারা জানে—সকালবেলায় এই সময়টা এটা-ওটা করে রোজই টুকটাক কিছু না কিছু কামানো যায়। ছেঁড়াফাড়া আস্তর কেটে হাতমোজার ওয়াড় বানাও। দলের যারা শাঁসালো লোক, জুতোর গাদা থেকে তাদের ভালেঙ্কিগুলো (হাঁটু অবধি টানা ফেল্টের বুট) যদি হাতের গোড়ায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারো তো তাদের আর বাঙ্ক থেকে নেমে খালি পায়ে লেংচে লেংচে জুতো খুঁজে বেড়াতে হয় না। ভাঁড়ারে গিয়ে ফাইফরমাশ খাটতে পারো, ঘর ঝাঁট দিতে পারো, ঘাড়ে করে এটা-ওটা বয়ে দিয়ে আসতে পারো। নইলে যেতে পারো খাওয়া-দাওয়ার জায়গায়; টেবিল থেকে এঁটো বাটির ডাঁই তুলে বাসন-মাজার জায়গায় পৌঁছে দিয়ে আসতে পারো। পেটে কিছু খেতে পাবে। তেমনি আবার অনেকেই দেখবে ঐ তক্কে রয়েছে; যত না কাজ, তার চেয়ে লোক বেশী। এ কাজে সব চেয়ে ভয়ের ব্যাপার হল

এই যে, কোনো বাটিতে যদি এতটুকুও কিছু লেগে থাকে তো, ব্যস্‌, তুমি গেলে! বাটিটা চেটেপুটে সাফ না ক'রে তুমি ছাড়বে না। কুজিওমিন একবার একটা কথা বলেছিল শুখভের মনে আছে। কুজিওমিন শুখভদের ব্রিগেডের প্রথম ফোরম্যান। অনেক দিনের পাকা লোক। ১৯৪৩ সালে তার বারো বছরের মেয়াদ খাটা হয়ে গেছে। ফ্রণ্ট থেকে তখন দলে দলে নতুন লোক আসছিল। জঙ্গলের মধ্যে একটা ফাঁকা জায়গায় গোল হয়ে বসে আগুন পোহাতে পোহাতে কুজিওমিন তাদের বলেছিল,—এ হল জঙ্গলের রাজত্ব। এ সত্ত্বেও মানুষ এখানে বেঁচে থাকে। সাবাড় হয় তারাই যারা পরের এঁটোপাত চাটে, যারা ডাক্তারের শরণাপন্ন হয় আর যারা সঙ্গীসাথীদের নামে চুকলি করে।

চুকলিখোরদের সম্বন্ধে যা সে বলেছিল তা ঠিক নয়। চুকলিখোরদের জাতটা দিব্যি বহালতবিয়তে থেকে গেছে—তার জন্যে খুন ঢালতে হয়েছে অবশ্য অন্যদের। ভোরের ঘণ্টা বাজতে না বাজতে শুখভ রোজ উঠে পড়ে। আজকের দিনটাতেই শুধু তার ব্যতিক্রম ঘটল। কাল সন্ধ্যে থেকেই শরীরটা ম্যাজম্যাজ করছে। কখনও জ্বর-জ্বর ভাব, কখনও সারা গায়ে ব্যথা। হাজার মুড়ি দিয়েও শীত-শীত ভাবটা কিছুতে যাচ্ছে না। রাত্তিরে ঘুমের ঘোরেও মনে করেছে তার যেন শক্ত কোনো ব্যামো হয়েছে। আবার খানিক পরেই নিজেকে সে একটু ভাল বোধ করেছে। সারা রাত মনে মনে সে প্রার্থনা করেছে, সকাল যেন আর না আসে।

কিন্তু সকাল এল ঠিক ঘড়ি ধরে।

আর শীতেরই বা দোষ কী? জানলার গায়ে দু'আঙুল পুরু বরফ, মাথার ওপর চালের নীচে মাকড়সার জালের মত চিক্‌ চিক্‌ করছে পাতলা ঝুরি ঝুরি বরফ। ব্যারাকের যেমন ছিরি।

শুখভ উঠল না। কোটকম্বলে মাথা মুড়ি দিয়ে বাঙ্কের ওপর মটকা মেরে পড়ে রইল। বালাপোশের জামার একটা হাতা মুড়ে পা'দুটো তার ভেতর চালান করে দিল। মাথা মুড়ি দিয়ে থাকায় চোখে সে কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। কিন্তু ব্যারাকের ভেতর কোথায় কী ঘটছে, ঘরের যে কোণটাতে তার দলের লোকজনেরা থাকে তারা কে কী করছে, সবই সে আওয়াজ শুনে ধরতে পারছিল। যারা হাঁড়ির কাজ করে তারা এবার আট-টুকরিওয়ালা পায়খানার পিপেগুলো পড়ি-মরি করে সশব্দে নিয়ে চলেছে। ওটা নাকি হাল্কা কাজ। অশক্ত অথর্বদের জন্যে। বয়ে নিয়ে যাও তো, চাঁদ, না চল্‌কিয়ে—দেখি কার কত মুরোদ। ৭৫নং ব্রিগেড যেদিকটাতে থাকে, সেখানে একগোছা শুখা ভালেঙ্কি ধপাস করে মেঝের ওপর পড়ল। শব্দটা এবার আমাদের এদিকেও শোনা গেল। আমাদেরও আজ ভালেঙ্কি শুকোবার দিন। ব্রিগেডের ফোরম্যান আর সহকারী ফোরম্যান চুপচাপ বসে পায়ে বুট আঁটছে। কিন্তু তাদের বাঙ্কগুলোতে ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ হচ্ছে। সহকারী ফোরম্যান এখন রুটি আনতে যাবে রেশন-আপিসে; আর ফোরম্যান যাবে উ. প. ডি (উৎপাদন-পরিকল্পনা-ডিপার্টমেন্ট) দপ্তরে।

হুঁ, ফোরম্যান যাচ্ছে বটে, তবে রোজকার যাওয়া আর আজকের যাওয়ার মধ্যে একটা তফাত আছে। রোজ তাকে হুজুরে হাজির হতে হয় কাজের ভার বুঝে নেবার জন্যে। আজ অন্য ব্যাপার। আজ তার দরের ভাগ্য নির্ধারিত হবে। 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন'—এই নামে নতুন একটা শহরের পত্তন হবে। ১০৪নং ব্রিগেডকে কারখানা তৈরির কাজ থেকে সরিয়ে সেই শহর গড়ার কাজে ঠেলে পাঠাবার একটা চেষ্টা চলেছে। সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন বলতে এখন সেখানে খাঁ খাঁ করছে মাঠ; চারিদিকে শুধু মাথা তুলে আছে বরফের শৈলশিরা।

কিছু খাড়া করতে গেলেই আগে সেখানে গর্ত খুঁড়তে হবে, খুঁটি গাড়তে হবে, কাঁটাতার দিয়ে ঘিরতে হবে। নিজেদের এমনভাবে বেড়া দিয়ে রাখতে হবে যাতে কেউ পালাতে না পারে। এসব হয়ে টয়ে গেলে তখনই উঠবে শহর গড়বার কাজে হাত দেবার কথা। শরীর গরম রাখার জন্যে একটু যে মাথা গুঁজবার ঠাঁই পাবে, মাসখানেকের মধ্যে তার কোনো আশা নেই। আগুন যে পোহাবে তারও উপায় নেই—আগুন জ্বালতে কুটোটাও মিলবে না। বাঁচার একমাত্র উপায়, খেটে খেটে যদি কালঘাম ছোটাতে পারো।

এমন একটা ব্যাপারে ফোরম্যানের উতলা হওয়ারই কথা। তাই সে গেছে কলকাঠি নাড়তে—যাতে তার দলটাকে রেহাই দিয়ে সে জায়গায় অন্য কোনো দলকে পাঠানো হয়। এ কাজটা অবিশ্যি খালি হাতে গিয়ে দাঁড়ালে হবার নয়। কর্মবণ্টন বিভাগের যিনি হর্তা-কর্তা, তাঁকে আধসেরটাক নধর শুয়োরের মাংস না দিলে চলবে না। ফোরম্যান হয়ত সেরখানেকও নিয়ে গিয়ে থাকতে পারে। তা যেভাবেই হোক, চেষ্টা করে দেখতে দোষ নেই। শুখভও একবার হাসপাতালে গিয়ে চেষ্টা করে দেখবে আজকের দিনটা যদি সে ছুটি করাতে পারে। সত্যি সত্যি, তার সারা শরীর যেন ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ছে। একবার সে মনে করবার চেষ্টা করল ব্যারাকে আজ কার ডিউটি। তাই বলো। দে-ড়া ইভান। দেড়া ইভানেরই তো আজ ডিউটির দিন। সেই যে ঢ্যাঙা, তালপাতার সেপাই। কালো কালো চোখ। প্রথমবার দেখলে মনে হবে অতি সাঙ্ঘাতিক লোক। যে-কজন পাহারাওয়ালা আছে, তার মধ্যে আসলে কিন্তু ইভানই সবচেয়ে নরম। লোকজনদের সে কথায় কথায় সেলে আটক করে না, শাস্তি দেওয়ানোর জন্যে টেনে হিঁচড়ে অফিসারদের কাছেও নিয়ে যায় না। কাজেই শুখভ আরও খানিকক্ষণ অনায়াসে শুয়ে থাকতে পারে—ন' নম্বর ব্যারাকের লোকেরা যতক্ষণ না খেতে যায় ততক্ষণ তো বটেই। শুখভের বাঙ্কটা একটা ঝাঁকানি খেয়ে কেঁপে উঠল। দুটো লোক একসঙ্গে বিছানা ছেড়ে উঠতে গিয়ে এই কাণ্ড। দুজনের একজন হল শুখভের ওপরের বাঙ্কের পাদ্রী আলিওশা; আর একজন হল নীচের বাঙ্কের বুইনভ্স্কি—নৌবহরের সেকেণ্ড র‍্যাঙ্কের ক্যাপ্টেন, অর্থাৎ এককালে ছিল। পেচ্ছাপের টিন খালাস করে এসে দুই ফালতুতে খিটিমিটি জুড়ে দিল কে আগে গরম জল আনতে যাবে এই নিয়ে। ঠিক যেন দুই বুড়িতে কোঁদল করছে। ২০নং ব্রিগেডের ঝালাইমিস্ত্রি সেই শুনে খেঁকিয়ে উঠল,—এইও, অলবড্যে। দাঁড়া, তোদের চেঁচানো বার করছি। বলেই একপাটি জুতো ছুঁড়ে মারল।

জুতোটা ঠকাস্ করে খুঁটিটার গায়ে গিয়ে লাগল। অমনি সঙ্গে সঙ্গে সব চুপ। পাশের ব্রিগেডের সহকারী ফোরম্যানকে ঠিক সেই সময় খাটো গলায় এই বলে গজ গজ করতে শোনা গেল,—বুঝলে ভাসিল ফেদোরিচ, শুয়োরের বাচ্চারা আবার ঠকিয়েছে। রেশনে আগে দিত চারটে করে দু'পাউণ্ডের রুটি—এখন দিচ্ছে তিনটে। কাকে ফেলে কাকে দিই? আস্তে বললেও তামাম ব্যারাক রুদ্ধনিশ্বাসে কথাটা গিলছিল। ওবেলা রুটি তাহলে ওদের কারো কারো ভাগে কম পড়বে।

কাঠের গুঁড়োয় আঁট করে ঠাসা তোশকে গা এলিয়ে দিয়ে শুখভ ঠায় শুয়ে রইল। সে চাইছিল হয় তেড়ে জ্বর আসুক, নয় গায়ের ব্যথাটা মরুক। এই না-অসুস্থ, না-ভালো অবস্থায় ঝুলে থাকতে তার আর কিছুতেই মন চাইছিল না। পাদ্রী আলিওশা বিড় বিড় করে মন্ত্র আওড়াচ্ছিল। সেই সময় বুইনভ্স্কি পায়খানা থেকে ফিরে এসে মজা মারার ভাব করে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলছিল,—সাহসে বুক বাঁধো, লাল নৌসেনা! মাইনাস বিশ না হয়ে যায় না।

শুখভ ঠিক করে ফেলল হাসপাতালেই সে একবার ঢুঁ মারবে। আর হবি তো হ' ঠিক তৎক্ষণাৎ একটা জাঁদরেলগোছের হাত এক হেঁচকা টানে তার গা থেকে কম্বল আর বালাপোশের জামাটা খসিয়ে দিল। মুখের ওপর থেকে কোটটা সরিয়ে শুখভ ঘাড় তুলল। ঘাড় তুলেই দেখে হ্যাংলা তাতার সেপাই খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে। বাঙ্কের উঁচু কাঁধ বরাবর তার মাথা।

ও হরি, ডিউটিতে এসেছে তাহলে তাতার, যদিও আজ ওর দিন নয়—পা টিপে টিপে এসে গ্যাঁক করে শুখভকে পাকড়েছে।

শুখভের কালো কোটের পিঠের ওপর নম্বরদাগা লেবেলটা বিড় বিড় করে আগে পড়ল,—শ—আট চুয়ান্ন। তাতার সেপাই তারপর হেঁকে বলল,—সেলহাজত তিন রোজ—বাইরে কাজ।

ঘরের সব আলো না জ্বলায় দুশো লোকের ছারপোকাগ্রস্ত পঞ্চাশ সারি বাঙ্কওয়ালা ব্যারাকের যে অংশটা আবছায়ায় ঢাকা ছিল, তাতারের ফ্যাঁসফেঁসে গলার আওয়াজ পাওয়ামাত্র হঠাৎ সেখানে খুব ব্যস্ততার ধুম পড়ে গেল। যারা তখনও শুয়ে ছিল তারা ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ে চটপট যে যার পোশাক পরতে শুরু করে দিল।

—কোন্ কসুর, হুজুর? কাঁদো কাঁদো গলায় কথাটা বললেও শুখভ কিন্তু আসলে আদৌ ততটা মুষড়ে পড়েনি। কেননা বাইরে কাজে যেতে পারলে একা একা সেলে থাকার কষ্ট অনেকখানি কমে যাবে। খাবারটা পাওয়া যাবে গরম। আর খামাখা ভেবে মন খারাপ করবার ফুরসতই মিলবে না। ষোল-আনা সেলের সাজা তখনই হয়, যখন কাজে না পাঠিয়ে বেকার ঘরে বসিয়ে রাখে।

—ঘণ্টা শুনে ওঠনি কেন? চল, বিচার হবে। তাতার কথাগুলো তোতাপাখির মত নিছক আওড়ে যাচ্ছিল। কেননা সে নিজে, শুখভ এবং ভূভারতে সবাই জানে শাস্তিটা কিসের জন্যে।

তাতারের চিম্‌সেপড়া মাকুন্দ মুখে কোনো ভাবান্তর নেই। একবার ঘাড় ঘুরিয়ে সে দেখবার চেষ্টা করল আর কাউকে পাকড়ানো যায় কিনা। কিন্তু আবছায়ায়, আলোর তলায়, ওপরনীচের বাঙ্কে প্রত্যেকেই দস্তুরমত ব্যস্ত। কেউ বালাপোশের ট্রাউজারে পা ঢোকাচ্ছে, কেউ বা ফিটফাট হয়ে পোঁটলাপুঁটলি বেঁধেছেঁদে নিয়ে হন্ হন্ করে বেরিয়ে যাচ্ছে—যাতে তাতার বিদায় না হওয়া পর্যন্ত তারা বাইরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে পারে।

সাজাটা যদি অন্য কোনো কারণে হত, এমন কারণ যাতে যথার্থই সেল সাজা হতে পারে—তাহলে শুখভের অতটা মন ভার হত না। তার রাগ হচ্ছে আরও এইজন্যে যে, বরাবর সকলের আগে সে ঘুম থেকে উঠে এসেছে। এও ঠিক যে, কাঁদাকাটা করলেও ছাড়া সে পাবে না। অন্তত তাতারের হাত থেকে তো নয়ই। কাজেই লোকদেখানোর মত করে মুখে মাপ চাইতে থাকলেও শুখভ সমানে তার বালাপোশের ট্রাউজার পরে যেতে লাগল (বাঁ হাঁটুর ওপর একটা নোংরা ছেঁড়া তাপ্পির গায়ে কালো কালিতে লেখা একটা অস্পষ্ট ছেঁড়া নম্বর —শ ৮৫৪), গায়ে চড়াল বালাপোশের কোট (তার গায় আর পিঠে দু' জায়গায় নম্বর মারা), তারপর উঠে গিয়ে মেঝের ওপর জুতোর গাদা থেকে নিয়ে এল ভালেঙ্কি, মাথায় দিল টুপি (সুমুখের দিকে একই রকমের সেই নম্বরের তাপ্পি)। সব পরে টরে শুখভ তাতারের পেছন পেছন চলল।

১০৪নং ব্রিগেডের সবাই দেখল শুখভকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কেউ একটি কথাও

বলল না। বলে কোনো লাভ নেই। আর তাছাড়া কীই বা বলবে? ফোরম্যান থাকলে সে শুখভের পক্ষ নিতে পারত। কিন্তু ফোরম্যান ব্যারাকে নেই। শুখভও তার বাঙ্কের সঙ্গীসাথীদের কিছু বলে গেল না। তার বাঙ্কের বন্ধুদের বলবার কোনো দরকার নেই, এমনিতেই তারা সকালের খাবারটা রেখে দেবে।

শুখভ সেপাইয়ের পিছু পিছু বাইরে এল।

একে কনকনে ঠান্ডা, তায় কুয়াসা। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। দু কোণের দুই টং থেকে দুটো বড় বড় সার্চলাইট গোটা তল্লাটের ওপর আড়াআড়িভাবে আলো ফেলছে। ক্যাম্পের হাতায় আর ক্যাম্পের ভেতরেও বাতিগুলো জ্বলছে। চারদিকের এই চোখধাঁধানো আলোয় আকাশের তারা দেখারও জো নেই।

কয়েদীর দল নানান ধান্ধায় এদিক ওদিক হানফানিয়ে বেড়াচ্ছে। তাদের জুতোর তলায় মুচ্ মুচ্ করে বরফ ভাঙার শব্দ। কেউ চলেছে শৌচাগারে, কেউ মালখানায়; বাড়ি থেকে একজনের পার্সেলে জিনিস এসেছে, সে চলেছে গুদামঘর থেকে সেটা আনতে। নিজের যুগ্যি চাল নিয়ে চলেছে একজন পথ্য-রান্নার ঘরে। সকলেই ওভারকোটের বোতাম এঁটে, ঘাড় হেঁট করে, কোলকুঁজো হয়ে হাঁটছে। হাতপা তাদের হিম হয়ে রয়েছে এই ভেবে যে, সারাটা দিন তাদের এই নিদারুণ শীতের মধ্যে বাইরে বাইরে কাটাতে হবে—যতটা না ঠান্ডায়, তার চেয়ে বেশী আতঙ্কে। তাতার কিন্তু তার তেলচিটে নীল ফিতে লাগানো ফৌজী কোটটা গায় দিয়ে দিব্যি গট্ গট্ করে বুক চিতিয়ে হেঁটে চলেছিল—ঠান্ডা যেন আদৌ তার গায়েই লাগছে না।

যেতে যেতে পথে পড়ল উঁচু উঁচু কাঠের তক্তাঘেরা জায়গা—তার ভেতর ক্যাম্পের কয়েদীদের সাজা দেবার হাজত। সেটা ছাড়িয়ে ক্যাম্পের রুটি-কারখানা। জায়গাটা কাঁটাতার দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে যাতে কয়েদীরা হামলা করতে না পারে। রুটি-কারখানা ছাড়িয়ে কোতোয়ালির একটা প্রান্ত। সেখানে একটা খুঁটির গায়ে ঝুলছে মোটা তারে বাঁধা বরফে-মোড়া একখন্ড রেলের পাত। একটু এগিয়ে গেলে কাঠের আরেকটা খুঁটি; তাতে বরফে ঢাকা একটা তাপমানযন্ত্র। তাপমাত্রা খুব বেশী নেমে গেলে লোকে যাতে দেখতে না পায়, তার জন্যে অন্ধকার ঘুপ্‌চিমত জায়গায় সেটা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। মাইনাস বিয়াল্লিশ ডিগ্রি তাপমাত্রা যদি কেউ দেখতে পায়, তাহলে আর কাউকে কাজে ঠেলে পাঠানো যাবে না। আজ অবশ্য তাপমাত্রা মাইনাস চল্লিশের ধারেকাছেও নয়।

কোতোয়ালি ব্যারাকে এসে দুজনে সটান ঢুকে গেল পাহারাওয়ালাদের কামরায়। তাকে যে সেলহাজতে পাঠানো হবে না, তাকে করতে হবে শুধু সেপাইদের ঘরের মেঝে থেকে ঘষে ঘষে ময়লা সাফ করার কাজ—ঘরে পা দিয়েই শুখভ চট করে সেটা বুঝতে পেরেছিল (রাস্তা দিয়ে আসবার সময়ই কথাটা একবার শুখভের মনে হয়েছিল)। এতক্ষণে তাতার খোলাখুলি জানিয়ে দিল যে, শুখভের কসুর সে মাপ করেছে এবং শুখভকে এইবার সে ঘরের মেঝেটা ধুয়েমুছে সাফ করবার হুকুম দিল।

পাহারাওয়ালাদের ঘর মোছার জন্যে আলাদা কয়েদী আছে। বাইরের কাজে তাকে যেতে হয় না। সে হল কোতোয়ালির খিদ্‌মতগার; তাকে রাখাই হয়েছে ঐ করতে। কিন্তু কোতোয়ালিতে নিজেকে সে দিব্যি সড়গড় করে নিয়েছিল; মেজর সাহেব শান্তিব্যবস্থার কর্তা আর নিরাপত্তা-বিভাগের ওপরওয়ালা ওরফে 'ধর্মবাপ'—এঁদের প্রত্যেকের খাস-কামরাতেই তার ছিল অবাধ গতি। হুজুরে হাজির থাকার দরুন হামেশা এমন সব জিনিস

সে শুনে ফেলত, যা সেপাইরাও ঘুণাক্ষরে টের পেত না। ফলে তার মনে হল, সাধারণ সেপাইদের ঘর মুছলে তার ইজ্জত চলে যাবে। সেপাইরা তাকে একবার দুবার ডাকাডাকি করে শেষটায় বুঝে ফেলল কী ব্যাপার। তারপর থেকেই শুরু হয়ে গেল ক্যাম্প থেকে লোক ধরে ধরে এনে ঘরদোর মোছানোর দস্তুর।

সেপাইদের ঘরটাতে গন্ গন্ করছে চুল্লীর আগুনের তাত। জাব্বাজোব্বা খুলে রেখে শুধু একটা ময়লাচিট জামা গায়ে দিয়ে দুজন সেপাই বসে বসে চেকার খেলছে। আরেকজন বেল্ট-আঁটা ভেড়ার চামড়ার কোট পরে, হাঁটু-অবধি-ঢাকা ফেল্টের বুট পায়ে দিয়ে সরু একটা বেঞ্চির ওপর শুয়ে ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমোচ্ছে। ঘরের এক কোণে একটা খালি বালতি আর একটা ঘরমোছার ন্যাতা।

সেল-হাজতে যাওয়ার হাত থেকে রেহাই পেয়ে শুখভের খুব ভাল লাগল। বলল, —বহুৎ মেহেরবানি, সেপাইজী! আর যদি কক্ষণো উঠতে দেরি হয় তো কী বলেছি।

এখানে হল সিধে বাৎ; কাজ চুকলেই কেটে পড়। ঘাড়ে কাজ এসে পড়তেই শুখভের গায়ের ব্যথাটা মরে গেল। বালতিটা হাতে নিল শুখভ। হাতটা হি হি করছে খালি। তাড়াতাড়িতে বালিশের তলা থেকে হাতমোজাটা আনতে মনে নেই। বালতিটা নিয়ে শুখভ ইঁদারা থেকে জল আনতে চলে গেল।

বিভিন্ন ব্রিগেডের একদল ফোরম্যান যাচ্ছিল পরিকল্পনা আর উৎপাদন আপিসের দিকে। যেতে যেতে যে খুঁটিটার গায়ে তাপমানযন্ত্রটি ঝোলানো ছিল, তার নীচে এসে তারা ভিড় করছিল। তাদের মধ্যে বয়সে যে সবচেয়ে ছোট, খুঁটি বেয়ে ওপরে উঠে সে তাপমাত্রা পড়বার চেষ্টা করছিল। বন্দীনিবাসে আসার আগে তার খেতাব ছিল 'সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর'। নীচে থেকে তাকে নানা রকম উপদেশ দেওয়া হচ্ছিল,—দেখো, নিশ্বাস যেন ওর ওপরে পড়ে না,—তাহলে পারা ওপরে উঠে যাবে।

—বৈকি! এ তোমার ধন কিনা! উঠলেই হল!

শুখভদের ব্রিগেডের ফোরম্যান তিউরিনকে ওদের দলে দেখা গেল না। বালতিটা নামিয়ে রেখে শুখভ তার হাতদুটো কোটের হাতার মধ্যে চালিয়ে দিয়ে সোৎসাহে ব্যাপারটা দেখতে লাগল।

খুঁটির ওপর থেকে লোকটা ফ্যাঁস্‌ফেঁসে গলায় বলল,—মাইনাস্ সতেরো!...সতেরোর নিকুচি করেছে!

আর একবার ভাল করে পরখ করে নিয়ে লোকটা ঝুপ্ করে নেমে পড়ল।

একজন বলে উঠল,—সমস্ত সময়ই বিগ্‌ড়ে আছে, কক্ষণো ঠিক থাকে না। এখানে ওরা বদ্‌লে ভাল জিনিস লাগাবে? তবেই হয়েছে। ফোরম্যানের দল যে যার ধান্ধায় এদিক সেদিক চলে গেল। শুখভ ছুট দিল ইঁদারার দিকে। টুপির দুটো পাশ খোলা থাকায় ঠাণ্ডায় তার কানদুটো জমে গিয়েছিল। ইঁদারার ওপর কাঠের গুঁড়িগুলো পুরু বরফে ঢাকা। সরু ফাঁকের ভেতর দিয়ে বালতিটা ঠেলেঠুলে কোনোরকমে ঢোকানো গেল। দড়িটা কাঠির মত শক্ত আড়ষ্ট। শুখভ যখন জল নিয়ে পাহারাওয়ালাদের ঘরে ফিরে এল, তখন তার বালতি থেকে গলগলিয়ে ঠাণ্ডা ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ঠাণ্ডায় তার হাতদুটো জমে গিয়েছিল। দুটো হাতই সে জলের ভেতর চালিয়ে দিল। বরং জলে হাত ডুবিয়ে তার একটু গরম বোধ হল। শুখভ ফিরে এসে আর তাতারের টিকি দেখতে পেল না। তবে ঘরে তখন চারজন সেপাই। চেকার খেলা আর ঘুমোনো ছেড়ে তখন তুমুল বাদবিতণ্ডা

চলেছে এই নিয়ে যে, জানুয়ারি মাসে তারা কতটা করে জওয়ার পাবে। এদিককার এলাকায় খাদ্যের ঘাটতি আছে; রেশনিং ব্যবস্থা অনেক আগে উঠে গেলেও, স্থানীয় লোকজনদের জন্যে সাধারণভাবে যা বরাদ্দ তার বাইরেও সেপাইরা কিছু কিছু খাবারদাবার শস্তা দরে পেয়ে থাকে। শুখভ ঘরে পা দিতে না দিতেই একজন গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল,—দরজাটা বন্ধ কর, ঘাটের মড়া! ঠান্ডা হাওয়া ঢুকছে যে!

সকালবেলাতেই ফেল্টের জুতো ভিজে যাওয়া—তার চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার আর নেই! শুখভ যদি ব্যারাকে একবার ছুটে যেতে পারত। তাতেই বা কী লাভ হত! কারণ, একজোড়ার বেশী তো তার জুতো নেই। বন্দীনিবাসে আট বছর বসে বসে জুতো নিয়ে কত কান্ডকারখানাই না সে হতে দেখল। একবার তো সারা শীত তাকে শুধু গাছের ছালের চটি 'লপ্‌টি' আর টায়ারের তৈরি চে-তে-জে (চেলিয়াবিন্‌স্ক্‌ ট্র্যাক্টর ফ্যাক্টরির রুশ নামের আদ্যক্ষর) পরে কাটাতে হয়েছিল। না পেয়েছিল ভালেঙ্কি, না পেয়েছিল চামড়ার জুতো। আজকাল অবস্থা ভাল হয়েছে : অক্টোবরে সহকারী ফোরম্যানের পেছনে ফেউ হয়ে লেগে থেকে মালখানায় গিয়ে শুখভ একজোড়া মজবুত চামড়ার বুট আদায় করে এনেছিল। বেশ শক্ত গোছের সামনেটা; পায়ে দো-ফেরতা করে গরম পট্টি পরলেও জুতো আঁট হত না। গোড়ালিতে গোড়ালি ঠুকে একটা সপ্তাহ মহা ফুর্তিতে সে ঘুরে বেড়াল; যেন তার জন্ম-দিনের উৎসব চলেছে। আর ঠিক তারপরই ডিসেম্বরে এসে গেল ফেল্টের তৈরি ভালেঙ্কি। কী চমৎকার জীবন! এমন জীবন পেলে কে আর মরতে চায়? কিন্তু ঠিক সেই সময় হিসেবপত্র বিভাগের এক হারামী এই বলে কর্তার কান ভারী করল যে, ভালেঙ্কি ওরা রাখে রাখুক কিন্তু চামড়ার জুতো যেন ফেরত দেয়। অর্থাৎ, একজন কয়েদীর একসঙ্গে দু'জোড়া জুতো রাখার নিয়ম নেই। কাজেই শুখভকে মনস্থির করতে হল : হয় সারা শীত বাইরে চামড়ার জুতো পায় দিয়ে কাটাতে হবে, নয় বরফ গলার সময়ও জলকাদায় ভিজে ঢোল হলেও ভালেঙ্কি পরে থাকতে হবে। শুখভ অগত্যা চামড়ার জুতো জোড়াটাই ফিরিয়ে দিয়ে এল। কত তেল মাখিয়ে মাখিয়ে নরম করা, হায় রে! শুখভের কত যত্নের, কত আদরের নতুন জুতো! এ আট বছরে বুকে এত বড় দাগা আর কিছুতেই সে পায়নি। পর্বতপ্রমাণ জুতোর ডাঁইয়ের মধ্যে শুখভের জুতো জোড়া সপাটে গিয়ে পড়ল। বসন্তকালে আবার সে জুতো যে শুখভ সেখান থেকে খুঁজে পাবে তার কোনো আশা নেই।

শুখভ এবার সড়াৎ করে ভালেঙ্কি দুটো পা থেকে খসিয়ে ঘরের এক কোণে রেখে দিল, তারপর পট্টি দুটো খুলে তাক করে তার ওপর ছুঁড়ে দিল। ভালেঙ্কি ছাড়তে গিয়ে তার চামচেটা মেঝের ওপর পড়ে যাওয়ায় ঠং করে একটা আওয়াজ হয়েছিল। সেল-হাজতে যাবার জন্যে তৈরি হতে গিয়ে শুখভ যত কম সময়ই পেয়ে থাক, চামচেটা সঙ্গে নিতে ভোলে নি। শুখভ তাড়াতাড়ি চামচেটা মেঝে থেকে কুড়িয়ে নিল। তারপর খালি পায়ে ন্যাতায় করে দেদার জল মেঝের ওপর ছিটিয়ে দিয়ে সেপাইগুলোর একেবারে পায়ের তলা থেকে ঘর মুছতে লেগে গেল।

—এইও, ছুঁচো! সামলে! জল চোখে পড়তেই তড়াক করে চেয়ারে পা তুলে দিয়ে একজন সেপাই বলে উঠল।

অন্য একজন সেপাই বলে চলল,—চাল? চাল হল আলাদা জিনিস। চালের সঙ্গে জোয়ারের কেন তুলনা করছ?

—এই উল্লুক, জল ঢেলে যে রাখলি নে। এ আবার তোর কোন্‌ দেশী ঘর মোছা?

—তোর বুড়ী মাগীকে জন্মেও ঘর মুছতে দেখিস্‌ নি, শুয়োর?

শুনে শুখভ সোজা হয়ে উঠে বসল; তার হাতের ন্যাতা থেকে টপ্‌ টপ্‌ করে জল গড়িয়ে পড়ছে। মুখে তার সাদা সরল হাসি। হাসতেই ফোকলা দাঁত দেখা গেল; ১৯৪৩ সালে উত্তরে বহু দূরদেশে, উস্‌ৎ-ইঝ্‌মায় থাকার সময় কাউর হয়ে তার দাঁতগুলো পড়ে যায়। তখন সে প্রায় মরবার দাখিল হয়েছিল। রক্ত পায়খানা করতে করতে পেটের নাড়ি-ভুঁড়ি পর্যন্ত বেরিয়ে আসার উপক্রম হয়েছিল, পেটে কিছুই সে রাখতে পারত না। সেদিনকার জের হিসেবে আজ থেকে গেছে শুধু তার ফোকলা দাঁত আর জড়ানো কথা।

১৯৪১ সালে বুড়ীর কাছ থেকে জবাব দিয়েই তো, হুজুর, ওরা আমাকে এখানে আনলে। সে কেমন ছিল না ছিল, আজ আর মনেও করতে পারি নে।

—ঐ ওদের ঘর মোছার ছিরি। এসব ঘাটের মড়া জানবেও না কিছু, শিখবেও না কিছু। ওদের রুটি গেলানো মানে রুটিগুলো নষ্ট করা। উচিত হল গু খাইয়ে রাখা।

—আর, শালার এই রোজ রোজ ঘর মোছানোরই বা কী দরকার। অষ্টপ্রহর ঘরে একটা স্যাঁতসেঁতে ভাব। বলি ওহে, আট চুয়ান্ন! তুমি বাপু, যাদুর গায়ে হাত বুলানোর মত করে ন্যাতাটা ওপর ওপর বুলিয়ে দিয়ে এখান থেকে কেটে পড়ো। তা হলেই হবে।

—চাল! কোথায় জোয়ার আর কোথায় চাল! কোনো তুলনাই হয় না।

শুখভ ওদের কর্থামত হাত চালিয়ে কাজ চুকিয়ে ফেলল।

কাজ। কাজ জিনিসটা লাঠির মত। তার দুটো দিক। যখন মানুষদের জন্যে করবে তাতে থাকবে হাতের গুণ; আর যখন গাড়োলদের জন্যে করবে, তখন করবে লোকদেখাবার মত।

নয়ত এতদিন কবে লোকগুলো ফৌত হয়ে যেত। সবাই সেটা জানে।

শুখভ সারা ঘরে এমনভাবে ন্যাতা বুলিয়ে গেল যাতে মেঝের কোথাও কোনো শুকনো জায়গা না থাকে। তারপর না নিংড়েই ভিজে ন্যাতাটা চুল্লীর পেছনে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দরজার ঝন্‌কাঠে দাঁড়িয়ে ভালেঙ্কিটা পায়ে গলিয়ে নিল। বালতির জলটা বড়কর্তাদের যাতায়াতের রাস্তার ওপর ছলাৎ করে ঢেলে দিল। তারপর স্নানাগার পেরিয়ে, ঠান্ডা এঁদো ক্লাববাড়ির পাশ দিয়ে রাস্তা সংক্ষেপ করে এসে পড়ল খাওয়াদাওয়ার জায়গায়।

একবার তার ডাক্তারখানায় না গেলেই নয়। আবার সারা শরীরটা ব্যথায় টন্‌ টন্‌ করছে। একটু দেখেশুনে চলতে হবে যেন খাওয়ার জায়গার সামনে কোনো সেপাইদের চোখে না পড়ে। বন্দীনিবাসের বড়কর্তার কড়া হুকুম : দলছাড়া হয়ে কোনো কয়েদীকে ঘুরতে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে সেল-হাজতে পুরবে।

খাওয়ার জায়গাটার সামনে—কী তাজ্জব ব্যাপার আজ—ভিড়ের গুঁতোগুঁতি নেই, লোকের লাইন নেই। শুখভ দিব্যি সাঁ করে ভেতরে ঢুকে গেল।

ভেতরটা স্নান করবার হামামের মত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার। একদিকে দরজা দিয়ে ঢুকছে হিম, অন্যদিকে বন্দীনিবাসের জলের মত পাতলা সুপ থেকে উঠছে তাপ। ব্রিগেডের লোক-জনেরা হয় টেবিল জুড়ে বসে আছে, নয় যাতায়াতের রাস্তায় ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে—জায়গা খালি হলেই বসে পড়বে। একেক ব্রিগেড থেকে দু'তিনজন করে লোক কাঠের ট্রে-তে পাতলা সুপ আর লপ্‌সির বাটি নিয়ে ভিড়ের ভেতর পরস্পরকে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি করতে করতে ঘুরছে। টেবিলে কোথায় খালি জায়গা আছে খুঁজছে।

আধদুমড়ো এক মিন্‌সে রাস্তার মধ্যিখানে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে! বললে কথা কানে

যায় না, ইস্টুপিড গাধা কোথাকার! দিল, দিল তো উল্টে! ছুড়ুৎ...ছড়াৎ! খালি হাতটা দিয়ে মারো বেটার ঘাড়ে এক রদ্দা! বহুৎ আচ্ছা, সাবাস! সর রাস্তা থেকে, দূর হ! এ'টো চাটবার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে না, বেরো!

কাছেই এক টেবিলে অল্পবয়সী এক ছোকরা খাবার আগে বুকের ওপর ক্রসচিহ্ন করল। তার মানে, পশ্চিম য়ুক্রেনে ওর বাড়ি—এখানে আনকোরা এসেছে। রুশরা তো ভুলেই গেছে কোন্ হাত দিয়ে ক্রসচিহ্ন করতে হয়।

খাবারঘরটা রীতিমত ঠান্ডা। বেশির ভাগ লোকই মাথায় টুপি পরে খাচ্ছিল। তবে হ্যাঁ, খাচ্ছিল বেশ গদাইলস্করী চালে। কালো কালো কপিপাতার তলা থেকে ঘেঁটে-যাওয়া সেদ্ধ মাছের টুকরোগুলো ধরে ধরে মাছের কাঁটাগুলো টেবিলের ওপর থু থু করে ফেলছিল। টেবিলের ওপর একরাশ কাঁটা জমে যাওয়ার পর কেউ হয়ত হাত দিয়ে ঝেটিয়ে মেঝের ওপর ফেলে দিচ্ছিল। তারপর লোকের জুতোর তলায় পড়ে কাঁটাগুলো মুড়্ মুড়্ করে ভেঙে যাচ্ছিল। তাই বলে সরাসরি মেঝের ওপর থু থু করে কাঁটা ফেলালে কিন্তু সকলেই অভদ্রতা বলে মনে করত।

ঘরটার ঠিক মাঝখানে খুঁটি নয় অথচ খুঁটির মত দেখতে দু-সার জিনিস ছিল। সেই রকম একটা খুঁটিগোছের জিনিসের ধারে শুখভের সকালের খাবার আগ্‌লে বসেছিল তার ব্রিগেডেরই একজন লোক—ফেতিউকভ। ব্রিগেডে ফেতিউকভের স্থান নীচুতে—শুখভের চেয়েও নীচে। সবাইকার এক ধরনের কালো খাটো কোট, এক ধরনের নম্বর দেখে বাইরে থেকে মনে হবে ব্রিগেডের সবাই বুঝি সমান; আসলে কিন্তু তলে তলে অনেক তফাৎ—উ'চু থেকে নীচু নানান ধাপ। বুইনভ্স্কিকে খাবারের বাটি আগলাতে বলা যাবে না, এমন কি শুখভকে দিয়েও যে-সে কাজ করানো যাবে না। তার নীচেও কয়েকটা ধাপ আছে।

শুখভকে আসতে দেখে ফেতিউকভ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল।

—সব জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। আরেকটু হলেই তোমার ভাগটা খেয়ে ফেলছিলাম। আমি তো ভাবলাম নির্ঘাৎ তোমাকে সেলে আটকেছে।

ফেতিউকভ আর সেখানে দাঁড়াল না। কারণ ফেতিউকভ জানত শুখভের পাতে আজ আর কিছুই পড়ে থাকবে না—দুটো বাটিই সে চেটেপুটে শেষ করবে।

শুখভ তার এক পায়ের ভালেঙ্কি থেকে চাম্‌চেটা বার করল। চাম্‌চেটা তার খুব শখের। গোটা উত্তরদেশ ওটা তার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছে। বালিতে অ্যালুমিনিয়ামের তার ফেলে শুখভ নিজে হাতে ওটা গড়িয়ে নিয়েছে। চাম্‌চের গায়ে ফুট্‌কি ফুট্‌কি অক্ষরে খোদাই করে লেখা : 'উস্ত্-ইঝ্মা, ১৯৪৪'।

শুখভের কামানো মাথাটা টুপির নীচে এতক্ষণ ঢাকা ছিল। শুখভ মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে নিল। যত ঠান্ডাই পড়ুক—টুপি মাথায় দিয়ে খেতে সে অভ্যস্ত নয়। জুড়িয়ে-যাওয়া সুপ্‌টা ঘুটে একবার সে খুঁটিয়ে দেখবার চেষ্টা করল বাটিতে কী আছে না আছে। তার ভাগটা সে পেয়েছে মাঝখানটা থেকে। হাঁড়ির ওপরের দিক থেকেও নয়, তলা থেকেও নয়। ফেতিউকভকে শুখভ ভাল করেই চেনে : বাটি আগলাতে আগলাতে দু-এক টুকরো আলু মুখে ফেলা তার পক্ষে মোটেই অসম্ভব নয়।

সুপ্ যত পাতলাই হোক, গরম থাকে বলে তবু একটু খেয়ে সুখ পাওয়া যায়। শুখভের সুপ্‌টা কখন জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে। তা সত্ত্বেও সে রোজকার মত মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে রয়ে বসে খেতে লাগল। এ সময় ঘরে আগুন লাগলেও সে কোনোরকম ব্যস্ততা দেখাত

না। ঘুমের ব্যাপারটা বাদ দিলে, বন্দীনিবাসের লোকেরা খেতে বসে সকালে মোটে দশ মিনিট, দুপুরে পাঁচ মিনিট আর সন্ধ্যেয় পাঁচ মিনিট—এইটুকুই যা নিজেদের জীবনগুলোকে নিজের করে পায়।

বন্দীনিবাসের সুপ্ রোজকে রোজ বদলায় না। শীতের মাসগুলোর জন্যে কোন্ তরকারি মজুত করা হয়েছে, তার ওপরই সেটা নির্ভর করে। গেল বছর গুদামে থাকার মধ্যে ছিল শুধু নোনা গাজর। তাই সেপ্টেম্বর থেকে জুন স্রেফ গাজরেরই সুপ্ হয়েছিল। এ বছর সে জায়গায় ছিল কালো বাঁধাকপি। সারা বছরের মধ্যে এক জুন মাসেই বন্দী-নিবাসের লোকজনদের একটু যা খেয়ে তাকত হয়। আর সব তরিতরকারি ফুরিয়ে যাবার ফলে এই সময় তারা পায় ভুট্টার ছাতু। সবচেয়ে ওঁছা মাস জুলাই; এই সময় স্রেফ বুনো শাকপাতা সেদ্ধ।

কুচো কুচো মাছ, তাও বলতে গেলে শুধু কাঁটাটুকুই তারা পায়। মাছগুলো এমনভাবে ঘেঁটে যায় যে, মুড়ো আর ল্যাজার কাছে সামান্য একটু লেগে থাকে। শুখভ খানিকটা নিছক হাড্ডিসার মাছের কাঁটা কচ্‌মচ্ করে চিবিয়ে, তারপর চুষে নিয়ে টেবিলের ওপর থু করে ফেলল। যে-কোনো মাছের কান্‌কোই হোক আর ল্যাজাই হোক, শুখভ একটু কিছুও ফেলে না। এমন কি মুড়োর গায়ে চোখ লেগে থাকলে চোখও সে খাবে। কিন্তু চোখটা যদি বেরিয়ে বাটির মধ্যে ভাসতে থাকে—তাহলে আর শুখভ মাছের সেই ড্যাবডেবে চোখটা খাবে না। অন্য কয়েদীরা এই নিয়ে খুব হাসাহাসি করত।

শুখভ আজ খানিকটা খাবার বাঁচিয়েছে। ব্যারাকে ফিরে না যাওয়ায় তার বরাদ্দ রুটিটা আনা হয়নি। এখন সে রুটি ছাড়াই খাচ্ছে। রুটিটা সে পরে শুধুমুখেই খেতে পারবে। তাতে আরও বেশী আরাম।

দ্বিতীয় বাটিটাতে ছিল 'মাগারা'র লপ্‌সি। জমে একশা হয়ে আছে। শুখভ চাম্‌চে দিয়ে ভেঙে টুকরো করে নিল। গরম গরম খেলেও এ জিনিসটাতে কোনো স্বাদ পাওয়া যায় না, খাওয়ার পর খেয়েছি বলে মনেও হয় না। ঘাসের মত দানা, কেবল হলদে এই যা; দেখতে জোয়ারের মত। এ জিনিসটা নাকি চীনেদের কাছ থেকে পাওয়া। সেদ্ধ করলে একেকটা ভাগের ওজন পাঁচ ছটাকের মত হয়। আসলে এটা লপ্‌সি নয়, জিনিসটা চালানো হয় লপ্‌সি বলে।

চাম্‌চেটা জিভ দিয়ে চেঁছেপুঁছে নিয়ে শুখভ সেটাকে তার ভালেঙ্কির ভেতর স্বস্থানে পুরে ফেলল। তারপর মাথায় টুপি দিয়ে হাসপাতালের দিকে রওনা হল।

আকাশে তখনও তেমনি অন্ধকার ঘুট ঘুট করছে। বন্দীনিবাসের হাতায় দুটো সার্চলাইট তখনও আড়াআড়িভাবে তেমনি জোরালো আলো ফেলছে। এই বিশেষ বন্দী-নিবাসটির যখন প্রথম পত্তন হয়, পাহারাওয়ালাদের হাতে যুদ্ধের সময়কার প্রচুর হাউই ছিল। যখনই বিজলীকল বন্ধ হয়ে যেত, তখনই তারা আকাশে শাদা সবুজ লাল—রংবেরঙের হাউই ছুঁড়ত। চারিদিক আলোয় আলো হয়ে যেত। মনে হত যেন লড়াই চলছে। তারপর একটা সময় হাউই ছোঁড়া বন্ধ হয়ে গেল। বোধহয় বড্ড খরচ হয়ে যাচ্ছিল বলে।

ভোর হওয়ার ঘণ্টা বাজবার সময় বাইরে যে-রকম অন্ধকার ছিল এখনও তেমনি। কিন্তু দেখে দেখে যারা অভ্যস্ত, তারা নানা রকম খুঁটিনাটি জিনিস লক্ষ্য করে বুঝতে পারবে ফাইলে দাঁড়াবার সময় আসন্ন। খাবার ঘরে কাজ করে খুময়—তার পুষ্যি সহকারীটি ৬ নম্বর ব্যারাকের লোকজনদের সকালের খাওয়ার জন্যে ডাকতে গেছে; ৬ নম্বরে থাকে

অশক্ত পঙ্গুর দল—বাইরে যাদের খাটাখাটুনি করতে যেতে হয় না। অল্প দাড়িওয়ালা একজন প্রবীণ শিল্পী রং আর তুলি আনতে শিক্ষাসংস্কৃতি বিভাগের দিকে গুটি গুটি চলেছে—তার ওপর কয়েদীদের নম্বর প্লেট লেখবার ভার। তারপর সেই তাতার সেপাই হাজিরা দেবার মাঠটার ভেতর দিয়ে কোতোয়ালির দিকে হন্ হন্ করে চলে গেল। বাইরে বিশেষ লোকজন নেই—তার মানে, শেষের কয়েকটি মুহূর্ত প্রায় সকলেই গা গরম করবার জন্যে কোনো আশ্রয়ের নীচে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুখভ তাড়াতাড়ি তাতারের নজর এড়াবার জন্যে ব্যারাকর কোণে লুকিয়ে পড়ল। দেখতে পেলে আবার শুখভকে তার হাতে পড়তে হত। সত্যি বলতে কি, হাঁই তুলতে গেলেও এখানে বিপদ আছে; একটু অসাবধান হয়েছ কি গেছ! এমনভাবে চলতে ফিরতে হবে যেন কোনো সেপাই একা দেখতে না পায়। কোনো সেপাইকেই ভরসা নেই—হয়ত কোনো কাজ করিয়ে নেবে বলে কাউকে খুঁজে বেড়াচ্ছে, কিংবা গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্যে হাতের কাছে কাউকে চাই। এই যেমন, সেদিন ব্যারাকে যে হুকুমনামাটা পড়ে শোনানো হল সামনে কোনো সেপাই থাকলে তার পাঁচ পা আগে মাথার টুপিটা নামিয়ে নিতে হবে, তারপর তাকে পেরিয়ে দু পা যাবার পর টুপিটা পরতে হবে। কোনো কোনো সেপাই আছে অতশত ভ্রূক্ষেপও করে না—আবার এতে কারো কারো হয়েছে পোয়াবারো। ঐ টুপির মামলায় ফেঁসে গিয়ে কত কয়েদীকে যে সেল-হাজতবাস করতে হয়েছে তার ঠিক নেই। যে যাই বলুক, সব সময় উচিত হল কোণাঘুপ্চিতে লুকিয়ে পড়া।

তাতার চলে যেতে শুখভ ঠিকই করে ফেলল হাসপাতালে যাবে। কিন্তু হঠাৎ তার মনে পড়ে গেল হাজিরা দেবার আগে আজ সকালে সাত নম্বর ব্যারাকে তার যাবার কথা—ঢ্যাঙা লাৎভিয়ানের কাছ থেকে তার দেশের তৈরি পুরো দু-গ্লাস তামাক পাওয়া যাবে। কিন্তু এতসব তাড়াহুড়োর মধ্যে কথাটা সে ভুলেই গিয়েছিল। ঢ্যাঙা লাৎভিয়ানের কাছে কাল রাত্রে তামাকের পার্সেল এসেছে। কাল গেলে হয়ত দেখা যাবে তামাকের একটুও আর পড়ে নেই। পরের পার্সেলের জন্যে তারপর হয়ত পুরো এক মাস বসে থাকতে হতে পারে। লাৎভিয়ানের তামাকটা বড় ভাল; বেশ কড়া, খেয়ে আমেজ হয়; দেখতেও গরগরে।

শুখভ মনে মনে বিরক্ত হয়ে মাটিতে পা ছুঁড়ল—তাহলে কি ফিরে যাবে সাত নম্বর ব্যারাকে? কিন্তু এদিকে হাসপাতালে যখন এসেই পড়েছে তখন যাওয়াই যাক বলে গট্ গট্ করে এগিয়ে গেল। তার পায়ের নীচে বরফ সশব্দে মুচ্ মুচ্ করে ভাঙতে লাগল।

হাসপাতালের দালানঘর যেমন হয়, একেবারে ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে। মেঝের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে তো শুখভের ভয় ভয়ই করছিল। দেয়ালগুলো চক্‌চকে সাদা পেন্ট করা। আসবাবপত্রও সব সাদা।

কিন্তু রুগীদেখার ঘরগুলো সব বন্ধ। শুখভের মনে হল, ডাক্তাররা বোধ হয় তখনও কেউ ঘুম থেকে ওঠে নি। ডিউটিতে ছিল অল্পবয়সী এক ছোকরা। মেডিকেল অ্যাসিস্টান্ট। কোলিয়া ভ্দোভুশ্‌কিন। গায়ে তার ধোপ-ভাঙা সাদা কোট। একটা ঝক্‌ঝকে পরিষ্কার টেবিলে বসে সে লিখছিল।

কাছেপিঠে আর কেউ ছিল না।

শুখভ এমন ভাব করে মাথা থেকে টুপিটা নামিয়ে নিল যেন কোলিয়া বন্দীনিবাসের একজন কর্তৃস্থানীয় লোক। বন্দীনিবাসের অভ্যেস যাবে কোথায়, শুখভ আড়চোখে দেখে নিল কোলিয়া কি যেন লিখছে। প্রত্যেকটা লাইন সোজা টানা-টানা, মাঝখানে আগাগোড়া

সমান ফাঁক। মার্জিনে জায়গা ছাড়া। প্রত্যেকটি বাক্যের আরম্ভের অক্ষরটা বড়। শুখভ দেখেই বুঝল কাজটা আপিসের নয়—নেহাৎই তার নিজের কোনো কাজ। হোক না হোক, তাতে শুখভের কী?

শুখভ আমতা আমতা করে বলল,—আমি বলছিলাম কি, নিকোলাই সেমিনিচ... আমার শরীরটা...কেমন যেন ভাল নেই। এমনভাবে বলল যেন সে কিছু একটা সুবিধে বাগাতে চাইছে।

ভ্দোভুশ্কিন বড় বড় দুটো শান্ত চোখ তুলে তাকাল। গায়ে সাদা কোট, মাথায় সাদা টুপি। নম্বরটা দেখা যাচ্ছিল না।

—আর সময় পেলে না? কাল রাত্তিরে আসতে কী হয়েছিল? জানোই তো সকাল-বেলায় আমরা রুগী ভর্তি করি না? আজকে যাদের কাজ থেকে ছুটি দেওয়া হয়েছে তাদের লিস্ট আপিসে পাঠিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে।

শুখভ জানে না তা নয়। সে এও জানে যে, সন্ধ্যের পর এলেও কাজে ছুটি পাওয়া সহজ হত না।

—দেখ, কোলিয়া...সন্ধ্যেবেলায় যখন জিনিসটা হওয়া দরকার, তখন আর আমার ব্যথাটা থাকে না...

—কী জিনিস? কিসের ব্যথা?

—যখন টিপে টিপে দেখবার চেষ্টা করি ঠিক কোন্ জায়গায় ব্যথা, তখন আর ব্যথাটা খুঁজে পাই না। অথচ সর্বাঙ্গে ব্যথা।

একদল লোক আছে যারা প্রায়ই হাসপাতালে এসে ঘ্যান্ ঘ্যান্ করে। ভ্দোভুশ্কিন জানে শুখভ মোটেই তাদের দলে পড়ে না। কিন্তু তার মুস্কিল এই যে, সকালে দুজন মাত্র লোকের জন্যে সে ছুটি মঞ্জুর করতে পারে। এর আগেই দুজনের ছুটির ব্যবস্থা সে করে ফেলেছে, টেবিলের সবুজাভ কাঁচটার নীচে তাদের নামদুটো লেখাও রয়েছে।

—ঢের আগেই কিছু একটা করা উচিত ছিল। ফাইলে দাঁড়াবার ঠিক মুখটাতে একেবারে শেষ বেলায় তোমার খেয়াল হল? আশ্চর্য! এই নাও, ধরো! বলে ভ্দোভুশ্কিন কাঁচের পাত্রটা থেকে একটা থার্মোমিটার বার করে গা থেকে ওষুধের জল মুছে শুখভকে টেম্পারেচার নেবার জন্যে দিল। কাঁচের পাত্রটার মুখে গজ-কাপড়ের ঢাকা আর তার গা ফুঁড়ে আরও কয়েকটা থার্মোমিটার ডোবানো।

দেয়ালের ঠিক পাশেই বেঞ্চি। শুখভ এমনভাবে বেঞ্চিটার একেবারে ধার ঘেঁষে বসেছে যে, আরেকটু হলেই বেঞ্চিটা উল্টে গিয়ে সে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পারে—অথচ পড়ছে না। অমনভাবে সে ইচ্ছে করে বসে নি; তার এই বসবার ধরনটা থেকে আপনিই বোঝা যাচ্ছে, হাসপাতালে আসার ব্যাপারটা তার রপ্ত নয় এবং তেমন গুরুতর অসুখ নিয়ে সে আসে নি।

ভ্দোভুশ্কিন ঘস্ ঘস্ করে লিখে চলেছে।

বন্দীনিবাসের একেবারে এক প্রান্তে সবচেয়ে নির্জন জায়গায় এই হাসপাতাল। কোথাও কোনো টুঁ শব্দ নেই। দেয়ালঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজ নেই। (বন্দীদের কাছে ঘড়ি রাখার নিয়ম নেই: সময় জানার দায়টা তাদের হয়ে এখানকার কর্তৃপক্ষই ঘাড়ে নিয়েছেন।) এমন কি একটা ইঁদুর পর্যন্ত এখানে নখ আঁচড়ায় না। হাসপাতালের হুলোবেড়াল তাদের সব ক'টাকে নিকেশ করেছে। তাকে রাখাই হয়েছে সেইজন্যে।

কী সুন্দর ঝকমকে ঘর। চারিদিক নিশ্চুপ নিস্তব্ধ। মাথার ওপর জ্বল জ্বল করছে জোরালো আলো। পুরো পাঁচটা মিনিট কোনো কাজ না করে শুখভ চুপচাপ বসে আছে। সব মিলিয়ে তার ভারি ভাল লাগছিল। দেয়ালগুলোর দিকে তাকিয়ে দেখল একেবারে ফাঁকা। ভেতরের কোটটা নেড়েচেড়ে দেখল—বুকের কাছে নম্বর লেখাটা ক্ষয়ে এসেছে, ওটা ঠিক করে নিতে হবে; নইলে ওর জন্যেই হয়ত কোন্‌দিন কপ্‌ করে ধরবে। খালি হাতটা দিয়ে শুখভ তার দাড়িটা দেখল। বড্ড বড় হয়ে গেছে। স্নানাগারে শেষবার সে গেছে দিন দশেকেরও আগে। তারপর থেকেই দাড়ি সমানে বেড়ে চলেছে। তাতে অবশ্য কিছুই যায় আসে না। আর দিন তিনেকের মধ্যেই আর একবার সে স্নানাগারে যাবে, দাড়ি তখনই কামানো হবে। শুধু শুধু কি জন্যে সে নাপিতের কাছে গিয়ে দাড়ি কামানোর জন্যে লাইন দেবে? সুন্দর হয়ে লাভই বা কী—কাকে সে দেখাবে?

তারপর ভ্‌দোভুশ্‌কিনের সাদা টুপিটার দিকে চেয়ে শুখভের লোভাত নদীর ধারের ফৌজী হাসপাতালটার কথা মনে পড়ে গেল—জখম-হওয়া চোয়াল নিয়ে কিভাবে সেখানে সে এসেছিল আর তারপর নিজে সেধে সে আবার লড়াই করতে চলে গিয়েছিল—কী বোকা গাধা ছিল তখন সে—অথচ কম করে পাঁচটা দিন দিব্যি সে বিছানায় শুয়ে বসে কাটাতে পারত।

আর এখন তো সে রীতিমত স্বপ্ন দেখে যেন দু-এক সপ্তাহ অসুখ হয়ে সে পড়ে থাকে, অবশ্য মরতে না হয় এবং কাটাকুটি করতে না হয় এমন অসুখ; অসুখটা এমন হবে যাতে ওরা হাসপাতালে পাঠায়, তাহলে তিনটে সপ্তাহ সে চুপচাপ বিছানায় শুয়ে থাকতে পারবে। অবশ্য খেতে দেবে ওরা নিছক জলের মত সুরুয়া। তা দিক।

এই সময় শুখভের মনে পড়ে গেল হাসপাতালেও এখন আর বিছানায় কেবল শুয়ে থাকতে দিচ্ছে না। একদল নতুন বন্দী আসবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন একজন ডাক্তারেরও আমদানি হয়েছে। তার নাম স্তেপান গ্রিগরিচ। ভদ্রলোক বেজায় হৈ-হৈ-বাজ আর কর্মঠ, কাজ ছাড়া এক মুহূর্ত থাকতে পারেন না আর সেইসঙ্গে রুগীদেরও মোটে জিরোতে দেন না। তিনি এসে এমন ব্যবস্থা করেছেন যে, হেঁটে চলে বেড়াবার ক্ষমতা আছে যেসব রুগীর তাদের সবাইকেই বাধ্যতামূলকভাবে হাসপাতালের চত্বরে কাজ করতে হয়: বাগানে বেড়া দিতে হয়, ছোটখাটো রাস্তা বানাতে হয়, ফুলগাছের গোড়ায় মাটি ফেলতে হয় আর শীতকালে মাটি ভেজাবার জন্যে বরফ এনে জমা করতে হয়। ভদ্রলোক জোর গলায় বলেছেন, অসুখ সারানোর সবচেয়ে ভাল ওষুধ হল কাজ।

কিন্তু ঘোড়া যে ঘোড়া, বেশী খাটালে সেও মারা পড়ে: এটা তাঁর জানা উচিত। নিজেকে যদি কালঘাম ছুটিয়ে ইঁটের পর ইঁট গেঁথে যেতে হত, তাহলে হয়ত ওঁর থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে যেত।

ভ্‌দোভুশ্‌কিন তখনও লিখে চলেছে। এটা ঠিক যে নিজের কাজই সে করছিল, কিন্তু কী কাজ কী ব্যাপার জানতে পারলেও শুখভের মাথায় কিছু ঢুকত না। ভ্‌দোভুশ্‌কিন আগের দিন রাত্রে নতুন একটা দীর্ঘ কবিতা লিখেছে। যাঁর কাছে কাজই হোল মহৌষধ, সেই ডাক্তার স্তেপান গ্রিগরিচকে সে কথা দিয়েছে কবিতাটি দেখাবে—সেইজন্যেই সে এতক্ষণ ধরে বসে বসে নকল করছে।

এ ধরনের জিনিস একমাত্র বন্দীনিবাসেই ঘটে থাকে। স্তেপান গ্রিগরিচ ভ্‌দো-ভুশ্‌কিনকে হাসপাতালের সহকারী বলে নিজের পরিচয় দিতে বলেছিলেন এবং তাকে তিনি

হাসপাতালের সহকারী পদে নিযুক্ত করেছেন। ভ্দোভুশ্কিনকে তিনি এমন সব অশিক্ষিত কুলিমজুর ধরে ধরে ইন্ট্রাভেনাস ইঞ্জেকশন দিতে শেখাচ্ছেন যাদের সাচ্চা সরল মনে কখনও এ সন্দেহ হবে না যে সে মোটেই হাসপাতালের সহকারী নয়। কোলিয়া আসলে ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহিত্যের ছাত্র; দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময় ধরা পড়ে। স্তেপান গ্রিগরিচ চেয়েছিলেন যে জিনিস বাইরে মুক্ত থাকা অবস্থায় সে মন খুলে লিখতে পারত না, সে জিনিস যেন সে জেলে বসে লেখবার সুযোগ পায়।

ডবল জানলার গা ঝক্ঝকে সাদা বরফে ঢাকা থাকায় খুব আস্তে হাজিরার ঘণ্টা বাজতে শোনা গেল। ঘণ্টা কানে যেতেই শুখভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়াল। আগের মতই শরীরটা তার ম্যাজ্ ম্যাজ্ করছে, কিন্তু ব্যাপার দেখে মনে হল কাজ থেকে ছুটি পাবার আর তার কোনো আশা নেই। ভ্দোভুশ্কিন হাত বাড়িয়ে থার্মোমিটারটা নিয়ে দেখতে লাগল,—এ দেখছি, না এদিক না ওদিক—টায় টায় নিরানব্বই। একশো পয়েণ্ট চার হলে আর কারো কোনো কথা বলার কিছু থাকত না। এ অবস্থায় তোমাকে আমি কাজ থেকে ছুটি করাতে পারব না। তুমি যদি চাও, এখানে অপেক্ষা করতে পারো—কিন্তু তাতে তোমার বিপদও আছে। ডাক্তার যদি বিশ্বাস করে তুমি সত্যিই অসুস্থ, তাহলে কাজ থেকে তোমাকে রেহাই দেবে। আর যদি তার মনে হয় সুস্থ দেহে তুমি অসুখের ভাণ করছ তাহলে সোজা সেলে পাঠাবে। আমার তা মনে হয়, তোমার নিজের জায়গায় ফিরে যাওয়াই ভাল।

শুখভ কোনো উত্তর দিল না। কোনো রকম নমস্কার-টমস্কার না করেই মাথায় টুপিটা টেনে দিয়ে বেরিয়ে চলে গেল।

যারা গরমের মধ্যে আছে, তারা ঠাণ্ডায় থাকার দুঃখ বুঝবে কী করে?

ঠাণ্ডা যেন গায়ে হুল ফুটিয়ে দিচ্ছে। শীত আর একটু আধটু দজ্জাল কুয়াশায় শুখভ না কেশে পারল না। বাইরে তাপমাত্রা মাইনাস সতেরো; আর শুখভের ভেতরের তাপ নিরানব্বই। এখন দেখা যাক কে যেতে কে হারে!

শুখভ ছুটতে ছুটতে ব্যারাকের দিকে গেল। যে মাঠে হাজিরা হয়, সে মাঠ একেবারে খালি। গোটা ক্যাম্প খাঁ খাঁ করছে। এ হল সেই হাত-পা ছড়ানো অস্থায়ী একটা মুহূর্ত, যখন রেহাই পাওয়ার কোনো উপায় নেই জেনেও লোকে এমন ভাব করে যেন আর তাদের লাইন বেঁধে কাজে যেতে হবে না। পাহারাওয়ালার যে দলটাকে সঙ্গে যেতে হয়, তারা তাদের ব্যারাকে গরমে আরাম করে বসে রাইফেলে মাথা রেখে ঢুলছে; এই ঠাণ্ডায় টঙে উঠে চৌকি দেওয়া—সেটাও খুব একটা সুখের ব্যাপার নয়। প্রধান ঘাঁটির পাহারারত সেপাইরা বেল্চায় করে খানিকটা কয়লা চুল্লীর মধ্যে ঢেলে দিচ্ছে। পাহারাওয়ালাদের ঘরে সেপাইরা নিজেদের হাতে-পাকানো সিগারেটে সুখটান দিয়ে নিচ্ছে। কয়েদীরা ধোক্ড়া পরে যার যার বাঙ্কে পাতা কম্বলের ওপর মনমরা হয়ে চোখ বুঁজে শুয়ে—কোমরে তারা দড়ি দিয়ে কষি এঁটে নিয়েছে, টুকরো টুকরো ন্যাকড়া দিয়ে চিবুক থেকে চোখ পর্যন্ত ঠাণ্ডা লাগার ভয়ে ঢাকা। ফোরম্যান 'চলো এবার' বলে হাঁক দিলেই সবাই অমনি হুড়মুড় করে উঠে রওনা দেবার জন্যে তৈরি।

ন' নম্বর ব্যারাকের বাকি সকলের সঙ্গে ১০৪ নম্বর ব্রিগেডের লোকেরা ঢুলছিল। কেবল সহকারী ফোরম্যান পাভ্লো নিঃশব্দে ঠোঁট নাড়তে নাড়তে পেন্সিলে কী যেন যোগ করছিল আর, হ্যাঁ, শুখভের ঠিক পাশের বাঙ্কের পাদ্রী আলিওশা বাইবেলের অর্ধেক

উত্তরভাগ কপি-করা তার নোটখাতা থেকে বিড়বিড় করে পড়ছিল।

শুখভ পা টিপে টিপে ছুটে এসে সটান সহকারী ফোরম্যানের বাঙ্কের সামনে এসে দাঁড়াল।

পাভ্‌লো তার দিকে ঘাড় তুলে দেখল।—তোমাকে তাহলে ওরা সেলে পোরে নি, ইভান দেনিসিচ? তাহলে বেঁচে গেছ?

জেলখানার জল পেটে পড়েও এই পশ্চিম য়ুক্রেনীদের কথাবর্তার ধরনগুলো কিন্তু এখনও ভারি মিষ্টি আছে।

টেবিলের ওপর থেকে পাভ্‌লো শুখভের বরাদ্দ রুটিটা তার হাতে তুলে দিল। রুটিটার ওপর চিনির একটা সাদা ছোট্ট ডেলা লেগে ছিল।

শুখভের হাতে একেবারেই সময় ছিল না। তা হলেও শুখভ একটু দাঁড়িয়ে অমায়িকভাবে দুটো কথা বলল। কারণ, সহকারী ফোরম্যান তার মুরুব্বিও বটে এবং সত্যি বলতে কি, ক্যাম্পের কমান্ডান্টের চেয়েও সহকারী ফোরম্যানের গুরুত্ব তার কাছে বেশী। ব্যস্ততার মধ্যেও শুখভ জিভ দিয়ে পাঁউরুটির ওপর থেকে চিনির দলাটা চেটে নিয়ে একটু উঠে বাঙকটা ঠিক করার জন্যে ব্র্যাকেটের ওপর একটা পা রাখল—আর সেই অবস্থায় রেশনের রুটিটা হাতে করে একটু নেড়েচেড়ে দেখে নিল রুটিটার ওজন ঠিক আঠারো আউন্সই আছে কিনা। জেলে আর বন্দীনিবাসে অমন হাজার হাজার রেশন সে পেয়েছে। যদিও দাঁড়ি-পাল্লায় কখনও মাপবার সুযোগ হয়নি, এবং যদিও মুখচোরা বলে নিজের অধিকার নিয়ে চেঁচামেচি হৈহল্লা কখনও সে করেনি—তাহলেও শুখভের কাছে (এবং প্রত্যেকটি বন্দীর কাছেই) অনেকদিন আগেই এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, রুটি কাটার ঘরে যারা কাজ করে তারা যদি ওজনের ব্যাপারে কারচুপি না করে তাহলে আর তাদের বেশীদিন ও কাজে বহাল থাকতে হবে না। বরাদ্দ প্রত্যেক রুটি থেকেই কমবেশি মার যায়। কেবল কথাটা হল কতটা মারে। খুব বেশী মারে কি? আর রোজই দেখেশুনে নিজের মনকে সবাই এই বলে চোখ ঠারবে—আজ হয়ত আমাকে ওরা খুব তেমন ঠকায় নি? ওজনটা বোধহয় প্রায় ঠিক আছে।

আন্দাজ করে শুখভের স্পষ্ট মনে হল, এক আউন্স মেরেছে। পাঁউরুটিটা শুখভ দু' টুকরো করল। কয়েদীদের ভেতরের জামায় পকেট থাকে না, কিন্তু শুখভ তার ভেতরের জামায় একটা স্পেশাল সাদা পকেট বানিয়ে নিয়েছিল—অর্ধেকটা রুটি সে সেই পকেটে রেখে দিল। বাকি অর্ধেকটা আরেকটু হলেই সে খেয়ে ফেলছিল—কিন্তু তাড়াহুড়ো করে খেলে খাবারটা আর খাবার থাকে না। পেটে যায় কিন্তু ক্ষিধে মেটে না। রুটির অর্ধেকটা শুখভ তার লকারের মধ্যে রাখতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত রাখল না। তার মনে পড়ে গেল, লকার থেকে চুরি করার জন্যে দু-দুবার ফালতুরা ঠ্যাঙানি খেয়েছিল। প্রকাণ্ড ব্যারাক এবং যে-কেউ যখন তখন এখানে ঢুকে পড়তে পারে।

এইসব ভেবে ইভান দেনিসোভিচ ভালেঙ্কি থেকে এমন কায়দা করে পা দুটো বের করে নিল যে, ভালেঙ্কিতেই পট্টি আর চাম্‌চে থেকে গেল। এবার সে তার রুটির অর্ধেকটা হাতে নিয়েই খালি পায়ে ওপরে উঠে পড়ল। শোবার তোশকের ওপর একটা ফুটো ছিল, সেই ফুটোটা টেনে বড় করে শুখভ তার ভেতর তার রুটির অর্ধেকটা কাঠের গুঁড়োর মধ্যে লুকিয়ে রেখে দিল। তারপর মাথা থেকে টুপিটা খুলে তার ভেতর থেকে ছুঁচসুতো বার করল। এ দুটো জিনিসও টুপির অনেকটা ভেতরে লুকানো ছিল। তল্লাসির সময় টুপিগুলো খুঁজে-পেতে দেখা হয়। একবার টুপি দেখতে গিয়ে এক সেপাইয়ের আঙুলে ছুঁচ ফুটে গিয়েছিল—

রেগে গিয়ে আরেকটু হলে সে শুখভের মাথা ফাটিয়ে দিচ্ছিল। শুখভ এবার বেশ ভাল করে কয়েক ফোঁড় দিয়ে ফুটোর মুখটা মোক্ষম করে বন্ধ করে দিল। তোশকের ভেতরে থেকে গেল রুটিটা। এইসব করতে করতে শুখভের মুখের মধ্যে চিনির ডেলাটা কখন মিলিয়ে গেছে। শুখভ উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠেছে। যে কোনো মুহূর্তে দরজায় পাহারাদার এসে হাঁক দেবে। শুখভের হাত চলছে বিদ্যুৎবেগে আর সেইসঙ্গে সে আগে থেকে ভেবে রাখছে এর পর কী করবে না করবে।

পাদ্রী আলিওশা বাইবেলের উত্তরভাগ পড়ছে—নিঃশব্দে নয়, আস্তে বিড় বিড় করে। বোধ হয় শুখভের যাতে শুনে পুণ্য হয় সেইজন্যে। এই পাদ্রীর দল সব সময় একটু প্রচার করে নিতে ভালবাসে।

—কিন্তু দেখো, কেউ যেন তোমরা খুনী, চোর, বদমায়েস, অনিষ্টকারী হয়ে কষ্ট পেয়ো না; কিন্তু কেউ যদি খ্রীস্টান হয়ে কষ্ট পাও, তাহলে তার লজ্জার কিছু নেই; ঐ নামে সে ঈশ্বরের মহিমা প্রচার করুক।

দেয়ালের গায়ে একটা গুপ্ত জায়গায় আলিওশা তার নোটখাতাটা লুকিয়ে রাখবার এমন চমৎকার একটা ব্যবস্থা করেছে যে, এ পর্যন্ত কোনো তল্লাসিতেই সেটা ধরা পড়েনি। আলিওশাকে বাহাদুর বলতে হবে।

শুখভ দ্রুত হাত চালিয়ে একটা হেৎনার গায়ে ওভার-কোটটা ঝুলিয়ে রেখে তোশকের নীচে থেকে হাতমোজা, পাতলা একজোড়া বাড়তি পায়ের পট্টি, একটুকরো দড়ি আর ফিতের পাড় দেওয়া একটুকরো কাপড় টেনে বার করে নিল।

তোশকের ভেতর কাঠের গুঁড়ো জমে শক্ত এব্ড়ো-খেব্ড়ো হয়ে যাওয়ায় শুখভ পিটিয়ে পিটিয়ে খানিকটা সমান করে নিল। কম্বলের পাশগুলো মুড়ে দিয়ে বালিশটা জায়গামত রেখে দিল। তারপর বাঙ্ক থেকে নেমে এসে আগে ভাল পট্টিটা পরে পাতলা পট্টিটা পায়ে পরে নিল।

এই সময় ফোরম্যান কাশতে কাশতে উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় হেঁকে উঠল,—উঠে পড়ো, ১০৪ নম্বর! চলো বাইরে!

সঙ্গে সঙ্গে গোটা ব্রিগেড—যারা ঢুলছিল, যারা চোখ চেয়ে ছিল, তারা সবাই হাঁই তুলতে তুলতে উঠে পড়েই দরজার দিকে ছুট। উনিশটি বছর ফোরম্যানের বন্দীদশায় কেটেছে। লোকজনদের সে একটি মিনিটও আগে কাজে ঠেলে পাঠাবে বলে মনে হয় না। সে 'চলো বাইরে' বললে বুঝে নিতে হবে পত্রপাঠ বাইরে চলো।

ব্রিগেডের লোকেরা মুখ বুঁজে লাইনবন্দী হয়ে বাইরে গলিতে এসে তারপর ঢাকা প্রবেশপথ পেরিয়ে উঠোনে এসে পড়তে না পড়তেই তিউরিনের ঢঙে ২০ নম্বর ব্রিগেডের ফোরম্যানের হাঁক শুনতে পাওয়া গেল, 'চলো বাইরে!' শুখভ এর মধ্যে দুপ্রস্থ পট্টির ওপর পায়ে ভালেঙ্কি গলিয়ে নিয়েছে, গায়ে ওভারকোট জড়িয়ে নিয়েছে আর কোমরে কষে দড়ি বেঁধে নিয়েছে। (যার যার চামড়ার বেল্ট ছিল, কর্তৃপক্ষ বাজেয়াপ্ত করে নিয়েছে—স্পেশাল ক্যাম্পে বেল্ট রাখবার হুকুম নেই।)

কাজেই শুখভ একেবারে ফিটফাট হয়ে ছুটে এসে উঠোনের আগেই ঢাকা প্রবেশপথের কাছে তার ব্রিগেডের শেষ লোকটাকে ধরে ফেলল। ব্রিগেডের লোকেরা একজন একজন করে এগিয়ে পেছিয়ে হাঁটছে—যার যা-কিছু ছিল সব নিঃশেষে তারা একটার পর একটা গায়ে চড়িয়েছে। পায়ে পায়ে যাতে জড়িয়ে না যায় তার জন্যে মাঝখানে খানিকটা করে জায়গা

ছেড়ে রাখা হয়েছে। এইভাবে লাইনবন্দী হয়ে তারা হাজিরা দেবার মাঠে এসে পড়ল। পায়ের নীচে মুচ্ মুচ্ করে বরফ ভাঙার শব্দ ছাড়া চলতে চলতে তাদের আর কোনো আওয়াজ নেই।

আকাশের পূর্বদিকটা সবুজাভ আর ফিকে হলেও অন্ধকার তখনও কাটেনি। তার ওপর পূর্বদিক থেকে শন্ শন্ করে বিশ্রী একটু হাওয়াও বইছিল।

দিনের মধ্যে এটাই সবচেয়ে জঘন্য সময়—সাত সকালে এই অন্ধকারে, এই ঠাণ্ডার মধ্যে ঘরের বাইরে গিয়ে সারা দিনের মত পেটে খিদে নিয়ে এই লাইনে দাঁড়ানো। জিভগুলো যেন কেউ দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিয়েছে। কারো সঙ্গে কথা বলবার প্রবৃত্তি নেই।

হাজিরা দেবার মাঠে একজন নিম্নপদস্থ তদারকী অফিসার ছুটোছুটি করছিল। রেগেমেগে সে বলল,—ওহে তিউরিন, আর আমরা কত দেরি করব? তোমার দেখছি আবার সেই গয়ংগচ্ছ ভাব শুরু হয়েছে।

হেঁজিপেঁজি অফিসারকেও ভয় করে শুখভ। তিউরিন তাকেও গ্রাহ্য করল না। তিউরিনের ভারি দায় পড়েছে এই ঠাণ্ডায় ওর সঙ্গে কথা বলতে। বিনা বাক্যব্যয়ে সে লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতে লাগল। আর তার পেছন পেছন গোটা ব্রিগেড খচর-মচর চিড়িক-মিড়িক করে এগোতে লাগল।

এক সের শুয়োরের মাংস ঘুষ দিয়ে দেখাই যাচ্ছে বেশ কাজ হয়েছে; কেননা, ১৪০ নম্বর ব্রিগেড তাদের সেই পুরনো জায়গাতেই এখনও বহাল আছে। ওদের চেয়েও যাদের হীন অবস্থা, যারা একটু হাঁদা গঙ্গারাম—তাদেরই সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন নগরে ঠেলে পাঠানো হচ্ছে। ইস্, কিন্তু কী সাংঘাতিক দশা হবে আজ ওদের—মাইনাস সতেরো, কন্‌কনে বাতাস, তার ওপর একটু কোনো আশ্রয় নেই, আগুন নেই!

ব্রিগেডের ফোরম্যানের অনেকটা করে নধর শুয়োরের মাংস লাগে। খানিকটা লাগে পরিকল্পনা আর উৎপাদন বিভাগে নিয়ে যাবার জন্যে আর খানিকটা লাগে তার নিজের ভোগে। নিজের বাড়ি থেকে না এলেও ফোরম্যানের কখনও ও জিনিসের অভাব হয় না। ব্রিগেডের যারই বাড়ি থেকে পার্সেল আসুক, তক্ষুণি সে ফোরম্যানকে খানিকটা ভেট দিয়ে আসবে।

নইলে তুমি বাঁচতে পারবে না।

উপরওয়ালা অফিসার একটা কার্ডের গায়ে টুকে নিচ্ছিল: তোমার দলে, তাহলে তিউরিন, একজন আজ অসুখ করে ছুটিতে আছে। বাকি তেইশ জন উপস্থিত?

কাকে পাওয়া যাচ্ছে না? পান্তেলেয়েভকে পাওয়া যাচ্ছে না। ওর আবার কখন অসুখ করল? সঙ্গে সঙ্গে ব্রিগেডসুদ্ধ লোক কানে কানে কথা বলতে শুরু করে দিল। পান্তেলেয়েভ—কুত্তাটা আবার ব্যারাকে থেকে গেছে। অসুখ-টসুখ বাজে কথা! নিরাপত্তা বিভাগই ওকে আসতে দেয়নি। ও নিশ্চয় এখন কারো নামে লাগানো ভজানো করছে।

দিনের বেলায় নিরাপত্তা বিভাগ তাকে বিনা বাধায় তলব করতে পারে। দরকার হলে তাকে ঘণ্টা তিনেক বা তারও বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারে। কেউ তো দেখতে পাচ্ছে না। কেউ তো শুনতে পাচ্ছে না। চিকিৎসা বিভাগের যোগসাজসেই এ ব্যাপারে তারা লোকের চোখে ধুলো দিতে পারবে।

হাজিরা দেবার মাঠটা কালো ওভারকোটে ছেয়ে গেছে। প্রত্যেকটা ব্রিগেড গা তল্লাসির

জন্যে আস্তে আস্তে ঠেলেঠুলে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। শুখভের মনে পড়ল তার ভেতরের জামার গায়ের নম্বরটা ঠিক করে নেওয়া দরকার এবং ঠেলাঠেলি করে মাঠ পেরিয়ে মাঠের ওপারে চলে গেল। আর্টিস্টের সামনে দু-তিন জন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। শুখভ তাদের পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। কয়েদীদের আবার নম্বর নিয়েও কম ঝকমারি নয়। নম্বর দেখেই সেপাইরা দূর থেকে লোক চিনে ফেলতে পারে আর কন্‌ভয় গার্ডরাও খাতায় লিখে নিতে পারে। কিন্তু সেই নম্বর তুমি যদি ক্ষয়ে যেতে দাও, তাহলে তোমার সেল সাজা অবধারিত—কেন তুমি তোমার নম্বরের যত্ন নাও না?

বন্দীনিবাসে আর্টিস্ট আছে তিন জন। অফিসারদের তারা বিনা পয়সায় ছবি এঁকে দেয় আর তার ওপর ফাইলে দাঁড়াবার সময় তারা পালা করে নম্বরে রং লাগায়। আজ পালা পড়েছে ছোট সাদা দাড়িওয়ালা বুড়ো আর্টিস্টের। বুড়ো যখন টুপির ওপর তুলি দিয়ে রং বুলোয়, দেখে মনে হয় যেন কোনো পাণ্ডা পুরুত কপালে রসকলি আঁকছে।

বুড়ো আর্টিস্ট একটার পর একটা রং বুলিয়ে যাচ্ছে আর অনবরত হাতের দস্তানায় নাক মুছছে। হাতে তার বোনা পাতলা দস্তানা। ঠাণ্ডায় হাতটা শক্ত আড়ষ্ট হয়ে গেছে। নম্বরগুলো স্পষ্ট হচ্ছে না। ভেতরের কোটে শ-৮৫৪ নম্বরটা দাগানো হল। শুখভ তার ওভারকোটের বোতাম না লাগিয়েই হাতে দড়ির কোমরবন্ধটা নিয়ে ছুটে এসে নিজের ব্রিগেডকে ধরে ফেলল—কারণ, দু-চার মিনিটের মধ্যেই সেপাইরা গা তল্লাসি শুরু করে দেবে। হঠাৎ একটু দূরে তার নজরে পড়ল তারই দলের একজন—ৎসেজার—ধোঁয়া ছাড়ছে। ৎসেজার পাইপ টানছিল না, টানছিল সিগারেট। তার মানে পোড়া সিগারেটে একটা সুখটান দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু সোজাসুজি চেয়ে বসা তার পক্ষে সম্ভব হল না; সোজাসুজি না চেয়ে শুখভ সরে এসে ৎসেজারের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে ঘাড়টা খানিকটা ঘুরিয়ে তার দিকে দৃষ্টি মেলে ধরল।

শুখভ এমন একটা উদাস ভাব নিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইল যেন তাকে সে দেখেও দেখছে না; কিন্তু তার চোখে পড়তে লাগল প্রত্যেকটা টানের পর—চিন্তার মধ্যে ডুবে থাকায় ৎসেজার অনেকক্ষণ পরে পরে টানছিল—আগুনের লাল আভাটা সিগারেটের গা বেয়ে ক্রমশ হোল্ডারের দিকে এগোচ্ছে।

ঠিক সেই সময় ফেতিউকভ—কোত্থেকে বেটা ফেউ এসে—ৎসেজারের ঠিক সামনে উদয় হয়ে তার মুখের দিকে জ্বল্‌জ্বলে চোখে তাকিয়ে রইল।

শুখভের কাছে একফোঁটা তামাক নেই; সন্ধ্যের আগে কোথা থেকেও যোগাড় করতে পারবে, তেমন কোনো আশাও সে দেখতে পাচ্ছে না। এতক্ষণ সে আশায় আশায় মুখিয়ে উঠেছিল এবং, ঠিক সেই মুহূর্তে তার মনে হচ্ছিল, মুক্তির চেয়েও তার কাছে ঢের বেশি কাম্য পোড়া সিগারেটের ঐ টুকরোটা। কিন্তু শত হলেও, ফেতিউকভের মত সোজা ৎসেজারের ঠোঁটের দিকে তাকিয়ে শুখভ কখনই নিজের মাথা হেঁট করবে না।

ৎসেজারের গায়ে পাঁচমিশেলী জাতের রক্ত। সে গ্রীক, না ইহুদী, না জিপ্‌সী—বলা শক্ত। বয়সে এখনও সে তরুণ। ৎসেজার ছিল সিনেমার ক্যামেরাম্যান, কিন্তু নিজের প্রথম ছবি তোলা শেষ হওয়ার আগেই সে গ্রেপ্তার হয়। মুখে তার কালো মোটা ঘন গোঁফ। পুলিশের খাতায় গোঁফসুদ্ধ ফটো তোলা আছে বলেই জেলখানায় তার গোঁফ কামিয়ে ফেলা হয়নি।

—ৎসেজার মার্কোভিচ! ফেতিউকভ আর নিজেকে সম্বরণ করতে না পেরে লালায়িত

হয়ে বলে উঠল,—আমাকে একটা টান! তার মুখটা খিদেয় আর লোভে বিকৃত হয়ে উঠেছে।

ৎসেজারের কালো চোখ এমনিতেই ছিল অর্ধনিমীলিত। চোখের পাতা প্রায় না তুলেই সে ফেতিউকভের দিকে তাকাল। ইদানীং ৎসেজার পাইপ খাওয়া ধরেছিল যাতে কয়েদীর দল সিগারেটের ভাগ চেয়ে তার ধূমপানে ব্যাঘাত ঘটাতে না পারে। তার আপসোস তামাকের জন্যে নয়, তাতে চিন্তার সূত্রটা ছিঁড়ে যেত বলে। মুখে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে চিন্তার মধ্যে ডুবে যেত : এইভাবে সে অনেক নতুন আইডিয়া পেত। কিন্তু কোনো একটা সিগারেট ধরাতে না ধরাতেই সে দেখত অজস্র চোখে নীরব প্রার্থনা ফুটে উঠেছে, আমাকে দিও কিন্তু সুখটানটা!

ৎসেজার এবার শুখভের দিকে ফিরে বলল,—নাও, ইভান দেনিসিচ!

বলে তার কাঠের ছোট হোল্ডারটা থেকে শেষ-হয়ে-আসা জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা মুচড়ে বার করতে লাগল। শুখভ তাড়াতাড়ি গা ঝাড়া দিয়ে কৃতজ্ঞচিত্তে সিগারেটের শেষ-হয়ে-আসা টুকরোটা গ্রহণ করল আর পাছে সেটা পড়ে যায় তার জন্যে সাবধানে একটা হাত পেতে রাখল। ৎসেজার নিজে থেকে যাতে তাকে দেয় তার জন্যেই শুখভ এতক্ষণ অপেক্ষা করছিল। ৎসেজার যে তাকে হোল্ডারসুদ্ধ সিগারেটটা দিতে কার্পণ্য করল, তার জন্যে শুখভ মোটেই ক্ষুণ্ণ হল না। যতই হোক, কিছু লোক আছে যাদের মুখ পরিষ্কার আর কিছু লোকের নোংরা। একেবারে জ্বলন্ত জায়গাটা ধরতে হলেও তার অসাড় আঙুলগুলোতে আগুনের ছেঁকা লাগল না। সবচেয়ে বড় কথা হল ফেতিউকভকে —ঐ ফেউ বেটাকে সে টেক্কা দিতে পেরেছে। ঠোঁট পুড়তে আরম্ভ করলেও শুখভ গলায় ধোঁয়া টানতে পারছে। উঁ-উঁ-উঁ-আ-আ-আঃ! শুখভের ক্ষুধার্ত শরীরময় ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ছে। ধোঁয়া যাচ্ছে পায়ে, ধোঁয়া যাচ্ছে মাথায়—সব সে অনুভব করতে পারছে।

সারা শরীরে বানডাকা এই সুখ ছড়িয়ে পড়তে না পড়তে সে একটা হল্লা শুনতে পেল,—আমাদের ভেতরের জামাগুলো ওরা নিয়ে নিচ্ছে গো, নিয়ে নিচ্ছে।

কয়েদীদের জীবনভর অশান্তি লেগেই আছে। শুখভের ওসব গা-সওয়া। শুধু দেখো, ওরা যেন তোমার টুঁটিটা ছিঁড়ে ফেলতে না পারে।

ভেতরের জামা? কেন, ভেতরের জামা কেন? ও জামা তো খোদ্ বড়কর্তারই দেওয়া! উঁহু, এ হতেই পারে না...

শুখভদের সামনে আরও দুটো ব্রিগেড রয়েছে। আগে তাদের গা তল্লাসি হবে। ১০৪ নম্বর ব্রিগেড দেখল, বন্দীনিবাসের শাস্তি বিধানের কর্তা লেফটেনাণ্ট ভল্কোভোই কোতোয়ালি ব্যারাক থেকে বেরিয়ে এসে সেপাইদের ধমকাচ্ছে। ভল্কোভোই ধারে কাছে না থাকায় সেপাইরা যো-সো করে আলটপকা গা-তল্লাসি করছিল। ধমক খাবার সঙ্গে সঙ্গে তারা জানোয়ারের পালের মত লোকগুলোর ওপর হন্যে হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। যারা খবরদারি করছিল, তারা কয়েদীদের ভেতরের জামার বোতাম খুলতে বলে হেঁকে উঠল, —খোল্ল্ল্ল্ল্ বোতাম্ম্ম্ম্!

শুধু কয়েদী আর সেপাইরাই নয়, লোকে বলে ক্যাম্পের বড়কর্তাও নাকি ভল্কোভোইকে ডরাত। তার নামের মানে হল 'নেক্ড়ে'। ভগবানও শয়তানটাকে বড় ভাল দাগিয়েছেন—নামটা দিয়েছেন একেবারে লাগসই। ওর জ্বলজ্বলে চাউনিটা পর্যন্ত হুবহু নেক্ড়ের মত। চাপা রং, লম্বা, ভুরু-কোঁচকানো চেহারা—খর খর করে চলে। ব্যারাকের পেছন থেকে হঠাৎ সে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এসে লোকজনদের বলে,—কী হচ্ছে কী এখানে?

তার সামনে কারো সাধ্য নেই নিজেকে আড়াল করে। গোড়ায় গোড়ায় তার সঙ্গে থাকত ছোট একটা চামড়ায় বাঁধানো চাবুক। লোকে বলে সেলের বন্দীদের নাকি ঐ দিয়ে সে পিট্‌ত। মাঝে মাঝে ব্যারাকে সন্ধ্যের হাজিরার সময় যখন কয়েদীদের ভিড় বেড়ে গিয়ে বিষম হৈচৈ বেধে যেত, হঠাৎ পেছন থেকে গুটি গুটি এসে সপা-ং সপা-ং! একদম ঘাড়ের ওপর সে চাবুক মারত।—কেন লাইনে দাঁড়াস নি, ঘাটের মড়া? ভিড়টা পিছন দিকে হেলে তার সামনে থেকে সরে দাঁড়াত। যে লোকটা চাবুক খেত তৎক্ষণাৎ সে নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে রক্ত মুছে ফেলত, মুখে টঁু শব্দও করত না—পাছে তাকে সেলে আটক করে।

আজকাল কী কারণে জানি না ভল্‌কোভেই আর চাবুক আনে না।

নিদারুণ শীত পড়লে সকাল বেলায় গা-তল্লাসি থেকে রেহাই মেলে, তাই বলে সন্ধ্যেবেলায় নয়। প্রত্যেকটি কয়েদীই নিজের নিজের টেঁপটি ওভারকোটের বোতাম খুলে গা থেকে ওভারকোট টেনে খুলে ফেলল, তারপর পাঁচজন পাঁচজন করে সার বেঁধে এগিয়ে গেল। তাদের মুখোমুখি পাঁচজন সেপাই দাঁড়িয়ে। সেপাইরা প্রত্যেক কয়েদীর বেল্ট-বাঁধা কোটের এপাশ ওপাশ থাব্‌ড়ে থাব্‌ড়ে দেখল। কয়েদীদের মোটে একটিই অনুমোদিত পকেট—ডান হাঁটুর ওপর। সেপাইরা হাতের দস্তানা না খুলে বাইরে থেকে পকেটগুলো হাতড়ে দেখার সময় তেমন তেমন ঠেকলে তৎক্ষণাৎ ভেতরে হাত চালিয়ে না দিয়ে গা-ছাড়া ভাবে জিজ্ঞেস করছিল,—কী ওটা?

কী এমন দরকার পড়ল যে সকালবেলাতেই কয়েদীদের গা তল্লাসি করতে হবে? ছুরিটুরির জন্যে নাকি? ছুরি আবার কে বাইরে নিয়ে যায়! ছুরি তো বাইরে থেকে ভেতরে আনবারই জিনিস! সকালে ওরা শুধু নজর রাখে ছ'পাউণ্ড বা তার কাছাকাছি ওজনের রুটি কোনো কয়েদীর কাছে না থাকে—একসঙ্গে অত বেশী রুটি রাখা মানেই পালানোর মতলব করা। একটা সময়ে কোনো কয়েদীর কাছে ছ' আউন্সের এক টুকরো রুটি থাকাটাও রীতিমত ভয়ের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তখন ওরা এই বলে হুকুম জারি করেছিল যে, প্রত্যেকটি ব্রিগেডকে নিজের নিজের কাঠের বাক্স বানিয়ে নিয়ে তাতে করে গোটা ব্রিগেডের দুপুরের খাবার বয়ে নিয়ে যেতে হবে। কেউ ভেবেই পেল না, এতে ওদের ঠিক কোন্ কাজটা হবে বলে ওরা মনে করছে। হয়ত ওদের একটাই উদ্দেশ্য—লোকগুলোকে ভোগানো, আরও একটু হয়রানি করা। কাঠের বাক্সে যার যার ভাগ রাখতে গিয়ে প্রত্যেকেই চিহ্ন করার জন্যে রুটির গায়ে একটু করে কামড় দিয়ে নিত। হলে হবে কি, সব ভাগই তো দেখতে হুবহু এক—এক রুটি থেকেই তো কাটা! সুতরাং কাজে যাবার সময় সারাক্ষণ তারা তাদের রুটিগুলো বেহাত হতে পারে ভেবে মন খারাপ করত। ব্রিগেডের লোকজন-দের মধ্যে এ নিয়ে কথা কাটাকাটি তো হতই, এমন কি কখনও কখনও হাতাহাতি পর্যন্ত হয়েছে। একবার এক কাণ্ড হল—কাজের জায়গা থেকে তিন জন কয়েদী একটা মোটর-গাড়িতে চড়ে উধাও হয়ে গেল, যাবার সময় সঙ্গে নিয়ে গেল রুটিভর্তি পুরো একটা কাঠের বাক্স। তখনই কর্তাদের টনক নড়ল—গার্ডরুমে নিয়ে গিয়ে কাঠের বাক্সগুলো চেলা করা হল। কর্তারা বললেন, এবার থেকে যে যার রুটি নিজে বয়ে নিয়ে যাবে।

সকালবেলায় ওদের আরও একটা জিনিস দেখতে হত—জেলখানার কুর্তার তলায় যেন কেউ সাধারণ লোকের পরিচ্ছদ পরে বেরোতে না পারে। সেসব পরিচ্ছদ যার যা ছিল সবই তো জেলে ঢোকানোর সঙ্গে সঙ্গে কবে কেড়ে রেখেছে। আর নেবার সময়ই বলে দিয়েছে। মেয়াদ শেষ হওয়ায় আগে কেউ সে সব ফেরত পাবে না। এ ক্যাম্প থেকে আজ পর্যন্ত কেউ

কেউ মেয়াদ খেটে বেরোতে পারে নি।

সেইসঙ্গে সেপাইদের এটাও দেখতে হত যে, বাইরের লোকদের দিয়ে চিঠি পাঠাবার জন্যে কেউ সঙ্গে কোনো চিরকুট নিয়ে যাচ্ছে কিনা। চিঠির জন্যে প্রত্যেককে দস্তুরমত তল্লাসি করতে গেলে ঐ করতেই দুপুরের খাওয়ার সময় হয়ে যেত।

কিন্তু ভল্‌কোভোই কী যেন চেঁচিয়ে বলতেই সেপাইরা সব ধাঁ করে হাতের দস্তানা-গুলো খুলে ফেলল, কয়েদীদের বলা হল কোট আর শার্টের বোতামগুলো খুলতে—যার আড়ালে তারা সযত্নে জমিয়ে রেখেছিল ব্যারাকের ঈষদুষ্ণতা। তারপর সেপাইরা জনে জনে দেখতে লেগে গেল আইন অমান্য করে কোনো কয়েদী বাড়তি কোনো কাপড়চোপড় পরেছে কিনা। একজন কয়েদীর গায়ে থাকবে দুটো করে শার্ট—একটা ভেতরে, একটা তার ওপর। দুটোর বেশী থাকলেই খুলে ফেলতে হবে। কয়েদীরা ভল্‌কোভোইয়ের এই হুকুমের কথা লাইন থেকে লাইনে মুখে মুখে রটিয়ে দিল। যেসব ব্রিগেড এর আগে বেরিয়ে যেতে পেরেছে—তারা বেঁচে গেল। কোনো কোনো ব্রিগেড এর আগেই গেটের বাইরে চলে গেছে। যারা থেকে গেছে—তাদেরই মরণ! খোলো শার্ট। যার গায়ে বাড়তি যা কিছু আছে খুলে দাও এই কন্‌কনে ঠান্ডায়।

গোড়ায় এইভাবেই শুরু হল, কিন্তু তারপরই ফ্যাচাং দেখা দিল। গেট খালি হয়ে যেতেই গেটে দাঁড়িয়ে সেপাইরা হাঁক জুড়তে লাগল,—দাঁড়িও না, চলে এসো, দাঁড়িও না, চলে এসো। ফলে ১০৪নং ব্রিগেডের বেলায় ভল্‌কোভোই একটু আল্গা দিল। বলল, কারো গায়ে অননুমোদিত কাপড়জামা থাকলে এক্ষুণি খোলবার দরকার নেই—পাহারাঅলা সেপাইরা তাদের নাম টুকে রাখবে। লিস্টিভুক্ত লোকেরা সন্ধ্যেবেলায় যেন তাদের বাড়তি জামাকাপড় ভান্ডারীর কাছে জমা দেয়। জমা দেবার সময় তাদের লিখে জানাতে হবে কেন এবং কিভাবে তারা ওসব জিনিস লুকিয়ে রেখেছিল।

শুখভের গায়ে যা কিছু ছিল সবই জেলখানায় পাওয়া। এই আমি, কল্‌জের ভেতরে বাইরে হাত দিয়ে দেখে নাও। কিন্তু ৎসেজার মার্কোভিচের গায়ে বাড়তি একটা ফ্ল্যানেলের ভেস্ট আর বুইনভ্‌স্কিরও একটা ভেস্ট ধরনের বা কোমরবন্ধ গোছের জিনিস। সেপাইরা লিস্টি করে নিল। বুইনভ্‌স্কি ফোঁস করে উঠল। নৌবহরে থেকে তার চেঁচানোর অভ্যেস বন্দীশিবিরে মোটে তিন মাস হল সে এসেছে।

—ঠান্ডার মধ্যে মানুষকে খালি গা করার তোমাদের কোনো অধিকার নেই। ফৌজদারি আইনের ন' নম্বর ধারায় কী লেখা আছে, জানো না তোমরা?

অধিকার তাদের আছে এবং আইন তাদের জানা আছে। একা তোমারই, ব্রাদার, আক্কেল হয় নি এখনও।

বুইনভ্‌স্কি আবার বলল,—তোমরা সোভিয়েট দেশের মানুষ নও! তোমরা কমিউনিস্ট নও!

ন' নম্বর ধারা নিয়ে বলাতেও ভল্‌কোভোই গায়ে মাখে নি, কিন্তু শেষের খোঁটাটা তার সহ্য হল না। রাগে ফেটে পড়ে বলে উঠল,—দশ দিনের সেল-হাজত!

জমাদারকে পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল,—আজই সন্ধ্যে থেকে।

সকালবেলায় লোককে সেলে আটক করাটা ওরা ঠিক পছন্দ করে না। তাতে খামাখা কাজের ঘণ্টাগুলো নষ্ট হয়। কাজেই দিনের বেলাটা হাড়ভাঙা খাটুনি খাটুক, তারপর সন্ধ্যেবেলায় সেলে যাক।

যে মাঠে কয়েদীরা ফাইলে দাঁড়ায়, তার ঠিক পরেই ক্যাম্পের হাজত—কয়েদীদের সাজা পাওয়ার জায়গা। দু-সার পাকা দালান। এবার শীতের আগে দ্বিতীয় সারিটা নতুন তৈরি হয়েছে। প্রথমটাতে জায়গার টান পড়ছিল। এই হাজতটাতে আঠারোটা সেল আছে; এই সেলগুলোকে আবার ভাগ ভাগ করে ছোট ছোট নির্জন কুঠুরিতে একেকজন করে রাখার ব্যবস্থা। গোটা বন্দীশিবিরটা কাঠ দিয়ে তৈরি; হাজতটাই শুধু কংক্রিটের তৈরি।

শুখভের শার্টের তলায় কন্‌কনে ঠান্ডা একবার সেই যে ঢুকে পড়েছে, কিছুতেই তাকে আর তাড়ানো যাচ্ছে না। কয়েদীরা অনর্থক নিজেদের গায়ে জামা কাপড় জড়িয়েছে। শুখভের পিঠ আবার টন্‌টন্ করতে শুরু করল। ইস্, এক্ষুণি এই মুহূর্তে হাসপাতালের বিছানায় লম্বা হতে পারলে কী ভালই না লাগত—যদি ঘুমের কোলে ঢলে পড়তে পারত। এর বেশী আর কিছু সে চায় না। কম্বল যত ভারী হয় ততই তার ভাল।

গেটগুলোর সামনে কয়েদীরা দাঁড়িয়ে জামার বোতাম আঁটতে আঁটতে কাঁধে কাঁধ দিয়ে দাঁড়াচ্ছে। তাদের দল বেঁধে নিয়ে যাবার জন্যে গেটের বাইরে সেপাইরা অপেক্ষা করছে।

—দাঁড়িও না, পা চালাও! দাঁড়িও না, পা চালাও!

কাজ বরাদ্দ করার অফিসারটি পেছন থেকে কয়েদীদের ঠেলতে ঠেলতে বলছে, —দাঁড়িও না, পা চালাও! দাঁড়িও না, পা চালাও!

পয়লা গেট। ক্যাম্পের সীমাসরহদ্দ। দোসরা গেট। গুমটি ঘরের ঠিক পরেই দুদিকে লোহার রেলিং দেওয়া।

পাহারাদার সেপাই হঠাৎ হেঁকে উঠল,—থামো সব! লোকগুলো যেন ভেড়ার পাল। পাঁচ জন পাঁচ জন করে আলাদা হয়ে দাঁড়াও।

ক্রমশ আলো ফুটছে। গুমটির ওধারে সেপাইদের পাতা-জ্বালানো আগুন পুড়ে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে। ফাইলে দাঁড়ানোর আগে বরাবরই কয়েদীরা আগুন পুইয়ে নিয়ে শরীরটাকে গরম করে নেয়—সে আগুনের আলোয় লোক গণ্‌তি করতেও সুবিধে হয়।

গেটের একজন সেপাই চিল-চিৎকার করে গুণতে লাগল,—এক! দুই! তিন!

পাঁচজন পাঁচজন করে আলাদা হয়ে গিয়ে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে পড়তে লাগল—যাতে সামনে থেকে আর পেছন থেকে স্পষ্ট দেখা যায় পাঁচটা মুন্ডু, পাঁচটা পিঠ, দশটা ঠ্যাং।

আরেকজন গেটের সেপাই আরেকদিকের রেলিঙে ভর দিয়ে নিঃশব্দে গুণে যেতে লাগল। তার একমাত্র কাজ গুণ্‌তিতে কোনো ভুল হচ্ছে কিনা দেখা। তাছাড়া একজন লেফটেনাণ্টও দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নজর রাখছে।

ও এসেছে ক্যাম্প থেকে।

পাহারা দেওয়া যাদের কাজ, তাদের কাছে মানুষ সোনার চেয়েও দামী। কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে একজন লোকও যদি খোয়া যায়, যারা পাহারা দেয় তাদের একজনকে দিয়ে শূন্য স্থান পূরণ করা হবে।

ব্রিগেডের লোকজনরা আবার সব এক জায়গায় হল। যে সার্জেন্ট কয়েদীদের কাজে নিয়ে যাবে, সে এবার গুণতে শুরু করল,—এক! দুই! তিন!

আবার বিগ্রেডের লোকজনেরা পাঁচজন পাঁচজন করে ভাগ হয়ে গিয়ে আলাদা আলাদা-ভাবে লাইনবন্দী হয়ে এগোতে লাগল।

কন্‌ভয় গার্ডের সহকারী কর্তা ওধারে দাঁড়িয়ে গোণা ঠিক হচ্ছে কিনা পরখ করতে লাগল।

আবার একজন সার্জেণ্ট।

এ হল কয়েদীদের কাজে নিয়ে যাবার দলের লোক।

পাহারা যারা দেবে তাদের ভুল করার উপায় নেই। ভুল করে যদি একটিও বাড়তি মাথা গুণতি করে বসে, তাহলে তাদেরই মাথা থাকবে না।

চারদিকে গিজ গিজ করছে কন্‌ভয় গার্ড। তারা অর্ধচন্দ্রাকার হয়ে কয়েদীদের বেড় দিয়ে রয়েছে। হাতে হাতে সাব-মেশিনগান কয়েদীদের নাক বরাবর উঁচিয়ে ধরা। ছাই-রঙের সব কুকুর নিয়ে পাহারাওয়ালা সেপাইরা দাঁড়িয়ে। একটা কুকুর এমনভাবে দাঁত বার করে আছে যে, মনে হয় কয়েদীদের দেখে হাসছে। কন্‌ভয় গার্ডদের মধ্যে ছ জন ছাড়া আর সকলের গায়েই ভেড়ার চামড়ার খাটো জামা; শুধু ছ জনের গায়ে পুরো মাপের ওভার-কোট। দিনের বেলায় লম্বা ঝুলের ওভারকোট শুধু তাদেরই দেওয়া হয় যাদের ওয়াচ-টাওয়ারে উঠে পাহারা দিতে হয়।

এরপর আবার বিগ্রেডগুলো একাকার হয়ে গেলে কন্‌ভয় গার্ডেরা গোটা বিজলী স্টেশনের দলটাকে পাঁচ জন পাঁচ জন করে গুনে নিল।

বুইভ্‌স্কি কার্যকারণ ব্যাখ্যা করে বলল,—ভোরের দিকেই সবচেয়ে বেশী ঠাণ্ডা পড়ে; তার কারণ, রাত্তিরের তাপ কমতে কমতে ঐ সময় একদম নিম্নতম মাত্রায় এসে ঠেকে।

বুইনভ্‌স্কি সব কিছুরই ব্যাখ্যা দিতে ভালবাসে। কোন্ বছরে কোন্ দিন কোন্ তিথি, শুক্লপক্ষ না কৃষ্ণপক্ষ—বুইনভ্‌স্কিকে জিজ্ঞেস করলেই বলে দেবে।

সবাই চোখের ওপর দেখতে পাচ্ছে বুইনভ্‌স্কি নিজেই দিনকে দিন কি রকম শুকিয়ে যাচ্ছে। গালদুটো ভেঙে গেছে, কিন্তু তার মন একটুও ভাঙে নি।

বাইরে খোলা জায়গায় হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে ঠাণ্ডা হাওয়া। শুখভ যে শুখভ, সবই যার গা-সওয়া—তারও মনে হল ঠাণ্ডায় নাক মুখ জমে গিয়েছে। কাজের জায়গায় যাবার সময় সারা পথ দাঁতে হাওয়া লাগবে—এটা বুঝতে পেরে শুখভ মাথায় ন্যাকড়া জড়িয়ে নেবে ঠিক করল। এই ধরনের হাওয়ার হাত থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে দুদিকে লম্বা ফিতে দেওয়া ন্যাকড়া শুখভ সব সময় নিজের কাছে রাখত। কয়েদীদের অনেকের কাছেই এই রকমের ন্যাকড়া থাকত; এ জিনিসটাকে তারা খুবই কাজের বলে মনে করত। চোখের নীচে পর্যন্ত ন্যাকড়ায় মুখ ঢেকে কানের তলা দিয়ে ফিতে দুটো টেনে নিয়ে গিয়ে পেছন দিকে গিঁঠ দিয়ে বেঁধে দিল। তারপর টুপির পেছনটা দিয়ে ঘাড়ের কাছটা ঢেকে দিয়ে ওভার-কোটের কলারটা তুলে দিল। তারপর টুপির সামনের অংশটা কপালের ওপর নামিয়ে নিল। এবার আর চোখদুটোতে ছাড়া মুখের আর কোথাও হাওয়া লাগার জো রইল না। এক টুকরো দড়ি দিয়ে শুখভ কোমরের কাছে ওভার কোটটা কষে বেঁধে নিল। এতে করে পুরোটাই বেশ আঁটোসাটো আর গরম থাকল। হাতমোজা দুটো পাতলা হওয়ায়, শুখভের হাতদুটো ইতিমধ্যেই ঠাণ্ডায় সিঁটিয়ে এসেছিল। শুখভ তার হাতদুটো জোড়া করে ঘষতে লাগল, তালি দিতে লাগল—কেননা এরপর সারাটা রাস্তাই তো হাত দুটো পেছনে জোড়া করে হেঁটে যেতে হবে।

গার্ডদের কর্তার রোজকার সেই 'কথামৃত' শুনে শুনে কয়েদীদের কান পচে গিয়েছিল, —শোনো সব, কয়েদীদের বলছি! যখন যে অর্ডার দেওয়া হবে, প্রত্যেকে মেনে চলবে। লাইন যেন কেউ না ভাঙে; ছুটবে না কেউ; যে পাঁচজনের মধ্যে যার জায়গা সেইখানেই সে থাকবে, কেউ জায়গা বদল করবে না। কেউ যেন মুখ না খোলে; ডাইনে বাঁয়ে না তাকায়;

হাতদুটো পেছন দিকে ধরা থাকবে। ডাইনে বাঁয়ে কেউ এক পা এগিয়ে গেলেই ধরে নেওয়া হবে সে পালাবার চেষ্টা করছে—কন্‌ভয় গার্ড বিনা বাক্যব্যয়ে সঙ্গে সঙ্গে তাকে গুলি করবে! আচ্ছা, আগে যে আছ—চলতে শুরু করো।

সঙ্গে সঙ্গে সামনের দুজন গার্ড রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করে দিল। কয়েদীদের দলটা সামনের দিকে হুড়মুড় করে এগিয়ে গেল। ডাইনে বাঁয়ে বিশ হাত জায়গা ছেড়ে সামনে পেছনে দশ হাত দূরে দূরে থেকে সাব-মেশিনগান উঁচিয়ে পাহারাদার সেপাইয়ের দল মার্চ করে চলল।

একটা সপ্তাহ তুষারপাত হয় নি। রাস্তাটা ক্ষয়ে ক্ষয়ে আকাট পিছল হয়ে আছে। ক্যাম্প পেরোতেই তেরছা হয়ে ওদের মুখের ওপর হাওয়া এসে বাড়ি মারতে লাগল। হাতগুলো পেছনদিকে জোড়া করা, মাথাগুলো নোয়ানো—কয়েদীদের দলটাকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন মৃতদেহ সৎকার করতে নিয়ে যাচ্ছে। চলতে চলতে সামনের দু'তিন জন লোকের শুধু পায়ের পাতা দেখা যাচ্ছে, শুধু পায়ের পাতা—আর সেইসঙ্গে এক খণ্ড পদদলিত মাটি, যার ওপর তোমার নিজের পাদুটো এসে পড়ছে। থেকে থেকে কোনো পাহারাদার সেপাইয়ের হাঁক শোনা যাচ্ছে,—উ-৪৭! হাতদুটো পেছনে করো! ব-৫০২! এগিয়ে যাও! ক্রমে ক্রমে এসব হাঁকডাক কমে আসতে লাগল। হাওয়া ওদের মুখে কেটে কেটে বসছে, ভাল করে চোখ চেয়ে ছাই দেখতেও পাচ্ছে না। ন্যাকড়া দিয়ে মুখ ঢাকা ওদের বারণ। ওদের চাকরিটাও বড় বেশী সুখের নয়!

ঠাণ্ডার দিন না হলে লাইনে দাঁড়িয়ে প্রত্যেকেই কথাবার্তা বলে—তা সে গার্ডের দল যতই চেঁচামেচি করুক। কিন্তু আজ সবাই শীতে কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। প্রত্যেকেই তার সামনের লোকটার পেছনে নিজেকে আড়াল করে রেখে গভীর চিন্তার মধ্যে ডুবে আছে।

বন্দীদের চিন্তাগুলোও স্বাধীন নয়। শুখভের ভাবনাগুলো কেবল একই জিনিস নিয়ে জাবর কাটছে। তোশকের ভেতর থেকে রুটির টুকরোটা ওরা খুঁজে বার করবে না তো? হাসপাতাল থেকে সন্ধ্যেবেলায় ওর ছুটির বন্দোবস্তটা হবে তো? বুইনভ্স্কিকে শেষ পর্যন্ত সেলে সত্যিই আটক হতে হবে নাকি? ৎসেজার কোত্থেকে অমন গরম আণ্ডার-ওয়্যার জোটাল? ও নিশ্চয় ভাণ্ডারীদের কাউকে ঘুষ দিয়ে নিজের জিনিসটা বাগিয়েছে? নইলে পেল কোত্থেকে?

বরাদ্দ রুটিটুকু ছাড়াই আজ সকালের খাবারটা খেতে হওয়ায়—তার ওপর খাবারটা ছিল জুড়নো—আজ তার মনেই হচ্ছে না সে খেয়েছে। পেটের মধ্যে যাতে ক্ষিধেয় মোচড় দিয়ে না ওঠে, যাতে খাই-খাই ভাব পেয়ে না বসে, তার জন্যে ক্যাম্পের বিষয়ে ভাবনা বন্ধ করে শুখভ বাড়িতে কী চিঠি লিখবে তাই নিয়ে ভাবতে শুরু করে দিল।

যেতে যেতে পাশেই পড়ল কয়েদীদের তৈরি সেই জায়গাটা যেখানে কাঠের কাজ হয়; আরও খানিকটা গিয়ে কয়েদীদের তৈরি মাটকোঠা, যেখানে জেলের কয়েদী নয় এমন মজুররা থাকে; আরেকটু এগিয়ে কয়েদীদের তৈরি নতুন ক্লাবঘর—যে-সব মজুর জেলের কয়েদী নয় একমাত্র তারাই সেখানে সিনেমা দেখে। লোকালয় ছাড়িয়ে লোকগুলো যখন খোলা মাঠে এসে পড়ল, তখন তাদের সপাটে হাওয়ার মুখোমুখি হতে হল। সামনে সূর্যোদয়ের লাল আভা আকাশে ছড়ানো। দিগন্তের উত্তরে দক্ষিণে দিগম্বর হয়ে রয়েছে শ্বেতশুভ্র তুষার। যতদূর দৃষ্টি যায়, ধু ধু করছে মাঠ—কোথাও কোনো গাছ নেই।

নতুন বছর আরম্ভ হয়েছে। ১৯৫১ সাল। বারো মাসের মধ্যে যখনই হোক দুটো চিঠি লিখতে পারবে, দুটো চিঠি পেতে পারবে শুখভ। বাড়িতে শেষ চিঠি সে লিখেছে জুলাই মাসে; সে চিঠির উত্তর পেয়েছে শুখভ অক্টোবরে। উস্‌ৎ-ইঝ্‌মায় ছিল অন্য রকম ব্যবস্থা—ইচ্ছে করলে সেখানে মাসে একটা করে লেখা যেত। কিন্তু অত লেখবার আছেই বা কী? সেখানে থাকতে শুখভ মোটেই বাড়িতে এর চেয়ে ঘন ঘন চিঠি লিখত না।

শুখভ বাড়ি ছেড়ে এসেছে ১৯৪১ সালের ২৩শে জুন। তার আগের দিন ছিল রবিবার। পোলোম্‌নিয়ার গির্জায় সেদিন এক জমায়েত ছিল; জমায়েতে এসে লোকে বলল যুদ্ধ বেধেছে। খবরটা পোলোম্‌নিয়ার ডাকঘরের লোকেরা শুনেছিল; তেম্‌গেনিয়েভোতে কিন্তু যুদ্ধের আগে কারো বাড়িতে রেডিও ছিল না। শুখভের বউ লিখেছে এখন সব বাড়িতেই রেডিওর হৈ-হট্টগোল—রেডিও বলতে তার-খাটানো লাউডস্পীকার।

আজকাল চিঠি লেখা তো নয়, যেন অথৈ দীঘিতে নুড়ি ছুঁড়ে মারা। টুপ্‌ করে পড়ল আর ভুস্‌ করে বেমালুম হাওয়া হয়ে গেল। ব্রিগেডের ব্যাপার স্যাপার নিয়ে, ফোরম্যান আন্দ্রেই প্রোকোফিয়েভিচ তিউরিনকে কেমন লাগে না লাগে এসব নিয়ে কিছু লিখতেই ইচ্ছে করে না। বাড়ির লোকজনদের চেয়ে এখন বরং ঐ লাৎভিয়ান কিলগাসের সঙ্গে শুখভ ঢের বেশী মনের মিল খুঁজে পায়।

বাড়ির লোকেরাও তাই—বছরে দুটো করে চিঠি পাঠাতে পারে। কিন্তু ওরা কিভাবে আছে না আছে চিঠি পড়ে কিচ্ছু বোঝবার জো নেই। শুখভের বউ লিখেছে, ওখানকার যৌথ খামারের নতুন একজন সভাপতি হয়েছে। নতুন লোক তো ফি বছরই হয়। যৌথ খামার নাকি ঢেলে বড় করা হয়েছে—আরে ভাই, বড় তো আগেও করা হয়েছিল, পরে আবার ছোট করে ফেলা হয়। হুঁ, আর যারা যৌথ খামারে তাদের বরাদ্দ কাজ পুরো করতে পারে নি, তাদের খোদ চাষের জমি কমিয়ে দেড় বিঘেরও কম করা হয়েছে—কেউ কেউ তো বলতে গেলে কিছুই পায় নি।

শুখভের বউ যৌথ খামারের ব্যাপারে কী যে ছাই লিখেছে শুখভ মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারে নি। শুখভের বউ লিখেছে যুদ্ধের পর যৌথ খামারে নতুন লোক একজনও আসে নি। ছেলেছোকরার দল এবং অন্য যারাই পারে তারাই দলে দলে শহরে গিয়ে কারখানায় ঢুকে পড়ছে কিংবা ঘাসের চাপড়া দিয়ে জ্বালানী তৈরির কাজে চলে যাচ্ছে। যারা যুদ্ধে গিয়েছিল তাদের মধ্যে অর্ধেক লোক আর ফিরে আসে নি। যারা ফিরে এসেছিল তারা আর যৌথ খামারের দিকে ফিরে তাকায় নি। বাড়িতেই তারা থাকে কিন্তু কাজ করে অন্য। যৌথ খামারে থেকে গিয়েছিল শুধু ফোরম্যান জাখার ভাসিলিচ আর চুরাশী বছরের বুড়ো ছুতোর মিস্ত্রি তিখন। তিখনের বিয়ে খুব বেশীদিন আগে হয় নি—ছেলেপুলেও হয়েছে। যৌথ খামারের পত্তন হয় এখানে ১৯৩০ সালে—তখনও যে মেয়েরা ছিল এখনও তারাই এটাকে চালিয়ে যাচ্ছে।

শুখভের মাথায় কিছুতেই ঢোকে না 'বাড়িতেই তারা থাকে কিন্তু কাজ করে অন্য' এ কী করে হয়? চাষীরা এক সময়ে যে যার নিজের জমিতে লাঙল দিত, পরে তারা যৌথ খামারে যোগ দিল—দুটো যুগই শুখভ দেখেছে। কিন্তু শুখভ বুঝতেই পারে না—চাষীরা নিজেদের গ্রামে কাজ করবে না, এ কেমন করে হয়? এ জিনিস কিছুতেই সে বরদাস্ত করতে পারে না। তাহলে কি ওরা বাইরে যায় মরশুমী ধরনের কাজকর্ম করতে? খড় কাটবার সময় গ্রামের তাহলে কী হাল হয়?

শুখভের বউ লিখেছে, বাড়িঘর ছেড়ে বাইরে মরশুমী কাজ করতে যাওয়া—সে সব পাট অনেকদিন আগেই উঠে গেছে। এক সময়ে এদিককার কাঠের কারিগরদের বেশ নাম-ডাক ছিল, কিন্তু এখন আর ছুতোরমিস্ত্রিরা কোনো কাজকর্ম পায় না; চাহিদা নেই বলে ঝুড়ি বোনার কাজও এখন আর হয় না। সে জায়গায় লোকে এক মজাদার ব্যবসা ফেঁদে বসেছে—গালচে রং করার ব্যবসা। প্রথমে যুদ্ধফেরত একজন লোক টিন কেটে তার ওপর রং বুলিয়ে নক্সা করার ব্যাপারটা শিখে এসে এখানে চালু করে। তারপর থেকে ক্রমেই বেশী বেশী লোক এই কাজে ভিড় করতে থাকে। এরা কোনো কিছুর সংগে যুক্ত ছিল না, কোনো একটা জায়গায় থেকে কাজ করত না। খড় কাটা বা ফসল কাটার সময় মাসখানেক থেকে যৌথ খামারের কাজে সাহায্য করত—তারপর যৌথ খামার থেকে এই মর্মে একটা ছাড়পত্র জুটিয়ে নিত যে : এই যৌথ খামারের সদস্য অমুক চন্দ্র অমুককে এতদ্বারা ব্যক্তিগত কার্যব্যপদেশে স্থানত্যাগের অনুমতি দেওয়া হল এবং উপরোক্ত ব্যক্তির কাছে যৌথ খামারের কোনো বাকিবকেয়া পাওনা নেই। এই ছাড়পত্রটি পেয়ে গেলে এরা সারা দেশ চক্কর দিতে পারে। সময় সংক্ষেপ করার জন্যে এরা এমন কি প্লেনে চড়েও ঘোরাঘুরি করে; এদের পকেটে থাকে হাজার হাজার টাকা। গালচে রং করার জন্যে হেন জায়গা নেই যেখানে তারা যায় না। বাড়িতে পুরনো চাদর বা কম্বল থাকলে পঞ্চাশ রুবলে এরা গালচের মত করে রং করে দেয়। সময়ও লাগে খুব কম—ঘণ্টাখানেকের মত। ইভানের বউয়ের খুব ইচ্ছে ইভানও বাড়ি ফিরে এসে রং করার কাজ নেয়। এখন ইভানের বউকে যেভাবে কষ্টেসৃষ্টে দিন চালাতে হচ্ছে, ইভান রং করার কাজ নিলে আর তাদের সে অভাব থাকবে না; তখন তারা ছেলেমেয়েদের টেকনিক্যাল স্কুলে পড়াতে পারবে; ভাঙাচোরা কুঁড়েঘরের বদলে তখন তারা নতুন একটা দালান তুলতে পারবে। যারা গালচে রং করার কাজ করে, তারা সবাই নতুন নতুন বাড়ি করছে। রেল-রাস্তার কাছোপিঠে বাড়ি করতে গেলে এখন আর আগের মত পাঁচ হাজার রুবলে হয় না—এখন লাগে পঁচিশ হাজার রুবল।

শুখভ তার উত্তরে বউকে লিখেছিল : জীবনে কখনও ছবি এঁকেছে বলে তার মনে পড়ে না, সেক্ষেত্রে কী করে সে রং-তুলির কাজ করবে? আর কী ধরনেরই বা আজব গালচে ওসব—গালচেগুলোতে থাকে কী? শুখভের বউ তার উত্তরে লিখেছিল : নেহাৎ মাথায় গোবর পোরা না থাকলে যে-কেউ ও-ছবি আঁকতে পারে, স্টেনসিল ফেলে ফাঁকগুলো দেখে দেখে দমাদ্দম তুলি বুলিয়ে যাও। রকম রকম নক্সা আছে। গালচের একটা ধরন আছে, তার নাম 'ত্রোইকা'—এক হুসার অফিসার রাজকীয় চালে তিন ঘোড়ায় টানা চমৎকার একটা গাড়ি হাঁকিয়ে চলেছে। দ্বিতীয় ধরনটার নাম 'বল্গাহরিণ' আর তৃতীয়টা হল পারস্যের গালচের নকল। ডিজাইন বলতে এই ক'টাই। কিন্তু দেশের যেখানেই যাও লোকে এই পেলেই খুশী হয়ে তোমাকে ধন্যবাদ দেবে—বলতে কি, তোমার হাত থেকে ছোঁ মেরে নেবে। তার কারণ, প্রকৃত গালচের দাম যেখানে কয়েক হাজার রুবল, সেখানে তারা এ জিনিস পাচ্ছে মোটে পঞ্চাশ রুবলে।

শুখভের খুব ইচ্ছে করে এই রকমের একটা গালচে নিজের চোখে দেখতে।

বছরের পর বছর বন্দীশিবির আর জেলখানায় থেকে থেকে ইভান দেনিসোভিচের কালকে কী হবে, এক বছর পরে কী হতে পারে এবং সংসারের লোকজনদের গ্রাসাচ্ছাদনের কী ব্যবস্থা করবে—এসব বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করবার অভ্যেসটাই চলে গেছে। তাকে কিছুই ভাবতে হয় না, ক্যাম্প যারা চালায় তারাই এ নিয়ে মাথা ঘামিয়ে থাকে; এক হিসেবে তাতে

ব্যাপারটা অনেক সহজ হয়েছে। তাছাড়া এখনও পুরো দু বছর তাকে মেয়াদ খাটতে হবে। কিন্তু ঐ গালচের ব্যাপারটা তাকে সত্যিই বেশ ভাবিয়ে তুলেছে।

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, এ রকম একটা ব্যবসায় টাকা রোজগার করাটা কিছুই নয়। পাড়াপড়শীরা সবাই যখন এ কাজে নেমে পড়েছে। তখন কেনই বা শুখভ তাদের পেছনে পড়ে থাকবে। বরং তাতে তার আঁতে ঘা লাগবে।...হাজার হলেও, আসলে কিন্তু শুখভ গালচের ব্যাপারটাতে জড়িয়ে পড়তে চায় না। ও জিনিস করতে হলে, বোলচাল আর হামবড়া ভাব থাকা দরকার। কাউকে না কাউকে তেল দিতে হবে। শুখভ এই পৃথিবীর মাটিতে পা দিয়ে আছে চল্লিশ বছর। অর্ধেক দাঁত তার এর মধ্যেই পড়ে গেছে। মাথায় টাক গজিয়েছে। কিন্তু আজও কাউকে সে ঘুষ দেয়ও নি, ঘুষ নেয়ও নি। এমন কি ক্যাম্প-জীবনেও ও ব্যাপারটাতে তার কখনও হাতেখড়ি হয় নি।

যে টাকা সহজে আসে, সে টাকার কোনো ওজন নেই—মনেই হবে না ওটা তোমার রোজগারের টাকা। সেকেলে বুড়োরা বেশ একটা ভাল কথা বলত; বলত—যদি না পুরো দামে কেনো, বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছুবে না জেনো। শুখভের এখনও খাটবার ক্ষমতা আছে, নানা রকম কাজও তার জানা আছে। ছাড়া পাওয়ার পর চুল্লী বানাবার কাজ, ছুতোরমিস্ত্রির কাজ, টিনের জিনিস তৈরির কাজ সে কি আর একটা জুটিয়ে নিতে পারবে না?

তবে এমন হতে পারে যে, জেলে ছিল বলে তাকে কেউ কাজে নেবে না। গ্রামের বাড়িতে গিয়ে তাকে উঠতে না দিতে পারে। তখন ঐ গালচের কারবারে সে কোমর বেঁধে নেমে পড়তে পারবে।

কয়েদীর দল ততক্ষণে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গেছে; বিজলী স্টেশনের বাইরের দিকে গুমটি ঘরের সামনে তারা দাঁড়িয়ে রইল। তারও আগে কোণের দিক থেকে ভেড়ার চামড়ার ঢোল্লা ওভারকোট-পরা দুজন কন্‌ভয় গার্ড আড়াআড়িভাবে মাঠটা পেরিয়ে দূরের ওয়াচ-টাওয়ারের দিকে রওনা হল। প্রত্যেকটি ওয়াচ-টাওয়ারে পাহারা দেবার লোক গিয়ে না পৌঁছুনো পর্যন্ত কয়েদীদের তারা ভেতরে ঢুকতে দেবে না। কন্‌ভয় গার্ডদের কর্তা কাঁধে সাব-মেশিনগান ঝুলিয়ে ফাঁড়ির ভেতর ঢুকে গেল। ফাঁড়ির চিমনি থেকে গলগলিয়ে ধোঁয়া বেরোতে লাগল। ফাঁড়িটাতে ওরা সারা রাত একজন বেসামরিক চৌকিদার রেখে পাহারা দেওয়ায়—যাতে সিমেন্ট আর তক্তা চুরি যেতে না পারে।

কাঁটাতারের গেটটা পেরিয়ে অনেকখানি ফাঁকা জায়গা, তার ওপাশে অনেক দূরে কাঁটা-তারের বেড়া—তার পেছনে কুয়াশা ভেঙে প্রকাণ্ড লাল সূর্য উঠছে। শুখভের ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আলিওশা মহানন্দে সূর্যের দিকে তাকিয়ে আছে—ঠোঁটের কোণে তার স্মিত হাসি। গাল দুটো ভেঙে গেছে, যেটুকু বরাদ্দ পায় সেইটুকুই খায়, বাড়তি এক আধলাও রোজগার করে না—ওর কিসের অত আনন্দ? রবিবারে রবিবারে অন্য সব পাদ্রীদের জুটিয়ে নিয়ে বিড় বিড় ফিস্ ফিস্ করে। হাঁসের গায়ে যেমন জল বসতে পারে না, ওরাও তেমনি গা থেকে ক্যাম্পের এই জীবনটাকে ঝেড়ে ফেলে দেয়।

শুখভের মুখের ঢাকাটা তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে ভিজে জবজবে হয়ে উঠেছে। তাতে জায়গায় জায়গায় জমে গিয়ে বরফের একটা আস্তরণ পড়েছে। শুখভ তার মুখ থেকে সরিয়ে ন্যাকড়াটা গলার কাছে নামিয়ে দিয়ে হাওয়ার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। ঠাণ্ডাটা তার জামাকাপড়ের তলায় তেমন যেতে পারে নি, কিন্তু পাতলা হাতমোজার ভেতরে তার হাত দুটো জমে গিয়েছিল—বাঁ পায়ের আঙুলগুলোরও সেই অবস্থা। কোনো সাড় নেই।

তার বাঁ পায়ের ফেল্টের জুতোটা একদম ক্ষয়ে এসেছে। এর মধ্যেই দুবার সেলাই করে নিতে হয়েছে। শুখভের মাজা থেকে ঘাড় পর্যন্ত পিঠটা টন্‌টন্‌ করছে। এই ব্যথা নিয়ে কী করে সে কাজ করবে?

এদিক ওদিক তাকিয়ে শুখভ তার ব্রিগেডের ফোরম্যান তিউরিনকে দেখতে পেল। শেষের পাঁচজনের মধ্যে তিউরিন দাঁড়িয়ে। লোকটার কাঁধ চ্যাটালো, মুখটা চওড়া। সব সময় মুখ গোম্‌ড়া করে থাকে। দলের লোকেরা তার সামনে কোনো রকম হাসিমস্করা করতে পারে না; কিন্তু তারা যাতে ভাল খেতে পায় সেটা সে দেখে। লোকগুলোর রুটির বরাদ্দ কিভাবে বাড়ানো যায়, এই নিয়ে এখন সে খুব ভাবছে। এইবার নিয়ে তিউরিনের দুবার মেয়াদ খাটা হচ্ছে। ও হল যাকে বলে সত্যিকার 'গুলাগ'-সন্তান—'গুলাগ' হল সারা দেশের বন্দীনিবাসগুলো পরিচালনা করার সরকারী প্রতিষ্ঠান। ক্যাম্পের জীবন এবং রীতিনীতিগুলো আদ্যোপান্ত তার জানা আছে।

ক্যাম্পের কয়েদীদের কাছে দলের নেতাই হল সব। নেতা যদি ভাল হয়, তোমাকে সে দ্বিতীয় জীবন দেবে। নেতা খারাপ হলে কাঠের পোশাকে তোমার সর্বাঙ্গ মুড়ি দিয়ে সে মাটির তলায় পাঠিয়ে দেবে। আন্দ্রেই প্রোকোফিয়েভিচ তিউরিন। আন্দ্রেই উস্‌ৎ-ইঝ্‌মাতে থাকার সময় থেকেই শুখভকে চিনত। সেখানকার বারোয়ারী ক্যাম্পেই তাদের প্রথম দেখা হয়। কিন্তু ইভান তখন আন্দ্রেইয়ের ব্রিগেডে ছিল না। প্রতিবিপ্লবী অপরাধ ও কার্যকলাপে লিপ্ত থাকলে আইনের ৫৮তম ধারা প্রয়োগ করা হয়—এই ধারায় যাদের সাজা হয়েছিল, তাদের সবাইকে ঝেঁটিয়ে বিদায় করে দিয়ে উস্‌ৎ-ইঝ্‌মা থেকে কঠোর সশ্রম কারাদণ্ডের জায়গা এই বন্দীনিবাসে নিয়ে আসা হল। তিউরিন এই বন্দীনিবাসে এসে শুখভকে নিজের দলে জুটিয়ে নিল। ক্যাম্পের কর্তা, পরিকল্পনা আর উৎপাদন বিভাগ, কাজের জায়গার ওপরওয়ালা, ইঞ্জিনিয়ার—এদের কারো সঙ্গে শুখভের কোনো সংস্রব নেই। তার হয়ে তার দলের নেতাই ওদের সামনে লোহার মত শক্ত হয়ে দাঁড়াবে। তার প্রতিদানে তিউরিন যদি একটু ভুরু কুঁচকে তাকায়, আঙুলের ইশারা করে—অমনি শুখভকে সঙ্গে সঙ্গে ল্যাজ তুলে পালাতে হবে, যে সে চাইবে তাই করতে হবে। ক্যাম্পে আর যার চোখেই তুমি ধুলো দাও না কেন, আন্দ্রেই প্রোকোফিয়েভিচকে কিন্তু কক্ষনো ঠকিও না। এটাই হল এখানে বাঁচবার রাস্তা।

ফোরম্যান তিউরিনকে একটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাইছিল শুখভ—আগের দিন যেখানে তারা কাজ করেছিল সেখানেই আজ কাজ হবে, না অন্য কোথাও হবে? কিন্তু তিউরিনকে গম্ভীর মুখে ভাবতে দেখে তার চিন্তায় বাধা দিতে শুখভের দ্বিধা হল। বেচারা এইমাত্র সেই 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়নে'র ব্যাপারটা চুকিয়ে এসেছে এবং এখন সে 'কোটা ছাপিয়ে যাওয়া'র সমস্যাটা নিয়ে ভাবছে। তার মানে, পুরো ব্রিগেডের পরের পাঁচ দিনের খোরাক।

তিউরিনের মুখময় গোটা গোটা বসন্তের দাগ। যেদিক থেকে হাওয়ার ঝাপ্টা আসছে সেইদিকেই সে সটান মুখ ফিরিয়ে আছে। মুখ একটুও কুঁচকে নেই। তার মুখের চামড়া ওক গাছের বাকলের মত টান-টান।

কয়েদীরা আগাগোড়া দাঁড়িয়ে হাতে হাত ঘষছে, মাটিতে পা ঠুকছে। জঘন্য ইতর হাওয়া। দেখে তো মালুম হচ্ছে ছ'টা ওয়াচ-টাওয়ারের সব ক'টাতেই পাহারাদার চিড়িয়ারা খাড়া হয়ে গেছে। তবু ওরা কয়েদীদের বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। আরও একটু

হ‍্শিয়ার হয়ে নিয়ে তবে ওরা ছাড়বে।

বেশ খানিকক্ষণ পর গ্মটিঘর থেকে কন্‌ভয় গার্ডের কর্তা আর চেকিং অফিসার বেরিয়ে এসে গেটে দাঁড়াল। তারপর গেট খোলা হল।

—পাঁচ্চ্চ্ জন্ন্ন্ পাঁচ জন্ন্ন্! এক্ক্ক্! দ্ই!

কয়েদীরা তালে তালে পা ফেলছে যেন কুচকাওয়াজ করতে করতে চলেছে। একবার গেটের ভেতর ঢ্কে পড়তে পারলে হয়! সেখানে কেউ ওদের কাজের ওপর ওস্তাদি ফলাতে আসবে না।

গ্মটি ঘরের ঠিক পেছনেই অফিসবাড়ি। তার কাছেই দাঁড়িয়ে কর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক সমস্ত ব্রিগেডের ফোরম্যানদের ডাকছিল। ফোরম্যানরা সব হন্তদন্ত হয়ে ছ্টল। দেরও সেইদিকে যাচ্ছিল। নিজে কয়েদী হলেও, দের পেয়েছিল অধস্তন তত্ত্বাবধায়কের পদ। লোকটা পয়লা নম্বরের হারামী; কয়েদী ভাইদের সঙ্গে সে এমন ব্যবহার করত যেন তারা কুকুর বেড়ালেরও অধম।

আটটা তখন বেজে গেছে। আটটা বেজে পাঁচ। একট্ আগে জেনারেটর ট্রেনে আটটার বাঁশী বেজেছে। অফিসাররা ভয় পাচ্ছিল কয়েদীরা এই ব্ঝি বাজে সময় নষ্ট করে ফেলে, গা গরম করে নেবার জন্যে এখানে সেখানে ছিটিয়ে যায়। কিন্তু সামনে তো সারাটা দিন তাদের পড়েই আছে। তারা সব কিছ্রই ঢের সময় পাবে। গেট পেরিয়ে যারাই ভেতরে ঢ্কছে, নীচু হয়ে হয়ে এখান থেকে একটা ওখান থেকে একটা কাঠি কুড়িয়ে নিচ্ছে। আগ্ন জ্বালাবে। জামাকাপড়ের ল্কনো ফাঁকেফোকরে কাঠিগ্লো চালান করে দিচ্ছে।

তিউরিন তার সহকারী পাভ্লোকে তার সঙ্গে অফিসে যেতে বলল। ৎসেজারও একই দিকে হনহনিয়ে চলেছিল। ৎসেজার শাঁসালো লোক। মাসে দ্বার করে পার্সেলে তার নানা জিনিস আসে এবং তা থেকে দরকার মত একে তাকে ভেট দেয়। অফিসে তাকে হালকা কাজ দেওয়া হয়েছে; কয়েদীদের কাজ যাচাই করে দেখে যে অফিসার, ৎসেজার তার সহকারী।

১০৪নং ব্রিগেডের বাকি লোকজনেরা সঙ্গে সঙ্গে কাজের জায়গায় চলে গেল—চোখের সামনে থেকে কেটে পড়ো, চোখের সামনে থেকো না।

সামনে যে ময়দানটা খাঁ খাঁ করছে, তার মাথার ওপর কুয়াশায় জড়ানো লাল ট্কট্কে স্র্য উঠল। এক জায়গায় ওপারে বরফ জমে স্ত্পাকার হয়ে রয়েছে ঘর-বাড়ির তৈরি কাঠামোর জোড়া দেবার অংশগ্লো। এক জায়গায় ভিতের ওপর খানিকটা গাঁথনি হয়ে পড়ে আছে। এক জায়গায় ফেলে-দেওয়া একটা মাটি খোঁড়ার যন্ত্র, এক জায়গায় একটা কোদাল, আরেক জায়গায় একগাদা লোহালক্কড় পড়ে রয়েছে। চারিদিকে গর্ত আর গড়-খাইয়ের ছড়াছড়ি। মোটর সারানোর কারখানাটা তৈরি হয়ে গেছে, এখন শ্ধ্ ওপরটা বাকি। একটা ঢিপি মতন জায়গায় বিজলী স্টেশন তৈরির কাজ চলেছে: দোতলা হয়ে গিয়েছে, তেতলা হচ্ছে।

সবাই যে যার গা ঢাকা দিয়েছিল। একমাত্র দেখা যাচ্ছিল টঙের ওপর পাহারাদার ছ'জন সেপাইকে—আর অফিস-বাড়ির পাশে ব্যস্তসমস্ত কিছ্ লোককে। এই হল এখন আমাদের মওকা। কর্মশালার তত্ত্বাবধায়ক বহ্বার এই বলে শাসিয়েছে যে, আগের দিন রাত্রেই সে ব্রিগেডগ্লোর কাজ ভাগ করে রাখবে; কিন্তু সন্ধ্যে থেকে সকালের মধ্যে সব প্ল্যান ভেস্তে যায় বলে এ পর্যন্ত কোনোদিনই তার পক্ষে আগে থেকে কাজ ভাগ করে রাখা

সম্ভব হয় নি।

সুতরাং এই সময়টা আমাদের দখলে। কর্তার দল যখন কাজ ঠিক করতে ব্যস্ত, যে যেখানে পারো গা ঢাকা দাও। যেখানে একটু গরম পাও, লুকিয়ে পড়ো। বসে পড়ো, বসো। মিছিমিছি দাঁড়িয়ে থেকে কষ্ট পাওয়ার মানে হয় না। যদি কাছাকাছি আগুনের চুল্লী থাকে, পায়ের পট্টিগুলো খুলে তাতিয়ে নিলে ভাল হয়। তাহলে সারাদিন তোমার পা দুটো গরম থাকবে। হাতের কাছে চুল্লী থাক না থাক, বসা ভাল।

১০৪নং ব্রিগেডের লোকেরা মোটর মেরামতী কারখানার একটা প্রকাণ্ড হলের ভেতর ঢুকে গেল; শীতের ঠিক আগে এখানে কাঁচের জানলা বসানো হয়েছে—৩৮নং ব্রিগেড এখন কংক্রিট ঢালাইয়ের কাজ করছে। কংক্রিটের কিছু কিছু চাঙ্গড় ফর্মায় আঁটা রয়েছে আর কিছু কিছু রয়েছে দাঁড় করানো অবস্থায়। একদিকে মশলা তৈরির জাল। কাঁচা মেঝে, উঁচু ছাদ। এমনিতে এ বাড়ির ঘর গরম থাকার কথা নয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগুনের আঁচে ঘরদোর ওরা গরমই রেখেছে। কয়লা খরচ করতে ওদের গায়ে লাগে না। ওরা অবশ্য ঘর গরম রাখার ব্যবস্থা করেছে লোকজনদের জন্যে নয়—কংক্রিটের চাঙ্গড়গুলো ভাল ভাবে শুকোবার জন্যে। ঘরে এমন কি একটা থার্মোমিটারও ঝুলিয়েছে। যে রবিবারে কয়েদীরা কাজে না যায়, বাইরের একজন লোককে পাঠানো হয় চুল্লীটাকে জেবলে রাখার জন্যে।

৩৮নং ব্রিগেড অবশ্য অন্য ব্রিগেডের কাউকে চুল্লীর কাছে ঘেঁষতে দিল না। ওটা তারা পুরোপুরি নিজেদের দখলে রেখে দিল। কুছপরোয়া নেই! আমরা কোণের দিকে বসছি। কোণটা এমন কিছু মন্দ নয়।

শুখভের ট্রাউজারের পেছনটা তুলোর প্যাড দেওয়া; সে একটা কাঠের ফর্মার ধার ঘেঁসে থেবড়ে বসে পড়ল—হেন জিনিস নেই যার ওপর সে ভর দিয়ে বসে নি। দেয়ালটাতে পিঠটা হেলান দিল। দেয়ালে ঠেস দিতেই তার ওভারকোট আর ভেতরের জ্যাকেটে এমন-ভাবে টান পড়ল যে, বাঁদিকের বুকে হৃদ্‌যন্ত্রের ঠিক পাশেই হঠাৎ একটা চাপ অনুভব করল। একটা শক্ত ডেলা গোছের জিনিস—পাঁউরুটির একটা টুকরো, দুপুরে খাবে বলে সকালের যে রেশনটা সে সঙ্গে করে এনেছে। রোজই সে সকালের রেশনের আধখানা বাঁচিয়ে রেখে কাজে আসার সময় সঙ্গে করে আনে—দুপুরের আগে সেটাতে হাত দেয় না। কিন্তু অন্যান্য দিন অর্ধেকটা সে প্রাতরাশের সময় খেয়ে নেয়; আজ তার খাওয়া হয় নি। শুখভ শেষ পর্যন্ত বুঝল রুটিটা এইবেলা খেয়ে ফেলা দরকার—শরীরটা গরম থাকতে থাকতে। এখন খেলে মোটেই সেটা অসময়ে খাওয়া হবে না। দুপুরের খাওয়ার এখনও পাঁচ ঘণ্টা দেরি। এখনও ঢের বেলা!

পিঠের ব্যথাটা এখন পায়ে এসে ঠেকেছে। পা দুটোতে কোনো জোর নেই। ইস্, একবার যদি সে কোনো একটা চুল্লীর কাছে যেতে পারত।

শুখভ তার হাতমোজা দুটো হাঁটুর ওপর রাখল; ওভারকোটের বোতামগুলো খুলে ফেলল; মুখের ওপর থেকে হিমজমাট ন্যাকড়াটার বাঁধন খুলে বার কয়েক ঝেড়ে নিয়ে পকেটে পুরল। এবার সে সাদা কাপড়ে জড়ানো রুটিটা বার করে কাপড়টা এমনভাবে ধরে থাকল যাতে রুটির গুঁড়োগুলো মাটিতে না পড়ে—তারপর এক-একটা কামড় দিয়ে তারিয়ে তারিয়ে রুটি খেতে লাগল। দু'ভাঁজ কাপড়ের মধ্যে থাকায় এবং গায়ের গরম পাওয়ায় রুটিটাতে এতটুকু হিম লাগতে পারে নি।

বন্দীশিবিরে বসে শুখভের প্রায়ই মনে পড়ত গ্রামে থাকার সময়কার খাওয়াদাওয়ার কথা। কড়াই ভর্তি আলুভাজা, হাঁড়ি ভর্তি খিচুড়ি এবং একটা সময় গেছে যখন কাঞ্জি ডুবিয়ে মাংস খাওয়া হত। দুধ খাওয়া হত এত যে, পেট ফেটে যাবার যোগাড়। শুখভ ক্যাম্পে এসে শিখেছে ওভাবে খাওয়াটা ঠিক নয়। খাওয়া উচিত এমনভাবে যাতে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে খেতে পারো। এই যেমন শুখভ এখন খাচ্ছে। দাঁত দিয়ে কুট করে কেটে জিভ দিয়ে মুখের মধ্যে নেড়ে নেড়ে গলিয়ে নিয়ে গালে ফেলে চুষতে থাকা। জবজবে কালো রুটিটার, আঃ, কী আস্বাদ! আট বছর গিয়ে ন বছর হতে চলল, শুখভ কী খেয়েছে এতদিন? কিছুই নয়। কিন্তু কাজ করেছে কত? ওরেঃ সাবাস! কম নয়!

অতঃপর শুখভ তার ছটাকী রুটিটা নিয়ে তন্ময় হয়ে গেল। আর তার পাশে বসে রইল গোটা ১০৪নং ব্রিগেড।

নীচু মতো একখণ্ড কংক্রিটের ওপর বসে একটা সিগারেট হোল্ডারে আধখানা সিগারেট পুরে পালা করে টানছিল দুজন এস্তোনিয়ার লোক—দুজনে এত ভাব যে ভাই বলে মনে হয়। দুজনেরই কটা চুল, লম্বা নাক, ড্যাবাড্যাবা চোখ, হ্যাংলা চেহারা, দুজনেই ঢ্যাঙা। দুজনে সব সময় এমন আঠার মত লেপ্‌টে থাকে যে, মনে হয় একজনকে ছাড়া আরেকজন নিশ্বাসই নিতে পারবে না। ফোরম্যান কখনই ওদের আলাদা করে না। ওরা সব সময় এক খাবার দুজনে ভাগ করে খায়, দুজনে একসঙ্গে ওপরের বাঙ্কে শোয়। সার বেঁধে যাবার সময়, লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় কিংবা রাত্তিরে বিছানায় শোবার পর ওরা দুজনে সারাক্ষণ আস্তে আস্তে মিহি গলায় কথা বলে। ওরা দুজনে তাই বলে মোটেই ভাই নয় এবং ওদের প্রথম পরিচয়ই হয়েছে ১০৪নং ব্রিগেডে এসে। একজন কাজ করত জাহাজে; সে সমুদ্রের ধারে মানুষ। আরেকজন যে, সোভিয়েত রাজত্ব পত্তনের পর তাকে শৈশবেই সুইডেনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। বড় হয়ে সে পড়াশুনো করবার জন্যে নিজে ইচ্ছে করে এস্তোনিয়ায় ফিরে আসে।

বলা হয়ে থাকে, জাত জিনিসটার কোনোই মানে নেই। সব জাতেই এমন লোক আছে যারা মোটেই সুবিধের নয়। কিন্তু শুখভ জীবনে যত এস্তোনিয়ার লোক দেখেছে, তাদের সংখ্যা যাই হোক—এ পর্যন্ত একটিও খারাপ লোক চোখে পড়ে নি।

এমনিভাবে সমস্ত কয়েদী বসে রইল—কেউ চাঙড়ের ওপর, কেউ কাঠের ফর্মায়, কেউ মাটিতে। সকালবেলায় জিভগুলো নড়ে না; প্রত্যেকেই নিজের নিজের ভাবনা নিয়ে তন্ময় হয়ে আছে; সবাই চুপচাপ। ফেতিউকভ, ওরফে ফেউ—এর মধ্যে কোত্থেকে যেন গোটাকতক পোড়া সিগারেটের টুকরো জুটিয়ে ফেলেছে। ও যদি পোড়া সিগারেটের টুকরো পায় তাহলে এমন কি পিকদানীও ঘাঁটতে—কিছুতেই ওর বাধবে না। পোড়া সিগারেটের টুকরোগুলো হাঁটুর ওপর রেখে ফেতিউকভ খুলে খুলে তার ভেতর থেকে যে তামাকটুকু পোড়ে নি সেই তামাক ঢেলে ঢেলে সিগারেটের কাগজে ভরছিল। বাইরে ফেতিউকভের তিন ছেলে; ফেতিউকভ গ্রেপ্তার হওয়ার পর তারা বাপের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছেদ করেছে, ফেতিউকভের বউও আবার নতুন করে বিয়ে করেছে। কাজেই তাদের কারো কাছ থেকে ফেতিউকভ কোনোরকম সাহায্য পায় না।

ফেতিউকভের দিকে ঘাড় ফিরিয়ে খানিকক্ষণ দেখবার পর বুইনভ্‌স্কি শেষ পর্যন্ত খেঁকিয়ে উঠল,—ওহে, হচ্ছেটা কী? যতসব রোগের জীবাণু কুড়িয়ে কুড়িয়ে মুখে দিচ্ছ? ঠোঁটে সিফিলিস হয়ে মরবে যে! ফেল শিগ্‌গির!

বুইনভস্কি ছিল নৌবহরের ক্যাপ্টেন—তাই হুকুম করা তার স্বভাব। সকলের সঙ্গেই সে ঐভাবে কথা বলে। কিন্তু ফেতিউকভের ওপর বুইনভস্কির কোনো জোর নেই। বাড়ি থেকে বুইনভস্কির কোনো জিনিসপত্রও আসে না। ফেতিউকভ হাসতে হাসতে মুখ বিকৃত করে বলল,—সবুর করো, ক্যাপ্টেন, সবুর করো। এখনই কী! আগে আটটা বছর ঘানি টানো, তারপর দেখবে তুমিও এটা ওটা খুঁটে খুঁটে বেড়াচ্ছ। তোমার চেয়েও ঢের ঢের মানী লোককে এ ক্যাম্পে আসতে দেখলাম...

ফেতিউকভ নিজেকে দিয়ে দুনিয়াকে বিচার করছিল; কিন্তু ক্যাপ্টেন বুইনভস্কি হয়ত বরাবর ঠিক একভাবে চালিয়ে যাবে।...

কানে খাটো হওয়ায় সেন্কা ক্লেভশিন শুনতে পায়নি কী বলা হল। লাইনে দাঁড়াবার সময় বুইনভস্কি যে ফ্যাসাদে পড়েছিল, সেন্কা ভেবেছে সেই নিয়ে কোনো কথা হচ্ছে। সেন্কা বললে,—ওখানে গলা বাড়াতে যাওয়া তোমার মোটেই উচিত হয়নি। তারপর সখেদে মাথাটা নাড়িয়ে বলল,—সব আপনি ঠিক হয়ে যেত।

সেন্কা ক্লেভশিন খুবই গোবেচারা মানুষ। ওর কপালটাই খারাপ। ১৯৪১ সালে ওর একটা কানের পর্দা ফেটে যায়। তারপর যুদ্ধে বন্দী হয়। বন্দীশালা থেকে পালায়। কিন্তু আবার ধরা পড়ে বুকেনওয়াল্ডে চালান যায়। বুকেনওয়াল্ড থেকেও ও যে কী করে বেঁচে গেল সেটাই একটা তাজ্জব ব্যাপার। এখন ও বেশ চুপচাপ জেলের মেয়াদ খাটছে। সেন্কা বলল,—গলা বাড়িয়েছ কি গেছ।

কথাটা ঠিক। বরং মেনে নিয়ে কাঁদাকাটা ভাল। যদি রুখে দাঁড়াও ছাতু করে ছেড়ে দেবে।

আলিওশা নিঃশব্দে দু'হাতে মুখ ঢেকে রয়েছে। প্রার্থনার মন্ত্র জপ করছে।

শুখভ পাঁউরুটির প্রায় সবটাই খেয়ে শেষ করে ফেলল—শুধু ওপরের অর্ধচন্দ্রাকার ছালটুকুন ছাড়া। রুটির টুকরো দিয়ে বাটির গা থেকে খিঁচুড়ি চেঁছেপুঁছে খেতে—আঃ, কী ভাল যে লাগে! এর কাছে দুনিয়ার কোনো চামচই কিছু নয়। দুপুরের জন্যে শুখভ রুটির ছালটুকু বাঁচিয়ে রেখে একটা সাদা ন্যাকড়ায় জড়িয়ে নিল; তারপর নীচের জামার ভেতরের পকেটে পুঁটলিটা চালান করে দিয়ে যাতে ঠাণ্ডা না লাগে তার জন্যে জামার বোতামগুলো ভাল করে এঁটে তৈরি হয়ে নিল। এবার ওরা যেখানে খুশি ওকে কাজে পাঠাক। অবশ্য হাতে আরেকটু সময় পেলে মন্দ হত না।

৩৮নং ব্রিগেড উঠে পড়ে যার যার কাজে চলে গেল। কেউ গেল সিমেন্ট মাখতে, কেউ জল আনতে, কেউ লেগে গেল লোহার শিক দিয়ে রিইন্ফোর্স করার কাজে। এদিকে ১০৪নং ব্রিগেডে তিউরিন কিংবা তার সহকারী পাভলোর কোনো পাত্তা নেই। এদিকে যদিও ব্রিগেডের লোকজনেরা দাঁড়িয়ে আছে বিশ মিনিটও হয়নি, এবং যদিও কাজের সময় (শীতকাল বলে কম) সন্ধ্যে ছ'টা পর্যন্ত, তবু মাঝখানের এই ফাঁকটুকুর জন্যে তারা নিজেদের খুব ভাগ্যমন্ত বলে মনে করছে—যেন সন্ধ্যেটা বেশ খানিকক্ষণ এগিয়ে আনা গেছে।

লালমুখো পেটমোটা লাৎভিয়ান কিল্‌গাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল,—ইস্, কতদিন যে বরফের ঝড় হয়নি! শীত যেতে বসেছে—অথচ এবার একবারও বরফের ঝড় উঠল না। এ আবার কোন্‌দেশী শীত?

ব্রিগেডের বাকি সবাইও তখন দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগল,—সত্যি—কী কাণ্ড! বরফের ঝড় হল না।

এদিকে একবার যখন তুষারঝঞ্ঝা বইতে শুরু করে, তখন বাইরে কাজে যাবার কোনো প্রশ্নই থাকে না। শুধু কি তাই? ব্যারাক ছেড়ে কাউকে বেরোতেই দেওয়া হয় না। যদি দড়ি ধরে ধরে না চলো, তাহলে হয়ত ব্যারাক থেকে খাবার জায়গায় যেতে গিয়েই দেখা গেল তুমি উবে গিয়েছ। কোনো কয়েদী যদি বরফে জমে যায়—কুত্তায় ছিঁড়ে খাক। তাকে দেখতে কারো ভারি বয়েই গেছে। কিন্তু যদি সে সট্‌কান দেয়? এমন এমন ঘটনা ঘটেছে। ঝড়ের সময় ঝরা তুষারগুলো থাকে ঝুরঝুরে; কিন্তু স্তূপাকার হয়ে যখন সেগুলো চলতে আরম্ভ করে, তখন জমে জমে বেদম শক্ত হয়ে ওঠে। কিছু লোক তাতে চড়ে কাঁটাতারের বেড়া টপ্‌কে পালিয়েছে। তারা অবশ্য বেশীদূর যেতে পারেনি।

ভাল করে ভেবে দেখলে, বরফের ঝড়ে কারো কোনো লাভ নেই। কয়েদীদের থাকতে হয় চাবিবন্ধ ঘরে। সময়মত কয়লা মেলে না। ব্যারাকের ভেতর কোথাও এতটুকু তাপ নেই। ময়দা এসে না পৌঁছুনোয় রুটি হতে পারে না। তিন দিন কি এক সপ্তাহ—ঝড় যতদিনই চলুক, দিনগুলোকে ছুটির দিনের মতই ধরা হয়; কিন্তু পরে তার জন্যে পর পর কয়েকটা রবিবার ওরা তোমাদের নাকে দড়ি দিয়ে বাইরে নিয়ে গিয়ে খাটাবে।

তবু কিন্তু কয়েদীরা বরফের ঝড় পছন্দ করত, তারা চাইত ঝড় উঠুক। একটু জোরে হাওয়া দিলেই তারা আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখত। আয় বৃষ্টি হেনে! ছাগল দেব মেনে!

বৃষ্টি বলতে বৃষ্টি নয়—তুষার।

এ দলের একজন একটু গা গরম করবে বলে ৩৮ নম্বর ব্রিগেডের চুল্লীটার কাছে ঘেঁষবার চেষ্টা করেছিল, তাকে ওরা ঠেলা মেরে সরিয়ে দিল।

এমন সময় তিউরিন ভেতরে এল। মুখটা তার থম থম করছে। ব্রিগেডের লোক-জনদের বুঝতে বাকি রইল না—ঘাড়ে কাজ চেপেছে, তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে করতে হবে।

তিউরিন চারদিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল,—আচ্ছা! একশো চার নম্বর—হাজির সব?

তিউরিন আর গোণাগণ্‌তি করার ঝুটঝামেলার মধ্যে গেল না—কেননা এ জায়গা ছেড়ে কোথায়ই বা কে যাবে? কাজেই লোক না গুণে তিউরিন কাকে কী কাজ করতে হবে চট্‌পট্‌ বুঝিয়ে দিল। এস্তোনিয়ান দুজন আর সেইসঙ্গে ক্লেভশিন আর গপ্‌চিককে পাঠানো হল কাছেই একটা জায়গা থেকে সুরকি মেশানোর দুটো বড় বড় বাক্স বিজলী স্টেশনের বাড়িতে নিয়ে যাবার জন্যে। সবাই বুঝতে পারল তাদের ব্রিগেডের ওপর বিজলী স্টেশনে গিয়ে কাজ করবার ভার পড়েছে; বাড়িটা এতদিন অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে আছে এবং শীত পড়বার পর থেকে তাতে আর কারো হাত পড়েনি। দুজনকে পাঠানো হল যন্ত্রপাতির ঘরে। পাভলো আগে গিয়ে সেখান থেকে যন্ত্রপাতি যোগাড়ের ব্যবস্থা করছিল। দলের চার জন লোককে ডেকে তিউরিন বিজলী স্টেশনের বাড়িটার পাশ থেকে, জেনারেটর যে ঘরে আছে সেই ঘরের প্রবেশপথ থেকে, খোদ জেনারেটর রুম থেকে এবং মই থেকে বরফ সাফ করার হুকুম দিল। দুজনের ওপর হুকুম হল জেনারেটর রুমে কয়লা দিয়ে এবং যেখান থেকে যেটুকু কাঠ জোটাতে পারবে তাই দিয়ে আগুন ধরাবার। একজনকে সে পাঠাল স্লেজে করে সিমেন্ট পৌঁছে দেবার জন্যে। দুজনকে পাঠানো হল জল আনতে। একজন গেল বালি আনতে; তার সঙ্গে আরেকজনকে পাঠানো হল সেই বালির ওপর জমা বরফ সাফ করবার কাজে সাহায্য করতে এবং শাবল মেরে সেই বরফ ভেঙে টুকরো টুকরো করতে।

সবাইকে সব কাজ দেওয়ার পর বাকি রয়ে গেল শুধু শুখভ আর কিল্‌গাস—

ব্রিগেডের মধ্যে এই দুজনেরই সবচেয়ে পাকা হাত। ওদের দুজনকে 'ওহে ছোকরা, শোনো এদিকে' বলে ডাকল।

বয়সে যদিও তিউরিন ওদের চেয়ে বড় নয়, তবু ওদের সে ছেলেছোকরা বলেই ডাকে। ডেকে বলল,—দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর তোমরা দোতলার দেয়ালে সিমেন্টের চাঙড়গুলো বসাবে—৬ নম্বর ব্রিগেড শীতের আগে যে পর্যন্ত কাজ করে রেখে গেছে, তার পর থেকে। জেনারেটর রুমটাকে একটু গরম করার কোনো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। গোটা তিনেক বড় বড় জানলা আছে। যাহোক কিছু দিয়ে জানলাগুলো ঢেকে দিতে হবে। আমি তোমাদের কিছু লোকজন দিচ্ছি, জানলায় কী লাগাবে তোমরা ভেবে ঠিক করে নাও। জেনারেটর রুমটাতে সুরকি তৈরি করা হবে। আর সেইসঙ্গে ঠাণ্ডার হাত থেকে নিজেদের বাঁচবারও একটা ব্যবস্থা থাকবে; নইলে কুকুরবেড়ালের মত আমাদের ঠাণ্ডায় মরতে হবে।

তিউরিন আরও হয়ত কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু গপ্‌চিক ছুটে এসে নালিশ করল,—অন্য ব্রিগেডের লোকেরা সুরকি মেশানোর বাক্সটা কিছুতেই দিতে চাইছে না, নিতে গেলে তেড়ে মারতে আসছে। গপ্‌চিক নেহাৎ ছেলেমানুষ, বছর ষোল বয়স—শুয়োরছানার মত গোলাপী রং। শুনে তিউরিন তক্ষুণি ছুটে গেল।

এই ঠাণ্ডায় কাজে হাত লাগানো যত কষ্টেরই হোক, সবচেয়ে বড় কথা হল কাজ একবার শুরু করে দেওয়া—শুধু একবার শুরু করে দিতে পারলেই হয়।

শুখভ আর কিল্‌গাস পরস্পরের দিকে চাইল। প্রায়ই তারা দুজনে মিলে কাজ করে থাকে। ভাল ছুতোরমিস্ত্রি আর রাজমিস্ত্রি হিসেবে তারা পরস্পর পরস্পরকে শ্রদ্ধা করে। চারিদিকে খাঁ খাঁ করছে বরফ, তার মধ্যে থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে যা-হোক কিছু দিয়ে জানলার খোঁদলগুলো আটকানো—কাজটা খুব সহজ হবে না। কিন্তু কিল্‌গাস বলল,—ভানিয়া, বাড়ি তৈরির পাটাগুলো যেখানে রাখা আছে—আমি জানি তার মধ্যে ঘর ছাওয়ার জন্যে রোল-করা একরাশ কাগজ আছে। আমিই লুকিয়ে রেখে দিয়েছি। চলো না, ওটা আমরা হাতিয়ে নিয়ে আসি।

কিল্‌গাস লাৎভিয়ান হলে কী হয় রুশভাষা তার কাছে ডালভাত। দেশে তার বাড়ির পাশেই ছিল সনাতনধর্মে বিশ্বাসী একটা খৃষ্টানপাড়া; ছেলেবেলাতেই রুশভাষায় তার হাতেখড়ি হয়। বন্দীশিবিরে সবে দু'বছর হল সে এসেছে; কিন্তু এর মধ্যেই আদত কথাটা সে বুঝে নিয়েছিল—যদি কিছু পেতে চাও দাঁত দিয়ে কামড়ে নিতে হবে। নাম তার জোহান। জোহান কিল্‌গাস। কিন্তু শুখভ আর সে দুজনেই দুজনকে ভানিয়া বলে ডাকত।

দুজনে ঠিক করল রোল-করা কাগজটা আনতে যাবে। কিন্তু শুখভ প্রথমে ছুটে গেল যেখানে মোটর মেরামতী কারখানার ঘর তৈরি হচ্ছিল সেখান থেকে কর্নিকটা আনতে। রাজমিস্ত্রিদের আবার যেমন তেমন কর্নিক হলে ঠিক চলে না; কর্নিকটা হতে হবে বেশ হাল্কা এবং যুৎসই। কিন্তু এখানে এই কাজের জায়গায় যন্ত্রপাতিগুলো সকালে দিয়ে সন্ধ্যেবেলা নিয়ে নেওয়াই হল রেওয়াজ। কাল কার কি রকম জুটবে কেউ বলতে পারে না—সবই ভাগ্যের ব্যাপার। কিন্তু শুখভ একবার গণ্ডায় আণ্ডা মিলিয়ে যন্তরখানার মুন্সীকে ফাঁকি দিয়ে সবচেয়ে ভাল কর্নিকটা বাগিয়ে নিয়েছিল। রোজ সে কাজ সেরে কর্নিকটা লুকিয়ে রেখে যেত। রোজ সকালে ইঁট বা পাটা গাঁথার দরকার পড়লেই গিয়ে কর্নিকটা নিয়ে আসত। অবশ্য ১৪০নং ব্রিগেডকে ওরা যদি 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়নে'র কাজে আজ

ঠেলে পাঠাত, তাহলে ওটা তার হাতছাড়া হয়ে যেত। যাই হোক, এখন সে কিছু ইঁট-পাটকেল সরিয়ে একটা ফাটলের মধ্যে আঙুল গলিয়ে লুকোনো কর্নিকটা টেনে তুলল।

শুখভ আর কিল্‌গাস মোটর মেরামতী কারখানা থেকে বেরিয়ে কংক্রিটের ফলক জোড়া-দেওয়া বাড়িগুলোর দিকে হাঁটা দিল। সূর্য দেখা দিয়েছে বেশ খানিকক্ষণ আগে, কিন্তু রোদটা মিয়োনো—কেমন যেন কুয়াশায় ঢাকা ভাব। সূর্যের চার পাশ থেকে কতকগুলো ফ্যাকড়া বেরিয়েছে ঠিক আলোর খুঁটির মত।

শুখভ মাথাটা নেড়ে সূর্যের দিকে ইশারা করে বলল,—খুঁটি পোঁতা রয়েছে বলে মনে হয়!

কিল্‌গাস নির্লিপ্তভাবে বলল,—খুঁটি পুঁতলেই বা আমাদের কী এসে যায়! বলে একটু হাসল। তারপর বলল,—খুঁটিগুলোর মাঝখানে মাঝখানে কাঁটাতার না বসালেই হল।

কিল্‌গাস যাই বলুক তার মধ্যে একটু রসিকতা থাকে। ব্রিগেডের সবাই তাকে সেইজন্যে এত পছন্দ করে। জেলে আর যে-সব লাৎভিয়ান আছে তারা সবাই কিল্‌গাসকে খুব ভক্তিশ্রদ্ধা করে। হাজার হোক, কি্‌লগাস খেতে পায় মন্দ নয়। মাসে ওর বাড়ি থেকে দুটো করে পার্সেল আসে। ওর টোবো-টোবো গাল দেখে মনেই হবে না ও জেলখানায় আছে। রসিকতা করা কিল্‌গাসেরই সাজে।

যেখানে দালানকোঠা তৈরির কাজ হচ্ছে সেই এলাকাটা প্রকাণ্ড। এপাশ থেকে ওপাশে যেতেই তো অনেকখানি সময় লেগে যাবে। রাস্তায় ৮২ নম্বর ব্রিগেডের ছোকরাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। আবার তাদের ওপর হুকুমও হয়ে গেল বরফজমাট মাটিতে যেন তারা গর্ত খোঁড়বার চেষ্টা করে। খুব বড় গর্ত নয়; লম্বায় দেড় ফুট, আড়ে দেড় ফুট আর নীচের দিকে দেড় ফুট। কিন্তু জমি এখানে পাথরের মত, এমনকি গ্রীষ্মকালেও—আর এখন তো সে জমি ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে এমন শক্ত নিরেট হয়ে আছে যে তাতে দাঁত ফোটাতে পারবে না। শাবল মারতে গেলে শাবল সাঁ করে পিছলে যাবে। শুধু আগুনের ফুলকিই উঠবে—না খসবে ধুলোমাটি, না ভাঙবে টুকরো। যাদের ওপর গর্ত খোঁড়ার ভার পড়েছিল, তারা তাদের ক্ষুদে ক্ষুদে গর্তের ওপর দাঁড়িয়ে চারদিকে জুল জুল করে তাকাচ্ছে—শুখভ আর কিল্‌গাস যেতে যেতে দেখতে পেল। এমন একটা জায়গা নেই যেখানে দুদণ্ড গিয়ে একটু গরম পেতে পারে—তাছাড়া কাজ ছেড়ে কোথাও যাওয়ার হুকুমও নেই। সুতরাং শাবল হাতে নাও—এখানে গা গরম করার একমাত্র উপায় সমানে শাবল চালিয়ে যাওয়া।

দলটার মধ্যে শুখভের একজন চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল; ভিয়াৎকায় তার বাড়ি। শুখভ তাকে বুদ্ধি-পরামর্শ দিল,—বাপু হে, এক কাজ করো; একটু আগুন জ্বালিয়ে নাও, তাহলে আপনা থেকেই বরফ গলে গিয়ে গর্ত তৈরি হয়ে যাবে।

তার উত্তরে ভিয়াৎকার সেই লোকটা বলল,—আগুন জ্বালাতে দিলে তো! একটা চেলাকাঠও ওরা আমাদের দেয় না।

—নিজেদেরই জুটিয়ে নিতে হবে।

কিল্‌গাস শুধু পিচিৎ করে থুথু ফেলে নিল।

—তুমিই বলো, ভানিয়া—কর্তৃপক্ষের ঘটে যদি বুদ্ধিই থাকবে, তাহলে কি কেউ এই ঠাণ্ডার মধ্যে শাবল দিয়ে মাটি খাবলাবার জন্যে লোক পাঠায়?

কিল্‌গাস অস্পষ্টভাবে বারকয়েক শ-কার ব-কার আউড়ে চুপ করে গেল। এত ঠাণ্ডায় বেশী কথাও বলা যায় না। ওরা দুজনে আরও খানিকটা এগিয়ে যেখানে বরফের

নীচে বাড়ি তৈরির পাটাগুলো ডাঁই করা আছে সেখানে এল।

শুখভ কিল্‌গাসের সঙ্গে কাজ করতে ভালবাসে। কিল্‌গাসের একটাই যা দোষ। ওর ধূমপানের অভ্যেস নেই, বাড়ি থেকে ওর তামাক আসে না।

ঠিক তো, এই সেই জায়গা। কিল্‌গাসের চোখ আছে বলতে হবে। দুজনে মিলে ধরাধরি করে প্রথমে একটা, তারপর আর একটা পাটা সরাতেই তার তলা থেকে ঘর ছাইবার রোল-করা কাগজটা পাওয়া গেল।

দুজনে টেনেটুনে তো বার করল। কিন্তু এখন নিয়ে যাবে কেমন করে? উঁচু টং থেকে পাহারাওয়ালারা যদি দেখে ফেলে কিছু আসে যায় না। ওরা ওখানে মাথায় শুধু একটা চিন্তা নিয়েই ময়নার মত দাঁড়ে বসে আছে—ওরা দেখছে কয়েদীরা যেন না পালায়। আর কাজের জায়গায় পাহারাদার সেপাইরা? যদি সমস্ত পাটাগুলোকে কুড়ুল দিয়ে চেলা করে জ্বালানী করো—তাতেই বা কে দেখতে আসছে? এমনকি যদি কোনো ক্যাম্পগার্ডের সামনাসামনি পড়ে যাও তাতেও কোনো ভয় নেই। কেননা সে নিজেই তক্কে তক্কে ঘুরছে কোন্ জিনিসটা হাতিয়ে বাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। আর যদি সাধারণ কয়েদীদের কথা ওঠে —বাড়ি তৈরির পাটাগুলো দেখলেই তো ওরা থু থু করে। ব্রিগেডের ফোরম্যানদেরও ঐ এক ব্যাপার। একমাত্র যাদের এদিকে কড়া নজর, তারা হল: এক, বেসামরিক (অর্থাৎ, জেলের বাইরের লোক) ওয়ার্ক সুপারভাইজার; দুই, জুনিয়র ওয়ার্ক সুপারভাইজার-দের (কয়েদী); আর তিন, ঢ্যাঙা রোগা শ্কুরোপাতেঙ্কো। শ্কুরোপাতেঙ্কো কোনো পদের নয়—সাধারণ একজন কয়েদী মাত্র। ওকে ঘণ্টা হিসেবে ফুরণে শুধু একটাই কাজ দেওয়া হয়েছে—কয়েদীরা যাতে বাড়ি তৈরির পাটাগুলো নিয়ে হাঁটা না দেয় সেদিকে নজর রাখা। খোলা জায়গায় সবচেয়ে বেশী ভয় রয়েছে শ্কুরোপাতেঙ্কোর হাতে ধরা পড়বার।

শুখভ বলল,—দেখ ভানিয়া, আড় করে নিয়ে যাওয়াটা ঠিক হবে না। তার চেয়ে এসো দুপাশ থেকে খাড়া করে ধরে নিয়ে যাই—তাড়াতাড়ি নিয়ে যেতেও সুবিধে হবে, গায়ে আড়ালও পড়বে। দূর থেকে দেখে কেউ ধরতে পারবে না।

শুখভ মন্দ বলেনি। আড় করে নিয়ে যাওয়াটা মোটেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। কাজেই ওরা ওভাবে নিয়ে গেল না। ওরা করল কি, ওটাকে তৃতীয় একজন লোকের মত দুজনের মাঝখানে খাড়া করে ধরে হন্ হন্ করে হাঁটতে লাগল। পাশ থেকে দেখলে মনে হবে দুজন লোক যেন খুব ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে হাঁটছে।

শুখভ বলল,—কিন্তু ওয়ার্ক সুপারভাইজার তো জানলার গায়ে ঘর ছাইবার কাগজ দেখতেই পাবে। তখনও তো সব বুঝে ফেলবে।

কিল্‌গাস অবাক হওয়ার ভাব করে বলল,—আমরা তার কী জানি! বিজলী স্টেশনে এসে দেখা গেল জানলায় কাগজ দেওয়া। তার মানে, আগে থেকেই ওখানে ছিল। তখন আর কী করা হবে? টেনে ছিঁড়ে ফেলা হবে?

হ্যাঁ, ঠিকই তো।

পাতলা হাতমোজার মধ্যে আঙুলগুলো ঠাণ্ডায় অসাড় হয়ে গেছে। শুখভের মনে হচ্ছে না হাতে আঙুল আছে। বাঁ পায়ের ফেল্ট বুটটার জন্যে শুখভ জোরে চলতে পারছে না। পায়ের জুতোজোড়াই হল আসল। হাত দুটো তো কাজে লাগলেই গরম হয়ে যাবে।

ফুটফুটে শুচিশুভ্র বরফের ওপর দিয়ে ওরা চলতে লাগল। যন্ত্রপাতির ঘর থেকে বিজলী স্টেশন পর্যন্ত বরফের ওপর স্লেজ টেনে নিয়ে যাওয়ার দাগ। স্লেজে করে নিশ্চয়

সিমেণ্ট বয়ে নিয়ে গেছে।

বিজলী স্টেশনটা একটা উ'চু ডাঙার ওপর। তার ঠিক পেছনেই এলাকাটা শেষ হয়েছে। বিজলী স্টেশনের গায়ে অনেক দিন হয়ে গেছে কারো হাত পড়ে নি। ভেতরে যাবার সব ক'টা রাস্তাই বরফে ঢাকা পড়ে গেছে। স্লেজের রাস্তা আর তার ওপর গভীর-ভাবে কাটা নতুন দাগগুলো তুলনায় রীতিমত স্পষ্ট। ব্রিগেডের লোকজনেরা কাঠের কোদাল দিয়ে বিজলী স্টেশন আর গাড়ির রাস্তার বরফ সরিয়ে সরিয়ে এই পথ দিয়েই গেছে।

বিজলী স্টেশনের লিফ্‌ট্‌টা চালু থাকলে বড় ভাল হত। কিন্তু মোটরটা পুড়ে যাওয়ার পর আর সারানো হয় নি। এ-অবস্থায় সব কিছুই দোতলায় ঘাড়ে করে টেনে তুলতে হবে। সুরকি। সিমেন্টের ব্লক। সব কিছু।

দু দুটো মাস বিজলী স্টেশনটা পাঁশুটে কঙ্কালের মত পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে ছিল। এমন সময় সেখানে এল ১০৪ নম্বর ব্রিগেড। কিসের টানে ১০৪ নম্বর ব্রিগেডের মানুষেরা এক জায়গায় বাঁধা পড়েছিল? খালি পেটে জড়ানো ক্যানভাসের বেল্ট? হাড়কাঁপানো শীত? না আছে মাথা গু'জবার একটু ঠাঁই, না একটু আগুন। তবু ১০৪ নম্বর ব্রিগেড আসাতেই বাড়িটাতে যেন প্রাণের সাড়া জেগে উঠল।

জেনারেটর রুমে ঢুকবার মুখেই সুরকি মেশাবার বাক্সটা ভেঙে খসে পড়ে গিয়েছিল। বাক্সটা ছিল একদম পচা। বাক্সটা যে আস্ত গিয়ে পে'ৗছুবে এ বিশ্বাস গোড়াতেই শুখভের ছিল না। ফোরম্যান তিউরিন নেহাৎ লোকদেখানোর মত করে একপ্রস্থ গালাগাল দিল; সেও স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছিল যারা বয়ে আনছিল তাদের দোষ নয়। এমন সময় শুখভ আর কিল্‌গাস রোল-করা কাগজ নিয়ে সেখানে হাজির হল। তিউরিন দেখে খুব খুশী হল। তক্ষুণি নতুনভাবে সে কাজকর্মের ব্যবস্থাটা ঢেলে সাজল। শুখভ চুল্লীটা ঠিক করে ফেলবে যাতে অবিলম্বে তাতে আগুন দেওয়া যায়। কিল্‌গাসের ওপর সুরকির বাক্সটা সারাবার ভার পড়ল, এস্তোনিয়ান যুগল তাকে সাহায্য করবে। সেন্‌কা ক্লেভ্‌শিনকে একটা কুড়ুল হাতে দিয়ে বলা হল দুটো লম্বা গোছের কাঠের বাতা চেলা করে জানলায় কাগজ আটকাবার ব্যবস্থা করতে। জানলা যা চওড়া, তাতে আড়ের দিকে দুটো কাগজ জুড়তে হবে। কাঠের বাতা কোথায় পাওয়া যাবে? নিছক মাথা গু'জবার জন্যে তক্তা দিতে ওয়ার্ক সুপারভাইজারের ভারি বয়েই গেছে। ফোরম্যান এদিক ওদিক তক্তা খু'জে বেড়াতে লাগল; সেই দেখে অন্যেরাও খু'জতে লেগে গেল। দোতলায় ওঠবার সি'ড়িতে হাত দিয়ে ধরবার যে রেলিংটা আছে, তা থেকে একজোড়া কাঠের বাতা খসিয়ে নেওয়া যায়। না নিলে চলবেই বা কী করে। ওপরে ওঠবার সময় একটু শুধু হু'শিয়ার থেকো—নইলে পা ফস্‌কালেই গেছ!

হয়ত কেউ ভাবতে পারে, দশ বছর ধরে যে জেলের ঘানি টানছে তার কী এমন দায় পড়েছে যে খেটে খেটে পিঠের হাড় বে'কিয়ে ফেলবে! অর্থাৎ, আমার ভাল লাগে না, ব্যস! এর ওপর আর কথা নেই। সন্ধ্যে অবধি দিনমানটা যো-সো করে কাটিয়ে দেব। তারপর রাত্তিরটা আমার।

কিন্তু তাতে ভবী ভোলে নি। নইলে আর ওয়ার্ক ব্রিগেড করা হয়েছে কেন! এ তো আর স্বাধীন অবস্থার ব্রিগেড নয়, যেখানে রাম আর শ্যাম আলাদা আলাদা মজুরী পাবে। বন্দীশিবিরগুলোতে ব্রিগেড হল এক রকমের কল, যেখানে কর্তৃপক্ষের বদলে

কয়েদীরাই এ ওকে চোখে চোখে রাখে। কলটা এইভাবে চলে : হয় প্রত্যেকে বাড়তি খাবার পাবে, নয় প্রত্যেকেই উপোষী থাকবে। তুই যদি কাজ না করিস, ছুঁচো—তোর জন্যে আমাকে না খেয়ে থাকতে হবে। গা লাগা, জানোয়ার কাঁহাকা!

এই রকমের অবস্থায় পড়লে আর ঢিলেমির ভাব থাকতে পারে না। তখন আর তুমি উব্‌দো হয়ে বসে থাকতে পারো না। চাও না চাও, তখন তোমাকে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে বেড়াতে হবে। দু ঘণ্টার মধ্যে যদি আমরা মাথা গুঁজবার ঠাঁই করে ফেলতে না পারি, আমাদের সকলেরই প্যাঁচে পড়তে হবে। সে একরকমের ভালই।

পাভলো যন্ত্রপাতিগুলো নিয়ে এল। যার যেটা দরকার নিয়ে নাও। সেইসঙ্গে চুল্লীর খানিকটা পাইপ। টিনের কাজ করবার কোনো যন্ত্রপাতি ছিল না বটে, তবে একটা হাতুড়ি আর কুড়ুল ছিল। ঐ দিয়েই কোনো রকমে আমরা কাজ চালিয়ে নেব।

শুখভ নিজের হাত দুটো ঘষে গরম করে নিচ্ছেন, তারপর পাইপে পাইপে বসিয়ে জোড়গুলো ঠুকে জুড়ে নিচ্ছে। একবার হাত ঘষছে, তারপর আবার হাতুড়ি দিয়ে জোড়-গুলো ঠুকছে। কর্নিকটা সে কাছেই একটা জায়গায় লুকিয়ে রেখেছে। চারপাশে যদিও সব নিজেদের ব্রিগেডেরই লোক, তবু তারা কর্নিকটা মেরে দিতে পারে। এমন কি কিল্‌-গাসকেও বিশ্বাস নেই।

শুখভের মাথায় তখন আর অন্য কিছুই নেই। নিজের বিষয়ে সমস্ত স্মৃতি, সমস্ত চিন্তাভাবনা তখন চুলোয় গেছে। সে তখন এক মনে ভাবছে—চুল্লীর চোঙটা বেঁকিয়ে কিভাবে সে ঝোলাবে যাতে তাদের ধোঁয়া খেতে না হয়। গপ্‌চিককে পাঠানো হল, একটা তার খুঁজে আনতে—যাতে জানলায় নলটাকে বেঁধে দিলে মুখটা বাইরের দিকে থাকে।

ঘরের কোণে আরেকটা বসানো চুল্লী ছিল—তার চিমনিটা ইঁট দিয়ে গাঁথা। চুল্লীটার মুখে একটা লোহার পাত ছিল; আগুনের আঁচে লোহার পাতটা যখন লাল হয়ে তেতে উঠত, তখন তার ওপর বরফলাগা বালি ছড়িয়ে দিলে বরফ গলে জল শুকিয়ে গিয়ে বালিটা বেশ শুকনো কড়কড়ে হয়ে থাকত। ব্রিগেডের লোকজনেরা ঐ চুল্লীটাতে এরই মধ্যে আঁচ দিয়ে ফেলেছে এবং বুইনভ্‌স্কি আর ফেতিউকভের ওপর ভার পড়েছে ঠেলাগাড়িতে করে বালি বয়ে আনার। হাতগাড়ি ঠেলতে কোনোই বুদ্ধির দরকার হয় না। কাজেই আগে যারা মাতব্বর গোছের লোকের ছিল, তিউরিন তাদেরই বেছে বেছে এই কাজ করতে দিয়েছে। লোকে বলে, ফেতিউকভ নাকি কোথাকার কোন্‌ এক অফিসের বড়সাহেব ছিল; সব সময় গাড়ি হাঁকিয়ে ঘুরে বেড়াত।

গোড়ায় গোড়ায় ফেতিউকভ ক্যাপ্টেন বুইনভ্‌স্কিকে ভড়্‌কে দেবার খুব চেষ্টা করত আর কথায় কথায় খেঁকিয়ে উঠত। কিন্তু ক্যাপ্টেন একবার ফেতিউকভের মুখের ওপর সজোরে এমন এক চড় কষিয়ে ছিল যে, তারপর থেকে ও আর কখনও লাগতে আসে নি।

কয়েদীরা এ ওকে ঠেলে চুল্লীটার কাছে এগিয়ে যাচ্ছিল শরীরটা একটু তাতিয়ে নেবে বলে—কিন্তু ফোরম্যান তাদের ধমকাল।

—সেঁকি, দাঁড়াও—মুণ্ডুগুলো। যাও, পালাও—আগে সব কাজ সারো।

ঘরপোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ডরায়। ভয়ঙ্কর ঠাণ্ডা, কিন্তু তার চেয়েও ভয়ঙ্কর হল ফোরম্যান! লোকলস্করেরা যে যার কাজ করতে চলে গেল।

শুখভ শুনতে পেল তিউরিন ফিস ফিস করে পাভ্‌লোকে বলছে,—তুমি এখানে থাকো। একটু ডেঁটে রেখো সবাইকে। আমি যাই, গিয়ে কোটাটা বাড়িয়ে আসি।

কাজ করার চেয়ে কোটা ছাপিয়ে যাওয়ার ওপরই নির্ভর করে বেশী। যে ফোরম্যান চালাক, প্ল্যান পুরো করার বিবরণসংক্রান্ত নথিপত্র তৈরি—'কোটা ছাপিয়ে যাওয়ার'র ব্যাপারেই সে বেশী রকম খাটে। খেতে পাবার এই হল উপায়। যেটা হয় নি—সেটা হয়েছে বলে প্রমাণ করো। যে কাজগুলো কম দামী কাজের কোঠায় পড়েছে—এমনভাবে হাতসাফাই করো, যাতে সেগুলো বেশী দামী কাজের কোঠায় পড়ে। এই চালাচালির ব্যাপারে ফোরম্যানকে বেশ মাথা খেলাতে হয়। সেই সঙ্গে দরকার খাতাঞ্চীদের সঙ্গে খানিকটা খাতির জমিয়ে রাখা। ওদের হাতও খানিকটা ভারী করা দরকার।

যদি একটু ভেবে দেখ—কার জন্যে ঐ কোটা? ক্যাম্পের জন্যে। নির্মাণ সংস্থাগুলোর কাছ থেকে বাড়তি হাজার হাজার টাকা পেয়ে ক্যাম্প লাল হয়ে গেছে; অফিসারদের দেওয়া হয়েছে বোনাস। ভল্‌কোভোই পেয়েছে চাবুক মেরে। আর কয়েদীর দল? কয়েদীরা পেয়েছে সন্ধ্যেবেলায় ছ-আউন্স রুটি। ছ-আউন্স রুটিই এখানে জীবনের নিয়ন্তা।

দু'বালতি জল এল। কিন্তু আনতে আনতে বরফ। পাভলো ঠিক করল জল বয়ে আনার কোনো মানে হয় না। তার চেয়ে এ বাড়ির বরফগুলো তাতিয়ে জল করে নেওয়াই তো ভাল। দু বালতি জল চুল্লীর ওপর বসিয়ে দেওয়া হল।

গপ্‌চিক কোত্থেকে যেন ঝকঝকে নতুন খানিকটা অ্যালুমিনিয়ামের তার হাতিয়ে এনেছে—তারটা ইলেকট্রিক মিস্ত্রিদেরই হবে। এনে শুখভকে বলল,—ইভান দেনিসিচ! বেশ ভাল তার এটা, এদিয়ে চাম্‌চে হয়। আমাকে তুমি চাম্‌চে বানাতে শেখাবে?

বিচ্ছুটাকে শুখভ ভালবাসত। শুখভের নিজের একটি ছেলে ছিল, ছোটবেলাতেই মারা যায়; দেশের বাড়িতে তাব দুই বয়স্থা মেয়ে আছে। পশ্চিম য়ুক্রেনের বেন্দেরার দলের গেরিলাদের জন্যে জঙ্গলে দুধ নিয়ে যাচ্ছিল বলে গপ্‌চিককে ধরে জেলে পোরা হয়েছে। সাবালকদের যে সাজা দেওয়া হয়, গপ্‌চিককে সেই সাজাই দেওয়া হয়েছে—নাবালক বলে রেয়াত করা হয় নি। গপ্‌চিক যেন ফুটফুটে ছোট ছানা; সবার কাছে সেইভাবেই সে আদর কুড়িয়ে বেড়াত। ছোট্ট ছানা হলে কী হবে, এর মধ্যেই সে খানিকটা ধূর্তুমি রপ্ত করে ফেলেছে। বাড়ি থেকে ওকে যা খাবার পাঠাত, কাউকে না দিয়ে তা সে একাই খেয়ে শেষ করত। কখনও কখনও দেখা যেত রাত্তিরবেলায়ও ওর মুখ চলছে।

যাই বলো, সবাইকে তো আর ও খাওয়াতে পারে না।

গপ্‌চিক আর শুখভ চাম্‌চে করবার জন্যে খানিকটা তার কুট্‌ করে ভেঙে নিয়ে ঘরের এক কোণে লুকিয়ে রেখে দিল। চুল্লীর চোঙ ঝোলাবার জন্যে শুখভ দু টুকরো কাঠ দিয়ে উপস্থিতমত একটা মই বানিয়ে গপ্‌চিককে তার ওপর ঠেলে তুলে দিল। গপ্‌চিক ঠিক কাঠবেড়ালির মত মই বেয়ে তরতরিয়ে মটকায় উঠে গেল। কড়িকাঠে হাতুড়ি দিয়ে একটা পেরেক ঠুকে, তাতে তার লাগিয়ে চোঙটার গায়ে জড়িয়ে দিল। শুখভও গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াচ্ছিল না। চুল্লীর চোঙটাতে একটা কনুই লাগিয়ে চোঙের মুখ বাইরের দিকে করে দিল। আজ অবশ্য তেমন হাওয়া নেই, কিন্তু কাল তো হতে পারে। হাওয়ার ঝাপ্টায় চুল্লীর ধোঁয়া উজিয়ে ভেতরে আসুক এটা সে চায় না—বিশেষ করে, ঐ চুল্লীটা যখন তাদের নিজেদেরই জন্যে।

সেন্‌কা ক্লেভশিন এর মধ্যে লম্বা লম্বা কয়েকটা কাঠের ফলক চিরে ফেলেছে। ওগুলো পেরেক দিয়ে আটকাবার জন্যে আবার সেই গপ্‌চিক সোনামানিকেরই ডাক পড়ল। দুষ্টুর শিরোমণি লটরপটর করতে করতে ওপরে উঠে নীচের লোকদের ওপর খুব তম্বি

করতে শ্বরু করে দিল।

রোদ আরেকটু চড়া হয়ে কুয়াশা খেদিয়ে দিল। স্বর্যের চার পাশে লম্বা লম্বা খ্বঁটির মত আর সেই রশ্মিগ্বলো দেখা গেল না। বাড়ির ভেতরটা গোলাপী আভায় ভরে উঠল। ঠিক সেই সময় চুরি করে-আনা দ্বিতীয় চুল্লীটাতে আগ্বন দেওয়া হল। সেটা হল আরও বেশী আনন্দের কারণ।

শ্বখভ বলে উঠল,—জান্বয়ারি মাসে স্বয্যিঠাকুর গর্বর পাছা গরম করে।

স্বরকি মেশানোর বাক্সটা সেরেস্বরে শেষবারের মত তাতে একটা কুড়্বলের কোপ মেরে কিল্‌গাস চেঁচিয়ে বলল,—শ্বনে রাখো, পাভ্‌লো ভায়া! আমি কিন্তু ঐ কাজটার জন্যে ফোরম্যানের কাছ থেকে একশো র্ববলের এক আধলাও কম নেব না।

পাভ্‌লো হেসে ফেলল,—আচ্ছা, তুমি একশো গ্রামই পাবে। তার মানে, আউন্স তিনেক ভোদ্‌কা।

গপ্‌চিক ওপর থেকে ফোড়ন কাটল,—সরকারী উকিল আরও একট্ব বাড়িয়ে দেবে।

শ্বখভ হঠাৎ হাঁ-হাঁ করে উঠল,—কী করো, কী করো—উঁহ্ব, ওভাবে নয়। ছাদ-ছাওয়ার কাগজ কক্ষণো ওভাবে কাটে না।

কিভাবে কাটতে হয় শ্বখভ দেখিয়ে দিল।

লোহার চুল্লীটার কাছে একগাদা লোক ভিড় করেছে। পাভ্‌লো দ্বর-ছাই করে তাদের তাড়িয়ে দিল। কিল্‌গাসকে সে কিছ্ব লোক দিল যাতে তাদের সাহায্য নিয়ে কিল্‌গাস সিমেন্ট বয়ে নিয়ে যাবার ঠেলাগাড়ি তৈরি করে ফেলে। আরও কিছ্ব লোককে সে বালি-টানার কাজে লাগিয়ে দিল; কিছ্ব লোককে পাঠানো হল ওপরে উঠে ভারার গা থেকে আর নতুন যেখানে কংক্রিটের গাঁথনি বসবে সেখান থেকে বরফ পরিষ্কার করতে। একজনের ওপর ভার দেওয়া হল চুল্লীর ম্বখ থেকে গরম বালি নিয়ে সে স্বরকি মেশাবার বাক্সে রাখবে।

বাইরে একটা মোটরের ভট্‌ ভট্‌ আওয়াজ শোনা গেল; কংক্রিটের চাঙড়গ্বলো পেঁাছে দেবার জন্যে বরফের ভেতর দিয়ে একটা ট্রাক পথ কেটে কেটে আসছে। পাভ্‌লো তাড়াতাড়ি বাইরে বেরিয়ে গেল—ট্রাকটাকে হাত দেখাতে হবে আর বলে দিতে হবে ঠিক কোন্‌ জায়গায় মালগ্বলো রাখা হবে।

প্রথমে একপ্রস্থ, পরে আরেক প্রস্থ ঘর ছাওয়ার কাগজ পেরেক দিয়ে আটকানো হল। এতে কতটা ঠাণ্ডা আটকাবে কে জানে? যত যাই হোক, কাগজ তো! কিন্তু দেখতে হল ঠিক সত্যিকার দেয়ালের মত। কাগজ দিয়ে ঢেকে দেবার ফলে ভেতরটা খানিকটা অন্ধকার-অন্ধকার হল। সেই স্তিমিত আলোয় চুল্লীর শিখাগ্বলো আরও বেশী জ্বল্‌ জ্বল্‌ করে উঠল।

আলিওশা এল কয়লা নিয়ে। তাকে দেখেই হৈ হৈ করে উঠে কেউ বলল,—ঢেলে দাও চুল্লীতে—কেউ বলল,—খবরদার, ঢালবে না! তব্ব যা হোক, কাঠের জ্বালে একট্ব হাত-পা গরম করা যাচ্ছে। আলিওশা কার কথা শ্বনবে ব্বঝতে না পেরে হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইল।

ফেতিউকভ চুল্লীর একেবারে ধারে গিয়ে তার ফেল্টের ব্বটজোড়াটা বোকার মত সটান আগ্বনের আঁচের মধ্যে ঠ্বসে দিয়েছিল। ব্বইনভ্‌স্কি এসে ওকে ঘাড় ধরে তুলে দিয়ে ঠেলাগাড়ির দিকে ঠেলে পাঠাল,—যা, নচ্ছার—বালি বইগে যা!

ক্যাপ্টেন ব্বইনভ্‌স্কির কাছে ক্যাম্পের কাজও নৌবহরের কাজেরই মত। তোমাকে

যা কিছুই করতে বলা হোক, বললে করতেই হবে। গত একমাসে ক্যাপ্টেনের গাল একেবারে চাড়িয়ে গেছে, তবু কিন্তু সে ঠিক আগের মতই চালিয়ে যাচ্ছে।

শেষ পর্যন্ত তিন তিনটে জানলাই বুজিয়ে দেওয়া হল। এখন শুধু দরজাগুলো দিয়েই যা আলো আসছে। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডাও। নীচের দিকটা যেমন আছে তেমনি রেখে পাভ্‌লো দরজাগুলোর ওপরের দিক বন্ধ করে দেবার হুকুম দিল—ঘরে ঢুকবার সময় সবাই একটু কুঁজো হয়ে ঢুকবে। তার কথামত কাঠের পরত দিয়ে দরজাগুলোর খানিকটা আট্‌কে দেওয়া হল।

ইতিমধ্যে তিন লরী মাল খালাস করে দিয়ে গেছে। এখন সমস্যা দাঁড়াল বিনা কপিকলে কী করে ঐ সব কংক্রিটের চাঙড়গুলা ওপরে তোলা হবে।

যারা রাজমিস্ত্রির কাজ করে, পাভ্‌লো তাদের ডেকে বলল,—চলো, ওপরে যাই। বলেছে যখন উঠতেই হবে। শুখভ, কিল্‌গাস আর পাভ্‌লো কাঠের সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে লাগল। একেই তো সিঁড়িটা বেজায় সরু, তার ওপর হাত দিয়ে ধরবার রেলিংটা সেন্‌কা খসিয়ে নেওয়ায় সব সময় দেয়াল ঘেঁষে থাকতে হবে। না হলেই চিৎপটাং। মুশকিল আরও বেড়েছে বরফ পড়ে সিঁড়ির ধাপগুলো গোলাকার হয়ে যাওয়ায়। পা রাখার জায়গা নেই। কী করে ওরা মশলাগুলো ওপরে টেনে তুলবে?

চাঙড়গুলো কোথায় বসবে ওরা একবার সেই জায়গাটা দেখতে লাগল। কোদাল দিয়ে বরফ চাঁছা হচ্ছে। এই হল সেই জায়গা। যে পর্যন্ত দেয়াল গাঁথা হয়েছে, তার ঠিক মাথায় হাতুড়ি পিটিয়ে বরফের চাঁইটা ভেঙে চুরমার করে তারপর একটা কচি ডাল দিয়ে ঝেড়ে মুছে নিতে হবে।

চাঙড়গুলো ওপরে ওঠানোর কোন্‌টা সব চেয়ে ভাল পন্থা, এবার ওরা তাই নিয়ে মাথা ঘামাতে শুরু করে দিল। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখে ওরা কর্তব্য স্থির করে ফেলল। চাঙড়গুলো বয়ে অত উঁচু সিঁড়ি ভেঙে ওপরে ওঠার কোনো দরকার নেই। মাটিতে চারজন লোক থাকবে, তারা ভারা-বাঁধা স্তর পর্যন্ত তোল্লা করে উঠিয়ে দেবে; দুজন লোক সেখান থেকে চাঙড়গুলো দোতলার দুজন লোকের হাতে এগিয়ে দেবে। সেগুলো তারা তখন ধরে রাজমিস্ত্রির কাছে পেঁাছে দেবে। তাতেই সবচেয়ে জল্‌দি কাজ হবে।

দোতলার ওপর হাওয়া তত জোরালো নয়, তবে গায়ে যেন কেটে বসে। চাঙড়গুলো বসাতে শুরু করলেই হাওয়া এসে ওদের ছেঁকে ধরবে। গাঁথুনি যতটা হয়েছে ওরা যদি তার পেছনে গা আড়াল করতে পারে, তাহলে কতকটা বাঁচবে; মন্দ কি, বরং খানিকটা তো গরম গরম ভাব হবে।

শুখভ আকাশের দিকে তাকিয়ে অবাক হল। আকাশ একেবারে ধোয়ামোছা; সূর্য প্রায় মধ্যাহ্নভোজনের জায়গায় এসে গেছে। সত্যি এ এক তাজ্জব ব্যাপার। কাজের মধ্যে সময় এইভাবেই কেটে যায়। শুখভ বহুবার লক্ষ্য করেছে, বন্দীশিবিরে দিনগুলো যেন নেহাৎ হুড়মুড়িয়ে চলেছে। চারপাশে তাকিয়ে দেখার সময় নেই। কিন্তু তার সাজা-খাটার মেয়াদটার কোনো নড়চড় নেই; যেন যা ছিল তাই আছে—একটুও ছোট হয় নি।

ওরা নীচে নেমে এসে দেখে বাকি সবাই চুল্লীটার চারদিকে গোল হয়ে বসে আছে। একমাত্র বুইনভ্‌স্কি আর ফেতিউকভ সমানে বালি টেনে যাচ্ছে। দেখে পাভ্‌লো তো রেগে আগুন। তক্ষুণি আটজনকে সে কংক্রিটের চাঙড় আনতে পাঠাল, দুজনকে সুরকির বাক্সে সিমেন্ট ঢালতে পাঠাল—ওরা করবে শুকনো অবস্থায় বালির সঙ্গে সিমেন্ট মেশানোর কাজ।

একজন গেল জল আনতে। আরেকজন গেল কয়লা আনতে। কিল্‌গাস তার সঙ্গের লোকদের বলল,—চলো বাপসকল, হাতগাড়ির কাজটা সেরে ফেলি।

শুখভ পাভ্‌লোকে জিজ্ঞেস করল,—ওদের সঙ্গে হাত লাগাব?

পাভ্‌লো ঘাড় নেড়ে বলল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও।

তারপর বরফ গলাবার জন্যে একটা ঢাউস টিন আনা হল। তাতে সিমেন্ট মাখার জল হবে। এমন সময় কে একজন বলে উঠল বেলা দুপুর হয়ে গেছে।

শুখভ সায় দিয়ে বলল,—ঠিক বলেছে। সূর্য এখন ঠিক মাথার ওপর।

ক্যাপ্টেন বুইনভ্‌স্কি ফোড়ন কেটে বলল,—সূর্য মাথার ওপর উঠলে এখন দুপুর নয়, বেলা একটা।

শুখভ অবাক হয়ে বলল,—কেন তা হবে? যাদেরই নাতিপুতি আছে তারাই জানে—সূর্য যখন মাথার ওপর ওঠে তখনই ঠিকদুকুর।

ক্যাপ্টেন সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,—ওসব দাদামশায়দের আমলের ব্যাপার। তারপরের আমলে নতুন হুকুম জারী হয়েছে। ঠিক বেলা একটায় সূর্য থাকে মাথার ওপর।

—হুকুম কে জারী করল?

—সোভিয়েত সরকার।

ক্যাপ্টেন বুইনভ্‌স্কি হাতগাড়িগুলো নিয়ে চলে গেল। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে শুখভের তর্ক করার ইচ্ছে ছিল না। সূর্যও নাকি সরকারী হুকুম মেনে চলে! তাও কি হয়?

হাতুড়ি মেরে মেরে শেষ পর্যন্ত চারটে হাতগাড়ি তৈরি হয়ে গেল।

পাভ্‌লো দুজন রাজমিস্ত্রিকে ডেকে বলল,—আচ্ছা, ঠিক আছে—এসো আমরা একটু বসে খানিকটা আগুন পুইয়ে নিই। এসো সেন্‌কা, তুমিও এসো—দুপুরে খাওয়ার পর তোমাকে ওদের সঙ্গে দেয়াল গাঁথতে যেতে হবে।

অতএব চুল্লীর পাশে বসবার তো তাদের এখন হক্‌ রয়েছে। এখুনি দুপুরের খাওয়ার ছুটি হবে; তার আগে দেয়াল গাঁথার কাজে হাত দেবার আর সময় পাওয়া যাবে না। আর যদি একটু বেশী আগে সিমেন্ট মেশানো যায়, ঠাণ্ডায় জমাট বেঁধে যাবে।

শেষ পর্যন্ত কয়লাগুলো ভালভাবে ধরে গেলে সমানে আগুনের তাপ পাওয়া যেতে লাগল। তবে সেটা টের পেতে হলে চুল্লীটার কাছ ঘেঁষে বসা দরকার। বাকি ঘরটা যে ঠাণ্ডা সেই ঠাণ্ডাই থেকে গেল।

চারজনই তাদের হাত অনাবৃত করে আঁচের কাছে ধরল।

তাই বলে বুটজুতো পরে যেন কক্ষণো আগুনের কাছে পা বাড়িও না। মনে থাকে যেন। যদি তোমার পায়ে বুট থাকে, আগুনের তাপে চামড়া ফেটে যাবে। আর যদি ভালেঙ্কি হয়, বরফের কুচোগুলো গলে গিয়ে ভিজে যাবে, জুতোর গা থেকে ভাপ উঠবে—ঠাণ্ডার হাত থেকে একটুও পরিত্রাণ পাবে না। আর যদি আগুনের আরও কাছে গিয়ে বসবার চেষ্টা করো ভালেঙ্কি পুড়ে যাবে। তার ফল হবে এই যে, সারা বসন্তকাল তোমাকে ছ্যাঁদাওয়ালা জুতো পরে থাকতে হবে। ফুটো জুতোর বদলে নতুন জুতো পাবে—সে আশা করো না।

কিল্‌গাস দুষ্টুমি করে বলল,—শুখভের কী আসে যায়? আর দাদা, শুখভ তো বেরুল বলে—বাইরে এক পা বাড়িয়েই দিয়েছে।

একজন আবার তার সঙ্গে আরেকটু জুড়ে দিল,—ঐ যে হে—ঐ খালি পা-টা। সবাই

হো-হো করে হেসে উঠল। শুখভ তার তালি-মারা ফেল্টের বুটটা খুলে ফেলে পায়ের পট্টিগুলো সেঁকে নিচ্ছিল।

—শুখভের দিন তো এখানে ঘনিয়ে এল।

কিলগাসকে দিয়েছে তেইশ বছরের সাজা। আগে কিন্তু বেশ ছিল; সকলের ঢালাও সাজা—দশ বচ্ছর। কিন্তু উনপঞ্চাশ সালের পর থেকেই নতুন পর্ব শুরু হল—যে কেউ যাই করে থাকুক—পঁচিশ বচ্ছর ধরে ঘানি টানার ব্যবস্থা। পটোল না তুলে মেরেকেটে দশ বছর টিঁকে থাকা যায়, কিন্তু টিঁকে থাকো তো দেখি পঁচিশ বছর।

সবাই শুখভকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে—এতে শুখভের বেশ ভাল লাগল। সত্যিই, তার মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে; তবে সে যে খালাস পাবে এ বিশ্বাস তার নেই। যুদ্ধের মধ্যে যাদের মেয়াদ ফুরিয়েছিল, তাদের কী দশা হয়েছিল মনে নেই? ১৯৪৬ সালে নতুন হুকুমনামা যতদিন না এল, ততদিন তাদের জেলে আটক থাকতে হয়েছিল। সুতরাং মূলে যাদের তিন বছরের সাজা হয়েছিল, তাদের আরও পাঁচ বছর বেশী সাজা খাটতে হল। আইন—জিনিসটা এমন যে, সরকার তাকে ইচ্ছেমত সোজা উল্টো দুই করতে পারে। সুতরাং তোমার দশ না হয় পুরলো—ওরা তখন বলবে, এই নাও দাদা, আরও দশ। না নেবে তো যাও কালাপানি পার।

যত যাই হোক, কথাটা মনের মধ্যে মাঝেসাঝে ঝিলিক না দিয়ে পারে না। মনে হলেই দম বন্ধ হয়ে আসে। সমস্ত কিছু সত্ত্বেও জেলের মেয়াদ শেষ হয়ে আসছে। লাটাইতে সুতো খুলছে...হায় ভগবান! বাইরে যখন বার হব, তখন স্বাধীন মানুষ। স্বাধীন!?

ক্যাম্পের একজন পুরনো লোক হয়ে মুখ ফুটে এসব কথা বলা ঠিক নয়। কাজেই শুখভ সে কথা চেপে গিয়ে কিল্‌গাসকে বলল,—তোমার যে পঁচিশ, সে-পঁচিশ গোণবার মোটে চেষ্টাই করো না। পঁচিশ বছর বসে থাকাও যা আর চিম্‌টের বৈঠে মেরে ডিঙি বাওয়াও তাই। তবে আমি যে পুরো আটটা বছর বসে থেকেছি—তাতে ভুল নেই।

উটপাখির মত তোমরা বালির মধ্যে মুখ গুঁজে পড়ে থাকো; তোমাদের এ সময় নেই যে তোমরা ভাববে কেমন করে জেলে এলে এবং কেমন করেই বা এখান থেকে বেরোবে।

রেকর্ডে আছে, শুখভের সাজা হয়েছে রাজদ্রোহের জন্যে; নিজের বিরুদ্ধে নিজেই সে সাক্ষী দিয়েছে। মাতৃভূমির প্রতি বেইমানি করার জন্যে সে জার্মানদের কাছে আত্ম-সমর্পণ করেছিল এবং পরে যে রুশ বাহিনীতে সে ফিরে এসে যোগ দিয়েছিল, তার কারণ জার্মান গোয়েন্দা বিভাগ তাকে কিছু কাজের ভার দিয়েছিল। কী ধরনের কাজের ভার—না শুখভ, না তার তদন্তকর্তা—দুজনের একজনও ঠিক ভেবে বার করতে পারে নি। সুতরাং শুধু কাজের ভার—এইটুকু বলেই তারা ছেড়ে দিয়েছিল।

শুখভ সোজা এঁচে নিল: যদি সই না করি, সাড়ে তিন হাত মাটি। সই করলে আরও কিছুদিন বেঁচে থাকা যাবে। সুতরাং শুখভ সই করল।

ব্যাপারটা আদতে ঘটেছিল এই: বিয়াল্লিশ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে উত্তর-পশ্চিম রণাঙ্গনে লালফৌজ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে। আকাশ থেকে খাবারদাবার ফেলা হচ্ছে না। কোনো এরোপ্লেন নেই। ক্রমে এমন খারাপ হাল হল যে, লোকে মরা ঘোড়ার পায়ের খুর-গুলো কেটে নিয়ে জলে ভিজিয়ে ভিজিয়ে খেতে লাগল। গোলাবারুদও সব ফুরিয়ে গিয়েছিল। জার্মানরা একেকবারে অল্প কয়েকজন করে লোককে বন্দী করছে। এমনি একটা দলে আট্‌কা পড়ে গিয়েছিল শুখভ। বনের মধ্যে দিন দুই বন্দী হয়ে থাকার পর

শুখভ আর তার সঙ্গে আরও চারজন লোক সেখান থেকে এক ফাঁকে কেটে পড়ে। ঝোপ-ঝাড়ের ভেতর দিয়ে জলকাদা ভেঙে, হবি তো হ, নিজেদের এলাকাতেই তারা এসে পেঁাছল। শুখভের দুজন সঙ্গী মেশিনগানের গুলি খেয়ে সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। আরেকজনও জখম হয়েছিল; সে মরল পরে। শুখভ আর তার একজন সঙ্গী—শুধু এই দুজনই যা বেঁচে গেল। ওরা যদি একটু চালাক-চতুর হত তাহলে বলত: জঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেছিলাম। তাহলেই সব ঠিক হয়ে যেত। তা নয়, বোকার মত ওরা সত্যি কথাটাই বলে ফেলল। বলল,—পালিয়ে চলে এসেছি।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নকর্তাদের গলার স্বর সপ্তমে উঠল।—পালিয়ে এসেছ? ইয়ার্কি মারার—, বলে মা তুলে বিশ্রী একটা গালাগাল দিল। যদি ওরা পাঁচজনই বেঁচে থাকত, তাহলে হয়ত পাঁচজনের মুখের কথার সঙ্গে মিলিয়ে ওদের দুজনের জবান-বন্দী বিশ্বাসযোগ্য হতে পারত। ওদের মুখের কথা প্রশ্নকর্তারা বিশ্বাস করলেন না। ওদের বলা হল,—আগে থেকে দুজনে যুক্তি করে পালানোর গপ্পটা বুঝি ফেঁদে রেখেছিলি? শয়তান কাঁহাকা!

সেন্কা ক্লেভ্শিন কালা হলেও জার্মানদের হাত থেকে পালাবার কথাটা শুনতে পেয়েছিল। শুনে সে চিৎকার করে বলল,—আমি তিনবার ওদের হাত থেকে পালিয়েছিলাম, তিনবারই ধরা পড়েছিলাম।

সেন্কার ওপর দিয়ে সারাটা জীবন কম ঝড়ঝাপ্টা যায় নি। এমনিতে সে চুপচাপই থাকে। কানে কম শোনে বলে বড় একটা কথাবার্তা সে বলে না। লোকে তার সম্বন্ধে বেশী কিছু জানে না; শুধু এইটুকু জানে যে, সেন্কা ছিল বুকেনওয়াল্ডে; সেখানকার গুপ্ত আন্দোলনের সঙ্গে তার যোগ ছিল এবং বিদ্রোহ ঘটানোর জন্যে সে গোপনে সেখানে অস্ত্রশস্ত্র আমদানি করেছিল। জার্মানরা তাকে পিছমোড়া করে বেঁধে ঝুলন্ত অবস্থায় লাঠিপেটা করে।

কিল্গাস ছাড়ল না। শুখভের কথার উত্তরে বলল,—হ্যাঁ, তা আট বছর আছ বটে—কিন্তু কোথায় ছিলে, চাঁদ? ছিলে তো সাধারণ ক্যাম্পে। মেয়েমানুষদের সঙ্গে। গায়ে নম্বর লাগাতে হত না। হাড়ভাঙা খাটুনির ক্যাম্পে থাকতে তো বুঝতাম। ওখান থেকে আজ পর্যন্ত কেউ জান্ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারে নি।

—মেয়েমানুষদের সঙ্গে বলছ? মেয়েমানুষ নয়, গাছের গুঁড়ি...

আগুনের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শুখভের মনে পড়ে গেল উত্তরাঞ্চলে তার সাত বছরের বন্দীজীবনের কথা। প্যাকিং বাক্স আর রেলের স্লীপার তৈরির জন্যে সমানে তিন বছর তাকে কাঠের গুঁড়ি বইতে হয়েছে। সেখানেও এমনি দাউ দাউ করে আগুন জ্বলত—রাত্তিরে যখন কাঠ কাটার কাজ হত। বড়কর্তার হুকুম ছিল—যে দল দিনের বরাদ্দ কাজ বেলাবেলি শেষ করতে পারবে না, রাত্রে জঙ্গলে থেকে তাদের কাজ করতে হবে।

রাত দুপুরের আগে কোনোদিনই তারা ক্যাম্পে ফিরতে পারত না; এদিকে সকাল হতে না হতেই আবার জঙ্গলে ছুটতে হত।

—ন্‌ন্‌-না ভাই, বলতে গিয়ে শুখভের কথাটা জড়িয়ে গেল।—আমি বলব, বরং এ জায়গায় খানিকটা শান্তি আছে। দিনের বরাদ্দ কাজ শেষ হোক না হোক, ক্যাম্পে তবু ফেরা যাবে। ওখানকার চেয়ে রেশনের পরিমাণও এখানে কম-সে-কম ছটাকখানেক বেশী। এখানে তুমি হাড় ক'খানা বজায় রাখতে পারো। হলই বা স্পেশাল ক্যাম্প, তাতে হয়েছে

কী! নম্বরগুলো কি তোমাকে কামড়ায়? নম্বরের তো কোনো ভারই নেই, হে!

ফেতিউকভ ধিক্কার দিয়ে বলে উঠল,—ফুঃ, এখানে নাকি শান্তি! দুপুরের খাওয়ার ছুটির আর দেরি নেই বলে সবাই এখন আগুনের কাছ ঘেঁষে এসে বসেছে। ফেতিউকভ বলল,—ঘুমন্ত লোকদের গলা কাটা যায় এখানে। শান্তির জীবনই বটে!

পাভ্‌লো ফেতিউকভের দিকে তর্জনী নেড়ে শাসিয়ে বলল,—লোক নয়, বিভীষণ!

এটা ঠিক যে, ক্যাম্পে একটা নতুন রকম ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। একদিন ভোরের ঘণ্টা বাজার সময় দেখা গেল দুজন লোক (সবাই যাদের কর্তৃপক্ষের চর বলে জানে) গলা-কাটা অবস্থায় তাদের বাঙ্কে পড়ে আছে। আর একদিন দেখা গেল একজন সাধারণ কয়েদীরও ঐ অবস্থা। বাঙ্ক ভুল হয়েছিল বোধহয়? কর্তৃপক্ষের একজন চর তো সাজা দেবার হাজতের অফিসারদের কাছে পালিয়ে গিয়েছে—সেখানে তাকে তালাবন্ধ করে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। অদ্ভুত সব ব্যাপার। সাধারণ ক্যাম্পগুলোতে এমন জিনিস ঘটে না। আর বলতে কি, এ জিনিস এখানেও এই প্রথম ঘটছে।

আচমকা বিজলী ট্রেনের হুইস্‌ল্‌ বেজে উঠল। প্রথমেই পুরোদমে নয়—গোড়ায় একটু ভাঙা ভাঙা মত, যেন গলাটা ঝেড়ে নিচ্ছে।

দুপুর। দিনের অর্ধেক কাবার। এবার খাওয়ার ছুটি।

এঃ, ওরা বড্ড গা ঢিলে দিয়ে ফেলেছে। অনেক আগেই ওদের উচিত ছিল খাওয়ার জায়গায় গিয়ে লাইনে দাঁড়ানো। এখানে কাজে আসে এগারোটা ব্রিগেড—দুটো দলের বেশী একসঙ্গে বসে খাওয়ার জায়গা হয় না।

তিউরিনের এখনও পাত্তা নেই। পাভ্‌লো একবার চকিতে চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। তারপর বলল,—শুখভ আর গপ্‌চিক—আমার সঙ্গে এসো। দেখ, কিল্‌গাস—আমি গপ্‌চিককে পাঠালে দলের সবাইকে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চলে আসবে।

ওরা উঠতেই সেই জায়গায় অন্যেরা এসে চুল্লীর কাছে বসল। এমনভাবে ওরা চুল্লীটার কাছে এগিয়ে গেল যেন চুল্লীটা কোনো মেয়েমানুষ। ওরা সবাই তাকে জড়িয়ে ধরবার জন্যে তার গা ঘেঁষে গিয়ে বসল।

একজন সবাইকে শুনিয়ে বলে উঠল,—সরে এসো! বুদ্ধির গোড়ায় একটু ধোঁয়া দিয়ে নেওয়া যাক।

এ ওর মুখের দিকে চাইল। কই, কেউই সিগারেট ধরাচ্ছে না। হয় কারো কাছে তামাক-টামাক কিছু নেই, নইলে যার আছে সে চেপে যাচ্ছে।

শুখভ আর গপ্‌চিক পাভ্‌লোর সঙ্গে বেরিয়ে গেল। গপ্‌চিক ঠিক একটা খর-গোশের ছানার মত ওদের পেছন পেছন খর খর করে চলল।

শুখভ বেরিয়েই বলে উঠল,—ঠাণ্ডা আগের চেয়ে কম। এখন খুব বেশী হলে শূন্য। দেয়াল গাঁথতে খুব খারাপ লাগবে না।

চাঙড়গুলোর দিকে তারা ঘাড় বেঁকিয়ে তাকাল। বেশ কিছু চাঙড় ডাঁই করা হয়েছে ভারার তক্তায়। কিছু চাঙড় তুলে ফেলা হয়েছে দোতলার ওপর।

শুখভ চোখ কুঁচকে একবার সূর্যের দিকে তাকাল, বুইনভ্‌স্কির ফতোয়াটা ঠিক কিনা পরখ করবার জন্যে।

ফাঁকায় এসে বোঝা গেল হাওয়া তখনও গায়ের ওপর কেটে কেটে বসছে। হাওয়া যেন এ কথা তাদের হাড়ে হাড়ে টের পাইয়ে দিতে চাইছিল—ভুলে যেও না হে, এটা জানুয়ারি।

একটা চুল্লীকে ঘিরে চারদিকে তক্তাপোঁতা ছোট একটা চালাঘর। ফাটা-ফুটোগুলো বুজোবার জন্যে মরচে-ধরা লোহার পাত পেরেক দিয়ে আটকানো। ভেতরে পার্টিশন করা —একদিকে রান্নার জায়গা, আরেক দিকে খাওয়ার জায়গা। মেঝেয় পাটাতন নেই; পা দিয়ে মাটি ঠেসে দেওয়া হয়েছে—ব্যস্, আর কিছু নয়। চারদিকে কোথাও গর্ত, কোথাও মাটি উঠে আছে। রান্নার জিনিস বলতে চৌকো চুল্লীটার সঙ্গে সিমেন্ট-করা একটা বড় পাত্র।

রান্নাঘরের কাজে আছে দুজন লোক—একজন রসুই করে, আরেকজন দেখাশুনো করে স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপার। সকালে ক্যাম্প থেকে বেরোবার আগে রান্না করার লোকটাকে বড় ক্যাম্পের পাকশালা থেকে দিনের রেশন দিয়ে দেওয়া হয়। মাথাপিছু হয়ত ছটাকখানেক মকাই; একেকটি ব্রিগেড ধরলে সেরখানেক, আর এ জায়গায় যত লোক কাজে আসে তাদের সবাইকে ধরলে মোট আঠারো সেরেরও কম হবে। রান্নার লোকটি তাই বলে ক্রোশখানেক রাস্তা নিজে বয়ে নিয়ে যায় না। রেশনের বস্তাটা সে আর কারো পিঠে চাপায়। তাকে সে অন্যদের ভাগ থেকে নিয়ে খানিকটা বাড়তি খাবার দেয়—নিজে ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়ার চেয়ে তাও বরং ভাল। জল আনা, কাঠকুটো যোগাড় করা, উনুন ধরানো—কোনোটাই সে নিজে করে না। প্রত্যেকটা কাজই সে কাউকে না কাউকে দিয়ে করিয়ে নেয়—তার বদলে তাদের বাড়তি কিছুটা করে খাবার দেয়। অন্যদের ভাগ থেকেই সে দেয়, কাজেই তার আর দিতে কী?

নিয়ম হল, সবাইকে খাওয়ার জায়গায় বসে খেতে হবে। খাবার নিয়ে বাইরে যেতে পারবে না। বাটিগুলো আনতে হয় ক্যাম্প থেকে। এখানে যে একটা রাত ফেলে রেখে যাবে, তার জো নেই। কেননা কয়েদী নয় এমন যে সব বাইরের মজুর এখানে কাজ করতে আসে, তারা বাটিগুলো পেলেই নিয়ে চলে যাবে। কাজেই এখানে একসঙ্গে পঞ্চাশটার বেশী বাটি আনা হয় না। এ'টো বাসনগুলো সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে ফেলে আবার তাইতে করে নতুন লোককে খাবার দেওয়া হয়। যে লোকটা বাটিগুলো বয়ে আনে তাকে খানিকটা বাড়তি খাবার দেওয়া হয়। বাটিগুলো ঘরের বাইরে যাতে চলে না যায়, তার জন্যে দরজায় এক-জনকে দিয়ে পাহারা দেওয়ানো হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও, হয় সে লোকটার পিঠে হাত বুলিয়ে, নয় তার চোখে ধুলো দিয়ে কয়েদীরা বাটিগুলো বাইরে নিয়ে যায়। কাজেই তখন আবার আর কাউকে পাঠিয়ে বাইরের মাঠ-ময়দান থেকে এ'টো বাসনের ডাঁইগুলো আনিয়ে নিতে হয়। এমনি করে দশজনের খাবারে ভাগ বসাবার লোক ক্রমেই বেড়ে বেড়ে যায়।

যে রসুই করে, তার কাজ শুধু হাঁড়িতে খিচুড়ি চাপিয়ে দিয়ে তাতে নুন ছড়িয়ে দেওয়া; চর্বির খানিকটা সে হাঁড়িতে দেয়, খানিকটা নিজে খায়। ভাল চর্বি কখনই কয়েদী-দের কপালে জোটে না; কেবল দুর্গন্ধ বাসি চর্বিটুকু হাঁড়ির মধ্যে যায়। ক্যাম্পের ভাঁড়ার থেকে তাই যতটা বাসি চর্বি দেয়, কয়েদীদের ততটাই লাভ। উনুনে জল যখন ফুটে ওঠে, রাঁধুনী তখন খুন্তি দিয়ে নাড়ানাড়ি করে। যার ওপর স্বাস্থ্যরক্ষার ভার, তাকে সেটুকুও করতে হয় না। সে দিব্যি গ্যাঁট হয়ে বসে দেখে। খিচুড়ি হওয়ামাত্র সে-ই প্রথম খেয়ে দেখে—এবং বেশ ঠেসেই খায়। রাঁধুনীও ভর-পেট খেয়ে নেয়। এরপর আসে ডিউটি-ফোরম্যান—একজনই রোজ নয়, যেদিন যার পালা পড়ে। ডিউটি-ফোরম্যানকে দেখে নিতে হয় খিচুড়িটা লোকজনদের পাতে দেবার মত ঠিক হয়েছে কিনা। ডিউটি-ফোরম্যান পাবে ডবল ভাগ।

এমনি সময় বাঁশী বাজে। তখন অন্য ফোরম্যানেরা ভেতরে আসে। রান্নার লোকটি

খিচুড়ির বাটিগুলো জানলা গলিয়ে হাতে হাতে এগিয়ে দেয়। দেখা যায়, শুধু বাটির তলায় জেগে রয়েছে একটু করে পাতলা জলের মত খিচুড়ি। কেই বা দেখতে যাচ্ছে ওজন, আর কেই বা জিজ্ঞেস করছে বরাদ্দের কতটা পাওয়া গেল না গেল। মুখ খুলেছ কি, গালাগালির চোটে ভূত ভাগিয়ে দেবে।

ধু ধু করছে প্রান্তর; তার ওপর দিয়ে সোঁ সোঁ করে বইছে হাওয়া। গরমের সময় হাওয়াটা থাকে খড়খড়ে শুকনো; শীতের সময় কন্‌কনে। এখানকার মাটিতে—বিশেষ করে, কাঁটাতারের রাজত্বে—কিছুই হয় না। এ তল্লাটে ফসলের দানা দেখতে পাবে একমাত্র রুটি রাখার ভাঁড়ারে; এখানে জই পাকে একমাত্র গুদামঘরে। খেটে খেটে যদি তুমি হাড় কালি করে ফেলো, যদি সাষ্টাঙ্গে পড়ে যাও—তবু মাটি থেকে দাঁতে কুটো কাটারও কিছু তুমি জোটাতে পারবে না। মুরুব্বিরা যা দেবে, কিছুতেই তার এককোঁটা বেশী তুমি পাবে না। সেটুকুও তুমি পুরো পাচ্ছ না—কারণ, তাতে থাবা বসাবার জন্যে আছে রান্নার লোকজন, তাদের যারা সাহায্যকারী এবং কয়েদীদের মধ্যে যারা কর্তাব্যক্তি। তারা বাইরে এসে মারে। ক্যাম্পের ভেতরে বসে মারে। মারে তারও আগে—খোদ্ মালখানা থেকে। যারা মারে, তারা কিন্তু বড় একটা গতর খাটায় না। তোমার বেলায় অন্য ব্যাপার—তুমি যেমনি গতরেও খাটবে, তেমনি যা দেবে তাই নেবে। জান্‌লা গলিয়ে হাতে বাটি দেবে, পাওয়া মাত্র কেটে পড়বে।

যে যার সে তার।

পাভ্‌লো, শুখভ আর গপ্‌চিক খাওয়ার ঘরের ভেতরে এল। ঘরের ভেতর এমন গিজ গিজ করছে লোক যে, টেবিল বা বেঞ্চি কিছুই তাদের চোখে পড়ল না। কিছু লোক খাচ্ছিল বসে, কিন্তু তার চেয়েও বেশী লোক ছিল দাঁড়িয়ে। ৮২নং ব্রিগেডের লোকেরা বাইরের কন্‌কনে ঠাণ্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে সকাল থেকে দুপুর গর্ত খুঁড়ছে; তারাই এসে আগেভাগে জায়গা দখল করে বসেছে। এখন তাদের খাওয়াদাওয়া শেষ, তবু তাদের নড়বার নাম নেই। এমন গরম জায়গা ছেড়ে যাবেই বা কোন্ চুলোয়? লোকে ওদের যাচ্ছেতাই বলে গাল দিচ্ছে; ওরা কিছু গায়েই মাখছে না। বাইরের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডার চেয়ে ঘরের ভেতরটা ঢের বেশী আরামের।

পাভ্‌লো আর শুখভ কোনো রকমে ঠেলেঠুলে ভেতরে এল। ওরা এসেছে একেবারে ঠিক সময়ে। একটি ব্রিগেড তখন খিচুড়ির বাটি নিচ্ছে। লাইনে দাঁড়িয়ে আছে আর একটি মাত্র দল। ওদের সহকারী ফোরম্যান জান্‌লার ধারে দাঁড়িয়েছে। বাকি সবাই আমাদের পিছনে।

জানলার ওপাশ থেকে রাঁধুনী লোকটা 'বাটি কোথায়! বাটি নিয়ে এসো' বলে চেঁচাচ্ছে। লোকজনেরা সঙ্গে সঙ্গে জানলায় বাটি এগিয়ে দিচ্ছে। শুখভও চট্‌পট্ কিছু বাটি যোগাড় করে জানলার ধারে এগিয়ে দিল—বাড়তি খাবারের আশায় নয়, যাতে পরিবেশনটা একটু তাড়াতাড়ি হয়।

কিছু সাহায্যকারী লোক বাসন ধুতে শুরু করে দিয়েছে। তারাও ভাগে খানিকটা বেশী পাবে।

পাভ্‌লোর সামনে যে সহকারী ফোরম্যান্‌টি ছিল, সে এবার পেতে শুরু করে দিল। পাভ্‌লো তার কাঁধের ওপর দিয়ে হাঁক দিল : গপ্‌চিক।

দরজার কাছ থেকে বলতে শোনা গেল,—এই যে আমি! ছাগশিশুর মত মিষ্টি মিহি গলা।

—ব্রিগেডের লোকজনদের ডাকো!

গপ্‌চিক তক্ষুণি ছুট লাগালো।

খিঁচুড়িটা আজ যা হয়েছে এমন আর হয় না—তোফা! জই দেওয়া হয়েছে যে! অন্যান্য দিন সাধারণত দুবেলাই মাগারা দেয়; নইলে কুঁড়ো। কিন্তু জইতে যেমনি পেটও ভরে, তেমনি খেতেও ভাল।

শুখভ জোয়ান বয়সে তার ঘোড়াগুলোকে জই খাওয়াত। তখন সে স্বপ্নেও ভাবেনি কোনোদিন একমুঠো জইয়ের জন্যে তাকে হামলাতে হবে।

—বাটি কোথায়? বাটি নিয়ে এসো! জানলায় হাঁক শোনা গেল।

এবার ১০৪নং ব্রিগেডের পালা। সহকারী ফোরম্যান পাভ্‌লো ফোরম্যানের 'ডবল ভাগ' নিয়ে জান্‌লা ছেড়ে চলে গেল।

এটাও যায় মুনিষদেরই ভাগ থেকে। তবে এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করে না। প্রত্যেক ফোরম্যানের জন্যেই একটা করে বাড়তি বরাদ্দ থাকে; হয় সে নিজে খায়, নইলে আর কাউকে দিয়ে দেয়। তিউরিন দিত পাভ্‌লোকে।

এবার শুখভের কাজ হল ঠেলেঠুলে কোনো রকমে একটা টেবিলে গিয়ে জায়গা দখল করা। ধুঁকে-পড়া দুজন লোককে লেঙ্গি মেরে সরিয়ে, একজনকে দয়া করে সরে যেতে বলে, শুখভ একটা টেবিলের খানিকটা জায়গা খালি করে নিল। বারোটা বাটি ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসবে; তার ওপর ছ'টা; তারপর সেই ছ'টার ওপর আরও দুটো। এবার পাভ্‌লোর কাছ থেকে শুখভ বাটিগুলো নেবে; এক-দুই করে তাকেও গুণতে হবে এবং সেইসঙ্গে দেখতে হবে কেউ যেন একটা বাটিও হাতিয়ে নিতে না পারে। হুঁশিয়ার থাকতে হবে—যেন কারো হাত লেগে বাটিগুলো উল্টে না যায়। ঘেঁষাঘেঁষি টেবিলে কেউ খাওয়া শেষ করে হুড়মুড় করে বেঞ্চি ছেড়ে উঠছে, কেউ বা বেঞ্চিতে পা গলিয়ে দিয়ে বসছে খেতে। শুখভকে নজর রাখতে হচ্ছে টেবিলে বাইরের কেউ যেন তাদের জায়গায় হস্তক্ষেপ না করে। এইও, কার বাটি থেকে খাওয়া হচ্ছে? আমাদেরটা থেকে নাওনি তো!

জান্‌লার ওপার থেকে রান্নার লোকটি গুণতে লাগল, দুই চার, ছয়! একেবারে দুটো দুটো করে সে এগিয়ে দিচ্ছে। তাতে গোণার ব্যাপারে ভুল হওয়ার ভয় কম।

পাভ্‌লো জানলায় দাঁড়িয়ে য়ুক্রেনীতে বিড় বিড় করে সেইসঙ্গে গুণে চলল,—দুই, চার, ছয়! শুখভকে সে দুটো দুটো করে বাটি দিচ্ছে, শুখভ সেগুলো টেবিলে রেখে দিচ্ছে। মুখে কিছু না বললেও শুখভ মনে মনে ঠিক গুণে যাচ্ছিল।

—আট, দশ।

গপ্‌চিক ব্রিগেডের লোকদের আনতে এত দেরি করছে কেন?

—বারো, চোদ্দ—গোণা চলতে লাগল।

রান্নাঘরে বাটি নেই আর। পাভ্‌লোর ঘাড় আর মাথার ওপর দিয়ে শুখভ রাঁধুনীর দুটো হাত দেখতে পাচ্ছিল—জান্‌লার ওপর দুটো বাটি রেখে হাত দিয়ে সে ধরে রয়েছে—বাটিদুটো হাতছাড়া করবে কি করবে না ভাবছে। যে বাসন মাজছে, তাকে গালাগাল দেবার জন্যে নিশ্চয় ও ঘুরে দাঁড়িয়েছে। ঠিক সেই সময় একগাদা এঁটো বাসন জান্‌লা গলিয়ে তার দিকে এগিয়ে দেওয়া হল। সে তখন বাটি থেকে হাত সরিয়ে এঁটো বাসনগুলো ফিরিয়ে নিল।

শুখভ তার হাতের বাটিগুলো টেবিলে রেখে দিয়ে একটা বেঞ্চিতে লাফিয়ে উঠে জান্‌লার দুটো বাটিই হস্তগত করল। তারপর, যেন রান্নার লোকটিকে বলছে না, বলছে

যেন পাভ্‌লোকে—এমনি একটা ভাব দেখিয়ে গলা নামিয়ে গুণতে গুণতে বলল,—চোদ্দ।

রান্নার লোকটি চেঁচিয়ে উঠল,—থামো, থামো! কোথায় নিয়ে চললে?

পাভ্‌লো বলল,—আমাদের লোক ও! আমাদের লোক।

—তোমাদের লোক! কিন্তু ও যে হিসেব গুলিয়ে দিল।

পাভ্‌লো কাঁধটা একটু ঝাঁকিয়ে বললে,—চোদ্দ হয়েছে। পাভ্‌লো নিজে হলে খাবার চুরির মত অতটা নিম্ন পর্যায়ে নামতে পারত না। কারণ, সহকারী ফোরম্যান হিসেবে তার একটা ইজ্জৎ বলে জিনিস আছে। শুখভ যা বলেছে, পাভ্‌লো শুধু তার প্রতিধ্বনি করেছে। দোষটা সে শুখভের ঘাড়ে চাপাতে পারবে।

রান্নার লোকটি চটে উঠে বলল,—চোদ্দ তো আগেই বলেছি!

শুখভ গলা চড়িয়ে বলল,—বলেছ তো কী হয়েছে! তুমি তো দাওনি। হাত দিয়ে ধরে ছিলে! বিশ্বাস না হয়, নিজে গুণে দেখে নাও। টেবিলেই তো সব আছে।

রান্নার লোকটির সঙ্গে কথা বলতে বলতে শুখভ দেখল সেই এস্তোনিয়ার দুই মানিকজোড় আসছে। চট্ করে শুখভ তাদের হাতে দুটো বাটি ধরিয়ে দিল। তারপর এক ফাঁকে টেবিলের কাছে গিয়ে দেখে নিল বাটিগুলো সব আছে কিনা—বলা যায় না, কেউ যদি ওখান থেকে বাটি চুরি করে তো ধরবার জো থাকবে না।

জানলার ফাঁক দিয়ে রান্নার লোকটির রক্তবর্ণ মুখ দেখা গেল।

কড়াভাবে সে জিজ্ঞেস করল,—বাটিগুলো কোথায়?

শুখভ গলা চড়িয়ে বলল,—আজ্ঞে মশাই, এই যে—। সামনে আড়াল করে একজন দাঁড়িয়েছিল, শুখভ তাকে 'আহা, সরে যাও না' বলে ঠেলে সরিয়ে দিল। মাথার বাটি দুটো তুলে শুখভ দেখিয়ে বলল,—এই দুই। আর—এই দেখ, ঠিকঠাক চারটে করে তিন সার—গুণে দেখ।

জানলার ফুটোটা এইটুকু। এত ছোট যে, তার ভেতর দিয়ে রান্নাঘরে উঁকি মেরে হাঁড়িতে কতখানি খাবার থাকল এটা বোঝা কয়েদীদের পক্ষে সম্ভব নয়। সেই ছোট্ট ফুটোটা দিয়ে রান্নার লোকটা সন্দেহের চোখে জ্বল্ জ্বল্ করে তাকিয়ে বলল,—তোমাদের দলের লোকজন আসে নি এখনও?

পাভ্‌লো ঘাড় নেড়ে বলল,—না, আসে নি।

পাভ্‌লো হেঁকে বলল,—এইতো, বলতে বলতে সব হাজির।

রান্নার লোকটি চটেমটে বলল,—আসে নি তো তাড়াতাড়ি খাবারের বাটিগুলো নিচ্ছ কী জন্যে?

পাভ্‌লো হেঁকে বলল,—এই তো, বলতে বলতে সব হাজির—

ক্যাপ্টেন দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকছিল। তার হাঁকডাক সকলেরই কানে গেল। এমনভাবে কথা বলছিল, যেন সে এখনও জাহাজেরই ক্যাপ্টেন,—কী হচ্ছে? এখানে এত ভিড় কিসের? খাওয়া হয়ে থাকলে যাও সব, কেটে পড়ো। অন্যদের বসতে দাও।

রান্নার লোকটি আরও খানিকটা বিড়বিড় করল। তারপর টান হয়ে দাঁড়াল। জানলায় আবার তার দুটো হাত দেখা গেল।

—ষোল, আঠারো...

এবং শেষের বাটিতে ডবল ভাগ দিয়ে বলল,—এই হল তেইশ! ব্যস্। এবার পরের ব্রিগেড।

১০৪নং ব্রিগেডের লোকজন ভিড় ঠেলে এগিয়ে এল। দ্বিতীয় টেবিলে যারা খেতে বসেছিল, শুখভ তাদের মাথার ওপর দিয়ে নিজেদের দলের লোকদের হাতে বাটিগুলো চালান করে দিল।

গরমকালে প্রত্যেক বেঞ্চিতে পাঁচজনে হেসেখেলে বসতে পারে। কিন্তু শীতের সময় গায়ে থাকে মোটা জাব্বাজোব্বা—তখন পাশাপাশি চারজন করে বসতেও কষ্ট হয়। বসলেও খাওয়া কঠিন।

দুটো বাড়তি বাটি আছে; শুখভ ধরেই রেখেছিল দুটোর মধ্যে অন্তত একভাগ সে পাবে। সময়মত যে বাটিটা পেয়েছে, সেটা তাই চটপট শেষ করবার কাজে সে লেগে গেল। ডান হাঁটুটা পেটের কাছে এনে জুতোর মাথা থেকে 'উস্‌ৎ-ইঝ্‌মা, ১৯৪৪' লেখা চামচেটা বার করে শুখভ মাথা থেকে টুপিটা খুলে ফেলে বাঁ বগলে রাখল। তারপর চাম্‌চেটা দিয়ে খিচুড়ির বাটিটার ধার বরাবর নাড়তে লাগল।

এখন হল একাগ্রচিত্তে খাওয়ার সময়—বাটির তলা থেকে পাতলা খিচুড়ির একটা পর্দা উঠিয়ে নিয়ে সুন্দরভাবে মুখের মধ্যে রাখবে, তারপর জিভ দিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে গোল্লা পাকাতে থাকবে। কিন্তু শুখভের খেয়ে শেষ করার তাড়া ছিল; তার খাওয়া হয়ে গেছে এটা যাতে পাভ্‌লো দেখতে পেয়ে তাকে আরেক ভাগ খিচুড়ি দেয়। এস্তোনিয়ানরা যখন ঘরে ঢোকে, ফেতিউকভও তাদের সঙ্গে ছিল। শুখভকে দু বাটি খিচুড়ি মেরে দিতে সে দেখেছে। ফেতিউকভ পাভ্‌লোর মুখোমুখি বসে খাচ্ছিল। কেবলি সে বাড়তি ভাগগুলোর দিকে নজর দিচ্ছিল, যাতে পাভ্‌লো দয়াপরবশ হয়ে আরও এক আধ ভাগ তাকে দেয়।

রোদে-পোড়া সোমত্ত চেহারা পাভ্‌লোর। সে বেশ নির্বিকারভাবে তার ডবল খানা শেষ করল। তার মুখ দেখে বোঝার জো নেই আশপাশে কাউকে সে দেখতে পাচ্ছে কিনা কিংবা আদৌ তার মনে আছে কিনা যে, তার হাতে দুটো বাড়তি খাবারের ভাগ আছে।

শুখভ তার খিচুড়িটুকু শেষ করল। দু বাটি খিচুড়ি খাবে, এটা তার সমস্ত মন-প্রাণ এমনভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, মোটে একটা বাটিতে তার ক্ষিধে গেল না। কাজেই তখন ভেতরের পকেট থেকে সে একটা সাদা ন্যাকড়ার পুঁটলি খুলে তা থেকে একটুকরো পাঁউরুটি বার করে পাঁউরুটির টুকরোটা দিয়ে সযত্নে বাটির পাশ আর তলা চেঁছেপুঁছে নিল। পাঁউরুটির গা থেকে খিচুড়িটুকু জিভ দিয়ে চেটে নিয়ে আবার সে বাটিটা চাঁছতে পুঁছতে লেগে গেল। শেষকালে মাজাঘষা পরিষ্কার চেহারা দাঁড়াল বাটিটার—শুধু ওপর-ওপর রংটা যা একটু চাপা। যে লোকটা পাত পরিষ্কার করছিল, শুখভ তার হাতে বাটিটা তুলে দিল এবং টুপিটা মাথায় না চাপিয়ে ঠায় বসে রইল।

বাটি দুটো শুখভই সরিয়েছে বটে, কিন্তু সহকারী ফোরম্যানই হল বাটি দুটোর মালিক।

আরও খানিকক্ষণ কাটল। পাভ্‌লো নির্বিকারভাবে খেয়ে চলেছে। এদিকে শুখভ অশান্তিতে ছটফট করছে। পাভ্‌লো খাওয়া শেষ করে বাটিটা জিভ দিয়ে চাটল না; চাম্‌চেটা চেটেপুঁছে সরিয়ে রেখে কপালে আর বুকের দুপাশে আঙুল ঠেকিয়ে ক্রসচিহ্ন করল। তারপর বাকি চারটে বাটির মধ্যে দুটো বাটি হাত দিয়ে আলতোভাবে ছুঁল।

—ইভান দেনিসোভিচ। একটা তুমি নাও, আর একটা ৎসেজারকে দিয়ে এসো।

ৎসেজারকে একটা বাটি দিয়ে আসতে হবে শুখভ জানত। কী এখানে, কী ক্যাম্পে—বারোয়ারী খাওয়ার জায়গায় গিয়ে খেতে ৎসেজারের আত্মসম্মানে লাগত। কিন্তু জানলেও,

পাভ্‌লো যখন একসঙ্গে দুটো বাটিতে হাত রেখেছিল, সঙ্গে সঙ্গে শুখভের বুকের মধ্যে ছাঁৎ করে উঠেছিল—পাভ্‌লো কি তাহলে দুটো বাটিই শুখভকে দিচ্ছে? পাভ্‌লোর কথা শুনে শুখভ একটু ধাতস্থ হল।

শুখভ এবার তার যথাবিহিত স্বত্বটির ওপর হুম্‌ড়ি খেয়ে পড়ে বেশ মন লাগিয়ে তারিয়ে তারিয়ে খেতে লাগল। নতুন ব্রিগেডের লোকজনেরা তাকে যে পেছন থেকে ঠেলা-ঠেলি করছিল, সে বিষয়ে তার বিন্দুমাত্র হুঁশ ছিল না। পাছে বাড়তি অন্য ভাগটা ফেতিউ-কভ পেয়ে যায়, এটাই ছিল তার একমাত্র দুশ্চিন্তা। পরের পাত কুড়োবার কাজে ফেতিউ-কভ একেবারে সিদ্ধহস্ত—কিন্তু চুরি করতে বলো, ওর সে সাহস নেই।

টেবিলের ওপাশে কাছাকাছি বসেছিল বুইনভ্‌স্কি। অনেক আগেই ওর খিঁচুড়ি খাওয়া হয়ে গেছে; বাড়তি যে কিছু আছে, তা সে জানতও না। খাওয়া শেষ করে গরম ঘরটার মধ্যে বসে থাকতে বুইনভ্‌স্কির বেশ আরাম লাগছিল। উঠে পড়ে বাইরের ঠাণ্ডায় গিয়ে দাঁড়াবে কিংবা নিরুত্তাপ ছাউনির মধ্যে ঢুকবে—সেটুকু মনের জোর বুইনভ্‌স্কির তখন ছিল না। একটু আগে যাদের সে বাজখাঁই গলায় খেদিয়েছিল, তাদেরই মত বেআইনী-ভাবে সে জায়গা জুড়ে বসে রইল, অথচ অন্য ব্রিগেডের নতুন লোকেরা বসতে জায়গা পেল না। বুইনভ্‌স্কি এখানে খুব বেশিদিন আসে নি—এখনও এখানকার সাধারণ কাজের সঙ্গে নিজেকে সে রপ্ত করে নিতে পারে নি। বুইনভ্‌স্কি জানতে পারত না বটে, কিন্তু এই ধরনের কয়েকটি মুহূর্তই তাকে নৌবহরের একজন জাঁদরেল চোখা অফিসার থেকে আস্তে আস্তে বদ্‌লে ধড়িবাজ গদাইলস্কর কয়েদীতে পরিণত করে ফেলছিল। এই গয়ংগচ্ছ ভাব-খানার জোরেই পঁচিশটা বছর সে জেলের ঘানি টেনে যেতে পারবে।

এর মধ্যেই বুইনভ্‌স্কিকে উঠে যাবার জন্যে লোকে চেল্লাচিল্লি ঠেলাঠেলি করতে শুরু করে দিয়েছে।

পাভ্‌লো বলল,—ক্যাপ্টেন! বলি, ও ক্যাপ্টেন।

বুইনভ্‌স্কি যেন ঘোরের মধ্যে ছিল। হঠাৎ ধড়মড়িয়ে উঠে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল।

পাভ্‌লো কোনো রকম জিজ্ঞেসপত্তর না করেই ওর হাতে আরেক বাটি খিঁচুড়ি তুলে দিল।

বুইনভ্‌স্কির চোখ কপালে উঠল। খিচুড়ির দিকে সে এমনভাবে তাকিয়ে থাকল যেন খুব একটা আজব চিজ।

পাভ্‌লো ওকে সাহস দিয়ে বলল,—নাও, ধরো! বলে শেষের বাটিটা ফোরম্যানের জন্যে নিয়ে পাভ্‌লো চলে গেল।

ক্যাপ্টেনের ঠোঁটের ফাঁকে একটু সলজ্জ হাসি ফুটে উঠে তক্ষুণি মিলিয়ে গেল। প্রায়ই সে ইউরোপের চারধারে, উত্তরের সমুদ্রপথে টহল দিয়ে বেড়িয়েছে—নৌবহরের সেই ক্যাপ্টেন খিচুড়ির বাটির ওপর মহানন্দে ঝুঁকে পড়েছে—তাও জলের মত পাতলা জইয়ের খিঁচুড়ি, তাতে একটুও চর্বি পড়ে নি।

ফেতিউকভ উঠে যাবার আগে শুখভ আর বুইনভ্‌স্কির দিকে কটমট করে তাকিয়ে গেল।

শুখভকে কেউ যদি জিজ্ঞেস করে, তাহলে শুখভ বলবে, ক্যাপ্টেনকে দেওয়াটা ভাল কাজ হয়েছে। বেঁচে থাকার ঘাঁতঘোঁতগুলো জেনে নিতে বুইনভস্কির আরো কিছুদিন সময় লাগবে। এখনও পর্যন্ত সে জানেই না কিভাবে বেঁচে থাকতে হয়।

শুখভের এমন কি ক্ষীণ একটা আশাও ছিল—ৎসেজার হয়ত তাকে নিজের ভাগটা দিয়ে দেবে। না দেওয়াই সম্ভব; কেননা গত দু সপ্তাহ ওর বাড়ি থেকে কোনো খাবার-দাবারই আসে নি।

দ্বিতীয় দফায় খাওয়া শেষ করে শুখভ ফের প্রথম বারেরই মত বাটিটার তলা আর পাশগুলো রুটির ছালটা দিয়ে সযত্নে চেঁছেপুঁছে নিয়ে জিভ দিয়ে চেটে নিল। শেষ পাতে রুটির ছালটা মুখে পুরে দিল। তারপর ৎসেজারের জুড়িয়ে জল হয়ে যাওয়া খিচুড়ির বাটিটা হাতে নিয়ে উঠে পড়ল।

দরজায় যে লোকটা পাহারা দিচ্ছিল, শুখভের হাতে বাটি দেখে সে আট্‌কাল। 'অফিসে যাচ্ছি' বলে তাকে কনুই দিয়ে সরিয়ে শুখভ বেরিয়ে গেল। গুমটির কাছে অফিসের চালাঘর। সকালবেলার মত চিমনি দিয়ে গলগলিয়ে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। একজন ফালতু আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। তাকে আবার চিঠিচাপাটি দিয়ে-আসা নিয়ে-আসার কাজও করতে হয়। ঘণ্টা হিসেবে ওর কাজ। তবে অফিসের চুল্লীতে যত ইচ্ছে কাঠকুটো জ্বালানো যায়।

বাইরের দরজাটা খুলতেই ক্যাঁ-চ্ করে শব্দ হল। তারপর আরেকটা দরজা; রন্ধ্র-গুলো দড়ির কিৎনি দিয়ে মোক্ষম করে আঁটা। শুখভ ভেতরে যেতেই বাইরের একরাশ ঠাণ্ডা ধোঁয়া হুশ্ করে ঢুকে পড়ল। শুখভ চটপট দরজাটা বন্ধ করে দিল। তার ভয় হল, এখুনি না কেউ খেঁকিয়ে ওঠে,—এইও, মাথামোটা! বন্ধ কর্ দরজা।

অফিসের ভেতরটা হামামের মত গরম। জান্‌লার গায়ে গলন্ত বরফ ভেদ করে রোদ্দুর আনন্দে আটখানা হয়ে খেলা করছে—বিজলী স্টেশনের মাথার ওপর তার যেরকম শত্রুতার ভাব ছিল, সে ভাব একেবারেই নেই। ৎসেজারের পাইপ থেকে ধোঁয়া উঠে সেই রোদের ছটায় যেন মন্দিরের ধুপধুনোর মত দেখাচ্ছে। চুল্লীতে সারাক্ষণ গন্‌গনে আঁচ। শালারা কি রকম বেধড়ক কাঠ পোড়াচ্ছে, দেখ! চুল্লীর নলগুলো পর্যন্ত লাল হয়ে তেতে উঠেছে।

এমন গরম জায়গায় এক মিনিটও কেউ যদি বসে, ঘুমে চোখের পাতা জড়িয়ে আসবে।

অফিস বাড়ির দুটো কামরা। দ্বিতীয় ঘরটা নির্মাণকাজের তত্ত্বাবধায়কের। মাঝের দরজাটা ভাল করে বন্ধ করা ছিল না বলে ঘরের ভেতর থেকে তত্ত্বাবধায়কের গলার স্বর-ভেসে আসছিল,—মজুরি আর বাড়ির মালমশলার খাতে যা বরাদ্দ ছিল, তার ওপর আমাদের বাড়তি খরচ হয়ে গেছে। সিমেন্টের চাঙড়গুলোর কথা বাদই দিলাম—কিন্তু দামী দামী সব তক্তা কেটে তোমাদের লোকজনেরা ছাউনির মধ্যে আগুন পোহাচ্ছে। আর তোমরা নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছ। ক'দিন আগে তোমাদের লোকজনেরা প্রচণ্ড হাওয়ার মধ্যে মাল-গুদামের কাছে সিমেন্ট খালাস করেছে। সেখান থেকে খোলা অবস্থায় দশ কদম দূরে ঠেলাগাড়িতে করে নিয়ে গেছে। ফলে কী হয়েছে? না, গোটা এলাকায় এক হাঁটু সিমেন্ট জমে গেছে। আর লোকগুলা ভূতের মত চেহারা নিয়ে সেখান থেকে বেরিয়ে এসেছে। জিনিসের কিরকম অপচয়, একবার ভেবে দেখ।

শুনেই বোঝা যায়, ও ঘরে বৈঠক চলছে। নিশ্চয় তাতে ছোট মাতব্বরেরা আছে।

দরজার কাছে এককোণে একজন ফালতু টুলের ওপর বসে ঢুলছে। আরও খানিকটা দূরে খুঁটির মত বেঁকে দাঁড়িয়ে আছে শ্‌কুরোপাতেঙ্কো—ব-২১৯ নম্বর কয়েদী। জানলা দিয়ে সে নজর রাখছে যেন কেউ তার পাটাগুলো টুক্ করে উঠিয়ে নিয়ে না যায়। কিন্তু

মাথার ওপর চাল-ছাওয়ার কাগজগুলো যে হাওয়া হল—তুমি দেখতে পেলে না, চাচা?

দুজন খাতাঞ্চি—দুজনেই কয়েদী—চুল্লীর ওপর রুটি টোস্ট করছিল। তার দিয়ে ওরা বেশ একটা ধরার ব্যবস্থা করে নিয়েছে যাতে না পোড়ে।

ডেস্কের ওপর আড় হয়ে ৎসেজার পাইপ টানছিল। শুখভের দিকে পেছন ফিরে ছিল বলে শুখভকে দেখতে পায় নি। ৎসেজারের মুখোমুখি হয়ে বসেছিল খ-১২৩ নম্বর, আদালতে যার বিশ বছরের সাজা হয়েছে। বুড়ো হলেও তার বেশ গাঁটাগোট্টা চেহারা। বসে খিচুড়ি খাচ্ছিল।

ৎসেজার মিহি গলায় থেকে থেকে বলছিল,—আজ্ঞে, না মশাই—আপনি যদি বস্তু-নিষ্ঠভাবে দেখেন, তাহলে আপনাকে মানতেই হবে আইজেন্স্তাইন একজন যুগান্তকারী প্রতিভাধর পুরুষ। "ভয়ঙ্কর সেই ইভান" ছবিতে কি তার পরিচয় পান নি? ওপ্রিচনিকদের সেই নাচ! ক্যাথিড্রালের সেই দৃশ্য!

খ-১২৩ চটে গিয়েছিল। মুখের সামনে চাম্চেটা ধরে বলল,—ওসব চমকসুন্দর! কচ্লে কচ্লে শিল্পের আর কিছু রাখে নি। দৈনন্দিন মাছভাতের বদলে মশলাদার মোগলাই ব্যাপার। তাও কী! না, তাতে একেবারে জঘন্যতম রাজনৈতিক মত তুলে ধরা হয়েছে–স্বৈরতন্ত্রের জয়গান করা হয়েছে। তিন পুরুষের রুশ মনীষাকে এর ভেতর দিয়ে ঝাঁটা মারা হয়েছে।

লোকটা খেয়ে চলেছে, কিন্তু খাওয়ার দিকে কোনোই মন নেই—ওভাবে খেলে খাওয়াটা কক্ষণো গায়ে লাগে না।

—ওভাবে না দেখিয়ে উপায়ই বা কী ছিল?

—এবার পথে এসো। উপায় কী ছিল? তাহলে আর যুগান্তকারী প্রতিভা-টতিভা —ওসব কথা বলো না। সোজা বলো, লোকটা ছিল পা-চাটা। মনিব যা বলেছে, ল্যাজ নীচু করে তাই শুনেছে। বড় প্রতিভা যাদের, তারা কখনও দমনপীড়নকারী শাহান্শাদের রুচি অনুযায়ী নিজেদের দেখবার ধরন পালটায় না।

উঁচুদরের আলোচনা চলছে। এর মধ্যে কথা বলতে যাওয়া মানেই আলোচনায় ব্যাঘাত ঘটানো। শুখভের সাহস হল না। কিন্তু সেই বা আর কাঁহাতক খামাখা দাঁড়িয়ে থাকে? এইসব ভেবে শুখভ বার দুই গলা খাঁকারি দিল।

ৎসেজার এপাশে ফিরে শুখভের দিকে একবারও না তাকিয়ে হাত বাড়িয়ে তার খিচুড়ির বাটিটা এমনভাবে টেনে নিল—যেন খিচুড়ির বাটিটা আপনি হাওয়ায় ভেসে এসেছে।

—কিন্তু এও জেনে রেখে দিন—শিল্প জিনিসটা 'কী' নয়, শিল্প হল 'কেমন'।

খ-১২৩ আরেকবার হাত দিয়ে টেবিলে ঘা মেরে জবাব দিল,—যান মশাই, শিল্প যদি আমার মধ্যে সুভাব না জাগাল—তাহলে আপনি আপনার 'কেমন' নিয়ে জাহান্নামে যান।

খিচুড়ির বাটিটা দেবার পর শুখভ যতক্ষণ ইজ্জত বজায় রেখে দাঁড়িয়ে থাকা যায় ততক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। বলা যায় না, শুখভকে হয়ত খানিকটা তামাক নেবার জন্যে বলতে পারে। কিন্তু শুখভকে ৎসেজারের নজরেই পড়ল না।

কাজেই শুখভ গুটি গুটি যে রাস্তায় এসেছিল সেই রাস্তায় হাঁটা দিল।

বাইরে তেমন ঠাণ্ডা নই। দেয়াল গাঁথতে এখন খুব একটা কষ্ট হবে না।

শুখভ রাস্তা দিয়ে হাঁটছিল। যেতে যেতে বরফের ওপর ইস্পাতের একটা ফলা দেখতে পেল। বোধহয় আলগা হয়ে ছিল, কোনো কিছু থেকে খসে পড়েছে।

জিনিসটা তার এক্ষুণি কোনো কাজে লাগবে না। কিন্তু কোন্‌ জিনিস কখন কাজে লাগে আগে থেকে কিছু বলা যায় না। কাজেই কুড়িয়ে নিয়ে শুখভ সেটা প্যান্টের পকেটে রেখে দিল। বিজলী স্টেশনে গিয়ে ওটা লুকিয়ে রেখে দিতে হবে। বড়লোক হওয়ার চেয়ে মিতব্যয়ী হওয়া ভাল।

বিজলী স্টেশনে গিয়ে শুখভের পয়লা কাজই হল লুকোনো কর্নিকটা বার করা। কর্নিকটা নিয়ে পেছনে দড়ির কোমরবন্ধে গুঁজে রাখল। তারপরেই সে মেশিনঘরের দিকে

বাইরের রোদে এতক্ষণ থাকার পর ঘরে ঢুকে কেমন যেন অন্ধকার-অন্ধকার লাগতে লাগল; বাইরের চেয়ে ঘর তেমন গরম বলেও বোধ হল না। তাছাড়া স্যাঁৎসেঁতে।

হয় শুখভের বসানো গোল চুল্লীটাকে ঘিরে, নয় যেখানে শুকোবার জন্যে রাখা বালি থেকে ভাপ উঠছে, তার কাছাকাছি তামাম লোক ভিড় করে রয়েছে। কিছু লোক জায়গা না পেয়ে গিয়ে বসেছে সুরকির বাক্সের এক ধারে। ফোরম্যান তিউরিন চুল্লীর কাছ ঘেঁষে বসে তার খিচুড়ির বাটিটা শেষ করছিল। তার ঠাণ্ডা খিচুড়ি চুল্লীতে বসিয়ে পাভ্‌লো গরম করে দিয়েছে।

ঘরের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জন চলেছে। সকলেরই খুব খোশমেজাজ। লোকপরম্পরায় চুপি চুপি শুখভকে ওরা সুখবরটা জানিয়ে দিল। ফোরম্যান ভালভাবেই কাজের কোটা ছাপিয়ে গেছে। তিউরিন খুব ডগমগ হয়ে ফিরেছে।

কাজটা কোত্থেকে গজালো, কাজটাই বা কী—সেসব তিউরিন জানে। আজ সকাল-বেলাকার কথাটাই ধরো না কেন—কাজ কী হয়েছে? ঘোড়ার ডিম। চুল্লী বসানো কিংবা মাথা গোঁজার ঠাঁই করা—এর কোনোটার জন্যেই কোনো পাওনা হয় না। যা হয়েছে তা নিজেদের জন্যে, ইমারতের কাজ হিসেবে নয়। কিন্তু খাতায় কিছু একটা বাবদে লিখতে হয়েছে। সম্ভবত ৎসেজার খাতা লেখার ব্যাপারে তিউরিনকে সাহায্য করেছে। নইলে তিউরিন কি আর এমনি এমনিই ৎসেজারকে এত খাতির করে?

কোটা ছাপিয়ে গেছে—তার মানে পাঁচটা দিন ভাল রেশন মিলবে। না, ঠিক পাঁচ নয়—চার দিন বলাই ভাল। ভাল এবং আনাড়ি নির্বিশেষে পুরো ক্যাম্প যাতে প্রতিশ্রুত ন্যূনতম রেশন পায়, তার জন্যে খোদ অফিসাররাই একটা দিনের রেশন মেরে দেবে। এতে হয়ত ক্ষুণ্ণ হওয়া উচিত নয়; কারণ, সকলেই পাবে সমান ভাগ। কিন্তু ওরা যে আমাদের পেট কেটে নিজেদের খরচ বাঁচায়। ঠিক আছে, কুছপরোয়া নেই—কয়েদীদের পেটে সব কিছুই সয়। আজকের দিনটা যো-সো করে চালিয়ে নেব, তারপর কাল না হয় খাওয়া যাবে।

যে দিনটা থাকে প্রতিশ্রুত ন্যূনতম খোরাকীর দিন, সেদিন চোখে এই স্বপ্ন নিয়ে সবাই ঘুমোতে যায়।

কিন্তু তারপর তোমার কাছে এই হিসেবটা ধরা পড়ে—খাটছ পাঁচদিন, কিন্তু খাচ্ছ চারদিন।

দলের কারো মুখে রা নেই। যার কাছে এতটুকুও ধূমপানের জিনিস আছে, তাই ধরিয়ে সে চুপচাপ টানছে। আবছা আলোয় ঘেঁষাঘেঁষি হয়ে বসে সবাই আগুনের দিকে চেয়ে আছে। সকলে মিলে যেন একই পরিবার। চুল্লীর কাছে বসে ফোরম্যান তিউরিন জনকয়েককে একটা গল্প বলছিল। সবাই কান খাড়া করে শুনছিল। তিউরিন এমনিতে কথা বলে কম। কাজেই তার গল্প শুরু করার মানেই হল তার মেজাজটা খুব ভাল আছে।

আন্দ্রেই প্রোকোফিচ তিউরিন। টুপি পরে খেতে না পারার দলে তিউরিনও পড়ে। মাথায় টুপি না থাকলে তিউরিনকে বুড়ো দেখায়। অন্য সবার মতই তিউরিনের চুল কদমছাঁট করা—কিন্তু তবু চুল্লীর মিটমিটে আলোতেও পরিষ্কার দেখা যায় শুখভের মাথার অনেকটাই বেশ সাদা হয়ে এসেছে।

...ব্যাটালিয়নের কমান্ডারকে দেখলেই আমার হাঁটু কাঁপত, আর চেয়ে দেখি আমার সামনে স্বয়ং রেজিমেন্টের কমান্ডার। আজ্ঞা করুন, অধীন লালফৌজের তিউরিন।

কমান্ডার তাঁর হিংস্র ভুরুর নীচে থেকে আমার দিকে কট্‌মট্‌ করে চাইলেন।—তোমার পুরো নাম?

—আমি বললাম।

—জন্ম সাল? কোন্‌ সালে জন্মেছি বললাম। এটা বলছি তিরিশ সালের কথা। আমার তখন বাইশ বছর বয়েস—একেবারেই বালখিল্য।

—ভাল, তা তিউরিন, আজ কী উদ্দেশ্যে?

—শ্রমিক শ্রেণীর সেবার জন্যে। বলতেই কমান্ডার ক্ষেপে গিয়ে দুহাত দিয়ে টেবিলে দড়াম করে ঘুসি মারলেন।

—তুমি কাজ করছ শ্রমিক শ্রেণীর জন্যে! নিজে কী তুমি, বদ্‌মায়েশ কাঁহাকা?

আমি ভেতরে ভেতরে রাগে ফুলছিলাম। কিন্তু নিজেকে সামলে রাখলাম। —পদাতিক বাহিনীর গোলন্দাজ, প্রথম শ্রেণী। উঁচুদরের সামরিক আর রাজনৈতিক...

কমান্ডার আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন,—কোন্‌ শ্রেণী? হারামজাদা, তোমার বাপ ধনী চাষী। চেয়ে দেখ, কামেন থেকে ওরা লিখে পাঠিয়েছে। তোমার বাপ ধনী চাষী এবং তুমি সেখান থেকে গা ঢাকা দিয়েছ। তোমাকে ওরা দু' বছর ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

শুনে আমার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গেল। কোনো কথা বললাম না। একটা বছর বাড়িতে আমি চিঠি লিখিনি, যাতে ওরা আমার খোঁজ না পায়। বাড়ির লোকেরা বেঁচে আছে কি মরে গেছে কিছুই আমি জানতাম না; বাড়ির লোকেরাও আমার কোনো খবর রাখত না।

কমান্ডার চিৎকার করে বললেন,—লজ্জা করে না? বলবার সময় তাঁর উর্দির চারটে ফলকই নেচে উঠ্‌ল, বিবেকে বাধে না চাষীমজুরের রাষ্ট্রকে ঠকাতে?

আমি ভাবলাম আমাকে এবার উনি মারবেন। কিন্তু মারলেন না। উনি লিখিত হুকুম দিলেন—ছ' ঘণ্টার মধ্যে আমাকে সামরিক বাহিনী থেকে ঘাড় ধরে বের করে দেওয়া হল। বাইরে তখন নভেম্বরের ঠান্ডা। আমার গা থেকে শীতের ইউনিফর্ম কেড়ে নিয়ে আমাকে দেওয়া হল নতুন রংরুটদের পরা তিন বছরের পুরনো গ্রীষ্মের উর্দি। আমাকে ওরা মোক্ষম তুড়ুং ঠুকে দিল। শীতের উর্দি আমি না দিলেও পারতাম, আমি বলতে পারতাম অমুক জায়গায় যেতে চাই—কিন্তু তখন আমি আইনকানুন কিছুই জানতাম না। সেইসঙ্গে আমার হাতে ওরা একটা সর্বনেশে ছাঁটাইপত্র দিল। তাতে লেখা: কুলাকপুত্র বিধেয়......সামরিক বাহিনী হইতে বরখাস্ত করা হইল। নতুন চাকরি পাওয়ার পক্ষে চমৎকার চিঠি বটে! রেলে বাড়ি যেতে চার দিনের রাস্তা; আমাকে ওরা টিকিট তো দিলই না, সঙ্গে একটা দিনের শুক্‌নোশাক্‌না খাবার পর্যন্ত দিল না। শেষ বারের মত মধ্যাহ্ন-ভোজন করিয়ে ক্যাম্প থেকে আমাকে বিদায় করে দিল।

হ্যাঁ, এই প্রসঙ্গে বলে নিই: আটত্রিশ সালে কৎলাস ট্র্যান্‌জিট ক্যাম্পে আমার সাবেক

স্কোয়াড কমান্ডারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাকেও দশ বছর ঠুকে দিয়েছে। তার কাছেই শুনলাম—রেজিমেণ্টের কমাণ্ডার আর পলিটিক্যাল অফিসার, দুজনকেই সাঁইত্রিশ সালে গুলি করে মারা হয়। তার মানে, সর্বহারাই হও আর ধনী চাষীই হও, বিবেক থাকুক বা না থাকুক...সবই এক কথা। শুনে আমি কপালে আর বুকে ক্রুসচিহ্ন এঁকে বললাম,—যে যাই বলুক, হে সৃষ্টিকর্তা! মাথার ওপরে তুমি সত্যিই আছ। তোমার টনক নড়ে একটু দেরিতে, কিন্তু যখন মারো—সে বড় কঠিন মার।

দু' বাটি খিচুড়ি খাওয়ার পর ধূমপান না করে শুখভ আর পারছিল না। শুখভ সাত নম্বর ব্যারাকের ল্যাটভিয়ার লোকটির কাছ থেকে দু' মগ তামাক কিনবে এটা ঠিক হয়ে আছে—কাজেই এখন ধার নিলে পরে তাই থেকে সে শোধ করে দিতে পারবে। সুতরাং সেই ভরসায় শুখভ এস্তোনিয়ার মৎস্যজীবী লোকটিকে ফিস্ ফিস্ করে বলল,—শোনো, এইনো! এক ছিলিমের মত আমাকে একটু তামাক দাও। কালকেই শোধ করে দেব। তুমি জানো, আমি তোমাকে ঠকাব না।

এইনো সটান শুখভের চোখে চোখ রাখল; তারপর একটুও তাড়াহুড়ো না করে আস্তে আস্তে চোখ সরিয়ে নিয়ে ধর্মভাইয়ের দিকে তাকাল। সব জিনিসেই ওদের দুজনের হাফাহাফি ভাগ। পরস্পরের মত না নিয়ে একরত্তি তামাকও কাউকে ওরা দেবে না। দুজনে ওরা কী যেন হিজিরবিজির করে বলাবলি করল। তারপর এইনো গোলাপী সুতো-ঝোলানো সুন্দর একটা তামাক রাখার থলি বার করল। থলি থেকে একটিপ কলে-কাটা তামাক বার করে শুখভের চেটোর ওপর রাখল। তারপর মেপে দেখে আরও কয়েকগাছি তামাক তাতে যোগ করল। ব্যস্, একটা সিগারেটের পক্ষে এই যথেষ্ট।

শুখভের কাছে একটুকরো খবরের কাগজ ছিল। কাগজটা ফ্যাড়্ ফ্যাড়্ করে ছিঁড়ে ফেলে, তাই দিয়ে একটা সিগারেট পাকিয়ে নিল। তিউরিনের দু'পায়ের ফাঁকে একটা জ্বলন্ত কাঠকয়লা পড়ে ছিল—তুলে নিয়ে শুখভ তাই দিয়ে সিগারেটটা ধরিয়ে নিল। তারপর টান দিয়ে ধোঁয়া গলায় নিয়ে গিলল। আবার একবার টান দিল। আবার ধোঁয়া গিলল। একটা মধুর আমেজ তার সমস্ত সত্তা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল। তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত যেন কড়া মদের ঝাঁঝালো নেশায় চুর হয়ে গেল।

সবে সে সিগারেটটা ধরিয়েছে, এমন সময় মেশিনঘরের ওপাশে হঠাৎ একজোড়া নীল চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে উঠল—এই সেরেছে, ফেতিউকভ। শুখভের হয়ত ওর ওপর মায়া হত, হয়ত একটান টানতেও দিত—কিন্তু ও আজ ইতিমধ্যেই একবার একজনের কাছ থেকে একটান দিয়ে নিয়েছে। শুখভ নিজে ওকে ধোঁয়া ছাড়তেও দেখেছে। শুখভ তার চেয়ে বরং সেন্কা ক্লেভশিনকে দেবে। তিউরিন বলে যাচ্ছে, কিন্তু সেন্কা একটা কথাও শুনতে পাচ্ছে না। বেচারা চুপচাপ ঠায় বসে ঘাড়টা বেঁকিয়ে আগুন পোহাচ্ছে।

তিউরিনের মুখময় বসন্তের দাগ। তাতে চুল্লীটা থেকে আলো এসে পড়েছে। এমন নির্বিকারভাবে বিনা খেদে নিজের কথা সে বলে যাচ্ছিল, শুনে মনে হবে যেন আর কারো কথা সে বলছে : আমার নিজের কাছে যা-কিছু রদ্দি মাল ছিল, একজন দোকানীকে সিকি ভাগ দামে বেচে দিলাম। তাই দিয়ে চোরাবাজারের দরে দুটো পাঁউরুটি কিনলাম—রেশন প্রথা তার আগেই চালু হয়ে গেছে। আমি ঠিক করেছিলাম একটা কোনো মালগাড়িতে চড়ে

বসব; কিন্তু তখন নতুন আইনকানুন হয়েছে—মালগাড়িতে উঠলে কঠোর শাস্তি পেতে হবে। হয়ত তোমাদের মনে থাকতে পারে, সে সময়ে বিনা পয়সায় দূরে থাক—টাকা দিলেও ট্রেনের টিকিট পাওয়া যেত না; সরকারী কাগজ বা পাশ দেখাতে হত। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে যাকে তাকে ঢুকতেই দিত না। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকত মিলিটারি পুলিশ, স্টেশনে স্টেশনে রেললাইনের দুপাশে থাকত সারি সারি পাহারা। রোদে একদম তাপ নেই; মাথার ওপর সূর্য ডুবু ডুবু। ডোবাগুলোর ওপর বরফের সর জমে যাচ্ছে। রাতটা কোথায় কাটাবো? একটা ইঁটের দেয়ালে উঠে কোনো রকমে টপকালাম। সোজা চলে গেলাম স্টেশনের শৌচাগারে। খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করলাম। না, কেউ আমার পিছু নেয়নি। প্যাসেঞ্জারের ভাব করে বেরিয়ে পড়লাম। আমি যেন পল্টনেরই লোক। স্টেশনে ট্রেন দাঁড়িয়ে—ভ্যাদিভস্তক থেকে মস্কো যাচ্ছে। এক দঙ্গল লোক ভিড় করে চলেছে গরম জল আনতে। জলের পাত্র হাতে করে এ ওর মাথা ঠুকে দিচ্ছে। গাঢ় নীল সোয়েটার গায়ে দিয়ে একটি মেয়ে হাতে একটা দেড়সেরী কেৎলি নিয়ে গরম জলের হিটারের কাছে ভয়ে ঘেঁষতে না পেরে কেবলই ঘুরপাক খাচ্ছে। খুদে খুদে পা দুটো পাছে ছ্যাঁকা লেগে পুড়ে যায় কিংবা কেউ মাড়িয়ে দেয়—এই তার ভয়।

আমি তাকে বললাম,—আমার পাঁউরুটি দুটো লক্ষ্মীটি তুমি একটু ধরো, আমি ঝাঁ করে তোমার গরম জল এনে দিচ্ছি। আমি যখন গরম জলের জায়গায় সবে পৌঁচেছি, এমন সময় ট্রেন চলতে আরম্ভ করল। মেয়েটি আমার রুটি দুটো হাতে করে দাঁড়িয়ে। ও দুটো নিয়ে কী করবে বুঝতে না পেরে কেঁদে ফেলে দিল। চায়ের কেৎলিটা খোয়াতে ও সানন্দে রাজী ছিল। আমি চেঁচিয়ে বললাম,—ছুট লাগাও, ছুট লাগাও তুমি। আমি ঠিক ধরে ফেলব। মেয়েটি আগে আগে চলেছে, আমি তার পেছনে। দৌড়ে গিয়ে ধরে ফেললাম। এক হাতে ওকে ধরে ট্রেনে উঠিয়ে দিলাম। ট্রেন তখন জোরে চলতে আরম্ভ করেছে। আমিও পাদানিতে লাফিয়ে উঠে পড়লাম। ট্রেনের কন্ডাক্টর আমার আঙুলের গাঁটগুলোতে বাড়ি মারল না কিংবা বুকে ঠেলা মেরে ফেলেও দিল না। গাড়িতে পল্টনের আরও লোকজন ছিল; আমাকে তাদেরই একজন বলে ভুল করেছিল।

শুখভ কনুই দিয়ে সেনকাকে একটা ঠেলা মারল।—নাও, ধরো সিগারেটটা—হতভাগা, দুটো সুখটান দিয়ে নাও। কাঠের হোল্ডারটাসুদ্ধ সেন্‌কার হাতে সিগারেটটা দিল। ওতে মুখ দিয়েই ও টানুক, সেন্‌কা মুখ দিলে কিছু হবে না। সেন্‌কা বড় অদ্ভুত লোক যাহোক : বেশ একটা নাটুকে ভঙ্গিতে বুকে হাত ঠেকিয়ে ঘাড়টা নুইয়ে সিগারেটটা হাতে নিল। কালা লোকের কাছ থেকে এর চেয়ে আর বেশী কী আশা করা যায়!

তিউরিন বলে চলল : কামরাটাতে ছিল ছ'জন মেয়ে। তারা সব লেনিনগ্রাদের ছাত্রী। হাতেকলমে কাজ শিখতে গিয়েছিল। এখন যে যার বাড়ি ফিরে যাচ্ছে। ওদের ছোট্ট টেবিলের ওপর চমৎকার টাটকা মাখন, আলুথালু সাজ; হুকের গায়ে ঝুলছে বর্ষাতি, ওয়াড়-দেওয়া ছোট্ট ছোট্ট সুন্দর সব সুটকেস। ওরা যেন সবুজ-আলো-দেখানো জীবন-পথের যাত্রী।...ওরা কথা বলছে, হাসছে, আমরা এক জায়গায় বসে চা খাচ্ছি।

আমাকে ওরা জিজ্ঞেস করল কোন্ গাড়িতে আমি উঠেছি। বড় করে আমি একটা নিশ্বাস ফেললাম। তারপর সত্যি কথা বললাম : যে গাড়িতে আমি উঠেছি, তাতে করে

তোমরা পৌঁছবে জীবনে আর আমি পৌঁছব মৃত্যুতে।...

মেশিনঘরে সবাই নিঃসাড়ে বসে। চুল্লীতে শুধু মাঝে মাঝে ফুটফাট শব্দ হচ্ছে।

...মেয়েদের দলটা হায়-হায় করে উঠল। তারপর তারা নিজেরা আলোচনা করতে বসে গেল কী করা যায়।...ওরা করল কি, আমাকে ওপরের বাঙ্কে তুলে দিয়ে বর্ষাতি দিয়ে সর্বাঙ্গ ঢেকে দিল। এমনিভাবে সারা রাস্তা ওরা আমাকে আড়াল করে রেখে নোভো-সিবির্স্ক্-এ পৌঁছে দিল।...হ্যাঁ, এই সূত্রে বলে রাখি—পরে ওদের মধ্যে একজনকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাবার সুযোগ হয়েছিল। পেচোরার জেলখানায়। কিরোভের খুনের মামলায় পঁয়ত্রিশ সালে মেয়েটি ধরা পড়ে। ঘাড়ে এমন হাড়ভাঙা খাটুনির কাজ পড়েছিল যে, ও প্রায় মরবার দাখিল হয়েছিল। আমি তখন একে ওকে ধরে দর্জিঘরে মেয়েটিকে একটা কাজের বন্দোবস্ত করে দিই।

পাভ্‌লো ফিস্ ফিস্ করে তিউরিনকে জিজ্ঞেস করল,—এখন বোধ হয় আমাদের সিমেন্ট মেশানো উচিত?

পাভ্‌লোর কথা তিউরিনের কানেই গেল না।

...সব্জিক্ষেতের ভেতর দিয়ে রাত্তিরবেলায় আমি বাড়িতে পৌঁছুলাম। আবার সেই রাত্রেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। সঙ্গে নিয়ে এলাম আমার ছোট ভাইটিকে। ওকে নিয়ে গেলাম গ্রীষ্মমণ্ডলের দিকে—ফ্রুন্‌জ্-এ। ভাইকে খেতে দেব, কিংবা নিজে খাব—আমার সে সঙ্গতি ছিল না। ফ্রুন্‌জ্-এ দেখলাম রাস্তায় একটা পাত্রে পিচ গলানো হচ্ছে আর তার চার ধারে একদল বাপে-খেদানো মায়ে-তাড়ানো চোর-গুণ্ডা-বদমায়েশ ছোকরা বসে গুলতানি করছে। আমি তাদের পাশে বসে পড়ে বললাম,—ভদ্রমহোদয়গণ! আমার ভাইটিকে আপনাদের সাকরেদ করে নিন। ওকে আপনারা কী করে বাঁচতে হয় তার তালিম দিন। আমার ভাইটিকে ওরা দলে নিয়ে নিল।...কেন আমি তখন নিজেও ওদের দলে ঢুকে পড়লাম না, এই ভেবে এখন আমার আপ্‌শোস হয়।...

ক্যাপ্টেন বুইনভ্‌স্কি জিজ্ঞেস করল,—তোমার ভাইয়ের সঙ্গে পরে আর কখনও দেখা হয়নি?

তিউরিন হাই তুলল।

—না, তার সঙ্গে আর কখনও আমার দেখা হয়নি।

তারপর আবার ও একটা হাই তুলল।

ছোকরা বলে সবাইকে সম্বোধন করে তিউরিন বলল,—মুষড়ে পড়ো না। এমনকি এই বিজলী স্টেশনেও আমরা ঠিক টিঁকে থাকব। সুরকি মেশানোর কাজে যারাই আছ, তারাই লেগে পড়ো। বাঁশী বাজবার অপেক্ষায় বসে থেকো না।

ব্রিগেডে এই রকমটাই হয়ে থাকে। ওপরের কর্তারা এমনকি কাজের সময়ও কয়েদী-দের দিয়ে কাজ করাতে পারে না। অথচ ফোরম্যান বললে ছুটির সময়টুকুতে পর্যন্ত তারা কাজ করবে। তার কারণ, তাদের খাইয়ে বাঁচিয়ে রাখে তো ফোরম্যানই। ফোরম্যান তাদের

দিয়ে কখনই বেগার খাটায় না।

ওরা যখন সুরকি মাখবে, রাজমিস্ত্রিদের তখন কী করবার থাকবে? অথচ তখনই কাজ শুরু হয়ে যাওয়া উচিত। তখন কি তারা কেবল হাত গুটিয়ে বসেই থাকবে?

শুখভ লম্বা একটা নিঃশ্বাস ফেলে উঠে পড়ল।

—যাই, ওপরে গিয়ে বরফ সরিয়ে দিয়ে আসি।

শুখভ ছোট একটা কুড়ুল আর একটা বুরুশ সঙ্গে নিল। চাঙড়গুলো গাঁথবার জন্যে রাজমিস্ত্রিদের উপযোগী হাতুড়ি, মাপজোখ করবার রড, ওলন আর একটুকরো সুতো দরকার। লালচে গাল নিয়ে কিল্‌গাস শুখভের দিকে এমন মুখ করে তাকাল যে, সে যেন বলতে চাইছে—ফোরম্যানের কথায় কেন তোমরা নাচছ? কিন্তু ব্রিগেডের লোকেরা খেতে পেল কি পেল না, কিল্‌গাসের তো তাতে ভারি বয়েই গেছে। দিনে ওর আধপোয়া কিংবা তারও কম খাবারে দিব্যি চলে যায়। বাড়ি থেকে যা আসে, তাই খেয়েই টেকো কিল্‌গাস জীবনধারণ করে।

তাই বলে কিল্‌গাস অবুঝ নয়। সেও উঠে পড়ল। তার জন্যে ব্রিগেডের কাজ আটকে থাকুক, এটা সে চায় না।

কিল্‌গাস শুখভকে ডেকে বলল,—দাঁড়াও, ভানিয়া! আমিও আসছি।

না এসে যাবে কোথায়, চাঁদ! তুমি যদি অতটা একালষেঁড়ে হতে, তাহলে তো চড়চড় করে ওপরে উঠে যেতে, হে!

শুখভের অত হানফান করে ছুটে যাওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। ও চেয়েছিল কিল্‌গাস গিয়ে পড়বার আগেই ওলনসুতোটা হাতে পুরবে। যন্ত্রপাতির গুদাম থেকে ওরা মোটে একটাই ওলন নিয়ে এসেছিল।

ফোরম্যানকে পাভ্‌লো জিজ্ঞেস করল,—দেয়াল গাঁথার কাজ কি তিনজন দিয়ে হবে? আরও একজনকে ওদের সঙ্গে লাগালে কেমন হয়? নাকি, মশলাতে টান পড়বে? স্বভাব-সিদ্ধ য়ুক্রেনী ভাষাতেই পাভ্‌লো কথাগুলো বলল।

তিউরিন কপাল কুঁচকে খানিকটা ভাবল।

—ঠিক আছে, পাভ্‌লো! আমি ওদের সঙ্গে থাকছি। তুমি বরং এখানে এই সুরকির জায়গাটায় থাকো। ঢাউস খোল এটার—এখানে ছ'জন লোক রাখো। এমনভাবে চালাবে যাতে একধার দিয়ে যখন তৈরি মশলা টেনে নেওয়া হবে, তখন যেন সেইসঙ্গে অন্য মুখ দিয়ে নতুন মশলা ঢেলে দেওয়া হয়। দেখো, যেন সমানে একটানা কাজ চলে।

—হেইও! বলে পাভ্‌লো এক তুড়িলাফ দিল। বয়েস কম, রক্ত এখনও গরম—কয়েদখানার জীবন এখনও ওর সব রস নিংড়ে ফেলতে পারেনি। য়ুক্রেনী পিঠেপুলি-খাওয়া গোলগাল মুখ। বলল,—তুমি যদি দেয়াল গাঁথো—আমি বানাব সুরকি। দেখা যাক, কার কত মুরোদ। আরে, বড় বেল্‌চাটা গেল কোথায়?

ব্রিগেডের এও আর এক মজা। পাভ্‌লো জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে চোরাগোপ্তা গুলি ছুঁড়ত, রাত্তিরে মফঃস্বল শহরগুলোতেও হানা দিত। ওর ভারি বয়ে গেছে জেলখানায় এসে হাড়ভাঙা খাটুনি খাটতে! কিন্তু ফোরম্যান যদি কাজ করতে বসে, তাহলে অবশ্য অন্য ব্যাপার।

শুখভ আর কিল্‌গাস দোতলায় উঠে গেল। ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ শুনে ওরা বুঝল সেন্‌কাও ওপরে উঠছে। কালা হলে কী হয়, না বললেও সেন্‌কা কিন্তু সমস্তই ধরতে পারে।

দোতলায় দেয়াল গাঁথার কাজ সবে শুরু হয়েছে। পুরোটা তিন থাক্ করে তো হয়েছেই, কোথাও কোথাও আরো একটু বেশী। আজ ওরা সবচেয়ে সহজ অংশটা গাঁথবে —হাঁটু থেকে বুক অবধি। তার জন্যে ভারা বাঁধার দরকার হবে না।

আগেকার ভারা আর তক্তাগুলো অন্য সব কয়েদীরা হয় অন্যান্য বাড়িতে নিয়ে গেছে, নয় জ্বালানী হিসেবে কাজে লাগাবার জন্যে চেলা করে ফেলেছে—যাতে অন্য ব্রিগেডের লোকেরা ওগুলো নিয়ে নিতে না পারে। এখন ওদের কিছু তক্তা লাগিয়ে নিতে হবে, তবে ওরা পরের দিন হাত চালিয়ে কাজ করতে পারবে—নইলে কাজকর্ম সব ঠেকে থাকবে।

বিজলী স্টেশনের ছাদ থেকে শুখভ অনেক দূর অবধি দেখতে পাচ্ছিল। পুরো এলাকাটা বরফে সাদা হয়ে আছে; চারিদিক খাঁ খাঁ করছে। কয়েদীরা যেখানে পেরেছে মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নিয়েছে; বাঁশী বাজার আগে পর্যন্ত যতটা পারে শরীরটা গরম করে নেবে। কালো কালো গুমটিঘর আর কাঁটাতার-জড়ানো ছুঁচলো খুঁটিগুলো তাকালেই চোখে পড়ছে। রোদের দিকে মুখ করে দাঁড়ালে তবেই তারগুলো দেখা যাচ্ছে—পেছন ফিরলে নয়। এমন ঝকমকে রোদ যে, চোখ খুলে তাকানো যায় না।

একটু দূরে বিদ্যুৎবাহী ট্রেন। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আকাশটাকে নোংরা করে ফেলছে। গল্‌গলিয়ে হুস্ করে ধোঁয়া ছাড়ছে; সিটি বাজবার আগে সমস্ত সময় এই রকমের ঘ্যান্-ঘেনে ধরা গলায় সাঁই সাঁই শব্দ হয়। ঐ! সিটি বাজল। তাহলে দেখা যাচ্ছে, খুব আগে ওরা কাজে হাত দেয়নি।

—ওহে, স্তাখানভপন্থী! ওলনটা নিয়ে হাত চালাও। কিল্‌গাস এই বলে তাড়া দিল।

শুখভও পেছনে লাগতে ছাড়ল না। বলল,—তোমার দেয়ালটা দেখ—কতখানি বরফ জমে রয়েছে। সাফ করতে করতে তো রাত্তির হয়ে যাবে। কর্নিকটা বৃথাই সঙ্গে এনেছ।

মধ্যাহ্নভোজের আগেই ওদের দুজনকে বলেই দেওয়া হয়েছিল কোন্ কোন্ দেয়াল গাঁথতে হবে। কিন্তু ঠিক তক্ষুণি নীচে থেকে ফোরম্যানের গলা শোনা গেল,—ওহে, ছোকরার দল! আমরা দুজন দুজন করে কাজে হাত দেব। তাহলে আর সুরকিগুলো ঠাণ্ডায় জমে যেতে পারবে না। শুখভ! তোমার দেয়ালে কাজ করার জন্যে তুমি ক্লেভ্‌শিনকে সঙ্গে নাও আর আমি থাকব কিল্‌গাসের সঙ্গে। আমি যতক্ষণ গিয়ে না পড়ছি, গপ্‌চিক কিল্‌গাসের সঙ্গে গিয়ে দেয়ালের ওপর থেকে বরফগুলো সরিয়ে ফেলুক।

শুখভ আর কিল্‌গাস পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করল। ঠিক। ওতেই তাড়াতাড়ি কাজ হবে।

ওরা যে যার কুড়ুল হাতে তুলে নিল।

দূরে বরফের গায়ে চোখ-ধাঁধানো রোদ্দুর; এদিক ওদিক মাথা গুঁজবার ঠাঁইগুলো থেকে কয়েদীরা হুড়মুড় করে বেরিয়ে এসে কেউ সকালের ছোট ছোট অসমাপ্ত গর্তগুলোতে খোন্তা চালাচ্ছে, কেউ লোহার জালি বেঁধে দিচ্ছে, কেউবা ওয়ার্কশপের ইমারতে কড়িবরগা লাগাচ্ছে। কিন্তু এসব কিছুই আর তখন শুখভের চোখে পড়ছে না। শুখভ তখন একমাত্র তার নিজের দেয়ালটুকুই দেখছে—বাঁদিকে যেখানে চাঙড়গুলো তার কোমর ছাড়িয়ে উঠেছে, সেই সন্ধিস্থল থেকে ডানদিকে যেখানে তার আর কিল্‌গাসের দেয়াল এক জায়গায় এসে মিলেছে। শুখভ সেন্‌কাকে দেখিয়ে দিল কোন্ কোন্ জায়গা থেকে বরফ ছাড়াতে হবে; তারপর নিজে দমাদ্দম করে কখনো কুড়ুলের ধারালো দিক কখনো ভোঁতা দিক দিয়ে এমন-

ভাবে বরফের ওপর ঘা দিতে লাগল যে, চটাস্ চটাস্ করে বরফের টুকরোগুলো চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগল, কখনও বা সটান তার মুখে এসে লাগতে লাগল। শুখভের কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই; দেয়াল ছাড়া দ্বিতীয় কোনো চিন্তাও নেই তার মাথায়। সে শুধু একদৃষ্টে বরফ কুঁদে কুঁদে কল্পনার জোরে বার করে আনছে বিজলী স্টেশনের দু' চাঙড়ে গাঁথা মোটা দেয়ালের মূর্তিটা। দেয়ালের এই অংশটা যে রাজমিস্ত্রি করেছিল, হয় সে একদম আনাড়ি—নয়, একেবারেই মন দিয়ে করেনি। কিন্তু শুখভ এখন এমনভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়ে দেখছে যেন দেয়ালটা তার নিজেরই। ও-ই, ঐ জায়গাটায় একটা খোঁদল হয়ে আছে। একটা থাকে ওটা সমান করা যাবে না। তিনটে থাক্ লেগে যাবে। প্রত্যেকবারই ঐ জায়গাটায় এসে চুণবালি একটু মোটা করে লাগাতে হবে। ইস্, এক জায়গায় দেখছি বাইরের দেয়ালটা একটু ঢিবিমত হয়ে আছে। দু' থাক্ পরে ওটা টেনে সমান করে দিতে হবে। শুখভ মনে মনে দেয়ালটা দুটো ভাগে ভাগ করে নিল; জোড়ের মুখ থেকে বাঁদিকে ধাপে ধাপে চাঙড়গুলো যেখানে উঠেছে, সেটা হবে তার ভাগ; কিল্‌গাসের দেয়াল পর্যন্ত বাকি ভাগটা হবে সেন্‌কার। শুখভ মনে মনে এঁচে নিল : কোণটাতে কিল্‌গাস কিছু চাঙড় সেন্‌কার জন্যে রেখে না দিয়ে পারবে না, কেননা সেটাই তার পক্ষে সুবিধের হবে। ওরা দুজনে যখন কোণের কাছে জট পাকাবে, সেই ফাঁকে শুখভের অর্ধেক দেয়াল তোলা হয়ে যাবে; ফলে শুখভদের জুটির পিছিয়ে পড়বার আর ভয় থাকবে না। শুখভ মনে মনে এঁচে নিল কোথায় কোথায় সিমেন্টের চাঙড়গুলো বসাবে। চাঙড়গুলো ছাদের ওপর তোলা হয়েছে দেখামাত্র শুখভ চেঁচিয়ে আলিওশাকে ডাকল,—নিয়ে এসো আমার এখানে। রাখো এখানে। হ্যাঁ, আর এই যে এইখানে।

সেন্‌কা তখনও বরফ চাঁচছে। শুখভ দুহাতে তারের বুরুশটা চেপে ধরে দেয়াল বরাবর একবার এদিক একবার ওদিক করে সিমেন্টের চাঙড়ের ওপর ঘষতে লাগল। ষোলআনা পরিষ্কার না হলেও মোটামুটিভাবে বরফ চাঁছা গেল। জোড়ের মুখগুলোতে ফিনফিনে একটা ছোপ তখনও লেগে রইল।

হড়বড় করে তিউরিনও ওপরে উঠে এল। শুখভ তখনও বুরুশ ঘষছে। তিউরিন তার মাপের কাঠিটা দেয়ালের কোণে দাঁড় করিয়ে রেখে দিল। শুখভ আর কিল্‌গাস আগেই নিজেদের মাপের কাঠিগুলো দেয়ালের ধারে রেখে দিয়েছিল।

নীচে থেকে পাভ্‌লো চেঁচাল,—বেঁচে কে আছ হে, মট্‌কায়? মশলাগুলো ধরো।

শুখভ ঘামতে শুরু করেছে; এখনও তার ওলনসুতো টেনে লাগানো হয়নি। এবার সে তাড়া লাগাল। ঠিক করল, এখুনি তিন থাকের মত করে সুতো টেনে দেবে—পরে মেলাবার জন্যে একটু একটু করে ফাঁক রেখে যাবে। তাছাড়া ঠিক করল, সেন্‌কার খাটুনি কমাবার জন্যে বাইরের দিকের আরও অংশ সে নিজের ভাগে নেবে; সেই সঙ্গে ভেতরের থাকেরও খানিকটা অংশ গাঁথার ব্যাপারে সেন্‌কাকে সে সাহায্য করবে।

একদম ওপরে ধার বরাবর ওলনসুতো লাগিয়ে শুখভ মুখে কথা বলে আর হাতের ইশারা করে সেন্‌কাকে বুঝিয়ে দিল কোথায় কোথায় চাঙড় বসাতে হবে। কালা হলেও সেন্‌কা সব বুঝল। ঠোঁটটা দাঁত দিয়ে চেপে, আড়চোখে তিউরিনের দেয়ালের দিকে চেয়ে ঘাড়টা নাড়ল। মনে হল ও বলতে চাইছে,—দেব নাকি ওদের ঘোল খাইয়ে? কী বলো? আমরা তাই বলে পিছিয়ে থাকব না। শুখভ হাসল।

ভারা বেয়ে আগেই মশলা আসতে শুরু করেছে। আটজন লোককে এই কাজে

লাগানো হয়েছে। ফোরম্যান ঠিক করেছে মশলার বাক্সগুলো যেন রাজমিস্ত্রিদের কাছে রাখা না হয়—তাহলে মাঝের থেকে কেবল ঠাণ্ডায় জমে যাবে। তার বদলে ঠেলাগুলো কাছাকাছি রাখা হয়েছে যাতে দুজনে সোজাসুজি ঠেলার ভেতর থেকে মশলা তুলে নিয়ে দেওয়ালে চটাস্ চটাস্ করে লাগিয়ে তারপর চাঙড়গুলো বসাতে পারে। ঠেলা বওয়ার লোকেরা ততক্ষণে চাঙড় বইবার কাজ করতে পারে—তাহলে আর তাদের ওপরে দাঁড়িয়ে থেকে ঠাণ্ডায় জমে যেতে হবে না। মশলা ফুরিয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নতুন একদল ঠেলা বওয়ার লোকেরা এসে মশলা পেঁাছে দিয়ে যাবে এবং আগের লোকেরা খালি বাক্সগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যাবে। নীচেকার লোকেরা ঠাণ্ডায় জমে যাওয়া মশলাগুলো চুল্লীতে গলিয়ে নেবার সময় নিজেরাও একটু হাতপাগুলো সেঁকে নিচ্ছে।

একসঙ্গে দুটো করে মশলার বাক্স—একটা কিল্‌গাসের দেয়ালের জন্যে, অন্যটা শুখভের দেয়ালের জন্যে। ঠাণ্ডার মধ্যে মশলাগুলো থেকে ভাপ উঠছে—তবু সেই ধূমন্ত জিনিসটাতে তাপ মোটে নামমাত্র। কর্নিক দিয়ে তোলো আর চটাপট দেয়ালে সাঁটো। হাঁই তুলতে গিয়ে একটু থেমেছো কি সঙ্গে সঙ্গে জমে যাবে। একবার জমে গেলে আর কর্নিক দিয়ে তুলতে পারবে না। তখন কুড়ুলের উল্টোমুখ দিয়ে মেরে খসাতে হবে। চাঙড়টা যদি একটু বেলাইনে বসাও, সঙ্গে সঙ্গে বাঁকা জায়গাটার মশলা জমে যাবে। তখন তোমাকে কুড়ুলের উল্টোমুখ দিয়ে চাঙড়টা খসিয়ে নিয়ে তারপর মশলাগুলো তুলে ফেলতে হবে।

কিন্তু শুখভের কোনো ভুল হল না। চাঙড়গুলো সব অবিকল সমান মাপের নয়। কোনোটার কোণের দিকটা চটাওঠা, কোনোটার ধারের দিকে ভাঙা, কোনোটার বা আছে অন্য কোনো খুঁত। শুখভ একবার দেখেই সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে নিচ্ছিল কোন্‌টাতে কোন্ পাশ করে দেয়ালের ঠিক কোন্‌খানটাতে লাগসই করে বসাবে।

শুখভ তার কর্নিকে ধুঁইয়ে-ওঠা মশলা তুলে ঠিক সেই সেই জায়গায় ফেলছিল। তলার জোড়টা কোন্ জায়গায় আছে, এটা তাকে মনে করে রাখতে হচ্ছিল—কারণ ওপরের চাঙড়টার নীচে ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় জোড়টা থাকা চাই। একটা চাঙড়ের উপযোগী মশলা নিয়ে শুখভ আগাগোড়া সমান করে লেপে দিচ্ছিল। সিমেন্টের চাঙড়ে একটুতেই বড্ড কেটে ছড়ে যায় বলে মশলা লেপে দেবার পর শুখভ খুব সাবধানে একটা করে চাঙড় তুলছিল, যাতে তার হাতমোজাটা ছিঁড়ে না যায়। তারপর আবার কর্নিকটা দিয়ে মশলার ওপর সমান করে বুলিয়ে সিমেন্টের চাঙড়টা তার ওপর ঝপ্ করে বসিয়ে দিচ্ছিল। আর যদি ঠিকভাবে না বসে থাকে তাহলে তখন তখনি এপাশে ওপাশে কর্নিক ঠুকে চাঙড়টা ঠিকঠাক করে নিতে হবে। দেয়ালের বাইরেটা যেন ওলনসুতোর সঙ্গে নিখুঁতভাবে সোজাসুজি হয়, চাঙড়গুলো যেন আড়ে আর লম্বায় ঠিক সমান হয়ে বসে। দেখতে দেখতে কিন্তু মশলা থিতিয়ে যাবে। ঠাণ্ডায় একদম জমে যাবে।

খানিকটা মশলা যদি চাপ খেয়ে পাশের দিকে চলে আসে, তাহলে তৎক্ষণাৎ কর্নিকের ধারটা দিয়ে ঘা মেরে সেই মশলা খসিয়ে দিয়ে দেয়াল টপ্‌কে বাইরে ফেলে দিতে হবে। গরমকাল হলে সেই মশলা পরের চাঙড়টা বসাবার কাজে লেগে যেত। কিন্তু এখন তো সে সব মনেও স্থান দেওয়া যায় না। নীচের জোড়ের মুখটা একটু নজর করে দেখা দরকার। চাঙড়টা হয়ত ভেঙেচুরে গিয়ে থাকতে পারে। সেক্ষেত্রে আবার হয়ত বাঁদিকে একটু পুরু করে তলায় মশলা দিতে হতে পারে। তখন আর চাঙড়টা জায়গায় শুধু বসিয়ে দিলেই চলবে না; ডানদিক থেকে বাঁদিকে আস্তে আস্তে ধরে ধরে বসাতে হবে, নইলে বাড়তি

মশলাটা বাঁদিকের চাঙড়ের চাপে পড়ে বাইরে ঠেলে বেরিয়ে আসবে। সুতোর দিকে চোখ রাখো। সমান হচ্ছে কিনা দেখ। ব্যস্, ঠিক বসেছে। এবার আর একটা।

এইভাবে সমানে চলতে থাকল। দু' থাক্ বসানো হয়ে গেলে পর আগেকার ভুলগুলো শোধরানো যাবে। তারপর আর কোনো ঝামেলা নেই। কিন্তু এখন—একটু ভাল করে নজর দাও।

শুখভ বাইরের থাক্ বরাবর দেয়াল গাঁথতে গাঁথতে সেন্কার দিকে জোর্‌সে এগিয়ে চলল। আর এক কোণে সেন্কা তিউরিনের কাছ থেকে সরে সরে শুখভের দিকে আসতে লাগল।

যারা মশলা বয়ে আনছিল, শুখভ তাদের দিকে তাকিয়ে চোখের ইশারা করল। মশলা চাই, মশলা। জল্‌দি করো। এত তাড়াতাড়ি তার হাত চলছে যে, নাক মুছবারও সে সময় পাচ্ছে না। শুখভ আর সেন্কা এগোতে এগোতে এক জায়গায় এসে পড়ল। দুজনে তখন একই জায়গা থেকে মশলা নিচ্ছে। দেখতে দেখতে মশলা তলায় এসে ঠেকল।

শুখভ দেয়ালের এপাশ থেকে চিৎকার করে বলল,—মশলা কই?

পাভ্‌লো চেঁচিয়ে উত্তর দিল,—যাচ্ছে।

এক ঠেলা মশলা এল। তাতে যেটুকু টলটলে অবস্থায় ছিল, দু'হাতে খানিকক্ষণের মধ্যেই ফুরিয়ে গেল। পাশগুলো জমাট বেঁধে গিয়েছিল। তোমরা এনেছ তোমরাই চেঁছে চেঁছে তুলবে। জমে যেতে দিয়েছ যখন, তোমাদের দুবার করে ওঠাতে নামাতে হবে। যাও যাও। নতুন মশলা আনো।

শুখভ এবং আর যারা রাজমিস্ত্রির কাজ করছিল, তাদের কেউই আর ঠাণ্ডা অনুভব করছিল না। দ্রুত কাজের মধ্যে ডুবে গিয়ে গোড়ায় তারা একটা গরমের ঢেউ অনুভব করল—এমন গরম যাতে ওভারকোটের তলায়, জ্যাকেটের নীচে, শার্ট আর গেঞ্জির তলায় ভিজে ভিজে ঠেকে। কিন্তু এক মুহূর্তের জন্যেও তারা কাজ বন্ধ করল না। ক্রমাগত দেয়াল গেঁথে চলল। একঘণ্টা পরে তারা আবার একটা গরমের ঢেউ অনুভব করল—এমন গরম যাতে ঘাম মরে যায়। পা দুটোতে আর ঠাণ্ডা লাগছে না, সেটাই বড় কথা। আর কিছুতেই কিছু যায় আসে না। এমন কি অল্পস্বল্প কন্‌কনে হাওয়া দিলেও কাজের মন নষ্ট হয় না। একমাত্র ক্লেভশিন পায়ে পা ঘষছিল—বেচারার পায়ের সাইজ ৪৬—ওকে এমন বেয়াড়া একজোড়া ভালেন্‌কি দিয়েছে যে পায়ে বেজায় ছোট হয়।

মাঝে মাঝে তিউরিনের গলা পাওয়া যাচ্ছে,—মশ্-ল্-লা! শুখভও হাঁক দিচ্ছে,—ম-শ্-লা! দলের কেউ যদি খুব গতর দিয়ে কাজ করে, তার আশপাশের লোকদের কাছে সে খানিকটা ফোরম্যান-পদবাচ্য হয়ে দাঁড়ায়। কিল্‌গাস আর তিউরিনের জুটির সঙ্গে শুখভকে পাল্লা দিতে হবে। মায়ের পেটের ভাই হলেও তাকে শুখভ এখন ঠেলা নিয়ে ভারা বেয়ে ওপর নীচে এমন দৌড় করাত যে গা দিয়ে তার কালঘাম ছুটত।

দুপুরের খাওয়ার পর বুইনভ্‌স্কি ফেতিউকভের সঙ্গে সুরকি বইছিল। সিঁড়িটা এমন খাড়া হয়ে উঠেছে যে, বেয়ে ওঠা বেশ শক্ত। গোড়ায় গোড়ায় ক্যাপ্টেন বুইনভ্‌স্কি মাল টানার ব্যাপারে তেমন গা' লাগায় নি। শুখভ মিহি গলায় তাকে একটু জোরে হাত চালাতে বলল।

—ক্যাপ্টেন, আরেকটু জল্‌দি করো। ক্যাপ্টেন, আরো চাঙড় আনো।

একবার করে ওপরে ঠেলা বয়ে আনে আর ক্যাপ্টেনের মধ্যে চটপটে ভাব বেড়ে যায়।

আর ফেতিউকভের বেলায় হয় তার ঠিক উল্টো। প্রত্যেকবারই ফেতিউকভ ক্রমশ বেশী বেশী এলিয়ে পড়ে। ঠেলাটা কাত করে ধরে শালা শুয়োরের বাচ্চা ফেতিউকভ এমনভাবে চলছিল যাতে ভেতরের মশলাগুলো টুপ টাপ মাটিতে পড়ে ভারটা হালকা হয়।

শুখভ তার পিঠে খোঁচা মারল।

বলল,—এই উল্লুক কাঁহাকা! ফেতিউকভ, তুমি না কারখানায় ম্যানেজারি করতে? বাজি রেখে বলতে পারি, মজুরদের তুমি নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতে।

ক্যাপ্টেন বুইনভ্‌স্কি চেঁচিয়ে ফোরম্যানের কাছে দরবার জানাল,—আমাকে একজন কাজের মানুষ দাও, তিউরিন। আমি ঐ গুখেকোর বেটার সঙ্গে আর মশলা বইছি না।

তিউরিন লোকজনদের সরিয়ে নড়িয়ে নতুনভাবে কাজ ভাগ করে দিল। ফেতিউকভকে নীচে পাঠিয়ে দেওয়া হল; ওকে সিমেন্টের চাঙড়গুলো ভারার ওপর তুলে দিতে হবে। ক'টা করে চাঙড় তুলছে তার আবার আলাদা আলাদা হিসেব হবে। তিউরিন আলিওশাকে ক্যাপ্টেনের সঙ্গে যুতে দিল। আলিওশা শান্ত নিরীহ মানুষ। যে কেউ ওকে হুকুম করুক, ও সেই হুকুম তামিল করবে।

—দমকলে খাড়া হয়ে যাও সব, ঢেঁকির দল! চেয়ে দেখ, যারা দেয়াল গাঁথছে—কি রকম সাঁই সাঁই করে তাদের হাত চলছে।

আলিওশা বিনীতভাবে হাসল,—হাত চালিয়ে করতে হলে হাত চালিয়েই করা হবে। যেমন তুমি বলবে তেমনি হবে।

বলেই সে তরতর করে নীচে নেমে গেল।

দলে কেউ ভালমানুষ থাকলে সে হয় রত্ন।

নীচে থেকে কে একজন তিউরিনকে ডাকল। সিমেন্টের চাঙড় নিয়ে আরেকটা ট্রাক এসে হাজির। ছ'টি মাস কারো টিকি দেখা যায় নি, এখন সব আসছে বানের জলের মত। ওরা চাঙড় বয়ে আনলে তবেই কাজের মরশুম পড়ে। পয়লা দিন। তারপর আবার আঠারো মাসে বছর। তখন আর হাত চালিয়ে কিছু করবার থাকবে না।

তিউরিন বাপান্ত করছে। কপিকলটা না চলায় ও খেপেছে। হাতে সময় নেই, নইলে কী হয়েছে একবার খোঁজ নিত। দেয়ালটা এখন ও সমান করতে ব্যস্ত। ঠেলাওয়ালারা এসে ওকে জানাল যে, কপিকলের মোটরটা ঠিক করবার জন্যে একজন সারাবার-মিস্ত্রি এসেছে; তার সঙ্গে আছে ইলেকট্রিক মেরামতের কাজ দেখার জন্যে বন্দীশালার বাইরের একজন বেসামরিক তদারককারী লোক। মিস্ত্রি এটা ওটা নেড়ে চেড়ে বেড়াচ্ছে আর তদারককারী দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছে।

শাস্ত্রে আছে : একজন খাটবে, একজন দেখবে।

কপিকলটা এখন সারিয়ে ফেললে বাঁচা যায়। তাহলে চাঙড় আর মশলা দুইই ওপরে তোলা যাবে।

শুখভ তৃতীয় থাক্ দেয়াল গাঁথছে আর কিল্‌গাস তৃতীয় থাকে সবে হাত দিয়েছে, এমন সময় সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এল আরেক ওপরওয়ালা, পাজীর পা-ঝাড়া—ছোট তদারককারী দের। দেরের বাড়ি নাকি মস্কো শহরে; আগে কোন্ একটা মন্ত্রণালয়ে কাজ করত।

শুখভ তখন ছিল কিল্‌গাসের কাছাকাছি। শুখভ ইশারা করে কিল্‌গাসকে দেরের উপস্থিতির কথা জানিয়ে দিল।

কিল্‌গাস কোনো রকম কেয়ার না করে বলল,—ধুত্তোর! নিকুচি করেছে তোমার ওপরওয়ালার! সিঁড়ি থেকে পড়ে গেলে আমাকে ডেকো।

এইবার দের ব্যাটা এসে রাজমিস্ত্রিদের পেছনে দাঁড়িয়ে ঘাড়ের ওপর থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখবে। এই লোকগুলো শুখভের দুচক্ষের বিষ। দের এমন ভাব দেখায়—শালা যেন ইঞ্জিনিয়ার! একবার শুখভকে ও শেখাতে এসেছিল দেয়াল কী করে গাঁথতে হয়—শুখভ তো হেসেই বাঁচে না। আগে নিজে হাতে বাড়ি বানাও, তবে তোমাকে কারিগর বলতে পারি—শুখভের এই হল কথা।

ওদের দেশে তেম্‌গেনিয়েভোতে কোনো কোঠাবাড়ি ছিল না—না ইঁটের, না কংক্রিটের। সবই কাঠের গুঁড়ির ঘরবাড়ি। ইস্কুলবাড়িও তাই। সংরক্ষিত বন থেকে চল্লিশ ফুট লম্বা লম্বা গাছের গুঁড়ি কেটে আনা হত। ক্যাম্পে এসে শুখভকে হতে হয়েছে রাজমিস্ত্রি। চাইল যখন, কী করা যায়—রাজমিস্ত্রিই সে হল। হাতের কাজ দুটো জানা থাকলে আরও দশটা কাজ সহজেই তার রপ্ত হতে পারে।

দের পড়ে নি। তবে একবার শুধু একটু হোঁচট খেয়েছিল। প্রায় লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি বেয়ে সে ওপরে উঠে এল। এসেই চেঁচিয়ে উঠল,—তিউরিন! তিউরিন! তার চোখ দুটো যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

বেল্‌চা হাতে পাভ্‌লোও তার পিছু পিছু এসে হাজির।

দের যে ওভারকোট পরেছিল সেটা বন্দীশালাতেই পাওয়া। কিন্তু ঝকমকে নতুন। মাথায় চামড়ার টুপিটা খুব শৌখীন হলেও অন্য সকলের মতই তাতে দাগানো রয়েছে নম্বর—ব-৭৩১।

—কী মনে করে? তিউরিন হাতে কর্নিক নিয়ে ওর সামনাসামনি এল; টুপিটা বেঁকে গিয়ে ওর একটা চোখ ঢাকা পড়েছে।

একটা অসাধারণ কিছু ঘটবে বলে মনে হচ্ছে। মশলা জুড়িয়ে যাওয়া সত্ত্বেও শুখভ এ ব্যাপারে ঠিক নির্লিপ্ত থাকতে পারল না। দেয়াল গাঁথতে লাগল বটে, কিন্তু কান দুটো খাড়া করে রাখল।

—বড্ড বাড় বেড়েছে দেখছি? চিৎকার করে বলতে গিয়ে দের থুথু ছিটোতে লাগল। —শুধু জেলে বন্ধ হওয়ার ব্যাপার নয়। এ একেবারে ফৌজদারি-সোপর্দ হওয়ার ব্যাপার। তিউরিন, এর জন্যে তোমাকে তৃতীয় দফায় মেয়াদ খাটতে হবে।

একমাত্র তখনই শুখভ ব্যাপারটা ধরতে পারল। শুখভ কিল্‌গাসের দিকে তাকাল। কিল্‌গাসও বুঝেছে। চাল ছাওয়ার কাগজ। জান্‌লায় টাঙানো হয়েছে ব্যাটারা দেখে ফেলেছে।

নিজের জন্যে শুখভের মেটেই ভাবনা হয় নি। কারণ, তাকে ধরিয়ে দেবে ফোরম্যান তেমন লোকই নয়। তার ভয় হচ্ছিল ফোরম্যানের কথা ভেবে। ফোরম্যান হল আমাদের কাছে মা-বাপ। ওদের কাছে দাবার বড়ে মাত্র। ওরা হেসে খেলে ফোরম্যানের সাজার সঙ্গে আরও কিছুদিনের ঘানি টানার মেয়াদ জুড়ে দিতে পারে।

তিউরিনের মুখটা কি রকম খিঁচিয়ে উঠেছে। হাতের কর্নিকটা কিভাবে আছাড় দিয়ে নীচে ফেলে দিল। দেরের দিকে এক পা এগিয়ে গেল। দের পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল—পাভ্‌লো বেল্‌চাটা হাতে করে উঁচিয়ে ধরেছে।

পাভ্‌লো তার বেল্‌চাটা ওপরে টেনে এনেছে এমনি এমনি নয়।

সেন্‌কা কানে কালা হলেও ব্যাপারটা বুঝতে পেরে কোমরে হাত দিয়ে এগিয়ে এসেছে। সেন্‌কাকে দেখতে বেশ ষণ্ডামার্কা।

দের চোখ পিট্‌ পিট্‌ করে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে ইঁদুরের গর্ত খুঁজতে লাগল।

তিউরিন ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে খুব নীচু গলা করে বলল,—তোরা সাজা দিবি, সে দিন শেষ হয়ে গেছে, উল্লুক! আর যদি একটাও ট্যাঁ ফোঁ করিস, তাহলে জান সাবাড় করে দেব। ভুলে যাস নে। কথাগুলো এত স্পষ্ট যে, সকলেই শুনতে পেল।

তিউরিন রাগে কাঁপছিল। নিজেকে কিছুতেই সে ধরে রাখতে পারছিল না।

মুখটা তীক্ষ্ম করে পাভ্‌লো জ্বলন্ত দৃষ্টিতে দেরের দিকে তাকাল। দুচোখে তার যেন সত্যিই আগুন জ্বলছে।

—হয়েছে, বাপু, হয়েছে—থাক। দেরের মুখ শুকিয়ে আমসি হয়ে গেছে। সিঁড়িটার কাছ থেকে সে বেশ খানিকটা দূরে সরে গেল।

তিউরিন আর একটাও কথা বলল না। মাথার টুপিটা ঠিক করে নিয়ে নীচু হয়ে কর্নিকটা তুলে সে আবার তার দেয়াল গাঁথার কাজে ফিরে গেল।

হাতে বেল্‌চা নিয়ে পাভ্‌লো নীচে নেমে গেল আস্তে আস্তে।

আ...স্তে! আ...স্তে!

দের এত ভয় পেয়ে গিয়েছিল যে, না পারছিল থাকতে—না পারছিল যেতে। কিল্‌-গাসের পেছনে ঘাপ্‌টি মেরে থেকে দের সেখানে দাঁড়িয়ে রইল।

কিল্‌গাস সমানে দেয়াল গেঁথে যেতে লাগল। ডাক্তারখানায় ওষুধপত্তর যেভাবে মাপে, ঠিক সেইভাবে ধরে ধরে। কিল্‌গাসের অবস্থাটা দাঁড়াল ঠিক একজন কম্পাউন্ডারের মত—যে কখনই ঘোড়ায় জিন্‌ দিয়ে কাজ করে না। দেরের দিকে পেছন ফিরে কিল্‌গাস দাঁড়িয়ে রইল—দেরকে যেন সে দেখতেই পায় নি।

দের তখন থোঁতা মুখ ভোঁতা করে তিউরিনের কাছে এগিয়ে গেল।

—তদারককারী অফিসারের কাছে আমি এখন কী বলি, বলো তো?

তিউরিন যেমন চাঙড় বসাচ্ছিল তেমনি চাঙড় বসিয়ে যেতে লাগল।

—তুমি ব'লো : ওটা ঐভাবেই ছিল, আমরা এসে দেখি ওটা ঐভাবেই রয়েছে।

দের আরও খানিকক্ষণ থাকল। ও দেখল, ওকে কেউ সাবাড় করে ফেলছে না। হাত দুটো পকেটে পুরে দের তখন দু চার পা চলে ফিরে বেড়াল।

তারপর ঠোঁট চেপে বলল,—ওহে, শ-৮৫৪! অত পাতলা করে মশলা লাগাচ্ছ কেন?

একজনকে তার দরকার হল গায়ের ঝাল ঝাড়বার জন্যে। গাঁথনির জোড় কিংবা সমান করার দিক দিয়ে শুখভের কাজের কোনো খুঁত পেল না সে। কাজেই মশলার ধুয়োটা তুলল।

শুখভ একটু হেসে ঠেস দিয়ে বলল,—আজ্ঞে, মশাই! কিছু যদি মনে না করেন তবে বলি : এখন যদি মোটা করে মশলা লাগাই, শীতের পর সারা বিজলী স্টেশনই ঝাঁঝরা হয়ে যাবে।

দের চোখ কুঁচকে স্বভাবসুলভভাবে গাল ফুলিয়ে বলল,—তুমি কাজ করো রাজ-মিস্ত্রির—ওপরওয়ালার কথা শুনে তোমাকে চলতে হবে।

এটা ঠিক যে, কোথাও কোথাও মশলা আরেকটু মোটা করে দেওয়া উচিত ছিল—একটু পাতলা হয়ে গেছে। তবে এখানকার অবস্থাটা যদি ভদ্রগোছের হত, তাহলে না হয়

কথা ছিল। যা শীত, বাপরে বাপ! কথা বলে দিলেই হল না, লোকজনদের ওপর একটু দরদ থাকা উচিত। এখানে কতটা কাজ হল, সেটাই বড় কথা। বিচার হবে শুধু ফল দিয়ে। অবশ্য যে নিজে বোঝে না, তাকে এসব কথা বলেই বা কী লাভ?

দের চুপচাপ সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেল।

তিউরিন নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে ওকে যেতে দেখে চেঁচিয়ে বলল,—কপিকল যেন সারাবার ব্যবস্থা হয়। কী পেয়েছে আমাদের? ধোপার গাধা? সিমেন্টের চাঙড়গুলো আমরা ঘাড়ে করে দোতলায় তুলব?

সিঁড়ির ওপর থেকে দের কাঁচুমাচু হয়ে বলল,—মাল বওয়ার জন্যে তোমরা অবশ্যই পয়সা পাবে।

—কী, ঠেলাগাড়ির রেটে? যাও না, চাঁদ—ভারা বেয়ে ঠেলাগাড়ি নিয়ে গড় গড় করে ওপরে তোলো না দেখি! দিতে হবে হাতঠেলার রেটে।

—আমাকে যদি বলো, আমি বলব: ঐ রেটেই দেওয়া উচিত। কিন্তু খাতাঞ্চি আপিসে হাত-ঠেলার রেটে দিতে রাজী হবে না।

—খাতাঞ্চি আপিস দেখাচ্ছ! এদিকে চারজন রাজমিস্ত্রিকে যোগাড় দিতে আমার গোটা দলটাকে হিমসিম খেতে হচ্ছে। ওভাবে আমাদের আর কতই বা রোজগার হবে?

তিউরিন গাঁক গাঁক করে চেঁচালেও একদণ্ডও সে তার হাত থামায় নি।

নীচের দলটাকে তিউরিন হেঁকে বলল,—মশলা!

শুখভও সেইসঙ্গে চেঁচাল,—মশলা! তৃতীয় থাক্‌টা একদম সমান হয়ে গেলে পর এবার তারা চতুর্থ থাকে হাত দেবার জন্যে তৈরি হল। ওলন সুতোটা এক থাক্‌ উঁচু করে বেঁধে নিতে হবে—যাক ঠিক আছে, একটা থাক্‌ বিনা সুতোতেই সে চালিয়ে নিতে পারবে।

দের নিজে থেকেই চলে গেল। মাঠের ভেতর দিয়ে যাবার সময় কেমন যেন কেঁচোর মত ওকে দেখাচ্ছিল। দের চলেছিল অফিসঘরের দিকে একটু গরম হয়ে নিতে। ওর তেমন যুত লাগছিল না বোধহয়। তবে তিউরিনের মত বাঘা লোকের পেছনে লাগতে যাবার আগে দ্বিতীয়বার ওর ভাবা উচিত ছিল। তিউরিনের মত ফোরম্যানদের সঙ্গে ভাব রাখতে পারলে ওর আর কোনোই ভাবনা থাকত না। এমনিতে ওকে হাড়ভাঙা খাট্‌নি খাটতে হয় না, মোটা রকমের রুটির বরাদ্দ জোটে; থাকবার জন্যে ওর আলাদা খোপ আছে। আর কী চাই? ও যদি ঐভাবে ঝামেলা এড়াতে পারে, তাহলে সেটা হবে ওর তুখোড় বুদ্ধির পরিচয়।

জনকয়েক কয়েদী ওপরে এসে খবর দিল—ইলেকট্রিক মেরামতের তদারককারী আর সারাই-মিস্ত্রি দুজনেই চলে গেছে। কপিকল সরানো যায় নি।

অতএব গাধার খাটুনি খাটো। উপায় কী।

শুখভ এ যাবৎ কাজ করতে গিয়ে যা দেখে এসেছে, তাতে কলকব্জাগুলো হয় আপনিই ভেঙে পড়েছে—নয়ত কয়েদীরা ইচ্ছে করে সেগুলো ভেঙেছে। শুখভ একবার একটা লগ-কন্‌ভেয়ার ভাঙতে দেখেছিল—চেনের তলায় একদল কয়েদী একটা প্রকাণ্ড লাঠি ঢুকিয়ে জোরে চাড় দিতে দিতে শেষ পর্যন্ত সেটাকে ভেঙে ফেলে। ওরা চেয়েছিল দুদণ্ড জিরিয়ে নিতে। ক্রমাগত একটার পর একটা কাঠের গুঁড়ি এনে ওদের জমা করতে হচ্ছিল। ওরা আর পেরে উঠছিল না।

তিউরিন বিরক্ত হয়ে হাঁক ছাড়ছিল,—কই, সিমেন্টের চাঙড় কী হল? যারা মশলা বয়ে আনছিল আর যারা সিমেন্টের চাঙড় টেনে তুলছিল, সবাইকে তিউরিন গালাগালি দিয়ে

চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছেড়ে দিল।

নীচে থেকে একজন গলা উঁচু করে বলল,—পাভ্‌লো জিজ্ঞেস করছে মশলা আর বানানো হবে কিনা।

—হ্যাঁ, হবে।

—আধ বাক্স কিন্তু তৈরি আছে!

—তাহলে আরও এক বাক্স করো।

ঝড়ের বেগে ওরা কাজ করে চলেছে। এইবার ওরা পঞ্চম থাক্‌ গাঁথছে। গোড়ায় যখন দেয়াল গাঁথতে শুরু করে, তখন ওদের হুমড়ি খেয়ে পড়ে কাজ করতে হয়েছিল; আর এখন দেখ, বুক অবধি দেয়াল উঠেছে। আরে, ঠেলে এগিয়ে গেলেই তো হয়—জান্‌লা দরজা ফোটাবার জায়গা রাখার ভাবনা নেই, ভারি তো দুটো ফাঁকা দেয়াল জোড়া দেবার মামলা, সিমেন্টের চাঙড় আছে এন্তার। ওলন-সুতোটা আরও উঁচু করে বাঁধা উচিত ছিল; কিন্তু তার আর এখন সময় নেই।

গপ্‌চিক এসে জানাল,—বিরাশী নম্বর ব্রিগেড যন্তরপাতি জমা দিতে চলে গেছে।

তিউরিন শুধু তার দিকে একবার চোখ পাকিয়ে তাকাল।

—নিজের চরকায় তেল দাও গে যাও। আরও চাঙড় আনো।

শুখভ বাইরে তাকাল। সত্যিই, সূর্য ডুবছে। লাল আভার মধ্যে অস্তোন্মুখ সূর্যের কেমন যেন একটা পাংশু ভাব। ওরা সত্যিই তেড়ে ফুঁড়ে এগিয়ে গেছে—এর বেশী আশাই করা যায় না। ওরা এর মধ্যে পঞ্চম থাক্‌ শুরু করে ফেলেছে। পঞ্চম থাক্‌টা শেষ করে তবে ছাড়বে। সেইসঙ্গে আগাগোড়া সমান করে দেবে।

যারা মশলা বইছিল, তারা জান-পেরেশান ঘোড়ার মত বেদম হাঁপাচ্ছিল। বুইনভ্‌স্কির মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেছে ক্লান্তিতে। ক্যাপ্টেন মশাই আর যাই হোক ছোকরা তো নয়। বয়স চল্লিশ। পুরো চল্লিশ না হলেও কাছাকাছি।

একটু একটু করে ঠান্ডা জেঁকে বসছে। হাত চললেও ফিনফিনে হাতমোজায় আঙুলগুলো কন্‌ কন্‌ করছে, বাঁ পায়ের ভালেঙ্কির ভেতরে ঠান্ডা কোন্‌ ফাঁকে যেন ঢুকে পড়েছে। শুখভ থপ্‌ থপ্‌ করে মাটিতে পা ফেলছে।

আর তাদের নীচু হয়ে ঝুঁকে পড়ে কাজ করতে হচ্ছে না—কিন্তু তাহলেও কোমর ধরে যাওয়ায় প্রত্যেকবার নীচু হয়ে চাঙড় তুলতে গিয়ে এবং মশলা নিতে গিয়ে ওদের বেশ কষ্ট পেতে হচ্ছে।

যারা চাঙড় বয়ে আনছিল, শুখভ পই পই করে তাদের বলে দিচ্ছিল,—বাপসকল, চাঙড়গুলো এনে রেখো দেয়ালের কাছ বরাবর। একেবারে দেয়াল অবধি।

ক্যাপ্টেনের ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার ক্ষমতায় কুলোচ্ছিল না। খাটতে খাটতে জিভ বেরিয়ে যাওয়ার এমন অভিজ্ঞতা এর আগে কখনও তার হয় নি।

কিন্তু আলিওশা বলল,—ঠিক আছে, ইভান দেনিসিচ। কোথায় রাখতে হবে আমাকে শুধু দেখিয়ে দাও।

আলিওশাকে যাই বলা যাক, সে হাসিমুখে করবে। দুনিয়ার সব মানুষই যদি অমন হত, শুখভও অমনি হত। কেউ যদি তোমার কাছ থেকে সাহায্য চায়, কেন তুমি সাহায্য করবে না? এমন ধারাই তো হওয়া উচিত।

সমস্ত সীমাসরহদ্দ জুড়ে ঢং ঢং করে পরিষ্কার ঘণ্টা বাজার আওয়াজ বিজলী স্টেশন

থেকেও শোনা গেল।

কাজ চুকিয়ে এবার ফেরবার পালা। ইস্, এখনও ওদের টাটকা আনা হাতের মশলা-গুলো হাতেই রয়ে গেল।

ওঃ, কী চেষ্টাটাই না তারা করেছিল।

ফোরম্যান হাঁকতে লাগল,—মশলা আরো। মশলা!

নীচে ওরা সবে এক বাক্স নতুন মশলা বানিয়েছে। এখন আর দেয়াল গেঁথে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। মশলার বাক্সটা যদি খালি করে ফেলা না যায়, তাহলে কাল এমনিতেই লোকজনেরা এসে হয়ত জ্বালানী করবার জন্যে বাক্সটা চেলা করে ফেলবে। মশলাগুলো জমে এমন শক্ত পাথর হয়ে যাবে যে, তখন আর কুড়ুল দিয়ে ঘা মেরেও তাকে কোনোরকম কায়দা করা যাবে না।

শুখভ চেঁচিয়ে ডাকল সবাইকে,—চলে এসো ভাই, কাজে ঢিল দিও না।

শুখভ চটে গেল। এই রকম পেটের-ছেলে-পড়ে-যাওয়া হা-হা-করা ভাব দেখলে তার গা জ্বালা করে। কিন্তু সেও তালে তাল দিয়ে হাত চালিয়ে যাচ্ছে। তা যদি বলো, এ ছাড়া করবেই বা কী?

পাভ্‌লো কোমরে কর্নিক গুঁজে একটা ঠেলাগাড়ি টেনে নিয়ে এক দৌড়ে মই বেয়ে ওপরে উঠল। ওপরে উঠেই চাঙড় বসাতে লেগে গেল। পাঁচ পাঁচটা কর্নিক বাঁই বাঁই করে ছুটছে।

এবার দুই দেয়ালের জোড়ের কাজটা সেরে ফেলো। শুখভ একবার তাকিয়ে দেখে নিল কোন্ চাঙড়টা ওখানে বসবে। তারপর আলিওশার হাতে হাতুড়িটা এগিয়ে দিয়ে বলল,—একটু পাশগুলো মেরে দাও তো হে!

তাড়াতাড়ির কাজ কখনও ভাল হয় না। এখন যখন সবাই তাড়াহুড়ো করছে, শুখভ তখন সময় নিয়ে আস্তে আস্তে দেয়ালটা খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। সেন্‌কাকে বাঁদিকে সরিয়ে দিয়ে শুখভ নিজে ডানদিকে দুই দেয়ালের আদত জোড়টার দিকে সরে গেল। কোণটা এখন যদি জবরজং হয়, তাহলে সব মাটি। কাল তাহলে পুরো আধবেলা যাবে ওটা শোধরাতে।

—রসো! বলে পাভলোকে একটা চাঙড়ের কাছ থেকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে শুখভ সেটা নিজে হাতে বসিয়ে দিল। ওদিকে সেন্‌কার কাণ্ডটা দেখ! লাইন এঁকে বেঁকে গেছে। শুখভ ছুটে গিয়ে দুটো সিমেন্টের চাঙড় বসিয়ে সেন্‌কার ভুল শুধ্‌রে দিল।

বুইনভ্‌স্কি ভাল ঘোড়ার মত আরেক ঠেলা মশলা নিয়ে এল। এনে বলল,—আরও দু ঠেলা মাল আসছে।

বুইনভ্‌স্কির পা টলছিল, কিন্তু তবু সে মাল বওয়া ছাড়ে নি। এককালে ঐ ক্যাপ্টেনের মত একটা ভাল ঘোড়া ছিল শুখভের। তাকে সে খুব যত্নও করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ঘোড়াটাকে কেটে ফেলতে হয়েছিল! তার ছালটা ছাড়িয়ে শুখভ রেখে দিয়েছিল।

দিগন্তে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গপ্‌চিক এসে ওদের চোখে আঙুল দিয়ে আর দেখাচ্ছে না বটে—কিন্তু ওরা এখন নিজেরাই দেখতে পাচ্ছে: সব ব্রিগেডের লোকজনেরাই যন্তর-পাতি জমা দিয়ে এসে এখন গুমটিঘরের দিকে পিল্ পিল্ করে চলেছে। কেউ অত বোকা নয় যে ঘণ্টা বাজবার পর অমনি বাইরে বেরোবে। বাইরে দাঁড়াতে হলে তো সব ঠাণ্ডায় জমে যাবে। সবাই যে যার মাথা গুঁজবার জায়গায় বসে থাকবে। তারপর একটা সময়

আসবে যখন ফোরম্যানেরা সবাই এ বিষয়ে একমত হবে যে, হ্যাঁ—এইবার বেরিয়ে পড়া যায়—তখন হুড়মুড় করে সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বে। ফোরম্যানেরা যদি সবাই একমত না হয়, তাহলে কয়েদীর দল যে যার জায়গায় কে কতক্ষণ বসে থাকতে পারে তাই নিয়ে পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেবে—যদি রাত দুপুর অবধি বসে থাকতে হয় তাও ভি আচ্ছা। লোকগুলো এমনি ইতর, এমনি ওদের শুয়োরের গোঁ।

অবশেষে তিউরিনের হুঁশ হল—না, এতটা দেরি করা তার উচিত হয় নি। যে ঘরে যন্তর জমা নেয়, সে ঘরের মুন্সী এতক্ষণে হয়ত তিউরিনকে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিচ্ছে।

তিউরিন গলা বার করে বলল,—ওহে, ওইটুকুর জন্যে আর মায়া করে লাভ নেই। যারা বওয়াবওয়ি করছে, তারা চলে যাও নীচেয়। মশলা মেশানোর বড় বাক্সটা চেঁছে যা পাও উঠোনের গর্তটার মধ্যে ঢেলে ফেলো। ওপরে বরফ চাপা দিয়ে দিও, তাহলে আর কেউ দেখতে পাবে না। আর শোনো, পাভ্লো! সঙ্গে দুজন লোক নিয়ে যন্তরপাতিগুলো যোগাড় করে তুমি মালখানায় জমা দিয়ে এসো। হাতের এই মশলাটা শেষ হয়ে গেলেই গপ্‌চিককে দিয়ে এই কর্নিক তিনটে আমি পাঠিয়ে দেব।

হুট্‌পাট করে সবাই ছুটল। শুখভের হাতুড়ি আর ওলন-সুতো তারা নিয়ে গেল। যারা মশলা বইছিল এবং ঠেলাগাড়ি টানছিল, তারা সবাই ছুটে মেশিনঘরে চলে গেল—কেননা তাদের তো আর করবার কিছু নেই। শুধু তিনজন রাজমিস্ত্রি থেকে গেল নিজেদের জায়গায়—কিল্‌গাস, ক্লেভ্‌শিন আর শুখভ। তিউরিন দেখে বেড়াতে লাগল কতটা কাজ হয়েছে। কাজ দেখে খুব খুশী হল সে।

—কাজ দেখছি মন্দ হয় নি আধ বেলায়। তাও তো শালার কপিকল ছিল না, কিছুই ছিল না।

শুখভ দেখতে পেল কিল্‌গাসের মশলা প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। কর্নিকগুলো দিতে দেরি হবার জন্যে যন্তরপাতির ঘরে তিউরিনকে গাল দেবে—এই ভেবে শুখভের বিশ্রী লাগছিল।

শুখভ বলল,—ওহে, শোনো—তোমাদের কর্নিক দুটো গপ্‌চিককে দিয়ে পাঠিয়ে দাও। আমার কর্নিকটা হিসেবের বাইরে; ওটা জমা করতে হবে না। বাকি কাজটা আমি একাই সেরে ফেলব।

ফোরম্যান হো হো করে হাসল।—এখান থেকে যখন তুমি খালাস পাবে, কোন্ প্রাণে তোমাকে আমরা বিদায় দেব? সারা জেলখানা যে কেঁদে ভাসাবে!

শুখভও হো হো করে হেসে উঠে দেয়াল গাঁথতে লাগল।

কিল্‌গাস কর্নিকগুলো নিয়ে চলে গেল। সেন্‌কা সিমেন্টের চাঙড়গুলো শুখভের দিকে ঠেলে কিল্‌গাসের বাকি মশলাটুকু এদিককার ঠেলার ভেতর ঢেলে দিল।

পাভ্লোকে ধরবার জন্যে যন্তরপাতির ঘর অবধি গপ্‌চিক গোটা রাস্তা ছুটতে ছুটতে গেল। ১০৪নং ব্রিগেড মাঠ পেরিয়ে গেটের দিকে চলল। সঙ্গে তিউরিন নেই। ফোরম্যান থাকলে জোর হয়। কিন্তু কন্‌ভয়-গার্ডের ক্ষমতা আরও বেশী। যারা দেরিতে আসে, ওরা তাদের নাম টুকে নেয়—তারপর তাদের সেল-হাজতে সাজা খাটায়।

বেরোবার মুখে দু দফায় গুণ্‌তি হয়। গেট যখন বন্ধ থাকে, তখন একবার এলাকার মধ্যে গুণ্‌তি হয়; তারপর দ্বিতীয় দফায় গুণ্‌তি হয় খোলা গেট দিয়ে বেরোবার সময়।

যদি ওরা মনে করে গুণতে গিয়ে কোনো রকম ভুল হয়েছে, তাহলে গেটের বাইরে গিয়ে আরেক দফা গোণা হয়।

তিউরিন আর স্বর সইতে না পেরে বলল,—নিকুচি করেছে মশলার। দাও দেয়াল টপ্‌কে ফেলে।

—ফোরম্যান, তুমি আর দাঁড়িয়ে থেকো না, চলে যাও। গেটে তোমাকে দরকার হবে।

সাধারণত শুখভ ফোরম্যানকে সমীহ করে আন্দ্রেই প্রোকোফিয়েভিচ বলেই ডাকত। কিন্তু এখন কাজ করার গুণে সে ফোরম্যানের সঙ্গে এক পর্যায়ে উঠে এসেছে। শুখভ অবশ্য মনে মনে স্পষ্ট করে একথা বলে নি যে, 'দেখ হে, আমি তোমার সমান'—তাহলেও তার অমনি মনে হয়েছে। তিউরিন যখন সিঁড়ি দিয়ে নামছে, শুখভ একটু ইয়ার্কি মেরে বলল,—কাজের দিনটাকে ছেঁটে ওরা এত ছোট করে দেয় কেন? হাত যখন সবে খুলতে আরম্ভ করে, তখনই দেখি দিন কাবার।

কালা লোকটার সঙ্গে শুখভ একা পড়ে গেল। ওর সঙ্গে বেশী কথা বলা যায় না। আর তাছাড়া, এমন কিছুই নেই যা ওকে শোনানো যায়। ওদের সকলের চেয়েই ও বেশী সেয়ানা। সব কথাই ও বুঝে নেয়—মুখ ফুটে ওকে বলবার দরকার হয় না।

চটাপট মশলা পড়ছে। ফটাফট চাঙড় বসছে। ঠেসেঠুসে দাও। দেখ ঠিক সমান হল কিনা। ঠিক হ্যায়। আচ্ছা, এবার মশলা। তারপর চাঙড়। মশলা। চাঙড়।

তিউরিন বলে গিয়েছিল মশলার জন্যে মায়া করে লাভ নেই—বলেছিল দেয়াল টপ্‌কে ফেলে দিতে। ওরা সবাই দৌড় মেরেছে শুখভকে একা রেখে। কিন্তু আট বছর ক্যাম্পে কাটিয়েও শুখভ যে গর্দভ সেই গর্দভই রয়ে গেছে। চোখের ওপর কোনো জিনিস, কোনো কাজ এতটুকু অপচ নষ্ট হয়ে যেতে দেখলে তার আর সহ্য হয় না।

মশলা। চাঙড়। মশলা। চাঙড়।

সেন্‌কা চেঁচিয়ে উঠল,—ব্যস, কাজ ফতে। মার কেল্লা! চলো, এবার ছুট দিই।

দুজনে ঠেলাগাড়িটা বাগিয়ে ধরল। তারপর সিঁড়ি বেয়ে সটান নীচে।

কিন্তু কেমন কাজ হয়েছে দেখবার জন্যে শুখভও আরেকবার দৌড়ে চলে গেল। পাহারাওয়ালা সেপাইরা ওর পেছনে যদি কুকুর লেলিয়ে দিত, তাহলেও ওকে নিরস্ত করতে পারত না। মন্দ হয় নি তো! এবার একছুটে দেয়ালের কাছে গিয়ে ডান থেকে বাঁয়ে এক-দফা তাকাল। ওর চোখ অনেকটা রাজমিস্ত্রিদের লেভেল ঠিক করার যন্ত্রের মত। সব একদম সিধে। এখনও ওর হাত খুব পাকা।

শুখভ মই বেয়ে তর তর করে নেমে এল।

সেন্‌কা মেশিনঘর থেকে বেরিয়ে ঢাল বেয়ে ছুটছিল।

পেছন ফিরে সেন্‌কা হাঁক দিল,—পা চালিয়ে এসো ভাই, পা চালিয়ে।

শুখভ তাকে হাতের ইশারা করে বলল,- তুমি এগোও। আমি এই এলাম বলে বলে শুখভ মেশিনঘরে ঢুকল। কর্নিকটা তো আর তাই বলে যেখানে সেখানে ফেলে রেখে যাওয়া যায় না। কাল সে নাও কাজে আসতে পারে। শেষ পর্যন্ত 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন' নগরে ওদের যে ঠেলে পাঠাবে না, তাই বা কে বলতে পারে? তাহলে তো ছ'মাসের ধাক্কা। তার আগে আর এ মুখো হবে না। সুতরাং কর্নিকটা খুইয়ে কী লাভ? একবার যখন জিনিসটা সে হাত করেছে, তখন হাতে রাখাই ভাল।

মেশিনরুমের সব চুল্লীই নেভানো। ভেতরে ঘুট ঘুট করছে অন্ধকার। শুখভের ভয়

করতে লাগল। ভয় অন্ধকারের জন্যে নয়—ভয় লাগছে একা পড়ে যাওয়ার জন্যে; ভয়—গুম্‌টিঘরে গণ্‌তির সময় একা শুখভই বাদ পড়ে যাবে ব'লে; ভয়—কন্‌ভয়-গার্ডরা শুখভকে ধরে ধোলাই দেবে ব'লে।

সে যাই হোক, অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে শুখভ ঘরের কোণে একটা বড় পাথর দেখতে পেল। পাথরটা সরিয়ে তার নীচে কর্নিকটা লুকিয়ে রেখে পাথরটা আবার টেনে গর্তের মুখ বন্ধ করে দিল। এখন সব ঠিকঠাক!

এইবার ছুটে গিয়ে সেন্‌কাকে ধরে ফেলতে হবে। কিন্তু সেন্‌কা সামান্য একটু এগিয়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে শুখভের জন্যে অপেক্ষা করছিল। সেন্‌কা কখনও কাউকে একা মুশকিলে ফেলে পালায় না। যদি বিপদ দেখা দেয়, দুজনে একসঙ্গে মিলে তার মহড়া নেবে।

দুজনে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ছুটতে লাগল। একজন ঢ্যাঙা, একজন মাথায় খাটো। সেন্‌কার তুলনায় শুখভ নেহাৎই বেঁটে।

ফ্যা-ফ্যা-করে-বেড়ানো কিছু লোক আছে, যারা নিজেরা সাধ করে স্টেডিয়ামের মাঠে দৌড়োদৌড়ি করে। শুখভের একবার দেখতে ইচ্ছে করে সারাদিন খাটুনির পর, পিঠ যখন এলিয়ে পড়ে, তখন ভিজে হাতমোজা আর তালি-মারা জুতো পরে ছুটুক তো দেখি দস্যি-গুলো। হ্যাঁ, আর এই রকম ঠাণ্ডার মধ্যে!

দুজনে দৌড়োচ্ছে ঠিক হন্যে কুকুরের মত। নিজেদের নিশ্বাস ছাড়া অন্য কোনো আওয়াজই তাদের কানে যাচ্ছে না—নিশ্বাস নিচ্ছে, ছাড়ছে—নিচ্ছে, ছাড়ছে।

যত যাই হোক, তিউরিন তো গুম্‌টিঘরে আছে। তিউরিনই ওদের হয়ে ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলে দেবে।

এবার ওরা সোজা ছুটে চলেছে যেদিকে গাদা গাদা লোক ভিড় করে আছে সেইদিকে। দেখলে ভয় ধরে যায়।

হঠাৎ একসঙ্গে শত শত গলা সমস্বরে ওদের দুজনকে লক্ষ্য করে ধিক্কার দিয়ে উঠল। দুজনকে তারা বাপ-মা তুলে, নাক-মুখ-কলজের কথা বলে বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি সব খিস্তি খেউড় করতে শুরু করে দিল। পাঁচ শো লোক যখন একসঙ্গে কারো ওপর খেপে ওঠে, তখন তার কী সাংঘাতিক অবস্থা হয়!

কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, কন্‌ভয়-গার্ডদের কী অবস্থা? কী মতিগতি তাদের?

না। ওরা এ-সবের মধ্যে নেই। তিউরিন হাজির আছে। শেষ সারিতে। তিউরিন আগেভাগেই ব্যাপারটা খোলসা করে বলে দিয়েছে। দোষটা সে নিজের ঘাড়েই নিয়েছে।

কিন্তু কয়েদীরা ছাড়ছে না। তারা হৈ চৈ করছে আর কেবল গাল দিচ্ছে। ওদের চেঁচানি এমন কি সেন্‌কা পর্যন্ত শুনতে পাচ্ছে। হঠাৎ লম্বা-চওড়া চেহারা নিয়ে বুক ফুলিয়ে সেন্‌কা ঝট্‌ করে ঘুরে দাঁড়াল। সেন্‌কা বরাবরকার শান্ত নিরীহ মানুষ। এবার হঠাৎ সে গাঁক গাঁক করে চেঁচিয়ে উঠল। ঘুসি পাকিয়ে সে লড়বার জন্যে তৈরি হল। তক্ষুণি কয়েদীর দল একদম চুপ। একজন হেসে উঠল,—ওহে, একশো চার! তোমাদের উনি তাহলে কালা নন। অন্যেরা চেঁচিয়ে উঠল,—ধরা পড়ে গেছে! ধরা পড়ে গেছে!

সবাই হো হো করে হেসে উঠল। এমন কি কন্‌ভয়-গার্ডরাও হাসি চেপে রাখতে পারল না।

—পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়িয়ে যাও!

কিন্তু পাহারাওয়ালারা গেট খুলল না। নিজেদের ওপরও ওদের বিশ্বাস নেই। গেট

থেকে ওরা লোকজনদের ঠেলে পেছনে সরিয়ে দিল। লোকে গেটের কাছে ভিড় করেছিল; মনে করছিল তাহলেই বুঝি আগে আগে বেরোতে পারবে—বোকা আর বলেছে কাকে।

—দাঁড়িয়ে যাও, পাঁচজন পাঁচজন। এক! দুই! তিন...

ডাকবার সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ-পাঁচজনের একেকটি দল হাতকয়েক সামনে এগিয়ে গেল।

শুখভ দাঁড়িয়ে থেকে দম নিতে নিতে চারদিকে তাকাচ্ছিল। চাঁদমামাকে আগে আগেই মুখ লাল করে চোখ রাঙাতে দেখা গেল। কৃষ্ণপক্ষ নিশ্চয় শুরু হয়েছে। কাল রাত্রে চাঁদ ছিল আরেকটু ওপরে।

সুভালাভালি সব দিক রক্ষা হয়ে যাওয়ায় শুখভের মেজাজ খুব ভাল। শুখভ কনুই দিয়ে ক্যাপ্টেনকে খোঁচা মারল।

—আচ্ছা, ক্যাপ্টেন সাহেব! তোমাদের বিজ্ঞান কী বলে গো—চাঁদমামা যায় কোথায়?

—যায় কোথায়, মানে? কী গর্দভ! দেখা যায় না, ব্যস্ এই।

শুখভ মাথা ঝাঁকিয়ে হাসল।

—দেখা যদি না যায় তো জানলে কী করে যে আছে?

ক্যাপ্টেন হাল ছেড়ে দিয়ে বলল,—তোমার কী ধারণা? প্রত্যেক মাসে নতুন নতুন চাঁদ হয়?

—কেন? হলে আশ্চর্য হওয়ার কী আছে? বছরভর রোজ মানুষ জন্মাচ্ছে, তার বেলায়! চার হপ্তা পর পর চাঁদ জন্মাতে পারে না?

ক্যাপ্টেন ঠোঁট উল্টে বলল,—ফুঃ! এমন একজন খালাসীও দেখিনি যে তোমার মত বোকা। চাঁদমামা কোথায় যায় বলে তোমার মনে হয়?

শুখভ কান এঁটো করে হেসে বলল,—সেই কথাই তো জিজ্ঞেস করছি? কোথায় যায়?

—আমাকে বলো তুমি, কোথায় যায়?

শুখভ দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুরনো কথা মনে করল।

—গাঁয়ের লোকে বলত, ভগবান নাকি চাঁদমামাকে ভেঙেচুরে আকাশের তারা গড়েন।

ক্যাপ্টেন হেসে বলল,—একেবারেই জংলী ব্যাপার। এমন কথা এই প্রথম শুনছি। তুমি কি ঠাকুর দেবতায় বিশ্বাস করো, শুখভ?

শুখভ তো অবাক। বলল,—করি বৈকি, কেন করব না! আকাশে গুড় গুড় করে যখন দেবতা ডাকে, বিশ্বাস না করে পারা যায়?

—ভগবান কিসের জন্যে ওসব করবে?

—কী করবে?

—ঐ সব, চাঁদ ভেঙে তারা করা—কেন করবে?

শুখভ ঘাড়টা ঝাঁকিয়ে বলল,—কি গো, এও বোঝো না? তারাগুলোর সময় ফুরোলেই একে একে খসে পড়ে যায়। তাদের জায়গায় তখন নতুন নতুন তারা বসানোর দরকার হয়।

একজন কন্‌ভয়-গার্ড বিশ্রী গাল দিয়ে উঠে বলল,—ঘুরে দাঁড়া! লাইন ঠিক কর!

ওরা এবার গণ্‌তির পাল্লায় এসে পড়েছে। পঞ্চম শতকের কোঠায় পাঁচ বারোং লোক গোণা হয়ে গেছে। পেছনে আছে দুজন—বুইনভ্‌স্কি আর শুখভ।

কন্‌ভয়-গার্ডেরা ভারি সমস্যায় পড়ে গেছে। হন্তদন্ত হয়ে ওরা নম্বর লেখার বোর্ডগুলো নিয়ে নিজেদের মধ্যে তুমুল আলোচনা চালাচ্ছে। গণ্‌তিতে কম হয়েছে! এবারও একজন কম পড়ছে! ভাল করে ওদের গুণতে শেখানো হয় না কেন?

গুণেটুনে ওদের ৪৬২ হচ্ছে। ওরা বলছে, হওয়া উচিত ৪৬৩।

আবার ওরা সবাইকে ঠেলেঠুলে গেট থেকে হটিয়ে দিল। কয়েদীরা আবার গেটে ভিড় করেছিল। তারপর আবার একবার,—পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়াও। এক! দুই!

বার বার এই গোণাটা অসহ্য। আরও অসহ্য এই জন্যে যে, এতে যে সময়টা যায় সেটা সরকারের সময় নয়—কয়েদীদের নিজস্ব সময়। তাছাড়া এর পরও আছে বৃক্ষহীন বিরাট প্রান্তর পেরিয়ে ক্যাম্পের দিকে যাত্রা এবং তারপর ক্যাম্পের সামনে গা-তল্লাসির জন্যে লাইন বেঁধে দাঁড়ানো। বিভিন্ন কাজের জায়গা থেকে দলে দলে এসে কয়েদীরা সাধারণত লম্বা লম্বা পা ফেলে ছুটতে থাকে—যারা আগে গিয়ে গা-তল্লাসির লাইনে দাঁড়াবে, তারা আগে ক্যাম্পে ঢুকতে পারবে। যে দল আগে ক্যাম্পে ঢুকবে, তারাই রাজা। খাওয়ার ঘরে তাদের জন্যে খাবার তৈরি; পার্সেল ঘরের লাইনে প্রথমেই তারা দাঁড়াবে, চেক রুম আর রসুইঘরে তারা প্রথম যাবে, শিক্ষা-সংস্কৃতির দপ্তর থেকে চিঠি আনবে বা সেন্সারের জন্যে চিঠি জমা দেবে তারাই প্রথম; হাসপাতালে, সেলুনে, হামামঘরে—সর্বত্রই তারা সবার আগে।

এদিকে কন্‌ভয়-গার্ডদেরও তাড়া থাকে ক্যাম্পে সবাইকে নিয়ে গিয়ে পেঁাছে দেবার। তাহলে ক্যাম্পে তারা তাদের আস্তানায় তাড়াতাড়ি ফিরতে পারবে। সেপাইদেরও জীবন খুব সুখের নয় : কাজ থাকে অনেক, অথচ সময় কম।

কিন্তু গণ্‌তিতে এবারও কম হল।

শেষের কজনকে পাঁচজন পাঁচজন করে যখন এগিয়ে যেতে বলা হল শুখভের একবার মনে হয়েছিল শেষে তিনজন থেকে যাবে। কিন্তু না, হল না। শেষে ফের সেই দুই।

যারা গুণছিল তারা তাদের নম্বর লেখার বোর্ডগুলো নিয়ে কন্‌ভয়-গার্ডদের মাতব্বরের কাছে চলে গেল। নিজেদের মধ্যে তারা কি সব বলাকওয়া করল। তারপর কন্‌ভয়-গার্ডদের সেই মাতব্বর লোকটি হাঁক দিল,—১০৪নং ব্রিগেডের ফোরম্যান! কোথায় সে?

তিউরিন আধ কদম এগিয়ে গেল।

—এই যে আমি।

—তোমার দলের কেউ বিজলী স্টেশনে নেই? মনে করে দেখ।

—না, নেই।

—ভাল করে মনে করে দেখ—মিথ্যে হলে আমি তোমার মুণ্ডু ছিঁড়ে দেব।

—নেই। আমি সত্যি কথাই বলছি।

কিন্তু তিউরিন একবার পাভ্‌লোর দিকে আড়চোখে চেয়ে নিল—মেশিনঘরে গিয়ে কেউ ঘুমিয়ে পড়েনি তো?

কন্‌ভয়-গার্ডদের মাতব্বর হেঁকে বলল,—ব্রিগেড হিসেবে সবাই দাঁড়াও। ব্রিগেড হিসেবে গোণা হবে।

আগে ওরা যে যেখানে ছিল এলোমেলোভাবে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। এবার গুতোগুতি হৈচৈ শুরু হয়ে গেল। নানা রকমের চিৎকার শোনা যেতে লাগল : 'বাহাত্তর নম্বর—এই যে এইখানে!' 'তেরো নম্বর! আমার কাছে!' আবার কোথাও বা, 'বত্রিশ!'

১০৪ নম্বরের ডাক পড়ল সকলের শেষে। শুখভ দেখল দলের সবাই এসেছে খালি হাতে। সবাইকে এত বেশী খাটতে হয়েছে যে চুল্লীর জন্যে কাঠকুটো যোগাড় করবার আর সময় পায়নি। একমাত্র দুজনের কাছে কিছু কাঠকুটোর বাণ্ডিল আছে।

রোজ এই এক খেলা। ছুটির ঠিক আগে কয়েদীর দল এখান ওখান থেকে টুকরো

টাকরা কাঠ, কাঠি আর ভাঙা বাতা কুড়িয়ে ন্যাকড়ার পঁটলি করে কিংবা সুতো দিয়ে বেঁধে ক্যাম্পে নিয়ে যায়। কিন্তু তার আবার নানান ফ্যাচাং। প্রথম তো গুমটিঘরে। ইমারত বিভাগের তদারককারী আর তার সঙ্গে কোনো একজন ছোটবাবু যদি থাকে, তাহলে বাণ্ডিল-গুলো হাত থেকে ফেলে দেবার হুকুম হবে। অফিসারের দল বাজে খরচ করে লক্ষ লক্ষ টাকা ফুঁকে দিল তাতে কিছু হল না—এখন কয়েদীদের সামান্য কাঠকুটো থেকে বঞ্চিত করে ওঁরা খরচ কমাচ্ছেন।

কিন্তু কয়েদীদের আবার নিজেদের আলাদা হিসেব। ব্রিগেডের প্রত্যেকে যদি কয়েকটা করে কাঠি জুটিয়ে আনে তাহলে ব্যারাকে ওরা একটু আগুন পোহাতে পারে। নইলে ব্যারাকের ফালতুদের দৈনিক মোটে পাঁচ সের করে কয়লার গুঁড়ো বরাদ্দ। ওতে ঠাণ্ডার হাত থেকে আর কতটুকু বাঁচা যায়! সেইজন্যেই ব্রিগেডের লোকেরা কাঠিগুলো ভেঙে বা ছোট করে কেটে নিয়ে ওভারকোটের নীচে লুকিয়ে রাখে—যাতে তদারককারী অফিসার কাঠের বাণ্ডিলগুলো দেখে না ফেলে।

সঙ্গে যে কন্‌ভয়-গার্ডরা থাকে, তারা কক্ষণো কাজের এলাকায় বাণ্ডিলগুলো ফেলে দেবার কথা বলে না। জ্বালানী কাঠ তাদেরও দরকার। কিন্তু তারা নিজেরা কখনও বয়ে নিয়ে যাবে না। এক তো, চাকরির দিক থেকে তাতে ইজ্জতে বাধে। অন্যদিকে, হাতের সাব-মেশিনগানও একটা বাধা বটে—যদি গুলি ছুঁড়তে হয়! অবশ্য ক্যাম্পের গেটে পৌঁছুনো মাত্র কন্‌ভয়-গার্ডরা হুকুম করবে,—অমুক সারি থেকে অমুক সারি, কাঠ-কুটোগুলো এখানে নামিয়ে রাখো। কিন্তু তারা রয়ে সয়ে নেয়—ক্যাম্পের গার্ডরা পায় কিছু, আর কিছু পায় কয়েদীরা। তা না হলে তো কয়েদীরা কাঠকুটো আর আনবেই না।

ফলে, এই ব্যবস্থা : প্রত্যেকটি কয়েদী প্রত্যেক দিন কাঠ বয়ে নিয়ে যাবে। কোন্‌দিন কে নিয়ে যেতে পারবে, কোন্‌দিন কারটা বেহাত হবে– আগে থেকে কেউই বলতে পারে না।

শুখভ পায়ের কাছে এদিক-ওদিক চেয়ে দেখছিল কোথাও কোনো কাঠকুটো পড়ে আছে কিনা। ইতিমধ্যে তিউরিন তার দলের লোক গুন্‌তি করে গার্ডদের কর্তাকে জানিয়ে দিল।

—এক শো চার—সবাই হাজির।

অফিসকর্মীদের দল থেকে ঠিক তখনই ৎসেজার নিজের ব্রিগেডে ফিরে এসেছে। জ্বলন্ত পাইপটা থেকে হুস্‌হুস্‌ করে সে ধোঁয়া ছাড়ছিল। তার কালো গোঁফে বরফ পড়ে সাদা হয়ে আছে।

ৎসেজার জিজ্ঞেস করল,—তারপর? আছ কেমন, ক্যাপ্টেন?

যার শরীর গরম রয়েছে সে কখনও ঠাণ্ডায় জমে-যাওয়া লোকের দুঃখ বুঝবে না। কেমন আছ—এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না।

ক্যাপ্টেন কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল,—কেমন আছি জিজ্ঞেস করছ? আর বলো না। এমন হাড়ভাঙা খাট্‌নি গেছে যে, কোমর সোজা করতে পারছি না।

অন্তত এ থেকেও বোঝা উচিত ক্যাপ্টেনকে একটা সিগারেট খাওয়ানো দরকার।

ৎসেজার ক্যাপ্টেনকে সিগারেট খাওয়াল। দলের মধ্যে একমাত্র ক্যাপ্টেনের সঙ্গেই ৎসেজার যা একটু মেলামেশা করে। দ্বিতীয় আর কেউ নেই যার সঙ্গে সে কথাবার্তা বলতে পারে।

সবাই ফিসফিস গুজগুজ করছে,—৩২ নম্বর থেকে একজন কেটেছে! ৩২ নম্বর থেকে।

৩২ নম্বর ব্রিগেডের সহকারী ফোরম্যান এবং তার সঙ্গে আরেক ছোকরা মোটর মেরামতী কারখানায় ছুটে গেল নিখোঁজ লোকটির সন্ধান করতে। ভিড়ের মধ্যে সবাই সবাইকে জিজ্ঞেস করতে লাগল,—কে-কী-কেন-কোথায়? সকলেই জানতে চায়। লোক-পরম্পরায় শুখভের কানে এল : ছোটখাটো শ্যামবর্ণ মোল্‌দাভিয়ার লোকটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। মোল্‌দাভিয়ার কোন্ লোক? যাকে রুমানিয়ার গুপ্তচর বলা হত—সত্যিকার যে স্পাই—সে নিশ্চয় নয়?

প্রত্যেক ব্রিগেডেই খুঁজলে গুটি পাঁচেক করে স্পাই মিলবে। তবে তারা বানানো স্পাই, সত্যিকারের নয়। ওদের বিরুদ্ধে এমনভাবে কাগজপত্র সাজানো হয়েছে, যাতে ওদের খাঁটি স্পাই বলে মনে হবে। আসলে ওরা সবাই ছিল প্রাক্তন যুদ্ধবন্দী। শুখভ নিজেও ছিল ঐ পদের স্পাই।

কিন্তু মোল্‌দাভিয়ার লোকটি ছিল যথার্থই একজন স্পাই।

গার্ড বাহিনীর কর্তা কয়েদীদের তালিকাটা দেখল। দেখে তার মুখ কালো হয়ে গেল। স্পাই হয়ে কেউ যদি পালায় তাহলে কন্‌ভয়-কর্তার কী দশা হবে?

লোকজনেরা সবাই, মায় শুখভ পর্যন্ত রেগে আগুন হয়ে গিয়েছিল। মড়াখেকো, কালকেউটে, ছুঁচো, পাজী, শুয়োর স্পাইটার জন্যে এ কী পেড়ার বলো তো? সন্ধ্যের ঘনিয়ে-আসা অন্ধকারে একটুখানি যা চাঁদের আলো। আকাশে মিটমিট করছে তারা; রাত্রে ঠাণ্ডা বেশ জাঁকিয়ে পড়বে, তার তোড়জোড় চলেছে। এই সময় শালার বেটা শালা বেপাত্তা হয়ে গেল। কেন? খেটে খেটে তোর বুঝি আশ মিটছিল না? সরকারী কাজের যা সময় —উদয়াস্ত এগারো ঘণ্টা—তাতে বুঝি শাণাচ্ছিল না? দাঁড়া, দাঁড়া—ঘানি টানার মেয়াদ আদালত আরও খানিকটা বাড়িয়ে দেবে।

কাজে কেউ এতটা মত্ত হতে পারে যে, ছুটির ঘণ্টা বাজলেও শুনতে পায় না—শুখভের কাছে এটা অদ্ভুত ঠেকল। শুখভ নিজেই একটু আগে ঐ রকমভাবে কাজ করছিল, সাত-তাড়াতাড়ি কাজ ফেলে উঠে আসতে হয়েছিল বলে তার তখন কী মন খারাপ—এখন আর সেসব কথা তার মনেও নেই। কিন্তু এখন আর সকলের মত তাকেও ঠাণ্ডায় জমে যেতে হচ্ছে। মোল্‌দাভিয়ার সেই লোকটির জন্যে তাদের বোধহয় আরও আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। কন্‌ভয়গার্ডরা লোকটাকে ধরে এনে কয়েদীদের এই বিরাট দঙ্গলের হাতে যদি একবার ছেড়ে দেয়, তাহলে নেকড়ের হাতে ছাগলছানা পড়লে তার যে দশা হয় —সেইভাবে এরা তাকে ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেলবে।

ঠাণ্ডা এইবার বেশ জবরভাবেই পড়তে আরম্ভ করল। স্থির হয়ে কেউ আর দাঁড়াতে পারছে না। হয় ওরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা দিয়ে মাটিতে তাল ঠুকছে, নয় দু-পা সামনে এগিয়ে আবার দু-পা পিছিয়ে আসছে।

মোল্‌দাভিয়ার লোকটা পালিয়েও তো যেতে পারে! জোর আলোচনা চলেছে এই নিয়ে। ও যদি দিনের আলো থাকতে কেটে পড়ে থাকে, তাহলে এক কথা। কিন্তু ও যদি এই ভেবে এখন ঘাপ্‌টি মেরে পড়ে থাকে যে, গুমটির সেপাইরা বেরিয়ে চলে গেলে তারপর পালাবে—তাহলে অপেক্ষা করাটাই ওর কাল হবে। কাঁটাতারের নীচে যদি এমন কোনো চিহ্ন দেখতে না পাওয়া যায় যা থেকে বোঝা যাবে সে পালিয়েছে, তাহলে যতদিন না লোকটাকে পাওয়া যাচ্ছে ততদিন গুমটিতেই পাহারাওয়ালাদের থাকতে হবে—তিন দিন, চার দিন, এমনকি এক হপ্তা পর্যন্ত থাকতে হতে পারে। এটাই নিয়ম। এ নিয়মের কথা

পুরনো কয়েদীরা সকলেই জানে। সাধারণত কেউ এখান থেকে পালালে কন্‌ভয়-গার্ডদের হাড়ে দুর্ব্বো গজায়—না খেয়ে, না ঘুমিয়ে সারা দিন সারা রাত তাদের ডিউটি দিতে হয়। কখনও কখনও তাদের এত বেশী খাটানো হয় যে, রাগে ওরা পাগলা খ্যাপা হয়ে যায়। যে পালায়, তাকে আর তখন জ্যান্ত অবস্থায় তারা ফিরিয়ে আনে না।

ৎসেজার চেষ্টা করছিল ক্যাপ্টেনকে বোঝাতে,—যেমন ধরো, জাহাজের দড়ির গায়ে পাঁস্‌নেটা যখন পড়ো-পড়ো হয়ে ঝুলছিল—মনে আছে?

পাইপের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে ক্যাপ্টেন বুইনভ্‌স্কি বলল,—হুঁ...উঁ।

—কিংবা সেই বাচ্চার পেরাম্বুলেটারটা। লম্বা সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে, গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে।

—হ্যাঁ।...তবে ও-ছবিতে জাহাজের যেসব দৃশ্য দেখানো হয়েছে, সেগুলো কি রকম যেন সাজানো—পুতুল-পুতুল ভাব।

—আমাদের স্বভাব খারাপ হয়ে গেছে মুভি ক্যামেরার একেলে সব কেরামতি দেখে দেখে।

—মাংসের পোকাগুলো দেখিয়েছে যেন এককেটা ধাড়ী কেঁচোর মতন। তা কি কখনও হতে পারে?

—কিন্তু সিনেমায় তো তুমি ওর চেয়ে ছোট দেখাতেই পারো না।

—বুঝলে, আমার তো মনে হয়—যে মাছ এখানে আমরা পাই, তার বদলে ঐ মাংস ওরা যদি ক্যাম্পে এনে একেবারে আধোয়া অবস্থায় উনুনে চাপিয়ে দেয়, তাহলে আমরা তো...

হঠাৎ কয়েদীর দলে হৈ-হৈ রৈ-রৈ করে একটা চিৎকার।

ওরা তিন মূর্তিকে মোটর মেরামতী কারখানা থেকে হুড়মুড় করে বেরোতে দেখেছে। তার মানে, মোল্‌দাভিয়ার লোকটাকে ওরা খুঁজে পেয়েছে।

গেটে দাঁড়িয়ে লোকে সুর করে সমস্বরে আওয়াজ দিতে লাগল।

তিন মূর্তিকে ছুটে এগিয়ে আসতে দেখে পরিত্রাহি চিৎকার উঠল,—শালা! ছুঁচো! নেড়ী কুত্তার বাচ্চা! গুখেকোর বেটা! শয়তানের ডিম!

শুখভ সুদ্ধু চেঁচাতে লাগল,—পাজী! ছুঁচো কোথাকার।

পাঁচশো লোকের কাছ থেকে আধঘণ্টারও বেশী সময় কেড়ে নেওয়া—যে সে ব্যাপার নয়—

মোল্‌দাভিয়ার লোকটা মাথা হেঁট করে নেংটে ইঁদুরের মত ছুটছিল।

পাহারাদার সেপাই চেঁচিয়ে উঠল,—এই! থাম! ওর নম্বর লিখে নিতে নিতে বলল,—ক—৪৬০! ছিলি কোথায়?

বলে লোকটার দিকে এগিয়ে গিয়ে রাইফেলের কুঁদোটা উঁচিয়ে ধরল।

ভিড়ের মধ্যে তখনও কেউ কেউ চেঁচাচ্ছিল,—পাজী বদ্‌মাশ! নচ্ছার! শুয়োর!

পাহারাদার সেপাইকে রাইফেলের কুঁদো তুলে ধরতে দেখে বাকি সবাই চুপ হয়ে গেল।

মোল্‌দাভিয়ার লোকটি কোনো কথা বলল না। মাথা নীচু করে পেছনে শুধু একটু সরে দাঁড়াল।

৩২ নম্বর ব্রিগেডের সহকারী ফোরম্যান সামনে এগিয়ে এল: কালি ফেরানোর ভারার ওপর কোন্ ফাঁকে উঠে বসে হতভাগা গরমে আরাম পেয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল।

ব'লে লোকটার মুখে আচমকা একটা ঘুসি মেরে বসল। তারপর ঘাড়ে এক রুদ্দা। মেরে মেরে লোকটাকে সেপাইয়ের কাছ থেকে সরিয়ে আনল।

মোল্‌দাভিয়ার লোকটা চোখে সর্ষের ফুল দেখতে লাগল। ৩২ নম্বর ব্রিগেডেরই আরেকজন—এক হাঙ্গেরিয়ান—পেছন থেকে এসে তাকে পর পর কয়েকটা লাথি মারল।

—এ তোমার স্পাইগিরি পাও নি। বোকা গবেটরাও স্পাই হতে পারে। স্পাই হলে ঝুটঝামেলা নেই, তোফা মজার জীবন। কিন্তু জেলখানায় দশ বছর ঘানি টানার পর বেঁচে থাকো তো দেখি, চাঁদ!

পাহারাদার তার রাইফেলটা নামাল।

কন্‌ভয়-গার্ডদের কর্তা হাঁক দিল,—গেট থেকে পিছিয়ে এসো। পাঁচজন করে দাঁড়িয়ে যাও।

কুকুরগুলো আবার গুণতে লেগেছে। সবই তো পরিষ্কার হয়ে গেছে, আবার এখন গোণাগুণি কেন? কয়েদীরা গাঁইগুঁই করতে লাগল। মোল্‌দাভিয়ার লোকটার ওপর থেকে রাগ পড়ে সব রাগ গিয়ে পড়ল এখন কন্‌ভয়-গার্ডের ওপর। ওরা জায়গা থেকে না নড়ে নানারকম আওয়াজ দিতে লাগল।

গার্ডদের কর্তা গজরাতে লাগল,—কী? দেখবে, বরফের ওপর তোমাদের বসিয়ে রাখব? বড় তেল হয়েছে, না! দাঁড়াও, দেখাচ্ছি। রাতভোর এখানে আমি তোমাদের ফেলে রাখব।

ওর কিন্তু যে কথা সেই কাজ—এ বিষয়ে দুবার ভাববে না। করে তবে ছাড়বে। গার্ডদের হুকুমে কতবার ওদের বসে থাকতে হয়েছে। এমন কি শুতেও হয়েছে। শুয়ে পড়ো সব! নইলে গুলি চলবে। এসব কথা কয়েদীদের জানা আছে।

তাই ওরা সুড় সুড় করে গেট থেকে সরে দাঁড়াল।

—হটো! আরও হটো! কন্‌ভয়-গার্ড ওদের ঠেলতে লাগল।

চাপ পড়ায় পেছনের লোকেরা রেগে গিয়ে সামনের লোকদের বলল,—কেন গেটের গায়ে ঠেলছ? এই আহাম্মকের দল!—পাঁচজন পাঁচজন করে গুণে নাও। এক! দুই! তিন!

চাঁদ এবার ঢলো ঢলো রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে। আরও উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। লাল রঙের ছোপ আর নেই। আকাশে তার সিকি ভাগ রাস্তা পাড়ি দেওয়া হয়ে গেছে। পুরো সন্ধ্যেটাই মাটি। মোল্‌দাভিয়ার ঐ হতচ্ছাড়া লোকটা! ঐ হতচ্ছাড়া কন্‌ভয়-গার্ড। এই হতচ্ছাড়া জীবন!

সামনে যাদের গনতি হয়ে গেছে তারা ঘাড় ঘুরিয়ে ডিঙি মেরে মেরে দেখছে—শেষ সারিতে লোক আছে দুজন না তিনজন। এই মুহূর্তে ওদের জীবনমরণ এর ওপর নির্ভর করছে।

এক মুহূর্ত শুখভের মনে হয়েছিল শেষ সারিতে সে যেন চারজন লোক দেখেছে; সঙ্গে সঙ্গে ভয়ে তার হাত-পা হিম হয়ে গিয়েছিল। লোক বেড়ে গেছে! আবার গোণো। পরে বোঝা গেল ফেরুপাল ফেতিউকভ গিয়েছিল ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে আধপোড়া সিগারেট ভিক্ষে করতে; পরে ঠিক সময়মত নিজের গ্রুপে ফিরে আসতে না পারায় ওকে ফাল্‌তু হিসেবে সকলের শেষে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছিল।

কন্‌ভয়-গার্ডের ছোটকর্তা চটে গিয়ে ফেতিউকভের ঘাড়ে জোরসে এক রুদ্দা মারল।

মেরেছে বেশ করেছে। মারাই উচিত।

শেষ সারিতে হল তিনজন। হায় ভগবান! হিসেব তাহলে মিলল।

—গেট থেকে সরো! কন্‌ভয়-গার্ডরা আবার ঠেলা লাগাল।

কিন্তু এবার আর কয়েদীরা গাইগ‍ুঁই করল না। ওরা দেখতে পেল, গ‍ুমটিঘর থেকে সেপাইরা বেরিয়ে গেটের দ‍ুপাশে ব্যূহ রচনা করে দাঁড়াল।

তার মানে, এবার ওদের বেরোতে দেওয়া হবে।

তদারকী বিভাগের না বড়বাব‍ু, না ছোটবাব‍ু—কাউকেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। কাঠকুটোগ‍ুলো কয়েদীদের কাছেই এখনও আছে।

গেট খ‍ুলে গেল। ওপাশে কাঠের বেড়ার পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে কন্‌ভয়-গার্ডের কর্তা আর তার সঙ্গে একজন গোণবার লোক।

—এক! দ‍ুই! তিন!

গ‍ুণ্‌তি মিলে গেলে গ‍ুমটিঘর থেকে পাহারাওয়ালাদের ওরা ডেকে নামিয়ে আনবে।

সেই কোন্ দ‍ূরে দ‍ূরে গ‍ুমটিঘর। সেখান থেকে এলাকার ধার দিয়ে ধার দিয়ে আসতে পায়ের দড়ি ছিঁড়ে যাবার অবস্থা হয়। নিঃশেষে সমস্ত কয়েদী এলাকা থেকে বেরিয়ে যাবার পর যখন দেখা গেল গ‍ুণ্‌তি মিলে গেছে, তখন গ‍ুমটিতে গ‍ুমটিতে টেলিফোন করে বলে দেওয়া হবে : চলে এসো। কন্‌ভয়-গার্ডদের কর্তা যদি চালাক লোক হয়, তাহলে সে তক্ষ‍ুণি ক্যাম্পের দিকে রওনা দেবে—কেননা সে জানে কয়েদীরা কোথাও পালাতে পারবে না এবং পাহারাদার সেপাইরা পরে বেরোলেও রাস্তায় পা চালিয়ে ঠিক ওদের ধরে ফেলবে। কিন্তু কখনও কখনও গার্ডদের কর্তাটি হয় গবেট; সে ভয় পায়, পাছে একা তার সশস্ত্র শান্ত্রীরা কয়েদীদের ঠিকমত সামলাতে না পারে। তার জন্যে ওরা যতক্ষণ এসে না পেঁছোয়, কয়েদীদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়।

আজ সন্ধ্যায় গার্ডদের যে কর্তাটি ডিউটিতে এসেছে, সে অমনি এক মাথামোটা লোক। গ‍ুমটির সেপাইরা এসে না পড়া পর্যন্ত সে অপেক্ষা করতে লাগল।

কয়েদীরা দিনভর বাইরে দাঁড়িয়ে ঠাণ্ডায় জমে গেছে। এ যেন সাক্ষাৎ ম‍ৃত্যু। আবার কাজ শেষ করার পরও আরও এক ঘণ্টা হাড়-কাঁপানো শীতে বাইরে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু ঠিক এই ম‍ুহ‍ূর্তে শীতের কষ্টের চেয়েও বেশী হচ্ছে তাদের রাগ। গোটা সন্ধ্যেটা বরবাদ হয়ে গেল। এখন আর ক্যাম্পে ফিরে গিয়ে কিস‍্যু করা যাবে না।

শ‍ুখভ শ‍ুনতে পেল—তার পেছনে যে পাঁচজন, তাদের একজন বলছে,—ব‍্রিটিশ নৌবহরের এত কথা তুমি কী করে জানলে?

—কেন জানব না! এক ব‍্রিটিশ ক্র‍ুজারে আমি যে মাসখানেক ছিলাম। সেখানে আমার নিজের কেবিন ছিল। নৌবহরের সঙ্গে আমি ঘ‍ুরেছি। আমি ছিলাম লিয়াজঁ অফিসার। তারপর য‍ুদ্ধ শেষ হওয়ার পর ইংরেজ অ্যাডমিরালের মাথায় কী যে ভূত চাপল—আমাকে সে হঠাৎ একটা উপহার পাঠিয়ে বসল। তার ওপর লেখা : কৃতজ্ঞচিত্তে। ব্যস্, সেই উপহারই কাল হল। অন্য সকলের সঙ্গে এখানে আমাকে ঠ‍ুসে দেওয়া হল। য়‍ুক্রেনী বেন্দেরভের লোকদের সঙ্গে এক বন্দীশালায় থাকতে—সত্যি, কী বিচ্ছিরি যে লাগে!

অদ্ভুত। চারিদিকে ধ‍ু ধ‍ু করছে মাঠ, খাঁ খাঁ করছে গোটা তল্লাট, চাঁদের আলোয় বরফ ঝলমল করছে। অদ্ভুত দেখাচ্ছে সব। সামনে পেছনে দশ পা ছেড়ে ছেড়ে সারি সারি দাঁড়িয়ে গেছে কন্‌ভয়। বন্দ‍ুক হাতে সেপাইরা তৈরি। কালো কালো একপাল কয়েদী। আর তার মধ্যে, অবিকল এক ছাঁচের ওভারকোট গায়ে দিয়ে একজন লোক—কাঁধে সোনার

তকমা ছাড়া জীবনের কথা একদিন যার কাছে অভাবনীয় ছিল, ইংরেজ অ্যাডমিরালের সঙ্গে যে লোক ওঠাবসা করত, আজ যাকে ফেতিউকভের সঙ্গে মিলে ঠেলাগাড়িতে মাল বইতে হচ্ছে। শচ-৩১১।

হয় এস্পার, নয় ওস্পার—কার ভাগ্যে কখন কী ঘটে বলা যায় না...

কন্‌ভয়-গার্ডরা যে যার জায়গায় মোতায়েন হচ্ছে। চলে চলো, আর--'ভজনা-টজনা' নয়।

—আগে বাড়ো! জল্‌দি জল্‌দি!

আরে, রাখো তোমার জল্‌দি জল্‌দি। আর সব জায়গার কয়েদীরা অনেক আগেই রওনা দিয়ে বসে আছে। এখন আর তাড়াহুড়ো করে কী হবে। কয়েদীরা নিজেদের মধ্যে কোনো যুক্তিপরামর্শ করে নি—কিন্তু সকলেই ঠিক করে নিয়েছে তাদের কর্তব্য। আমাদের তোমরা ধরে রেখেছিলে, এবার আমরাও তোমাদের ধরে রেখে দেব। তোমরাও নিশ্চয় ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে হেদিয়ে উঠেছ।

গার্ডদের কর্তা হাঁক দিল,—লম্বা লম্বা পা ফেলো। সামনেওয়ালা, জল্‌দি চলো।

রাখো তোমার 'লম্বা পা'। কয়েদীরা শ্মশানযাত্রীদের মত পা ঘষটাতে ঘষটাতে ঠায় চলতে লাগল। আর আমাদের কিছুতেই কিছু যায় আসে না। ক্যাম্পে তো সেই সকলের শেষেই আমরা পৌঁছব। তোমরা তো আমাদের মানুষ বলে গণ্য করতে চাও নি। এখন যতই চেঁচিয়ে গলা ফাটাও না কেন।

গার্ডদের কর্তা সামনে চেঁচাচ্ছে,—লম্বা লম্বা পা ফেলো। শেষকালে ও বুঝতে পারল কয়েদীরা কিছুতেই তেড়েফুঁড়ে এগোবে না। এদিকে সে গুলিও চালাতে পারে না। ওরা ঠিক লাইন বেঁধে পরের পর পাঁচজন পাঁচজন করে চলেছে। ওর বাপের সাধ্যি নেই কয়েদীদের এর চেয়ে জোরে জোরে হাঁটায়। সকালবেলায় ওরা যখন কাজে যায় তখন ওদের পা ঘষটানির জোরেই ওরা ধড়ে প্রাণটুকু জীইয়ে রাখে। যারা তাড়াতাড়ি ছোটে, তারা জেলখানায় তাদের মেয়াদ পুরো করবার সময় পায় না। দম ফুরিয়ে গিয়ে তারা পড়ে আর মরে।

কাজেই তারা সাফ সাফ ঠায় একভাবে চলতে লাগল। বরফে ওদের বুটের মচ মচ শব্দ শোনা গেল। কেউ কেউ নীচু গলায় ফিস ফিস করে কথা বলছিল, কেউ কেউ একেবারে চুপ। শুখভ মনে করার চেষ্টা করছিল সেদিন সকালে ক্যাম্পে কোন্‌ জিনিসটা তার করা হয় নি। ও, মনে পড়েছে—হাসপাতালে যাওয়া! যাই বলো, সত্যি আশ্চর্য কাণ্ড! কাজে গিয়ে হাসপাতালের কথাটা শুখভ একেবারে বেমালুম ভুলে বসে আছে।

হাসপাতালে লোক নেবার ঠিক এখনই হল সময়। ও যদি খাওয়াটা বাদ দেয়, তাহলে এখনও যেতে পারে। কিন্তু ওর গায়ের ব্যথাটা মরে গিয়েছে। ওর গা এখন এত ঠাণ্ডা যে, ওরা হয়ত টেম্পারেচারটাও নেবে না। মিছিমিছি সময় নষ্ট। বিনা ডাক্তারেই শুখভ সেরে উঠেছে। এসব ডাক্তার তো রুগীকে টাঁসিয়ে দিয়ে রুগীর রোগ সারায়।

এখন শুখভের কাছে হাসপাতালের আর তেমন আকর্ষণ নেই। এখন তার একমাত্র চিন্তা রাত্রে খাবারের পরিমাণটা কিভাবে একটু বাড়ানো যায়। ৎসেজারের পার্সেল পাওয়ার ওপরই এখন তার যা কিছু আশা ভরসা। অনেক দিন হয়ে গেল ৎসেজারের কোনো পার্সেল আসে নি।

হঠাৎ কয়েদীদের দলটার মধ্যে কেমন যেন ভাবান্তর দেখা গেল। একটা নড়েচড়ে

ওঠার ভাব। আর আস্তে আস্তে পা মেপে মেপে চলা নয়। গোটা দলটা হঠাৎ গা ঝাড়া দিয়ে হুড়মুড় করে এগোতে শুরু করে দিল। শেষের পাঁচজন—তার মধ্যে ছিল শুখভ—হঠাৎ চেয়ে দেখে যারা সামনে ছিল তাদের চেয়ে তারা অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছে। সামনের লোকদের ধরবার জন্যে তাদের ছুটতে হল। সামনের লোকদের ধরা গেল বটে, কিন্তু খানিকটা হেঁটে যাবার পর আবার তাদের ছুটতে হল।

দলের শেষপ্রান্ত যখন পাহাড়ের মাথায়, তখন শুখভ ডানদিকে বহু দূরে ফাঁকা মাঠের মধ্যে কয়েদীদের ছায়া-ছায়া আরেকটি দল দেখতে পেল। তারা কোণাকুণি রাস্তা ধরে হন্-হনিয়ে এগোচ্ছে।

যারা যন্ত্রপাতির ঘরে কাজ করতে যায় নিশ্চয় সেই দলটা! ওদের দলে লোক আছে তিন শো। ওরাও নিশ্চয় বরাতদোষে আট্‌কে পড়েছিল। তা তো বুঝলাম, কিন্তু হয়েছিল কী? প্রায়ই ওদের ছুটি হয় দেরিতে—হাতে একটা না একটা যন্ত্রপাতি থাকেই; মেরামত শেষ না হলে তারা আসতে পারে না। অবশ্য তাতে ওদের খুব কিছু লোকসান নেই; কারণ, সারাদিন কারখানার ভেতরে থাকে বলে ঠাণ্ডাটা লাগে না।

এবার প্রশ্ন দাঁড়াল, কারা আগে পেঁছুবে—ওরা, না এরা! কয়েদীরা পাঁই পাঁই করে ছুটতে শুরু করে দিল। ছোটা যাকে বলে। কন্‌ভয়-গার্ডরাও দৌড়ুতে লাগল।

এদিকে গার্ডদের কর্তা চেঁচাতে লাগল,—মাঝখানে ফাঁকা পড়ে না যায়। পেছনের লোক, এগিয়ে! আরও ঘন হয়ে।

—ওরে আমার তুমি রে! যাও, যাও—অত চেঁচাতে হবে না। ঠাস্ করে চাঁটি মারব। চোখের মাথা খেয়েছ? দেখছ না, আমরা ছুটছি?

যেসব লোক এতক্ষণ ধরে চলতে চলতে ভাবছিল, কথা বলছিল—তাদের সেসব ভাবনা-চিন্তা কথাবার্তা মাথায় উঠেছে। সারা দলের এখন একটাই চিন্তা—ওদের দলটাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যাও! এগিয়ে যাও!

সব কিছু এমন তালগোল পাকিয়ে গেছে যে, এখন আর কন্‌ভয়-গার্ডরা কয়েদীদের যেন শত্রু নয়—বন্ধু। অন্য দলটা এখন শত্রু।

মেজাজ ভাল হয়ে গেছে সকলের। এখন আর কারো রাগ নেই।

পেছনের লোকেরা সামনের লোকদের ডেকে বলতে লাগল,—জোরে জোরে চলো, পা চালিয়ে চলো।

মেশিন কারখানার লোকেরা যখন একসার বাড়ির আড়ালে পড়ে গেছে, সেই সময় আমরা এসে পড়েছি রাস্তায়। অন্ধকারে দুটো দল পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ছুটছে।

এখন আমাদের পক্ষে ছোটা সহজ, কেননা আমরা চলেছি রাস্তার মাঝখান দিয়ে। দুপাশে সেপাইদেরও এখন ছুটতে গিয়ে হোঁচট খাওয়ার ভয় নেই। এইখানটাতেই আমরা ওদের মেরে বেরিয়ে যাব।

আগে গিয়ে পেঁছুনো আরও এই কারণে দরকার যে, মেশিন-কারখানার দলের লোকদের অনেকক্ষণ ধরে তন্ন তন্ন করে গা-তল্লাসি করা হয়। ক্যাম্পে ছুরি মারার প্রথম ঘটনাটা ঘটবার পর থেকেই অফিসাররা মনে করছে—মেশিন কারখানায় তৈরি হয়ে ছুরিগুলো ক্যাম্পে এসেছে। কাজেই ক্যাম্পে ঢুকবার মুখে মেশিন কারখানার লোকদের এখন একটু বেশিরকম তল্লাসি করা হয়।

শীত যে সময়ে পড়ব-পড়ব করছে, মাটি যখন কন্‌কনে হতে শুরু করেছে, তখনই

পাহারাঅলা সেপাইরা হাঁক দিত,—যারা মেশিন কারখানাওয়ালা, জুতো খুলে ফেলো! জুতোগুলো হাতে নাও।

আর তারপর খালি পা করে ওদের তল্লাসি করত।

আর এখন তো ভরা শীত। এই ঠাণ্ডার মধ্যে এখনও তারা এলোপাথাড়ি লোক ধরে ধরে খোঁচায়,—ওহে, শুনছ—খুলে ফেলো তোমার ডান পায়ের বুটটা। আর এই যে, খোলো তো বাছাধন তোমার বাঁ পায়ের বুটটা।

যাকে বলা হয়, সে তার ফেল্টের বুটটা খুলে ফেলে; এক পায়ে ল্যাংচাতে ল্যাংচাতে বুটটা উপুড় করে আর পটির কাপড়টা ঝেড়েঝুড়ে দেখায়। এই দেখ, এর মধ্যে কোনো ছুরিছোরা লুকনো নেই।

মেশিন কারখানার লোকেরা গতবার গ্রীষ্মের সময় ভলিবলের দুটো খুঁটি নিয়ে এসেছিল ক্যাম্পে; সেই খুঁটির ভেতর নাকি ওরা ছোরাছুরি লুকিয়ে এনেছিল—এটা শুখভের শোনা কথা; সত্যি কি মিথ্যে শুখভ জানে না। দশটা করে বড় বড় ছোরা ছিল একেকটা খুঁটির মধ্যে। আজও বেশ কিছুদিন পর পর সেইসব ছোরা এখানে সেখানে নানা জায়গায় হঠাৎ হঠাৎ একেকটা পাওয়া যায়।

নতুন ক্লাবঘর আর সার সার বসতবাড়ি তারা হন্ হন্ করে পেরিয়ে এল। তারপর পড়ল কাঠ-খোদাইয়ের ফ্যাক্টরি। এরপর হুড় হুড় করে তারা মোড় ঘুরে এসে পড়ল সটান ক্যাম্পের গুমটিঘর বরাবর রাস্তায়।

লোকজনের সেই বিরাট দঙ্গলটা সমস্বরে হৈহৈ করে উঠল।

এই মোড়টাতে আসা নিয়েই এতক্ষণ এত লোকের এই হানফানানি। মেশিন কারখানা-ওয়ালার দল ডানদিকে—দেড় শো গজ পিছিয়ে পড়ে আছে।

এবার দলের আগুপিছু সকলেই ধীরেসুস্থে যেতে পারবে। খুব খুশী সবাই। যাক, কিছু লোককে ওরা দুয়ো দিতে পেরেছে। অনেকটা সেই গল্পের খরগোশের মত; খরগোশ খুশী হয়েছিল এই ভেবে—যাক, অন্তত ব্যাঙেরা আমাকে ভয় করে।

সামনে ছায়া-ছায়া দেখা যাচ্ছে ক্যাম্প। সকালে রওনা হওয়ার সময় যতখানি আলো ছিল, এখনও ততখানিই আলো। ঠাসা পুরু কাঠের বেড়ার ওপর এলাকার নৈশ বাতি-গুলো জ্বল জ্বল করছে। গুমটিঘরের সামনেটা আলোয় আলো হয়ে আছে। গা-তল্লাসি করার পুরো জায়গাটা জুড়ে রাতকে দিন করছে জোরালো আলো। যাতে দেখেশুনে ওরা পোঁচ দিতে পারে।

তখনও গেট পর্যন্ত পৌঁছোয় নি।

গার্ডবাহিনীর ছোট কর্তার চিৎকার শোনা গেল,—থামো। সাব-মেশিনগানটি একজন সেপাইকে ধরতে বলে ছোট কর্তা সটান কয়েদীদের দলের কাছে চলে গেল। সাব-মেশিনগান হাতে নিয়ে কয়েদীদের বেশী কাছে যাওয়ার নিয়ম নেই।—যারা যারা ডানদিকে দাঁড়িয়ে আছ—তারা তাদের ডানদিকে জ্বালানী কাঠকুটোগুলো ফেলে দাও।

বাইরের সারিতে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের জ্বালানীগুলো দেখা যাচ্ছিল—ঢাকবার কোনো চেষ্টাই তারা করে নি। একটা...দুটো...তিনটে...ঝুপঝাপ করে বাণ্ডিল পড়তে লাগল। কেউ কেউ তাদের জ্বালানীগুলো ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে ফেলার চেষ্টা করায় আশ-পাশের লোকজনেরা আপত্তি জানাল।

—দিতে বলছে যখন দিয়ে দাও না। নইলে তোমাদের দোষে মাঝের থেকে আমাদের-

গুলোও ওরা নিয়ে নেবে।

কয়েদীরাই কয়েদীদের বড় শত্রু। ওরা যদি সব সময় একজন আরেকজনকে ডোবাবার চেষ্টা না করত, তাহলে আর আজ ওদের এই হাল হত না।

গার্ডদের ছোট কর্তা হাঁক দিল,—আগে বাড়ো, আগে!

এবার তারা গুমটিঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

গুমটিঘরের সামনে এসে মিশেছে পাঁচ-পাঁচটা রাস্তা। এক ঘণ্টা আগে কাজের নানা জায়গা থেকে এসে কয়েদীদের অন্যান্য দলগুলো এখানেই জমায়েত হয়েছিল। যদি কোনো-দিন এই রাস্তাগুলো বাঁধানো সড়ক হয়ে ওঠে, তাহলে তখন এই গুমটিঘর আর গা-তল্লাসির জায়গার বদলে এখানে দেখা দেবে ময়দান। আর আজ যেমন বিভিন্ন কাজের জায়গা থেকে একটার পর একটা কয়েদীর দঙ্গল এসে এখানে জড়ো হয়, ভবিষ্যতের সেই মহানগরে তেমনি মিছিলের পর মিছিল এক জায়গায় এসে মিলবে।

যে সেপাইদের কাজ তল্লাসি করা, তারা ঘরে বসে আগেই শরীরগুলো কোনোরকমে গরম করে নিয়েছিল। বাইরে বেরিয়ে এসে তারা এবার রাস্তার ওপারে অপেক্ষা করতে লাগল।

ওভারকোট আর কোটের বোতামগুলো খুলে ফেলার জন্যে তারা কয়েদীদের হুকুম করল।

তারপর দুহাত বাড়িয়ে তারা কোল পেতে দিল। গা-তল্লাসির সময় এরা কয়েদীদের সঙ্গে কোলাকুলি করবে। দুটো পাশ চাপ্‌ড়ে চাপ্‌ড়ে দেখবে। বলতে গেলে, অবিকল সকালবেলারই মত। আর বাড়িতে যখন এসেই পড়েছে, তখন আর জামার বোতাম খুলতে তত ভয় নেই।

বলবার সময় ওরা সবাই বলত,—বাড়ি যাচ্ছি।

তারা দিনের বেলায় অন্য কোনো বাড়ির কথা ভাববার সময় পেত না।

লাইনের ও-মুড়োয় যারা ছিল, তাদের তল্লাসি হয়ে যেতেই শুখভ তাড়াতাড়ি ৎসেজারের কাছে গিয়ে বলল,—ৎসেজার মার্কোভিচ! এখান থেকে এক ছুটে আমি পার্সেল-ঘরে চলে যাব। লাইনে তোমার হয়ে জায়গা রাখব।

ৎসেজারের গোঁফজোড়া যেন কালো পাথরে খোদাই করা; ওপরের দিকটা শাদা শাদা হয়ে এসেছে। ৎসেজার শুখভের দিকে ফিরে বলল,—তুমি আবার জায়গা রাখতে যাবে কেন, ইভান দেনিসিচ? হয়ত দেখব কোনো পার্সেলই আসে নি।

—যদি না আসে—তাতেই বা কী? আমি দশ মিনিট দাঁড়াব, তার মধ্যে তুমি এলে তো ভাল—নইলে আমি ব্যারাকে চলে যাব।

শুখভ মনে মনে এঁচে নিল—ৎসেজার যদি এসে না পোঁছোয়, শেষ পর্যন্ত লাইনে তার জায়গাটা হয়ত সে আর কাউকে বেচে দিতে পারবে।

মনে হল ৎসেজার তার পার্সেলের জন্যে মুখিয়ে আছে।

—আচ্ছা, সেই ভাল—ইভান দেনিসিচ! তুমি ছুটে চলে গিয়ে লাইনে জায়গা রেখো। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে হবে না, দশ মিনিট।

তল্লাসি সামনে থেকে হয়ে হয়ে আসছে। এর পরই শুখভের পালা পড়বে। আজ শুখভ একেবারে ঝাড়া হাত-পা—আজ আর ওর লুকনো-চুরনো কোনো ব্যাপার নেই। কাজেই শুখভ বুক ঠুকে এগিয়ে যেতে পারবে। শুখভ আস্তে আস্তে ওভারকোটের

বোতাম খুলল, তারপর নীচের জামাটা থেকে ক্যানভাসের কাসিটা আলগা করল।

শুখভ জানে তার কাছে কোনো রকম নিষিদ্ধ জিনিস নেই। কিন্তু তা হলেও এই আট বছরে সাবধান হওয়াটা তার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেছে। প্যান্টের হাঁটুর পকেটে যে কিছু নেই, এটা জেনেশুনে প্রমাণ করবার জন্যেই শুখভ তার হাতটা পকেটের ভেতর চালিয়ে দিল।

কী সর্বনাশ! ঠক্ করে তার হাতে লাগল ছোট্ট একটা ইস্পাতের ফলা। সেই যে সেই ইস্পাতের ভাঙা ফলাটা, যেটা সে কাজের জায়গায় কুড়িয়ে পেয়েছিল। কোনো জিনিস ফেলে না দিয়ে জমানো তার স্বভাব। তাই বলে ওটাকে ক্যাম্পে আনবার কোনো ইচ্ছে আদৌ তার ছিল না।

আনবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু এনে যখন ফেলেছে তখন আর ওটা ফেলে দিতে ওর মন উঠল না। এটাও ঠিক, ভাল করে ধার দিয়ে নিতে পারলে ওটা দিয়ে জুতো সেলাইয়ের কাজ কিংবা দর্জির কাজ করা যাবে।

ক্যাম্পে নিয়ে আসার মতলবটা ও যদি আগে থেকে করত, তাহলে লুকোবারও একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় করে ফেলতে পারত। কিন্তু এখন আর তার সময় নেই। এখন শুখভের সামনে আর মাত্র দু-সার লোক। তার মধ্যে প্রথমটার ডাক পড়েছে; তারা আলাদা হয়ে গিয়ে এগিয়েও গেছে।

শুখভ কী করবে না করবে এক নিমেষে ঠিক করে ফেলতে হবে। দুটোর একটা সে করতে পারে। সামনের লোকেরা আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। এই বেলা বরফের ওপর জিনিসটা সে ফেলে দিতে পারে; পরে এক সময় কুড়িয়ে নিলেই হবে—কেউ জানবেও না কার জিনিস। অথবা জিনিসটা নিজের কাছে রেখে কপাল ঠুকে একবার সে দেখতে পারে।

ওটাকে ওরা ছুরি বলে ধরলে শুখভের দশ দিনের সেল-সাজা হয়ে যেতে পারে।

কিন্তু মুচির বাটালি হলে রোজগার হবে, রুটি মিলবে।

লোহার ফলাটা ফেলে দিতে সে চায় না।

অতএব শুখভ ওটাকে ওর সুতির হাতমোজার মধ্যে চালান করে দিল।

আর ঠিক তৎক্ষণাৎ তল্লাসির জন্যে পরের পাঁচজনের ডাক পড়ল।

এবার সোজাসুজি আলোর মুখোমুখি হয়ে দাঁড়াল তিনজন: সেন্‌কা, শুখভ আর ৩২নং ব্রিগেডের সেই ছোকরাটি, মোল্‌দাভিয়ার লোকটাকে খুঁজে আনার জন্যে যাকে পাঠানো হয়েছিল।

শুখভদের সারিতে লোক মোটে তিনজন আর পাহারাদার আছে পাঁচজন, কাজেই শুখভ একটা চাল চেলে দেখতে পারে—কোন্ পাহারাদারের কাছে গেলে শুখভ ধরা পড়বে না, এটা সে ঠিক করে নিতে পারে। লালমুখো ছোকরা সেপাইটার চেয়ে বরং পাকা গোঁফ-অলা বুড়োটাই ভাল। বুড়োটা অবশ্য পাকা ঝানু; ইচ্ছে করলে অতি সহজেই গ্যাঁক্ করে ধরে ফেলতে পারে। কিন্তু ওর বয়েস হয়ে গেছে; চোখ বুঁজে বলে দেওয়া যায়, নিজের পেশার ওপর ওর ঘেন্না ধরে গেছে—চাকরিটা ওর কাছে এখন নরকভোগের সামিল।

ততক্ষণে শুখভ তার হাতমোজা দুটো খুলে ফেলেছে। একটাতে লোহার ফলা, আরেকটা খালি। দুটোই সে এক হাতে ধরে রাখল। খালি হাতমোজাটা সামনে বাড়িয়ে দিয়ে সেই হাতেই দড়ির বেল্টটা ধরে নীচের জামাটা পুরোপুরিভাবে আলগা করে ফেলল। তারপর যো হুকুম ভাব করে ওভারকোট আর কোট দুটোই উঁচু করে তুলে ধরল। আগে কোনোদিনই তল্লাসির ব্যাপারে শুখভের অতটা অনুগত ভাব দেখা যায়নি। কিন্তু আজ

সে দেখাতে চাইছে—বহুৎ আচ্ছা! তল্লাশি করতে চাও, করো! শুখভের মধ্যে কোনো ঢাক-ঢাক গুড়গুড় নেই। তল্লাসির ডাক পড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুখভ পাকা গোঁফঅলা লোকটার কাছে চলে গেল।

বুড়ো সেপাই শুখভের দুটো পাশ একবার চাপড়ে নিল, তারপর থাবড়া মেরে হাঁটুর পকেটটা দেখে নিল। নেই কিছু। ভেতরের জামা আর ওভারকোটের পাশগুলো টিপে টিপে দেখল। নেই কিছু। শুখভকে ছেড়ে দেবার আগে ভাল করে দেখে নেবার জন্যে সামনে এগিয়ে দেওয়া একটা হাতমোজা বুড়ো সেপাই টিপে টিপে দেখতে লাগল। বাড়ানো হাতমোজাটা ছিল খালি।

বুড়ো সেপাই এমনভাবে হাতমোজাটা চেপে ধরল যে, শুখভের মনে হল যেন সাঁড়াশি দিয়ে কেউ তার কল্‌জেটা মুচ্‌ড়ে দিচ্ছে। দ্বিতীয় হাতমোজাটা অমনিভাবে ধরলে আর শুখভকে দেখতে হবে না। কেউ আটকাতে পারবে না নির্জন কারাবাস। দিনে পাঁচ ছটাক খোরাক। গরম গরম মিলবে দুদিন ছেড়ে একদিন। সঙ্গে সঙ্গে শুখভ মনশ্চক্ষে দেখতে পেল কি রকম কাহিল হয়ে পড়েছে সে, ক্ষিধেয় পেট পিঠ এক হয়ে গেছে, আর এখনকার না-আহার না-অনাহার অবস্থায় ফিরে আসতে তাকে কী কষ্টই না করতে হচ্ছে।

তখন ঠিক সেই মুহূর্তে সত্যিকার আবেগে তার অন্তরে উচ্চারিত হল প্রার্থনা : হে দয়াময়, আমাকে রক্ষা করো। তুমি দেখো, যেন আমাকে নির্জন কারাবাসে যেতে না হয়।

বুড়ো সেপাইয়ের প্রথম হাতমোজাটা স্পর্শ করা আর তারপর দ্বিতীয় হাতমোজাটার দিকে হাত বাড়িয়ে দেওয়া -এই এক মুহূর্ত সময়ের মধ্যে এতগুলো কথা হুড়মুড় করে শুখভের মনের ভেতর খেলে গেল। শুখভ যদি হাতমোজা দুটো একসঙ্গে বাড়িয়ে না দিত, যদি সে একটা একটা করে সামনে রাখত -তাহলে বুড়ো সেপাই দুটো মোজাই একসঙ্গে চেপে ধরত। কিন্তু ঠিক সেই সময় উচ্চগ্রামে একজনের গলা পাওয়া গেল। গা-তল্লাসির ব্যাপারে যে কর্তাব্যক্তি, সে কন্‌ভয়-গার্ডদের ডেকে বলছিল,—কই, দেরি করছ কেন? মেশিন কারখানার লোকদের আনো।

শুখভের দ্বিতীয় হাতমোজাটা শেষ পর্যন্ত আর দেখা হল না। পাকা গোঁফঅলা সেপাই এমনভাবে হাত নাড়ল, যার মানে হচ্ছে, কেটে পড়ো, ভাগো হিঁয়াসে। ওর হাত থেকে শুখভ ছাড়া পেল।

দলের লোকদের ধরে ফেলার জন্যে শুখভকে ছুটতে হল। ওরা সব পাঁচজন-পাঁচজন করে ইতমধ্যেই খুঁটির বেড়া-দেওয়া গোহাটা গোছের লম্বালম্বি দুটো ঘেরা জায়গায় লাইনবন্দী হয়ে দাঁড়িয়েছে—জায়গাটা যেন কয়েদী রাখার খোঁয়াড়। শুখভ এত জোরে ছুটল যে, তার মনে হল না তার পায়ের নীচে মাটি আছে। দাঁড়িয়ে ভগবানকে যে একটু ধন্যবাদ দিয়ে নেবে, সে সময়টুকুও শুখভ পেল না। আর তাছাড়া এখন ধন্যবাদ দেবার ঠেকাটাই বা কী!

যে কন্‌ভয়-গার্ডরা শুখভদের পাহারা দিয়ে নিয়ে এসেছে, তারা একপাশে সরে দাঁড়াল—মেশিন কারখানার লোকদের নিয়ে যে গার্ডরা এসেছে তারা যাতে এগিয়ে আসতে পারে। যারা একপাশে সরে গেল, তারা তাদের দলপতির জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। তল্লাসির আগে কাঠকুটোর যে বাণ্ডিলগুলো তারা ফেলে দিয়েছিল, নিজেদের ব্যবহারের জন্যে সেগুলো মাটি থেকে কুড়িয়ে হাতে নিল। তল্লাসির সময় যে কাঠকুঠোগুলো নিয়ে নেওয়া হয়েছিল, সেগুলো গুমটিঘরের কাছে স্তূপাকার করে রেখে দেওয়া হল।

চাঁদ গুটি গুটি করে আরও উঁচুতে উঠল। রাত্তিরটা ধবধবে সাদা—আর তেমনি কন্‌কনে ঠাণ্ডা।

কন্‌ভয়-গার্ডদের কর্তা গুমটিঘরে গেল ৪৬৩-র হিসেব-মেলানো জমার রসিদ আনতে। সেখানে ভল্‌কোভোইয়ের সহকারী প্রীয়াখভের সঙ্গে তার কী কথা হল।

প্রীয়াখভ হাঁকল,—ক—৪৬০!

মোল্‌দাভিয়ার সেই লোকটি দঙ্গলের ভেতর নিজেকে এতক্ষণ আড়াল করে রেখেছিল, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে ডানদিকের বেড়ার ধারে চলে এল। তখনও সে তেমনি মাথা হেঁট করে ঘাড় গুঁজে রয়েছে।

প্রীয়াখভ ওকে হাত দিয়ে দেখিয়ে ঘুরে আসবার ইসারা করে বলল,—চলে এসো এখানে।

মোল্‌দাভিয়ার লোকটি বেড়া-দেওয়া গণ্ডী ঘুরে সেখানে গেল। তার ওপর হুকুম হল হাতদুটো পিছমোড়া করে ধরে দাঁড়াবার। তার মানে, পালাবার চেষ্টার অভিযোগে ওকে সোপর্দ করা হবে। নির্জন কুঠ্‌রিতে এখন ও আটক থাকবে।

খোঁয়াড়টা ছাড়িয়ে ডাইনে বাঁয়ে দুদিকের গেটে দুজন পাহারাদার। তিন মানুষ সমান উঁচু গেট আস্তে আস্তে ফাঁক হচ্ছিল। এই সময় হুকুম হল,—পাঁচজন পাঁচজন করে গুণে নাও। এখন আর 'গেট থেকে হটো' বলে চিৎকার করার কোনো প্রয়োজন নেই—কেননা গেট খুললেই এখন ক্যাম্পের অন্দরমহল। ভেতর থেকে কয়েদীরা এখন দল বেঁধে ছেঁকে ধরলেও গেট ভেঙে পালাতে পারবে না।

—এক! দুই! তিন!

ক্যাম্পের গেট দিয়ে ঢুকবার সময় সন্ধ্যেবেলার এই গণ্‌তিতেই কয়েদীদের সবচেয়ে বেশী ভোগান্তি; কন্‌কনে ঠাণ্ডায় হাওয়ার মধ্যে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে দিনের এই সময়টাতেই তাদের সবচেয়ে বেশী ক্ষিধেয় ভোচকানি লাগে। সন্ধ্যের খাওয়া বলতে পাতলা একহাতা বাঁধাকপির গরম সুরুয়া; কিন্তু তার জন্যে চাতক পাখির মত তারা হাপিত্যেশে চেয়ে থাকে। বাটিটা তারা এক চুমুকে শেষ করে। সেই মুহূর্তে তাদের কাছে ঐ একটি হাতার মূল্য খালাস পাওয়ার চেয়েও বেশী বলে মনে হয়; যে জীবন তারা যাপন করেছে আর যে জীবন তারা যাপন করবে—তার চেয়েও ঢের বেশী মূল্যবান বলে বোধ হয় ঐ এক হাতা সুরুয়া।

লড়াই করে ফেরা সৈন্যসামন্তদের মত কয়েদীরা চড়া গলায় চড়া মেজাজে গটমট করে ক্যাম্পে ঢোকে। সামনেওয়ালা ভাগো!

কোতোয়ালি ব্যারাকে যে ভেড়ের ভেড়েরা হাল্‌কা কাজ নিয়ে আছে, বাঁধভাঙা ঢেউয়ের মত কয়েদীদের আসতে দেখে ভয়ে তাদের আত্মারাম খাঁচাছাড়া হয়।

ভোর সাড়ে ছ'টায় ফাইলে দাঁড়াবার ঘণ্টা বাজা থেকে শুরু করে সন্ধ্যেবেলার শেষ গণ্‌তি—সারা দিনের এই দীর্ঘ সময়ের পর কয়েদীরা এই প্রথম একটু হাফ ছেড়ে বাঁচে। এলাকার বড় গেটগুলো পেরিয়ে মধ্যবর্তী ছোট ছোট গেট, তার ভেতর দিয়ে ঢুকে ফাইলে দাঁড়াবার হাতাটা পার হওয়া। ব্যস, এরপর তুমি যেখানে খুশি চলে যেতে পারো।

তুমি যেতে পারো, কিন্তু কর্মবণ্টন বিভাগের মুন্সীরা ফোরম্যানদের খপ্‌ করে ধরে ফেলল,—যারা ফোরম্যান, তারা সব উৎপাদন পরিকল্পনা দপ্তরে চলে যাও।

সাজা দেবার জায়গাটা পার হয়ে দুপাশের আস্তানাগুলোর ভেতর দিয়ে শুখভ

ছুটতে ছুটতে পার্সেলঘরের দিকে গেল। আর ৎসেজার গেল উল্টোদিকে যেখানে গিজ্‌গিজ করছে লোকের ভিড়। ৎসেজারের চলার মধ্যে ছিল একটা মন্থর রাশভারী ভাব। সেখানে খুঁটির গায়ে পেরেক-মারা একটা প্লাইউডের বোর্ড। তার গায়ে পেন্সিলে লেখা যাদের যাদের পার্সেল এসেছে তাদের নাম—সে লেখা মুছলে ওঠে না।

কাগজে লেখার রেওয়াজ ক্যাম্পে নেই বললেই চলে। প্লাইউডের ওপরই বেশির ভাগ লেখা হয়। বোর্ডের ওপর লিখলে তবেই সে লেখা ঢের বেশী পাকা এবং ঢের বেশী মজবুত আর জোরালো হল বলে ওরা মনে করে। খাতাঞ্চি আর গার্ডের দল সব সময়ই বোর্ডের ওপর হিসেবপত্র লেখাজোখা করে। পরের দিনই চেঁছে তুলে ফেলে তাতে আবার নতুন করে লেখে। এর নাম পয়সা বাঁচানো।

যে কয়েদীরা দিনের বেলায় ক্যাম্পে থাকে, তারা এই সময় খানিকটা রোজগার করে নিতে পারে। বোর্ডে কার কার নাম উঠেছে তারা দেখে রাখে; তারপর সন্ধ্যেবেলায় সেই সেই লোক কাজ থেকে ফেরামাত্র গুণ্‌তি হওয়ার জায়গায় ভিড়ের মধ্যে থেকে খুঁজে বার করে কার পার্সেলের কত নম্বর বলে দেয়। তাতে খুব একটা কিছু হয় না। তবে কম্‌সে কম একটা সিগারেট তো পাওয়া যায়।

শুখভ পার্সেলঘরে ছুটে গেল। ঠিক ঘর বলা যায় না, ব্যারাকের লাগোয়া বড় দালানবিশেষ—মাথার ওপরটা ছাওয়া। বন্ধ করবার মত দরজা না থাকায়, দালানটাতে অবাধে ঠাণ্ডা ঢোকে। বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার চেয়ে বরং দালানে অপেক্ষা করা ভাল। তবু যা হোক মাথার ওপর চাল আছে।

দালানের ভেতর দেয়াল বরাবর লাইন দাঁড়িয়ে গেছে। সেই লাইনে গিয়ে শুখভ দাঁড়াল। শুখভের ঠাঁই হয়েছে পনেরো জনের পর। তার মানে, লাইনে দাঁড়াতে হবে এক ঘণ্টার ওপর—ততক্ষণে আটটার ঘণ্টা বেজে যাবে। বিজলী স্টেশনের যে লোকগুলো আগে দেখে আসতে গেছে লিস্টিতে তাদের নাম আছে কিনা, তাদের সবাইকেই অবশ্য শুখভের পেছনে এসে দাঁড়াতে হবে—মেশিন কারখানার লোকদেরও ঐ এক দশা। অনেককেই আজ ফেরত গিয়ে কাল সকালে এসে আবার ফিরে লাইনে দাঁড়াতে হবে।

যারা লাইনে দাঁড়িয়েছে তাদের সকলের হাতেই একটা করে ব্যাগ বা থলে। ঐখানে, ঐ দরজার পেছনদিকে (এ ক্যাম্পে শুখভের কখনও কোনো পার্সেল আসেনি, তবে লোক-জনদের কথাবার্তা থেকে শুখভ যতটা যা জানতে পেরেছে) ছোট একটা কুড়ুল দিয়ে প্যাকিং বাক্স খোলা হয়; পাহারাদার সেপাই বাক্সের ভেতরকার জিনিসগুলো বার করে ফেলে কোন্‌টা কোন্‌ জিনিস খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নেয়। কখনও তারা বাক্স কাটে, কখনও ভাঙে, কখনও বা হাত ঢুকিয়ে জিনিস বার করে আনে। যদি তরল পদার্থ হয়, তাহলে গেলাস বা ধাতুর পাত্রে সে জিনিস কোনো কয়েদীকে দেওয়া হবে না। গার্ডরা বোতল কাত করে ঢেলে দেবে আর তুমি যদি ভাল বোঝো তো হয় আঁজলা ভরে নেবে, নয়ত তাতে তোয়ালে বা কাপড় ভিজিয়ে নেবে। মরে গেলেও ওরা তোমাকে ধাতুর তৈরি বাসন দেবে না। বাড়ি থেকে পিঠেপুলি, মিঠাইমণ্ডা, কাবাব কিংবা মাছ—ভালমন্দ কিছু এলে ওরা তা থেকে এক খাবলা নেবে। আপত্তি করেছ কি গেছ। সংগে সংগে ওরা জোর দিয়ে বলবে, পার্সেলের ও-জিনিস বিধিবহির্ভূত। জিনিসটা ওরা কারো সামনে বারই করবে না। যারই পার্সেল আসুক, তাকে ঐ গার্ড থেকে শুরু করে একের পর এক সমানে কেবল দিয়ে যেতে হবে। পার্সেল পরীক্ষা হয়ে যাবার পর পার্সেলের বাক্সটা কিন্তু ওরা কয়েদীদের

দেবে না। প্রত্যেকটা জিনিস খোলা অবস্থায় হয় থলিতে পোরো, নইলে এমনকি ওভার-কোটের কোঁচড়ের মধ্যেও নিয়ে নিতে পারো। যার যার নেওয়া হয়ে গেছে তারা সরে পড়ো। তারপরে কে আছো! তারপর? ওরা এমন তাড়াহুড়ো লাগিয়ে দেবে যে, কয়েদীদের মধ্যে কেউ কেউ চলে যাবার সময় তাড়াতাড়িতে দুটো একটা জিনিস ভুলে ফেলে যাবে। পরে গিয়ে আর খোঁজ করার কোনো মানে হয় না। ততক্ষণে সে জিনিস হাওয়া।

উস্‌ৎ-ইঝ্‌মাতে থাকার সময় বাড়ি থেকে শুখভের খান দুই পার্সেল এসেছিল। পার্সেল পাওয়ার পর শুখভ তার স্ত্রীকে লিখে জানিয়েছিল ওসব পাঠানোর কোনো মানে হয় না। বলেছিল,—ওসব পাঠিও না আমাকে। সন্তানদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিও না।

যদিও শুখভ দেখেছে যে, বন্দীশালায় কোনরকমে একার পেট চালানোর চেয়ে বরং বাইরে স্ত্রীপুত্রপরিবারের গ্রাসাচ্ছাদানের ব্যবস্থা করা তার পক্ষে ঢের সহজ ছিল—তাহলেও সে ভালমতই জানত ওসব পার্সেল পাঠাতে কী পরিমাণ খরচ হয়। দশ বছর ধরে সংসারকে শুষে এই খরচ টানা সম্ভব নয়। তার চেয়ে ঢের ভাল বিনা পার্সেলে চালানো।

কিন্তু মনে মনে শুখভ যতই ঠিক করুক, আজও যখনই ব্যারাকে বা ব্রিগেডে আশ-পাশের কারো পার্সেল আসে—প্রায় রোজই কারো না কারো আসে—শুখভের কোনো পার্সেল আসে না বলে মন খারাপ হয়ে যায়। শুখভ যদিও স্ত্রীকে পই পই করে বারণ করে দিয়েছে যেন ঈস্টারের সময়ও তাকে কিছু পাঠানো না হয় এবং যদিও ব্রিগেডের কোনো শাঁসালো মক্কেলের পক্ষ থেকে ছাড়া শুখভ কখনও পার্সেল-প্রাপকদের নামের লিস্টি দেখতে যায় না—তাহলেও প্রায়ই শুখভ মনে মনে ভাবে—ইস্‌, কেউ যদি এখন ছুটে এসে তাকে খবর দিত,—একি শুখভ, হাঁ করে এখনও তুমি এখানে দাঁড়িয়ে? ওদিকে তোমার পার্সেল এসে পড়ে আছে।

কিন্তু হায় কপাল, কেউই কোনোদিন ছুটে আসে না।

তেমগেনিভোর কথা কিংবা নিজের ভিটেবাটিটা মনে পড়ে যাবার কারণগুলো দিন দিন কমে কমে আসছে। সকাল থেকে রাত্তির অবধি জেলের জীবন শুখভকে কুরে কুরে খাচ্ছে। বসে বসে স্মৃতির জাবর কাটবার তার সময় কোথায়?

শুখভের আশপাশে যারা, তারা সকলেই এখন লাইনে দাঁড়িয়ে মশগুল হয়ে ভাবছে কে কি রকম আরামে শুয়োরের মাংসে প্রথম কামড়টা বসাবে, কিংবা রুটির ওপর কে কিভাবে মাখন মাখাবে, কিংবা চায়ের মগে কে কতটা চিনি মেশাবে। আর তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে শুখভের মাথায় তখন একটিমাত্র চিন্তা—ব্রিগেডের লোকজনদের সঙ্গে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে কতক্ষণে খেতে পারবে পাতলা সুরুয়া—খেতে হবে গরম গরম। ঠাণ্ডায় আর গরমে তফাত অনেক। যদি জুড়িয়ে যায় তাহলে কিন্তু অর্ধেক স্বাদ চলে যাবে।

শুখভ মনে মনে একবার খতিয়ে নিল : ৎসেজার যদি দেখে থাকে লিস্টিতে তার নাম নেই, তাহলে অনেক আগেই সে হাতমুখ ধোওয়ার জন্যে ব্যারাকে চলে গেছে। আর যদি দেখে থাকে নাম রয়েছে, তাহলে এতক্ষণে থলি, মগ আর এটা-সেটা জোটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। শুখভ সেই কারণেই বলেছিল দশ মিনিট অপেক্ষা করবে।

লাইনে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে শুখভ কতকগুলো খবর শুনতে পেল। এই রবিবার কয়েদীদের কাজে যেতে হবে। তাহলে আবারও একটা রবিবার মাঠে মারা যাচ্ছে। এমন যে হবে শুখভ আগেই ভেবেছিল। ব্যাপারটা কারো কাছেই খুব অপ্রত্যাশিত নয়। মাসে যদি পাঁচটা রবিবার পড়ে, তাহলে কয়েদীদের তিনটে দিয়ে বাকি দুটো রবিবার ওরা

কয়েদীদের নাকে দড়ি দিয়ে খাটাতে নিয়ে যায়। কিন্তু যতই ভাবা থাক না কেন, খবরটা কানে যেতেই শুখভের সমস্ত অস্থিমজ্জা ব্যথায় মুচড়ে উঠল। অমন একটা মধুর দিন হারিয়ে কার না কান্না পায়! লাইনে দাঁড়িয়ে লোকে যেটা বলছিল সেটা অবশ্য ঠিকই। বাইরে যদি যেতে নাও হয়, তাহলেও ক্যাম্পের কর্তারা কয়েদীদের ছুটির দিনটা মাটি করে দিতে পারে। ওরা ভেবে ভেবে কাজ বার করবে। স্নানের ঘর বানাও। নয় দেয়াল তুলে গলিটা বন্ধ করে দাও। নয় উঠোনটা পরিষ্কার করো। আর নয়ত তোশকগুলো পাল্টে নাও, ধুলো ঝেড়ে নাও কিংবা বাঙ্কে ছারপোকা হয়েছে মারো। নয়ত বলবে সবাই ফাইলে দাঁড়িয়ে যাও, যার যার ফটোর সঙ্গে চেহারা মিলিয়ে মিলিয়ে গোণা হবে। নয়ত কার কার কাছে কী কী জিনিস আছে তার ফিরিস্তি তৈরি করা। তার মানে, পোঁটলাপুঁটলি ঘাড়ে করে বাইরে যাওয়া আর তারপর দিনের অর্ধেক উঠোনে বসে থাকা।

সকালের খাওয়ার পর কোনো কয়েদী বিছানায় একটু লম্বা হবে, কর্তাদের কাছে এ অসহ্য।

লাইন খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছিল। এমন সময় একদল লোক ঢুকে পড়ে কাউকে না বলে কয়ে নিঃশব্দে কনুই দিয়ে ঠেলে বেমক্কা লাইনের সামনে এসে দাঁড়িয়ে গেল। তার মধ্যে একজন ক্ষৌরকার, একজন খাতাঞ্চি আর একজন ছিল শিক্ষাসংস্কৃতি বিভাগের কর্মী। ওরা কেউই নীচের তলার লোক নয়। ক্যাম্পের ভেতরে খুচ্‌খাচ্‌ কাজ করা যত সব বাস্তুঘুঘু। পয়লানম্বরের হারামী। মেহনত-করা কয়েদীদের কাছে ওরা ছিল গুয়েরও অধম। তেমনি ওরাও এইসব কয়েদীদের হুবহু অমনি চোখে দেখত। কিন্তু ওদের সঙ্গে কোঁদল করা বৃথা। বাস্তুঘুঘুদের নিজস্ব একটা ঘোঁট আছে আর সেইসঙ্গে পাহারাদারদের সঙ্গেও ওদের খুব খাতির।

শুখভের সামনে এখন দশজন লোক আর পেছনে আছে সাতজন। ঠিক সেই সময় দরজা দিয়ে ৎসেজারকে ঢুকতে দেখা গেল—মাথায় তার নতুন একটা ফারের টুপি। টুপিটা জেলের বাইরে থেকে কেউ পাঠিয়েছে।

দেখ, কী একখানা টুপি। চকচকে ঝকঝকে একদম আনকোরা শহুরে। ৎসেজার কি আর অমনি অমনি ওটা পেয়েছে? একজন না একজনকে ঘুষ দিতে হয়েছে। অন্যদের তো বেশির ভাগের কাছ থেকেই ছেঁড়াখোঁড়া পুরনো ফৌজী টুপি পর্যন্ত কেড়ে নিয়ে তার বদলে ওরা দিয়েছে শুয়োরের চামড়ায় তৈরি জেলখানার টুপি।

শুখভের দিকে তাকিয়ে ৎসেজার মৃদু হাসল। চশমা-পরা একজন অদ্ভুত ধরনের লোক লাইনে দাঁড়িয়ে খবরের কাগজ পড়ছিল।

ৎসেজার তাকে দেখে ঝাঁপিয়ে পড়ল,—আরে, পীতর মিখাইলিচ যে! কী খবর!

একেবারে দুই মাণিকজোড়। মিলেছে ভাল। সেই অদ্ভুত ধরনের লোকটা বলল, —কী পেয়েছি দেখ! টাটকা নতুন একটা সান্ধ্য মস্কো পত্রিকা। ডাকে এসেছে।

—আরে, সত্যিই তো। বলে ৎসেজারও কাগজটা নাকের কাছে ধরল। মিটমিট করছে সিলিঙে ঝোলানো বাতি। এত কম আলোয় অমন ক্ষুদে ক্ষুদে হরফ ওরা পড়ছে কী করে?

—জাভাদ্‌স্কির উদ্বোধন-রজনী সম্পর্কে চমৎকার একটা লেখা বেরিয়েছে।

মস্কোর লোকদের সব কুকুরের মত নাক। দূর থেকে পরস্পরের গন্ধ পায়। যখন কারো সঙ্গে কারো দেখা হয় অমনি শুরু হয়ে যায় ওদের ঐ এক ধরনের গা শোঁকাশুঁকি।

আর এক নিশ্বাসে হড়বড় হড়বড় করে কে কত কথা বলে যেতে পারে—এই নিয়ে ওরা পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেয়। আর যখন ওরা বকবক করতে শুরু করে দেয় তখন খুব কম খাঁটি রুশ কথা কানে আসে। শুনে মনে হবে ওরা যেন লাতভিয়ান বা রুমানী ভাষায় কথা বলছে।

যাই হোক, ৎসেজার থলিটলি জুটিয়ে এনেছে।

শুখভ ফোকলা দাঁতে অস্পষ্ট উচ্চারণে বলল,—তাহলে আমি...ৎসেজার মার্কোভিচ ...এখন আমি যেতে পারি?

ৎসেজার খবরের কাগজের আড়াল থেকে কালো গোঁফজোড়া বার করে বলল,—হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়, নিশ্চয়। আচ্ছা, একটু বলে দাও তো কে আমার আগে আর কে আমার পরে।

কে আগে এসেছে, কে পরে এসেছে সব বুঝিয়ে টুঝিয়ে দেবার পর শুখভ রাতের খাবারের কথা আপনা থেকে মনে পড়বার আগেই ৎসেজারকে মনে করিয়ে দিল,—তোমার খাবারটা কি পেঁাছে দেব?

তার মানে, মেসের টিনের পাত্রে করে মেসবাড়ি থেকে ব্যারাকে বয়ে নিয়ে যাওয়া। খাওয়ার জায়গা থেকে বাইরে খাবার নিয়ে যাওয়া নিয়মবিরুদ্ধ—এ বিষয়ে আইনের আরও অনেক রকম ফ্যাচাং আছে। নিয়ে যেতে গিয়ে যদি ধরা পড়ো, তাহলে খাবারটা মাটিতে ফেলে দেওয়া হবে এবং নির্জন কারাবাস ভোগ করতে হবে। কিন্তু হলে কি হবে, কয়েদীরা বাইরে ঠিক খাবার নিয়ে যায় এবং নিয়ে যাবেও—কারণ, কারো যদি কোনো দরকার পড়ে তাহলে তার পক্ষে নিজের ব্রিগেডের সঙ্গে খাওয়ার জায়গায় গিয়ে পেঁাছুনো সম্ভব হয়ে ওঠে না।

শুখভ খাবার আনার ব্যাপারে মুখে জিজ্ঞেস করল বটে, কিন্তু মনে মনে বলল : তুমি কি বাবা, এতই কঞ্জুস হবে? তোমার রাতের খাবারটা আমাকে দেবে না? খাবার তো ভারি! লপ্‌সিও নয়, সুধু জলের মত পাতলা সুরুয়া।

ৎসেজার ঠোঁটের কোণে হেসে বলল,—না, না! ও তুমিই খেয়ে নিও, ইভান দেনিসিচ।

শুখভও এতক্ষণ তাই চাইছিল। খাঁচাখোলা পাখির মত শুখভ সাঁ করে দালানটা থেকে উড়ে বেরিয়ে গেল—ক্যাম্পের ভেতর দিয়ে ভেতর দিয়ে ছুটতে লাগল।

কয়েদীরা চতুর্দিক থেকে আসছিল। ক্যাম্পের কর্তা এই বলে একবার এক ফতোয়া দিয়েছিল যে, কোনো কয়েদী কোনো সময় ক্যাম্পের মধ্যে একা একা ঘুরে বেড়াবে না। যেখানে যেখানে সম্ভব পুরো ব্রিগেড সার বেঁধে একসঙ্গে যাবে। যেখানে সকলের এক-সঙ্গে একই সময়ে যাওয়া সম্ভব নয়—যেমন হাসপাতালে বা পায়খানায়—সেখানে যাবে ভারপ্রাপ্ত একজন লোকের অধীনে চার পাঁচজনের একটি করে দল! সার বেঁধে তাদের নিয়ে যাওয়া এবং নিয়ে আসা হবে।

ক্যাম্পের কর্তার এটা ছিল ভারি জবরদস্ত হুকুম। কারো ঘাড়ে এত মাথা ছিল না যে, তার কথার ওপর কথা বলে। পাহারাআলারা কয়েদীদের একা পেলেই ধরত; ধরে নম্বর লিখে নিয়ে সেলে চালান করে দিত। তবু কিন্তু শেষ পর্যন্ত সব ভেস্তে গেল। আগেকার এমনি হৈচৈ করে চালু করা অনেক হুকুমের মতই এ হুকুমটাও নিঃসাড়ে অকেজো হয়ে পড়ল। যেমন মনে করো, একজনকে তলব করা হল নিরাপত্তা বিভাগে—তখন তো আর তুমি চার-পাঁচজনের পুরো একটা দল পাঠাবে না! কিংবা ধরো, তুমি পার্সেলঘরে যাবে তোমার খাবারদাবার আনতে—আমার কী দায় পড়েছে যে আমি তোমার সঙ্গে যাব!

যে লোকটা শিক্ষাসংস্কৃতি দপ্তরে কাগজ পড়তে যাবে, অন্য কার এমন ভূতে ধরেছে যে তার সঙ্গে যাবে? কিংবা এ যাবে জুতো সারাতে, ও যাবে শুখা-ঘরে, আরেকজন হয়ত যাবে শুধু এ-ব্যারাক থেকে ও-ব্যারাকে—যদিও এক ব্যারাক থেকে অন্য ব্যারাকে যাওয়া তার চেয়েও বেশী রকম বেআইনী। তাহলেও, এত লোককে কী করে তুমি আটকাচ্ছ?

ঐ এক হুকুমে ক্যাম্পের কর্তা চেয়েছিল কয়েদীদের শেষ একফোঁটা স্বাধীনতাও কেড়ে নিতে। কিন্তু এ'টে উঠতে পারে নি শালার বেটা শালা ঐ বুড়ো পেটমোটা।

ব্যারাকের দিকে যাবার পথে একজন সেপাইকে দেখে শুখভ টুপিটা তুলে খাতির করল। কিছু তো বলা যায় না, করে রাখা ভাল। তারপর সোজা ব্যারাকে। একটা হল্লা চলছিল। কে একজন সকালে তার বরাদ্দ রুটি রেখে গিয়েছিল, সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এসে আর পাচ্ছে না। কয়েদীরা ফালতুদের ওপর চোটপাট করছে আর ফালতুরাও কয়েদীদের ওপর চোটপাট করছে। কোণে ১০৪নং ব্রিগেডের আস্তানাটা খালি।

যেদিন ফিরে এসে দেখা যায় তোশকগুলো হ্যান্ডাব্যান্ডা হয়ে উল্‌টে নেই, ব্যারাকে খানাতল্লাসি-টল্লাসিও হয়নি—শুখভ সেদিন ভাবে আজ কার মুখ দেখে উঠেছি!

শুখভ ছুটে নিজের বাঙ্কের দিকে গেল। যেতে যেতেই গায়ের ওভারকোটটা খুলে ফেলেছিল। ওভারকোটটা সোজা বাঙ্কের ওপর ছু'ড়ে দিল। তারপর তোশকে হাত দিয়ে টিপে টিপে দেখে নিল তার পাঁউরুটির টুকরোটা আছে কিনা। যাক, আছে তাহলে। ভাগ্যিস, সেলাই করে রেখে গিয়েছিল!

তারপর বাইরে বেরিয়ে দে ছুট্। সোজা মেসবাড়ির দিকে।

রাস্তায় সেপাইদের সাক্ষাৎ সম্পর্ক এড়িয়ে শুখভ মেসবাড়িতে পে'ছিল। পথে শুধু জনা কয়েক কয়েদীর সঙ্গে তার দেখা হল। রেশনের ব্যাপারটা নিয়ে তাদের মধ্যে খুব কথা কাটাকাটি হচ্ছিল।

উঠোনে সব কিছু জ্যোৎস্নায় উদ্ভাসিত হচ্ছিল। বাতিগুলো কেমন যেন ম্লান। ব্যারাকবাড়িগুলো কালো কালো ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা চওড়া বারান্দায় উঠবার চারটে পে'ঠেযুক্ত সি'ড়ি। বারান্দাটা পেরোলেই খাবার ঘর। ওপর থেকে একটা ঝোলানো বাতি দুলতে থাকায় বারান্দাটা ঠিক এই মুহূর্তে আবছা হয়ে আছে। বাতি থেকে যে আলো বেরোচ্ছে, সেটা কতকটা রামধনু রঙের—বাষ্পে হয় বরফ পড়েছে বলে, নয় বড় বেশী ধুলোময়লা পড়েছে বলে।

আরও একটা ব্যাপারে ক্যাম্পের কর্তার কড়া হুকুম ছিল। মেসবাড়িতে কয়েদীরা যেন দুজন দুজন হয়ে সার বে'ধে ঢোকে। হুকুমনামাতে আরও বলা হয়েছিল : মেস-বাড়িতে পে'ছে ব্রিগেডের লোকজনেরা সোজা বারান্দায় উঠে না গিয়ে সি'ড়ির ঠিক নীচে গিয়ে পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়াবে। মেসবাড়ির ফাল্‌তু এসে না ডেকে নিয়ে যাওয়া অবধি তাদের অপেক্ষা করতে হবে।

মেসবাড়ির ফাল্‌তুর পদ অধিকার করে গ্যাঁট হয়ে বসে আছে ল্যাংড়া খোমোই। খোঁড়া হওয়ার অজুহাতে ও দিব্যি পঙ্গু বলে নিজেকে চালিয়ে দিয়েছে। শালা মহা হারামজাদা, একেবারে পাজীর পা-ঝাড়া। হাতে বার্চগাছের একটা চাবুক নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে; ওর বিনা হুকুমে কেউ বারান্দায় উঠতে গেলেই সপাং সপাং করে চাবুক বসিয়ে দেবে। তাই বলে সবাইকে নয়। সেদিক থেকে খুব সেয়ানা; হাড়ে হাড়ে লোক চেনে। এমনকি অন্ধকারে, এমনকি পেছন না ফিরেও ও দেখতে পায়। যারা ঠিক কিল খেয়ে

কিল চুরি করার পাত্র নয়, তাদের ও ঘাঁটায় না। যারা পড়ে পড়ে মার খায়, তাদেরই ও মারে। একদিন শুখভকেও শালা মেরে পাট করে দিয়েছিল।

ওকে বলা হত 'ফালতু'। কিন্তু একটু যদি খতিয়ে দেখ তো দেখবে, ও হল সত্যিকার নবাবপুত্তুর। যারা রসুই পাকায় তাদের সঙ্গে ওর হলায়-গলায় ভাব।

আজ হয় সব ব্রিগেডই একসঙ্গে এসে পড়েছে, নয় সব জিনিস গুছিয়ে গাছিয়ে নিতে একটু বেশী সময় লেগে গেছে। কিন্তু বারান্দাটায় বেজায় ভিড়। তার মধ্যে রয়েছে খেমোই, তার এক সাকরেদ আর মেসবাড়ির কর্তা। কোনো সেপাইশান্ত্রীর সাহায্য না নিয়ে হারামীরা নিজেরাই ভিড় সামলাচ্ছে।

মেসবাড়ির কর্তা হল এক হৃষ্টপুষ্ট আঁটকুড়োর বেটা। মাথাটা কুমড়োপটাসের মত। বিশাল বৃষস্কন্ধ চেহারা। হাত-পাগুলোতে যেন স্প্রিং লাগানো; তিড়িং তিড়িং করে এমনভাবে হাঁটে যেন গায়ে অসুরের মত শক্তি ফেটে পড়ছে। মাথায় নম্বরবিহীন সাদা ফারের টুপি। আর কারো অমন টুপি নেই—বাইরের যেসব বেসামরিক লোক এখানে কাজ করে, তাদেরও কারো অমন টুপি নেই। গায়ে মেষশাবকের চামড়ার তৈরি আঙরাখা। তাতে অবশ্য নম্বর দাগা—তবে ডাকটিকিটের মত তার সাইজ। সেটাও রাখা ভল্‌কোভোইয়ের খাতিরে। কিন্তু তার পিঠে কোনো নম্বরের বালাই নেই। মেসবাড়ির কর্তা কারো কাছে মাথা নোয়ায় না এবং কয়েদীদের কাছে সে হল সাক্ষাৎ যম। হাজার হাজার লোকের জীবনমরণ তার হাতে। একবার ওরা ওকে পেটবার উপক্রম করেছিল। কিন্তু রসুই-পাকানেওয়ালারা ঝাঁপ দিয়ে পড়ে ওকে বাঁচায়—ও-লোকগুলোও কম গুণ্ডাবদ্‌মায়েশ নয়।

১০৪ নং ব্রিগেড আগে ঢুকে পড়ে থাকলেই তো চিত্তির। খেমোই ক্যাম্পে চেনে না এমন লোক নেই। মেসবাড়ির কর্তা সঙ্গে থাকাতে কাউকে যে নিয়মবিরুদ্ধভাবে ঢুকতে দেবে, সে আশা নেই। এমনিতেই মানুষকে কষ্ট দিয়ে ও আনন্দ পায়।

কখনও কখনও খেমোইয়ের পেছনদিক দিয়ে বারান্দার রেলিং টপকানো যায়। শুখভ নিজেই কতবার টপ্‌কেছে। কিন্তু আজ তা সম্ভব নয়—খোদ্‌ মেসবাড়ির কর্তা দাঁড়িয়ে। ওর হাতে একবার পড়লে শেষে চ্যাংদোলা করে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে।

চটপট, চটপট উঠে যাও। বারান্দায় উঠে একবার দেখে নাও—দূর ছাই, সকলের গায়েই একছাঁচে ঢালা কালো ওভারকোট—দেখ তো ১০৪ নম্বর ব্রিগেডের লোকেরা আছে কিনা!

ঠিক তক্ষুণি ব্রিগেডগুলো হুড়োহুড়ি করে সামনে এগোতে শুরু করেছে। রাতের ঘণ্টা পড়বার সময় হয়ে এল। কেল্লা দখল করবার ভাব নিয়ে বাঁই বাঁই করে পয়লা, দোসরা, তেসরা, চৌঠা ধাপ পেরিয়ে গাদাখানেক লোক বারান্দার ওপর উঠে পড়ল।

খেমোই তার হাতের চাবুকটা উঁচিয়ে চিৎকার করে সামনের লোকদের বলল, —খবর্দার, খবর্দার! আঁটকুড়োর বেটারা! পিছিয়ে যা বলছি। নইলে মাথার খুলি ফাটিয়ে দেব।

সামনের লোকেরা চিৎকার করে বলল,—আমাদের কী দোষ! পেছন থেকে ঠেলছে যে।

পেছন থেকে ঠেলছিল ঠিকই। কিন্তু তাই বলে সামনের লোকেরাও যে খুব জোরের সঙ্গে ঠেকাবার চেষ্টা করছিল এমন নয়। কোনোরকমে সাঁ করে খাবারঘরে ঢুকে পড়বার

ভালোই তারা ছিল।

খেচোমোই তখন রেলের গেট বন্ধ করার ভঙ্গিতে বেতটা বুকের ওপর আড় করে ধরে সামনের লোকদের সজোরে ঠেলতে লাগল। লম্বা বেতের আরেকটা দিক ধরল খেচোমোইয়ে সাকরেদ। মেসবাড়ির কর্তাটিরও হাত লাগানোর ব্যাপারে কোনোরকম কুণ্ঠা দেখা গেল না।

ওরা দুড়দাড় করে ঠেলে পিছু হটিয়ে দিচ্ছিল। গায়ে ওদের শক্তি আছে। মাংস খায়। কয়েদীরা টলতে টলতে পিছিয়ে গেল। সামনের লোকেরা সপাটে পেছনের লোকদের ঘাড়ে পড়ে যেতে পেছনের লোকেরা কুপোকাৎ হল।

একদল লোক চিৎকার করে বলে উঠল,—তোমার গুষ্টির...খেচোমোই! দেখে নেব তোমাকে। ভিড়ের মধ্যে তাদের দেখা গেল না। বাকি সবাই মুখ বুঁজে পড়ল, তাড়াতাড়ি উঠেও পড়ল মুখ বুঁজেই। আরেকটু হলেই পায়ের তলায় ওরা পিষে যেত।

সিঁড়িটা ফাঁকা করে ফেলেছে। মেসবাড়ির কর্তা স্বস্থানে ফিরে গেছে। সিঁড়ির একেবারে ওপরের পৈঁঠেয় খেচোমোই দাঁড়িয়ে।

পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়িয়ে যা সব, গবেট কোথাকার! এক কথা রোজ বলতে হবে? সময় হলেই যেতে পাবি।

সামনের দিকে এক জায়গায় সেন্‌কা ক্লেভ্‌শিনের মত একজন রয়েছে বলে শুখভের ঠাহর হল। শুখভ তো আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে কনুই দিয়ে ঠেলেঠুলে তার কাছে যাওয়ার চেষ্টা করল। খানিকটা এগোবার পর শুখভের দম নিক্‌লে গেল। ভিড় ঠেলে অত দূর যাওয়া যাবে না।

খেচোমোই তারস্বরে চেঁচাল,—সাতাশ নম্বর! উঠে এস।

২৭নং ব্রিগেডের লোকেরা লাফাতে লাফাতে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সোজা দরজার দিকে ছুটল। বাকি লোকেরা আবার ঠেলাঠেলি করে সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার চেষ্টা করল। শুখভও প্রাণপণে ঠেলতে লাগল। বারান্দাটা থর থর করে কাঁপছে। বারান্দার মাথার ওপর বাতিটা কুঁই কুঁই করছে।

খেচোমোই রেগে খুন হল,—আবার? আবার বজ্জাতি শুরু হয়েছে? বলে সপাং সপাং করে বেত চালাতে শুরু করে দিল। কারো লাগল মাথায়, কারো পিঠে। ঠেলে ঠেলে লোকদের পিছু হটিয়ে দিল খেচোমোই। সিঁড়িটা আবার ফাঁকা হয়ে গেল।

শুখভ দেখতে পেল খেচোমোইয়ের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছে পাভ্‌লো। ব্রিগেডের লোকদের খাবারঘরে ওই নিয়ে যাবে। এই হৈ-হল্লার মধ্যে এসে তিউরিন নিজের মান খোয়াতে রাজী নয়।

পাভ্‌লো ওপর থেকে হাঁক দিল,—পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়িয়ে যাও, এক শো চার! ভাই, তোমরা ওদের একটু জায়গা দাও আসবার।

হ্যাঁ, দেখই না কেমন জায়গা দেয় বন্ধুরা।

—আমাকে যেতে দাও। আমি ঐ ব্রিগেডের লোক। শুখভ হাঁচড় পাঁচড় করতে লাগল। যারা ওর ঠিক সামনে, তারা ওকে এগিয়ে যেতে দিতে একটুও অরাজী নয়। কিন্তু লোকে চতুর্দিক থেকে ওকে চিঁড়ে চ্যাপ্টা করে রেখেছে।

ফুলে ফুলে উঠছে ভিড়। বন্ধ হয়ে আসছে নিশ্বাস। সুরুয়ার জন্যে। যে সুরুয়া তাদের ন্যায্য পাওনা।

শুভ অন্য এক পন্থা ধরল। বাঁদিকের রেলিংটা পাকড়াল। বারান্দার খুঁটিটা দুহাত দিয়ে বাগিয়ে ধরে ঝুলে পড়ল। পা দুটো আর তখন মাটিতে নেই। কার যেন হাঁটুতে ক্যাঁৎ করে লাথি মারতেই সে ওকে এক ঘুষি মেরে বাপ মা তুলে গাল দিয়ে উঠল। কিন্তু তা সত্ত্বেও শুভ এক ঝট্‌কায় নিজেকে ঠিক উঠিয়ে নিল। বারান্দার ওপরকার কার্নিশে এক পা বাধিয়ে শুভ অপেক্ষা করতে লাগল। বন্ধুবান্ধবেরা দেখতে পেয়ে ছুটে এসে হাত বাড়িয়ে শুভকে টেনে তুলল।

মেসবাড়ির কর্তা দরজার বাইরে মুখ বার করে বলল,—আচ্ছা, খোমোই—আরও দুটো ব্রিগেডকে পাঠাও।

—এক শো চার! খোমোই হেঁকে উঠল।—আরে, এই উল্লুক! বলি, উঠছিস কোথায়? অন্য একটা ব্রিগেডের লোক ঢুকে পড়তে যাচ্ছিল তার ঘাড়ে সপাং করে চাবুক পড়ল।

নিজের দলের লোকদের খাবার ঘরে ঢুকে পড়বার জন্যে পাভ্‌লো হাঁক পাড়ল,—এক শো চার!

—উ-ফ্‌! সশব্দে হাঁফ ছেড়ে শুভ খাবার ঘরে এল। পাভ্‌লোর বলাবলির অপেক্ষায় না থেকে শুভ খালি ট্রে-র ধান্ধায় ঘুরতে লেগে গেল।

রোজ যেমন হয়, খাবার ঘরের দরজা দিয়ে বাইরের ঠাণ্ডা হাওয়া গল্‌ গল্‌ করে ভেতরে ঢুকছে। কয়েদীরা টেবিলে গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি হয়ে বসেছে। দুপাশের টেবিলের মাঝখান দিয়ে কয়েদীরা ঘুরছে ফিরছে, এ ওকে ঠেলছে, কেউ বা ভর্তি ট্রে নিয়ে যাওয়া আসা করছে। এত বছর হয়ে গেল, শুভের এখন এসব সড়গড় হয়ে গেছে। শুভের চোখ আছে বলতে হবে—ঠিক দূর থেকে দেখতে পেয়েছে শচ-২০৮ ট্রের ওপর পাঁচটা বাটি বসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে; শুভ দেখেই বুঝে ফেলল ওদের ব্রিগেডের ওটাই শেষ ট্রে—কেননা তা নাহলে, বাটির সংখ্যা আরও বেশী হত।

ছুটে গিয়ে ওকে ধরে ফেলে কানের কাছে শুভ ফিসফিস করে বলল,—ভাই, তোমার হয়ে গেলে ট্রে-টা আমাকে দিও।

—একজনকে যে আগেই কথা দিয়ে ফেলেছি। জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছে সে।

—আরে রাখো। একটু দেরি করলে ওর কিছু মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না।

দুজনের মধ্যে একটা বোঝাপড়া হয়ে গেল।

লোকটা টেবিলের ওপর বাটিগুলো নামিয়ে রাখল। অমনি শুভ সাট্‌ করে ট্রে-টা নিয়ে নিল। যাকে এর আগে দেওয়া হবে বলে কথা দেওয়া হয়েছিল, সে হন্তদন্ত হয়ে এসে ট্রে-র একটা কোণ চেপে ধরল। ট্রে ধরে সে যেই না টান দেওয়া, অমনি শুভ তার দিকে ট্রে-টা ঠেলে দিতেই সামলাতে না পেরে সে পেছনে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। আর ট্রে-টা যেই তার হাতছাড়া হওয়া, অমনি সেটাকে বগলদাবা করে শুভ খাবার নেবার জানলার দিকে ছুটে গেল।

জানলার ধারে পাভ্‌লো এতক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে ছিল। ট্রে হাতে শুভকে আসতে দেখে পাভ্‌লো মহাখুশী। তার সামনে ছিল ২৭ নম্বর ব্রিগেডের সহকারী ফোরম্যান। পাভ্‌লো তাকে ঠেলা দিল,—কই, এগোতে দাও না হে! মিছিমিছি দাঁড়িয়ে কী ভেরেণ্ডা !? দেখছ না, আমার হাতে ট্রে রয়েছে!

—হ্যাদে, ঐ দেখ গপ্‌চিকও একটা ট্রে জুটিয়ে এনেছে।

গপ্‌চিক হেসে উঠে বলল,—ওরা হাঁ করে দাঁড়িয়ে ছিল, আমি ছোঁ মেরে নিয়ে চলে এসেছি।

গপ্‌চিক এরই মধ্যে হয়ে উঠেছে। পাকা ঝানু হতে ওর আর বছর তিনেক লাগবে। একবার লায়েক হতে পারলেই চড় চড় করে উঠে যাবে। কম্‌সে কম রুটি কাট্‌নেওয়ালা তো হবেই।

পাভ্‌লো দ্বিতীয় ট্রে-টা ইয়েরমোলায়েভের হাতে দিতে বলল। ইয়েরমোলায়েভের বাড়ি সাইবেরিয়ায়। বেশ ধুম্‌শো চেহারা। জার্মানদের হাতে পড়েছিল বলে ওকেও দশ বছরের সাজা খাটতে হচ্ছে। পাভ্‌লো গপ্‌চিককে ডেকে এখনি খালি হয়ে যাবে এমন একটা টেবিল দেখতে বলল। শুখভ তার ট্রে-টা খাবার নেবার জানলায় ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

পাভ্‌লো জানলার কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে জানান দিল : ব্রিগেড এক শো চার।

দেওয়া-নেওয়া করবার জানলা আছে পাঁচটা। তিনটে আছে খাবার দেওয়ার জন্যে, একটা জানলা আছে রুগীদের বিশেষ রকমের পথ্য যোগানোর জন্যে (যে দশজনের পেটে ঘা, এবং তাছাড়া হিসেবপত্র বিভাগের খাতাঞ্চিরা কলকাঠি নাড়ার গুণে, একই খাবার পায়) আর শেষটাতে হয় এঁটো বাসন চালাচালি। শেষের জানলাটায় এঁটো চাটার জন্যে লোকে কামড়া-কামড়ি করে। জানলা বলতে নীচু নীচু ছোট খোঁদল—কোমরের চেয়ে একটু উঁচুতে। রান্নার লোকদের মুখ দেখা যায় না; শুধু ওদের হাত আর হাতাগুলো নড়তে দেখা যায়।

রান্নার এই লোকটার হাত দুটো চিকণ-চাকণ, ধবধবে সাদা থাবা দুটো বাঘা বাঘা আর লোম বেশী। রান্না করার চেয়ে মুষ্টিযোদ্ধা হলেই মানাত ভাল। পেন্সিল হাতে নিয়ে দেয়ালে টাঙানো একটুকরো কাগজে ও টুকে নিচ্ছিল : এক শো চার—২৪!

পান্তেলেয়েভ খোঁড়াতে খোঁড়াতে খাবার ঘরে ঢুকল। বেটা ভান করছে। আসলে ওর কিসু হয় নি।

রান্নার লোকটি একটা দু-সেরী হাতা কড়াইয়ে ডুবিয়ে ঘটাং-ঘট্ ঘটাং-ঘট্ ঘটাং-ঘট করে সমানে ঘুঁটে চলেছে। লোকটার সামনে একটা হাঁড়ি সবে কানায় কানায় ভরা হয়েছে; হাঁড়ির মুখ থেকে হুস্ হুস্ করে গরম ভাপ উঠছে। তারপর লোকটি আধ সের তিন পোয়া আঁটে এমন একটা ছোটমত হাতা নিয়ে আলগোছে একটু ডোবাতে না ডোবাতেই তুলে নিয়ে বাটিগুলোতে ঢালতে শুরু করে দিল। মুখে আওড়ে চলল,—একে এক, দুয়ে দুই, তিনে তিন, চারে চার...

শুখভ ভাল করে দেখে রেখে দিল নীচে থিতিয়ে বসবার আগেই কোন্ কোন্ বাটিতে ঢালা হল আর কোন্ কোন্ বাটিতে পড়ল নিছক পাতলা জলীয় অংশ। দশটা বাটি ট্রে-র ওপর তুলে নিয়ে শুখভ রওনা হল। দ্বিতীয় সারির খুঁটিগুলো যেখানে, সেখান থেকে গপ্‌চিক হাত নেড়ে শুখভকে ডাকল,—এইখানে, ইভান দেনিসিচ ভায়া—এইখানে!

বাটি নিয়ে যাবার সময় হাত একটু নড়লেই সর্বনাশ। শুখভ তরতর করে হেঁটে যাওয়ায় বাটিগুলো একটুও হেলেনি। শুখভ দিব্যি কথা বলতে বলতে হেঁটে গেল,—ওহে, ও খ—৯২০! একটু দেখে, চাচা—দেখে! আরে হটো না, ভাই—হটো না!

এই ভিড়ের মধ্যে দশটা কেন, একটা বাটিও যদি না চল্‌কিয়ে নিয়ে যেতে পারো তো মুরোদ বুঝি! শুখভ কিন্তু খুব হুঁশিয়ার হয়ে টেবিলের একধারে আল্‌তোভাবে ট্রে-টা

রাখল। জায়গাটা গপ্‌চিক আগেই মুছে রেখেছিল। শুখভ এমন সুন্দরভাবে ট্রে-টা নামাল যে নতুন করে সে-জায়গায় একছিটে দাগ লাগল না। আর ট্রে-টা আগে থেকে ভেবেচিন্তে এমনভাবে ঘুরিয়ে বসাল যাতে পুরু হয়ে জমাট-বাঁধা তার ভাগের দুটো বাটি তার বসার জায়গাটার দিকে থাকে।

ইয়েরমোলায়েভ আরও দশটা বাটি আনল। গপ্‌চিক ছুটে গিয়ে পাভ্‌লোর সঙ্গে ভাগাভাগি করে শেষ চারটে বাটি নিজেরা হাতে করে নিয়ে এল।

কিল্‌গাস একটা ট্রে-তে করে রুটি নিয়ে এল। আজ ওরা খাবার পাচ্ছে কাজের হিসেবে। কেউ পাচ্ছে সাত, কেউ দশ আর শুখভ পাচ্ছে চোদ্দ আউন্স রুটি। শুখভ নিজের চোদ্দ আউন্সের ভাগটা নিল বাইরের শক্ত ছালের দিক থেকে আর ৎসেজারের সাত আউন্সের ভাগটা নিল রুটির মধ্যেকার নরম ফুল্‌কো অংশটা থেকে।

এমন সময় ব্রিগেডের লোকজনেরা খাবারের জন্যে চারদিক থেকে এসে হাম্‌লে পড়ল। যেখানে হোক বসে পড়ে ঢক ঢক করে গলায় ফেলে গিলে নাও। শুখভ হাতে হাতে বাটি এগিয়ে দিচ্ছে, মনে করে রাখছে কার কার নেওয়া হয়ে গেল আর সেইসঙ্গে ট্রে-র এককোণে তার ঘন সুরুয়াওয়ালা বাটি দুটোর ওপর নজর রাখছে। শুখভ তার চামচেটা দুটো বাটির একটাতে ডুবিয়ে রাখল। তার মানে, ও বাটিটা ইতিমধ্যে একজনের নেওয়া হয়ে গেছে। ফেতিউকভ আগে আগে তার বাটিটা শেষ করে উঠে চলে গেল। ও বুঝল নিজের ব্রিগেডে পাত কুড়নোর আশায় বসে থেকে আজ কোনো লাভ নেই। তার চেয়ে ও বরং গোটা ঘর টহল দিয়ে বেড়াবে। কারো পাতে এ'টোকাঁটা পড়ে থাকলে ফেতিউকভ যাতে কুড়িয়ে খেতে পারে। কেউ যদি পুরো না খেয়ে বাটিটা ঠেলে রাখে, সঙ্গে সঙ্গে একদল লোক বাটির ওপর শকুনের পালের মত ঝাঁপিয়ে পড়বে।

শুখভ আর পাভলো গুণে গেঁথে দেখে নিল। দেখল যা আছে তাতে সকলেরই কুলিয়ে যাবে। শুখভ একটা ঘন সুরুয়াওয়ালা বাটি তিউরিনের জন্যে সরিয়ে রেখে দিল। জার্মানদের কাছ থেকে পাওয়া একটা মুট্‌কিওয়ালা চ্যাপ্টা টিনের কৌটোয় খাবারটা ঢেলে নিল। কৌটোটা সে ওভারকোটের তলায় বুকের সঙ্গে লেপ্‌টে নিয়ে যাবে। ট্রেগুলো ওরা খালাস করে দিল। পাভলো নিজের ডবল ভাগ আর শুখভ এক জোড়া বাটি নিয়ে বসে গেল। আর কোনো কথাবার্তা নয়। পূত মুহূর্ত এবার সমাগত।

মাথা থেকে টুপি খুলে ফেলে শুখভ হাঁটুর ওপর রাখল। তারপর চামচ দিয়ে নেড়ে নেড়ে প্রথমে এ-বাটি থেকে, পরে ও-বাটি থেকে চেখে দেখে নিল। একেবারে খুব খারাপ নয় তো! দু-চারটে চুনোচানা মাছও আছে দেখছি। ওবেলার চেয়ে এবেলার সুরুয়াটা হয়েছে মোটের ওপর ঢের পাতলা। সকালবেলায় কয়েদীদের খেতে দেওয়া হয় যাতে ওরা খাটাখাটনি করতে পারে। সন্ধ্যেবেলায় দেওয়া না দেওয়া সমান—সেই তো ওরা ঘুমোবেই।

শুখভ খেতে শুরু করে দিল। প্রথমে পাতলা ঝোলটা খেয়ে নিল। বেশ একটা গরম ভাব ভেতরে চলে গিয়ে তার সারা শরীরে আনন্দের বান ডেকে আনল। ভেতরের তন্ত্রীগুলো ঝঙ্কৃত হয়ে উঠে সেই সুরুয়াটাকে অভ্যর্থনা জানাল। খু—ব ভাল। সেই অচিরস্থায়ী মুহূর্তটি এসে গেল, যে মুহূর্তটির পথ চেয়ে কয়েদীরা কত আশা করে বসে থাকে।

এরপর শুখভ বাটির তলায় লেগে থাকা এইটুকু একটু সুরুয়া দিয়ে কচকচ করে

বাঁধাকপি খেতে শুরু করে দিল।

এখন ঠিক এই মুহূর্তে কোনো কিছুর ওপর শুখভের রাগ নেই; তার যে এই দীর্ঘ-মেয়াদী সাজা, দিনমান যে এত দীর্ঘ, রবিবারেও যে তাকে কাজে যেতে হবে—এমন কি এসবের জন্যেও তার আর এখন কোনো নালিশ নেই। এখন সে শুধু ভাবছে; আমরা বেঁচে থাকব। যত যাই হোক, আমরা বাঁচব। আর ভগবান যদি মুখ তুলে চান, একদিন না একদিন এর অবসান হবে।

প্রথম এবং দ্বিতীয়, দুটো বাটি থেকেই পাতলা ঝোলের অংশটা খেয়ে নিয়ে শুখভ দ্বিতীয় বাটির অবশিষ্টাংশ প্রথম বাটিতে ঢেলে নিয়ে চামচে করে গা চেঁছে পরিষ্কার করে বাটিটা উপুড় করে দিল। যাক, এতক্ষণে শুখভ একটু সোয়াস্তি পেল। আর এখন তার দ্বিতীয় বাটিটা নিয়ে কোনো মাথাব্যথার কারণ থাকল না; সব সময় চোখে চোখেও রাখতে হবে না, হাত দিয়ে আগলাতেও হবে না।

শুখভ এবার নির্ভাবনায় আশপাশের বাটিগুলোর দিকে চেয়ে দেখতে পারছে। যে ওর বাঁ পাশে বসেছে তার ভাগে পড়েছে পুরোটাই শুধু পাতলা জল। আপন কয়েদীভাই সব—তাদের সঙ্গেও শালার বেটা শালারা এমনি ছোটলোকের মত ব্যবহার করে।

শুখভ কপিসেদ্ধ আর সুরুয়ার শেষটুকু এবার খেতে শুরু করে দিল। শুখভ ৎসেজারের বাটি থেকে একটুকরো আলু উদ্ধার করল। ঠান্ডাঘরের মাঝারি সাইজের আলু—কিন্তু গলে পাঁক হওয়াও নয় এবং একেবারে মিষ্টত্ববর্জিতও নয়। মাছ নেই বললেই হয়, মাঝে মাঝে হাতে ঠেকে দু-চারটে যা কাঁটা-চোক্‌ড়া। কিন্তু শুখভ বসে বসে প্রত্যেকটা কাঁটা আর পাখনা চিবোতে থাকে, হুস্ হুস্ করে কাঁটার ভেতরকার রসটুকু চুষে নিতে থাকে—কেননা ঐ রস শরীরের পক্ষে ভাল। এত সব করতে সময়ও অবশ্য লাগে। কিন্তু শুখভের এখন এমন কিছু তাড়া নেই। আজ ও যে কার মুখ দেখে উঠেছে! বড় শুভদিন আজ। দুপুরেও ডবল খাবার, রাত্তিরেও ডবল। অন্য সব কাজ আজ পড়ে থাকতে পারে!

অবশ্য তামাকের জন্যে ল্যাটভিয়ার লোকটার কাছে একবার না গেলেই নয়। নইলে হয়ত কাল সকালের আগেই সব উড়ে পুড়ে যাবে।

শুখভ বিনা রুটিতেই তার নৈশভোজন চালিয়ে যাচ্ছিল। একে ডবল বাটি, তার ওপর আবার রুটি খেলে একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। রুটিটা কালকের জন্যে তোলা থাক। পেট জিনিসটা হল একের নম্বরের নিমকহারাম—আজ যে এত কিছু পেল সমস্তই ভুলে গিয়ে কালই আবার খাই-খাই করতে শুরু করে দেবে।

শুখভ নির্বিঘ্নচিত্তে সুরুয়াটুকু শেষ করল। নিজে আগ্রহ করে ধারে কাছে আর কে আছে না আছে দেখবার তেমন চেষ্টা করল না। আজ শুখভের তেমন কোনো ঠেকা নেই। আজ আর ওকে বাড়তি খাবারের ধান্ধায় থাকতে হচ্ছে না—নিজের যা ন্যায্য পাওনা, তাই সে খাচ্ছে। তবু তার চোখে না পড়ে পারল না: টেবিলের ওধারে একটা জায়গা খালি হওয়ায় ঢ্যাঙামত একজন বুড়োমানুষ—য়ু--৮১—এসে বসল। শুখভ জানত, ও ৬৪ নম্বর ব্রিগেডের লোক। পার্সেল-ঘরের লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার সময় শুখভ শুনে এসেছে—১০৪ নং ব্রিগেডের জায়গায় ৬৪নং ব্রিগেড আজই গিয়েছিল 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন'-এর নগরপত্তনের কাজে, সেখানে তাদের সারাটা দিন খোলা মাঠে ঠান্ডার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজেদের চারদিকে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরতে হয়েছে।

শুখভ শুনেছে ঐ বুড়ো লোকটা নাকি অনন্তকাল ধরে জেলখানায় আর ক্যাম্পে পচছে—এতবার এত বন্দীমুক্তি হয়, বুড়োর কেউ নামও করে না। একটা করে দশ-শালা মেয়াদ শেষ হয় আর তক্ষুণি আবার বুড়ো নতুন করে দশ বছরের সাজা পায়।

লোকটাকে শুখভ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল। ক্যাম্পের আর যেসব পিঠ-কুঁজো-হওয়া লোক আছে, তার মধ্যে এই বুড়োর পিঠই সবচেয়ে খাড়া। টেবিলে বসে আছে, কিন্তু এত ঢ্যাঙা যে, দেখে মনে হচ্ছে যেন উঁচু কিছু নীচে পেতে তার ওপর বসেছে। বহু বছর ধরেই ওর আর পরামানিকের প্রয়োজন হয়নি : জেলে যে কী সুখে কাটিয়েছে, সেটা ওর মাথার এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো টাক দেখলেই বোঝা যায়। বুড়ো একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে; কিন্তু খাবার ঘরে কী ঘটছে না ঘটছে সেসব ও দেখছে না—অন্যমনস্ক হয়ে শুখভের মাথার ওপর একটা জায়গায় ঠায় চেয়ে থেকে আত্মসমাহিত হয়ে কী যেন ভাবছে। ঘষা লেগে লেগে ক্ষয়ে যাওয়া একটা কাঠের চামচ করে বুড়োটা জলের মত পাতলা সুরুয়াটুকু তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছিল। ও কিন্তু অন্যদের মত হেঁট হয়ে বাটির কাছে মুখ নিয়ে যাচ্ছিল না—চামচটা উঁচু করে তুলে মুখের কাছে আনছিল। লোকটা একদম ফোক্‌লা; শক্ত মাড়ি দিয়ে রুটির টুকরোগুলো চিবোচ্ছিল। ওর জীর্ণশীর্ণ মুখ দেখে কিন্তু জরাগ্রস্ত অথর্ব পঙ্গু বলে বোধ হয় না—মনে হয় কেউ যেন পাথরে ছায়া-ছায়া মূর্তি খোদাই করে রেখেছে। কালি-লাগা, কোঁচকানো হাতের প্রকান্ড থাবা দুটো দেখলে স্পষ্ট বোঝা যায় এই দীর্ঘ বন্দীজীবনে যাদুর গায়ে হাত বোলানো গোছের কাজের সুযোগ তার বরাতে বিশেষ জোটে নি। কিন্তু ওর মধ্যে কোথায় যেন একটা এমন গোঁ আছে, কিছুতেই কারো কাছে মাথা নোয়াবে না। আর পাঁচজনের মত ও কিন্তু এঁটো-ছড়ানো নোংরা টেবিলের ওপর ওর পাঁচ ছটাকী রুটিটা রাখেনি। রেখেছে একটা ফর্সা ন্যাকড়ার ওপর।

কিন্তু হলে কী হবে, লোকটার দিকে এখন হাঁ করে তাকিয়ে বসে থাকার সময় নেই শুখভের। গেলার পালা শেষ করে চাম্‌চেটা, জিভ দিয়ে চেটে পরিষ্কার করে, তারপর ভালেঙ্কির মধ্যে চামচেটা চালান করে দিয়ে, মাথার টুপিটা কপাল পর্যন্ত টেনে নামিয়ে এনে শুখভ উঠে পড়ল। উঠে তার নিজের আর ৎসেজারের ভাগের রুটিদুটো হাতে নিয়ে খাবারঘর থেকে বেরিয়ে গেল। খাবারঘর থেকে বেরোবার রাস্তা অন্য একটা বারান্দা দিয়ে। বেরোবার দরজায় দুজন ফালতু দাঁড়িয়ে। কেউ বেরোবার সময় একবার করে দরজার হুড়কো খোলা আর বেরিয়ে যাবার পর একবার করে হুড়কো লাগানো—এই ওদের একমাত্র কাজ।

আজ শুখভের খাওয়াটা ভরপেট হয়েছে। তাই ওর বেশ ফুর্তির ভাব। বেরিয়ে ঠিক করল এক দৌড়ে ল্যাটভিয়ার সেই লোকটার কাছ থেকে ঘুরে আসবে—যদিও রাতের ঘণ্টা বাজতে বেশী দেরি নেই। নিজেদের ন'নম্বর ব্যারাকে রুটিটা নিয়ে যাওয়ার বদলে শুখভ সাত নম্বরের দিকে হাঁটা দিল।

আকাশের অনেকখানি ওপরে চাঁদ—যেন ঝকঝকে সাদা পাথর কুঁদে তৈরি। মেঘহীন টলটলে আকাশ। অন্ধকারের গায়ে ঝিকমিক করছে ফোঁটা ফোঁটা তারা। কিন্তু শুখভের এখন হাতে সময় নেই আকাশটাকে খুঁটিয়ে দেখবার। একটি জিনিসই শুধু তার মাথায় ঢুকল—ঠান্ডা কম পড়বার আশা নেই। লোকমুখে শোনা গেছে, বেসামরিকদের একজন নাকি বলেছে রাত্তির নাগাদ তাপমাত্রা কমে নাকি মাইনাস্‌ তিরিশ ডিগ্রি হবে এবং ভোরের

দিকে নাকি সেটা আরও কমে গিয়ে মাইনাস্ চল্লিশে নামবে।

বহু দূর থেকে এ রাজ্যে গুন্‌গুন্ করে ভেসে আসছে একটা ট্র্যাক্টরের আওয়াজ; আর বড় রাস্তাটার ওদিকে একটা মাটি-কাটার গাড়ি বিশ্রী রকমের কর্কশ গলায় চিল্লাচ্ছে। ভালেণ্কি পরে যারাই যেখানে হেঁটে যাচ্ছে বা ছুটছে, তাদেরই পায়ের জুতো থেকে খচর-মচর খটাস্ খট্ আওয়াজ হচ্ছে।

কিন্তু কোথাও হাওয়ার টুঁ শব্দ নেই।

শুখভ যে তামাক কিনতে যাচ্ছে, সেটা বাড়ি থেকে আনা নিজেদের চাষের তামাক। ছোট এক গেলাস তামাকের দাম পড়বে এক রুবল। ক্যাম্পের বাইরে কিনতে গেলে ওরই দাম লেগে যাবে তিন রুবল এবং একটু ভাল তামাক হলে আরও বেশী। কড়া-খাটুনির ক্যাম্পগুলোতে সব জিনিসেরই দামের একটু বিশেষত্ব আছে, ঠিক অন্যান্য জায়গার মত নয়—কারণ, এ জায়গায় টাকাপয়সার তেমন চলন নেই। টাকা খুব কম লোকেরই আছে এবং যা আছে তাও চোখে বিশেষ দেখা যায় না। এখানে কয়েদীদের সারাদিন খাটিয়ে নিয়ে একটা পয়সাও দেওয়া হয় না। উস্‌ৎ-ইঝ্‌মায় থাকতে শুখভ মাসে কম্‌সে কম তিরিশ রুবল করে পেত। এখানে কারো আত্মীয়স্বজন টাকা পাঠালে অফিসাররা সে টাকা কাউকে নগদ হাতে তুলে দেয় না—টাকাটা তার নামে খাতায় জমা হয়। সেই টাকা দিয়ে সে গায়ে-মাখা সাবান, বাসি বোদা কেক, প্রাইমা-মার্কা সিগারেট কিনতে পারে। ক্যাম্প-কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত দামে কোন্ কোন্ জিনিস তুমি চাও, এক টুকরো কাগজে লিখে দিতে হবে। জিনিস পছন্দ হোক না হোক, ফেরত নেই। যদি তুমি না চাও, তাহলে কিন্তু টাকাটা জলে গেল—কেননা, মনে রেখো, তোমার নামে জমা টাকার অংক থেকে ঐ টাকাটা কাটা হয়ে গেছে।

শুখভ এখানে যতটুকু যা রোজগার করে, তার সবটুকুই করে গোপনে এর ওর টুকিটাকি কাজ করে দিয়ে। খদ্দের মালমশলা যোগাবে আর শুখভ চটি বানিয়ে দেবে—তার চার্জ দু' রুবল। ভেতরের জামায় তালি লাগাতে হবে—দু'জনে কথাবার্তা বলে তার দরদস্তুর ঠিক হবে।

সাত নম্বর ব্যারাকটা ন'নম্বরের মত দু-আধখানা করে ভাগ করা নয়। সাত নম্বরে টানা লম্বা দালান চলে গেছে, তাতে দশটা দরজা ফোটানো; আর প্রতি কামরায় সাতটা করে বাঙ্কে গুঁতোগুঁতি করে থাকে একটি করে ব্রিগেড। তাছাড়া এক চিল্‌তে একটি ঘরে পেচ্ছাপের টুকরি রাখার ব্যবস্থা। আর আছে এ ব্যারাকের বড় ফাল্‌তুর নিজের একটি খুপ্‌রি। যারা শিল্পী, তাদেরও আছে আলাদা ঘর।

শুখভ সোজা তার সেই লাৎভিয়ার লোকটির ঘরে ঢুকে গেল। একটা বাঙ্কের নীচের দিকে একটা ধারে পা তুলে দিয়ে শুয়ে শুয়ে সে তখন তার পাশের লোকটির সঙ্গে লাৎভিয়ান ভাষায় গালগল্প করছিল।

শুখভ তার বিছানার পাশে বসে পড়ে বলল,—ইয়ে, কী খবর?

যেখানকার পা সেখানেই রেখে লোকটা ছোট্ট করে উত্তর দিল,—এই যে, কী খবর। ছোট্ট এতটুকু ঘর। সবাই কান খাড়া করে আছে। কে? কী মতলবে এসেছে? বললে এক্ষুণি হাটে হাঁড়ি ভাঙা হয়ে যাবে।

দুজনেই সেটা বুঝল। বুঝে শুখভ কিছু আর না ভেঙে খেজুরে আলাপ জুড়ে দিল।

—তারপর, ইয়ে, আছ কেমন?

—ভাল।

—আজ বড্ড ঠান্ডা পড়েছে, না?

—হ্যাঁ।

ঘরে অন্যেরা নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা আবার শুরু না করা পর্যন্ত শুখভ কিছুতেই আর কথাটা পাড়ছে না। কোরিয়া যুদ্ধের প্রসঙ্গ নিয়ে একটু বাদেই ওরা মেতে উঠল। কোরিয়া যুদ্ধে চীনের মাথা গলানোর ফলে বিশ্বযুদ্ধ বাধবে কি বাধবে না এই নিয়ে জোর তর্ক বেধে গেল। শুখভ সেই ফাঁকে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বলল,—তামাক নেই তোমার কাছে?

—আছে।

—দেখাও তো।

বাঙ্কের ধারটা থেকে পা দুটো সরিয়ে মেঝেয় নামিয়ে লাৎভিয়ার লোকটি উঠে বসল। অতি তেএঁটে লোক। গেলাসে যখন তামাক ঢালে ওর সব সময় ভয় এই বুঝি এক খামচা বেশী চলে যায়।

লোকটা শুখভকে তামাকের থলিটা দেখিয়ে থলির মুখটা ফাঁক করল।

শুখভ থলি থেকে এক খামচা তুলে হাতের চেটোর ওপর রাখল। দেখে বুঝল— হ্যাঁ, এবারও সেই আগের বারেরই তামাক। যেমনি কটা রং আর তেমনি কড়া। নাকের কাছে ধরে গন্ধ শুঁকল। হ্যাঁ, সেই তামাকই বটে। কিন্তু মুখে বলল,—সে তামাক নয় বলে মনে হচ্ছে!

লোকটি ঝাঁঝালোভাবে বলল,—সেই তামাকই। বলছি, সেই তামাক। আমার কাছে এছাড়া অন্য তামাক থাকে না। আমার তামাক বরাবর এক।

শুখভ বলল,—ঠিক আছে, আমাকে তুমি পুরো এক গেলাস ঠেসে দাও। খেয়ে দেখি, ভাল হলে পরে আর এক গেলাস নেবখন।

শুখভ 'ঠেসে দাও' কথাটা ইচ্ছে করেই বলল। কারণ, লোকটার স্বভাবই হল গেলাসে আলগা করে তামাক ভরা।

লোকটা বালিশের তলা থেকে আরেকটা থলি বার করল। তাতে প্রথমটার চেয়ে তামাকের পরিমাণ একটু বেশী। তারপর নিজের দেরাজটা খুলে একটা ছোট গেলাস বার করল। গেলাসটা প্ল্যাস্টিকের হলেও, শুখভ মেপে দেখেছে, এমনি গেলাসেরই মত একই মাপের।

লোকটা ঝুর ঝুর করে গেলাসে তামাক ঢালতে লাগল।

—চেপে দাও! কই, চেপে চেপে দাও—বলে শুখভ নিজেই আঙুল দিয়ে ঠাসতে লেগে গেল।

—যাও, যাও—মা-র কাছে মাসির গল্প! বলে ঝাঁঝ দেখিয়ে গেলাসটা হাতে পুরে লোকটা নিজেই আঙুল দিয়ে ঠাসতে লাগল। তবে ওর ঠাসাটা একটু আলতোভাবে হচ্ছিল। এরপর লোকটা গেলাসে আরও খানিকটা তামাক ভরল।

ইতিমধ্যে শুখভ কোটের বোতাম খুলে ফেলেছে। কোটের আস্তরটা হাতড়াতে হাতড়াতে একজায়গায় হাতে একটা কাগজ ঠেকল। তারপর দুহাত দিয়ে কাপড়টা টেপাটেপি করে ভেতরের কাগজটা সরিয়ে সরিয়ে অন্য পাশের আস্তরে একটা ছোট ছেঁড়া

ফুটোর মুখে নিয়ে এল। ফুটোটা দুটোমাত্র সুতোর ফোড় দিয়ে বন্ধ করা ছিল। কাগজটা গর্তের কাছে নিয়ে এসে শুখভ নখ দিয়ে পট্ পট্ করে সুতো দুটো ছিঁড়ে ফেলল। তারপর কাগজটা লম্বালম্বি সরু করে ভাঁজ করে নিয়ে ফুটো গলিয়ে বার করে আনল। দুটো রুবল। এত পুরনো যে, নোটদুটো একদম ন্যাতা হয়ে গেছে।

ঘরের মধ্যে একজন কয়েদী চিৎকার করে বলে উঠল,—তোমাদের দুঃখে গুঁফোদাদার প্রাণ গল্‌বে ভাবছ? ঐ আশাতেই বসে থাকো। নিজের মা-র পেটের ভাইকেই ও বিশ্বাস করে না, তার আবার তোমরা। আচ্ছা, উজবুক সব!

কড়া-খাটুনির ক্যাম্পে একটা সুবিধে এই যে, এখানে নির্ভয়ে রাজাউজির মারা যায়—যথেষ্ট স্বাধীনতা আছে। উস্-ৎ-ইঝ্‌মায় যদি তুমি বললে বাইরে দেশলাইয়ের আকাল পড়েছে, তো তোমার হয়ে গেল—সঙ্গে সঙ্গে সেলে পাঠিয়ে আরও দশ বচ্ছর ঠুকে দেবে। কিন্তু এখানে তুমি বাঙ্কের মাথায় দাঁড়িয়ে গলা ফাটিয়ে যা খুশি তাই অবাধে বলতে পারো—এখানকার টিকটিকিরা পর্যন্ত সে সব কথা শুনে কর্তাদের কান ভারী করতে ছুটবে না; এমনকি নিরাপত্তা দপ্তরও ওসব কথা নিয়ে মাথা ঘামাবে না।

কিন্তু মুস্কিল হল, বলবে কখন? সময় কোথায়?

—ওহে, বড্ড আল্‌গা করে ভরছ—শুখভ আপত্তি জানাল।

আচ্ছা বাপু, আচ্ছা—বলে লোকটা আরেক টিপ তামাক গেলাসের মাথায় রাখল।

শুখভ তার কোটের ভেতরের পকেট থেকে একটা থলি বার করে তার মধ্যে পুরো তামাকটা ঢেলে নিল।

এমন মিঠে সিগারেট হুটপাট করে খাওয়া ঠিক হবে না। মনে মনে ঠিক করে নিয়ে শুখভ বলল,—ঠিক আছে, আরেক দফা দাও।

আবার খানিকটা কস্তাকস্তি করে থলিতে দ্বিতীয় বার তামাক ভরে নিল। তারপর লোকটার হাতে দুটো রুবল ধরে দিয়ে মাথাটা নেড়ে সম্ভাষণ জানিয়ে শুখভ বিদায় নিল।

বাইরে বেরিয়েই শুখভ নিজের ব্যারাকের দিকে ছুট লাগাল—যাতে পার্সেল নিয়ে ফেরামাত্র ৎসেজারকে শুখভ ধরতে পারে।

কিন্তু ব্যারাকে ফিরে শুখভ দেখল ৎসেজার নীচের বাঙ্কে বেশ গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। পার্সেল পেয়ে তার বেশ গদগদ ভাব। বিছানার ওপর আর দেরাজে ওর জিনিসপত্রগুলো ছড়িয়ে রয়েছে; বাতির আলো একে ও-জায়গায় সরাসরি পড়ে না, তার ওপর শুখভের বাঙ্কের ছায়া পড়েছে—কাজেই জায়গাটা অন্ধকার হয়ে আছে।

ৎসেজার আর ক্যাপ্টেনের বাঙ্ক দুটোর মাঝখানে এসে এ বেলার বরাদ্দ রুটিটা ৎসেজারকে দেবার জন্যে শুখভ নীচু হল।

—তোমার রুটিটা, ৎসেজার মার্কোভিচ!

শুখভ এও বলতে পারত : আচ্ছা! পেয়েছ তাহলে? কিন্তু তা বলল না। কারণ, বললে তার মানে দাঁড়াত এই যে, শুখভ ওর হয়ে লাইনে দাঁড়িয়েছিল এবং পার্সেলের জিনিসে শুখভেরও একটা অধিকার আছে। মুখে না বললেও শুখভ জানে যে, সে অধিকার তার সত্যিই আছে। কিন্তু এমনকি আট বছর কয়েদী জীবন যাপন করার পরও শুখভ ফেরুপাল হয়ে যায়নি—এবং যত দিন যাচ্ছে ফেরুপাল না হওয়ার সঙ্কল্প তার মনে ক্রমশ দৃঢ়তর হচ্ছে।

কিন্তু শত হলেও, শুখভ তার চোখদুটোকে কিছুতেই সাম্‌লে রাখতে পারছে না। শুখভ হল জেলের বাস্তুঘুঘু; কিন্তু তার চিলের মত নজর—বিছানায় আর দেরাজে ছড়ানো

পার্সেলের জিনিসগুলো সে এক নজরে ধাঁ করে দেখে নিল। যদিও সব জিনিস তখনও ঠোঙা আর থলি থেকে পুরো খোলা হয়নি, কিছু কিছু জিনিস তো তখনও বাঁধাছাঁদা অবস্থাতেই ছিল—তাহলেও এক নজরে দেখে এবং ঘ্রাণশক্তি দিয়ে সেই দেখাটাকে যাচাই করে শুখভ জানতে পারল : ৎসেজার পেয়েছে সসেজ, জমানো দুধ, ভাপানো পাকা মাছ, চর্বিঅলা শুয়োরের নোনা মাংস, মিষ্টি গন্ধঅলা পিঠে, নানা রকমের সুন্দর মশলাদার ভাজাভুজি, সেরটাক মিছরি—এবং তাছাড়া—মাখন, সিগারেট আর পাইপের তামাক; এবং এসব বাদেও আরও যেন কী কী।

আর শুখভ এত কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিয়েছে ঐ একটি মুহূর্তের মধ্যে, যখন সে বলেছে : তোমার রুটিটা, ৎসেজার মার্কোভিচ।

আর ৎসেজার ডগমগ হয়ে কেমন যেন নেশার ঘোরে—খাবারের পার্সেল এলে অমন অবস্থা সকলেরই হয়—হাতের ইশারা করে শুখভকে রুটিটা নিয়ে নিতে বলল, ওটা তুমি নিয়ে নাও, ইভান দেনিসিচ।

সুরুয়া এবং তদুপরি পোয়াটেক রুটি! একেবারে পুরো ভূরিভোজ! বোঝাই যাচ্ছে, ৎসেজারের খাবারদাবার থেকে এটাই হল তাহলে শুখভের মোট পাওনা। মিঠাইমন্ডার আশায় বসে রইলে, পেলে কাঁচকলা—এর চেয়ে বিশ্রী জিনিস আর হয় না।

একবারের রেশনে শুখভ রুটি পেয়েছে চোদ্দ আউন্স, আরেকবারে সাত আউন্স এবং এছাড়া আরও অন্তত আউন্স সাতেক আছে তোশকের ভেতর। আবার কী চাই! সাত আউন্স এখনই মেরে দেবে। পাউন্ডখানেক কিংবা তার হয়ত কিছু বেশীই থাকবে কাল সকালের জন্যে। আর পাউন্ডটাক সঙ্গে নেবে কাজে যাবার সময়। কাজে যাবার সময় সঙ্গে নেবে—আঃ, এ না হলে জীবন! তোশকের ভেতরকার রুটিটা আর বের করে কাজ নেই। ভাগ্যিস্, শুখভ সেলাই করে রাখবার সময় পেয়েছিল! আজও বন্ধ দেরাজ থেকে রুটি চুরি হয়ে গেছে ৭৫ নম্বর ব্রিগেডে। নালিশ করে তো কচু ফল হবে।

কেউ কেউ আছে যারা মনে করে পার্সেল যে পেল, সে বুঝি সাত রাজার ধন হাতে পেল—সুতরাং যে যা পারে তার কাছ থেকে বাগিয়ে নেয়। কিন্তু মনে মনে একটু যদি খতিয়ে দেখ, তাহলে দেখবে : আসতেও যতক্ষণ, যেতেও ততক্ষণ। বাড়ি থেকে নতুন পার্সেল না আসা পর্যন্ত খানিকটা বাড়তি খিচুড়ির আশায় নিজের গরজে কাউকে কাউকে এটা-সেটা করতেই হয় এবং সেই সঙ্গে তারা আধপোড়া সিগারেটের তক্কে তক্কে থাকে। পাহারার লোক, ফোরম্যান, প্যাকিং-এর ঘরে যাদের হাল্কাগোছের কাজ—এদের তুমি কিছু না দিয়ে কী করে পারবে? যদি দিতে রাজী না হও, ওরা তোমার প্যাকেট গায়েব করে ফেলবে—ফলে, এক হপ্তার মধ্যে লিস্টিতে ও-জিনিসটার নামই উঠবে না। সকালে কাজে যাবার সময় চোর আর টহলদারের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে যার যা আছে চেকিং-ঘরের জমাদারের কাছে রেখে যেতে হয়; ৎসেজারকেও ওর পার্সেলের জিনিসগুলো পুঁটুলিতে বেঁধে জমাদরের জিম্মায় রেখে যেতে হবে। ওটা ক্যাম্পের কর্তার হুকুম। চেকিং-ঘরের জমাদারকে যদি তুমি নিজে থেকে খানিকটা ভাগ না দাও, ও তোমাকে না জানিয়ে একটু একটু করে যা নেবে তা তোমার দেওয়ার চেয়ে বেশী হয়ে যাবে। সারাটা দিন ও বেটা অন্য লোকের খাবার-দাবার নিয়ে একা ঘরে বন্ধ হয়ে আছে—কার সাধ্যি ওকে ধরে? তাছাড়া অনেকে অনেকভাবে সাহায্য করে—যেমন শুখভ করেছে। তাদেরও তো খুশী করতে হবে। যে লোকটার স্নানের ঘরে ডিউটি, সে যাতে ধোপদুরুস্ত কাপড়চোপড় দেয় তার জন্যে তাকেও কিছু দেওয়া চাই—বেশি নয়,

তবু কিছু তো বটেই। যে পরামানিক খেউরি করবার সময় তোমার খালি হাঁটুর ওপর না মুছে কাগজের গায়ে ক্ষুর মুছবে—তাকেও কিছু দিতে হবে। খুব বেশি কিছু নয় অবশ্য—নিদেনপক্ষে তিন চারটে সিগারেট। শিক্ষা-সংস্কৃতির বিভাগেও কিছু ধরে দিতে হবে, যাতে চিঠিপত্রগুলো ঠিকমত পেঁাছোয়—চিঠি যাতে খোয়া না যায়। আর মনে করো, দু-একদিন তুমি চাও হাসপাতালের বেডে শুয়ে থাকতে—তার জন্যে ডাক্তারকেও কিছু দিয়ে রাখতে হবে। তোমার ঠিক পাশেই যে থাকে, তোমরা যারা একই দেরাজে জিনিস রাখো—যেমন ক্যাপ্টেন বুইনভ্স্কি আর ৎসেজার—তোমার সেই পাশের লোকটিকে কি তুমি না দিয়ে পারো? প্রত্যেকটা গ্রাস মুখে তোলবার সময় তোমার পাশের লোক জুল জুল করে চেয়ে থাকবে। যার মন একদম পাষাণ, সেও না দিয়ে পারবে না।

যারা সব সময় ভাবে আমার মুল্যের চেয়ে ওর মুল্যেটা বড়, কারো পার্সেল আসতে দেখলে তাদের চোখ টাটাতে পারে। কিন্তু জীবন যে কী জিনিস শুখভ জানে; এবং সে কারো কাছ থেকে খুব বেশি কিছু প্রত্যাশা করে না।

ততক্ষণে শুখভ পা থেকে বুটজুতো খুলে ফেলে বাঙ্কে চড়ে বসেছে। হাতমোজার ভেতর থেকে ইস্পাতের ফলাটা বার করে উল্টেপাল্টে দেখে মনে মনে ঠিক করে নিল—কাল একটা ভাল পাথর যোগাড় করে ফলাটাতে শাণ দিয়ে নেবে যাতে ওটা দিয়ে জুতো সারানোর বাটালির কাজ হয়। চারটে দিন সকালসন্ধ্যে ও যদি সমানে লেগে থাকতে পারে, তাহলে ইস্পাতের ফলাটা দিয়ে আগার দিকটা সুন্দর ছোট্ট একটা বাটালি বানিয়ে ফেলতে পারবে।

কিন্তু আপাতত সকাল অবধি জিনিসটা লুকিয়ে রাখতে হবে। দেয়ালের গায়। নীচে ক্যাপ্টেনের বাঙ্কটা খালি থাকতে থাকতে—শুখভ খুব সাবধানে, ক্যাপ্টেনের মুখে-চোখে কিছু যাতে না পড়ে—কাঠগুঁড়োভর্তি ভারী তোশকটা উল্টে ইস্পাতের ফলাটা লুকোবার কাজে লেগে গেল।

অন্য সব বাঙ্কের ওপরতলার লোকেরা তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল শুখভ কী করছে। পাদ্রী আলিওশা—আর যাতায়াতের রাস্তার ওপারে পাশের বাঙ্কে এস্তোনিয়ার দুই মাণিকজোড়। ওরা দেখলে শুখভের কিছু যায় আসে না।

ব্যারাকের ভেতর দিয়ে ফেতিউকভ এল কাঁদতে কাঁদতে। ঘাড়টা ঝুলে পড়েছে, ঠোঁট রক্তাক্ত। এঁটো বাসন চাটতে গিয়ে আবার ও পিটুনি খেয়েছে। কারো দিকে মুখ তুলে না চেয়ে, কান্না চাপবার কোনো চেষ্টা না করে, গোটা ব্রিগেডের পাশ দিয়ে চলে গিয়ে ফেতিউকভ নিজের বাঙ্কে উঠে পড়ে তোশকে মুখ লুকোলো।

ওর কথা ভাবলে সত্যি দুঃখ হয়। মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ও মরবে। এ জায়গায় ও ঠিক নিজেকে মানিয়ে নিতে পারছে না।

এমন সময় ক্যাপ্টেন বুইনভ্স্কি এসে হাজির হল। খুব খুশী-খুশী ভাব। হাতে এক পাত্র স্পেশাল চা। ব্যারাকে দু-দুটো চা-ভর্তি পিপে—মরি মরি, কী চা? শুধু একটু যা রং করা, কুসুম কুসুম গরম। বোদা বোদা খেতে। খোশবু বলতে একমাত্র পিপের ধোঁয়ানো কাঠের ছাতা-পড়া গন্ধ। ওসব চা ছেঁদো লোকদের জন্যে। কিন্তু ৎসেজারের কাছ থেকে ক্যাপ্টেন একমুঠো আসল চা পেয়েছিল—চা যাকে বলে। সেই চা কেৎলিতে ফেলে ক্যাপ্টেন চলে গিয়েছিল কল থেকে গরম জল আনতে।

দেরাজের ওপর চা রেখে ক্যাপ্টেন খোশমেজাজে বড়াই করে বলল,—আর একটু হলেই গরম জলের কলে হাতটা পুড়িয়ে ফেলেছিলাম আর কি!

শুখভের তলার বাঙ্কে ৎসেজার ভাঁজ খুলে বিছানার ওপর একটা কাগজ পেতে তার ওপর এটা ওটা সাজিয়ে রাখছিল। শুখভ তার তোশকটা নামিয়ে রেখে দিল। যাতে ৎসেজারকে চোখে পড়ে গিয়ে মনটা না খারাপ হয়। কিন্তু ঠিক সেই সময় ৎসেজার প্রমাণ করে দিল শুখভকে ছাড়া ওদের চলতেই পারে না। দুধারি বাঙ্কের মাঝখানে সটান উঠে দাঁড়িয়ে শুখভের দিকে মুখ তুলে ৎসেজার চোখ মট্‌কাল,—দেনিসিচ, তোমার দশরোজীটা একটু দাও তো।

'দশরোজী' বলতে ছুরি। শুখভের নিজের। ভাঁজ-করা পুঁচ্‌কে ছুরি। সেটাও দেয়ালের গায়েই লুকিয়ে রাখা আছে। এক আঙুলের অর্ধেক ছোট ভাঁজ-করা ছুরি। কিন্তু পাঁচ আঙুল মোটা শুয়োরের মাংসও ব্যাটার ছেলে কুচ্‌ কুচ্‌ করে কেটে যেতে পারে। ছুরিটা শুখভ নিজে হাতে করেছে; নিজের বানানো, শাণও দিয়েছে নিজে।

শুখভ দেয়াল হাত্‌ড়ে ছুরি বার করে ৎসেজারের হাতে ছুরিটা তুলে দিল। ৎসেজার কৃতজ্ঞতাসূচকভাবে মাথাটা নেড়ে নিজের বাঙ্কে হাওয়া হয়ে গেল।

ছুরিটা শুখভকে আয় দেবে। কিন্তু যাই বলো, যার ছুরি তার মাথার ওপর সব সময় সেল-সাজার খাঁড়া ঝুলছে। যে লোক নিতান্ত চশমখোর, সেই শুধু বলতে পারে : ছুরিটা একটু দাও তো, সসেজ কাটব—তাই বলে ভেবো না তুমি ভাগ পাবে।

শুখভের কাছ থেকে ৎসেজার যদি ধার নিয়ে থাকে তো ঠিকই আছে।

রুটি আর লোহার ফলার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলার পর শুখভের হাতে আর একটা মাত্র কাজ বাকি রইল—তামাকের থলির বিধিব্যবস্থা করা। শুখভ একটিপ তামাক নিয়ে (ঠিক যতটুকু ধার নিয়েছিল ততটুকুই) হাত বাড়িয়ে এস্তোনিয়ার লোকটিকে দিল,—এই যে ভাই, অনেক উপকার করেছ তুমি! ধন্যবাদ!

এস্তোনিয়ার লোকটি মুখ হাসি হাসি করে ঠোঁটদুটো ফাঁক করল। তারপর ওর ধর্মভাইকে ডেকে কী যেন বিড় বিড় করে বলল এবং সেই এক টিপ তামাক দিয়ে একটা সিগারেট বানিয়ে ফেলল—টেনে দেখাই যাক, শুখভের তামাকটা কেমন।

যত ইচ্ছে টেনে দেখতে পারো। তোমাদেরটার চেয়ে মোটেই খারাপ নয়। শুখভ নিজেই একবার টেনে পরখ করে দেখত, কিন্তু ওর ভেতরের অন্তর্যামী ঘড়িটা কেবলি ওকে বলছিল : আর কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই রাতের গন্‌তির ঘণ্টা বেজে যাবে। ঠিক এই সময়টাতে পাহারাঅলা সেপাইরা ব্যারাকের চারধারে টহল দিয়ে বেড়ায়। এখন সিগারেট খেতে গেলে দালানের দিকটাতে চলে যেতে হবে। বাঙ্ক ছেড়ে এখন আর শুখভের উঠতে ইচ্ছে করছে না। ব্যারাকের মধ্যেটা এখনও তেমন গরম নয়। মাথার ওপর চালের গায় গুঁড়ি গুঁড়ি বরফ। কিন্তু ঠাণ্ডাটা শুখভের এখনও তেমন অসহ্য ঠেকছে না। আরেকটু বেশী রাত হলে তখনই শুখভ হি হি করে কাঁপবে।

এইবার শুখভ তার সাত আউন্সের রেশনটা টুকরো টুকরো করে ভাঙতে লেগে গেল। কিন্তু শোনবার ইচ্ছে না থাকা সত্ত্বেও নীচে চা খেতে খেতে ৎসেজার আর ক্যাপ্টেন বুইনভ্‌স্কির কথাবার্তা তার কানে আসতে লাগল :

—না, ক্যাপ্টেন, না! তুমি লজ্জা করে খাচ্ছ। এই মাছভাপানোটা খেয়ে দেখ। দু-এক টুকরো সসেজ খাও।

—খাচ্ছি গো, খাচ্ছি।

—আহাহা, রুটিটাতে খানিকটা মাখন লাগিয়ে নাও। এ বাবা, খাস মস্কোর রুটি।

—বলো কি, বলো কি! আমার তো বিশ্বাসই হয় না দুনিয়ার কোথাও এমন সত্যিকার রুটি তৈরি হয়। বুঝলে, হঠাৎ এই এলাহী ব্যাপার দেখে আমার পুরনো একটা কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। আমি তখন ছিলাম আরখান্‌জেল্‌স্‌ক্‌-এ...

ব্যারাকের এ অংশে দুটো লোকের গলায় এমন গোলমাল হচ্ছে যেন মেছোহাট বসেছে। কিন্তু এত হৈচৈয়ের মধ্যেও শুখভের মনে হল যেন ঢং ঢং করে রাতের ঘণ্টা বেজে উঠল। ঘণ্টার আওয়াজ আর কারো কানে যায়নি। নাকবোঁচা সেপাইটাকে শুখভ ব্যারাকে ঢুকতেও দেখল। লালমুখো বেঁটেখাটো মানুষটা। তার হাতে এমনভাবে একটা কাগজ ধরা রয়েছে এবং তার হাবভাবটাও এমন যে, শুখভ দেখেই বুঝে ফেলল—লোকটা সিগারেট খাওয়ার জন্যে কাউকে ধরতে বা রাতের গণ্‌তিতে লোকজনদের তাড়িয়ে নিয়ে যেতে আসে নি। ও এসেছে কাউকে নিতে।

নাকবোঁচা সেপাই কাগজটার দিকে চোখ রেখে বলল,—একশো চার কোন্‌খানে?

বলা হল : এইখানে। এস্তোনিয়ার মাণিকজোড় তাড়াতাড়ি তাদের সিগারেট লুকিয়ে ফেলে হাত দিয়ে ধোঁয়া তাড়াতে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

—ফোরম্যান কোথায়?

তিউরিন বিছানার ওপর নড়বার তেমন লক্ষণ না দেখিয়ে উত্তর দিল,—এই যে।

—তোমার লোকজনদের লিখে জবাবদিহি করতে বলা হয়েছিল। করেছে?

তিউরিন অম্লানবদনে বলল,—লিখবে।

—লেখা তো হয়ে যাওয়া উচিত ছিল।

—আমার দলের লোকদের পেটে বোমা মারলে ক বেরোয় না; লেখা অত সহজ নয়। (ৎসেজার আর ক্যাপ্টেনকে ঠোকা হল।) বা ভাই, তিউরিন, বেড়ে বলেছ—কথায় কেউ তোমার সঙ্গে পারবে না।—কলম নেই। কালি নেই।

—রাখা উচিত।

—রাখতে আর দেয় কই! নিয়ে চলে যায়।

—দেখ, ফোরম্যান! বেশি চ্যাটাং চ্যাটাং করে যদি কথা বলো, তোমাকেও আমি সেলে পুরব। নাকবোঁচা সেপাই তারস্বরে কথাটা বললেও খুব বেশি রেগে যায় নি।—জবাবদিহি-গুলো যেন কাল সকালের মধ্যেই পৌঁছোয়। আর একটা কথা, যে-সব বেআইনী কাপড়-চোপড় চেকিং ঘরে জমা দিয়েছ তার একটা লিস্টও যেন থাকে। বুঝলে!

—বুঝলাম।

(শুখভ মনে মনে ভাবল : ক্যাপ্টেনকে নিয়েছে একহাত। কিন্তু ক্যাপ্টেনের কিছুই কানে যায় নি, বসে বসে ও দিব্যি সসেজ সাঁটছে।)

পাহারাদার সেপাই জিজ্ঞেস করল,—আর শোনো। তোমাদের মধ্যে শচ-৩১১ কেউ আছে?

তা-না-না-না করে তিউরিন বলল,—লিস্টটা দেখে বলতে হবে। আমার ভারি দায় পড়েছে অখদ্যেগুলোর নম্বর মনে করে রাখতে!

তিউরিন চাইছিল একটু সময় নিতে—আজকের রাতটা, কংবা অন্তত গণ্‌তির সময় পর্যন্ত বুইনভ্‌স্কিকে যাতে আড়াল করে রাখা যায়।

—বুইনভ্‌স্কি বলে এখানে কেউ আছে?

বলতে না বলতে ক্যাপ্টেনের সাড়া পাওয়া গেল,—হ্যাঁ, কী? এই যে আমি। এতক্ষণ

শুখভের বাঙ্কের নীচে বসে ছিল বলে ক্যাপ্টেনকে দেখা যায় নি।

হুঁ, হুঁ, চাঁদ! এই রকমই হয়। যত চতুর তত ফতুর।

—ও, তুমি? হ্যাঁ, তাই তো। শচ-৩১১। ওঠো, উঠে পড়ো।

—কোথায় যাব?

—সে তুমি ভাল করেই জানো।

ক্যাপ্টেন শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল আর সেইসঙ্গে একটু গাঁইগুঁই করল। এমন সুন্দর খোশগল্পের আসর ছেড়ে তাকে চলে যেতে হবে বরফের মত ঠাণ্ডা নিঃসঙ্গ কুঠুরিতে। ক্যাপ্টেনের কাছে এর চেয়ে ঢের সহজ ছিল অন্ধকার ঝড়ের রাত্রে নৌবহর নিয়ে শত্রুর ওপর চড়াও হওয়া।

ক্যাপ্টেন বুইনভ্স্কি নীচু গলায় জিজ্ঞেস করল,—কত দিনের মেয়াদ?

—দশ। চলো, চলো। আর দেরি নয়।

ঠিক সেই সময় ব্যারাকের ফালতুরা চেঁচিয়ে উঠল,—গণ্তি হবে, গণ্তি! চলে এসো সব!

তার মানে, যে সেপাই গণ্তি করবে সে ইতিমধ্যেই ব্যারাকে এসে পড়েছে।

ক্যাপ্টেন বুইনভ্স্কি চারপাশে একবার তাকাল। ও কি ওর ওভারকোটটা সঙ্গে নেবে? নিয়ে গেলেও ওরা গা থেকে ওটা খুলে রেখে দেবে। কাজেই হরেদরে সেই একই দাঁড়াবে। সুতরাং বুইনভ্স্কি ঠিক করল যেমন আছে সেইভাবে শুধু কোট পরেই চলে যাবে। ক্যাপ্টেনের ভরসা ছিল ভল্কোভোই অত মনে করে রাখবে না; কিন্তু ভল্কোভোই ভোলবার পাত্রই নয়—সকলের সব কথা সে মনে করে রেখে দেয়। ক্যাপ্টেন আগে থেকে তৈরি হয়নি। এমনকি কোটের ভেতর লুকিয়ে খানিকটা তামাক নেওয়া—তাও সে করেনি। এখন আর নিয়েও কোনো লাভ নেই। গা-তল্লাসির সময় সেটা হয়ত সেপাইরাই হাতিয়ে নেবে। তা সত্ত্বেও, ক্যাপ্টেন মাথায় যখন টুপি পরে নিচ্ছিল তখন ৎসেজার তার হাতের মধ্যে গোটা দুই সিগারেট গুঁজে দিল।

ব্রিগেডের লোকনজনদের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে 'আচ্ছা চলি ভাই' বলে ক্যাপ্টেন বুইনভ্স্কি সেপাইয়ের পেছন পেছন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

কয়েকজনকে সেই সময় চিৎকার করে বলতে শোনা গেল,—ঘাব্ড়িও না, ক্যাপ্টেন, মন শক্ত রেখো। কিন্তু কীই বা আছে বলবার? সেল-সাজার ঘরগুলো ১০৪নং ব্রিগেডের লোকজনেরাই বানিয়েছে। ঘরগুলো কী পদের, ওরা ভালরকমই জানে। পাথরের দেয়াল, শানবাঁধানো মেঝে, জান্লার বালাই নেই; চুল্লী একটা আছে বটে, তবে ওটা আছে শুধু দেয়ালের গায়ের বরফগুলো গলিয়ে মেঝেটা জলে ভাসাভাসি করবার জন্যে। শুতে হবে খালি তক্তায়। শীতের কাঁপুনিতে দাঁতে দাঁতে এমন ঠক ঠক করবে যে, তারপরও যদি দাঁতগুলো পড়ে না যায়—তাহলে রোজ আউন্স দশেক করে রুটি গিলতে পাবে, আর সেইসঙ্গে ষষ্ঠ আর নবম দিনে পাবে গরমাগরম সুরুয়া।

দশ দিন। নির্জন সেই কুঠুরিটাতে গোড়া থেকে শেষ অবধি দশটা দিন যদি সমানে বসে থাকো সারাটা জীবন তোমাকে ভুগতে হবে। যদি যক্ষ্মায় ধরে, তাহলে চিরদিন হাসপাতালেই রয়ে গেলে।

আর যেসব লোক টানা পনেরো দিন সেলে থেকেছে, তাদের সকলেরই স্থান এখন ঠাণ্ডা কন্কনে মাটির তলায়।

যতক্ষণ ব্যারাকে থাকছ, মনে করো বরাতের জোর। খাও দাও ফুর্তি করো। কোনো ব্যাপারে যেন নাক গলাতে যেও না।

ব্যারাকের বড় ফালতু হাঁকল,—চলে এসো সব, বাইরে চলো! আমি এক, দুই, তিন বলব—যারা তার মধ্যে বাইরে না যাবে, আমি তাদের নাম টুকে নিয়ে সেপাইজীকে দিয়ে দেব।

ব্যারাকের বড় ফালতু। বেটা মহা হারামী। ব্যারাকে রাত্রে ওরা আমাদেরই সঙ্গে ওকে তালা দিয়ে রাখে, তবু ওর কাজ জেলের কর্তাদের হুকুম তামিল করা—কয়েদীদের কাউকেই ও পরোয়া করে না। বরং উল্টো ওকেই সবাই ডরায়। কোনো কয়েদীকে যখন ও সেপাইদের হাতে ভজিয়ে দেয়, তখন ও নিজে হাতেই তার মুখে চড়চাপড় মারে। মার-পিট করতে গিয়ে ওকে ওর হাতের একটা আঙুল খোয়াতে হয়েছিল; সেই সুযোগেই ও পঙ্গুর দলে ভিড়ে পড়তে পেরেছে। ওর মুখ দেখলে গুণ্ডা বদমায়েশ বলে মনে হয়। সত্যিই ও গুণ্ডাবদমায়েশ। ওর মামলাটা ঠিক রাজনৈতিক ছিল না—ওর সাজা হয়েছিল ফৌজদারী মামলায়। অন্যান্য অভিযোগের সঙ্গে ওর বিরুদ্ধে সংবিধানের ৫৮ ধারার ১৪ উপধারা অনুযায়ী একটি রাজনৈতিক অভিযোগও জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। এই হল ওর এই ক্যাম্পে আসার ইতিহাস।

ওর কাছে এসব ডালভাত—ও তোমার নম্বর টুকে নিয়ে পাহারাঅলা সেপাইয়ের হাতে গছিয়ে দেবে আর তারপরই তোমার দু রোজ সেল সাজা, সেইসঙ্গে বাইরে কাজ।

কয়েদীরা সব গয়ংগচ্ছ ভাব নিয়ে দরজার দিকে এগোচ্ছিল, কিন্তু যেই বড় ফাল্‌তু গলা বার করেছে অমনি শুরু হয়ে গেল হৈহল্লা—বাইরে যাবার জন্যে সবাই ভিড় করে এ ওকে ঠেলতে লাগল। যারা বাঙ্কে মট্‌কার ওপর চড়ে বসেছিল, তারা হনুমানের মত হুপ্‌ হাপ্‌ করে লাফিয়ে পড়ে সরু দরজা দিয়ে সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়বার চেষ্টা করল।

শুখভ অনেকক্ষণ ধরে ঠিক করে রেখেছিল আরাম করে এবার একটা সিগারেট ধরাবে। কিন্তু তার আর মওকা পেল না। হাতের চেটোয় পাকানো সিগারেটটা নিয়ে তড়াক করে লাফ মেরে শুখভ নীচেয় নামল। তারপর ফেল্টের বুটের মধ্যে পা গলিয়ে দিয়ে শুখভ রওনা হবে—এমন সময় ৎসেজারের ওপর ওর কেন যেন খুব মায়া হল। ৎসেজারের কাছ থেকে কিছু বাগাবার মতলবে নয়—সত্যিকার অন্তর থেকেই ৎসেজারের কথা ভেবে শুখভের দুঃখ হচ্ছিল। ও নিজেকে খুব একটা কেষ্টবিষ্টু ঠাওরায়; কিন্তু জীবন সম্বন্ধে ওর বিন্দুমাত্র কোনো ধারণা নেই। পার্সেলের ব্যাপারটাই ধরো না কেন—তুই বাপু পার্সেল পেলি; পার্সেল পেয়ে গণ্‌তির আগে কোথায় চটপট চেকিং-ঘরে রেখে আসবি—তা নয়, ঐ নিয়ে আদেখ্‌লেপনা শুরু করে দিলি! খাওয়ার জন্যে খানিকটা সরিয়ে রেখে দিলেও তো পারতিস। পার্সেল নিয়ে এখন তো ৎসেজারের উভয়সংকট। গণ্‌তির জায়গায় যদি থলেসুদ্ধ নিয়ে হাজির হয়, ক্যাম্পের লোকে ওর গায়ে গু দেবে। পাঁচ শো লোক একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠবে। আর যদি ব্যারাকে ফেলে রেখে যায়, ছুটে এসে যে প্রথমে ঘরে ঢুকবে সেই সব মেরে দিয়ে বসে থাকবে।

শুখভের মনে পড়ে গেল উস্‌ৎ-ইঝ্‌মায় ছিল এর চেয়ে আরও এক কাঠি সরেস অবস্থা। কাজ থেকে ফেরবার সময় দেখা যেত গুণ্ডাশ্রেণীর লোকেরা সকলের আগে পাঁই পাঁই করে ব্যারাকে ছুটে যাচ্ছে; বাদবাকি লোকেরা ব্যারাকে পেঁাছে দেখত দেরাজগুলো সব সাফ।

শুখভ দেখতে পেল ৎসেজার তার জিনিসপত্তরগুলো হুটপাট করে এখানে সেখানে

গ‍্ুজে গ‍্ুজে রাখছে। কিন্তু সব ল্ুকিয়ে রাখবারও এখন সময় নেই। সসেজ আর মাংসের দলাটা ৎসেজার কোটের তলায় কোঁচড়ের মধ্যে প্ুরে নিল। গণ্তির সময় ও-দ্ুটো নিজের কাছে রাখবে। আর কিছ্ু না হোক, অন্তত গোটা দ্ুয়েক জিনিসও তো তাতে বাঁচবে।

ৎসেজারের ওপর কর্ুণা হওয়ায় শ্ুখভ তাকে কতকগ্ুলো ব্ুদ্ধিপরামর্শ দিল,—তুমি এই ছায়া-ছায়া জায়গাটায় বসে থাকো, ৎসেজার মারকোভিচ। ঘর খালি করে সকলে আগে চলে যাক। সেপাই আর ফাল্তুর দল যখন এসে ঘরের আনাচ-কানাচগ্ুলো চ‍্ুড়তে আরম্ভ করবে, তখন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়বে। এমন ভাব করবে যেন তোমার খ্ুব অস্ুখ করেছে। আর আমি করব কি, সকলের আগে বেরিয়ে গিয়ে সকলের আগে ফিরে আসব।

—তাহলে আর..., বলেই শ্ুখভ ছ্ুট দিল।

শ্ুখভ তার পাকানো সিগারেটটা ম্ুঠোর মধ্যে সাবধানে ধরে গ‍্ুতোগ‍্ুতি করে সামনে এগিয়ে গেল। ব্যারাকের দ্ুদিককার লোকেরই ভাগে যে দালানটা পড়ে, সেই দালান আর দরজাগ্ুলোতে যারা দাঁড়িয়ে আছে তারা কেউই বাইরে পা বাড়াচ্ছে না। কয়েদীরা সব জানোয়ারের মত ধড়িবাজ। দ্ুজন দ্ুজন হয়ে দ্ুপাশের দেয়ালে ওরা ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওদের মাঝখান দিয়ে খানিকটা রাস্তা ফাঁকা রয়েছে—মেরে কেটে একজন যেতে পারে। তেমন উজব্ুক যদি কেউ থাকে তো সে এই ঠান্ডার মধ্যে বাইরে যাবে—আমাদের কথা যদি বলো, আমরা এই গ্যাঁট হয়ে এখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম। এমনিতেই সারাটা দিন আমাদের ঠান্ডার মধ্যে কাটাতে হয়, উপরন্তু আরও দশ মিনিট কেন আর আমরা ঠান্ডায় জমে যাই? উ‍ঁহ্ু, আমরা অত বোকা নই। আজই না মরলে যাদের চলছে না, তারা মর্ুক গে যাক—কালকের দিনটা না দেখে আমরা মরতে চাই না।

অন্য অন্য দিন হলে শ্ুখভও ঐ দেয়ালের গায়েই নিজেকে সেঁটে রাখত। কিন্তু আজ তার অন্যথা হল। লম্বা লম্বা পা ফেলে সকলের মাঝখান দিয়ে এগিয়ে গিয়ে শ্ুখভ বত্রিশ পাটি দাঁত বার করে ফেলল,—অত কিসের ভয়, বাছা? সাইবেরিয়ার ঠান্ডা কি বাপের জন্মে দেখ নি? যাও, বেরিয়ে পড়ো! আকাশে নেক্ড়ের অংশ্ুমালী রয়েছে, যাও—গা-টা একট্ু তাতিয়ে নাও। এই যে দাদা, একট্ু আগ্ুন হবে?

দরজার ম্ুখে এসে সিগারেটে একটা টান মেরে শ্ুখভ বাইরের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। শ্ুখভদের দেশে চাঁদকে লোকে ঠাট্টা করে বলে 'নেক্ড়ের অংশ্ুমালী'।

অনেকখানি ওপরে উঠেছে চাঁদ। আরেকট্ু উঠলেই চাঁদ সর্বোচ্চবিন্দ্ুতে আরোহণ করবে। শ্বেত শ্ুভ্র আকাশের গায়ে সব্ুজের ছিটে; উজ্জ্বল তারাগ্ুলো দ্ুরে দ্ুরে ছড়ানো ছিটোনো; ঝলমল ঝলমল করছে ধবধবে বরফ। ব্যারাকের দেয়ালগ্ুলোও এত সাদা যে, এখন বাতিগ্ুলো থাকা না থাকা সমান হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ওপাশের একটা ব্যারাকের বাইরে একরাশ কালো কালো মাথা—কয়েদীরা ঘর ছেড়ে বাইরে এসে লাইন বেঁধে দাঁড়াচ্ছে। ওধারে আরও একটা দল। ব্যারাকে ব্যারাকে কল-গ্ুঞ্জনের চেয়েও ঢের বেশী জোরালো হয়ে উঠেছে পায়ের নীচে কচর মচর করে বরফ ভাঙার শব্দ।

পাঁচজন লোক সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে গিয়ে দরজার দিকে ম্ুখ করে দাঁড়াল। তাদের পেছন পেছন আরও তিনজন এল। শ্ুখভ দ্বিতীয় সারির তিনজনের পাশে এসে দাঁড়াল। বাড়তি র্ুটির ট্ুকরোটা সাঁটা হয়েছে, ঠোঁটে সিগারেট রয়েছে, এখন লাইনে এসে দাঁড়ানো

যেতে পারে। তামাকটা খাসা। ল্যাৎভিয়ার লোকটি দেখছি ঠকায় নি—খেতে যেমন কড়া, গন্ধও তেমনি ঝাঁঝালো।

অন্যরা গুটি গুটি করে এসে পেছনে দাঁড়িয়ে গেল। খানিক পরেই দেখা গেল, শুখভের পেছনে পাঁচজন পাঁচজন করে দুটো তিনটে লাইন দাঁড়িয়ে গেছে। যারা ব্যারাকের বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে তারা এবার ব্যারাকের ভেতরে যারা দাঁড়িয়ে আছে তাদের ওপর খেপে গেল। বেল্লিকগুলো কেন দালানে ভিড় করে আছে? বাইরে বেরিয়ে আসছে না কেন? ও শালাদের জন্যে আমরা যে ঠান্ডায় মরছি।

কয়েদীরা কেউই কখনও হাতঘড়ি বা দেয়ালঘড়ি দেখে না। দেখেই বা কী ঘোড়ার-ডিম হবে? কয়েদীদের তো শুধু জানার দরকার : ভোরের ঘণ্টা কতক্ষণে বাজবে? ফাইলে দাঁড়াতে আর কত দেরি? কখন খেতে দেবে? রাত্তিরে গুণ্তি হবে ক'টায়?

অথচ তা সত্ত্বেও বলা হয়ে থাকে, রাত্তিরে গুণ্তি করা হয় ন'টায়। ন'টায় কখনই শেষ হয় না। অনেক সময় দুবার করে কখনও কখনও তিনবার করেও গুণ্তি হয়। কয়েদীরা কোনোদিনই দশটার আগে শুতে যেতে পারে না। ঘণ্টা বাজিয়ে ডেকে তোলা হয় ভোর পাঁচটায়, মোল্দাভিয়ার লোকটির কাজ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ার মধ্যে অবাক হওয়ার কিছু নেই। কয়েদীরা যেখানেই একটু গরম জায়গা পাবে, সেখানেই তক্ষুণি তক্ষুণি ঘুমে ঢুলে পড়বে। সারা সপ্তাহে এত ঘুম জমে থাকে যে রবিবার দিন সারা ব্যারাক দিনভর শুধু ভোঁস্ ভোঁস্ করে ঘুমোয়—অবশ্য সে রবিবারে যদি কাজে বেরোতে না হয়।

বাছাধনেরা এবার সুড় সুড় করে বাইরে বেরিয়ে আসছে। ব্যারাকের বড় ফাল্তু আর পাহারাঅলা সেপাই হুড়ো দিয়েছে; গুঁতো খেয়ে বারান্দার ওপর থেকে সব এখন টপাটপ নামছে। যেমনি সব গাড়োল, তার তেমনি—বেশ হয়েছে। য্যায়সা কি ত্যায়সা।

যারা সামনের সারিতে দাঁড়িয়ে আছে, তারা দেরি-করে-আসা লোকগুলোকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বলতে লাগল,—বড় ওস্তাদ হয়েছ, না? আমরা আঙুল চুষব আর তোমরা ক্ষীর-সর খাবে! তাই না? আগে আগে তোমরা যদি বেরিয়ে আসতে—গুণ্তির কাজ কখন চুকে যেতে পারত।

সব কটা ব্যারাক খালি করে লোক বেরিয়ে এসে বাইরে জমায়েত হয়েছে। ব্যারাকে লোক আছে মোট চার শো; আশী জন করে লোক নিয়ে পাঁচ-পাঁচটি গ্রুপ। পেছনে পেছনে সব দাঁড়িয়ে গেছে। গোড়ার দিকে যারা, তারা সব দাঁড়িয়েছে পাঁচজন পাঁচজন করে—পরের দিকে সব তালগোল পাকিয়ে গেছে।

ব্যারাকের বড় ফাল্তু হেঁকে বলল,—পেছনের লোকেরা পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়াও।

খান্কির ছেলেরা কিছুতেই আলাদা আলাদা হয়ে দাঁড়াচ্ছে না।

ৎসেজার দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল। কুঁকড়ে মুকড়ে কাঁপতে কাঁপতে এমনভাবে আসছে যেন ওর অসুখ করেছে। ব্যারাকের এদিকের দুজন ফাল্তু, ওদিকের দুজন ফাল্তু আর একজন পঙ্গু লোকও বেরিয়ে এল। ওরা পাঁচজন সকলের আগে লাইন করে দাঁড়াল—ফলে, শুখভের লাইনটা হয়ে গেল তৃতীয়। ৎসেজারকে খেদিয়ে একেবারে সকলের শেষে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পাহারাঅলা সেপাই বারান্দায় বেরিয়ে এল।

লাইনের শেষদিকে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তাদের দিকে তাকিয়ে সে হেঁকে বলল, —পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়াও। লোকটার গলার জোর আছে।

ব্যারাকের বড় ফাল্তু চেঁচাল,—পাঁচজন পাঁচজন করে দাঁড়াও। এর গলা ওর চেয়েও বাজ খাঁই।

শালার বেটা শালারা এখনও ঠিক হয়ে দাঁড়াল না।

ব্যারাকের বড় ফালতু বারান্দা থেকে লাফিয়ে নেমে পেছনের লোকগুলোর দিকে তেড়ে গেল। বাপ-মা তুলে গাল দিতে দিতে লোকগুলোর পাছায় লাথি মারতে লাগল।

কিন্তু লোক বুঝে ও লাথি মারছিল। মারছিল তাদেরই, যারা মুখ বুঁজে লাথি হজম করবে।

এইবার সব লাইন বেঁধে আলাদা আলাদা হয়ে দাঁড়াল। বড় ফাল্তু নিজের জায়গায় ফিরে এল। তারপর সেপাইয়ের গলায় গলা মিলিয়ে হাঁকতে লাগল,—এক! দুই! তিন!

পাঁচ গোণা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই পাঁচজন লাইন ভেঙে দিয়ে চোঁ চাঁ ব্যারাকের দিকে ছুট মারছিল। ক্যাম্প কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ওদের সমস্ত কাজকারবার আজকের মত এখানেই চুকে বুকে গেল।

চুকে অবশ্য গেল, যদি আবার ফিরে গুণতে না হয়। এইসব মাথামোটা লোকগুলো ভাল করে গুণতেও পারে না। যে গরু চরায় সেও এদের চেয়ে ভাল গোণে। লিখতে পড়তে না জানুক, যখন সে গরু চরায়—গরুটরু হারালে ঠিক বুঝতে পারে। কিন্তু পরের-মাথায়-কাঁঠাল-ভাঙা এই লোকগুলো—এদের এতসব তালিম-টালিম দিয়েই বা কী হচ্ছে?

গতবার শীতের সময় ক্যাম্পে জুতো শুকোবার আলাদা কোনো ব্যবস্থা ছিল না: রাত্তিরে ঘরের মধ্যেই সবাইকে জুতো খুলে রাখতে হত। কাজেই ফিরে গুণবার দরকার হলে দুবার, তিনবার, চারবার করে তাদের ঘরের বাইরে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত। শেষে তারা করত কি, ভাল করে জামাকাপড়ও পরত না—কোনো রকমে ভালেঙ্কিটা পায়ে গলিয়ে নিয়ে গায়ে কম্বল জড়িয়ে সটান বাইরে চলে যেত। এ বছর শুকোবার জায়গা তৈরি হয়েছে; তাই বলে সব জুতো একসঙ্গে দেওয়া যায় না। প্রত্যেক ব্রিগেডের ভালেঙ্কি শুকোতে দেওয়ার পালা পড়ে দুদিন ছেড়ে একদিন। কাজেই এখন নতুন নিয়ম হয়েছে, দ্বিতীয়বার গুণতে হলে ব্যারাকের ভেতর গুণতে হবে। সেক্ষেত্রে কয়েদীদের সার বেঁধে এ-অংশ থেকে ও-অংশে খেদিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে।

শুখভ দৌড়ে ভেতরে চলে গেল। ঘরে যদিও সে ঠিক সকলের আগে ঢোকে নি, তাহলেও যারা গোড়ায় এসেছে তাদের চোখের আড়াল না করে পায়ে পায়ে এসে পৌঁচেছে। দৌড়ে ৎসেজারের বাঙ্কে গিয়ে শুখভ তার বিছানায় বসে পড়ল। তারপর পা থেকে ভালেঙ্কিটা খসিয়ে নিয়ে চুল্লীর কাছের বাঙ্কটাতে চড়ে পড়ে চুল্লীর ওপর তার ভালেঙ্কিটা চাপিয়ে দিল। কে আগে চুল্লীর ওপর ভালেঙ্কি রাখতে পারে এই নিয়ে রোজই সকলের মধ্যে একটা কাড়াকাড়ি পড়ে। শুখভ আবার ফিরে এসে ৎসেজারের বিছানায় বসে পড়ল। বস্‌ল বেশ গ্যাঁট হয়ে, হাঁটু দুটো মুড়ে; একটা চোখে সে ৎসেজারের থলেটার দিকে নজর রাখল, কেউ যাতে বিছানার মাথার দিক থেকে টেনে নিতে না পারে; আরেকটা চোখে সে নজর রাখল ভিড়ের মধ্যে কেউ যেন তার ভালেঙ্কিজোড়া চুল্লীর ওপর থেকে সরিয়ে না দেয়।

শুখভকে গলা বার করতে হল,—ওহে, ও মাকালফল। বলি, তোমার দন্তকৌমুদিতে জুতো মারব সেটা কি ভাল হবে? নিজেরটা সরিয়ে নিয়ে আমারটা যেখানে আছে রেখে দাও বলছি।

কয়েদীরা স্রোতের মত হুড় হুড় করে ব্যারাকে ঢুকছে।

২০ নম্বরের ছোকরাগুলো চেঁচিয়ে বলছে,—ভালেঙ্কিগুলো দিয়ে দাও।

এরপর ওদের ভালেঙ্কিগুলো নিয়ে ব্যারাক থেকে বেরিয়ে যেতে দেওয়া হবে। ব্যারাকে তালাচাবি পড়বে। তারপর ছোকরাগুলো ফিরে আসবে, এসে বলবে—সেপাইজী আমরা ভেতরে যাব।

সেপাইরা কোতোয়ালী ব্যারাকে এক জায়গায় হয়ে আঁকজোকগুলো নিয়ে হিসেব মেলাতে বসবে : দেখবে কেউ পালিয়েছে কিনা, নাকি লোকজন সব ঠিকঠাক্‌ই আছে!

যাক গে, আজ আর ওসব নিয়ে শুখভ মোটেই মাথা ঘামাচ্ছে না। দুপাশারি বাঙ্কের মাঝখান দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে এল ৎসেজার।

—ধন্যবাদ, ইভান দেনিসিচ।

শুখভ তার উত্তরে মাথাটা একটু নেড়ে কাঠবেড়ালির মত তরতর তরতর করে নিজের বাঙ্কে গিয়ে উঠে বসল।

এবার ও ছ-আউন্সের টুকরোটা খেয়ে ফেলতে পারে। তারপর দ্বিতীয় আরেকটা সিগারেট। তারপর ঘুম।

আজকের দিনটা শুখভের এত ভাল গেছে যে ঘুমোতে ইচ্ছে করছে না এই যা।

বিছানা করাটা শুখভের কাছে কোনো সমস্যাই নয়। তোশকের ওপর থেকে কালো কম্বলটা টেনে নাও। তারপর তোশকের ওপর লম্বা হও। (১৯৪১ সালে বাড়ি ছেড়ে আসার পর থেকে শুখভ কখনও আর বিছানায় চাদর পেতে শোয় নি। বরং এখন তো ও ভেবেই পায় না মেয়েদের কেন বিছানার চাদর নিয়ে অত মাথাব্যথা, কাচাকাচির বাড়তি হাঙ্গামার মধ্যে যাওয়াই বা কেন!) কাঠকুচোঠাসা বালিশে শুখভের মাথা। পা দুটো কোটের মধ্যে গোঁজা। কম্বলের ওপর ওভারকোট চড়ানো। হে প্রভু, তোমার অশেষ দয়া —আরও একটা দিন পার করে দিলে।

প্রভু, তোমারই দয়ায় তাকে আজ নির্জন কুঠুরিতে শুতে হয়নি। এখানে এই ব্যারাকে যো সো করে সে চালিয়ে নেবে।

শুখভ জানলার দিকে মাথা করে শুয়েছে। শুখভের ঠিক ওপাশে ওপরের আরেকটা বাঙ্কে শুয়েছে আলিওশা। ঝোলানো বাতিটা থেকে আলো পাবার জন্যে আলিওশা একটু হেলে রয়েছে। এ বেলাও সে বাইবেলই পড়ছে।

ইলেকট্রিক আলোটা ওদের দুজনের কাছ থেকেই খুব দূরে নয়। সে আলোয় পড়াও যায়, সেলাইও করা যায়।

শুখভকে জোরে জোরে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাতে শুনল আলিওশা। শুনে তার দিকে ফিরল,—এই তো, ইভান দেনিসেভিচ—তোমার প্রাণ আকুলিবিকুলি করছে ভগবানের কাছে প্রার্থনা জানাবার জন্যে। কেন তুমি নিজের মনটাকে বেঁধে রাখছ?

শুখভ আড়চোখে আলিওশার দিকে তাকাল। পাদ্রী আলিওশার চোখ দুটো যেন একজোড়া মোমবাতির মত জ্বল জ্বল করছে। শুখভ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে শুখভ বলল,—কেন জানো, আলিওশা? ঐ প্রার্থনার দশা হয় ঠিক আমাদের আবেদনপত্রগুলোর মত—হয় ওগুলো যেখানে যাবার সেখানে পৌঁছোয়ই না, নয় পিঠের ওপর 'নামঞ্জুর' ছাপ নিয়ে ফিরে আসে।

কোতোয়ালী ব্যারাকের সামনে দরখাস্ত দেবার জন্যে চারটে সীলমোহর-করা বাক্স

আছে। মাসে একবার করে বিশেষ একজন অফিসার এসে বাক্স থেকে আবেদনপত্রগুলো খালাস করে নিয়ে যায়। এতদিন কম কয়েদী ওর মধ্যে আবেদনপত্র ফেলেনি। তারা মাসের পর মাস আশায় আশায় থেকেছে—আর দুটো মাস, আর একটা মাস পরেই তাদের কাছে উত্তর এসে যাবে।

কিন্তু উত্তর আর আসে না। অথবা আসে : 'আবেদন নামঞ্জুর।'

—তার কারণ, ইভান দেনিসিচ—তুমি খুব কমই ভগবানের নাম করো; যেটুকু করো, তাও করো খুব দায়সারা ভাবে, নম-নম করে। সেইজন্যেই তোমার প্রার্থনায় ফল হয়নি। নিরন্তর প্রার্থনা করে যেতে হবে। তোমার মধ্যে যদি সত্যিকার বিশ্বাস থাকে, সেই বিশ্বাসের জোরে যদি তুমি পাহাড়কে বলো 'পাহাড়, চলো'!—পাহাড় চলবে।

শুখভ হো হো করে হেসে উঠে আরেকটা সিগারেট পাকাল। তারপর এস্তোনিয়ার লোকটির কাছ থেকে আগুন চেয়ে নিয়ে ধরাল।

—বাজে কথা ছাড়ো, আলিওশা। পাহাড় কখনও চলে, এ আমি বাপের জন্মে দেখি নি। দেখ, সত্যি বলতে কি—জন্মে কখনও আমি পাহাড়ই দেখি নি। ককেশাসে তুমি তো পাদ্রীদের দলবল নিয়ে থাকতে। কোনো একটা পাহাড়কেও কি চলতে দেখেছ?

পাদ্রীগুলো সত্যিই খুব অভাগা। ওরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করত। তাতে কার কী ক্ষতি হয়েছে? তবু ওদের গোটা দলটাকে ধরে পঁচিশ বছর ঠুকে দেওয়া হল। তার কারণ, এখনকার সময়টাই হল এই। সব কিছুরই এক মাপ—পঁচিশ বছর।

আলিওশা ওকে তবু ছাড়বে না—বোঝাবেই,—আমরা তো, দেনিসিচ, সে প্রার্থনা জানাই নি। বলে আলিওশা কাছে সরে এসে শুখভের মুখোমুখী হল।—ঈশ্বর চাইলেন সমস্ত পার্থিব এবং সমস্ত নশ্বর জিনিসের মধ্যে আমরা যেন শুধু রোজকার রুটির জন্যে প্রার্থনা জানাই, আজ আমাদের দাও রোজকার রুটি।

শুখভ প্রশ্ন করল,—তার মানে, দৈনিক রেশন?

কিন্তু আলিওশা হাল ছাড়ল না। কথার চেয়েও সে ঢের বেশী বলছিল চোখ দিয়ে। শুখভের হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে সে চাপড়াতে লাগল।

—ইভান দেনিসিচ! একটা পার্সেল কিংবা বাড়তি এক বাটি সুরুয়া—এর জন্যে প্রার্থনা জানানো ঠিক নয়। লোকে যে জিনিসকে মূল্যবান মনে করে, ঈশ্বরের চোখে সে জিনিস ঠুনকো। ঈশ্বরের কাছ থেকে তুমি চাইবে আধ্যাত্মিক জিনিস; বলবে,—হে প্রভু, আমার অন্তরের সমস্ত কুভাব দূর করো।...

—শোনো, আমার কথা শোনো। পোলোমনিয়ায় আমাদের গীর্জায় এক পাদ্রী আছে...

আলিওশা ব্যথায় ভ্রূ কুঞ্চিত করে ব্যগ্রতার সঙ্গে বলল,—তোমাদের পাদ্রীর বিষয়ে আমার সামনে বলো না।

শুখভ কনুইয়ের ওপর ভর দিয়ে উঠে বলল,—আরে, শোনোই না। গীর্জার অধীনে আমাদের যে গ্রামগুলো, সেখানে ঐ পাদ্রীই হল সবচেয়ে রেস্তঅলা লোক। ওখানে ঘরামির কাজে এমনিতে আমাদের রোজ হল পঁয়ত্রিশ রুবল—কিন্তু পাদ্রীর কাছে আমরা দর হাঁকি একশো রুবল করে। ও তক্ষুণি দিয়ে দেয়; কখনই কোনোরকম ওজর আপত্তি করে না। তিন তিনটে শহরে ওর তিন তিনটে মেয়েমানুষ আছে—তাদের ও খোরপোষ দেয়। আর চতুর্থ একজনের সঙ্গে এখন ঘর করছে। ওর বিশপের কথা কী বলব, তাকেও ভেড়া বানিয়ে রেখেছে। সব সময় তেলাচ্ছে। আমাদের শহরে অন্য যত পাদ্রীই আসুক,

কাউকে ও তিষ্ঠোতে দেয় না। কেউ ওর কাছ থেকে কোনো জিনিসের এক আধলাও ভাগ পায় না...

—আমাকে পাদ্রীদের কথা শুনিয়ে কী লাভ? সনাতন গীর্জাগুলো ধর্মের পথ থেকে সরে গেছে। সেইজন্যেই সরকার ওদের ধরে না। কারণ, ওদের মধ্যে সেই অটল বিশ্বাস আর নেই।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে আলিওশার মুখের ওপর ধোঁয়া ছেড়ে শুখভ বলল,—আলিওশা! দেখ, আমি ঈশ্বরবিরোধী নই। আমি মনেপ্রাণেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি। আমার শুধু বিশ্বাস নেই স্বর্গ আর নরকে। কেন তোমরা স্বর্গ আর নরকের গল্পগুলো আমাদের দিয়ে গিলিয়ে নিতে চাও—আমরা কি অতই বোকা? এই জিনিসটাই আমার বরদাস্ত হয় না।

শুখভ চিৎ হয়ে শুয়ে মাথার ওপর দিয়ে বাঙ্ক আর জানলার ফাঁক গলিয়ে সাবধানে ছাই ফেলল—যাতে ক্যাপ্টেনের জিনিসপত্রগুলো পুড়ে না যায়। শুখভ ভাবতে ভাবতে এমন তন্ময় হয়ে গেল যে, আলিওশা বিড়বিড় করে কী বলছিল শুনতে পেল না।

আলোচনাটা চুকিয়ে ফেলার জন্যে শুখভ বলল,—মোদ্দা কথা, যতই তুমি ভগবানের নাম করো—তোমার সাজার মেয়াদ কমছে না। প্রথম থেকে শেষ অবধি তোমাকে ঘট হয়ে বসে থাকতে হবে।

আলিওশা আতঙ্কের সঙ্গে বলে উঠল,—না, না, না। তুমি প্রার্থনা করবে সে ভেবেও নয়। কেন তুমি জেলের বাইরে যেতে চাও? বাইরে গেলে তোমার বিশ্বাসের শেষ কণাটুকুরও দম বন্ধ হয়ে আসবে। তোমার ভাগ্য ভাল যে, তুমি কয়েদখানায় আছ। এখানে থাকায় তুমি আত্মচিন্তা করার সময় পাচ্ছ। প্রভুপাদ পল কী বলেছিলেন? বলেছিলেন—এ কী করছ তুমি? কেঁদে কেঁদে আমার বুক ভেঙে দিতে চাইছ কেন? আমি তো প্রভু যীশুখৃষ্টের নামের জন্যে শুধু কয়েদ খাটা কেন, প্রাণবলি দিতেও রাজী!

শুখভ কোনো কথা না বলে মাথার ওপর চালটার দিকে তাকাল। বাইরে যাবার ইচ্ছেটা এখন আর তার মধ্যে বেঁচে আছে কিনা সে জানে না। গোড়ায় গোড়ায় তার প্রবল ইচ্ছে হত খালাস পেয়ে বাইরে যাবার। রাতের পর রাত সমানে সে গুণে যেত কতদিন কাবার হল, কতদিন থাকল। গুণতে গুণতে একদিন তার মনের মধ্যে ঘাঁটা পড়ে এল।

সেই সময় তার কাছে এটা পরিষ্কার হল যে, শুখভের মত লোকদের কখনই আর বাড়িতে ফিরে যেতে দেবে না। ওদের ঠেলে পাঠাবে কালাপানিতে। এখানে, না কালা-পানিতে—থেকে সুখ কোথায় বেশী শুখভ সেটা জানে না।

একটামাত্র কারণেই শুখভের খালাস পাওয়ার এত ইচ্ছে—শুখভ চায় বাড়ি যেতে। কিন্তু বাড়িতে ওরা মানুষকে ফিরে যেতে দেয় না।

আলিওশা মিছে কথা বলে নি, ওর গলার স্বর, ওর চোখের চাহনি বলে দিচ্ছে কয়েদখানায় ও সত্যিই সুখে আছে।

শুখভ এইভাবে তাকে খোলসা করে বলল,—দেখ, আলিওশা—কথাটা তোমার ক্ষেত্রে উঠছে না। এর সঙ্গে যে করেই হোক নিজেকে তুমি মানিয়ে নিয়েছ। তোমার যীশুখৃষ্ট চেয়েছেন তুমি জেলখানায় যাও, তাঁর কথা শিরোধার্য করে তুমি জেলখানায় আছ। কিন্তু আমি আছি কিসের জন্যে? ১৯৪১ সালে যুদ্ধের জন্যে দেশ তৈরি ছিল না। সেইজন্যে? কিন্তু সে দোষ কি আমার?

কিল্‌গাস বিছানায় শুয়ে বিড়বিড় করে বলল,—আজ আর ফিরে গুণবে বলে

মনে হচ্ছে না।

উত্তরে শুখভ বলল,—তাইতো হে! চিমনির গায়ে কাঠকয়লা দিয়ে লিখে রাখলে হয়—আজ দুবার গণ্তি নেই। তারপর হাই তুলল,—একি, ঘুম-ঘুম পাচ্ছে যে!

গোটা ব্যারাক চুপচাপ শান্ত। হঠাৎ সেই মুহূর্তে ঘরের শান্তিভঙ্গ করে বাইরের দরজায় ঘটাং-ঘট্ ঘটাং-ঘট্ করে খিল খোলার আওয়াজ শোনা গেল। যে দুজন ছোকরা ভালেঙ্কি নিয়ে গিয়েছিল শুকোতে দেবার জন্যে, তারা দালানের ওদিক থেকে ছুটতে ছুটতে এসে চিৎকার করে বলল,—ফিরে গণ্তি হবে।

তখন তখনি ওদের পেছন পেছন একজন সেপাই এসে পড়ল,—যাও সব, ওদিকটাতে চলে যাও।

কিছু কিছু লোক ঘুমিয়ে পড়েছিল। গাঁইগুঁই করে আড়ামোড়া ভেঙে তারা ভালেঙ্কির ভেতর পা গলিয়ে দিতে লাগল। রাত্তিরে কেউই তুলো-ভরা পাজামাগুলো খুলে রেখে শোয়নি। কম্বলের নীচে ওগুলো পরা না থাকলে ঠান্ডায় জমে যেতে হবে।

শুখভ মুখ খারাপ করে বলে উঠল,—শালাদের ভুষ্যিনাশ করো। শুখভের খুব একটা রাগ হল না; তার কারণ, ও তখনও ঘুমিয়ে পড়েনি।

ৎসেজার হাত বাড়িয়ে শুখভকে দুটো লেড়ো বিস্কুট, দুটো চিনির মিঠাই আর গোল এক ফালি সসেজ দিল।

শুখভ বাঙ্কের ধারে ঝুঁকে পড়ে বলল,—বেঁচে থাকো, ৎসেজার মার্কোভিচ! দেখি, তোমার থলেটা দাও! বিছানার মাথার নীচে রেখে দিই। বলা যায় না! যেতে যেতে কেউ ওপরের বাঙ্ক থেকে জিনিস টেনে নিতে পারে না। তাছাড়া চুরি করবার জন্যে কেই বা আর শুখভের বাঙ্কে হাত দিতে যাবে?

ৎসেজার তার বাঁধাছাঁদা সাদা থলেটা শুখভের হাতে তুলে দিল। শুখভ সেটা তোশকের নীচে চাপা দিয়ে রেখে দিল। আরও কিছু লোকজনকে ওপাশে ঠেলে না পাঠানো পর্যন্ত শুখভ অপেক্ষা করে থাকল। যাতে তাকে মেঝের ওপর খুব বেশীক্ষণ খালি পায়ে দাঁড়িয়ে থাকতে না হয়। কিন্তু পাহারাঅলা সেপাই তাকে দেখে দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, —এইও, কোণে বসে কেন? চলে এসো।

কাজেই শুখভকে মেঝের ওপর খালি পায়ে আলগোছে লাফিয়ে নেমে পড়তে হল। ওর ভালেঙ্কি আর পায়ের পটিগুলো এত সুন্দরভাবে চুল্লির ওপর বসানো আছে যে, ওগুলো ওখান থেকে সরিয়ে আনতে ওর আর ইচ্ছে করল না। অন্যদের কত চটি যে শুখভ বানিয়ে দিয়েছে, কিন্তু একজোড়াও নিজের জন্যে রাখে নি। যাই বলো, এ সব ঠান্ডা তার গা-সওয়া—তাছাড়া বেশীক্ষণ তো থাকতেও হচ্ছে না।

চটি থেকেই বা কী লাভ? দিনের বেলায় খানাতল্লাসির সময় ওরা যদি চটি পায়, সে চটি বগলদাবা করে নিয়ে যাবে।

যে সব ব্রিগেডের ভালেঙ্কিগুলো আজ শুকোতে গেছে, তার মধ্যে যাদের চটি আছে তাদের কথা আলাদা—কিন্তু বাদবাকি সবাইকেই হয় পায়ে পটি বেঁধে, নয় খালি পায়ে ঠান্ডা মেঝের ওপর দিয়ে হাঁটতে হবে।

পাহারাঅলা সেপাই গজর গজর করতে লাগল,—চলে এসো, চলে এসো।

ব্যারাকের বড় ফালতুও তাতে ফোড়ন দিল,—মার না খেলে কথা কানে যাবে না, না রে মড়াখেকো?

এদিককার সবাইকে ঠেলে ওদিকে পাঠানো হল। যারা দেরিতে এল তাদের গিয়ে দাঁড়াতে হল দালানে। পেচ্ছাপের টুক্‌রির ঠিক পাশেই পার্টিশানের ধার ঘেঁষে শুখভ দাঁড়িয়েছে। তার পায়ের নীচে মেঝেটা ভিজে ভিজে। দরজার নীচ দিয়ে ঝির ঝির করে কন্‌কনে ঠান্ডা হাওয়া এসে লাগছে।

ঘরের এদিককার সবাইকে বার করে দেওয়ার পর পাহারাঅলা সেপাই আর ব্যারাকের বড় ফালতু আরেকবার দেখে আসতে গেছে কেউ কোথাও গা-ঢাকা দিয়ে কিংবা ঘুপ্‌চির মধ্যে ঘুমিয়ে আছে কিনা। কারণ, গুণতে গিয়ে যদি কম পড়ে তাহলে চিত্তির। আর গুণতে গিয়ে যদি বেড়ে যায় তাহলেও চিত্তির। কম পড়লে বা বেশী হলে আবার ফিরে গুণতে হবে। ব্যারাকের ফাঁকা দিকটাতে বার বার দুবার ঘুরে আসার পর ওরা দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

—এক, দুই, তিন, চার...। এবার যে যার জায়গায় ফিরে যাবার জন্যে জল্‌দি জল্‌দি করে লোক ছাড়া হতে লাগল। শুখভ কায়দা করে সতেরো জনের ঠিক পরেই ছাড়া পেয়ে গেল। তারপর ছুট্রে চলে গেল নিজের বাঙ্কে। পা রাখার একটু জায়গা করে নিয়ে হু—শ্‌ করে সোজা ওপরে উঠে গেল।

সব ঠিক হ্যায়। পা দুটো কোটের হাতার ভেতর; গায়ের ওপর কম্বল; কম্বলের ওপর ওভারকোট। ব্যস্‌, ঘুমোও। ওরা এবার ওদিককার লোকদের ঠেলে আমাদের এদিকে পাঠাবে। তাতে আমাদের তো ভারি বয়েই গেল।

ৎসেজার ফিরে এল। শুখভ তাকে তার থলেটা ফেরত দিল।

আলিওশা ফিরল। লোকটা একেবারেই করিৎকর্মা নয়। সব সময় পরের উপকার করে বেড়াবে। নিজের রোজগারের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ।

—এই যে, আলিওশা—বলে ডেকে শুখভ ওকে একটা লেড়োবিস্কুট দিল।

আলিওশা হাসল।

—দাও ভাই। কিন্তু তোমার যে কিছু থাকল না!

—আরে, খেয়ে নাও।

আমাদের কিছু থাকে না। আমরা তাই কিছু না কিছু সব সময় উপায় করি।

শুখভ ছোট একটুকরো সসেজ গালে ফেলে দিল। চাকম চাকম করে খাচ্ছে শুখভ। চাকম চাকম। মাংসের স্বাদ। মাংসের সত্যিকার রস। চুঁইয়ে চুঁইয়ে পেটের মধ্যে যাচ্ছে।

ব্যস্‌, সসেজ শেষ।

শুখভ মনে মনে ঠিক করে নিল : কাল সকালে ফাইলে দাঁড়াবার আগে বাকি খাবারটা শেষ করে ফেলতে হবে।

ওপাশের কয়েদীরা এদিকে এসে বাঙ্কগুলোর ফাঁকে ফাঁকে দাঁড়িয়ে জটলা করছে—গণ্‌তি শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে ওদের অপেক্ষা করতে হবে। শুখভ ওদের দিকে কোনোরকম কান না দিয়ে ওর পাতলা ময়লাচিট কম্বলে নিজের মাথাটা মুড়ি দিয়ে নিল।

ভরপুর মন নিয়ে শুখভ ঘুমিয়ে পড়ল। আজ ওর দিনটা বড় ভাল গেছে। ওরা ওকে সেল-হাজতে বন্ধ করে নি; ব্রিগেডকে ঠেলে পাঠায় নি 'সমাজতান্ত্রিক জীবনায়ন নগরে'; দুপুরে সে বাড়তি এক বাটি খিচুড়ি নিয়ে সরে পড়েছিল; ফোরম্যান দলের কোটা ছাপিয়ে যেতে পেরেছে; দেয়াল গাঁথার সময়টা খুব আনন্দে কেটেছে; গা-তল্লাসির সময় লোহার

ফলকটা ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছে; সন্ধ্যেবেলায় ৎসেজারের কাছ থেকে খানিকটা সে রোজগার করেছে; নিজের জন্যে খানিকটা তামাক কিনেছে। আর অসুখ তাকে সেভাবে পট্‌কে ফেলতে পারে নি। কোনোরকমে আবার ঠিক খাড়া হয়ে উঠেছে।

কোনোরকম কোনো মুখভার না করেই একটা দিন অতিক্রান্ত হল। প্রায় একটা খুশিখোশালির দিন।

লোকটার মেয়াদে আগা থেকে গোড়া ছিল এমনি তিন হাজার ছ' শো তিপ্পান্নটি দিন।
তিনটে দিন বেড়ে গিয়েছিল লীপ-ইয়ার পড়ায়।

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়

জীবনের রূপক বা প্রতিমা নির্মাণই ঔপন্যাসিকের মূল লক্ষ্য। উপন্যাসের চরিত্র-পাত্র-পরিকল্পনা, উপায়-উপকরণের ভাবনা সবকিছুই সেই মূল লক্ষ্য-সিদ্ধির প্রয়াসের সঙ্গে প্রসঙ্গ-বদ্ধ। এবং ঔপন্যাসিকের এই জীবন-প্রতিমা-নির্মাণের সবটুকুই যেহেতু শেষ তাৎপর্য খোঁজে জীবনার্থ-নির্ণয়ে, সেই হেতু তাঁর উপাদান-উপকরণের সর্বস্তরে ও সর্বপর্যায়ে সেই জীবনার্থ-চেতনাই সক্রিয় থাকে। প্রতিমা যেমন ধ্যানমূর্তির বস্তু-বিগ্রহ, উপন্যাসের জীবন-প্রতিমাও তেমনি ঔপন্যাসিকের জীবন-ধ্যানেরই বস্তু-বিগ্রহ। সে কারণে উপন্যাসের গঠনশৈলী-বিচারের সঙ্গে সঙ্গে ঔপন্যাসিকের বক্তব্যের বিচারও অনেকাংশে সম্পন্ন হয়ে থাকে। যাকে হেনরি জেমসের মতো উপন্যাস-তাত্ত্বিকেরা বলে থাকেন ঔপন্যাসিকের মানকোৎকর্ষ—তা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসের আন্তর-সত্তার জনক হলেও, বস্তুতঃ উপন্যাসের সর্বাঙ্গীণ বিন্যাসেই তার প্রতিফলন। এই গঠনশৈলীর ভিতর দিয়ে ঔপন্যাসিকের চেতনার তিনটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

(ক) চরিত্র-পাত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কের চলিষ্ণুতা সম্বন্ধে চেতনা। এই সম্পর্কসূত্রগুলি সম্বন্ধে লেখকের বিশিষ্ট জ্ঞান প্রকৃতপক্ষে লেখকের বিষয়-জ্ঞানের প্রধান অংশ।

(খ) ব্যক্তিমানুষের স্বাতন্ত্র্যই উপন্যাসের মূল বিষয়। কখনও প্রকৃতিবিধৃত মানুষ, কখনো সমাজবিধৃত মানুষ, কখনো আত্মগত, কখনও ঘটনাগত—ব্যক্তিমানুষের নানা পটকে ঔপন্যাসিক ব্যবহার করেন—পটবিধৃত মানুষকেই সর্বাঙ্গীণতা প্রদানের জন্য। পটকে যথোপযুক্ত ভূমিকা প্রদানের কাজে ঔপন্যাসিকের প্রধান সহায় পট-প্রসঙ্গের পরস্পর অন্বয় সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব সচেতনতা।

(গ) এবং উল্লিখিত দুটি বিষয়ের ভিতর দিয়েই পরোক্ষভাবে লেখকের সভ্যতা সংক্রান্ত মৌলিক প্রশ্নটি প্রতিফলিত হয়।

ইতিহাসের গতিবেগের মান্দ্যে ও তীব্রতায় সভ্যতার নানা মূল্যগত প্রশ্ন কখনো কখনো ব্যাপক ও গভীর আকার ধারণ করে। উপন্যাস সাহিত্যেও সেই সময়েই উক্ত প্রশ্নগত ব্যাপকতা ও গভীরতা উপন্যাসের গঠনশৈলীতে বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করে। আবার, এক এক জাতির উপন্যাসে জীবনের রূপক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ব্যঞ্জনাগর্ভ হয়ে ওঠে। ইংলন্ডীয় উপন্যাস-সাহিত্যে পরোক্ষে প্রত্যক্ষে ইংলন্ডের গৃহ-চেতনা, গৃহ-কেন্দ্রিক সম্পর্কের টানা-পোড়েন বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। যে 'হোম' ইংলন্ডীয় জীবন চেতনার কাঠামোগত মেরুদণ্ড, সে দেশের উপন্যাসের সকল বৈচিত্র্য সেই মেরুদণ্ডের উপরেই রূপায়িত। এমন কি ইংরাজী উপন্যাসে যখন এ্যাডভেঞ্চারারের জীবনও অঙ্কিত হয়েছে তখনও সে জীবনকে দেখা হয়েছে এমন এক মানুষের দৃষ্টিতে যে মানুষ গৃহস্বাচ্ছন্দ্যের অগ্নিকুণ্ডের পাশে সমাসীন। পরোক্ষ গৃহচেতনাটি ঔপন্যাসিকের মনে বদ্ধমূল বলেই এ্যাডভেঞ্চারারের জীবনের ঘাতপ্রতিঘাত বর্ণনার সময় বারে বারে এই কথাটাই ফুটে উঠেছে যে বর্ণিত নায়ক গৃহছাড়া। সেই কারণে বলা যায় রবিনসন ক্রুশো ইংলন্ডের প্রতিনিধিত্বমূলক উপন্যাসের

ভিতরেও ইংলন্ডবাসীর মেজাজকে আমরা সর্বতোভাবে পেয়েছি। পক্ষান্তরে রুশ উপন্যাসে দেখা যায় যে সময়ের ও স্থানের অনুভূতিই সেখানকার উপন্যাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য। পরিবর্তন, এবং সময়ের সুদীর্ঘ পদক্ষেপের বিলম্বিত লয়, রুশ উপন্যাসে যে ছন্দ সৃষ্টি করে তার সঙ্গে বাংলা তান প্রধান ছন্দের সাধর্ম্য আছে—শোষণক্ষমতায়, বহনক্ষমতায় সেও অতুলনীয়। রুশ উপন্যাসের চরিত্র-পাত্র মাত্রেই সময়ের হাতে-গড়া দার্শনিক। সদ্যকথিত বৃহত্ত্বের অনুভূতি সে সব উপন্যাসে প্রধান বলেই অতি অকিঞ্চিৎকর ঘটনার মধ্যেও সেখানে বৃহতের প্রকাশকে উপলব্ধি করা হয়—এই অংশেরই রুশ উপন্যাস আধুনিক উপন্যাসের স্বগত ভাবনাশীল নায়কদের ঐতিহ্যের উৎসগুলির অন্যতম। এবং ফরাসী উপন্যাসে প্রসঙ্গের বিশিষ্টতা মানসিক আক্ষেপকেই বেশী মর্যাদা দেয়। ফরাসী উপন্যাসের ধ্রুপদী-রূপে এবং আধুনিকরূপে—উভয় ক্ষেত্রেই এই মানসিক আক্ষেপ প্রধান বিষয়। ঘটনার নাটকীয় প্রতিক্রিয়া নয়, মানসিক প্রতিক্রিয়াই ফরাসী উপন্যাসের লক্ষ্য। হয়তো এ সবের কারণও বিশেষ দুঃসন্ধেয় নয়। ইংরাজী সাহিত্যের ইতিহাসে দ্রুতগামী যুগবিভাগগুলির কথা মনে রেখেও বলা যায় দীর্ঘকাল ধরে ইংলন্ডের গৃহ-চেতনার প্যাটার্ন অপরিবর্তিত থেকেছিল। রুশ ইতিহাসের মন্থরগতিতে বিষণ্ণ পর্যবেক্ষণের অবকাশ। এবং ফরাসী জীবনের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের চেহারা বড় ধারালো। লেখকদের দেশজ জীবনজ্ঞানের আন্তরিকতা ও বিশিষ্টতা জীবন-প্রতিমা-নির্মাণের প্রধান সহায়। সেই জ্ঞানেরই এক এক ধরনের পরিচয় পাওয়া যায় এক এক দেশের উপন্যাসের গঠনশৈলীর চেতনায়। কিন্তু এ সমস্ত ব্যাখ্যা আমাদের বেশীদূর সাহায্য করে না। আসলে সকল দেশের ঔপন্যাসিকের কাছেই ঐতিহ্যের প্রশ্নকে সঠিকভাবে অনুধাবন ও তার মীমাংসা প্রয়াসই প্রধান কথা। এক এক দেশজ আধারে এই প্রশ্নের এক এক আকারগত রূপায়ণ, প্রকারগত তীব্রতা। য়ুরোপে গত একশত বছর ধরে সাধারণতঃ তিনটি পাদপীঠে দাঁড়িয়ে এই প্রশ্নকে অনুধাবন করার প্রয়াস হয়েছে। ক্যাথলিক ধর্ম-জিজ্ঞাসা, উদারনীতি, এবং বৈজ্ঞানিক সমাজচেতনা ও মানসচেতনা। এই ত্রিমুখে ঐতিহ্যের মীমাংসাই সাধারণতঃ য়ুরোপের উপন্যাসে জীবন-প্রতিমা-নির্মাণের মননজাত প্রেরণা জুগিয়েছে।

বাংলা উপন্যাসের কথাও এই প্রসঙ্গপটেই বিচার্য। এখানেও ঐতিহ্যের প্রশ্ন এখানকার দেশজ আকারে অন্য রূপ পরিগ্রহ করেছে। আমাদের গৃহধর্ম, আমাদের সমাজধর্ম, কালান্তরের যে সব তরঙ্গাঘাতের সম্মুখীন হয়েছে স্বভাবতই আমাদের উপন্যাসে এখনও পর্যন্ত অধিকাংশ ক্ষেত্রে সেই প্রতিক্রিয়াই মুখ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে প্রধানতঃ গৃহধর্মলালিত সম্পর্ক-চেতনার নানা অভিব্যক্তি, নানা টানাপোড়েন ও ভাঙাগড়া লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের গোরা এ প্রসঙ্গে মহৎ ব্যতিক্রম বটে, কিন্তু অন্য উপন্যাস-গুলিতে গৃহধর্ম-চেতনা প্রবল। চোখেরবালিতে এই গৃহধর্মের ব্যত্যয় যে সম্পর্কগত সংঘাত-সংক্ষোভ, যোগাযোগ তাই ভিন্নপট-প্রসঙ্গে অন্যার্থসঞ্চারী হয়েছে। চোখেরবালিতে মাতা মাতার মত ব্যবহার করেনি, পুত্র পুত্রের ব্যবহার করেনি এবং স্বামীর ব্যবহার স্বামী করেনি—মূল গঠনাস্থিতে এই ব্যাপারই প্রধান শক্তি। যোগাযোগে মধুসূদন ঠিকভাবে স্বামী হল না বলেই ইচ্ছা সত্ত্বেও কুমু পত্নীধর্মকে সফল করে তুলতে পারছিল না; মধুসূদনের গৃহ পূর্ণরূপ পরিগ্রহ করতে পারল না। অবশ্যই চরিত্রগুলির ব্যক্তিগত পুরুষার্থ নিজ নিজ ব্যক্তিত্বের ন্যায়কে অনুসরণ করেছে—এবং তাতেই উপন্যাসের অনতিনাটকীয় কিন্তু তীব্র আক্ষেপ-সমন্বিত গঠনশৈলী সার্থক হতে পেরেছে বটে—তথাপি, রঙ্গমঞ্চের যে নেপথ্য

থেকে কুশীলবেরা বেরিয়ে এসেছে সেটি অবশ্যই একটি স্থির বিন্দু। সেটাই রবীন্দ্রনাথের গৃহধর্মচেতনা—গোরায় এরই পরিবর্ধিতরূপে পেয়েছি সমাজচেতনাকে। আবার গৃহধর্মের কঠিন বন্ধনকে স্বীকরণ ও সেইসঙ্গে সকল বন্ধন থেকে মুক্তির যে অনাসক্ত প্রয়াস ভারতীয় জীবনের নিজস্ব দ্বান্দ্বিক ছন্দ—সেই বিস্তার এবং সমের চেতনা চতুরঙ্গ উপন্যাসের গঠন-শৈলীর রচয়িতা, সে উপন্যাসের পরম তাৎপর্যের জনক। এবং এইদিকের বিচারে চতুরঙ্গ রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসমালায় সর্বোত্তম যোজনা।

উপন্যাসের গঠনশৈলী বিচারে বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে যে পার্থক্য তারও মূল উভয়ের ঐতিহ্যচেতনার বিশিষ্টতার মধ্যেই অনুসন্ধেয়। বঙ্কিম মানুষের জীবনে নানা অংশে বিভক্ত বৃত্তিগুলিকে সুসমঞ্জস করার আদর্শ পেয়েছিলেন ভারতবর্ষের ধর্মের ইতি-হাসের এক বিশেষ পর্যায় থেকে। তিনি সে পর্যায়টির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছিলেন তুলনামূলক বিচারের সাহায্যে। এই নানা অংশের সামঞ্জস্য-সমন্বিত ব্যক্তি স্বভাবতই পূর্ণাদর্শ বলে তা ঔপন্যাসিকের কল্পনাকে আকৃষ্ট করে না। কিন্তু যেখানে সামঞ্জস্য নেই—নানা অসামঞ্জস্য যেখানে আবেগে বাসনায়, লোভে নানা আকস্মিকতার মধ্য দিয়ে আত্মপ্রকাশ করে সেখানে বঙ্কিমের ঔপন্যাসিক আগ্রহ ত্বরান্বিত হয়ে উঠত। এই অসংযত বাসনাজনিত অসামঞ্জস্য বারে বারে নাটকীয় আকস্মিকতার জন্ম দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনশৈলীতে তাই নাট্যধর্মিতা প্রবল। পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় ঐতিহ্যের অংশ-বিশেষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন না করে তার লোকাশ্রয়ী শাশ্বত স্বরূপটিকে জানতে চাইতেন। তাই মানবিকতার উপর আস্থা তাঁর অশেষ। সেই আস্থার মূলে উক্ত লোকাশ্রয়ী চেতনা। সেই মানবিকতাকে রবীন্দ্রনাথ সর্বাংশে পরীক্ষা করতে চেয়েছেন বলেই আকস্মিকতাকে প্রশ্রয় দেননি। তাঁর বিনোদিনী নানা বাঁকা ও জটিল পথ শেষ করে উপসংহারে সবাইকে বাঁচিয়ে দেয়। তাঁর সাধারণ মানুষেরা নিজেদের স্বভাবেই উপন্যাসে গতি আনে, জটিলতার গ্রন্থি মোচন করে,—বঙ্কিম এ জায়গায় হয়তো একজন অলৌকিক মানুষকে আহ্বান করতেন। গোরা উপন্যাসে বিনয় উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যে উত্তেজিত ঘোড়াকে সামলেছে—রোমান্সের নায়ক হিসাবে নয়, শক্তিমান স্বাভাবিক যুবক হিসাবে। পরেশবাবুদের বাড়ির মেয়েদের তার ভাল লেগেছে। সুতরাং প্রস্তাবিত অভিনয়ে অংশগ্রহণে তার অনিচ্ছা নেই। কিন্তু গোরার কারাদণ্ডের আদেশ শোনামাত্র তার সিদ্ধান্ত গ্রহণে দেরী হল না। সে অভিনয় পরিহার করল। অসমসাহসিকা ললিতার ব্যবহারেও সে বিচলিত হল না বা আবেগে কম্পমান হল না। গল্পের প্রথম দৃশ্যের মতই বলিষ্ঠ হাতে দায়িত্ব গ্রহণ করল বিনয়। উপন্যাসের প্রথমাংশের যাত্রারম্ভের নায়ক বিনয়—মধ্যাংশের তীব্র আলোড়নেরও স্রষ্টা বিনয়। বিনয়ের জীবনধর্মী বিশুদ্ধ মানবিকতা উপন্যাসকে থামতে দেয়নি—আগ্রহকে স্তিমিত হতে দেয়নি। এবং আরো অন্যান্য উপন্যাসের ক্ষেত্রেও দেখা যায় রবীন্দ্রনাথের সাধারণেরা পরম স্বাভা-বিকতায় উপন্যাসের জটিলতা মোচন করেছে—তাকে সমে ফিরিয়েছে। বঙ্কিম সাধারণ মানুষের জীবনের জট-মোচনে নিয়ে এসেছেন অলৌকিকদের। উভয়ের এই বিপরীত বৈশিষ্ট্য একদিকে যেমন উভয়ের পৃথক ঐতিহ্যচেতনার ফল, আবার অন্যদিকে নিজ নিজ গঠনশৈলীগত চেতনার জনকও বটে।

জেন অস্টেনই হোন অথবা হার্ডিই হোন যে কোনো ঔপন্যাসিকেরই গঠন-কৌশলের বৈশিষ্ট্যকে উপলব্ধি করতে হয় সেই উপন্যাসের চরিত্র-বিন্যাসের তাৎপর্যের মাধ্যমে। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের চরিত্র থেকে উপন্যাসের ঘটনাগতিকে পৃথক করে ভাবাই যায় না।

চরিত্রগুলি বঙ্কিমী কল্পনাভূমিতে জন্মগ্রহণের মুহূর্ত থেকেই ঘটনাগর্ভ। এই কারণেই বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠনবিন্যাস নাট্যধারার ঐতিহ্যবাহী হয়ে ওঠা অসমীচীন হয়নি। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে সেক্ষেত্রে ঘটনাগতির প্রতি পক্ষপাত ন্যূন—শরৎচন্দ্র পরিস্থিতি-প্রিয়। তাঁর উপন্যাসের গঠন-পরিকল্পনার সারল্য অনবদ্য—এবং চরিত্রবিন্যাসে তাঁর ঐতিহ্যজ্ঞানেরও স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত শশিভূষণ দাশগুপ্তের শরৎচন্দ্রের নারী ও পুরুষ শীর্ষক আলোচনা এ সম্বন্ধে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু উপন্যাসের কাঠামোর দিকে তাকালে বোঝা যায় যে শরৎচন্দ্রের চরিত্রেরা পরিস্থিতির সঙ্গে যুক্ত হতেই ভালবাসে। শরৎচন্দ্রের চরিত্রগুলিকে সহজে পরিস্থিতি থেকে পৃথক করে নেওয়া যায় এবং তখন তাদের কোনো অর্থই থাকে না, আর বঙ্কিমচন্দ্রের চরিত্রদের ঘটনা থেকে পৃথক করাই যায় না। শরৎচন্দ্রের চরিত্রোপন্যাস-গুলিতে অসংখ্য দ্বিবর্ণ চরিত্রের সমাবেশ। এক একটা পরিস্থিতি তারা পেরিয়ে যায়। পরিস্থিতিগুলি সোপানের মতো সাজানো নয়। ছকের মত সাজানো। এই বিন্যাসের ব্যাপারে তাঁর অকারণ পক্ষপাতের জন্যই শরৎচন্দ্রের চরিত্র-রস-প্রধান উপন্যাসে গাঠনিক ব্যর্থতা এসেছে।

তথাপি শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসের বিষয় কল্পনায় গৃহ-জীবনের আধিপত্যই প্রবল ছিল। এবং এই গৃহ-জীবনের সমস্যার মূল উৎস ঊনবিংশ শতকের কালান্তরের তরঙ্গাঘাতে। উনিশের শতকের মধ্যভাগ থেকেই আমাদের প্রথানুগত গৃহধর্মচেতনা প্রচন্ড না হলেও, যে প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হল তার তীব্রতা স্বল্প নয়। এই দীর্ঘ সময়ে অধিকাংশ উপন্যাসে যে জীবন-প্রতিমা নির্মিত হয়েছে তার প্রধান উপাদান সংগৃহীত হয়েছে এই প্রতিক্রিয়া থেকে। সম্পর্কসূত্রের প্রতিটি গ্রন্থিতে এ দেশের চিৎক্ষেত্রে স্থায়ী নারী-রূপকের ব্যবহার ছিল অনিবার্য। সেই নারীরূপকের ধ্যানে ব্যত্যয় যখন ঘটেছে তখনই উপন্যাসে বিন্যাসগত কৃত্রিমতা দেখা দিয়েছে। ঘরে বাইরের বিমলা ও শেষপ্রশ্নের কমল সামাজিক বাসনালোকে ধৃত চরিত্র নয় বলেই এই উপন্যাস দুটিতে বিন্যাস-রীতির দিক থেকে বিভ্রান্তি দেখা দিয়েছে। এই ধ্যান সম্বন্ধে স্বকীয়তা না থাকলে সম্পর্কসূত্রগুলি মেরুদণ্ডহীনতায় এলিয়ে পড়ে—যেমন নৌকাডুবি। গঠন-শৈলীর দিক থেকে উপন্যাসে তাৎপর্য আনেন ঔপন্যাসিক ব্যক্তিত্বের নিহিত প্রশ্ন উত্থাপনের বৈশিষ্ট্যে। গৃহদাহের অচলার ব্যক্তিত্বের কোনো বৈশিষ্ট্য না থাকায়, সে হৃদয়মণ্ডটি সুরেশ এবং মহিমের সংঘাতের ক্ষেত্র হল। এখানে ত্রিকোণ গঠনরীতি অনুসৃত হয়েছে—অবশ্য প্রচলিত অর্থে নয়। নষ্টনীড় উপন্যাস না হলেও, চারুর ব্যক্তিত্ব পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয়েছে। চারুর ভিতরে আমাদের হৃৎকন্দরে পোষিত নারীত্বের আদর্শের দেখা পাই। সকল নারীর মত আবহমানের ধারায় সেও রচনা করতে চায় নিজেকে ঘিরে পুরুষকে নিয়ে। চারুর সমস্যা এইখান থেকেই উদ্ভূত, এবং রচনাটিকে ত্রিকোণী না করে লেখক ত্রিমুখী করে গড়েছেন। অমল, চারু, ভূপতি তিনজনে ত্রিধাবিভক্ত হয়েছে শেষে—কিন্তু একটা বিন্দু থেকেই তিনজনের যাত্রা। সেই বিন্দুটার নাম দেওয়া যেতে পারে নিজেকে রচনা করার প্রচেষ্টা।

তিরিশের যুগে এসে বাংলা উপন্যাসের এই গৃহধর্মচেতনার আধিপত্যের অবসান হল। উপন্যাসের গঠন-শৈলীরও বিকাশ ঘটল বিচিত্র পথে। তিরিশের যুগেই দেখা গেল যে উপন্যাসের কাহিনী-কথনে পূর্ববর্তী একশ বছরের গাদ্যিক ঐতিহ্যের অনেকখানিই ব্যবহৃত হতে শুরু করেছে। চিঠি, ডায়েরী, অন্তর্গত স্বগত আলাপ, লোককথার ব্যবহার, উপন্যাসে প্রভাব বিস্তার করেছে এ যুগেই। বিশুদ্ধ উপন্যাস রচনায়

জগদীশ গুপ্তের প্রয়াসকে স্মরণে রেখেও বলা যায় যে, ব্যক্তির যে ব্যাপক ও গভীর সত্তাকে প্রতিমায়িত করার জন্য এ যুগের ঔপন্যাসিকেরা তৎপরতা দেখিয়েছেন তার মূল ছিল পুরুষার্থ সম্বন্ধে নূতনতর জিজ্ঞাসার মধ্যে। এই জিজ্ঞাসার কারণেই এ যুগের নায়কেরা নিরীক্ষাশীল। এবং নিরীক্ষাশীল নায়কদের জন্যই উপন্যাসের বিন্যাসেও নানা নিরীক্ষা এ যুগেরই বৈশিষ্ট্য। আমাদের উপন্যাসে এর পূর্ব পর্যন্ত গৃহধর্মচেতনা প্রধানতঃ প্রবল-ভাবে সক্রিয় ছিল। ইংরাজি উপন্যাসেও গৃহচেতনা অধিষ্ঠাতা-চেতনা। কিন্তু সেখানে পুরুষই গৃহ-রচয়িতা বলে উপন্যাসে পুরুষ প্রাধান্য খর্বিত নয়। কিন্তু আমাদের গৃহ-সম্পর্কে নারীরাই প্রধান। তাই সম্পর্কসূত্রগুলিকে নারী চরিত্রের মাধ্যমেই ঔপন্যাসিকেরা সর্মাধিক অনুভব করতে চেয়েছেন। তিরিশের কালে ব্যক্তির ক্রমবর্ধমান আত্মচেতনায় কেবল গৃহ সম্পর্কই নয়, মানবিক সম্পর্কের সমস্ত সূত্রগুলিই সক্রিয় হয়ে উঠল। তারাশঙ্করের এ যুগের কতকগুলি উপন্যাসে গোরা উপন্যাসের উত্তরাধিকার এই অর্থেই প্রবল, যে সমগ্রের সঙ্গে ব্যক্তির মানবিক সম্পর্কগুলি সম্বন্ধে চেতনা সেগুলিতে রূপান্বিত হয়েছে। গোরায় ব্যক্তিই চলিষ্ণু। সমগ্র পট সেখানে ব্যক্তির টানে চঞ্চল হয়ে উঠল। তারাশঙ্করে যাকে সমগ্র আখ্যা দেওয়া হচ্ছে তা নিজেই চলিষ্ণু—ব্যক্তির মধ্যে তার বিকাশ প্রকাশ লাভ করে। এই কারণেই তারাশংকরের মধ্যবিত্ত পাত্রপাত্রী প্রধান উপন্যাস নায়ক-প্রধান: এবং শুধু তারাশঙ্কর কেন, এ যুগের নিরীক্ষাশীল সমস্ত চরিত্র-প্রধান উপন্যাসগুলি মূলতঃ নায়ক-প্রধান। পুরুষার্থ চেতনায় দেশকালের বোধ মৌলিক শক্তিসঞ্চার করার ফলেই বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের ইতিহাসে এই অভূতপূর্ব নায়ক-নিরীক্ষার যুগ সম্ভব হয়েছে। দশকে দশকে আমরা যতই ভাগ করতে চাই না কেন এখনও পর্যন্ত বাংলা উপন্যাস সাহিত্যে তিরিশের যুগে উন্মেষিত বৈশিষ্ট্যের সম্বলই প্রধান সম্বল।

এই যুগের উপন্যাস প্রচেষ্টাকে প্রধানতঃ তিনটি ধারায় বিভক্ত করে দেখা চলে। এর একটি ধারায় লক্ষ্য করা যায় বঙ্কিমী ঘটনা-বিন্যাসের ঐতিহ্যানুসরণ। বনফুলের দ্বৈরথ এই জাতীয় উপন্যাস। আর এক ধারায় লক্ষণীয় নায়কের দেশকাল জিজ্ঞাসা, যাকে আমরা গোরা উপন্যাসের ঐতিহ্যবাহী বলেছি। প্রসংগতঃ তারাশঙ্করের কিছু উপন্যাস এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। অন্য একটি ধারায় প্রধান হয়েছে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর জটিলতার চেতনা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল ও প্রেমেন্দ্র মিত্র এই ধারার অন্তর্ভুক্ত—যদিও এঁদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান দুস্তর। এ সমস্ত উপন্যাসে দেখা যায় যে নায়কেরা অভিজ্ঞতার আধার হিসাবে বিশিষ্ট। চরিত্রগুলির মনোলোকের বিশিষ্ট গঠনের সাহায্যে ঔপন্যাসিকেরা আলোচ্য কালের জীবনপ্রতিমা নির্মাণ করেছেন। এঁদের তিনজনেরই নায়ক-কল্পনায় স্বগতভাষী বিপন্ন-বিস্ময় নায়ক পরিস্ফুট হয়েছে। সেক্ষেত্রে তারাশঙ্করের মধ্যবিত্ত নায়ক বিশূন্য-বিস্ময় নায়ক নয়। হাক্সলির প্রথম যুদ্ধোত্তর নায়কের ভাষায় সে কখনো বলে না since the war we wonder at nothing. কিন্তু তা সত্ত্বেও তারাশংকরের উপন্যাসের শিল্পকর্মে প্রকাশিত ঐতিহ্যচেতনা বঙ্কিম রবীন্দ্রনাথের মতোই বিশিষ্ট হতে পেরেছে বলে তার তাৎপর্য অসামান্য। মানিক-বনফুল-প্রেমেন্দ্রের নায়কদের মতো তারাশঙ্করের নায়কেরা অবশ্য কখনোই জিজ্ঞাসার যন্ত্রণায় মথিত নয়—বরঞ্চ তারা যেন কতকটা অকারণেই উপলব্ধির প্রত্যয়ে দীপ্ত। কিন্তু এ ক্ষতি তারাশঙ্কর পূরণ করেছেন পট-প্রসঙ্গের যাথার্থ্য নির্মাণে। মাতৃকামূর্তি নির্মাণে সিদ্ধহস্ত তারাশঙ্কর জাতীয় মনোলোকের মাতৃকা-প্রীতিকে রূপায়িত করেছেন তার উপন্যাসের গাঠনিক বৈশিষ্ট্যেও। গ্রাম (গণদেবতা) নদী (হাঁসুলী বাঁকের

উপকথা) অথবা মৃত্যুরূপা দেবী (আরোগ্য নিকেতন) এই তিন পটভূমিকেই তারাশঙ্করের ধাত্রী জননীর প্রতীকে রূপান্তরিত করেন—চিরপোষিত মাতৃকাধ্যানের প্রেরণায়। এমনকি তারাশঙ্করের প্রেমিকা নায়িকা কল্পনাতেও এরই প্রভাব ও আকর্ষণ। এ কারণেই তাঁর নায়কদের নিজেদের দ্বন্দ্ব কম—ধৃতিরূপিণীর ক্রোড়াশ্রিত যে তারা। আবার তারাশঙ্করে আমরা ঐতিহ্যচেতনার যে বিকাশ লক্ষ্য করি বিভূতিভূষণে তার রূপ স্বতন্ত্র। ঐতিহ্য বাঁধা ছক নয়। ঐতিহ্য নানাভাবে নানা হাতে সক্রিয় থাকে। বিভূতিভূষণ আমাদের উল্লিখিত ধারাগুলির কোনোটির মধ্যেই পড়েন না। এবং তাঁর উপন্যাসের গঠন-রীতিতে সারল্য এতই প্রধান শক্তি যে তা বিশ্লেষণের অতীত। কিন্তু তাঁর চরিত্রগুলির মধ্যেও ভারতীয় ঐতিহ্যের লোকায়ত চেতনাটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। নানা দুঃখ ধান্ধার মাঝখানেও চরিত্রগুলি শান্ত সমাহিত—নিরুদ্বেগ অথচ নিরভিমান।

তথাপি যে যুগের কথা আমরা বলছি সে যুগের উপন্যাসের জীবন-প্রতিমার মাধ্যমে সময়ের ব্যাপক জটিলতার ব্যাখ্যা-রূপ নির্মাণ ঔপন্যাসিকদের অবশ্য করণীয়ের অন্যতম ছিল। তারাশঙ্করের মধ্যবিত্ত নায়কদের মধ্যে সময়ের আবেগ উপস্থিত, কিন্তু সময়ের জটিলতাকে ধারণের তারা উপযোগী ছিল না। হয়তো কতকটা সে কারণেই পাঠকের অজ্ঞাত কোনো শ্রেণীর মানুষের জীবনযাত্রা বর্ণনার আধারে অভিজ্ঞতার বিস্ময়কে মূর্ত করে তারাশঙ্কর বাংলা উপন্যাসে এক বলিষ্ঠ ধারার স্রষ্টা হলেন। চারের ও পাঁচের দশকে বেশ কয়েকজন ঔপন্যাসিক তারাশঙ্করকে অনুসরণ করেছেন হয়তো অজানিতেই। অন্য-দিকে কেউ কেউ অন্ততঃ উপন্যাসে সময়চেতনাকে প্রবল ভাবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। তিন-চার-পাঁচ বা ছয়ের দশকেও তাঁরা অভিনিবেশে ও আন্তরিকতায় সময়ের ব্যাপকতা ও জটিলতার মূর্তি নির্মাণে সমানভাবে প্রয়াসী। বনফুল তাঁদের অন্যতম। তাঁর "ত্রিবর্ণ" সে জাতীয় উপন্যাস।*

এই উপন্যাসখানির সাহায্যে, বনফুলের শক্তি ও সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে, আধুনিক জীবনের যন্ত্রণাভিত্তিক উপন্যাসের গঠনশৈলীর সমস্যাকে বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। এই জাতীয় উপন্যাসের চরিত্রগুলিকে কেবলমাত্র সময়ের জটিলতা সম্বন্ধে সচেতন হলেই চলে না—এবং চরিত্রগুলির পরস্পর সম্পর্কের চলিষ্ণুতা সম্বন্ধে লেখকের ধারণাতেও সময়ের হস্তাবলেপ অবশ্য পরিস্ফুট হওয়া প্রয়োজন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলনাচের ইতিকথার নায়ক জটিলতা সম্বন্ধে সচেতনতার জন্য প্রখ্যাত নন—তিনি নিজেই জটিলতার সন্তান। তারাশঙ্করের নায়কের সময়ের জটিলতার বোধ নেই—বনফুলের নায়কেরা সময়কে স্পর্শ করে থাকে সকল সময়েই—কিন্তু তারা জটিলতার সন্তান নয়। বনফুলের উপন্যাসের উপাদানে ডায়েরি এবং চিঠিপত্র একটি মূল্যবান ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে—বনফুলের নায়কেরা গদ্যময় বাস্তবধর্মী মানুষ, জীবনের স্বাস্থ্য-ব্যত্যয় সম্বন্ধে তাদের জ্ঞান অটুট। কাহিনী নয়—মানুষটিকে অথবা মানুষগুলিকে স্পষ্ট করে তোলাই বনফুলের লক্ষ্য। ডায়েরি বা চিঠিতেই মানুষ নিরাবরণ। সেই নিরাবরণ, স্পষ্ট মানুষটাকে রূপ দেবার জন্যই বনফুলের উপন্যাসগঠনে ডায়েরি ও চিঠির এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস-গঠন আপাতদৃষ্টিতে শিথিল। নায়কের অদৃষ্টসূত্রেই সেখানে আসে এক অন্তর্গূঢ় সংহতি। তারাশঙ্করের উপন্যাসগঠনে বিষয়ীর অধ্যাত্মচেতনা অধিক

* ত্রিবর্ণ—বনফুল। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোঃ লিমিটেড। মূল্য দশ টাকা।

বাঙ্ময়—বনফুলের উপন্যাসগঠনে তাঁর জীবনের স্বাস্থ্যের বোধ সদাই প্রভাবশীল। উভয়ের এইখানেই সতর্কতার ক্ষেত্র যে অধ্যাত্মচেতনায় যদি কখনো কৃত্রিমতা দেখা দেয় সেটাই হয়ে উঠবে প্রবঞ্চনা; স্বাস্থ্যের বোধ কৃত্রিম হলে সেটাই হবে ব্যাধি। এ'দের সম্বন্ধে আরো একটি কথা উভয়ের ঔপন্যাসিক চরিতার্থতা প্রসঙ্গে অবশ্য স্মর্তব্য। প্রত্যেক বড় ঔপন্যাসিক বাঁচার বিষয়ে যেমন কথা বলেন পরোক্ষে বাঁচার আদর্শ সম্বন্ধেও বলেন। টলস্টয় ও মান্-এর কথাই শুধু নয় ডস্টয়ভস্কিও এ ব্যাপারে আদর্শ। তারাশঙ্কর কেমনভাবে জীবনকে অনুভব করতে হবে সে কথা বলেন—কবি গণদেবতা পঞ্চগ্রামে ও সন্দীপন পাঠশালায় কী করে বাঁচতে হবে সে কথাও তিনি বলেন। বনফুলের ডানা উপন্যাস থেকে এই বিষয়ক বক্তব্য ইতিবাচক স্পষ্টতা লাভ করেছে। সপ্তপদী উপন্যাসের পর থেকে তারাশঙ্কর এ সম্বন্ধে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছেন।

"ত্রিবর্ণ" উপন্যাসের প্রধান মানুষগুলি—শুধু ত্রিবর্ণ কেন—বনফুলের প্রায়-উপন্যাসের প্রধান চরিত্রের কথা ভাবলে দেখা যায় যে তারা সবাই বড় মাপের মানুষ। যেন তারা সকলেই উনিশের শতকের প্রশস্ত রাজপথের মহান নাগরিক। আকৃতি প্রকৃতিতে সাধারণের ঊর্ধ্বে তাদের আসন। পৃথক তাদের চলা, বলা, ভাবা, ও করা। বনফুলের দুটি একটি হালকা ধরনের রচনার কথা বাদ দিলে বোধহয় জঙ্গমই তাঁর দায়িত্ব-গম্ভীর রচনার মধ্যে এ প্রসঙ্গে একমাত্র ব্যতিক্রম। এবং এই ব্যতিক্রম-সাধন বনফুলের স্বধর্ম পালন হয়নি। জঙ্গম উপন্যাসের শঙ্করের উদ্দেশ্যহীনতা এ কারণে উদ্দেশ্যহীন আয়তনের জনক হয়েছে। এই উপন্যাসে বনফুল চেষ্টা করেছিলেন মানুষগুলো এবং ঘটনাগুলোকে সমমাপের করে তুলতে। তা হয়তো সেখানে হয়েছে। কিন্তু বনফুলের চরিত্রদের যে নিজস্ব বৈশিষ্ট্য তা হারিয়ে গেছে। বনফুলের অন্যসব উপন্যাসে একটি অর্থব্যঞ্জনাময় আপাত-অসঙ্গতি বিদ্যমান। সেটি হল প্রধান মানুষগুলি বড়মাপের, আর তুলনায় ঘটনাগুলি ছোটমাপের। সে ও আমির নায়ক বা ভুবন সোম কিম্বা হাটে-বাজারের ডাক্তার-বাবু, কিম্বা ত্রিবর্ণের ডাক্তার সুঠাম মুখোপাধ্যায়ের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। বাংলা দেশের উনিশ শতকের আদর্শের ক্রোড়ে লালিত বৃহৎ মানুষের মহৎ আদর্শের গুরুগৌরব এখন যেন প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে সম্মুখে দেখছে এক অর্বাচীন ইতরতাকে। এখন তাদের সামনে আদর্শের প্রতিযোগিতা নয়, মানুষের সাধারণ শ্রীভ্রষ্ট স্থূলতার ব্যাপারটিই অধিকতর জীবন্ত। বনফুলের বড়মাপের নায়কেরা এই এ্যাভারেজ পাপ ও পুণ্যের, দৈন্যের ও বঞ্চনার মীমাংসা করতেই ব্যস্ত। এ যেন পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর পাড়ার মেয়ে-স্কুলের দলাদলিতে জড়িয়ে পড়েছেন। এখানে দাঁড়ালেই বোঝা যায় বনফুলের জীবন-রূপকের তাৎপর্যও এই। গৌরবময় স্বাস্থ্যের চেতনা যার বা যে দেশের ছিল—সে নিজেই স্বাস্থ্যের ব্যত্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে সর্বতোভাবে। এই অর্থে জাতীয়জীবনের অসঙ্গতিজনিত কারুণ্যই বনফুলের উপন্যাসের প্রধান রূপকার্থ। তবে এ প্রসঙ্গে বনফুলের উপন্যাসের কাঠামোর ত্রুটির কথাটিও স্মরণীয়। চরিত্র এবং ঘটনার পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত জনিত অগ্রগতি বনফুলের উপন্যাসে তাদৃশ সাফল্য লাভ করেনি। এখানে ঘটনাগুলি সাধারণ-ভাবে কেবল ঘটে চলে; বড়মাপের মানুষগুলি সে ঘটনায় মাত্র নিরাসক্তভাবে অংশ গ্রহণ করে থাকে। উপলব্ধির স্তরে যাত্রা-বিন্দুতে চরিত্রগুলি যা, উপসংহারেও দেখা যায় তারা তাই আছে। ছোটপরিসরে ভুবন সোম-এর ব্যতিক্রম মাত্র।

"ত্রিবর্ণের" সুঠাম মুখুজ্জে বড়মাপের মানুষ। না বলা থাকলেও বোঝা যায় যে তিনি

চওড়া কাঁধের পুরুষশ্রেষ্ঠ। তিনি আশ্রয় দিতে পারেন, প্রশ্রয় দিতে জানেন—ন্যায়কে ন্যায় এবং অন্যায়কে অন্যায় বলার সাহস রাখেন। সুঠাম মুখুজ্জের জীবনের ছন্দে স্খলন নেই কোথাও। তিনি সুস্থতার সাধক। তাঁকে পাশে রেখেই যেন আমরা আরো বেশি করে বুঝতে পারি স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের ডাক্তার ঘোষাল, মিঃ সেনের অস্বাস্থ্যকে, জীবনের অসম্পূর্ণতাকে, এমনকি সুবেদার খাঁয়ের আশ্চর্য আত্মোৎসর্গের সাধনাকে। ঝিনুক তনিমা এরাও সুঠাম মুখুজ্জের বিবেকবান হৃদয়ের প্রৌঢ়-প্রীতির কাছে উন্মুক্তচিত্ত হতে পারে। সুঠাম মুখুজ্জের পরম স্বাভাবিকতা এবং অত্যুচ্চ জীবনাদর্শ এই উপন্যাসে একটি পরোক্ষ ভাব বন্ধন সৃষ্টি করেছে। বনফুলের উপন্যাসের গঠনশৈলীর একটা বৈশিষ্ট্য এখানে স্মরণীয়। এ গঠনশৈলী ঘটনার মুখাপেক্ষী। চরিত্রগুলি ঘটনা ভালবাসে। ত্রিবর্ণেও ঘটনা বৈচিত্র্য স্বল্প নয়। সুঠাম মুখুজ্জে সে ঘটনায় অংশ গ্রহণ করলেও মানসিক প্রতিক্রিয়ায় বিচলিত হয়ে পড়েন না। তনিমার সঙ্গে ট্রেনে অকস্মাৎ সাক্ষাতে সুঠাম মুখুজ্জে বিব্রতও হন না, তাঁর শজারু দর্শনের কার্যসূচী বাতিলও হয়ে যায় না। গিরিশ বিদ্যার্ণবের মেয়ে, ডাক্তার ঘোষালের রক্ষিতা এই কথা লিখতে গিয়ে সুঠাম মুখুজ্জের কোনো ভাববৈকল্য জাগে না। স্বাধীনতা ও দেশ বিভাগোত্তর বাংলাদেশে মনুষ্যত্বের অপমৃত্যু তো প্রাত্যহিকতায় অভ্যস্ত। এই অবিচলতা অনেক সময় প্রথাসিদ্ধ ধীরোদাত্ত নায়ক-চরিত্র পরিকল্পনার অনুগামী। এ পরিকল্পনায় ত্রুটির সম্ভাবনা যেটুকু সেটুকুও ত্রিবর্ণে বাস্তব আকার ধারণ করেছে। তনিমার সঙ্গে দেখা হবার আগে সুঠাম মুখুজ্জের সঙ্গে ঝিনুকের প্রথম সাক্ষাতে আকস্মিকতাই শুধু নেই—সুবেদার খাঁয়ের রিভলভার চালানোর নাটকীয়তাও আছে। একচুলের জন্য মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পাওয়া আছে। আছে এবম্বিধ নানা ঘটনা। কিন্তু প্রতি পদক্ষেপেই দেখা যায় সুঠাম মুখুজ্জে এসব ঘটনা থেকে অনেক বড়—লেখকের প্রতিপাদ্য এ কথাটাই।

অন্য চরিত্রগুলি প্রসঙ্গে প্রধান কথা এই যে এমন সুতীব্র গতিশীলতা চরিত্রগুলির মধ্যে বিদ্যমান যার ফলে চরিত্রগুলির বহু আপাত অবিশ্বাস্য আচরণ শেষ পর্যন্ত আমাদেব সহ্য করতে হয়। ঝিনুক, শামুক, কাউ, তনিমা, ডাক্তার ঘোষাল, সুবেদার খাঁ সকলেই দ্রুত ধাবমান চরিত্র। এবং মানসিকভাবে জীবনের স্থির-কেন্দ্র থেকে তারা বিচ্যুত। গণেশ হালদারও কম বেশী উদভ্রান্ত। এই বিচ্যুতির ফলে তারা প্রত্যেকে প্রতি মুহূর্তেই অস্থির। চরিত্রগুলির প্রধান পরিচয় উদ্বাস্তুতা, এবং তজ্জনিত আতিশয্য—পৃথিবীনন্দনের কথা এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে। সুতরাং বিশ্বাসবোধের ওপর সাধারণভাবে চাপ পড়ে। তবু চাপ ততটা অনুভূত হবে না। তার কারণ হল সুঠাম মুখুজ্জের দ্বৈত রূপবোধ। প্রকৃতি জগতের বিপুল বৈচিত্র্যে তিনি জীবনের স্বাভাবিক বিশালতাকে প্রত্যক্ষ করেন। জীবজগৎ তাঁর আত্মীয়কল্প—মানুষের মধ্যে তাঁর নিত্যসঙ্গী বিজয়, শালিয়া, যাদের শিশুচিত্তে জীবনেরই সরল রূপের আর এক অভিব্যক্তি। সুঠাম মুখুজ্জে জীবনরসিক। কিন্তু এই রসভোগ ভোগীর রসভোগ—যার মধ্যেও সুঠাম মুখুজ্জের শক্তিরই প্রকাশ। এই শক্তির ভঙ্গিকটা স্বীকার করলে উপন্যাসের শেষাংশে বিশ্বাসের ওপর যে প্রবল চাপ পড়ে তাকে মেনে নেওয়া যায়। সুঠাম মুখুজ্জের স্ত্রী যে তাঁদের আশ্রিত গণেশ হালদরেরই ভগিনী—কর্তিত স্তনী, ধর্ষিতা বুলি—সহসা এই উদ্ঘাটন প্রায় পরিকল্পিত নাট্যকেপনা হয়ে গিয়েছে। শুধু সুঠাম মুখুজ্জেই পারেন এমন সমস্ত বিষম ব্যাপার অক্লেশে বহন করতে, এই বোধটা পূর্ব সঞ্চিত বলে শেষরক্ষার কিছুটা সুরাহা হয়। উপন্যাসের প্রধান শক্তি ঝিনুক। বনফুলের নায়িকারা

বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদের মতোই বিদ্যুৎগতি চলিষ্ণুতার ভক্ত। ঝিনুক তার অনবদ্য নিদর্শন। শ্রীভ্রষ্ট ঘোষাল শ্রীভ্রষ্ট মানবতা—সমস্ত সত্ত্বেও ঝিনুক পরিশেষে নিজের স্থান বেছে নিল ঐ শ্রীভ্রষ্টতার পাশে। এটাই হল গল্পের নৈতিক নির্দেশ।

বনফুলের উপন্যাসে সভ্যতার অন্তরশায়ী ব্যাধিসংক্রান্ত এই মৌল চেতনা সদাজাগ্রত। তাই তাঁর উপন্যাসে গঠনশৈলীর বৈচিত্র্য এত বেশী। তাঁর বড়মাপের নায়কেরা জীবনের জটিলতা সম্বন্ধে নিজেদের চেতনাকে প্রতিফলিত করেছে। এর ভিতরে অনেক সময়ে হয়তো ব্যর্থতা এসেছে কিন্তু কোথাও ফাঁকি দেবার প্রবণতা নেই। কিন্তু বনফুলের এই উপন্যাসে মেলোড্রামার উপাদান বিদ্যমান। তারাশঙ্করের সাম্প্রতিক কালের উপন্যাসের গঠন কার্যেও দেখা যায় নির্বিচারে মেলোড্রামার সহায়তা গ্রহণ করা হয়েছে। দুজন প্রখ্যাত ঔপন্যাসিকের (এবং এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকজন ঔপন্যাসিকের কথা মনে পড়ে) উপন্যাসের কাঠামো নির্মাণে এই মেলোড্রামার উপাদানবাহুল্য বস্তুতপক্ষে সাম্প্রতিক উপন্যাসের গঠন বিন্যাস সম্বন্ধে কোনো সাধারণ ইঙ্গিত কিন্তু দেয় না। তবু বলা যায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, দেশ বিভাগ ও নানান বিপর্যয় সাধারণভাবে জীবনে যে কেন্দ্রচ্যুত অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে এই উপন্যাসে উক্ত প্রবণতার আংশিক কারণ সেখানেই নিহিত। প্রকৃত প্রস্তাবে যেখানে কোনো নির্দিষ্ট স্থানগত পটভূমি নেই, দ্রুতগতিসম্পন্ন সময়ের আবর্তই যেখানে পটভূমি, সেখানে ঘটনার চকিত চমকের কিছুটা অতিনাটকীয় অবদান অনিবার্য। বিশেষতঃ যদি চরিত্র বলতে প্রথানুগত কাহিনীর চরিত্রই বোঝা হয় তাহলে এ ত্রুটি পরিহার করা দুষ্কর। তবু তারাশঙ্কর চরিত্রগুলির নিজস্ব উপলব্ধির ক্রমগভীরতার স্তর পরম্পরা আঁকার চেষ্টা করেন। বনফুলের উপন্যাস সেক্ষেত্রে একান্তই চরিত্রোপন্যাস। যে বিন্দুতে তাদের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ, পরিণতিতে দেখা যায় সেই বিন্দু থেকে তারা বিশেষ এগোয়নি। ত্রিবর্ণে আমরা ঝিনুক ছাড়া আর কারো উপলব্ধির ক্রমান্বিত পরিণামের দেখা পেলাম না। বনফুলের উপন্যাসের উক্ত অতিনাটকীয়তার বাহুল্য তাঁর স্বক্ষেত্র নয়। ভুবন সোমের মতো কাহিনীতে কিম্বা, হাটে-বাজারের মতো পট-প্রসঙ্গ নির্মাণে তাঁরও মুক্তি, আমাদেরও তৃপ্তি। ডানা উপন্যাসেই তাঁর শিল্পীসত্তার এই নূতন পর্যায় সুরু হয়েছে। প্রকৃতির অমিত বিত্তের মাঝে মাঝে অমেয় শান্তি, অথচ জীবনে পদে পদে ছন্দোপাত—এই দুই প্রান্তে যিনি উভচর তিনি অসামান্য ব্যক্তি বলেই বনফুলের নায়ক। "ত্রিবর্ণে" জীবনের সেই দ্বৈতমূর্তি লেখক রচনা করতে দেখেছেন। কিন্তু মেলোড্রামায় জীবনের দ্বৈতমূর্তি রচনা কিছুটা ব্যাহত হয়েছে এতে সন্দেহ নেই।

ঔপন্যাসিকের গঠনশৈলীর চেতনায় তাঁর জীবন-চেতনারই ছায়া পড়ে। জীবনের সম্বন্ধে সঠিক ধ্যান অথচ বেঠিক গঠন—এ কখনো হয় না। একশ বছরের বাংলা উপন্যাসও এই সাক্ষ্যই দেয়। সাম্প্রতিক বাংলা উপন্যাসের নবীন প্রচেষ্টাগুলিরও বিচার হবে এই দৃষ্টিতে। বর্তমান জীবনের এই অষ্টাবক্র মূর্তির ভিতরেও সর্বাঙ্গীণ রূপকের সন্ধান বাঙালী ঔপন্যাসিকের নিজস্ব কাজ। গঠনশৈলীর নূতন চিন্তায় সেই অভিলাষের প্রতিবিম্বই লক্ষিত হচ্ছে।

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সমালোচনা

The Tin Drum. *By* Gunter Grass. Secker & Warburg. London. 30*s*.

আমরা যদি মনে করি, য়ুরোপীয় উপন্যাসে গুস্তাভ ফ্লবেয়ারের সঙ্গেই রিয়্যালিজ্‌ম্‌ প্রবেশ করেছিল, তাহলে দেখা যাবে তার একশো বছর পর সেখানকার উপন্যাসে নিওরিয়্যালিজম্‌ আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে তার কেন্দ্র স্থানান্তরিত, ফরাসী থেকে জার্মানীতে। স্থান-পরিবর্তন কাল-পরিবর্তনের আনুষঙ্গিক হওয়া স্বাভাবিক। রিয়্যালিজ্‌ম্‌ বিষয়টিও তো নিওরিয়্যালিজমে রূপান্তরিত। ১৯৫৯-এ জার্মানী যে উপন্যাসটির প্রতি সব চাইতে বেশি আগ্রহশীল হয়ে উঠেছিল, সেই "দি টিন ড্রাম"-এর নায়কের দৈনন্দিন অস্তিত্বকে তরুণ লেখক গুণ্টার গ্রাস্‌ নিওরিয়্যালিজ্‌ম্‌-এর রঙে ফুটিয়ে তুলেছেন বলে মনে হয়।

চিত্রকল্প যেমন প্রসারিত উপমা, নিওরিয়্যালিজ্‌ম্‌-ও তেম্নি প্রসারিত রিয়্যালিজ্‌ম্‌। মানুষ সম্পর্কে উনিশ শতকীয় জড়বাদী ধারণা বিশ-শতকীয় বিজ্ঞানীর নিকট সঙ্কীর্ণ মনে হওয়া স্বাভাবিক। মানুষকে যদি বস্তু বলেও ধরে নিই, তবু বল্‌ব উনিশ-শতকীয় বস্তু-জ্ঞান আমূলে পাল্টে গেছে বিশশতকে এসে। বস্তুর উপাদান বিদ্যুতাণুর যাত্রাপথ অনির্দিষ্ট, কাজেই বাস্তব মানুষও অজ্ঞেয়। বিশ-শতকের বিজ্ঞানীর কাছ থেকে এই আমরা জেনেছি। তাই, খুবই স্বাভাবিক, বাস্তববাদ তার সাম্প্রতিক চেহারায় মানসিক জগতের কতগুলো দুর্বোধ্য, রহস্যময়, আশ্চর্য ঘটনাকে আপন সীমায় টেনে আনবে। কিন্তু জীবন সম্পর্কে একটা ধারণায় পুরাতন ও নতুন বাস্তববাদ একই জায়গায় অবস্থিত। ফ্লবেয়ারের বিখ্যাত নায়িকা মাদাম বোভারি বিবাহিত জীবন নিয়ে যেম্নি ক্লান্ত, গ্রাসের অবিবাহিত নায়কও তা-ই। গ্রাসের চরিত্র এ যুগের সংজ্ঞাই দিচ্ছে এই বলে : Barbaric, Mystical, Bored।

গ্রাস্‌, যিনি মাত্র বত্রিশ বছর বয়সে প্রায় ছ'শ পৃষ্ঠার এই প্রথম উপন্যাস লিখেছেন, শিল্পের ক্ষেত্রে জার্মানীতে খুব অপরিচিত ছিলেন না। ভাস্কর্যে, মণ্ডালঙ্করণে, কবিতায় এবং নাটক রচনায় তাঁর হাত ছিল। তাঁর "দি টিন ড্রামে"র নায়ক ওস্কার-ও ত্রিশ বছর বয়েসে তার কাহিনী শেষ করছে (উপন্যাসটি আত্মজীবনী নক্সায় রচিত) এবং যে ডানজিগে গ্রাসের জন্ম, ওস্কারও সেই ডানজিগেরই ছেলে, অধিকন্তু গ্রাসের মতোই একহিসাবে শিল্পীও—কারণ, ড্রামবাদক। তাই মনে হয়, গ্রাস নিজের জীবনের অনেক অনুভূতি ও ঘটনা (বাস্তব ও তথাকথিত অবাস্তব) ওস্কারের জীবনে প্রতিফলিত করবার হয়তো সুযোগ পেয়েছেন।

ওস্কার একটি মানসিক রোগের হাসপাতালে পরীক্ষাধীন অবস্থায় ত্রিশ বছর বয়েসে স্মৃতিচারণ করছে। স্মৃতিচারণের সহায়ক তার ড্রাম। একটি টিন-ড্রাম তিনবছর বয়েসে সে তার মার কাছ থেকে উপহার পেয়েছিল। তারপর ড্রামের পর ড্রাম, জীবনের প্রত্যেক স্তরে তার দরকার হল। মার জন্ম থেকে স্মৃতিচারণ সুরু—বই-এরও সুরু।

আত্মনিপীড়ক ওস্কার ইচ্ছে করে একটা আঘাত নিয়ে শরীরের গড়ন খাটো করেছে।

নিজের জন্ম-সম্বন্ধে সে সন্দিহান। সে কি অখ্যাত জার্মান মুদী হিটলার-দলভুক্ত তার পিতা মাৎসেরাথের ছেলে, না তার মার প্রেমিক এক পোলিশ পোস্ট্যাল অফিসারের ঔরসজাত, অনেক সময়ই এই প্রশ্নে তার মন উৎকেন্দ্রিক। তারপরও আছে। বৈমাত্রেয় ভাইকে সে নিজের ঔরসজাত মনে করে। সেই ভাই-ই ঢিল ছুঁড়ে ওস্কারের ঘাড়ে এম্নি একটা আঘাত দেয়, যার ফলে সেখানে একটা কুঁজ গজিয়ে ওঠে। বিকৃত দেহ এবং বিকৃত মনের এই নায়ক যে তার যৌনজীবন নোংরা করে তুলবে, এবং নীচুস্তরের চরিত্রহীন মানুষদের সঙ্গেই পরিচিত হবে, রাসপুটিন পড়বে (অবশ্য গ্যেটেকেও ভালোবাসে), চার্চে ঢুকে শয়তানের পরামর্শ শুনবে, যীশুর মূর্তিকে ড্রাম বাজাতে বলবে, নিজে 'যেসাস' নাম নেবে, মনে করবে তার উভয় পিতার মৃত্যুর জন্যে সে দায়ী এবং যে নার্সকে (প্রত্যেক নার্সকেই সে ভালোবাসত) ভোগ করতে চেয়েছিল তার হত্যাপরাধ নিজের উপর তুলে নিয়ে (যদিও সে ঘাতক নয়) অবশেষে পরীক্ষার জন্যে মানসিক রোগের হাসপাতালে আসবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। এই নায়ককে দিয়ে গ্রাস একবার হিটলারের আদমীদের প্রচার-সভা বানচাল করিয়েছেন এবং যুদ্ধের সময় প্রচার-বিভাগে বাদ্যকর হিসেবে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। বই শেষ হয়েছে ছেলেবেলাকার 'কালো ডাইনি'-কে নিয়ে একটা ছড়ার স্মরণে : Where's the witch, black as pitch। ত্রিশবছর বয়েসে পৌঁছিয়ে অবিবাহিত ওস্কার জীবনের দিকে তাকিয়ে ভাবছে, তার জীবনে যতো মেয়ে এসেছে সবাই সেই কালো ডাইনি—আর যারা আসবে তারাও :

> Always somewhere behind me, the black witch,
> Now ahead of me, too, facing me, black.

গ্যেটের আলোতেও জার্মানীর কিছু হল না, কালোরই সাধক এ-যুগের মানুষরা। যে হাসি বা কৌতুক পরিবেষণ করেছেন গ্রাস বইটিতে, তা-ও জোর-করা, নিরানন্দ। জীবনের হৃদয়হীনতার এবং বর্বরতার দিকটা ওস্কারের জীবন-কাহিনীতে এতো সোচ্চার যে আমরা অনায়াসে ভাবতে পারি, হিটলারের বর্বরতা-শাসিত ও যুদ্ধোত্তর জার্মানীতে মানবতার ললিতবাণী কতো অর্থহীন। জার্মানীতে ও ফরাসীতে বইটির অসাধারণ সাফল্য এ-কথাটাই প্রমাণিত করে যে বর্তমান মানুষ ওস্কারের আলেখ্যে হয়তো নিজেদের বিকৃত জীবনই দেখতে পেয়েছে।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

Ship of Fools. *By* Catherine Anne Porter. Secker & Warburg. London. 25*s*.

ইংরাজী উপন্যাসে সাম্প্রতিক কালে চেতনা-প্রবাহরীতির অনুসরণ আর বড় একটা দেখা যাচ্ছে না। এখনকার লেখকদের সুস্পষ্ট ঝোঁক ভিক্টোরীয় রীতির দিকে প্রত্যাবর্তন। ভিক্টোরীয় রীতির উপন্যাসে কাহিনীর নিরঙ্কুশ প্রাধান্য। এক বা একাধিক পরস্পর সম্পর্কযুক্ত আখ্যায়িকার ক্রমবিকাশ ও ক্রম-পরিণতি পাঠকের মনকে ধরে রাখে। চরিত্র-চিত্রায়ন বা বাস্তব সত্যের উদ্‌ঘাটন সমস্তই কাহিনীকে অবলম্বন করে দানা বেঁধে ওঠে। এ যুগে আবার সেই কাহিনী প্রধান উপন্যাস রচনার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। উইলিয়াম

গোল্ডিং, উইলা ক্যাথার, জন্ ওয়েন্ প্রভৃতি বিভিন্ন ধাঁচের আধুনিক লেখক লেখিকাদের মধ্যে এই একটি জায়গায় মিল দেখা যায়।

কিন্তু ভিক্টোরীয় ধাঁচের রচনা রীতি যে পূর্ব-বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফিরে এসেছে তা নয়। এখন নানান্ ধরনের পরীক্ষামূলক কাহিনী রচিত হচ্ছে; কাহিনীকে নানা প্রয়োজনে ব্যবহার করার চেষ্টা চলছে। কাহিনীর মধ্যে প্রতীকের ব্যবহার যেমন বেড়েছে, তেমনি অনেক সময় সমগ্র কাহিনী একটি রূপক হিসাবে উপস্থাপিত হচ্ছে। কাহিনী অনেক সময়ে ব্যাপক সাধারণ সত্যের বাহন হিসাবে গুরুত্ব অর্জন করছে। গোল্ডিং-এর *Revolt of the Flies* একদা পড়েছিলাম। কাহিনীতে বলা হয়েছে একদল বালক কোন দুর্ঘটনার ফলে একটি নির্জন দ্বীপে গিয়ে পড়ে। সভ্যতার সংস্কার এবং নিয়মের বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে এই বালকের দল শীঘ্রই গভীর বর্বরতার মধ্যে নিমজ্জিত হল। কাহিনী এখানে উপলক্ষ্য মাত্র। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা যে বর্বরতার দিকে লেখক এখানে তাই প্রতিপন্ন করতে চাইছেন।

আলোচ্য গ্রন্থখানিতেও এই ধরনের একটি পরীক্ষামূলক কাহিনী স্থান পেয়েছে। কয়েকটি চরিত্রকে ঘিরে একটি ধারাবাহিক কাহিনীর দীর্ঘ সূত্র লেখিকা টানতে চান নি। অনেকগুলি ছোট ছোট ঘটনার ভিতর দিয়ে লেখিকা এ-যুগের বহু বিচিত্র মানবগোষ্ঠীর এক বৃহৎ সংখ্যাকে উপস্থিত করতে চেয়েছেন। চরিত্র-চিত্রায়ণে, সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা উদ্ঘাটনে এবং বিচ্ছিন্ন ঘটনাগুলির পরিকল্পনায় লেখিকা দুর্লভ শক্তির পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এ গ্রন্থের সেইটেই আসল কথা নয়। আধুনিক ইউরোপীয় মনন যে জাতিবিদ্বেষ, শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান, কৃত্রিম আভিজাত্য বোধ প্রভৃতি ক্ষতিকর মনোভাবের দ্বারা পীড়িত, লেখিকা সেই রূঢ় বাস্তব সত্যকে অনাবৃত করতে চেয়েছেন। কাহিনীকে ছাপিয়ে কাহিনীর উপজীব্য সাধারণ সত্য বইখানিতে সন্দেহাতীত গুরুত্ব অর্জন করেছে।

ইউরোপীয় সমাজ-মানসের অসুস্থ বিকৃতির এক বৃহৎ চিত্র উপস্থিত করার জন্য লেখিকা এক অভিনব পটভূমিকাকে গ্রহণ করেছেন। ভেরা নামক একটি জার্মান জাহাজে বহু যাত্রী মেক্সিকোর ভেরাক্রুজ থেকে ব্রেমার-হাভেনের দিকে যাত্রা শুরু করেছে। বেশ কয়েকদিন স্থায়ী জাহাজ ভ্রমণ উপলক্ষে যাত্রীরা নিজের নিজের অস্থায়ী সংসার পেতেছে। খাওয়ার টেবিলে নাচের আসরে এবং আরও নানা কারণে তারা পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হচ্ছে। এইভবে পরস্পরের মধ্যে নানাবিধ প্রিয় এবং অপ্রিয় সম্পর্ক গড়ে উঠছে। যাত্রীদের মধ্যে বেশীর ভাগই জার্মান; এছাড়া কয়েকজন মেক্সিকোবাসী, ছ'জন কিউবার ছাত্র, একজন রাজনৈতিক কারণে দেশান্তরিতা বৃদ্ধা লা ফন্ডেসা, চার জন আমেরিকান, একটি সুইস্ দম্পতী এবং তাদের সঙ্গে একটি সাদামাঠা মেয়ে, স্পেনের একদল নর্তক-নর্তকী অনেকে এই জাহাজে সাময়িকভাবে এক পরিবারভুক্ত হয়ে পড়েছে। এতগুলি চরিত্রকে লেখিকা এঁকেছেন; কিন্তু কোন চরিত্রের সঙ্গেই কোন চরিত্র মিশে যায়নি। প্রতেকটি চরিত্র নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। দু'জন আমেরিকান তরুণ-তরুণী চিত্রশিল্পী পরস্পরকে ভালবাসে; কিন্তু তাদের মনের সন্দেহ ঘোচে না, তাদের অপরিতৃপ্ত ভালবাসা কোন পরিণতি লাভ করে না। বিপরীতক্রমে সমাজ সম্পর্কে মোহমুক্ত বিগতযৌবনা লা ফন্ডেসার প্রতি জাহাজের ডাক্তারের স্বতস্ফূর্ত মানবিক প্রেম এক স্নিগ্ধ বিষণ্ণতা সৃষ্টি করেছে। ঢিলে ঢালা কাহিনীটি নানা কৌতুকজনক ঘটনার ভিতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে একটি চরম নাটকীয় মুহূর্ত সৃষ্টি করল যখন প্রকাশ পেল যে যে-মানটি ডিনারের সময় জাহাজের কাপ্তেনের টেবিলে বসেন

তিনি একটি ইহুদি মেয়ের স্বামী। সমস্ত জনতার তীব্র ইহুদি বিদ্বেষ লোকটির উপর কেন্দ্রীভূত হল; কাপ্তেনের সম্মানিত টেবিল থেকে তাঁকে অপসারিত করা হল জাহাজের একমাত্র ইহুদি যাত্রীর দল-ছাড়া টেবিলটিতে। দুটি বালকের চিত্র আছে যারা মূর্তিমান শয়তান। মানুষের সূক্ষ্ম স্বার্থপরতা, ছদ্মবেশ-পরা মিথ্যা আভিজাত্যের গর্ব, সুইস্ দম্পতীর কন্যার স্বামী-শিকারে ব্যর্থতা প্রভৃতি মিলিয়ে এই বৃহৎ বইখানি শেষপর্যন্ত, পাঠকের মনোযোগ আকৃষ্ট করে রাখে। সাধারণ নীচুতলার যাত্রীদের প্রতি প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের ঘৃণা আর অবজ্ঞা, তাদের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলার কদর্য মনোভাবকে লেখিকা গভীর সত্যবাদিতার সঙ্গে অনাবৃত করেছেন। এই প্রথম শ্রেণীর যাত্রীদের নীচতা, জাতিগর্ব ও জাতিবিদ্বেষের উপর স্পেনের নর্তক নর্তকীর দলটি এক মূর্তিমান বিদ্রোহ হিসাবে দেখা দিয়েছে। ব্যবহারে কৃত্রিম নিয়ম-কানুনের তারা ধার ধারে না; তাদের পাপপূর্ণ জীবনধারা ভদ্রলোকদের মুখোস-পরা প্রতারণার উপর জয়লাভ করেছে।

বইখানি নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। তথাপি শিল্পকর্ম হিসাবে আমি বইখানাকে শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দিতে পারছি না। আঙ্গিকের দিক থেকে আলোচ্য উপন্যাসের অসুবিধা এই যে কোন কেন্দ্রীয় কাহিনী, বা এমন কি একটি বা কয়েকটি কাহিনীর ধারাবাহিক সূত্র না থাকায়, পাঠকের মন ক্রমাগত বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়।

আসল কথা কান্টের শিল্প-তত্ত্বের যে-ত্রুটি এই বইয়ের ত্রুটিও সেইখানে। কান্টের মতে সাহিত্য কর্ম হচ্ছে কোন সাধারণ সত্যের রূপায়ণ। এই তত্ত্ব অনুযায়ী রচিত সাহিত্য প্রায়সই রূপক জাতীয় রচনার আকার গ্রহণ করতে বাধ্য। এবং রূপক কখনই শ্রেষ্ঠ সাহিত্য কর্ম হিসাবে গণ্য হতে পারে না। সাধারণ সত্য প্রধানতঃ মানুষের বুদ্ধিবৃদ্ধির আলোচনার ক্ষেত্র; রূপকের আবেদনও প্রধানতঃ মানুষের বুদ্ধির কাছে সাহিত্যের কারবার মূলতঃ বিশেষকে নিয়ে। বিশেষ যদি বিশেষ হিসাবে আমাদের মনে আবেগ জাগ্রত করতে সক্ষম হয়, তবে আমরা হয়তো তার মধ্যে কোন গূঢ় সাধারণ সত্য আবিষ্কারের জন্য তৎপর হই। সেটা পরবর্তী কাজ। কিন্তু লেখক যদি বুদ্ধি সম্বল করেই যাত্রা শুরু করেন; আগে তত্ত্ব স্থির করে নিয়ে তারপর তার আঁধার খুঁজতে বার হন তবে তিনি সার্থক শিল্পানুভূতি জাগ্রত করতে পারবেন কিনা সন্দেহ। এ কথা হয়তো ঠিক এরিস্টটল্‌কথিত তত্ত্ব—শিল্প ঘটনার অনুকৃতি মাত্র—অপেক্ষা প্লেটোর তত্ত্ব—শিল্প অনুকরণের অনুকরণ (Imitation of an imitation = imitation of a mental experience)—আধুনিক তত্ত্ববাগীষদের কাছে অধিকতর প্রিয়। কিন্তু আমাদের সেই মানসিক অভিজ্ঞতাই শিল্পসৃষ্টির উপযোগী যা বিশেষ, যার অনন্য বিশেষত্বই তার মৌলিকত্বের অকাট্য প্রমাণ। লেখিকা ঘটনা এবং চরিত্রগুলিকে বৈশিষ্ট্য-মণ্ডিত করতে চেষ্টার ত্রুটি করেননি, এবং তাতে সার্থকও হয়েছেন। তথাপি প্রতিমুহূর্তে আমরা এ-কথা না ভেবে পারি না যে বইয়ের প্রতিটি ঘটনা ও চরিত্রই নিজস্ব মূল্যে মূল্যবান নয়, তারা কতকগুলি সাধারণ সত্যের বাহক মাত্র। তাছাড়া এই বিশেষত্ব সম্পর্কে পাঠকের মতামত যাই হোক, এ-কথা সবাইকে মানতেই হবে যে লেখিকা অদ্ভুত কল্পনাকুশলতার সাহায্যে ইউরোপীয় মানসের এক বৃহৎ অংশকে অনাবৃত এবং আবেগ-মণ্ডিত করতে পেরেছেন।

অচ্যুত গোস্বামী

দণ্ডক-শবরী—নারায়ণ সান্যাল (বিকর্ণ)। গ্রন্থপ্রকাশ। কলিকাতা-১২। মূল্য নয় টাকা।

বাংলাদেশে সাধারণত সাহিত্য করে জীবিকার্জন খুব কঠিন। শরৎচন্দ্রের স্নিগ্ধ দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও এমনকি কথাসাহিত্যেরও সেই এক হাল। যে-ক'টি ব্যতিক্রম ইতস্তত চোখে পড়ে তা প্রথম জীবনের কৃচ্ছ্রসাধন ও উত্তরকালের ব্যসনবাহুল্যে চমৎকার। মাত্র লেখাকে জীবিকা করে সাহিত্যিক জীবনের ক্রমোন্নয়ন, পরিণতিসন্ধান, চিত্তজয়ের সহজ উপায় শিকার না করে আত্মগৌরবে ও স্বধর্মনিষ্ঠায় স্বস্তিবোধ তাই সুদুর্লভ সামগ্রী। তাতে নৈতিক মানের ক্ষতি গ্রাহ্য হোক না হোক সাহিত্যিক-চরিত্রের তথা সাহিত্যচরিত্রের হানি ও গ্লানি প্রায়ই অস্বীকার্য নয়। ফলে সাহিত্যজীবিকাধর্মী লেখকরা স্বল্প প্রয়াসে সমধিক ফলপ্রসূ হতে গিয়ে ব্যবহারিক সাফল্যে সাহিত্যিক সার্থকতাকে তলিয়ে দিচ্ছেন। বরং কখনো-কখনো অন্যজীবিকার মানুষ সাহিত্যক্ষেত্রে এসে তাঁদের পরিমিত শক্তির সঙ্কল্পদৃঢ় সদ্ব্যবহারে আমাদের বিস্মিত করছেন। "দণ্ডক-শবরী"র লেখক তেমন একজন অন্য-জীবিকানির্ভর সাহিত্যপ্রাণ মানুষ, জীবন ও সাহিত্যের প্রতি প্রীতিবশ এই বাস্তুকার-লেখক তাঁর অন্যান্য গ্রন্থেও যেমন, এ-গ্রন্থেও তেমনি আন্তরিকতার, নিষ্ঠা ও সততার, গভীর মানবিক মমত্ববোধের পরিচয়ই প্রধানত বহন করেছেন, কোন সচরাচর স্থূল উদ্দেশ্য-সিদ্ধির পিপাসাকে নয়। তাই সহজে কৃতকৃতার্থতার যে সরল পথ আজ জীবনের দিকে দিকে নব নব দিগন্ত দেখার প্রয়োজনে খুলে যাচ্ছে, তেমনি একটি নবদিগন্ত দেখতে গিয়েও তিনি তাঁর শ্রম ও তিতিক্ষার মূল্যেই সেই জীবনকে তুলে আনতে চেয়েছেন সাহিত্যে, অন্য কোন আশুতোষ উপকরণে ও উপঢৌকনে নয়। দণ্ডকারণ্যের মাড়িয়া-মুরিয়াদের বাস্তব-জীবনের স্থিরচিত্র ও চলচ্ছবি আমাদের কাছে নতুন ও অভিনব বলেই আকর্ষণীয় নয়, চিরন্তন ও শাশ্বত বলেই মূল্যবান, এ আবিষ্কার লেখকের, এজন্যে তিনি সাধুবাদ পাবেন।

পূর্ববঙ্গকে অন্য রাষ্ট্রভুক্ত হতে দেখলাম, সেইসঙ্গে এতাবৎকালবাহিত বাংলা কথা-সাহিত্যে অভিজ্ঞতার পরিধি সংকীর্ণ হয়ে এল। এর আংশিক পরিপূরণ উক্ত বিচ্ছিন্ন-দেশাগত উদ্বাস্তু মানুষদের উপলক্ষেই লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠল। পশ্চিমবঙ্গ ও কলকাতা তার ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ঘর ছেড়ে পথে বের হওয়ার সুযোগ পেল, অন্য প্রদেশের অন্য মানুষের জগতে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে সর্বত্র। এমনকি নাগাভূমি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত প্রভৃতি দুর্গম প্রত্যন্তও যে আজ বাঙালির ঘরকুনো কল্পনায় বিজিত হচ্ছে সে-ঘটনার পিছনে সাংবাদিকতা নামক জীবিকার তাড়না অবশ্য আছে, সেই সঙ্গে জীবনের পিছনদিকের এই ধাক্কাটুকুও নগণ্য নয়—স্বগৃহে প্রবাসী মানুষগুলি ঝাঁকে ঝাঁকে এ-প্রান্তে এসে পড়ল, এদের বিষণ্ণ জীবনের সঙ্গে এখানকার বিপন্ন মানুষদের সাময়িক মোকাবিলা হল—তারপর আন্দামান, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যায় পুনর্বাসনের প্রয়াস—পুনর্প্রবাস আর নয়, এই আশায়। সত্যই এখন আর একে প্রবাস মনে করা ভুল। সব অজানা অচেনা দেশকেই স্ববাস করে তুলতে প্রয়োজনীয়তা একটা কঠিন অস্ত্র। সেই অস্ত্রপ্রয়োগের আহ্বানে প্রায়-নিরক্ষর সাধারণ দুঃস্থ মানুষেরও সঙ্গী হলেন তাই এদেশী বিভিন্ন জীবিকার শিক্ষিত শহুরে মানুষ, বিভিন্ন পদের সরকারি চাকুরে, বাস্তুকার, চিকিৎসক, সাংবাদিক এবং ব্যবসায়ী।

এম্নি এক যোগাযোগজনিত ফলাফল আমরা "দণ্ডকশবরী" গ্রন্থে পড়বার সুযোগ পেলাম। লেখক এখানে দণ্ডকারণ্য পুনর্বাসনের উচ্চপদস্থ কর্মী, আর তাঁর বর্ণনীয় বিষয় যে-অরণ্যে তিনি উদ্বাস্তুদের আবাস গড়তে গিয়েছেন তারই আদিবাসীদের অজ্ঞাত-

পূর্ব জীবনধারা, আচারবিচার, সংস্কার ও সংস্কৃতি। প্রসঙ্গত একেবারে অন্য দৃষ্টান্তে ব্যবহৃত হার্বার্ট রীডের একটি উক্তি এখানে স্মরণীয় : '—we have now, thanks to the labours of Levy-Bruhl, abandoned the idea that what is primitive is necessarily inferior. In the circumstances in which they operate, the mind and language of the savage are more effective than the mind and language of the civilised people.' মনে হয় "দণ্ডকশবরী"-লেখকের প্রতিপাদ্যও অনেকটা তাই। রীডসাহেবের পূর্বোক্ত সূত্রের সিদ্ধান্তও এ-উপলক্ষে স্মরণীয় : 'But the world of one is not the world of the other...' এ-বিষয়ে আমাদের আলোচ্য কথাসাহিত্যিক অসচেতন নন, বরং একটু অধিক পরিমাণে সচেতন। তার ফল হয়েছে, গ্রন্থের আদ্যন্ত অতিমাত্রিক একটি উদ্দেশ্যপ্রবণতার চাপ, একটা ব্রতচারণের দায়িত্ববোধ মাঝেমাঝেই পক্ষতাড়না করছে। যা কিনা বারবার স্মরণ করাতে চায়, আমরা শিক্ষিত শহুরে মানুষ ঐসব অরণ্যচারী আদিবাসীদের কেবল ব্যবহার করতেই চাই, তাদের বুঝতে চাই না, জানতে চাই না, ভালোবাসতে যে চাই না, তা বলা বাহুল্য। এবং এজন্যেই যেন লেখক 'স্পর্ধিত শপথে'র ভাব নিয়ে গল্পবলার আসরে নেমেছেন, সুনিশ্চিত করে বলে যেতে চান, তারা তাদের ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে আমাদের চেয়ে অনেকবেশি সৎ, বিশ্বাসী ও একনিষ্ঠ, এমনকি রাজনৈতিক চেতনাতেও তারা সময়ের পদক্ষেপ সমান তীব্রতায় অনুসরণ করছে। আর তাদের সমাজের বা আচারের যা তথাকথিত অন্ধকার দিক, সে আমরা অবুঝ ও ভ্রষ্ট-আলোকপ্রাপ্ত বলেই বুঝি না, নষ্ট মূল্যবোধের বিক্ষিপ্ত ও সংশয়-শিক্ষিত মানুষ কীভাবে তাদের দৃঢ়মূল প্রত্যয়প্রস্থানকে সত্যমূল্য দেবে, দিতে পারে? লেখকের এবম্বিধ ক্ষুব্ধ মনোভাব অসঙ্গত নয়। কিন্তু স্বাভাবিকতার দাবি লঙ্ঘন না করে এই মনোভাবের প্রচ্ছন্ন বিকাশ লেখকের গল্পকাহিনীতে যে সব সময় সম্ভব হয়নি সেটাই আমাদের পক্ষে দুঃখের কারণ। অথচ তাঁর হাতে উপকরণের অভাব ছিল না, স্বল্পসময়ের ঘটনাজাল বিস্তারে জীবন্ত অভিজ্ঞতাও যতখানি ঘটানো সম্ভব, ঘটিয়েছিলেন, তবু যে কেন তাঁর গ্রন্থপাঠের ফলশ্রুতি তাঁর শক্তিমান লেখনীর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেনি তা ভেবে দেখা দরকার।

এবং এ গ্রন্থ সম্পর্কে আমাদের প্রয়োজনীয়তম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য তাই। আর সেজন্যেই বুঝি "দণ্ডকশবরী" পাঠান্তে বারবার বিভূতিভূষণের "আরণ্যকে"র কথা মনে পড়ছে। এই দুই গ্রন্থের মূল সাদৃশ্যসূত্র সদর্থে 'দেবা অপি আরণ্যকো', আর ভ্রমণ, ডায়েরি, কাহিনী এই ত্রিধারায় একটি অচেনা জগতের উন্মোচন উভয়েরই লক্ষণীয় বিশেষত্ব। কিন্তু এদের মধ্যেকার বিভেদ ও ব্যবধান তেমনই সুচিহ্নিত—দৃষ্টিভঙ্গির বিভেদ, একটা মানসিক জগতের ব্যবধান। বিভূতিভূষণ ছিলেন নিতান্তই গ্রামের মানুষ। সেই গ্রাম্যতার যে সহজাত কৌতূহল ও রহস্যভেদের শক্তি তাই তাঁকে টেনেছিল দুর্গম অরণ্যে। আর আলোচ্য লেখক কোনদিন নিশ্চয়ই গ্রামে ছিলেন, গ্রামের অনেক সংস্কার ও অভ্যাস তাঁর মধ্যে নিহিত আছে সত্য—কিন্তু এখন তিনি যে একজন দায়িত্বশীল শিক্ষিত নাগরিক, সেই তাঁর মুখ্য পরিচয়। তা তিনিও গোপন করেননি। এবং সেই একরকম নাগরিক দায়িত্বেই তিনি এই অরণ্যসমাজে প্রবেশ করেছেন। আর সুশিক্ষিত মননজীবী মানুষ সেখানে গিয়ে যা করেন তিনি তাই করেছেন, সে হল আরণ্যকসমাজের পর্যবেক্ষণ ও পর্যালোচনা। দুটি স্বতন্ত্র জগৎ স্বতই গড়ে উঠেছে সেখানে, পর্যবেক্ষণযোগ্য ও পর্যালোচনীয় আরণ্যক জীবন

ও জগৎ, পর্যবেক্ষণরত ও পর্যালোচনাকারী নাগরিক সমাজ—সম্প্রসারিত অর্থে অনেকটা যেন স্টিফেন স্পেন্ডার কথিত 'they' আর 'I'-এর জগৎ : দুই দৃষ্টিভঙ্গী, দুই দৃশ্যপট, দুই দর্শনপ্রস্থান। পক্ষান্তরে বিভূতিভূষণ আরণ্যকসমাজের ফুলপাখিবৃক্ষলতা পরিবৃত যে মানুষদের কাহিনী শুনিয়েছিলেন তারা তাঁর প্রাণের সামগ্রীই হয়ে উঠেছিল, একাত্মতার সুনিবিড় সম্পর্কে সে-জগতের 'তারা' ও 'আমি' তাঁরই তৃতীয় নয়নের দিব্য-দৃষ্টিপাতে দর্শনীয় পরমরমণীয় হয়ে উঠেছিল। বলা বাহুল্য, সে-দর্শন আজকের বস্তুবিজ্ঞান-ভাবিত ক্ষণমানুষী তথ্য ও সত্য পরীক্ষা নয়, সে-দর্শন আধ্যাত্মিক প্রত্যয়ে লালিত চিরন্তন মানবদর্শনের মহানিরীক্ষা—সাম্প্রতিক অস্থির ও সংশয়ী 'হীনযান' নয়, শাশ্বত স্থিরপ্রত্যয় 'মহাযান'; যেন শান্ত সুদূর অতীতকাল থেকে নিকট-বিক্ষুব্ধ বর্তমান পর্যন্ত সুবিচিত্র মানুষী লীলার একটা গভীর প্রাণলৌকিক ঐকসূত্র আবিষ্কার করা যাচ্ছে, অমৃতের পুত্রদের মৃত্যুহীন কাহিনীর গ্রামপর্বতঅরণ্যবৃক্ষবাহন সার্থকতার ইতিহাস; ব্যক্তিক ব্যর্থতাও সেখানে বৃহত্তর তাৎপর্যে সফলতাময়, দেবতার কাব্যের অনন্ত অধ্যায় বিভাগে একটি খণ্ড পরিচ্ছেদ রূপেই তার যা-কিছু মূল্যবত্তা। এবং সেই সুমহৎ পরি-কল্পনার অন্তর্গতরূপে দ্রষ্টা ও দৃশ্য, 'আমি' ও 'তারা' জীবনাচরণগত ব্যবধান সত্ত্বেও একৈকপ্রাণ, হরিহরাত্মা। কিন্তু "দণ্ডকশবরী"র পাতায় পাতায় রোমান্টিক কবির এহেন ঐক্যসন্ধানী অন্তর্দৃষ্টি কালোচিতভাবেই যেন অনুপস্থিত—পক্ষান্তরে বিশুদ্ধ বাস্তবদৃষ্টি ও জ্ঞানে পর্যাপ্ত শিক্ষা-অভিমানীর মনঃপীড়াই এখানে সুলভ। আদিম কৌম-নিয়ন্ত্রিত সমাজে ও আজকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদী শিক্ষিত মানুষে কোথায় একটা বিরাট বিচ্ছেদ যে ঘটে গেছে, শবব্যবচ্ছেদের নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে তার কিনারা করে দেখা যাক্—এম্নি মনোভাবে আক্রান্ত হয়েই তার সূচনা। 'তাদের' ও 'আমাদের' জগৎ বিভিন্ন—এখন তার রহস্যভেদ কর্তব্য। তাই এ-গ্রন্থে 'তাদের' জগতে মাড়িয়া-সুরিয়াসমাজের প্রতিনিধিত্ব করে যে চয়ন ও রঙিলা, গুনিয়া, 'মেরিয়া', মাল্‌কো প্রভৃতি তারাও যেমন নিভৃতস্তব্ধ, 'আমাদের' জগতের স্বয়ং লেখক, ডাঃ পিল্লাই, শর্মিলা দেবী, মেহরা, তারাপ্রসন্ন ন্যায়তীর্থ প্রভৃতিও তেমনি নিঃসঙ্গ নৈয়ায়িক, আতিথ্য দান ও গ্রহণের অনুষ্ঠানে যেন একীকৃত। আর এই দুই জগতের দৈবযোগযুক্ত একটি বিমিশ্র মূর্তি গুপ্তেজীর চরিত্রে রূপলাভ করতে চায়, তাতেই কঠোরতর কারুণ্যে সর্মাধক ফুটে ওঠে আমাদের সামাজিক রীতিনীতির মৌল দুর্বলতা, ক্ষয়িষ্ণুতা—আমরা সব সত্ত্বেও মিলতে পারিনি, মেলাতে পারিনি। 'তারা' ও 'আমরা' ভয়ানকভাবে পৃথক হয়ে গেছি, পৃথক হয়ে আছি, পৃথক হয়ে থাকব। গ্রন্থের উচ্চকণ্ঠ উপসংহার পর্যন্ত নাটকীয়তায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে—সে ঐ একই কারণে। 'তাদের' জীবনের সমস্যায়, সঙ্কটে 'আমাদের' ভূমিকা শুধু নির্লিপ্তপ্রায় ক্ষমাসুন্দর দর্শকের—আপ্রাণ চেষ্টাতেও এই রহস্যভেদ তাই ডাঃ পিল্লাইয়ের মতো আত্মত্যাগী মমতাঘন মানুষের মধ্যেও সার্থক হয়ে উঠল না। সবাই যে যেমন গিয়েছিলেন, সে তেমন ফিরে এলেন—রঙ্গমঞ্চের সুনির্দিষ্ট প্রবেশ-প্রস্থানের ফাঁকে ফাঁকে মাত্র কয়েকটি অজানা চরিত্র ও ঘটনা তাদের সুবিচিত্র সমাজব্যবস্থার পটভূমিসমেত দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল।

এতে স্মৃতি পীড়নভোগ করে, তা অবশ্য নিঃসন্দেহ। এবং বিবেকেও ঘা লাগে। বিশেষত 'sensibility' যাঁর আছে, তাঁর। লেখকরূপে নারায়ণ সান্যালের ঔপন্যাসিক 'আমি'-চরিত্রে সে-বস্তুর কোন অভাব ঘটেনি কখনো। তাঁর কৃতিত্বই এখানে যে সে-বিষয়ে তিনি অধিকন্তু শ্লেষ ও কশাঘাতের আশ্রয় নিয়েছেন। নিজেকে বেত্রাহত হতে দিতেও

তাঁর কোন অস্পষ্টতা নেই। কাহিনী-অংশের উত্তমপুরুষটি রাঁঙলাকে তথাকথিত 'সভ্য' মানুষের ধর্ষণ থেকে বাঁচাতে পারেন নি, এমনকি সেই সভ্য জীবটিকে উপযুক্ত শাস্তি দিতেও পিছিয়ে গিয়েছেন, সুতরাং সেই দ্বিতীয়োক্তের ঘর থেকে রবীন্দ্রনাথের ছবি ছিনিয়ে এনে প্রথমোক্ত যে আত্মগ্লানি-মুক্তি কামনা করেছেন, তাঁকে সে কামনাপূরণে অসহযোগিতা করেছেন আরেকটি দৃঢ়চেতা মানুষ—আপাতত সভ্যসমাজের, কিন্তু মূলত মুরিয়াসমাজের তিনি—সে-মানুষটি গুপ্তেজী, আলোচ্য কাহিনী অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। এখানেও যেন প্রমাণিত হল আরেকবার, 'তাদের' সমস্যার সমাধান তাদেরকেই করতে হবে, 'আমাকে' দিয়ে তা হয়নি, হবে না, গৌরবে বহুবচনান্ত হয়েও না। 'আমরা' বড়োজোর কর্তব্যবোধে কিঞ্চিৎ অধিক বিচলিত ও মর্মাহত বোধ করব, তার বেশি কিছু নয়—কাহিনীর উপান্তে এসে তারই আরেক পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছে, সেই 'উত্তমপুরুষ'-এর চয়নের খোঁজে না গিয়ে অদৃশ্য 'উদাসীন নাট্যকারকে' টেক্কা দিয়ে "দণ্ডকশবরী"র ডাইরি শেষ করার ব্যস্ততায়, মগ্নতায়।

এখানে এই ফলশ্রুতি পাঠে আমাদের স্বতই মনে হয়, ইউরোপীয় আধুনিক অর্থে নিশ্চয়ই নয়, স্বীয় শক্তিতেই, বিভূতিভূষণ আরণ্যকগ্রন্থের আমি-রূপে সে-সাফল্য অর্জন করেছেন, এখানে অনুরূপ দৃষ্টান্তে নারায়ণ সান্যালের তা অনায়ত্ত। উভয়তই ঔপন্যাসিক 'sensibility' সুলভ। কিন্তু বিভূতিভূষণ যেভাবে সমস্ত সত্ত্বেও তাঁর নিমগ্ন সত্তার 'sensibility'-কেই গ্রন্থমধ্যে চরম করে তুলেছিলেন, নারায়ণ সান্যাল তাঁর জাগ্রত মনকে তা সম্ভব করতে পারেননি। সম্ভব করা যায় না। এজন্যে তাঁর সেই পূর্বোক্ত ব্রতচারণের দায়িত্ববোধও অনেকাংশে দায়ী। একদিকে নিরক্ষর অথচ মানবোচিত আরণ্যকসমাজের জন্যে তাঁর বারবার বিঘোষিত শ্রদ্ধাপ্রতিষ্ঠার বিপুল আয়োজন, অন্যদিকে শিক্ষিত সমাজের অমানুষিকতা সম্পর্কে অতিরিক্ত আত্মগ্লানি ও উষ্মাবোধ। এর যে জাতক সে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার অভাবে ম্লান হতে বাধ্য। তাই স্পেণ্ডার কথিত 'the writer who uses his sensibility for the purpose of creating what is outside himself' যেমন হতে পারেননি তিনি, আবার 'the one whose real theme is his own sensibility' সেও তাঁর অনাকাঙ্ক্ষিত রয়ে গেছে। এজন্যে তাঁকে আধুনিক দৃষ্টিসম্মত কোন্ শ্রেণীর শিল্পী-সংজ্ঞায় বিশেষিত করা যায়, সে এক সমাধান-অসম্ভব সমস্যা।

তথাপি শেষ বিশ্লেষণে অস্পষ্ট, বিকেন্দ্রিক ও বিমিশ্র ভঙ্গিতে মানুষের যে সত্য নগ্ন ছবি নারায়ণবাবু আবিষ্কার করেছেন সেখানে তাঁর নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের কোন তুলনা নেই—আর তার সহায়ক হয়েছে তাঁর বহুবিষয়ের ব্যাপ্ত জ্ঞান, মাড়িয়া-মুরিয়া সমাজ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষ অভিজ্ঞতা, পৌরাণিক, ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক সংস্থানের সচেতনতা এবং সর্বোপরি একটি অনিন্দনীয় অসরল অতরল বাগ্‌বিন্যাসের ধারা, শব্দপদবন্ধনের সুদুর্লভ মাত্রাবোধ। বাঙালি পাঠক এই লেখকের মধ্যে বৈদগ্ধ্য ও মমতার একটা বিরলসুন্দর যুক্তবেণী লাভ করলেন।

তবে এ-গ্রন্থের ঔপন্যাসিক দাবি সম্পর্কে পূর্বোক্ত তির্যক প্রশ্নটি ('organic totality'র প্রশ্ন) ছাড়াও দু-একটি ঋজুরৈখিক প্রশ্নও উঠবে। বিভূতিভূষণের আরণ্যক সম্পর্কে যে উঠেছিল তার ইতিবাচক মীমাংসা স্বতই সহজ ছিল। তাঁর সুপ্রোথিত সুগভীর আধ্যাত্মিকতার নিকষেই পাকা সোনা রং ধরা পড়তে দেরি হয়নি। কিন্তু এখানে? বিশেষত আভাসে বা সঙ্কেতে মাত্র নয়, স্পষ্টোচ্চারিত বিস্তৃত ভাষ্যসহ পৌরাণিক কাহিনী-

গ্রন্থনের সহযোগ "দণ্ডকশবরী"র মৌল কাহিনীতে কতটা উপযোগিতা বহন করছে সে-বিষয়ে যখন নিঃসন্দেহ হওয়া সত্যই কঠিন। এভাবে কি 'তারা' ও 'আমি'র বিচ্ছিন্ন জগতে কোন ভাববাস্তবিক অস্থায়ী সেতুবন্ধও রচনা সম্ভব? গ্রন্থমধ্যে নানা উপলক্ষে তথ্যপঞ্জী সন্নিবেশের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কেও নিঃসন্দিগ্ধ হওয়া সহজ নয়। এবং এ-সম্পর্কে স্বয়ং লেখকের কৈফিয়ৎ অর্থান্তরে প্রণিধানযোগ্য : '...ভবিষ্যতে কোন সমাজ-বিজ্ঞানী বা নৃতত্ত্ববিদ এই আদিবাসীদের নিয়ে গবেষণা করার অবকাশে যদি আমার এ লেখা পড়েন তাহলে যেন এ-গ্রন্থকে ঔপন্যাসিক সত্য বলে বাতিল না করেন'—এই সূত্রে একাধিক পরিচ্ছেদ ও বহু অনুচ্ছেদ সম্পর্কেই আমাদের জিজ্ঞাস্য, কোন্‌দিকে লেখক আমাদের নিয়ে যেতে চান, সমাজবিজ্ঞানী ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণায়, না, ঔপন্যাসিক সত্যে, সামঞ্জস্যে? এই বিশেষ গোত্রের ঔপন্যাসিক বিসংগতি মেনে নিয়েও যে-কয়েকটি ক্ষেত্রে ভারসাম্য আদৌ ঘটতে পায়নি, সেজন্যেই এই চরম উক্তি। তাছাড়া লেখকের অসাধারণ কৃতি ছাপিয়ে গেছে তাঁর রামচন্দ্র-শবরী কাহিনীর সটীক পুনর্গ্রন্থণ, তার অনাবশ্যক উপস্থিতির দুর্বলতা, আদ্য ভূমিকায়ই কাহিনীর চরিতার্থতা বিষয়ে পাঠক এভাবে অবহিত হতে অথবা পথনির্দেশ পেতে চাইবেন কেন?

বাগ্‌বিন্যাস, পদান্বয় ও শব্দব্যবহারে লেখক অত্যন্ত নিপুণ, আগেই বলেছি। বিশেষত তাঁর বিরোধাভাস-প্রবৃত্তির উক্তিগুলি প্রায়ই চমৎকার। তার অবশ্য ত্রুটির দিকও আছে—চলতে চলতে বলতে বলতে হঠাৎ-আলোর ঝলকের বেগে সর্বদা সত্য-সামঞ্জস্য রক্ষা করা যায় না। যেমন নারায়ণবাবু লিখছেন : 'রৌদ্র এখানে অমলিন কিন্তু জ্বালাময়ী নয়, বাতাস এখানে স্নিগ্ধ কিন্তু ধূমলিপ্ত নয়'। অথচ আমরা তো বুঝি ধূমলিপ্ত নয় বলেই বাতাস স্নিগ্ধ হয়। আর এত অভিজ্ঞ হয়েও তিনি Tamasa—তামাশা—তমসার যেভাবে গ্রন্থিমোচন করেছেন (পৃঃ ১৩৪) তা অনর্থক কৌতুকজনক। লিখিতভাবে তাঁর কাছে এমন হতজ্যোতি চমক আমরা আশা করি না। পরিশেষে আদিবাসী সমাজের কণ্ঠ থেকে আহৃত লেখকের ভাষান্তরিত গান ও ছড়াকাটাগুলির উল্লেখ করি। হার্বার্ট রীডের পূর্বোদ্ধৃত সিদ্ধান্তের সমর্থন বলে নয়, মূল কাহিনীতেও যেহেতু তাদের নাটকীয় ও গীতমূল্য বর্তমান। কিন্তু গ্রন্থমধ্যে তাদের জীবনযাত্রা ও শিল্পকর্মনমুনা প্রভৃতির প্রদর্শনী, নারায়ণবাবুর ঈর্ষাযোগ্য শৈল্পিক সাধনা সত্ত্বেও বিপরীত কারণেই অগ্রাহ্য হতে পারে। অন্য কোন ভাবে এদের ব্যবহার হলেও হতে পারত, কাহিনীগ্রন্থিত চরিত্রচিত্রপাঠের মধ্যে এদের জন্যে অতিরিক্ত মনঃসংযোগ 'উপন্যাস'-পাঠকের কাছে দাবি করা হয়তো অযৌক্তিক।

নিখিলকুমার নন্দী

পূর্বদেশ—মেসবাহুল হক। কোহিনূর লাইব্রেরী। ঢাকা। মূল্য আট টাকা।

ঢাকায় প্রকাশিত মেসবাহুল হকের এই বৃহদায়তন উপন্যাসটি হাতে পেয়ে নানা কারণে উৎসাহ বোধ করেছিলুম। পূর্ব বাংলার লেখকগণের সাহিত্যকর্ম প্রায়ই কলকাতায় পৌঁছয় না। তবু, বিপুল সময়ের ব্যবধানে মাঝে-মাঝে এবং হঠাৎ যে দু-একটি বই হাতে এসেছে, তা পড়ে রীতিমতো চমৎকৃত হয়েছি। নদীর অন্য পারে, কলকাতায়, লেখকগোষ্ঠীর এক বৃহৎ

অংশ যখন বিজাতীয়তায় আক্রান্ত, তখন কতো সহজে এ'রা ধারণ করে আছেন আবহমান বাংলাদেশের স্মৃতি! উৎসাহের উল্লেখযোগ্য কারণ এই।

মেসবাহুল হক এর আগে আরো দুটি উপন্যাস প্রকাশ করেছেন। সেগুলি পাঠের সুযোগ আমার হয়নি। "পূর্বদেশ" পাঠে মনে হলো উপন্যাস রচনায় তিনি মোটামুটি পারদর্শী এবং কিছু-কিছু আপেক্ষিক ত্রুটি বর্জন করতে পারলে কালে হয়তো তিনি সফলতা অর্জনে সক্ষম হবেন।

মেসবাহুল হক কাহিনী নির্বাচন করেছেন ইতিহাস থেকে। সময় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ। পাঠক জানেন, শুধু বাংলায় নয়, সমগ্র ভারতবর্ষ এই সময়ে দারুণ এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন; মোগল সাম্রাজ্যের শক্তিহীনতার সুযোগে একদিকে যেমন আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও অরাজকতা চরমে উঠেছে, তেমনি, অন্যদিকে দেখা দিয়েছে বিদেশী শাসনের পূর্বাভাস। নবাব আলীবর্দী তখন বাংলার মসনদে। সুবেদার, জমিদারগণ একদিকে যেমন প্রভুত্ব সংরক্ষণে ব্যস্ত, তেমনি, বিশেষত পূর্ব বাংলা, দস্যু, জলদস্যুর উপদ্রবে উৎকণ্ঠ। তরুণ সিরাজদ্দৌলা নবাব হলেন আরো কিছুদিন পরে। তার পরেই পলাশীর যুদ্ধ।

লেখকের উদ্যম প্রশংসনীয়; এই বৃহৎ দেশের অন্যূন ষাট বছরের ইতিহাস তিনি বিন্যস্ত করেছেন একটি মাত্র উপন্যাসের পরিসরে; ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষা করেছেন অনায়াস কৌশলে। কিন্তু, "পূর্বদেশ" এককালীন ভারতবর্ষের কাহিনী নয়, এমনকি সমূহ বঙ্গদেশের কিনা, সে-বিষয়েও সন্দেহ বর্তমান। প্রক্ষিপ্ত ইতিহাসের সূত্র সংস্থাপনের প্রয়োজন ঘটেছে সেইসব জায়গায়, যেখানে, উপন্যাসের ধর্ম অনুসারে, কাহিনীর প্রধান চরিত্র ও নায়ক-শমসের গাজী আবির্ভূত হয়েছেন। এককথায়, উপন্যাসটি তৎকালীন পূর্ব বাংলার এই আর্যোপম পুরুষের বীরত্বময় ও ঘটনাবহুল জীবন-গাথা। কাহিনী এখানে ইতিহাসকে অনুসরণ করেনি; বরং ইতিহাস অনুসরণ করেছে কাহিনীকে।

এ-দেশের ইতিহাস সাধারণভাবে শমসের গাজী সম্পর্কে মূক। বাংলার গভীরতর ইতিহাসে তিনি এক মহতী পুরুষ, নামমাত্র সামান্য যোধা থেকে যিনি ক্রমে ক্ষমতার শীর্ষাসন স্পর্শ করেন। শৌর্যই তাঁর একমাত্র ভূষণ নয়; উপরন্তু, তিনি প্রজাবৎসল, দয়ার্দ্র ও প্রেমিক। গাজীর চরিত্র চিত্রায়ণে লেখক মূলত তাঁর শৌর্য এবং বিশেষভাবে প্রেমিক সত্তার উপর জোর দিয়েছেন। ঈর্ষা হয় তাঁর প্রেমিক প্রতিভায়; কিন্তু বর্তমান লেখকের স্মৃতি এমনই কৃপণ যে, দু-একজনের ব্যতীত গাজীর জীবনে আবির্ভূত অসংখ্য রমণীর অধিকাংশের মুখ তিনি শেষপর্যন্ত মনে রাখতে পারেননি।

উপন্যাসটির দুর্বলতাও এইখানে। অসংখ্য ঘটনা, অসংখ্য চরিত্র—একের পর এক এদের প্রহারে পাঠক জর্জরিত হন ঠিকই; কিন্তু ঘটনা বা চরিত্র কিছুই বিশ্বাস্য মর্যাদা নিয়ে উপস্থিত হয় না। যে-সব গুণের জন্য উপন্যাস গভীরতা পায়, তার পরিধির রূপটি প্রতিভাত হয়, এ-উপন্যাসে তারা মর্মান্তিকভাবে অনুপস্থিত। সত্যি বলতে, অনুচ্ছেদের চলচ্চিত্রধর্মিতা অন্যথা সুন্দর এই কাহিনীকে বৈশিষ্ট্যবিরূপ করে তুলেছে। দু-একটি দৃষ্টান্ত দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে :

(১) স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে পারলো না দরিয়া। লজ্জায় মুখ লুকালো শমসেরের প্রসারিত বক্ষে। অনুনয়রে স্বরে বললো, তুমি আমাকে ক্ষমা কর শমসের। তোমার ভালবাসা আমাকে অন্ধ করে দিয়েছিল। তাই অতি বড় একটা সত্যও আমার চোখে ধরা পড়লো না।

আদরে দরিয়ার পিঠে হাত রেখে শমসের বললো, তোমার এ অন্ধ ভালোবাসা পেয়েই ত আমি ধন্য দরিয়া।'

অতঃপর লেখকের মন্তব্য :

'সত্য এমনই সুন্দর। সকল মিথ্যা, সংশয়কে ছাড়িয়ে নগ্ন হয়ে ফুটে চোখের সামনে। গাঢ় মেঘের ব্যূহ ভেদ করে বেরিয়ে আসা প্রখর সূর্যের আলোর মতো। তবুও মিথ্যা দিয়ে সব কিছুকে জয় করার কত না প্রয়াস মানুষের। সত্য-মিথ্যার এ দ্বন্দ্ব কোন কালেও মিটবে না। মিথ্যা তিলে তিলে বেড়ে উঠবে। কিন্তু, একদা তার পরিসমাপ্তি ঘটবে সত্যেরই প্রসারিত আশ্রয়ে এসে।...(পৃঃ ২৭)

(২) 'সেই নির্জন ছাদে অনেকক্ষণ লড়াই চললো দুজন প্রেমিক-প্রেমিকার মধ্যে। হঠাৎ এক সময় দরিয়ার তলোয়ার ছিটকে পড়লো দূরে। শমসের হেসে উঠলো, এবার, এবার যাবে কোথায়? (পৃঃ ১০৮)

এইসব অযথা নাটকীয়, লঘু সংলাপ ও নির্ভার মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমেয়। লেখকের ইতিহাস বর্ণনাও অনুরূপ শ্রীহীন ও তাৎপর্যবিহীন। একটি উদাহরণ :

'পাঠান রাজত্বকালে বাংলাদেশে বারজন প্রধান ভূস্বামী ছিল। ইহারা বার ভূঁইয়া নামে খ্যাত। এই বারজনেরই বাস ছিল পূর্ববাংলায়। তাই পূর্ববাংলাকে বলা হতো 'বার ভূঁইয়ার মুলুক'। (পৃঃ ৪৩)

লেখকের একটি গুণ চার শতাধিক পৃষ্ঠার এই উপন্যাসটি পাঠে কোথাও ক্লান্তি বোধ করিনি।

দিব্যেন্দু পালিত

ত্রুটি স্বীকার

কার্তিক-পৌষ ১৩৭০ সংখ্যার চতুরঙ্গে ২৯০ পৃষ্ঠায় ১৮নং পংক্তিতে 'আলোকরঞ্জন' হবে অলোকরঞ্জন: ৩০নং পংক্তিতে 'সিন্ধসের সেনের' পরিবর্তে অরবিন্দ গুহের পঠনীয়; ৩৩নং পংক্তিতে আনন্দ বাগচী নামটিতেও ছাপার ভুল ছিল।